Hitesranjan Sanyal Memorial Collection

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS2001/ 2/2	Place(s) of Publication:	Calcutta
		Year of Publication	1353 b.s. (1946) – 1361 b.s. (1955)
Collection:	Bethune College Library	Publisher / Printer:	
~~Editor(s)~~ Title	Purbbāśā (পূর্ব্বাশা)	Size:	7½" x 9½"
		Condition:	brittle
~~Title:~~ Editor	Sanjay Bhattacharya	Volumes in record:	Vol. 9 : 1353 b.s. (1946-47) Vol. 11-17 : 1355-61 (1948-55)

Roll No. 182	From Gate: 1	To Gate:

পূর্বাশা

BETHUNE COLLEGE LIBRARY
BETHUNE
COLLEGE LIBRARY
Class No ....
G.R./D.G./N.G./Presentation
Session 19..............
Not For Home Issue

বৈশাখ
১৩৬১ বাংলা
॥ সপ্তদশ বর্ষ ॥
সম্পাদক : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি—যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পূর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায়—'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পূর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস
দুটাকা

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
গান্ধী-পরিকল্পনা
(অর্থনীতি বিষয়ক)
দু'টাকা

গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা
দু'টাকা

ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম
বারো আনা

শিক্ষার বাহন
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
রুশো

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
কার্ল মার্ক্স

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ডারুইন

সুবোধ ঘোষের
সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
বৌদ্ধধর্ম্ম
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
ধর্ম্মবিজয়ী অশোক
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা :

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ভারতীয় নারী ও সমাজ

গোপাল ভৌমিকের
সমাজ ও সাহিত্য

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
সমাজ ও বিজ্ঞান

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
ধর্ম্ম ও নীতি

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
সমাজ ও সংস্কৃতি

নারায়ণ চৌধুরীর
সঙ্গীত ও সমাজ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ

লুই ফিশারের
মহাজিজ্ঞাসা
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা

মিনু মাসানির
নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
মোসলেম রাজনীতি
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি
বার আনা

মিনু মাসানির
খাদ্য
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
বোম্বে পরিকল্পনা
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

টুকরো কথা (৩৭)

আশ্বিনের কিশোর শীতেও নয়, হেমন্তের ম্লান পীতেও নয়, বাঙলা-দেশের বছর শুরু রুদ্র বৈশাখে, আকাশ পৃথিবী যখন তৃষার্ত, বিশুষ্ক মাঠঘাট, পথে-পথে যাযাবর কন্যার মতো ঘূর্ণিধুলোর নাচ, মূর্ছিত গাছপালার ফাঁকে গুল্মোরের অট্টহাসি, কদাচিৎ হাওয়ায় হয়তো দূরবৃষ্টির গন্ধ। তৃষ্ণা, তাপ, প্রতীক্ষার এই নির্মম বৈশাখে ঐশ্বর্য নেই, আছে রাজসিকতা। রাজসিকতা দিগন্ত ছিঁড়ে লাফিয়ে ওঠা ঝড়ের মেঘে, আকাশছাওয়া বৃষ্টিধারায়। জন্মের দিনক্ষণ এমন হিসেব মিলিয়ে চলে না নিশ্চয়ই। তাহলেও বলতে ইচ্ছে করে বৈশাখ ছাড়া আর কোনো মাসে বছরের আর কোনো সময়ে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হতে পারত না। তৃষাতপ্ত দেশে রসমাধুর্যবৃষ্টির অজস্রতায় তিনিও রাজসিক। বাংলা কাব্যের পূর্বধারার সঙ্গমে আধুনিক উত্তরধারার উৎসমূলে রবীন্দ্রনাথ বিরাজ করছেন। প্রতি বৈশাখে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্য করে আমরা যে উৎসব করি সে উৎসব আজ আর মহর্ষির কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মোৎসব নয়, কবিজন্মোৎসব। সেদিন আমরা রবীন্দ্রনাথকে সম্মুখে রেখে সমগ্র বাংলা কাব্যকেই আবাহন করি। 'কবিপক্ষ' তাই বাংলা কবিতার পক্ষ।

অন্যান্য বছরের মতো এবারও সিগনেট বুকশপ 'কবিপক্ষে'র আয়োজন করেছেন। এই দুই সপ্তাহ কাল রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর পাশাপাশি পূর্ব এবং উত্তরকবিদের গ্রন্থাদিও বুকশপের সংগ্রহে দেখা যাবে। এই উপলক্ষ্যে পুস্তিকা আকারে প্রায় ছয়শো গ্রন্থের একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন সিগনেট বুকশপ: 'বাংলা কাব্যগ্রন্থের তালিকা' ১১০০ থেকে ১৩৬১ সাল। কাব্যের প্রতি মমতাবশত রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা স্মরণ করেন, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্যপ্রয়াস বিষয়ে তাঁরা নিরুৎসুক থাকলে বুঝতে হবে রবীন্দ্রপ্রীতি এবং কাব্যপ্রীতি তাঁদের কাছে অন্তত এক জিনিস হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথকে মনে রেখে পরবর্তী কাব্যের বিচার তাঁরা নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু সে কৌতূহলও যদি না থাকে তাহলে নিঃসন্দেহেই বলা যায় রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারের সন্তান বলেই শুধু জেনেছেন, বাঙলার মহত্তম কবি বলে জানেননি।

কবিপক্ষে সিগনেট প্রেস থেকে আধুনিক জ্যেষ্ঠ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তর 'অর্কেষ্ট্রা' কাব্যগ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশিত হল। 'অর্কেষ্ট্রা' প্রেমের কবিতার সংগ্রহ। এক যুগ আগে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছিল। সিগনেট সংস্করণে কবি প্রায় প্রতিটি কবিতার আদ্যন্ত পরিমার্জনা করেছেন। ফলে পুরনো আর নতুন 'অর্কেষ্ট্রা'য় পার্থক্য বিস্তর। আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে পরিমার্জিত সংস্করণটির প্রকাশ একটি বিশিষ্ট ঘটনা বলে গণ্য হবে। 'নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন' 'সংবর্ত'কে এ বছরের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বলে নির্বাচিত করেছেন। 'সংবর্তে'র কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। প্রকাশক সিগনেট প্রেস। কবি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' গত বছরে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থ। এটিও সিগনেট প্রেসের বই।

কবিপক্ষে কবি হেমচন্দ্র বাগচীর নাম স্মরণ করি। তিনি অসুস্থ এবং অশক্ত। বহুকাল পূর্বে ছাপা 'দীপান্বিতা' এবং 'মানসবিরহ' নামে তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থের কিছু অবশিষ্ট কপি সিগনেট বুকশপ সংগ্রহ করেছেন। কবিপক্ষে এ বই দুটিও বুকশপে পাওয়া যাবে। তাঁর শেষের দিকের লেখা আশ্চর্য সুন্দর ক্ষুদ্রাকার গদ্য কবিতা এবং অন্যান্য রচনা নিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই একটি নতুন কবিতার বই প্রকাশ করছেন সিগনেট প্রেস। নতুন কবিতার বই: করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ত্রয়ী' অরুণ ভট্টাচার্যের 'ময়ূরাক্ষী'। 'বঙ্গমঙ্গল', 'প্রসাদী' এবং 'ঝরাফুল' নামে তিনটি কাব্যগ্রন্থের একত্রিত সংস্করণ 'ত্রয়ী'॥

বাংলা প্রবন্ধের দুর্নাম আছে যে খঞ্জভাষার পায়ে ভর দিয়ে সে বস্তু খুব একটা সহজ ভঙ্গীতে চলতে ফিরতে পারে না। অনেক সময় গুরুবিষয়ের জ্ঞানের ভারে টাল খেয়ে পড়ে। ঈদৃশ প্রবন্ধগ্রন্থের বিষয়ে যাঁরা ভীতিগ্রস্ত, বাংলা গদ্যের সব্যসাচী প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' দুখণ্ড তাঁদের পড়তে অনুরোধ করি। উৎকৃষ্ট গদ্যের অসামান্য নিদর্শন। বিভিন্ন প্রবন্ধ পুস্তক এবং সাময়িকপত্রে মুদ্রিত প্রবন্ধাবলী থেকে নির্বাচিত পঞ্চাশটি রচনার সমষ্টি এই বই দুটি নিয়ে শিক্ষিত বাঙালী পাঠক গর্ববোধ করতে পারেন। দ্বিতীয় খণ্ডটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে॥

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 'একালের বই' নামে যে নতুন সিরিজের সম্পাদনা করেছেন তার প্রথম বই ছড়া মেশানো সহজ বাংলায় লেখা কার্ল মার্ক্স-এর 'ওয়েজ লেবার অ্যাণ্ড ক্যাপিটাল'। 'ভূতের বেগার' নামে অর্থনীতিসংক্রান্ত এই বইটি লিখেছেন সম্পাদকদেরই একজন—সুভাষ মুখোপাধ্যায়॥

ছোটদের লেখা ছাপানোটা দেশে আজ মারাত্মক রকম সহজ হয়ে উঠেছে। সেই সব ঝুড়ি ঝুড়ি রচনার মধ্যে প্রায়শই শিশুটি অনুপস্থিত। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সাত থেকে পনরো বছরের ছেলেমেয়েরা 'আমাদের লেখা' নামে প্রতিবছর যে ক্ষুদ্রকায় বার্ষিকীটি প্রকাশ করে সেটি এ বিষয়ে ব্যতিক্রম। গদ্য পদ্য রচনা এবং লিনোকাট ছবি নিয়ে এই ছোট্ট সংকলনটি যাঁদেরই হাতে পড়বে তাঁরাই খুসি না হয়ে পারবেন না। ছোটরা বড়োরা সমান উপভোগ করবেন॥

টুকরো কথার তিনবছর শেষ হল। এ তিনবছর ধরে বিভিন্ন মাসিক এবং সাময়িক পত্রিকায় 'টুকরো কথা' ছাপা হয়েছে। তদুপরি আলাদা ছাপানো ফোল্ডারেরও ব্যবস্থা ছিল। এখন থেকে শুধু ছাপানো ফোল্ডার আকারেই 'টুকরো কথা প্রকাশিত হবে, পত্রিকায় আর ছাপা হবে না। তার প্রধান কারণ অবশ্য এই যে পত্রিকায় নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যেও পুরো 'টুকরো কথা' কখনোই ছাপানো যেত না। ফোল্ডারে সম্পূর্ণ 'টুকরো কথাই' ছাপা হবে এবং ডাকযোগে বা সিগনেটের দুই দোকান থেকে এখন যেমন পাচ্ছেন তেমনই সকলে পাবেন। গত সংখ্যায় পুনরায় 'সাহিত্য প্রাসঙ্গিক সমস্যা' ছাপানো হয়েছে। সাহিত্যের পাঠকেরা উৎসাহ দেখালে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে॥

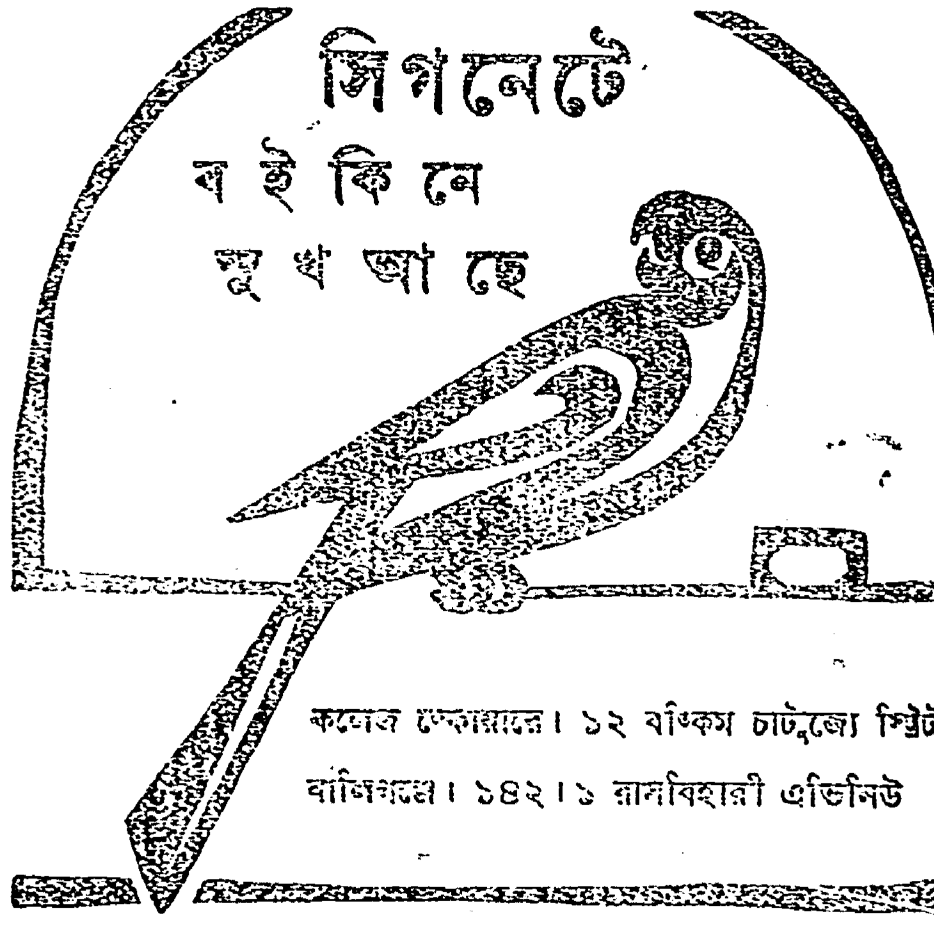

আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি—যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পূর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায়—'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পূর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস
দুটাকা

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
গান্ধী-পরিকল্পনা
(অর্থনীতি বিষয়ক)
দু'টাকা

গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা
দু'টাকা

ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম
বারো আনা

শিক্ষার বাহন
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
রুশো

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
কার্ল মার্ক্স

অনিলকুমার বন্দোপাধ্যায়ের
ডারুইন

সুবোধ ঘোষের
সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
বৌদ্ধধর্ম্ম
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
ধর্ম্মবিজয়ী অশোক
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা:

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ভারতীয় নারী ও সমাজ

গোপাল ভৌমিকের
সমাজ ও সাহিত্য

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
সমাজ ও বিজ্ঞান

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
ধর্ম্ম ও নীতি

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
সমাজ ও সংস্কৃতি

নারায়ণ চৌধুরীর
সঙ্গীত ও সমাজ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ

লুই ফিশারের
মহাজিজ্ঞাসা
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা

মিনু মাসানির
নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
মোসলেম রাজনীতি
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি
বার আনা

মিনু মাসানির
খাদ্য
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
বোম্বে পরিকল্পনা
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

টুকরো কথা… (৩৭)

আশ্বিনের কিশোর শীতেও নয়, হেমন্তের ম্লান শীতেও নয়, বাঙলাদেশের বছর শুরু রুদ্র বৈশাখে, আকাশ পৃথিবী যখন তৃষার্ত, বিশুষ্ক মাঠঘাট, পথে-পথে যাযাবর কন্যার মতো ঘূর্ণিধূলোর নাচ, মূর্ছিত গাছপালার ফাঁকে গুলমোরের অট্টহাসি, কদাচিৎ হাওয়ায় হয়তো দূরবৃষ্টির গন্ধ। তৃষ্ণা, তাপ, প্রতীক্ষার এই নির্মম বৈশাখে ঐশ্বর্য নেই, আছে রাজসিকতা। রাজসিকতা দিগন্ত ছিঁড়ে লাফিয়ে ওঠা ঝড়ের মেঘে, আকাশছাওয়া বৃষ্টিধারায়। জন্মের দিনক্ষণ এমন হিসেব মিলিয়ে চলে না নিশ্চয়ই। তাহলেও বলতে ইচ্ছে করে বৈশাখ ছাড়া আর কোনো মাসে বছরের আর কোনো সময়ে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হ'তে পারত না। তৃষাতপ্ত দেশে রসমাধুর্যবৃষ্টির অজস্রতায় তিনিও রাজসিক। বাংলা কাব্যের পূর্বধারার সঙ্গমে আধুনিক উত্তরধারার উৎসমূলে রবীন্দ্রনাথ বিরাজ করছেন। প্রতি বৈশাখে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্য করে আমরা যে উৎসব করি সে উৎসব আজ আর মহর্ষির কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মোৎসব নয়, কবিজন্মোৎসব। সেদিন আমরা রবীন্দ্রনাথকে সম্মুখে রেখে সমগ্র বাংলা কাব্যকেই আবাহন করি। 'কবিপক্ষ' তাই বাংলা কবিতার পক্ষ।

অন্যান্য বছরের মতো এবারও সিগনেট বুকশপ 'কবিপক্ষে'র আয়োজন করেছেন। এই দুই সপ্তাহ কাল রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর পাশাপাশি পূর্ব এবং উত্তরকবিদের গ্রন্থাদিও বুকশপের সংগ্রহে দেখা যাবে। এই উপলক্ষ্যে পুস্তিকা আকারে প্রায় ছয়শো গ্রন্থের একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন সিগনেট বুকশপ: 'বাংলা কাব্যগ্রন্থের তালিকা' ১১০০ থেকে ১৩৬১ সাল। কাব্যের প্রতি মমতাবশত রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা স্মরণ করেন, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্যপ্রয়াস বিষয়ে তাঁরা নিরুৎসুক থাকলে বুঝতে হবে রবীন্দ্রপ্রীতি এবং কাব্যপ্রীতি তাঁদের কাছে অন্তত এক জিনিস হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথকে মনে রেখে পরবর্তী কাব্যের বিচার তাঁরা নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু সে কৌতূহলও যদি না থাকে তাহলে নিঃসন্দেহেই বলা যায় রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারের সন্তান বলেই শুধু জেনেছেন, বাঙলার মহত্তম কবি বলে জানেননি।

কবিপক্ষে সিগনেট প্রেস থেকে আধুনিক জ্যেষ্ঠ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তর 'অর্কেষ্ট্রা' কাব্যগ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশিত হল। 'অর্কেষ্ট্রা' প্রেমের কবিতার সংগ্রহ। এক যুগ আগে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছিল। সিগনেট সংস্করণে কবি প্রায় প্রতিটি কবিতার আদ্যন্ত পরিমার্জনা করেছেন। ফলে পুরনো আর নতুন 'অর্কেষ্ট্রা'য় পার্থক্য বিস্তর। আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে পরিমার্জিত সংস্করণটির প্রকাশ একটি বিশিষ্ট ঘটনা বলে গণ্য হবে। 'নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন' 'সংবর্ত'কে এ বছরের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বলে নির্বাচিত করেছেন। 'সংবর্তে'র কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। প্রকাশক সিগনেট প্রেস। কবি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' গত বছরে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। এটিও সিগনেট প্রেসের বই।

কবিপক্ষে কবি হেমচন্দ্র বাগচীর নাম স্মরণ করি। তিনি অসুস্থ এবং অশক্ত। বহুকাল পূর্বে ছাপা 'দীপান্বিতা' এবং 'মানসবিরহ' নামে তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থের কিছু অবশিষ্ট কপি সিগনেট বুকশপ সংগ্রহ করেছেন। কবিপক্ষে এ বই দুটিও বুকশপে পাওয়া যাবে। তাঁর শেষের দিকের লেখা আশ্চর্য সুন্দর ক্ষুদ্রাকার গদ্য কবিতা এবং অন্যান্য রচনা নিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই একটি নতুন কবিতার বই প্রকাশ করছেন সিগনেট প্রেস। নতুন কবিতার বই: করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ত্রয়ী' অরুণ ভট্টাচার্যের 'ময়ূরাক্ষী'। 'বঙ্গমঙ্গল', 'প্রসাদী' এবং 'ঝরাফুল' নামে তিনটি কাব্যগ্রন্থের একত্রিত সংস্করণ 'ত্রয়ী'॥

বাংলা প্রবন্ধের দুর্নাম আছে যে খঞ্জভাষার পায়ে ভর দিয়ে সে বড় খুব একটা সহজ ভঙ্গীতে চলতে ফিরতে পারে না। অনেক সময় গুরুবিষয়ের জ্ঞানের ভারে টাল খেয়ে পড়ে। ঈদৃশ প্রবন্ধগ্রন্থের বিষয়ে যাঁরা ভীতিগ্রস্ত, বাংলা গদ্যের সব্যসাচী প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' দুখণ্ড তাঁদের পড়তে অনুরোধ করি। উৎকৃষ্ট গদ্যের অসামান্য নিদর্শন। বিভিন্ন প্রবন্ধ পুস্তক এবং সাময়িকপত্রে মুদ্রিত প্রবন্ধাবলী থেকে নির্বাচিত পঞ্চাশটি রচনার সমষ্টি এই বই দুটি নিয়ে শিক্ষিত বাঙালী পাঠক গর্ববোধ করতে পারেন। দ্বিতীয় খণ্ডটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে॥

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 'একালের বই' নামে যে নতুন সিরিজের সম্পাদনা করেছেন তার প্রথম বই ছড়া মেশানো সহজ বাংলায় লেখা কার্ল মার্ক্স-এর 'ওয়েজ লেবার অ্যাণ্ড ক্যাপিটাল'। 'ভূতের বেগার' নামে অর্থনীতিসংক্রান্ত এই বইটি লিখেছেন সম্পাদকদেরই একজন—সুভাষ মুখোপাধ্যায়॥

ছোটদের লেখা ছাপানোটা দেশে আজ মারাত্মক রকম সহজ হয়ে উঠেছে। সেই সব ঝুড়ি ঝুড়ি রচনার মধ্যে প্রায়শই শিশুটি অনুপস্থিত। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সাত থেকে পনরো বছরের ছেলেমেয়েরা 'আমাদের লেখা' নামে প্রতিবছর যে ক্ষুদ্রকায় বার্ষিকীটি প্রকাশ করে সেটি এ বিষয়ে ব্যতিক্রম। গদ্য পদ্য রচনা এবং লিনোকাট ছবি নিয়ে এই ছোট্ট সংকলনটি যাঁদেরই হাতে পড়বে তাঁরাই খুসি না হয়ে পারবেন না। ছোটরা বড়োরা সমান উপভোগ করবেন॥

টুকরো কথার তিনবছর শেষ হল। এ ইতিনবছর ধরে বিভিন্ন মাসিক এবং সাময়িক পত্রিকায় 'টুকরো কথা' ছাপা হয়েছে। তদুপরি আলাদা ছাপানো ফোল্ডারেরও ব্যবস্থা ছিল। এখন থেকে শুধু ছাপানো ফোল্ডার আকারেই 'টুকরো কথা' প্রকাশিত হবে, পত্রিকায় আর ছাপা হবে না। তার প্রধান কারণ অবশ্য এই যে পত্রিকায় নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যেও পুরো 'টুকরো কথা' কখনোই ছাপানো যেত না। ফোল্ডারে সম্পূর্ণ 'টুকরো কথাই' ছাপা হবে এবং ডাকযোগে বা সিগনেটের দুই দোকান থেকে এখন যেমন পাচ্ছেন তেমনই সকলে পাবেন। গত সংখ্যায় পুনরায় 'সাহিত্য প্রাসঙ্গিক সমস্যা' ছাপানো হয়েছে। সাহিত্যের পাঠকেরা উৎসাহ দেখালে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে॥

পূর্ব্বাশা

প্রতিসংখ্যা—আট আনা

বৈশাখ—১৩৬১

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

কবিতাগুচ্ছ :

নববর্ষের ভাবনা : অন্নদাশঙ্কর রায় ... ১

নৈকল্লীরন্মের নলেট অবলম্বনে : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ... ২

প্যাম্বার : অনুবাদক পুণ্যশ্লোক রায় ... ২

অতি বাস্তব স্বপ্ন : অনিল বিশ্বাস ... ৩

তুমি আমি : বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ... ৪

রূপনারায়ণে সন্ধ্যা : প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ... ৫

স্বপ্ন ধ্বনি : আবুল ফজল শাহাবুদ্দীন ... ৫

তৃতীয় নয়ন : পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য ... ৬

কেউ ডাকে নি : অরবিন্দ গুহ ... ৭

চীনাংশুক থেকে চীবর : বিশু বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৮

সুদর্শনের কাহিনী : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ... ২৭

বাংলার সমস্যার দু'একটি দিক : অম্লান দত্ত ... ৩৮

গড় শ্রীখণ্ড : অমিয়ভূষণ মজুমদার ... ৪২

ভারত-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ : ইন্দ্রজিত ... ৫২

সাংস্কৃতিকী : ... ৫৬

কবিতার বই : ... ৬২

প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

মনোলীনা— ২৷৷০

সেতুবন্ধ— ২৷৷০

সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲

বিচিত্র হৃদয়— ২৲

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

উপল-মুখর

(যন্ত্রস্থ)

প্রকাশক : পূর্ব্বাশা লিমিটেড

স্মরণীয় দৃষ্টান্ত

নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ব্যবসার বাজার যখন সাধারণতঃ মন্দার দিকে, তখন হিন্দুস্থান বীমা ব্যবসায়ে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা

২ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার

অধিক কাজ করিয়া সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। নূতন বীমার কাজেও ইহার অগ্রগতি অসামান্য।

১৯৫৩

নূতন বীমা ১৮ কোটি ৮৯ লক্ষের উপর

এই সাফল্য হিন্দুস্থানের প্রতি জনসাধারণের অক্ষুণ্ণ আস্থার উজ্জ্বল নিদর্শন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, ৪নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১৩

ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া বিল্ডিংস্

৬৪নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা-১৩

১৯৫২ ইং পর্য্যন্ত প্রথম ১৬২ বৎসরে পাঁচটি সার্থক ভ্যালুয়েশান। প্রতি ভ্যালুয়েশানে পলিসি-হোল্ডারদের বোনাস্ এবং শেয়ার-হোল্ডারদের ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় বীমাজগতে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

এন্, সি, দত্ত

চেয়ারম্যান।

খাদ্যপ্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড্' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

সুপার-নিও-কড্

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ

কলিকাতা-১৩

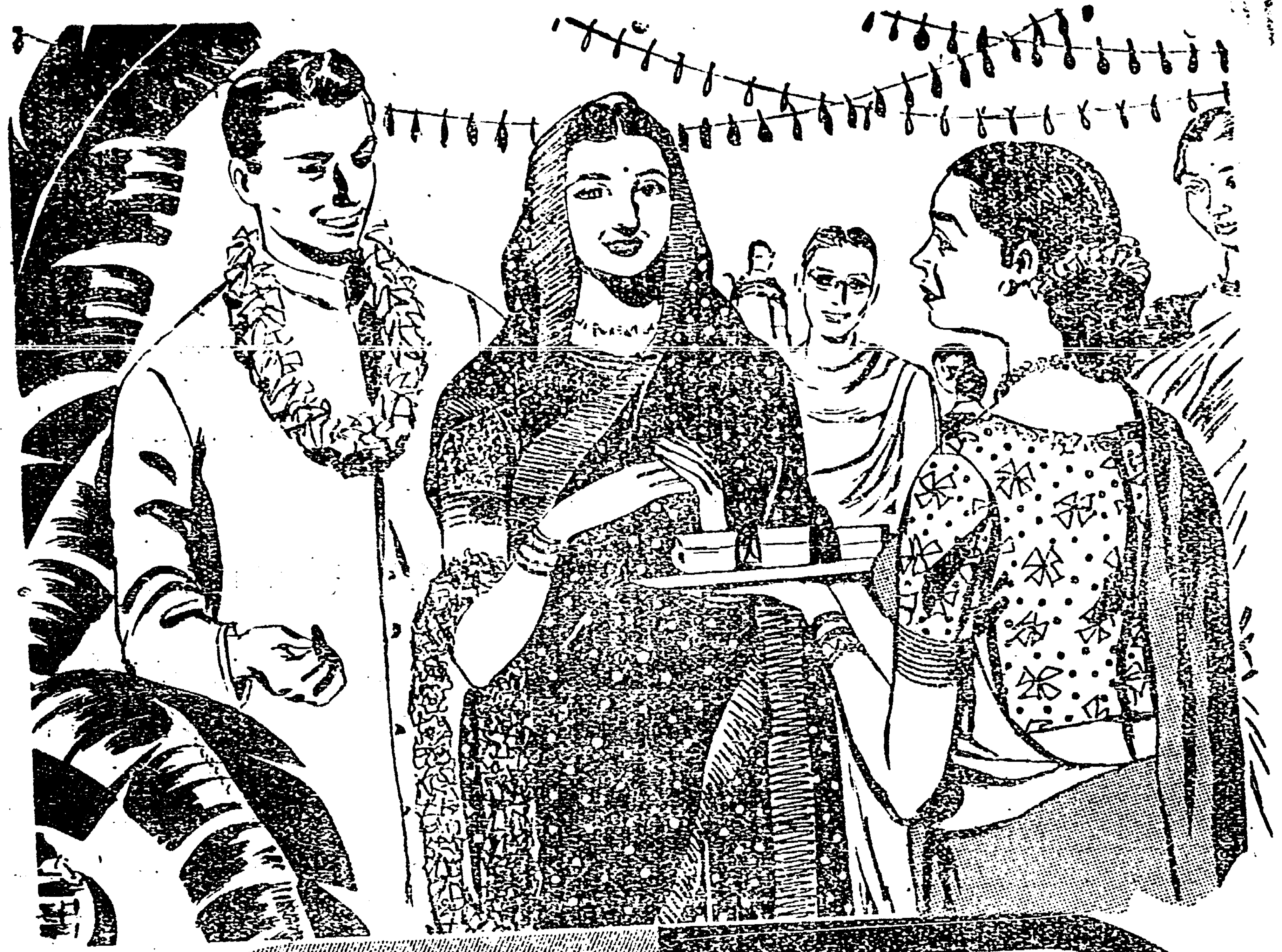

উৎসবের দিনের আনন্দ-মুখর
মুহূর্তগুলিকে রঙে-রসে আরো
পরিপূর্ণ করে তুলতে এক পেয়ালা
গরম চা সত্যিই অতুলনীয়।

উৎসবের আনন্দে

চা

CTB-115

পূর্ব্বাশা

বৈশাখ - ১৩৬১

নর্ত্তকী
অজন্তা গুহা-চিত্র

ভারতী
শিল্পী - আচার্য্য নন্দলাল বসু

পূর্ব্বাশা

বৈশাখ—১৩৬১

Not For Home Issue

নব বর্ষের ভাবনা

অন্নদাশঙ্কর রায়

নতুন বছরে সেই পুরাতন আমিকে
কেমন করে যে নতুন পোশাকে সাজাব !
তেমন পোশাক কিনতে কি যায় পাওয়া !
এখানে ওখানে দোকানে দোকানে না যাব।
নতুন বছরে সেই পুরাতন আমিকে
কেমন করে যে নতুন রেশমে সাজাব !

নতুন বছরে সেই পুরাতন আমিকে
কেমন করে যে নতুন রকমে জানাব !
চেনাব শোনাব বুনব বোনাব দোলাব
ভুলব ভোলাব সৃষ্টির সুখে বানাব !
নতুন বছরে সেই পুরাতন আমিকে
কেমন করে যে শতেক রঙ্গে জানাব !

নতুন বছরে সেই পুরাতন আমিকে
কেমন করে যে নব রূপে ভালোবাসাব !
বাসি মালাগাছি তাজা ফুল হবে তবে তো
পরব পরাব ফেলব ছড়াব ভাসাব !
নতুন বছরে সেই পুরাতন আমিকে
কেমন করে যে রূপে রূপে ভালোবাসাব !

শেক্‌স্‌পীয়রের সনেট অবলম্বনে

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

[১৩০]

কে বলে সূর্যের সঙ্গে তুলনীয় প্রিয়ার নয়ন ?
প্রবাল রক্তিম হলে, নাতিরক্ত তার ওষ্ঠাধর ;
তুষার ধবল বটে, পাংশুবর্ণ কিন্তু তার স্তন ;
কেশের বদলে ধরে মস্তকে সে তন্তুর কেশর।
স্ফুর্ত যে-কোশেয় কান্তি শাদা, লাল, বিস্তর গোলাপে,
কান্তার কপোল-তলে দুর্নিরীক্ষ্য তার প্রতিভাস ;
আমোদের আতিশয্য উদ্বায়ী যে-সুরভিকলাপে,
তার অন্যতম নয় প্রেয়সীর নিবিড় নিঃশ্বাস।
অবশ্য আমার কানে তার বাক্য নিত্য রমণীয় ;
তৎসত্ত্বেও বুঝি আমি সমধিক মধুর সঙ্গীত।
দেবীদের গতিবিধি এ-জীবনে দেখিনি যদিও,
সে মাটি মাড়িয়ে চলে, জানি তবু এ-কথা নিশ্চিত।
অথচ, ঈশ্বর সাক্ষী, যারা তার মিথ্যা উপমান,
সে শ্রেয় তাদের চেয়ে ; মাত্রাজ্ঞানে আমার প্রমাণ॥

প্যান্থার

রাইনর মারিয়া রিল্‌কে
মূল জার্মান হতে অনুবাদ
অনুবাদক পুণ্যশ্লোক রায়

গরাদের পর গরাদে দেখে তার দৃষ্টি
এত ক্লান্ত হয়ে গেছে যে সে আর পারে না।
তার কাছে যেন হাজার গরাদে সামনে
আর হাজার গরাদের ওপাশে নেই কোনো জগৎ।

বলিষ্ঠ ও নমনীয় পাদক্ষেপের পেলব গতি
ক্ষুদ্রতম বৃত্তের পরিধিতে ঘোরে ;
যেন শক্তির নৃত্য মাঝঠাঁই ঘিরে,
যেখানে প্রচণ্ড এক ইচ্ছে প্রমূঢ় হয়ে আছে।
কদাচ চোখের তারার আবরণ ঈষৎ সরে
নিঃশব্দে খুলে যায়—তখন ছবি এক ভিতরে চলে যায়,
চলে যায় অঙ্গে অঙ্গে বিস্তৃত নৈঃশব্দ্যের মাঝ দিয়ে—
মিলিয়ে যায় হৃদয়ে গিয়ে ঠেকে।

অতি বাস্তব স্বপ্ন

অনিল বিশ্বাস

অচৈতন্যে বিশ্ব ডোবে, ওড়ে শত প্রাণণ বলাকা
বস্তুর অতীত লোকে। হায়েনা-হর্মোন ধর্ষকাম
হরফ-লেখনে লেখে য়ুরোপার নব পরিণাম
উনিশো চুরাশি সালে। যুযুধান মস্তিষ্কের পাখা

ঘোরে লেক সাকসেসে—কোষপুঞ্জ পরায় বনেট
শতাব্দীর ভাঙা হাড়ে, রচে কালেভালা, ইলিয়াদ,
আর মহাভারতম্‌। মারমেডে বাদ বিসম্বাদ
জমে, ওঠে হৈচৈ ; গ্রন্থি নাচে মেথুশেলা হ্যামলেট।

থাইরয়েড ডেকে আনে বিজ্ঞানীকে অণুর খেলায়
ধর্ষণে ধরাকে ধরে, রচে বার্লিন ও হিরোশিমা ;
মুঠো মুঠো ধুলো ওড়ে, আঁকে শূন্যে আপনারি সীমা।
বোধিদ্রুমে ধ্যানমগ্ন রবটেরা শোনায় সন্দেশ—
অবিহীসাভূতানাম। দেশ কাল সন্ততি হারায় :
বস্তুঘন স্বপ্ন দেখে বিদেহী আত্মার গুড়াকেশ।

তুমি আমি

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

শেষ বেলার আলাপী বেহালায়
মনকে আজ পেয়েছি বড়ো কাছে ;
কী দিয়ে তাকে আমার আঙিনায়
ঘরোয়া ক'রে রাখতে পারি বলো
কী সুরে আজ হৃদয়ে বাঁধি গান
যা নিয়ে প্রাণ বাঁচার মতো বাঁচে !

আলোয় আলো মধুর পৃথিবীকে
কবে যে পাবো এ দেশে, এই পথে—
মাটি ও নদী—পাহাড়ে, পর্বতে
কবে যে তার প্রাণের প্রেরণার
আমরা হবো উত্তরাধিকার !

আকাশে আজো অথৈ নীল রঙ,
মেঘের বুকে একটি দিনান্ত
নদীর ঢেউয়ে কাঁপছে থরোথরো,
হাওয়ার সুর স্তব্ধ ও শান্ত !

ফুলের মতো নরম নিবিড়তা
গানের মতো প্রেমের তন্ময়তা
মনকে ছুঁয়ে বাঁচবে ভালোবাসা ঃ

সাগর থেকে কুড়িয়ে এনে নীল
দুচোখে মেখে হাসবো তুমি আমি।

রূপনারায়ণে সন্ধ্যা

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

নিঢেউ নীল জলে অলস ছায়া নামে।
বিকেল শেষে ম্লান স্তিমিত সূর্যের
মৃদুল চুম্বনে সোণালি হ'লো জল।

আকাশে আলপনা তারারা এঁকে যায়।
মায়াবী ছায়া মনে। সবুজ স্বপ্নের
অতসী শিশিরেরা হৃদয়ে টলোমল।

অতল কালো জলে আলোরা ঝলকায়।
অচেনা পাখিদের কাকলি খোঁজে নীড়।
মাঝিরা টানে দাঁড় : জলের মঞ্জীর

নরম নিস্বনে হৃদয়ে বেজে যায়।
রাতের ছায়া নামে ফিরোজা সন্ধ্যায় !
হৃদয় গান গায়, হৃদয় গান গায় ॥

স্বপ্ন ধ্বনি

আবুল ফজল শাহাবুদ্দীন

দুপুরের নিঃসঙ্গ পাখীর মত
আশ্চর্য্য স্তব্ধতা
ছিল বুঝি মনে।
তখন তোমার মুখ
কবেকার গ্রামান্তের গোধূলির মত
মনে হোত অনন্ত ধূসর—
নির্জন হৃদয় ঘিরে
অতন্দ্র সিন্ধুর যত রাত্রির পাখীরা বুঝি
উড়ছে আবার।

জোনাকির দেহ থেকে এক ফোঁটা আলোকের মত
চিলেদের পাখ্‌নায়
মনে হোত নেমে যাই
পাহাড়ের ঢালু পথ ধরে
বিষণ্ণ নদীর স্রোতে।
অগাধ ঘুমের সুরে সন্ধ্যার শালের বনে
স্বপ্নের ধ্বনিরা এসে
জড়ো হত
সামুদ্রিক প্রেরণার ঘাত—
অবলুপ্ত নক্ষত্রের হাসি
ডাক দিয়ে যেতো
অন্ধকার ছায়ার মতন।
চেতনার ঘুমন্ত পাখায়
সমুদ্রের ক্লান্ত নাবিকেরা
যেন চোখ তোলে—
নদীর শব্দের মত
দুপুরের পাখীরা ঝিমায়
রৌদ্রের ধূসর নীড়ে।

তৃতীয় নয়ন

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

হে মৃত্যু, হে অন্ধকার
তৃতীয় নয়ন থেকে প্রত্যহ তোমার
আবির্ভাব দুই চোখে, ঘুমন্ত রাত্রির স্বাদ হয়ে।
রোজ রোজ এই চোখে মৃত্যুর মধুর দীক্ষা লয়ে
হব একদিন—আর-না-জাগর তৃতীয় নয়ন।
পৃথিবীর এই জাগরণ
অতীতের সোমন্তা, দূরান্তের আঙুরের দেহে
কিম্বা তাল-খেজুরের, মহুয়ার স্নেহে

ভালবেসে সেই তৃতীয়কে
ঘুমকে ডেকেছে দুই চোখে।
হয়তো ঘুমেরই খোঁজে
পৃথিবীর যুগলেরা চোখে চোখ রেখে চোখ বোঁজে।
এ চোখের সব সমর্পণ
তুলে নেয়, ডেকে নেয়, তৃতীয় নয়ন।

কেউ ডাকে নি

অরবিন্দ গুহ

নতুন চোখে, নতুন হাতে, নতুন নামে
পুরোনো দোরে পুরোনো কড়া নাড়ো,
পুরোনো মন নতুন সুরে কাড়ো।

এখন নই অপরিণত। রঙিন খামে
খুশি এলেই হৃদয় ভ'রে সাড়া
পড়ে না আর, ঝরে না জলধারা।

তুমি কি জানো আকাশ ভ'রে পাতাল জুড়ে
তোমার নাম রেখেছি চুপে-চুপে
অন্ধকার গন্ধ-ভরা ধূপে।

সে-ধূপ শেষে ভালোবাসার আগুনে পুড়ে
পেয়েছে সুর, ছন্দ, মিল, গতি—
হয়েছে নীল নামের প্রজাপতি।

তখন পাখা, পাখার হাওয়া, গিয়েছে উড়ে
কোথায়—তুমি সেকথা বলোনি তো;
সেসব কথা এখনো অকথিত।

কী জানি তবু কোথায় যেন লুকিয়ে থাকে
যৌবনের প্রথম ভালোবাসা,
দুঃখ আর অভিসারের ভাষা।

যৌবনের বহু দূরের পথের বাঁকে
ভালোবাসায় ডেকেছো তুমি। তুমি?
কোথায়? কেউ ডাকে নি। বনভূমি॥

চীনাংশুক থেকে চীবর

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

বুদ্ধ তথাগত তখন রাজগৃহের উপকণ্ঠস্থ বেণুবনে (বেলুবন) বর্ষাবাস যাপন করছেন। এ সংবাদ যখন এসে গেল মগধেশ বিম্বিসারের অন্তঃপুরেও এবং কানে উঠলো অগ্রমহিষী ক্ষেমার (খেমা) তখন রাজমহিষী গোপনে প্রাসাদের অবরোধের বাইরে একাকিনীই পা বাড়াতে মনস্থ করলেন। তাঁর অন্তরের ঐকান্তিক আকূতি ছিল এই যে তিনি রাজধানীর উপকণ্ঠস্থ বেলুবনারামের উদ্দেশে যাবেন যেখানে রয়েছেন ভগবান বুদ্ধ। তাই তিনি সত্বর প্রসাধন শেষ ক'রে নিচ্ছিলেন এমন সময়ে সখী বিজয়া ঘরে ঢুকলেন।

প্রথম দৃশ্য

বিম্বিসারের অন্তঃপুরস্থ সুসজ্জিত প্রসাধন-কক্ষ ; খেমা প্রসাধন-নিরতা ; বিজয়ার প্রবেশ—

বিজয়া। সাজো কেন অসময়ে ওগো খেমারাণী ?
স্মরণ করেছে বুঝি রাজা বিম্বিসার ?
মিটবে মনের আশ এটা ঠিক জানি,
কামদেবও মূর্চ্ছা যাবে, রাজা কোন্ ছার !
অসাধ্য সাধন পারে তোমারি ও স্বর্ণ-তনুখানি।

খেমা। ভুল বুঝো নাকো সখি, ইচ্ছা আছে মনে
যাবো আজ বেলুবনে বুদ্ধ দরশনে।

বিজয়া। (সবিস্ময়ে)
সে কি রাণী ? হ'লো বুঝি প্রব্রজ্যায় মতি ?
রতির কি গেল সাধ সূক্ষ্ম স্বর্ণ-চীনাংশুক ফেলে
অঙ্গে নিতে চীবর সংঘাটী ?

খেমা। (স্মিতমুখে)
চিরদিন মানুষের সমান কি যায় ?
ঢের হ'লো রাজবেশ এখন এবার
দেখা যাক কী রকম চীবর কাষায়।

বিজয়া। বেলুবনে যাবে তুমি ? এও সত্য নাকি ?

খেমা। নিশ্চয়ই যাবো ; দেখো, যাবোই একাকী।

বিজয়া। আমারও তো আছে সাধ দেখে আসি বুদ্ধ তথাগতে
আমাকেও সাথে নাও বুদ্ধের দোহাই।

খেমা। চেঁচিও না, চুপ, চুপ, আজ নয় অন্যদিন হ'বে
দাও ভাই আজকের দিনটা রেহাই।

বিজয়া। যথা আজ্ঞা মহারাণী, পেড়াপীড়ি করবো না তবে।

[বিজয়ার প্রস্থান]

[সোমার প্রবেশ]

সোমা। একি দেখি মহারাণী যাবে কি কোথাও ?

খেমা। সে শুনে কি হ'বে সোমা ? যাবো বেলুবনে ;
তোর তো থাকে না পেটে একটি কথাও
এ কথা গোপন খুব থাকে যেন মনে।

সোমা। আমাকে বলো তো কেন অবিশ্বাস করো ?
আমাকেও সাথে নাও, দেখে আসি ঋষি গৌতমে

খেমা। কোথা যাবি সোমা ওরে, নাবালিকা তুই
পণ্ড শেষে করবি কি আমার যাওয়াই ?
একা যাবো পদব্রজে ভেবেছি এ পথ ক্রোশ দুই
বড়ো ভুল হ'য়ে গেছে তোকে বলাটাই।
পিতা তোর অতো গোঁড়া রাজপুরোহিত
বেলুবনে গিয়েছিস্ এ কথা প্রকাশ যদি হয়
বুঝিস্ তো হ'বে তাতে হিতে-বিপরীত
আজ থাক কথা দিচ্ছি হ'বে'খন পরেই না হয়।

সোমা। বিরূপ হ'বেন পিতা ? কেন রাণী ? এ তো সৎ কাজ
তিনি তো অবোধ নন, বুঝিয়ে বল্‌বো তাঁকে আজ।

খেমা। (মনে-মনে)
এতটুকু মেয়ে সোমা, তার এই পুণ্য আকিঞ্চন
পূর্ণ ঠিক করবেন জানি—
শাক্যকুল-তিলক গৌতম।
(প্রকাশ্যে)
হ'বে কন্যা ইচ্ছা তোর অপূর্ণ না রবে
বুদ্ধচক্ষু দ্যাখে সৎ নিষ্পাপ অন্তর
যাগযজ্ঞ নয় সোমা, নয় পাঠ, পুজা ও মন্তর
সংকল্প সৎ হ'লে চিরদিনই অজেয় তা' ভবে
হ'বে সোমা অভিলাষ পূর্ণ তোর হ'বে।

২য় নাগরিক। অনুতাপ এলে গণিকা কী আর গণিকা থাকে? দুর্বৃত্তও দুর্বৃত্ত থাকে?

১ম নাগরিক। অনুতাপটা সাময়িক কিন্তু স্বভাবটা চিরদিনের। এ জন্মের ঐ কুস্বভাব, কুপ্রবৃত্তি সে পেলো কেন? পুর্ব পুর্ব জন্মের দুষ্কৃতিশুল্কেই তো এটা অর্জ্জন করেছে। পূর্ব জন্মান্তরীণ সংস্কারেই আমি বিশ্বাস করি—একেই বলে প্রারব্ধ। গৌতম যে করেননা তা তো নয়। শত সদুপদেশেও পতিতা তার স্বভাব চিরদিনের জন্য ছাড়তে পারেনা, দুর্বৃত্ত তার স্বভাব চিরদিনের জন্য ছাড়তে পারেনা। সময় বিশেষে তার ভেতরকার কুপ্রবৃত্তি মাথা চাড়া দেবেই। স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন। তবে হ্যাঁ লোক দেখানো রকম সাধু তস্করো সাজতে পারে, বেশ্যাও তপস্বিনী হ'তে পারে কথায়ই তো বলে—'অশক্তস্তকরঃ সাধুঃ বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী'

২য় নাগরিক। তুমি একজন ঝানু ব্রাহ্মণের মতোই কথা বলছো। আজকের যে পতিতা চিরদিনই সে পতিতা? আজকের যে পাপী সে চিরদিনই পাপী থাকবে?—এ রকম কোনো নীতিই হ'তে পারে না। কেন রত্নাকর কি বাল্মীকি হননি?

১ম নাগরিক। হ'য়েছে কিন্তু সে ক'টা? পাপী পরিত্রাণ করবার উৎসাহে ওরা যেভাবে গণ্ডায় গণ্ডায় থের এবং থেরী বানিয়ে সংঘের মধ্যে তাদের জায়গা দিচ্ছে তাতে মনে হয় কালে ওদের সংঘ লোক চক্ষে অশ্রদ্ধেয় হ'য়ে উঠ্‌বে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠিন শাসন থেকে মুক্তি পাবার উন্মাদনায় কিছুকাল এখন লোকে বেশ ভূলে থাকবে কিন্তু পরে এর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ'বেই। অবশ্য সেদিন দেখবার জন্যে আমরা থাকবো না। মনে করো, যে-সুনীতকে প্রকাশ্য রাজপথে পুরীষবহন করতে সেদিন পর্যন্ত আমরা সকলেই দেখেছি, বুদ্ধের কৃপায় সেও আজ অর্হৎ! গণ্য মান্য স্থবির সেজে সেও ব'সে গেছে। ধর্ম সম্বন্ধে সে এখন আমাদেরও দীর্ঘ উপদেশ দিতে আসে! অথচ দেখো চিরজীবন সে কেবল পুরীষবহনই করলো ধর্ম সম্বন্ধে কবে কি জান্‌লো, কবে কি পড়লো…

২য় নাগরিক। এ তোমার অন্যায়। সুনীত নীচ কুলের হ'তে পারে, পণ্ডিত না হ'তে পারে কিন্তু অনেক ব্রাহ্মণের চেয়েই সে শুদ্ধশীল। তার সম্বন্ধে অমন নির্মম মন্তব্য কোরো না।

১ম নাগরিক। তা যদি বলো তো তাই। এ নিয়ে তোমাদের সঙ্গে এখন বাক্‌বিতণ্ডা করার ইচ্ছে নেই। গৃহে আমার গৃহিণী অসুস্থ। আমি চলি।

২য় নাগরিক। আরে, দাঁড়াও না, আমরাও তো যাচ্ছি। বুঝলে ভায়া, ইচ্ছে করে তোমাকে একবার গৌতম বুদ্ধের কাছে নিয়ে যাই তারপর দেখি তুমি অমন পবিত্র প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কী রকম বিরূপ মন্তব্য করতে পারো? কখ্‌খনো পারবে না। মহাপুরুষের দর্শন পাবামাত্রই চিঞ্চার কাঠের উদর সভাস্থলেই খ'সে পড়বে!

৩য় নাগরিক। চিঞ্চা কে হে? চিঞ্চার কথাটা তো ঠিক জানা নেই—ব্যাপারটা খুলেই বলো না।

২য় নাগরিক। তবে বলি শোনো—একবার শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারের প্রকাশ্য সভায় চিঞ্চা নাম্নী এক ভ্রষ্টা নারী কৃত্রিম কাষ্ঠোদর ধারণ ক'রে গর্ভিণী সেজে এসে গৌতম বুদ্ধকেই এই গর্ভের স্রষ্টা ব'লে অভিযোগ করলো। বুদ্ধ এই হীন মিথ্যা অভিযোগের কোনো প্রতিবাদ করলেন না শুধু শান্তভাব ধারণ ক'রে রইলেন। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। প্রকাশ্য সভাস্থলে সে-কাষ্ঠ

নির্মিত উদর যখন সকলের সাম্‌নে খ'সে পড়লো তখন প্রকাশ পেয়ে গেল তীর্থিয়দের হীন চক্রান্তের কথা।

১ম নাগরিক।—রেখে দাও তোমার ও সব বানানো গল্প! তুমি কি মনে করো বুদ্ধের দর্শন পাওয়ামাত্রই আমি পাত্র-চীবর গ্রহণ ক'রে ভিক্ষু সেজে বসবো? কখনোই না। যেখানে অঙ্গুলিমালের মতো দুর্বৃত্ত রক্তপিপাসু দস্যু শত শত নরহত্যা করার পর রাজদণ্ড এড়াবার জন্যে চীবর গ্রহণ ক'রে সংঘে আশ্রয় পায় আর সঙ্গে সঙ্গে একজন গণ্য মান্য স্থবির হ'য়ে ওঠে। সে সংঘের আশ্রয়ে আমার কাজ নেই। দুষ্কৃত আবৃত ক'রে ঘোরাফেরা করবার জন্যে চীবরেরও প্রয়োজন নেই, গৃহই আমার দিব্য আশ্রয়, আমার স্বধর্ম ও সহধর্মিণীই আমার শ্রেয় আশ্রয়। (সকলের হাস্য)

(২য় নাগরিকের প্রতি) ৩য় নাগরিক। সত্যি ভায়া নরঘাতী দুর্বৃত্ত অঙ্গুলিমালের ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যায় না। যাকে সমুচিত দণ্ড দিতে গেলে পৃথক্ নরকের সৃষ্টি করতে হয় তার কিনা হ'লো নির্বাণ! দুষ্কৃতির বিনিময়ে সে নির্বাণ পেলো? হৃদয় বা বিবেক ব'লে কোনো জিনিশ যদি থাকতো তাহ'লে সমস্ত দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত ও নিজের প্রাণ দিয়েই করতো, চীবর ধারণ ক'রে রাজদণ্ড এড়িয়ে যেতে চাইতো না।

২য় নাগরিক। মহাপুরুষের দয়া হ'লে সবই হয়। ওর আমরা আর কী বুঝবো বলো?

১ম নাগরিক! দস্যু অঙ্গুলিমাল দস্যুই আছে, অর্হৎ হয়েছে না ছাই! পাপ করলে কর্মফল ভোগ না ক'রে যাবে কোথা? ভোগ যে করতেই হ'বে। নির্বাণ কি গাছের ফল যে পেড়ে দিলেই পেয়ে যাবে? জানো তো ঐ অঙ্গুলিমাল স্থবির এখন ভিক্ষায় বেরোতে পারেনা, বেরোলেই লোকে কটূক্তি করে, গাল দেয়, লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে। ফলে সংঘের ওপরও অশ্রদ্ধা হ'য়ে যাচ্ছে লোকের। আশ্চর্য, কানে আসে নি একথা? ঢি-ঢি পড়ে গেছে যে চারিদিকে। যাক ওঠো হে এবার। কথায় কথায় অনেক বেলা হ'লো, সুর্যদেব মধ্যগগন অতিক্রম ক'রে গেছেন, আর নয়।

[নাগরিকদের গাত্রোত্থান ও প্রস্থান]

খেমা। (মনে-মনে) অসম্ভব, তিনি কি কখনো পাপকে প্রশ্রয় দিতে পারেন?
যিনি বলেছেন—সব্বপাপস্‌স অকরণং কুসলস্‌স উপসম্পদা
সচিত্তপরিযোদপনং এতং বুদ্ধান সাসনং॥
তবে পরমকারুণিক তিনি, তিনি প্রেমময়, ক্ষমাসুন্দর, অধমতারণ; তিনি কি বলেন নি—

খন্তি পরমং তপো তিতিক্‌খা
নিব্বাণং পরমং বদন্তি বুদ্ধা
ন হি পব্বজিতো পরূপঘাতী
সমনো হোতি পরং বিহেঠয়ন্তো॥
অনুপবাদো অনুপঘাতো পাতিমোক্‌খে চ সংবরো
মত্তঞ্ঞুতা চ ভত্তস্মিং পন্থঞ্চ সয়নাসনং,
অধিচিত্তে চ আয়োগ এতং বুদ্ধান সাসনং॥

১ম নাগরিক। আসতে আসতে এক যায়গায় জনতা দেখলাম—বেশ একটা চাঞ্চল্য জনতার মধ্যে। একজনকে জিগেসও করলাম—ব্যাপারখানা কী হে?

২য় নাগরীক। আরে তুমি তো শুধু জনতাই দেখলে আর আমি যে ব্যাপারটাই স্বচক্ষে দেখেছি।

৩য় নাগরিক। কী দেখলে?

১ম নাগরিক। আরে দূর্ দেখবে কী ক'রে শুনলে বলো।

২য় নাগরিক। না হে, শোনা কথা নয়, নিজের চোখেই দেখেছি। বল্‌তে দাও সবটা তাহ'লেই বুঝ্‌বে। চলো বসা যাক ঐ গাছতলায়।

(ঐ পূর্বোক্ত ন্যগ্রোধতরুমূলে সকলের উপবেশন)

২য় নাগরিক। এই তো তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার কিছুক্ষণ আগে ঐ যমকশাল প্রতোলী ধ'রেই আসছি দেখি একটা রথ আসছে বিপরীত দিক থেকে। দূর থেকে ধ্বজা দেখে আর ঘণ্টাধ্বনি শুনে বুঝলুম রাজরথ আসছে। পথিকজন সকলেই সভয়ে পথ ছেড়ে পাশে স'রে দাঁড়ালো। একটু পরেই দেখলুম রাজরথ বটে কিন্তু রাজা নয়, রাজপুত্র অজাতশত্রুই রথী। বাবা, সে কী চেহারা অজাতশত্রুর! দেখলে হৃদ্‌কম্প হয়! হাতে অশ্বতাড়নের কশা—ক্রমাগত নির্দয়ভাবে প্রহার করছেন যেন কাকে। কাছে এলে দেখি প্রহৃত ব্যক্তি আর কেউ নয় রাজপুত্র সীলবকুমার। রক্তাক্ত দেহে দাঁড়িয়ে অজাতশত্রুর কশাঘাত সহ্য করছেন। তবু যন্ত্রণায় একটুও মুখবিকৃতি নেই। পথিপার্শ্বস্থ সমবেত সকলেই 'আহা আহা' ক'রে উঠলো! সকলেই বলতে লাগলো— রাজকুমার সীলব, স'রে আসুন; পথ থেকে প্রান্তরের মধ্যে নেমে আসুন। রথ আপনাকে অনুসরণ করতে পারবে না। কিন্তু সীলবকুমার রাজপথ দিয়েই হাঁটতে লাগলেন আর রথারূঢ় অজাতশত্রু সীলবের পিঠে কশাপ্রহার করতে করতে চললেন পিছন পিছন।

৩য় নাগরিক। কিন্তু এই নিষ্ঠুর প্রহার কিসের জন্য?

২য় নাগরিক। শুনলাম সীলবকুমার নাকি অজাতশত্রুর পথরোধ ক'রেছিলেন। আসলে ও-সব কিছুই নয় মিথ্যে একটা ছল মাত্র।

৩য় নাগরিক। তারপর? কী হ'লো?

২য় নাগরিক। কাছেই পথের পাশে একটা আম্রবৃক্ষ মূলে একজন সন্ন্যাসী ব'সে ছিলেন তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে এসে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন—তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, সম্বর, সম্বর। কিন্তু তাঁর সেই নির্দেশ অগ্রাহ্য ক'রেই অজাতশত্রুর রথ চললো এগিয়ে আরো খানিকটা। কিন্তু তারপরেই দেখতে দেখতে ঘোড়া পড়লো ভীর্মি লেগে রথের একটা চাকা খুলে গিয়ে গড়াতে গড়াতে চল্‌লো, সারথি ও অজাতশত্রু দু'জনেই পড়লেন রাজপথের ওপর।

৩য় নাগরিক। বাঃ বেশ হ'য়েছে! বড়ই বৃদ্ধি হ'য়েছিলো অজাতশত্রুর। একেই বলে দৈব শক্তি—এ শক্তির কাছে রাজাও নেই প্রজাও নেই, কী বলো?

১ম নাগরিক। সীলবকুমারের সঙ্গে অভয়ও ছিলো শুনছি?

৩য় নাগরিক। কে অভয়?

২য় নাগরিক। ঐ যে মহারাজ বিম্বিসারের ঔরসজাত উজ্জয়িনী নগরীর—বিখ্যাত সুন্দরী পদ্মাবতীর কানীন পুত্র। তাহোক রাজকুমার অভয় শুদ্ধাত্মা অজাতশত্রুর মতো পাপিষ্ঠ নয়। জনতার মধ্যে সীলবকুমারের সঙ্গে অভয়ও যে কোথায় হারিয়ে গেলেন পাওয়া গেল না। সন্ন্যাসী ঠাকুরটিও সেই সঙ্গে কোথায় যে গেলেন তাঁরও কোনো সন্ধান নেই।

৩য় নাগরিক। আচ্ছা সন্ন্যাসী ঠাকুরটি কোন্ সম্প্রদায়ের লোক বলতে পারো?

২য় নাগরিক। বোধ হয় কোনো নির্গ্রন্থিক কিংবা কোনো বৌদ্ধ ভিক্ষু হ'বেন।

৩য় নাগরিক। তারপর, কোন্ দিকে গেলেন সে সন্ন্যাসীঠাকুরটি কেউ কিছু বল্‌ছে না?

২য় নাগরিক। অনেকেই অনেক রকম বল্‌ছে। কেউ বল্‌ছে বৈভার পর্বতের পাশে সপ্তপর্ণীগুহায়, কেউ বল্‌ছে তপোদের উষ্ণপ্রস্রবণের কাছে, কেউ বল্‌ছে চোরপ্রপাতে, কেউ বলছে ঋষিগিলিপর্বতের পাশে কৃষ্ণশিলায় আবার কেউ বলছে শীতবনের মহাশ্মশান সন্নিহিত সর্পশৌণ্ডিকগুহায় আবার কেউ বলছে বেণুবনস্থ কলন্দকনিবাপে।

৩য় নাগরিক। তোমরা যে যাই বলো এ সব শুনে তো আমার সে মহাপুরুষটিকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

১ম নাগরিক। (তৃতীয় নাগরিকের প্রতি) বলিহারি যাই, তোমার ওম্নি সাধু সঙ্গ করতে সাধ গেল? (দ্বিতীয় নাগরিকের প্রতি) হ্যাঁ ভালোকথা এ কথায় মনে পড়লো, রাজপ্রাসাদের মধ্যে এই তো ক'দিম আগে কী যেন একটা ব্যাপার ঘটে গেছে শুনছিলাম। কথাটা গুজব মনে ক'রে বিশ্বাস করিনি, এখন মনে হচ্ছে গুজবের মধ্যে কিছু সত্যও থাকতে পারে। রাজকুমার অজাতশত্রু নাকি মহারাজ বিম্বিসারকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন সিংহাসনের লোভে?

২য় নাগরিক। গুজব কেন হ'বে? অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আমি জেনেছি এ কথা সত্যি। এ সংবাদ কি আর চাপা থাকে? অজাতশত্রুর মতো পাপিষ্ঠ পুত্রকে কোথায় নির্বাসনে পাঠানা উচিত তার জায়গায় উনি অজাতশত্রুর সমস্ত অপরাধই ক্ষমা করলেন—এমনই পুত্রস্নেহান্ধ পিতা! শেষ পর্যন্ত দেখো হ'বেও তাই। গণক গুণে তো বলেছেই যে অজাতশত্রু পিতৃহন্তা হ'বেন।

[অবগুণ্ঠনের অন্তরালে খেমা একবার শিউরে ওঠেন শুনে, বুক কেঁপে ওঠে। মনের মধ্যে আবার ভেসে ওঠে কতকগুলো অপ্রিয় স্মৃতির বিভীষিকা—যেগুলোর উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হ'য়েই আজ তিনি এপথে পা বাড়িয়েছেন।]

২য় নাগরিক। অবশ্য অজাতশত্রু কুলাঙ্গার পুত্র হ'তে পারে কিন্তু এটাও ঠিক যে যতো নষ্টের মূল হ'চ্ছে ঐ শাক্য দেবদত্ত। যদিও লোকটা ধাম্মিকের ভেক নিয়েই ঘোরে আসলে লোকটা পামর। ওরই এ সব চক্রান্ত। আর এ চক্রান্তে লিপ্ত আছে মগধের মহামাত্য ব্রাহ্মণ বর্ষকারও। তোমরা কী বলো?

৩য় নাগরিক। আমারও তো তাই মনে হয়।

১ম নাগরিক। হ'তে পারে, আমি সে-সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ করতে চাই না। এমন কি এও মানতে রাজী আছি যে শাক্যমুনি গৌতমের কথাগুলো নীতি হিশেবে ভালো কিন্তু তাই ব'লে যত নটী, গণিকা, পতিতা ধ'রে ধ'রে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দেওয়ার সমর্থন আমি করতে পারি না। ওখানেই আমার আপত্তি।

সোমা। মনে রেখো মহারাণী আজ তবে যাই
বুদ্ধ দরশনে যাত্রা কদাচ এ হ'বে না বৃথাই।
[সোমার প্রস্থান]

এবার প্রসাধন সমাপনান্তে দর্পণ-সম্মুখে খেমার স্বগতোক্তি—

মগধ বিশ্রুত রূপ, যার নীড় এই দেহলতা
চঞ্চল চোখের লাস্য, সুচারু বিভ্রম
স্বর্ণ-সূচী-বিদ্ধ কালো বেণীর নাগিনী
স্বর্ণ-বর্ণ সুমসৃণ গ্রীবা অনুপম
বর্ণাঢ্য স্তনপট্টে পিহিত এ যুগ্ম পয়োধর
কূটগ্রন্থি কটিতটে, কটিবাস সূক্ষ্ম চীনাংশুক
তারি 'পরে দোলায়িত কাঞ্চীর রণন
সুপুষ্ট জঘন দেশে। রক্তিম অধর
অলোকসুন্দর ব'লে বাখানে যা লোকে
না জানি কী লাগবে তা' বুদ্ধের চোখে!
জন্ম সার্থক মানি এই প্রাণ, এই দেহ, রূপ
লাগে যদি বুদ্ধের সেবায়
তবে কেন দ্বিধা লাজ কেন সঙ্কোচ?
গাত্রবাস টানি কেন অহেতু ব্রীড়ায়?

[পঞ্চরাজচিহ্নহীন একাকিনী খেমা কোথা যাও—
আভিজাত্য গৌরব, অভিমান আজ কেন তাকে বাধা দেয়
—আর নয় থাক, থাক, এইবার ও-সব ঘোচাও।
খেমা ব'লে ওঠে আর নিষ্ক্রান্ত হয়।]

[সীলবকুমারের প্রবেশ]

সীলবকুমার। কই? কই? কোথা মাতা? স্পর্দ্ধা ছাখো অজাতশত্রুর
বিনাদোষে আমাকে সে করে নির্যাতন
মহামাত্য বর্ষকার সেও তাতে যোগায় ইন্ধন।
ও দুর্বৃত্ত মানে নাকো রাজাদেশ, পিতার শাসন
রাখে নাকো কোনো ভেদ লঘু ও গুরুর
ব'লে কিনা আমাকে সে ক'রে দেবে দূর
এ রাজপ্রাসাদ ওরই, ওরই সিংহাসন!
সুনীধ রয়েছে সাক্ষী শুনেছে সে ওর আস্ফালন
কেন বৃথা এই ঈর্ষ্যা?

ওর যৌবরাজ্য আমি কণ্টক তো নই
প্রব্রজ্যা আমার কাম্য
প্রয়োজন নাই আর কিছুই কোনোই।

[খেমার কক্ষ থেকে এক অপরিচিতা নারী কাছে আসতেই সবিস্ময়ে ব'লে ওঠে সীলব]

এ কি তুমি মাতা নও, কে তুমি ললনে?
দাসী। আমি তাঁর দাসী মাত্র হে রাজকুমার
এখন তো রাণীমাতা নাই কো এখানে।
সীলব। মাতা নাই? তিনি বুঝি গেছেন কোথাও?

[বিজয়ার প্রবেশ]

বিজয়া। কোথা গিয়েছেন তিনি জানি আমি তাও
তাঁরও কাম্য প্রব্রজ্যাই; গিয়েছেন তারই সন্ধানে।
সীলব। কোথায় আছেন তিনি? যাবো আমি বলো, ব'লে দাও।
বিজয়া। বলতে যে মানা আছে অনুরোধ করো না কুমার।
বললে সত্যই বলি করিনে কো হীন মিথ্যাচার।

[অভয়ের প্রবেশ]

অভয়। এসো ভাই, শোনো, শোনো, কী হ'লো সীলব?
শুনেছি সকল কিছু জানি আমি সব
ভালো লোকই কষ্ট পায় এ জগতে এই তো নিয়ম
বিড়াল আঁচড়ায় মাটি, যে-মাটি নরম
গিয়ে দেখি একবার মগধেশ্বরের সকাশে
পিতা তিনি নন শুধু অজাতশত্রুর
আমাদেরও পিতা তিনি
পিতা ও পালক তিনি সারা মগধের
তাঁর কাছে চলো যাই বিচারের আশে।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথে অবগুণ্ঠিতা পথচারিণী খেমা। পথাতিক্রমণে ক্লান্তপদ—পথিপার্শ্বস্থ একটি ন্যগ্রোধ তরুর ছায়ায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন একটু বিশ্রাম নেবার কথা। দ্বিপ্রহর সন্নিধানে রৌদ্রের তাপও এখন প্রখর। চোখে পড়লো অদূরে রাজপথের পাশে একটি পরিত্যক্ত কুটিরের ছায়াবৃত প্রাঙ্গণ। সেখানে একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে বসলেন খেমা। এমন সময়ে কয়েকজন নাগরিক আসছিলো বিপরীত দিক থেকে। ওদের সংলাপের অংশ খেমার কানে আসতে লাগলো।

সব সংশয়ের মেঘ যেন মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। খেমা গাত্রোত্থান করেন। রাজপথে নেমে এসে আবার শুরু করেন চলতে। মনে-মনে শপথ নেন যে কারো প্রতি কোনো রকম বিদ্বেষ পোষণ করবেন না, কোনো রকম অকুশল ভাবনা মনের মধ্যে পুষে নিয়ে যাবেন না, কারণ তিনি যে যাচ্ছেন সকল কুশলের আধার ভগবান বুদ্ধের দর্শনে। রৌদ্রের তাপ তখনো প্রখর, কষ্ট হচ্ছে চলতে তবু কি যেন একটা আসন্ন অভাবিত প্রাপ্তির আশায় তাঁর মন মাধুর্যে ভ'রে উঠছে ক্ষণে-ক্ষণে। আরো বেশ খানিকটা পথ হাঁটবার পর দেখা গেল দূরে একজন প্রসন্নমূর্তি বৌদ্ধভিক্ষু আসছেন। সমীপবর্তিনী হ'য়ে তাঁকে জিগেস করলেন খেমা।

খেমা। ভন্তে ভগবন্, রাজকুমার সীলব এখন কোথা? আপনি যদি জানেন তবে বলুন।

সন্ন্যাসী। তিনি নিরাপদে যথাস্থানে অবস্থান করছেন।

খেমা। আমার মনে হয় আপনিই সম্ভবতঃ তাঁর ত্রাণকর্তা।

(স্মিতহাস্যে) সন্ন্যাসী। আমি কিছুই করি না আমাদের শাস্তাই সব করেন। জগতের ত্রাণকর্তাই তিনি

খেমা। সাধু ভন্তে, এই সামান্যা নারীর প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করবেন, আপনার নামটি জান্‌তে পারি কি? কোথায় আপনার নিবাস?

সন্ন্যাসী। কোলিত গ্রামে একদা আমার নিবাস ছিলো—লোকে এ কথা বলে। কিন্তু সেই কি আমার নিবাস? সমগ্র জম্বুদ্বীপে যেথানে যেথানে সদ্ধর্ম পালিত হয় সেই সমস্ত দেশসমূহকেই আমি আমার নিবাসের মধ্যে গণ্য করি। মহাকুলের পুত্র ব'লেও লোকে আমাকে কোলিত আখ্যা দেয় কিন্তু আমি জানি আমি কেবল কোলিত নই আমি বুদ্ধসন্তান। তেমনই আবার আমি মোগ্‌গলী ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত ব'লে লোকে আমাকে মোগ্‌গল্লায়নও ব'লে থাকে কিন্তু আমি কেবলি কি মোগ্‌গলীপুত্র? সমগ্র নারী জাতিকেই এবং উক্ত জাতির প্রত্যেককেই আমি আমার জননী ব'লেই গণনা করি। অতএব ভদ্রে, আপনিও আমার জননী। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি আপনার সময় আগত এখনই আপনি যান। যে-সংকল্প আপনি করেছেন অচিরেই আপনার সেই অভিষ্ট লাভ হবে।

খেমা। ভগবন্, বেলুবন আরো কতো পথ?

সন্ন্যাসী। আর অধিক পথ অবশিষ্ট নেই, মাত্র ক্রোশার্দ্ধ পথ গেলেই বেলুবনে উপস্থিত হবেন।

[সন্ন্যাসীর প্রস্থান]

খেমা দ্বিগুণ উৎসাহে আবার পথ চলতে লাগলেন।

পটক্ষেপ

তৃতীয় দৃশ্য

নগরোপকণ্ঠের নির্জন বনস্থলী। বায়ু-নিস্বনিত ছায়াশ্রিত বেণুকুঞ্জ-বীথি। মধ্যাহ্নের অপরার্ধ। বনপথচারিণী একাকিনী খেমা।

খেমা (স্বগতোক্তিতে)।

এই বুঝি, এই বেলুবন?
কোথা থেকে ভেসে আসে শত শ্রাবকের কণ্ঠে
কী গম্ভীর ত্রিশরণ গান!
ত্রি-রত্ন তোমারও গতি···শান্ত হও মন,
পরিত্রাণ পরিনির্বাণ!
কই? কই? কোথা বুদ্ধ? সন্নিহিত বুঝি সংঘারাম?
চন্দন-ধূপিত সেই পূত গন্ধকুটী
ইচ্ছা হয় সে-অঙ্গনে ফুল হয়ে ফুটি
ঝ'রে গিয়ে নিই বিশ্রাম।

দেখতে দেখতে বনপথে বুদ্ধের আবির্ভাব। খেমা সেই জ্যোতির্ময় পুণ্যপুরুষের সমীপবর্তিনী হন। বুদ্ধ-কণ্ঠের অমৃতমন্ত্রে তখন উদ্‌গীত হচ্ছিলো—

সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চাতি যদা পঞ্‌ঞায় পস্‌সতি
অথ নিব্‌বিন্দতি দুক্‌খে এস মগ্‌গো বিসুদ্ধিযা।
সব্বে সঙ্খারা দুক্‌খাতি যদা পঞ্‌ঞায় পস্‌সতি
অথ নিববিন্দতি দুক্‌খে এস মগগো বিসুদ্ধিযা।
সব্বে ধম্মা অনত্তাতি যদা পঞ্‌ঞায় পস্‌সতি
অথ নিব বিন্দতি দুক্‌খে এস মগ্‌গো বিসুদ্ধিযা।

খেমা (স্বগতোক্তিতে)। সব অনিত্য?
সব দুঃখ?
সব অনাত্ম?
এই যদি সত্য আর অনুত্তর মোক্ষ-মার্গ তবে?
মানুষের ছোটো সুখ, দুঃখ, প্রেম, মায়া, স্মৃতি এরা কোথা রবে?
এরা যদি মুছে যায় এ-জীবনে মানুষের কী থাকে আশ্রয়?
কাজ নেই চলো খেমা, হেথা নয়, আর হেথা নয়।

চেষ্টাসত্ত্বেও খেমা কিন্তু সেখান থেকে স'রে যেতে পারেন না। তাঁর পা যেন আর তাঁর বাধ্য নেই। ইতিমধ্যে বুদ্ধ এসে খেমার মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়ান। ধ্যানগম্ভীর, প্রসন্ন, প্রশান্ত সেই দৃষ্টি এতটাই ঘোষিত পরিচিতি বহন করে যে খেমার চিনতে ভুল হয়না যে ইনিই হচ্ছেন সেই 'তথা আগতোতি—তথাগতো; তথাগতোতি—তথাগতো; তথলক্‌খণং আগতোতি—তথাগতো; তথ ধম্মে যথাবতো অভিসম্বুদ্ধোতি—তথাগতো; তথদস্‌সিতায়—তথাগতো; তথবাদিতায—তথাগতো; তথকারীতায—তথাগতো; অভিভবনট্‌ঠেন তথাগতোতি'

খেমা। কে পুণ্যপুরুষ এলে দেবোপম রূপ
মগধের রাণী বন্দে তোমার চরণ

খেমাকে সেবিকা করো শ্রাবিকা তোমার
অনন্ত জীবন-মার্গে অশেষ, অরূপ।

বুদ্ধ। মনে যদি গর্ব কিছু পুষে রেখে থাকো
সব ছিঁড়ে ফেলে দাও আজ
রূপগর্ব, ধনগর্ব, যতো রাগ, চীনাংশুক বাস
ঘুচাও ঘুচাও ত্বরা, মিথ্যা ঐ সাজ
ঝরাপত্র সম ভূমে ফ্যালো ধূলি'পরে।
উপদেশ দেবো তার পরে।
ভ্রান্ত ধারণা কোনো রেখো না মনেও
হে রূপসী রাজ্ঞী খেমা, তোমার চেয়েও
সুন্দরতর রূপ সম্ভবে নশ্বর দেহেও
নারীকুলে অসামান্যা বটে তুমি খেমা
কিন্তু অনন্যা নও, নও অনুপমা।
একথা বিনীতভাবে বোঝো ভালো ক'রে
উপদেশ দেবো তার পরে।

[অলৌকিক ক্ষমতাবলে ভগবান মুহূর্তে দুই তিলোত্তমা নারীমূর্তি সৃজন করলেন। তারা চামর ব্যজন করতে করতে এসে দাঁড়ালো বুদ্ধের উভয় পার্শ্বে।]

বুদ্ধ। দেখ চেয়ে কারা আসে চামর ঢুলাতে
নিজেকে সুন্দরী ভাবো জানো না তো আছে
কতো শ্রেষ্ঠতর রূপ পুরুষের নয়ন ভুলাতে
নিজ রূপ তুচ্ছ ব'লে মানোনা কি এ রূপের কাছে?

খেমা। শতবার মানি, কিন্তু এরা কারা এলো?
কোন্ স্বর্গ থেকে এরা এই দেহ পেলো?

(অবিশ্বাসের ভ্রূকুটিতে দেখ্‌তে দেখ্‌তে খেমার স্বগতোক্তি)

একি সত্য, নাকি স্বপ্ন? নাকি শুধু মায়া?
অথবা চোখের ভুলে দেখি কোনো কাল্পনিক ছায়া?

(আরো কাছে গিয়ে বুদ্ধ কর্তৃক সৃষ্ট সুন্দরীদ্বয়কে স্পর্শ ক'রে সম্বোধন)

তোমরা কি দেবী কোনো? বলো কথা কও।
স্বর্গের অপ্সরা? আবির্ভূতা বন-দেয়াসিনী?
তোমরা নিশ্চয় জানি মানবী তো নও
কিসের কুহক নিয়ে স্বর্গ থেকে ছলনায়
নেমে এলে দুই কুহকিনী?

সুন্দরীদ্বয় (সমস্বরে)

কুহক জানিনে রাণী, বুদ্ধের দাসী যে আমরা
বন-দেয়াসিনী নই, দেবী নই, নই অপ্সরা।

খেমা (মনে-মনে বিলাপ)।

রূপে-গুণে শ্রেষ্ঠতর কতো দাসী বুদ্ধের আছে
মগধের রাণী খেমা তুচ্ছ সে কি সকলেরই কাছে?
বুদ্ধের দাসী হ'বো নাইকো সে যোগ্যতা আমার?
তবে এ জীবনে ধিক, শত ধিক, কোটি ধিক্কার!

(বুদ্ধের প্রতি) খেমা।

যা ছিলো রূপের গর্ব চূর্ণ হ'লো সব
মুহূর্তেকে হ'লো যতো সংশয় নিরাস
মগধের রাণী খেমা মানে পরাভব
প্রজ্ঞানে প্রহীণ হোক যতো বিপল্লাস
মন মোর দুষ্ট অশ্ব মারো তাকে মারো
প্রজ্ঞার প্রগ্রহ নিয়ে ফিরাও ফিরাও
হানো মৈত্রী-করুণার তীব্র কশা আরো
অষ্টাঙ্গিক মার্গে তাকে এবার ভিড়াও
পঞ্চ নীবরণ আর সংযোজন যতো
ছিন্ন ক'রে মোরে নাও, হে গুরু সুগত।

বুদ্ধ। অধীর হ'য়ো না খেমা তিষ্ঠ ক্ষণকাল
দেখে যাও এ রূপের কিবা পরিণতি
আস্‌ছে জরার ঢেউ উদ্বেল উত্তাল
দেহের দেউলে আশু শেষ হ'বে রঙিন আরতি।

[ব'লেই বুদ্ধ ধ্যান-সমাহিত হ'লেন। বিস্ময়-বিমূঢ় খেমা চেয়ে-চেয়ে দেখতে থাকেন চামর-ব্যজন-রতা সুন্দরীদ্বয়কে। ক্ষণকাল মধ্যেই সে যৌবনারক্ত গণ্ডের আভা ম্লান হ'লো। ক্রমশই বয়সের বলিচিহ্ন প্রস্ফুট হ'তে থাকলো সেই স্বর্গীয় মুখ-লালিত্যে। পরিণামতঃ জরা-কবলিত হ'লো সেই অতুল সুষমাও। কুৎসিত বার্দ্ধক্যদশায় দন্তহীন, পক্ককেশ, লোলচর্ম, বয়োনুব্জ অশক্ত অবস্থায় কাঁপতে কাঁপতে চামর হস্তে ভূপতিত হ'লো সেই বুদ্ধ-সৃষ্ট নারী-প্রতিমা। খেমার অন্তর হাহাকার ক'রে ওঠে কিন্তু ভগবান সমস্তচক্ষে দেখ্‌তে পান সবই। প্রজ্ঞার শাসনে মুহূর্তে শিষ্ট ক'রে নেন খেমার অবিদ্যা। খেমা তখনই শান্ত ভক্তিরসাপ্লুত কণ্ঠে ব'লে ওঠেন—]

খেমা। বিদ্যাচরণসম্পন্ন, অনুত্তর, ওগো লোকবিদ্
বুঝেছি বুঝেছি দেব, দয়া করো দয়া করো প্রভু
পার করো জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-দুঃখের মরুভূ।

[ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের পদপ্রান্তে নিজেকে নিক্ষেপ করেন খেমা। সমাধিস্থ অবস্থা থেকেই অন্তঃসংজ্ঞ বুদ্ধ ব'লে ওঠেন—]

বুদ্ধ। কো মে বন্দতি পাদানি ইদ্ধিয়া যসসা জলং
অভিক্কন্তেন বণ্ণেন সব্বা ওভাসয়ং দিসং ?
ঋদ্ধি যশে জেলে দিক দিগন্তর অয়ি
চরণ বন্দনা করো কে সুষমাময়ী ?

[বুদ্ধপদ সমর্পিতাঙ্গী খেমা ব'লে ওঠেন—]

খেমা। আমি দীনা দাসী খেমা ধ্রুবপদকামী
বোধি দাও, হে সম্বুদ্ধ, মোক্ষে উপনীত করো স্বামী।

[অকস্মাৎ দিবাযাম কমনীয় হ'য়ে ওঠে। চতুর্দ্দিকে অরুণোদ্ভাস প্রকট হয়। মেদিনীপৃষ্ঠও হর্ষানুভূতিতে যেন শিহরিত হ'য়ে ওঠে। সমাধিস্থ অবস্থা থেকে সদ্য জাগ্রত হ'য়ে বুদ্ধ ব'লে ওঠেন—]

বুদ্ধ। ধন্য পুণ্যবতী তুমি কল্যাণী খেমা
তোমাকে অর্হত্ত্বে আজ করি যে দেশনা।
বারিত্রবারণ আর চারিত্রাচরণ
কায়-মনে সর্বথা কুশলকরণ
এই দীক্ষা এর বেশি আর কিছু নাই
ওঘোত্তীর্ণা হ'বে তুমি
এ তীব্র নির্বেদ বৎসে হ'বেনা বৃথাই।
তথাগত বাক্যে কোথা তিলেক অন্যথা
তোমারি উদ্দেশ্যে গাই আজিকার এই নীতিগাথা :
যে রাগরত্তানুপতন্তি সোতং
সয়ং কতং মক্কটকো ব জালং।
এতং পি ছেত্বান বজন্তি ধীরা
অনপেক্‌খিনো সব্‌বদুক্‌খং পহায় ॥

নেপথ্যে কারো কণ্ঠস্বর শ্রুত হয়—বন প্রকম্পিত হ'য়ে ওঠে সে উদার সিংহনাদে—

বহুং বে সরণং যন্তি পব্বতানি বনানি চ।
আরামরুক্‌খচেত্যানি মনুস্‌সা ভয়তজ্জিতা ॥
নেতং খো সরণং খেমং নেতং সরণমুত্তমং।
নেতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্‌খা পমুচ্চতি ॥
যো চ বুদ্ধং চ ধম্মং চ সংঘং চ সরণং গতো।
চত্তারি অরিয়সচ্চানি সম্মপ্পঞ্‌ঞায় পস্‌সতি ॥
দুক্‌খং দুক্‌খসমুপ্পাদং দুক্‌খস্‌স চ অতিক্কমং।
অরিয়ং চট্‌ঠঙ্গিকং মগ্‌গং দুক্‌খূপসমগামিনং ॥

এতং খো সরণং খেমং এতং সরণমুত্তমং।
এতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্‌খা পমুচ্চতি।

খেমা। এ কি দৈববাণী নাকি, বাজে কারো পদমর্মর ?
তোমার স্তুতির গানে হ'লো কেন এ বন মুখর ?
এলো কেউ ? কিংবা এও অলৌকিক লীলা ?

বুদ্ধ। এলেন মোগ্‌গলীপুত্র,
বন্দনা করো তাঁকে খেমা শুদ্ধশীলা।

[সীলব কুমারকে সঙ্গে নিয়ে মোগ গল্লায়নের প্রবেশ]

মোগ গল্লায়ন। উত্তমঙ্গেন বন্দে'হং পাদপংসু বরুত্তমং
বুদ্ধে যো খলিতো দোসো, বুদ্ধো খমতু তং মমং।

[মোগ্‌গল্লায়নের অণুসরণে উক্তবাক্য উচ্চারণ ক'রে সীলবও বুদ্ধকে বন্দনা ও প্রণাম করেন।]

(সীলবের প্রতি) খেমা।
আয় বৎস কাছে আয় দেখি
অজাতশত্রুর কশা কোথা তোরে করেছে আঘাত
কোথা তোর ক্ষতচিহ্ন ? আশ্চর্য ! কিছু নেই ? সে কি ?

সীলব। ভগবান মোগ্‌গলীপুত্র দিব্যস্পর্শে করেছেন সব নিরাময়।

(মোগ্‌গল্লায়নের প্রতি) খেমা।
কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে খেমা নিন দয়াময়
শুদ্ধাচারী পবিত্রাত্মা মোগগ্‌লীতনয়।

মোগ্‌গল্লায়ন। (খেমার প্রতি)
কে বা আমি ? নাও খেমা শাস্তার শরণ
আপদ বিপদ কেটে হ'বে নির্বিঘ্ন।
সীলবের জন্য আর নাই কোনো চিন্তা
বিদর্শন ভাবনায় অর্পণ করো মন
হ'য়োনা কো বৃথা উদ্বিগ্ন।

মোগ্‌গল্লায়ন। (বুদ্ধের প্রতি)
ভগবন্ !
সীলবকে ত্রিচীবর ভিক্ষাপাত্র দিতে আজ্ঞা হোক
শীলবান এ কুমার যাচে উপসম্পদা প্রব্রজ্যা-উৎসুক।

সীলব। বুদ্ধের শরণ নিই, নমি তাঁর অমৃত শ্রীচরণপ্রান্তে
ত্রিরত্ন বন্দনা করি যাচি দীক্ষা, হে সম্বুদ্ধ,
সীলং দেথ মে ভন্তে !

বুদ্ধ। এহি ভিক্ষু, এহি। [সীলবের দিকে হস্তপ্রসারণ]

মোগ্‌গল্লায়ন। স্বাক্‌খাতো ভগবতা ধম্মো সন্দিট্‌ঠিকো
অকালিকো, এহিপস্‌সিকো, ওপনায়িকো, পচ্চত্তং
বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহি…

(বুদ্ধের চরণে প্রণত হ'য়ে) সীলব।
নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স
বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি
দুতিয়ম্পি………… …
ততিয়ম্পি……………

[বুদ্ধ কর্ত্তৃক সীলবকে শীলমন্ত্রসহ ত্রিচীবর ও ভিক্ষাপাত্র দান]

মোগ্‌গল্লায়ন। আজ্ঞা দিন ভগবন্‌ প্রতিবেশী কোশল রাজ্যে
সীলবকে রেখে আসি সংঘের প্রচার কার্যে
নৃপতি প্রসেনজিৎ রক্ষা করবেন তাঁর ভাগিনেয়টিকে
সীলব রক্ষিত হ'বে অজাতশত্রুর ক্রূর কোপদৃষ্টি থেকে।

বুদ্ধ। সীলব অর্হৎ হ'বে ওর এই শেষবার জন্ম পরিগ্রহ
কার সাধ্য ওকে হত্যা করে ?
সদ্ধর্ম অবিরত রক্ষা ক'রে যাবে যতো ক্রূর নিগ্রহ
নিয়েছে আশ্রয় ও যে বুদ্ধদত্ত এই ত্রিচীবরে।

পটক্ষেপ

চতুর্থ দৃশ্য

কয়দিন পরেকার কথা। খেমা এখন ভিক্ষুণী। বেলুবন-বিহার-সংলগ্ন উদ্যান। ভিক্ষালব্ধ সামান্য পিণ্ডপাত গ্রহণান্তে একদিন দ্বিপ্রহরে খেমা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। শরীর ক্লিষ্ট কিন্তু মন প্রফুল্ল। হঠাৎ কী যেন একটা ঘটে গেল। নেপথ্য থেকে কে যেন তাঁকে সম্বোধন করলো—

রাজপ্রাসাদের থেকে বেলুবনে এই বৃক্ষতল—
অনেক দূরত্ব খেমা—নিষ্ঠাবতী হে কৃচ্ছ্র সাধিকা
রাজভোগে যে অভ্যস্ত তার কিনা কিছু বন্যফল
ভিক্ষালব্ধ পিণ্ড হ'লো তৃপ্তি-প্রদায়িকা ?

চমকে উঠলেন খেমা। একি, কে সম্বোধন করলো এমন ক'রে ? কোন্‌ অসতর্ক এক ফাঁকে নিজেরই মন থেকে মর্ষিত অবদমিত ইচ্ছাগুলোই কি মূর্তি নিয়ে পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠেছে ? ছিঃ, সে না বুদ্ধশ্রাবিকা ? বুদ্ধকে স্মরণ ক'রে খেমা ভয়ে-ভয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন কেউ কোথাও নেই। জনশূন্য উদ্যান। বর্ষার শেষ। আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই। উদাস দ্বিপ্রহর। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ

করছে—একটু হাওয়াও চল্‌ছে না। নিষ্কম্প বৃক্ষপল্লব। প্রখর রৌদ্রতাপে কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দেয়। সংঘাটির প্রান্তদেশ আন্দোলিত ক'রে সামান্য কিছু স্বস্তি পান। উত্তাপজনিত অবসাদে তাঁর চোখে ঘুমের আবেশ আসে কিন্তু ভিক্ষুণীর আলস্য জয় করাই যে কর্তব্য। এক রকম জোর ক'রেই চক্ষু উন্মীলিত ক'রে রাখেন।…মনে নানা স্মৃতি ভিড় ক'রে আসে, দুঃখ সুখের অগণিত বাহিনী—মনের মধ্যে উঁকি মেরে যায় নানা পরিচিত পরিবেশ, প্রিয় মুখ, প্রিয় সহচরী বিজয়ার বিশ্রব্ধ বাক্যাংশ। কিন্তু সব কিছুই খেমা বুদ্ধের উপদেশ স্মরণ ক'রে মন থেকে তাড়িয়ে দেন। কিছুটা শান্ত হয় মন, চিন্তার লয়ের সমতা ফিরে আসে খানিকটা, কিন্তু আবার নেপথ্য থেকে আগেকার মতোই কে যেন সম্বোধন ক'রে উঠলো—

এ আত্মনিগ্রহ খেমা। ফেননিভ মৃদু সে-আসন
ছেড়ে এই বৃক্ষতল তপ্ত রুক্ষ ধূসর মাটির
মনে আসে নাকি কোনো প্রিয়মুখ
ডাকে নাকি কোমল শয়ন
শীতল সজল কক্ষ সুবাসিত উদ্যানবাটীর ?
শুধু আত্মনিগ্রহ এই কি গো বুদ্ধের শাসন ?

আরো বেশি চমকে ওঠেন খেমা। এবার যেন ভীত হ'য়ে পড়েন। তাঁর মনের অগোচরে এ কথাগুলোই কি ছিলো ? কই কোথাও তো কেউ নেই। বনভূমি নিস্পন্দ নীরব। এর উৎস কি এই বনভূমি ? নাকি তাঁর নিজেরই মনোভূমি ? তখনই বুদ্ধকে স্মরণ করেন, বন্দনা করেন, বুদ্ধের শরণ নেন, চক্ষু মুদিত ক'রে কানে আঙুল দেন, উচ্চারণ করেন—

হে শাস্তা, পুরিসদম্মসারথি,
শতবার নেয় খেমা তোমার শরণ
তুমি দেব এ দাসীর একমাত্র গতি।

কিছুক্ষণ খেমা ধ্যানস্থ হ'য়ে রইলেন। যখন তিনি চোখ মেলে চাইলেন তখন রৌদ্রে আর উত্তাপ নেই। আশ্চর্য বর্ণ-সমারোহ রৌদ্রের ! গুমোট নেই, বসন্তের মতো হাওয়া দিয়েছে, শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। বিহগ কাকলি—পল্লব নিস্বন। আশ্চর্য মায়াবী হ'য়ে উঠেছে দিন। সাড়া জেগেছে বনে। চন্দন তগর মল্লিকার সুগন্ধে ভ'রে উঠেছে চতুর্দ্দিক। খেমার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। আঃ স্বস্তি ! গাত্রোত্থান করতেই দেখতে পান দূরে এক অনিন্দ্যকান্তি দেবোপম যুবা বনপথ বেয়ে তাঁরই দিকে আসছেন এগিয়ে। খেমা ভাবলেন এঁরই জন্য কি এত সব আয়োজন, এই নিসর্গ-সমারোহ ? ব'লে উঠলেন—

খেমা। এলে কে গো বনদেব স্বাগত ভন্তে
নিয়ে রামধনু রং নতুন দিগন্তে
সুন্দর মনোহর কে তুমি, কে তুমি ?

খেমা আরো সমীপবর্তিনী হন। সেই মনোহর আগন্তুকটি ব্যাকুলভাবে বাহুদ্বয় প্রসারিত ক'রে এগিয়ে

আসে। কাছ থেকে আগন্তুকটিকে দেখে এবার খেমার ভুল ভাঙে। যেন আকস্মিক প্রজ্ঞার উদয়ে খেমা ঘৃণায় পেছিয়ে আসেন, শাস্তাকে স্মরণ ক'রে ব'লে ওঠেন—ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

খেমা। বুঝেছি বুঝেছি ভুল, তুমি সেই চিরপাপী মার
অনুপম পুষ্পসম অন্তর কেবল
নিয়ত পুরিত পাঁকে পূথগন্ধ যার
পায় না কো কোনদিন পঞ্চস্কন্ধে রতিমান মূঢ় পাপীদল।
স'রে যাও স'রে যাও, চিনেছি কে তুমি।
অপবিত্র কোরো নাকো পরিশুদ্ধ তপোবনভূমি।

মার। একাকিনী কোথা যাও এ ছায়ায় এসো—
একটু থামাও সখি ত্বরিত চরণ
সব কথা শুনে নাও, ভালো যদি লাগে ভালোবাসো
অমৃতের আস্বাদে ভ'রে নাও ঐহিক জীবন
মিথ্যা ঐ দুঃখবাদ, বেঁচে আছো যতোদিন হাসো।

খেমা। ঐহিক জীবন-মোহ মিছে মার দেখাও আমাকে
কুমন্ত্রণে বদ্ধ আর হ'বো নাকো পাঁকে—
পরিজিণ্ণমিদং রূপং রোগনিড্ডং পভঙ্গুরং
ভিজ্জতি পুতিসংদেহো মরণন্তং হি জীবিতং ॥
কো নু হাসো কিমানন্দো নিচ্চং পজ্জলিতে সতি?
আকৃষ্ট হ'য়েছি তাই অনুত্তর সম্বোধির প্রতি।

মার। আমি ফিরে দেবো ফের অটুট যৌবন
দুঃখ কোরো নাকো।
বোসো, বোসো এ ছায়ায় এসো কথা রাখো।
বিম্বিসার জরাগ্রস্ত আমি তো তা নই
কাছে গেলে হ'বে যে বিমুখ
আমারি সে নামান্তর যাকে বলো সুখ
যুবা আমি কামাচারী ঋষি
আমাকে গ্রহণ করো
এসো এ জীবন ভরো
তুমিও যুবতী খেমা হে অগ্রমহিষী।
এসো পঞ্চাঙ্গিক তূর্যধ্বনি সাথে
সুরতে নিরত হই কুঞ্জের ছায়াতে।

খেমা। ও সব আমার কাছে বোলো না, বোলো না তুমি
প্রাতিমোক্ষ দৌবারিক, দুর্গ এই প্রজ্ঞাপুত বেলুবনভূমি।

বুঝেছি যে দুঃখ নিত্য
করি সেই অনাত্মভাবনা
দুঃখের নিরোধ হ'লে শেষ হয় সুদুশ্চর জীবনযাপনা।
এই যে সকাল ধ'রে রোদে রোদে যে সব মমতা
সঞ্চিত ফুলে ফলে অঙ্কুরিত উত্তাপে যত সব পাতা
সব ঝ'রে যাবে তবু তারি কিছু করুণ ম্লানতা
ভবিষ্যের ললাট ললামে
রাখবে কি কোনো স্বাক্ষর?
তোমারি চক্রান্তে হয় যত প্রাণী কাম-জর্জ্জর
এতদিন ছিলাম আমিও
নিশিদিন নিপীড়িত কামে
শেষে কিন্তু কাল এলে কাম-তণ্হা মুহূর্তেকে থামে।

মার। কাম-তণ্হা? থামো থামো। মিছে তর্কে কিবা প্রয়োজন?
কামে জন্ম সবাকার ব'য়ে চলে কামেই জীবন
কাম মিষ্টি; কামে সৃষ্টি; বিধাতার অভিপ্রেত কাম
কামে অস্বীকার করে কোন্ ভণ্ড বলো তার নাম
সে কি তোমাদের প্রভু বুদ্ধ তথাগত?

খেমা। যেই হোক, ছাড়ো পথ, নয় হও একেবারে হত।
রাজ্ঞী নই, আমি থেরী, আমি মোক্ষকামী
মূঢ় যারা দেয় তারা তোমায় প্রণামী।
বুদ্ধের শরণ নিয়ে করেছি যে আসবের ক্ষয়
আমাকে বৃথাই, মার, কী দেখাও ভয়?
সব রাগ শান্ত হোক, দান্ত হোক,
রূপ নিক একটি ক্ষমায়
সুতীব্র নির্বেদজাত একটি প্রমায়
এ বাঁচা সহজ হোক
সময় থাকবে তবু সময়ের যা কিছু রচনা
এও ঠিক কিছু থাকবে না।
এই সত্য আর সব হীন মিথ্যা স্তোক।
এটুকু চেতনা যেন প্রজ্ঞায় প্রোথিত হোক
সমগ্র সত্তাই করে তারস্বরে একথা রটনা।

নিজেরই কামানলে দগ্ধ হ'য়ে ক্রমশ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হ'তে-হ'তে সেই অনিন্দ্যকান্তি মার যেন বিন্দুমাত্র সার

হ'লো। তারপর খদ্যোতের মতো একটি স্ফুলিঙ্গ ঝোপের আড়ালে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেলো, প'ড়ে রইলো না কণামাত্র ভস্মাবশেষও।

(সহাস্যে) খেমা। কই, কই কোথা গেলে, কোথা গেলে মার ?
সাধ্য কি সও তুমি প্রজ্ঞার প্রহার ?
স্তনপট্টে আছে বর্ম অজেয় যে এ-রক্ষাকবচ
ভূর্জ্জপত্রে শাস্তার শাসন
সব প্রলোভন-বিঘ্ন-বিপদ-নাশন।

স্তনপট্টের অভ্যন্তর থেকে ভূর্জ্জপত্রলিপি বের ক'রে পঠন—

যে রাগরত্তানুপতন্তি সোতং
সয়ং কতং মক্কটকো ব জালং
এতম্পি ছেত্বান বজন্তি ধীরা
অনপেক্খিনো সব্বদুক্খং পহায়।

একান্ত নিকটেই যেন কারো মহান উপস্থিতির ভয়হরণ সান্নিধ্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন খেমা। প্রণামোদ্যতা খেমার রোমহর্ষ জাগে। রোমহৃষ্টা খেমা ব'লে ওঠেন—

খেমা। কে গো তুমি, হে মধুর, ছুঁয়ে গেলে প্রাণ ?
কে গো তুমি কে গো ?
এহিপস্সিকো, খেমা, এহিপস্সিকো !

পিছন থেকে পুরুষকণ্ঠের প্রেম-মুদিত আহ্বান আসে, তাঁরই নাম ধ'রে কে যেন বারবার বল্‌ছে—এহিপস্সিকো, খেমা, এহিপস্সিকো।

চমকে পিছন ফিরতেই খেমা দেখতে পেলেন—শাস্তা স্বয়ং। জ্যোতির্বলয়িত স্মেরানন সম্মাসম্বুদ্ধের। সে-জ্যোতির আভায় যেন ভাস্বতী হ'য়ে উঠ্‌ছেন খেমা নিজেও। সারা গায়ে কাঁটা দেয়, একতাল আবেগ যেন গলা পর্যন্ত উঠে এসে তাঁর কণ্ঠরোধ করে। কোনোকিছু বলা সম্ভব হয় না, শুধু তাড়াতাড়ি ভূমিষ্ঠ হ'য়ে খেমা উচ্চারণ করেন—

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি
নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স ॥

ক্ষেমার প্রব্রজ্যাগ্রহণের পর প্রসেনজিতের ভগিনী রাণী বৈদেহী বিম্বিসারের অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্তা হন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রথম পর্যায়ে ক্ষেমার ভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশ ও অজাতশত্রু-জনয়িত্রী বৈদেহীর পট্টমহিষী হওয়া এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে অজাতশত্রুর যৌবরাজ্যে অভিষেক ও সেই সঙ্গে শাক্য দেবদত্তের চক্রান্ত—এই দুই পর্যায়ের মধ্যে বেশ কয়েক বৎসর সময়ের ব্যবধান আছে—ঐতিহাসিকের দৃষ্টি থেকে দেখলে একথা মানতেই হয়। এই নাটিকায় সেই ব্যবধানের বিলোপসাধন ক'রে বিশেষ উদ্দেশ্যেই ইতিহাসকে লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং স্বকপোল কল্পনাকেই আশ্রয় করা হয়েছে। কারণ নাটক তো নাটকই, ঐতিহাসিক দলিল নয়। তবে পাত্রপাত্রীরা সকলেই ইতিহাসানুগ ও বৌদ্ধশাস্ত্রসম্মত। বি. ব.

সুদর্শনের কাহিনী

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

প্রথম পর্ব্ব

ডালিম নয় নিখুঁত বেদানা। মানে বিশ্রীভাবে টোল-খাওয়া, চুপসানো একটি মুখ। হয়ত একদিন সে ডালিমকুমারই ছিল—তবে আমরা যখন তাকে দেখেছি তখন সব রং আর রাঙা স্বপ্ন খুইয়ে শুধু কৌমার্য্যটুকুরই সে গর্ব্ব করে বেড়াত। 'চিক্-বোন' বেরিয়ে পড়ে মুখের চেকনাই যতোটুকু উধাও হয়েছে, কৌমার্য্যের গর্ব্বে সে-শূন্যস্থান পূর্ণ করে বেশ খুশী ছিল সুদর্শন। সুদর্শন! নামটা-ও, লক্ষ্য করুন, ওর জীবনে এখন কতো বড়ো পরিহাস!

এ-মানুষকে নিয়ে গল্প বলতে গিয়ে আমি তার আদ্যশ্রাদ্ধ সমাপন করে নিচ্ছি মনে ভাববেন না যেন। সে অধিকার আমার নেই! ওর সঙ্গে আমার অবশ্য সম্পর্ক ছিল—কিন্তু এমন সম্পর্ক নয়, যাতে শ্রাদ্ধের অধিকার জন্মায়। একই আড্ডার মানুষ আমরা। এইমাত্র। তা-ও ইতর আড্ডার নয়—রীতিমতো সভ্য-ভব্য ভদ্রলোকের বৈঠকখানার আড্ডা, যেখানে কোনো ছিদ্র-পথে পাপ-প্রবেশের সুযোগ নেই। ছেলেবেলায় পার্কে বসে সিগারেট-খাওয়া শিখতে হলে যে আড্ডা-সম্পর্ক জোঁকের মতো আমাদের লেপটে ধরতে চায় কিম্বা চায়ের দোকানে বসে কম্যুনিজ্‌ম্-মামলেট-ফুটবল-কাহিনী চিবিয়ে যে বয়স্য-ভাব হৃদয়ে সঞ্চিত হয়ে ওঠে—সুদর্শনের সঙ্গে আমার যদি তেমন কিছু বস্তুরও লেনদেন থাকত, তাহলে নাহয় ভাবতে পারতেন আজ আমি খামকা সাধু সেজে ওর কেচ্ছা রটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের আড্ডায় শালীনতার ও সৌজন্যের কম্পিটিশন চলত। কম্পিটিশনে আমার কাছে সুদর্শনের বা সুদর্শনের কাছে আমার কোনোদিন হার হয়েছে বলে মনে পড়েনা। তবু আজ মনে পড়ছে, ও যেন ওর কৌমার্য্য নিয়ে গর্ব্বিত ছিল—সব সৌকুমার্য্য খুইয়ে ওই একটি ছেলেমানষি নিয়ে ওর মনে যেন আর পবিত্রতার সীমা ছিলনা।

হ্যাঁ, বিধবাদের যেম্নি হয়। গর্ব্ব ও দেখাক আর না-ই দেখাক, আমার মনে হত ওর পা যেন মাটি ছুঁয়ে যেতে নারাজ। বড়োলোক ও মোটে-ও নয়। অর্দ্ধবিদ্বান-ও নয়। কাজেই অহঙ্কারের অন্য দশ-পাঁচটা লক্ষণেও আক্রান্ত ছিলনা সুদর্শন। তবু যে অহঙ্কার—তা কিসের জন্যে বলুন? চরিত্রের জন্যে নয় কি? আমরা যারা বিবাহিত ছিলাম, সমাজসম্মতরীতিতে বিবাহিত, তাদেরও যেন ওর চোখ অবিরত ভর্ৎসনা করে চলত—যেন বলতে চাইত: তোমরা চরিত্রহীন। বিবাহিতরাই অধিক পরিমাণে চরিত্রহীন হয় বলে রিপোর্ট পাওয়া যায় কিন্তু বিবাহিতমাত্রেই কি চরিত্রহীন? অবশ্য মুখ ফুটে কস্মিনকালেও

সুদর্শন এ-ধরনের কথা কাউকে বলেনি—ওর চোখের দিকে তাকালে আমার যা মনে হত তা-ই আমি বল্‌লাম।

চোখের নীচে কালি ছিল অবশ্যই সুদর্শনের—তবু সমস্ত মুখে ওর চোখগুলোই সুন্দর। ঠিক সুন্দর নয়, মায়াবী। অর্থাৎ ও তাকাতে জানত। কখন কি-ভাবে তাকালে ওকে ঠিক মানিয়ে যাবে—অভিনেতার মতোই এ-বিদ্যাটা তার আয়ত্তে এসে গিয়েছিল। এমন নজর নিয়ে মেয়েরা দিগ্বিজয় করে থাকেন শুনেছি—আমি অবশ্য কোনো মহিলার চোখে এ-ধরণের লোভনীয় দ্যুতি দেখিনি। যাক্‌, এখন সুদর্শনকে দেখুন ঃ

সেদিন, ধরুন, পরিমলবাবু আড্ডায় এলেন না, টালায় তাঁর সদ্যবিবাহিতা ছোটবোনটি মারা গেছেন খবর নিয়ে বিষণ্ণভাবে প্রবেশ করলেন নিখিলবাবু। সবাই জানি, মৃত্যু-তত্ত্বে মেতে উঠ্‌বে আড্ডাটা। চুপচাপ সুদর্শন শুনতে সুরু করেছে আমাদের কথা। ভালোছাত্ররা ক্লাশে মাষ্টারমশাইদের কথাগুলো যেমন গোগ্রাসে গিলে নেয়, তেম্নি একটা পাশবিক আগ্রহ ছিল ওর শরীরের সমস্ত ভঙ্গীতে। যেন ক্ষণে-ক্ষণে রোমাঞ্চিত-ও হচ্ছিল সুদর্শন। আমরা সংক্ষিপ্ত অথচ বুদ্ধিদীপ্ত বাক্যবাণে নিজেদের অগাধ অভিজ্ঞতার অস্ত্র-পরীক্ষা দিয়ে চলেছি, সুদর্শনকে একরকম উপেক্ষা করেই।

হঠাৎ, যেন সবারই একসঙ্গে, চোখ পড়ল সুদর্শনের উপর। যেন এতোক্ষণ ও শুধু ওর যোগবলের পরীক্ষা দিচ্ছিল। সবাই আমরা অবাক হয়ে দেখতে পেলাম, সুদর্শন হাসছে। স্পষ্ট হাসি। দ্যভিঞ্চির মোনালিসার হাসি নয়, পুরুষের সুডৌল পরিস্কার হাসি। হাসলে তখন-ও খানিকটা সুন্দরই দেখাত ওকে। আর তখন ওকে সুন্দর দেখাচ্ছিল।

কেন যে ও হাসছে এ-প্রশ্নটা-ও মুখে আসছিলনা কারো—এম্নি ঘোরতর বিস্মিত হয়েছিলাম আমরা।

শুধু মানিকবাবু, আমাদের হোষ্ট এবং সৌজন্যের হৃষ্টপুষ্টমূর্ত্তি, তাঁর কথার কসরৎ দেখাতে সাহস পেলেন। বললেন ঃ "আমাদের সেকেলে কথা-বার্ত্তায় সুদর্শনবাবু খুব একচোট মজা লুটে নিলেন!"

প্রগাঢ় ব্যথা যদি কেউ সত্যি জয় করতে পারেন তাঁর মুখে যেমন কচি ভাদ্রের কলা-বৌ-এর উদ্ভাস দেখতে পাওয়া যায়, পরের মুহূর্ত্তেই সুদর্শনের মুখে সেই অদ্ভুত হলুদ রং ফুটে উঠ্‌ল। ও বললে ঃ "বরং উল্টো। মনে হচ্ছিল আমি একটা সুন্দর বই অনায়াসে পড়ে যাচ্ছি।"

নিখিলবাবু বিচলিত হয়ে উঠ্‌লেন, কেন বা কার জন্যে ঠিক বোঝা গেলনা। প্রায় গদগদ হয়েই বললেন ঃ "থিয়োসফির চাইতে কি বড়ো দর্শন আর কিছু আছে?"

এবার যেন সত্যিকারের মজা লুটে নিচ্ছে সুদর্শন, মনে হল আমার। চিকিয়ে উঠ্‌ল ওর চোখ দু'টো এবং অত্যন্ত সাদাসিধে গলায় সুরু করতে চাইল ঃ "নিশ্চয়।" কিন্তু

হঠাৎ ছন্দের উপর যতি ফেলে মুচকি হাসিতে কুৎসিত করে তুলল মুখখানা। আর তারপর শৈশব স্মৃতির রোমন্থনে একটা অবাঞ্ছিত বার্দ্ধক্যের আবহাওয়া এনে উপস্থিত করল গৃহবাসীদের নাতিপ্রৌঢ় মনে। সুদর্শন কথা বলতে সুরু করল।

সুদর্শন ॥ আমি যে সহরে মানুষ, মানে অচেতন শৈশব থেকে চৈতন্যময় যুবাপুরুষ হবার সুযোগ যে-সহরটি আমাকে দিয়েছিল এখনো তা কলকাতার উনিশ-শতকেই পড়ে আছে—সুতরাং সেখানে অত্যন্ত জাঁকজমকে আনন্দে-উৎসাহে ধর্ম্মচর্চ্চা হতে দেখেছি আমি ছেলেবেলায়। একটা 'থিয়োসফিক হল'-ও তৈরী হয়েছিল সেখানে, যখন আমার আধো-বোঁজা এবং আধো-বুঝা মন। প্রথমটায় ভেবেছিলাম বুঝি কোনো থিয়েটর হল এবং শেষ-পর্য্যন্তও এ-ধারণাটা আমার ছিল। কারণ, প্রথম যখন তার ওপেনিং হয় এক মাদ্রাজী সাধুর অভিভাষণে ও অদ্ভুত বসনদৃশ্যে, আমি তা সাগ্রহে দেখতে গিয়ে অভিনয়ই দেখে এসেছিলাম।

এখানে নিখিলবাবু বজ্রাহত হলেন। কিন্তু মানিকবাবু যথারীতি প্রশান্ত থেকেই কৌতুহলী হতে পারলেন। তিনি যেন টিপ্পনি কেটেও বলতে চাইলেন ঃ "লোকের ভীড় দেখেই বোধহয় আপনার মনে হ'ল ওখানে নাটক হচ্ছে!" সুযোগ পেয়ে আমিও সনিঃশ্বাসে বলেছিলাম ঃ "আমাদের ধার্ম্মিকতা নাটুকেপনা ছাড়া আর কী?" বলেই মনে হয়েছিল আমাদের সেদিনকার আড্ডায় ওখানেই বুঝি যবনিকা-পাত হল। তখনও জানতে পারিনি সুদর্শন আজ কথায় বাজিমাৎ করে চিরদিনের জন্যে আমাদের আড্ডা ছেড়ে চলে যাবে।

সুদর্শন ॥ নাটক আর নাটুকপনা কিন্তু এক নয়, প্রিয়তোষ। তুমি জানো, এখনও, কলকাতার এই ভাঙা নাট্যমঞ্চেও, নাটক দেখে আমি আনন্দ পাই। যাক, ছেলেবেলায় আমি আমাদের সেই ধর্ম্মমন্দিরের দরজার প্রায় প্রত্যেক ওপেনিং-ই অ্যাটেণ্ড করেছি। যখন স্থানীয় কোনো বক্তা হাতে একগাদা কাগজ নিয়ে একঘেয়ে সুরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইংরেজী-বাংলা সংস্কৃত বাক্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার দেখাতে প্রয়াসী হতেন এবং সে-সব উৎসব-অনুষ্ঠানে যখন দশটি প্রাণীর বেশি একটি কানামাছিও ভুলক্রমে প্রবেশ করতে চাইতনা, তখনও আমার মতো একটা নির্ব্বোধ বালক সেখানে অনধিকার-প্রবেশ করে লেট্‌-লতিফের মতো সভয়ে পেছনের একটা বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে পড়ত। শুনতামনা হয়ত কিছুই। সাদা দেয়ালগুলোতে তাকিয়ে থাকতাম। ভাবতাম, কারো ছবি-ও যদি টাঙানো থাকত ওখানে তাহলে রং আর রেখাগুলো নিয়ে চোখ বেশ খানিকক্ষণ তেতে উঠ্‌তে পারত। মার হাতে-বোনা উলসূতো-রং-এর রাধাকৃষ্ণ নয়, বাবার ঘরের রবিবর্ম্মা-কৃত সমুদ্রশাসন-ও নয়, মিশনারী-ইস্কুল থেকে পাওয়া পেরেক-ঠুকে মানুষ-মারার বিশ্রী ছবিটা-ও নয়—অন্য কোনো মুখ—কোনো চেহারা—যা আমি অনেক সময় কোনো পুরনো দেয়ালের গায়ে—কোনো মেঘের মুখে—অস্পষ্ট আবছা দেখতে পেতাম বলে মনে হত, তেম্নি কিছুর প্রত্যাশায়ই আমি প্রত্যেক

ধর্ম্মসভায় যেতাম। আমার ধারণা হয়েছিল মাদ্রাজী সাধু তাঁর ঝুলিতে তেমন-কিছু ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী নিয়ে এসেছিলেন।

সুদর্শন জমিয়ে তুলল আসর এবং অবধারিতভাবে বিলিতি পোর্সেলিনে খাঁটি দার্জ্জিলিং-এর সুগন্ধি চা হাজির হয়ে আমাদের আপ্যায়ন সমাধা করল। নিখিলবাবু আবিষ্কারের আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন: "আমি বলেছি কিনা—সুদর্শনবাবু খাঁটি দার্শনিক।" আবিষ্কারে আমাদের আপত্তি থাকলেও সুদর্শন-প্রশস্তিতে বিন্দুমাত্রও আমাদের ইতস্তত ছিলনা। পাৎলা কাপের কানায় সুদর্শন ওর পাৎলা ঠোঁট লুকিয়ে তখন মনে মনে হেসেছিল কি না জানিনে কিছু ওঁর বিধাতা-পুরুষ নিশ্চয়ই তখন খুব একচোট হেসে নিয়েছিলেন। চাপানান্তে সুদর্শনের চাপা গলাটা-ও যেন হাসির মতো ঝরঝরে হয়ে উঠল।

সুদর্শন॥ অল্প-বিস্তর দার্শনিক আমরা সবাই, নিখিলবাবু! যে দেশে এতো উঁচু এতো নীল আকাশ সে-দেশের মানুষরা দার্শনিক হবে না ত কি হবে ধোঁয়াটে আকাশের নীচে বাস করে অভ্যস্ত যেসব মানুষ তাঁরা? কিন্তু আমি খাপছাড়া—মোটেও দার্শনিক নই। তাহলে যদি কবি ভেবে ভুল করে বসেন তার জন্যে বলে রাখছি আমি সত্যেন দত্ত আর সুইনবার্ন ছাড়া আর কাউকে জীবনে স্পর্শ করিনি। আমাকে যদি রিলিজিঅস বলেন তাহলে খানিকটা রাজি হতে পারি।

মানিকবাবু হো-হো রবে হেসে বল্‌লেন: "তাতে আর সন্দেহ কি?"

সুদর্শন॥ সন্দেহ ধরানো যায় কিন্তু ধরাবো না। শুনুন মজার ব্যাপার। ছোট-বেলায় ফুল-কুড়োবার সখ ছিল আমার ভীষণ। সূর্য্য এসে আমাকে কোনো দিন ঘুমন্ত দেখেনি। দেখেছে আমাদের সহরের একটা বারোয়ারী ফুল-বাগানে—বকুল-শিউলি তলায়, যুঁইবেল ঝোপে, নয়ত পদ্ম-দিঘীতে। কোনো দেবতার জন্যে সে ফুল নয়—মজার ব্যাপারটা সেখানেই। কোনো মানুষের জন্যেও নয়—স্রেফ আমার মনের জন্যে। সেখানেই একটি মানবিকার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। মালবিকা সে হতে পেরেছে কিনা আপনারা অবশেষে যাচাই করবেন, কিন্তু সবার-শেষে-আসা কাঁদ-কাঁদ চেহারার সেই বাচ্চা মেয়েটির শূন্য ডালা দেখে মানুষকে ফুল দান করবার বৃত্তিটা আমার মনে সেই প্রথম জন্ম নিয়েছিল। এ-দানের ফল হাতে-হাতে পাওয়া যায়, আপনারা তা জানেন। আমিও তা পেয়েছিলাম। মনে করুন, মেয়েটির নাম শর্ব্বরী। মানে, যখন সে বেশ বড়-সড় তখনকার নাম। থার্ড ক্লাশে পড়ে আর আমি থার্ড ইয়ারে। মনের দিক থেকে এখনকার থার্ড ইয়ারের মেয়ের চাইতেও তখনকার থার্ড ক্লাশের কোনো-কোনো মেয়ে বড়ো ছিল। শর্ব্বরী ঠিক তেম্নি মেয়ে। কিন্তু ওদের নিয়ে বিপদ কি জানেন, ওরা ছিল বেজায় ধার্ম্মিক মেজাজের। আমাকে ইস্তক ধার্ম্মিক বানিয়ে ছাড়ল মেয়েটি। বিজয়া দশমীর পর কিম্বা পয়লা বৈশাখ ও যখন আমাকে

নির্জ্জনে পেয়ে পা ছুঁয়ে কোনো রকমে একটা প্রণাম সেরে নিত তখন আমি ভাবতে বাধ্য হতাম, বুঝিবা আমরা প্রথম পুরুষ আর নারী।

"প্রণয়ের উন্মেষকে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রগুলো পবিত্র মনে করলেও সমাজ তাকে ক্ষমার চোখে কোনোদিনই দেখতে পারল না! সমাজের চেহারাটা এম্নি নিরেট আর মেজাজও তার এম্নি আমি লক্ষ্য করেছি যে কোনোরকম সূক্ষ্মতার প্রশ্রয় সেখানে নেই। অনর্থক আমরা 'ধর্ম্মশাসিত সমাজ' বলে একটা মিথ্যাকথা বলে যাই। তার মানে কি জানেন? কোন্‌ ফেঁকড়ায় এর উৎপত্তি—ধর্ম্মের দরবারে এ কৌর্টফি কেন দিই, তা জানেন ত? আমরা ধর্ম্মও চিনিনে, সমাজও বুঝিনে। মুখে রং মেখে মুখরক্ষা করি—মানে-মানে ষ্টেজ থেকে বিদেয় হতে পারলেই বাঁচি। ইহলোক-পরলোক কোনোটাই আমাদের যোগ্য বাসস্থান নয়। এ কথাগুলো আপনাদের শোনালাম এজন্যে যে শর্ব্বরীকেও কথাগুলো আমি বলতাম। আমাদের প্রেমের ডায়ালগ শোনাবার যদি প্রিয়তোষের ইচ্ছা থাকে—এ-কথাগুলো থেকে সে তা বানিয়ে নিতে পারে। আমি ওর মতো ওস্তাদ লিখিয়ে নই, তাই রসিয়ে কথাগুলো বলতে পারলাম না। ধীমান প্রিয়তোষ তার ওই অন্যমনস্ক হাসির মুখোসে মনে-মনে যে অনুমান করে চলেছে, তা ঠিক। আমার সঙ্গে শর্ব্বরীর বিয়ে হয়নি। এ-অনুমান অবশ্য আপনারা-ও করতে পারতেন। বিয়ে-না হওয়াটা যে একটা মস্ত হৃদয়হীন ব্যাপার, শরৎ-চাটুজ্যের মতো এমন কথা আমি ভাবিনে। সমাজ, মানুষ, ধর্ম্ম—কেউ এরা হৃদয়হীন হ'তে পারে না। নির্দ্দয় হওয়া নিয়তির স্বকীয়তা। রাষ্ট্র বলে যে একটা বিষয় আছে, শুনেছি, তা মাঝে মাঝে নিয়তির পোষাক পরবার অধিকার পায়।

এখানে আমি সুদর্শনকে রুখতে পারতাম, কারণ একজন সমাজ-সচেতন লেখক হিসাবে আমার কিঞ্চিৎ অভিমান আছে। এ-অভিমানের মানদণ্ডে মাপলে সুদর্শনের মতো চিজরা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর হয়ে দাঁড়ায়—জলের দামেও বিকোয়না। তবে আমার মনে হ'ল চুপ করে থেকে ওকে টোপ গিলতে দেওয়াই ভালো। আখেরে ঝোপ বুঝে কোপানো চলবে—মানে ওর দর্পচূর্ণ করা যাবে। আমার মনোভাবটা প্রতিক্রীত হয়ে উঠেছিল সুদর্শনের চোখে, কারণ ওর চোখ তখন চকচক করে উঠেছে দেখলাম।

সুদর্শন॥ শর্ব্বরীকে আমি 'পরী' বলে ডাকতাম আর ও আমাকে ডাকত 'দোসর' বলে। নামের এ অদলবদলে যে দোষই থাকুক আমাদের মনোভাব অপরিস্কার থাকেনি। নামের কোনো মর্য্যাদা আপনারা দেন কিনা জানিনে, সেক্সপীয়র পড়া কাচা বিলিতি মন নাম উড়িয়ে দিয়ে রূপ নিয়েই ব্যস্ত হতে অভ্যস্ত কিন্তু নামের অর্থ আমার মনে অপরিসীম। পরীর চোখে আমি সুদর্শন ছিলাম না কোনোদিন—তরুণ বয়সেও নয়—যখন প্রত্যেকটি জীবই খানিকটা সুন্দর হয়ে উঠবার সুযোগ পায়। তবু আমার অদর্শনে ও পাগল হয়ে যেতো

—রাই উন্মাদিনীর মতো আজকাল হওয়া যায়না বলেই মনে-মনে পাগল। আমি আপনাদের ব্যর্ণর্ডশকে বাহবা দিয়ে বলতে পারিনে যে ইতর জনের ভাগ্যে মহীয়সী রমণীর সিকা ছিঁড়ে না। 'তারা-মৈত্রী' বলে কথাটা আমি বিশ্বাস করি—আকাশের যুগল তারা যে আকর্ষণে তৈরী হয়, সে-আকর্ষণে পৃথিবীর দু'টি প্রাণও বন্ধনে আসে। বন্ধন—সত্যি তা বন্ধন। এক ব্রাউনিং ছাড়া ইংরেজ জাতের আর কোনো কবি উনিশ-শতকে এ-কথাটা হৃদয়ঙ্গম করেন নি। যাক্ সব বাজে কথা, এখন ধর্ম্মের কাহিনী শুনুন। আমি পরীকে বলতাম: আমাদের যদি বিয়ে না হয়, হয়ত বিয়ে হবে না, তাতে কি তুমি খুব ব্যথা পাবে? পরী আমার মুখের দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকাত, তারপর অনেকক্ষণ তাকিয়ে ওর চোখ-ঠোঁট গলা-চিবুক থেকে মুছে যেতো উৎকণ্ঠা—মাথা নামিয়ে বলত: ব্যথা কেন? এ জীবনই ত সবটুকু জীবন নয়। ও কি বিশ্বাস করত—কি বিশ্বাস করে আনন্দ পেতো জানিনে। আমি কিন্তু মুখে বললেও মনে যেন বিশ্বাস করতে পারতাম না যে এ-জীবন সবটুকু নয়। ধ্রুব তারাই যে ধ্রুব এ-বিশ্বাস ধারণ করে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে প্রথমটায় খুব সহজ হয়নি যদিও আমিই কথাটার প্রথম বক্তা ছিলাম। মানুষের মন নিয়তি সেজেও বা কী ট্র্যাজিডি ঘটায় দেখবেন! আধুনিক ফরাসীরা হয়ত বলবেন, এ হ'ল নিছক এক্সিষ্ট্যান্সিয়্যালিজম্-এর ঘোষণা। ঘোষণাটা যে মানুষের মনের, যার দুই তৃতীয়াংশ জলে-ডোবা বরফের মতো জলের নীচে, এই সাধারণ ধারনা মনে আনতে কি ফরাসী-ভিয়েনা পরিভ্রমণ করতে হয়? আমাদের চঞ্চল চিত্তের প্রতি মনোনিবেশই কি যথেষ্ট নয়?

আমরা নিবিষ্ট ছিলাম তবু সুদর্শনের সৌজন্যবোধ তাকে কুপরামর্শ দিলে, কথাগুলো সংক্ষিপ্ত করে আনতে।

সুদর্শন॥ যাক বক্তৃতায় আপনাদের আর বেশিক্ষণ জ্বালাতন করবনা। নিরেট ঘটনা তারপর কি হয়েছিল শুনুন। পরী একদিন আত্মহত্যা করলে। আমাকে টুঁ-অক্ষরে নোটিশ না দিয়ে। ওর পরিবার গোপনে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করলেও প্রকাশ্যত প্রচার করলেন যে মেয়েটির মেনেঞ্জাইটিস হয়েছিল—এবং যেহেতু মফঃস্বলে তার চিকিৎসা হয়না সেই হেতু তাঁদের চোখের মণিকে ধরে রাখতে পারলেন না। তার মানে পরিবারের ডাক্তারবাবুটি নীলকণ্ঠ সাজলেন—মফঃস্বলের ডাক্তারবাবুদের যেমন দুর্ভাগ্য! আপনারা জানতে চান নিশ্চয়ই—আমি কী করলাম! কী আর করব—কিছুই করিনি, এই ত আপনারা দোসর সুদর্শনকে দেখছেন! মীরার গিরিধরলাল।

সুদর্শন স্তব্ধ হয়ে গেল। আমরা বিমূঢ়। তারপর এ-সম্পর্কে যে আর একটি কথা-ও আমাদের মধ্যে বিনিময় হলনা তার কারণ আমাদের মনে পড়ল, পরিমলবাবুর সদ্য-বিবাহিতা ছোট বোনটি-ও সদ্য মারা গেছেন।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

সেদিন যদি আমরা সুদর্শনকে নয়ন-জলে বিদায় দিতে পারতাম তাহলে অন্তত একটা সান্ত্বনা মনে থাকত যে তাকে কোনো ছলেই আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। ও বেমালুম উধাও হ'ল আমাদের আসর থেকে! দু'চারদিন ওর অসুস্থতার ছলে মনকে প্রবোধ দিলাম আমরা। তারপর খোঁজ করতেই হল যেচে গিয়ে। কিন্তু আস্তানা থেকেও উবে গেছে সুদর্শন। ঘোরতর সন্দেহ আর দুশ্চিন্তায় কাটল কয়েকটা দিন—নিঃসঙ্গতায় ত বটেই। তারপর আমরা-ও বেমালুম ভুলে গেলাম ওর কথা। চিরসঙ্গিনী স্ত্রীকেও ত মানুষ চিতায় তুলে দিয়ে চারদিনেই ভুলে যায়, আর এ ত দুদিনের পরিচিত ব্যক্তি মাত্র। তবু স্মৃতি বলে একটা অপদার্থ পদার্থ মাঝে-মাঝে আমার মনে ওর ব্যক্তিত্বটা ঘোষণা করে বসত। জানিনে নিখিলবাবু বা মানিকবাবু ওকে নারীঘাতক ভাবতেন কি না, কিন্তু আমার কেবলি মনে হত, হয়ত এম্নি কোনো দুশ্চরিত্রতার জানান দেবার জন্যেই সুদর্শন আমাদের সভ্য-ভব্য আড্ডাটিতে এসে প্রবেশ করেছিল। এতে তার কা লাভ? কিছুই না। অপকার-বৃত্তি—পরের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেওয়া! তুমি ভদ্রস্থ আছো জানলে এদের চোখ টাটাবে। বলবে: তুমি-ও কিন্তু সাংঘাতিক একটা দুষ্কর্ম্ম করতে পারো। কারণ, জগৎটা অসৎ।

তবে রক্ষা যে স্মৃতির জলছবির চিল্‌তে রং শীগগীরই কালগ্রাসে চটে যায়। পাঁচ-বছরে আমি সুদর্শনকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে সমর্থ হলাম। ভুলে-ও কোনোদিন তার মুখ মনে পড়তনা—স্বপ্নে-ও ও চড়াও হতে আসতনা। তার কারণ, কি-এক কৌশলে মন যেন ওর চেহারাটাকেই ভুলে গিয়েছিল।

কিন্তু আমি কি জানতাম মনের এ কৌশল-কসরৎ শুধু উপরকার বরফটুকু নিয়ে? আমি কি জানতাম, দশবছর পর হঠাৎ একদিন একটি মুখ দেখে আমি মনে-মনে চেঁচিয়ে উঠ্‌তে যাব: 'আরে, এই যে সুদর্শন!' মনের এসব দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার আমি ত ছাড়, স্বয়ং ফ্রয়েড বা শরৎ চাটুজ্জেও হয়ত উপলব্ধি করতে পারেন নি। বৌদ্ধ আমলে কেউ-কেউ পারতেন আর ইদানীং যোগী-সন্নেসীরা।

গা-ঢাকা-দেওয়া সুদর্শন এমন একটা জলজ্যান্ত জায়গায় চলাফেরা করছে তা চোখে দেখলেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়না। আমার স্বদেশী বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম কলকাতা-ই না কি গা-ঢাকা দেবার প্রশস্ত স্থান। এ হেন মহাপীঠে প্রকাশ্য দিবালোকের মতো সন্ধ্যে বেলায় সুদর্শন বউ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—যে সুদর্শনের খবর বহু সন্ধানেও আমরা যোগাড় করতে পারিনি—তা দেখলে মুখ দিয়ে সহজে মাতৃভাষা বেরিয়ে আসতে চায় না। এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেই আমরা বলি; কী তাজ্জব ব্যাপার, অথবা কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্। কিম্বা কেউ কেউ বিলিতি পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ করে বলেন: মাই গড্!

বিস্তর বাজে বকছি, এখন কাজের কথা শুনুন। একটি বর্ষা-সন্ধ্যায় খেলার-ময়দান ফিরতি আমি নিউ-মার্কেটে প্রবেশ করে ভেজা সার্টের পাখসাট মারছিলাম, এমন সময় দেখা গেল—বিপরীত কোনো গৃহচূড়ে কপোত-কপোতীর মতো নয়—সোজা আমার চোখের সামনে ফ্লোরিষ্টদের কুঞ্জ-গলিতে একটি দম্পতী। "ছাখো ত কে ?"—সুস্পষ্ট মনের পরামর্শ শুনতে পেলাম আমি। মালঞ্চওয়ালাদের ফুল-গছাবার অনুরোধে কর্ণপাত না করে সোজা এগিয়ে গেলাম দুটি ঝকঝকে মুখের কাছে।

"সুদর্শন—" স্নেহে বিস্ময় মিশিয়ে ডেকেছিলাম, হুবহু মনে পড়ে আজও।

উদ্বিগ্ন মুখ তুলে তাকাল সুদর্শন—তা-ও দেখলাম। কিন্তু পরের মুহূর্ত্তেই ও ভদ্রলোক বনে গেল।

"আপনি ?" থামলেন ভদ্রলোক : "আমাকে বল্‌ছেন ?" বিনীত ভদ্র একটা তিরস্কার খেলে গেল ভদ্রলোকের গলায় এবং চোখেমুখে।

উত্তরে তাড়াতাড়ি আমাকে বলতে হল ; "ও, মাপ করবেন—আমি ভুল ভেবেছিলাম !" চোখ আমাদের হামেসাই ঠকায় জেনে দ্রুতপায়ে বিলিতি কেতাবের গলিতে ঢুকে গেলাম। এবং বৃষ্টি-ভেজা হয়েও এতোক্ষণ যা না হচ্ছিল, এই ঘটনার পর আমার সর্ব্বাঙ্গে সে লক্ষণ প্রকাশ পেলো। লজ্জায় কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল শরীর। সুদর্শনের যুগল-মূর্ত্তি দর্শনের পুণ্যেও এমন রোমঞ্চ হতে পারত কি না সন্দেহ।

আমি ভাদ্রবৌদের জন্যে গল্প লিখিনে। ভদ্র-জীবনের প্রতি আমার আস্থা নেই, ভদ্র বল্‌তেই ভদ্র নয় বলে। সুদর্শনের কাহিনী শোনবার পর থেকে আমার প্রায়ই ভাবতে ইচ্ছে করত, হয়ত সুদর্শন বিবাহিত হলে একটি ভদ্র স্বামী হতে পারত। আমার মনে যে ভদ্র বিবাহিত-জীবনের চিত্রটা ছিল, তার একমাত্র নায়ক মনে-মনে স্থির করে রেখেছিলাম সুদর্শনকে। সুতরাং সর্পে রজ্জু ভ্রম আমারই হতে পারে। বর্ষার দিনে একটি দম্পতীকে রজনীগন্ধার গুচ্ছ কিনতে দেখলে তাঁদের মধ্যে আমি ফুল-কুড়োনো সুদর্শনকে নির্ঘাৎ দেখতে পাব।

সেদিন নিউ-মার্কেট থেকে বাড়ি ফিরে এসে এ-ধরনের ফুলের প্রসঙ্গে আমাদের বিকেলের আড্ডাটাকে প্রফুল্ল করে তুললাম দু'দিন। মানিকবাবু মজা পেলেন খুব—সবতাতেই তাঁর মজা—জলসাঘরের মালিক হতে গেলে যেয়ি হতে হয়। কৌতূহলী চোখে তিনি বারবারই বললেন : "আপনি ঠিক দেখেছিলেন—উনি সুদর্শনবাবু না হয়ে যান না !"

শ্রুতিধর নিখিলবাবুও সোৎসাহে বল্‌লেন : "এ বয়সে হঠাৎ বিয়ে করে লজ্জিত হয়ে পড়েছেন !"

ওঁদের সৌম্য কণ্ঠের যুক্তি শুনে কোন পাপিষ্ঠ না মাথা নত করে ওঁদের কথা মেনে নেয়! আমিও তথাস্তু বলে মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তা চেষ্টাই।

আমরা কেউ বৌদ্ধ সন্নেসী নই—কাজেই আমাদের মতো হ্যামলেটের কাছে 'দেয়ার-আর-মোর-থিঙ্গস্' নামক আশ্চর্য্য বস্তুর আবির্ভাব হামেসাই হয় এবং সেসব আবির্ভূত ভূতপেত্নী সর্ব্বদাই মনের মধ্যে জড় হয়ে হামলা লাগায়। বিশেষ করে আমাদের মতো প্রাণীর চিত্ত হ্যামলেটের বৃত্তিতেই তৈরী। একই গোষ্ঠীর মানুষ আমরা—লেখক-গোষ্ঠীর-চরিত্রের ভিত্তি একই রকম।

তবে এখন আর দুর্গপ্রাকারে ভূতের মুখে খবর আসেনা—আসে পত্রের আকারে কিম্বা পত্রিকাস্থ গল্পের কলেবরে। আমি একটি চিঠি পেলাম। পুরুখামে পুরু চিঠি। রাইটিং-প্যাডের পুরো পাঁচ পৃষ্ঠা। তার সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত আপনাদের শোনাবনা—শ্রাব্য অংশটুকু বা অন্তরটুকুই আপনারা লাভ করবেন এবং তার অন্তেই সুদর্শনের কাহিনী শেষ হবে। সুদর্শনের সঙ্গে আমাদের আজ যে-বিচ্ছেদ তা মৃত্যুর মতোই। আমাদের সভ্য-ভব্য আড্ডার সম্মতি-ক্রমেই এ-চিঠি প্রকাশ করছি :

শেষ পত্র

"......নিউ-মার্কেটের দৃষ্টি-বিনিময় নিয়ে আর বলবনা, এখন কাজের কথা বলছি। আমার সঙ্গিনী হিসেবে যাঁকে দেখেছ তিনি আমার বিবাহিতা পত্নী। আমি বিয়ে করেছি, প্রিয়তোষ! অভাবনীয় ব্যাপার কিছুই নয়। সব শুনলে বুঝতে পারবে। জানার জানালা যে কতো আশাকরি লেখকরা তার খবর রাখেন। তাই তোমাকে এই পাপী-চিত্তের পাত্রী বলে মেনে নিলাম।

লক্ষ্য করে থাকলে দেখে থাকবে, আমার স্ত্রীর রং ফর্সা নয় এবং তাকে কোনোক্রমেই সুন্দরী বলা যায়না। রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলি নয়—রামচন্দ্রের শবরী হতে পারেন। ঠিকই শবরী। কিন্তু তিনি আমার প্রতীক্ষায় ছিলেন, কি আমি তাঁর প্রতীক্ষায়, ঠিক বলতে পারবনা। তবে দেখা হল এক বন্য-আবহাওয়ায় তা স্বীকার করছি।

কলকাতায় তুমিই একমাত্র আমার লেখক-বন্ধু নও, আরো অগণিত লেখক আছেন এবং তাঁদের কেউ-কেউ আমার বেশ অন্তরঙ্গ সুহৃদ। তাঁরা সম্ভবত শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত পড়ে সাহিত্যিক হয়েছিলেন কিম্বা শ্রীকান্ত হবার জন্যে সাহিত্যিক হয়েছেন। আমি সাহিত্যিক নই—শ্রীকান্তই হই আর ভারতচন্দ্রের নায়কের মতো যে-হই সে-হই, তাতে 'তোমার সমাজে'র কিছু যায় আসে না। তুমি যদি সত্যি 'তোমার সমাজ'-সচেতন সাহিত্যিক হয়ে থাকো

তাহলে তোমার প্রথম কাজই হবে তোমাদের শ্রীকান্তদের উদ্ধার করা। এমন অনেক কান্ত তোমাদের ভাণ্ডারে আছে। সব কান্তই মরু-কান্তার-চারী। তাকিয়ে আছেন কবে কান্তা এসে ভালোবেসে তাকে বুকে টেনে নেবেন। সাহিত্যের পাঠক হয়েই আমি এই দুরবস্থা ভোগ করেছি, সাহিত্যিকদের অবস্থা ত আরো সঙ্গীন। সঙ্গীহীন হয়ে দুরারোগ্য রোগে ভুগবারই কথা। তাঁরা তা ভোগেন-ও জেনে নাও। বসন্তের ভিরাস্-ই শুধু ভীষণ নয়, যত্রতত্র প্রাণ-দান, পাগলামি, মাতলামি এসব-ও আছে। এঁদের তুমি কী সান্ত্বনা দিতে পারো, বন্ধু? তোমার সমাজ কী সান্ত্বনা দেয়? যাক্, আত্মকথায় আসি। শরৎবাবু আমাদের জানিয়েছেন, গণিকাশক্তি প্রবল। আমি উৎসুক হয়েছিলাম। ঔৎসুক্যই সঙ্গী জোটায়। তবে ভাগ্যি ভালো, সে-সঙ্গী নেহাৎ কুসঙ্গী ছিল না। সাহিত্যিককে কি ভাবে কুসঙ্গী বলব, বলো!

মেয়েটি কালো। মায়াবী চোখ—এক-মাথা চুল—চমৎকার খোঁপা—তাকানো ভালো—সুস্থ অবস্থায় ভদ্র ব্যবহার। আমি সেলো-গার্ল বা গীসা-গার্ল বা বৌদ্ধ যুগের অম্বাপালির স্বপ্ন দেখেছিলাম। ওম্নি দেখছিলাম, মানে দেখতাম—ওকে দেখেই দেখেছিলাম এমন নয়। আমার মনের অম্বাপালি-বসন্তসেনা-বাসবদত্তা বসন্ত-বর্ষা-শরৎ-সমাগমে আমাকে একটি সঙ্গিনী খুঁজে দিতে চাইত। শীতকাল অনেক ভালো—আমাদের এই গ্রীষ্মের দেশে। শয্যা ছাড়া মন আর কিছু চায় না। এ-কথা শুনলে নিখিলবাবু নিশ্চয়ই বলতেন, এ-চাওয়া ঘুরে-ফিরে শর্ব্বরীকেই চাওয়া। কিন্তু আমি ত পরলোকে বিশ্বাসী নই—কি ভাবে আবার-ও মিথ্যে কবুল করা যায় বলো!

প্রথমদিনের সঙ্কোচে আমি যখন জনৈক রূপসীর ফরাসের এককোণে চুপচাপ বসে আছি, আমার সাহিত্যিক বন্ধুদের কথার ব্যূহ ভেদ করে মেয়েটি হঠাৎ আমার দিকে সরে এলো। আমি রীতিমতো ভীত হয়ে উঠেছিলাম। মেয়েটিই যথোচিত প্রগলভার মতো জিজ্ঞেস করলে: "আপনি এতো চুপচাপ যে!"

"কী করব?" নিরাশা ধ্বনিত করল আমার গলা।

"কী করবেন তা-ও জানেন না?" মেয়েটি হাসবার উপক্রম করেই থেমে গেল: "অন্তত আমার নামটা-ও ত জিজ্ঞেস করতে পারেন!"

"বেশত! বলো, কি তোমার নাম!"

"বিভা! পছন্দ হয়?"

সাহিত্যিক বন্ধুর দল অট্টহাস্যে চমকে দিলে আমাকে। পছন্দ-অপছন্দের সময় দিলেনা।

নির্ব্বোধের মতো হাসতে থাকা ছাড়া তখন আর গত্যন্তর ছিল কি আমার? কিন্তু

তদবস্থায়ও পরম আশ্বস্তিতে দেখতে পেলাম মেয়েটির মুখ ভার। খানিকক্ষণের জন্যে। যে-বিষণ্ণ মুখ আমার সব চাইতে ভালো লাগে, তেমন একটি মুখশ্রী আবিষ্কার করলাম আমি পথিক-বনিতার মুখে। তা অন্তর্হিত হতেও অবশ্য বেশি দেরি হল না। আবিষ্কারের যা দশা হয়। আমার ফুর্ত্তিবাজ সুহৃদরা এখানে দুঃখোত্থিত হতেই আসেন, দুঃখ পাবার জন্যে নয়। কিন্তু দুঃখিত মুখ তাঁদের চোখ এড়িয়ে যায়। শরৎচাটুজ্জের নায়কের কিন্তু তা যায়নি। আমার তা গেল কি গেলনা তুমি অনুমান করে নাও। আমার সব-চাইতে বড়ো একটি গোপন কথা ত তোমাদের বলেছি। তোমরা ধার্ম্মিক—নিশ্চয়ই আমার মতো পাপিষ্ঠের মন বুঝতে পারো। তবে কি জানো প্রিয়তোষ, শতচেষ্টায়ও আমরা হুবহু অন্য একটি চরিত্রের মতো হতে পারিনে—তোমার নূতন ধর্ম্ম সাম্যবাদ যা-ই বলুক, আমি প্রাণান্তেও এ-মিথ্যা বিশ্বাস করব না। আমি প্রৌঢ়তায় পৌঁছিয়ে বিশ্বাস করছি, ধর্ম্মও সমাজের মতো নিরেট হতে পারে। যাক্ দর্শন-প্রস্থান নিয়ে আর কচকচি করব না। অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি।

আমরা যখন প্রস্থানোদ্যত হলাম তখন মেয়েটি কি করলে, বা কি করতে পারে, অনুমান করতে পারো? সম্ভাব্য সব অনুমানকে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে, মেয়েটি ঘুম-কাতর চোখ তুলে আমাকে, হাঁ শুধু আমাকে, বললে: "আপনি কেন এসেছিলেন?"

এ-কথাটিরও প্রতিধ্বনি তুলল বন্ধুদের কুৎসিত হাসি। কিন্তু আমি ওর মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবার সময় অন্য একটি মুখ দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম শর্ব্বরীকে।

তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে, প্রিয়তোষ, যদি আমি বলি, বিভা-ই আজ আমার সহধর্ম্মিণী বিভাবরী!..."

সব প্রিয় মুখ নয় স্বীয়।
অপ্রীতির চোখেও তাকিও।
তখন লাগবে যারে ভালো
সে-ই হবে চির-স্মরণীয়॥

বাংলার সমস্যার দু'একটি দিক

অম্লান দত্ত

কলকাতার গত কয়েক বছরের ঘটনার ভিতর দিয়ে বাঙ্গালীর মন যে-ভাষায় কথা বলেছে তাতে একটা প্রবল অস্থিরতা অতিব্যক্ত। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে সারা কলকাতা শহর ভেঙ্গে পড়েছে; অচিন্ত্যকুমারের "পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" জনপ্রিয়তার বিস্ময়কর চূড়ায় উঠেছে; একই সময়ে কম্যুনিষ্টদের প্রভাব প্রবল হয়েছে। পূর্ব্বপাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বিরাট আকার ধারণ ক'রে আবার ছায়ায় বিলীন হয়েছে; গণবিক্ষোভ নূতন ক'রে ভেঙ্গে পড়েছে ট্রাম কোম্পানী আর রাষ্ট্রীয় পরিবাহন ব্যবস্থার উপর; বোমা ছোড়া হয়েছে ট্রামে-বাসে—তারপর ছাত্রদের সভায়, পূজার মণ্ডপে।

আমরা অহঙ্কারী জাতি। আমাদের আছে সংস্কৃতি-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী; বুদ্ধির অভিমান; রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্বের মোহ। অথচ জীবনধারনের সংগ্রামে বাঙ্গালী আজ পদে পদে পরাজিত। একদিকে বাঙ্গালী অহঙ্কারী; অন্যদিকে পৌনঃপুনিক পরাজয়ে সে আত্মবিশ্বাসচ্যুত। আমাদের কল্পনা আছে; স্বপ্ন দেখতে আমরা ভালোবাসি; বাস্তবজীবনে পরাজয়ের গ্লানি তাই আরও অসহনীয়। সমাজের প্রতি অন্ধ আক্রোশে একবার আমরা দু'হাতে সব ভাঙ্গতে চাই; আবার অসহায় আত্মবিশ্বাসশূন্যতা থেকে মেকীধর্ম্মের আশ্রয় খুঁজি। বোমা এবং কবচ, বিপ্লব এবং পরমপুরুষপ্রসঙ্গ, এই আজ বাঙ্গালীর চেতনার মূল উপাদান।

বাঙ্গালীমনের এই অব্যবস্থিতচিত্ততার অন্যতম প্রধান কারণ অর্থনৈতিক সংকট। মধ্যাবত্ত বেকার সমস্যা ক্রমশই কঠিনতর হ'য়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী কলকাতায় বাঙ্গালী বেকারের সংখ্যা একলক্ষ পঁচাশি হাজার তিনশ; এদের ভিতর দুই-তৃতীয়াংশের কিছু বেশী মধ্যবিত্ত। এই মধ্যবিত্ত বেকার যুবকেরা বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোর এক মৌল গলদের সাক্ষ্যস্বরূপ। বাঙ্গালীর মনকে আবার স্বপ্রতিষ্ঠ করতে হ'লে চাই দেশের ধনোৎপাদন ব্যবস্থার এবং সেই সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন।

ইংরেজের কল্যাণে এ-দেশে যে-শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তন তাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দেশশাসনের যন্ত্রে ফরমাশ খাটবার উপযোগী ক'রে গড়বার চেষ্টা ছিল। আমরা হ'য়ে উঠলাম কলমপেষা জাতি; আমাদের আখ্যা হ'ল "বাবু"। সামান্য কিছু অদলবদলসহ সেই শিক্ষাব্যবস্থাই এখনও চালু। হাতের কাজে আমাদের দীক্ষা নেই, রুচিও নেই। কিছুদিন আগেই কলকাতার বেকার অধিবাসীদের সংখ্যাগণনায় দেখা গেছে যে, বাঙ্গালী বেকারদের অনেকেই হাতের কাজ গ্রহণ করতে অসম্মত; অপরপক্ষে, অবাঙ্গালীদের অনেকেই এ-ধরণের কাজে নিযুক্ত হতে রাজী। শিক্ষার গুণে হাতের কাজে আমরা অক্ষম;

মিথ্যা মর্য্যাদাবোধে বাবু-বুদ্ধিজীবীর দল এই অক্ষমতা সম্বন্ধে অহঙ্কৃত ,অন্তত উদাসীন।

এ-সবই অবশ্য পুরনো কথা। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বহুদিন পূর্ব্বে এ-বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ ক'রে গেছেন। প্রফুল্লচন্দ্র এ-বিষয়ে দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার পর সমস্যা আরও গুরুতর আকার ধারণ করেছে। ইতিমধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশবিভাগের পর পূর্ব্বপাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ লোক স্বল্পায়তন পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছেন; ফলে জনসংখ্যার চাপ আরও বেড়েছে। সারা ভারতবর্ষে আজ প্রথম শ্রেণীর প্রদেশগুলির ভিতর আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার চাপ সর্ব্বাধিক পশ্চিমবঙ্গে। স্বল্পপরিসর পশ্চিমবঙ্গে এই বিপুল জনতার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সুদূরপ্রসারা পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

প্রশ্নটা বিস্তৃততর একটি পটভূমিকায় তুলে ধরা যাক। কৃষিপ্রধান অনুন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যার চাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবন যাত্রার সমস্যা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠে। এ অবস্থায় সমস্যা সমাধানের পথ শিল্পের প্রসার। এই সাধারণ সূত্রের সত্যতা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত। সূত্রটি এখানে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। অর্থনীতিবিদ ম্যালথাস দীর্ঘ পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটে না। ম্যালথাসের সিদ্ধান্ত অবশ্য সর্ব্বাবস্থায় গ্রহণীয় নয়; যে সব দেশে উৎপাদনপদ্ধতি পরিবর্ত্তনহীন সে সব দেশেই জনসংখ্যার তুলনায় শস্যোৎপাদন পিছিয়ে পড়বার সমধিক সম্ভাবনা। কৃষি প্রথার দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শস্যোৎপাদনেরও দ্রুত বৃদ্ধি সম্ভব। কিন্তু উন্নততর কৃষিপদ্ধতি প্রবর্ত্তনের ফলে একই জমি চাষের জন্য অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন ঘটে। উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের তখন নিয়োগ করা চলে ক্রমপ্রসার্য্যমাণ শিল্পের ক্ষেত্রে।

প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এদিকে দামোদর পরিকল্পনার কাজ চলেছে; তারই সঙ্গে অন্যান্য পরিকল্পনাও আছে। কৃষিপদ্ধতির উন্নতির পথে তবু বাধা এখনও প্রবল। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। আমাদের বলবার কথা এই যে, কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের সম্প্রসারণে মনোযোগী না হ'লে এ-দেশে বেকার সমস্যার সমাধান তো হ'বেই না, বরং অনিবার্য্য ভাবে সমস্যা আরও গুরুতর আকার ধারণ করবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বাংলা দেশের সমস্যা তা হ'লে এই: একদিকে এ-দেশে জনসংখ্যার চাপ ভয়াবহ, বেকার সমস্যা গুরুতর, এবং সমস্যার সমাধানের জন্য শিল্পের সম্প্রসারণ অবশ্য প্রয়োজনীয়; অন্যদিকে এ-দেশে শিক্ষাব্যবস্থা শিল্পবিমুখ। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে দেশের বাস্তব প্রয়োজনের যোগসূত্র ছিন্ন। স্কুল কলেজে শিক্ষার প্রতি

একটা অবজ্ঞা, তুচ্ছতাবোধ, ছাত্র শিক্ষক সকলের ভিতর ব্যাপ্ত। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যর্থতার এটাই গোড়ার কারণ। সমস্যার সমাধান অনুপযুক্ত ছাত্রদের নম্বর বাড়িয়ে পাশ করিয়ে দেওয়াতে নয়; শিক্ষা ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও পারস্পারিক যোগাযোগ সাধনের পথেই শুধু বর্ত্তমান পরিস্থিতির প্রতিকার সম্ভব। যে শিক্ষা দেশের মানুষকে বাঁচবার এবং বাড়বার পথ দেখাতে পারবে সে শিক্ষার প্রতি দেশের মন শ্রদ্ধাবান হ'বেই। জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যোগাযোগ স্থাপিত হ'লে শিক্ষণীয় বস্তুকে নিষ্ঠার সঙ্গে আয়ত্ত করেই পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা অর্জ্জনের চেষ্টা প্রধান হ'বে।

দেশকে যদি শিল্পের জন্য প্রস্তুত করতে হয় তবে শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন প্রয়োজন মুখ্যত কারিগরি অথবা বৃত্তিমূলক শিক্ষার পথে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা আবশ্যক। এ-দেশে নিকট ভবিষ্যতে বৃহৎ শিল্পের এমন বিরাট প্রসার সম্ভব নয় যাতে লক্ষ লক্ষ বেকার মানুষ এ-জাতীয় শিল্পেই কাজ খুঁজে নিতে পারে। শহর ও পল্লী অঞ্চলের অনিযুক্ত এবং অর্দ্ধনিযুক্ত সর্ব্বসাধারণকে বৃহৎ শিল্পে নিয়োগ করবার মত যথেষ্ট মূলধন এদেশে নেই। পর্য্যাপ্ত পরিমাণ মূলধন সৃষ্টি করাও দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। রাশিয়াতে অবশ্য পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনায় বৃহৎ শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধির উপরই জোর দেওয়া হয়েছে; বেকার সমস্যার সমাধানও সে-দেশে হয়েছে। কিন্তু রাশিয়ার তুলনায় ভারতের জনসংখ্যা অনেক বেশী। আর বৃহৎ শিল্পের দ্রুত প্রসারের জন্য যে বিপুল পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন ছিল, রাশিয়ার অপর্য্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সত্ত্বেও সে মূলধন গড়ে তোলা সহজ হয় নি। লক্ষ লক্ষ চাষী ও মজুরের অপরিসীম দুঃখভোগের মূল্যেই সোবিয়েত দেশ তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছে। প্রচারে বিভ্রান্ত হ'য়ে এই ঐতিহাসিক সত্যটি আমরা অনেক সময় ভুলে যাই। গণতন্ত্র বিসর্জ্জন না দিয়ে রাশিয়ার পথ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আপাতত অনুপস্থিত। বৃহৎ শিল্পের চমকপ্রদ প্রসার এদেশে আশা করা ভুল। স্বল্প-পুঁজি-নির্ভর উদ্যোগের স্বপক্ষে অন্যান্য নানা যুক্তিও আছে। (কুটির শিল্পে শ্রমের অনুপাতে পুঁজির প্রয়োজন কম, এ সিদ্ধান্ত অবশ্য সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; তবে এ দেশে, মনে হয়, বহুলাংশে গ্রহণীয়।) নিকট ভবিষ্যতে আমাদের এমন শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন যাতে বহু লোক সাধারণ হাতের কাজে দক্ষতা অর্জ্জন ক'রে নিজেদেরই উদ্যমে, অথবা সমবায় সংগঠনের পথে, ছোট ছোট নানা শিল্পে এবং বৈজ্ঞানিক কৃষিকর্ম্মে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিতে পারেন। বৃহৎ শিল্পের উপযোগী সুদক্ষ যন্ত্রবিদ সৃষ্টি করা আমাদের কারিগরি শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হলে চলবে না। একই কারণে অতিযান্ত্রিক মার্কিনী শিল্প পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণও এ দেশে কার্য্যকারী হ'তে পারে না।

ভারতবর্ষ আজ শিল্প বিপ্লবের প্রারম্ভিক পর্য্যায়ে। এই বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নূতন এক শ্রেণীর উদ্যোক্তা প্রয়োজন। এ বিষয়ে অন্যান্য দু'য়েকটি দেশের সঙ্গে ঐতিহাসিক তুলনায় এদেশের সমস্যা বোঝা সহজ হ'তে পারে। ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের পূর্ব্বে বিজ্ঞান চর্চ্চার ধারা শুরু হ'য়েছে; মধ্যযুগীয় মনোভাব কেটে এসেছে; এবং শিল্প-বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার উপযোগী এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেখা দিয়েছে। শিল্পের প্রসারে, উন্নততর উৎপাদনপদ্ধতির প্রবর্ত্তনে, এরাই উদ্যোক্তা ছিলেন; কাজকারবারে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ইংলণ্ডের তৎকালীন অর্থনীতিবিদগণ সমর্থন করেন নি। জাপানে কিন্তু শিল্পবিপ্লবের প্রাক্কালে অনুরূপ সংস্কারমুক্ত কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণী উপস্থিত ছিল না। সেখানে শিল্পবিপ্লবের প্রথম পর্য্যায়ে উদ্যোক্তার অংশ গ্রহণ করতে হ'য়েছে বহু পরিমাণে রাষ্ট্রকেই। ভারতবর্ষে, পাশ্চাত্যশিক্ষার আংশিক প্রসার সত্ত্বেও, দেশীয় ব্যবসায়ীশ্রেণী প্রধানত অশিক্ষিত ও অন্ধসংস্কারগ্রস্ত। চোরা কারবারী বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানকে উৎপাদন-প্রথার উন্নয়নকল্পে প্রয়োগবুদ্ধি এক নয়। বৃহৎশিল্পের ক্ষেত্রে এ-দেশেও উদ্যোক্তার স্থান পূর্ণ করতে হ'বে অনেকাংশে রাষ্ট্রকেই। একই সঙ্গে প্রয়োজন কুটিরশিল্পে ও ছোট কারখানায়—এবং বৈজ্ঞানিক চাষ-আবাদে—শিক্ষিত, বিজ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন যুবকদের উদ্যোগ। দামোদর পরিকল্পনার ফলে যে বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি হ'বে তাকে কুটির শিল্পে ও কৃষিকর্ম্মে ব্যবহার করতে হ'লে নূতন পরিবেশ ও নূতন মন দুই-ই চাই। শিল্পোন্নতির নূতন পথে শিক্ষিত বাঙ্গালী যদি আজ দলে দলে এগিয়ে আসেন তবে ভারতবর্ষের এই যুগসন্ধিক্ষণে বাঙ্গালীর কর্ম্ম একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্যের অধিকারী হ'বে।

ধনোৎপাদন প্রথার দ্রুত যান্ত্রিক পুনর্গঠনের যুগে যন্ত্রের প্রতি একটা অন্ধ মোহ বিস্তারের আশঙ্কা থাকে। যন্ত্রকে বর্জ্জন ক'রে বর্ত্তমান যুগের সমস্যার সমাধান নেই; কিন্তু মানবধর্ম্মহীন যান্ত্রিকতা সমাজ জীবনে কত কঠিন অনর্থের সৃষ্টি করে বিশ শতকের ইতিহাসে তার প্রমাণ বেদনাজনক। সোবিয়েত ও মার্কিন জীবনদর্শনের বৈষম্য সত্ত্বেও জড়বাদী আদর্শের প্রভাব দু'য়েতেই সুস্পষ্ট। যান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে মানবিক সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন ভারতবর্ষের নূতন যুগের একটি প্রধান সমস্যা। চণ্ডীদাস ও রবীন্দ্রনাথের বাংলায় মানবিক সংস্কৃতির একটি ধারা সুদীর্ঘকাল প্রবাহিত। বাস্তব জীবনে বাঙ্গালীর পরাজয় যতই প্রকট হ'বে, এই মানবিক সংস্কৃতিকে বাঁচায়ে রাখা ততই কঠিন হ'বে; পরাজয়ের তিক্ততা ক্রমশই আমাদের ঠেলে দেবে মানবতাবিরোধী নানা মতবাদের পথে। অপর পক্ষে, সংস্কৃতির সঙ্গে কারিগরির সমন্বয় সাধনকে যতই আমরা পথ হিসাবে বেছে নেব ততই জীবন নিয়ে ভারতবর্ষের আজকের পরীক্ষা নিরীক্ষায় আশা করা যায় যে বাঙ্গালীর দিকনির্দ্দেশ একটি যুগসৃষ্টিকর অর্থ লাভ করবে।

গড় শ্রীখণ্ড

অমিয়ভূষণ মজুমদার

[গতবৎসর গড় শ্রীখণ্ডের প্রথম পর্ব্ব প্রকাশিত হয়েছে। এবার দ্বিতীয় পর্ব্ব আরম্ভ হচ্ছে। গড় শ্রীখণ্ডের শ্রী খণ্ডে-খণ্ডে বিভক্ত। একটি সম্প্রদায়ের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেছেন লেখক যে-মাটিতে, সে-মাটিতেই অপর একটি সম্প্রদায়ের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হচ্ছে এখানে।—সম্পাদক।]

খুব যখন দুঃখ কষ্ট চলছে গ্রামে শ্রীকৃষ্টর দিকে লক্ষ্য করার মতো অবস্থা তখন কারো ছিল না। তাদের শত ছিদ্র নৌকার মতো সংসার কি ক'রে অতবড় দুর্য্যোগের সময়টা কাটাল এ খোঁজও কেউ নেয়নি। দুর্য্যোগ কাটলেও দেখা গেল শ্রীকৃষ্টরা আছে।

কিছুদিন থেকে রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্টর বাড়ীতে আসছে পড়ন্ত বেলায়। শ্রীকৃষ্ট তার দাওয়ায় জীর্ণ মাদুর বিছিয়ে মলাট ছেঁড়া ময়লা কাগজের মহাভারতখানি নিয়ে ব'সে থাকে। রামচন্দ্রকে আসতে দেখে সসম্ভ্রমে বলে—আসেন মোণ্ডল।

শ্রীকৃষ্টর চৈতন্যমঙ্গল ছেড়ে মহাভারত ধরার একটু ইতিহাস আছে। বারবার বৈষ্ণবীদের কাছে আঘাত পেয়ে সে বুঝতে পেরেছে, 'জয় রাধারাণি' বলার যোগ্যতা তার নেই। নিজের নাম শ্রীকৃষ্ট না ব'লে একসময়ে কেষ্টদাস বলতে সে সুরু করেছিল, আর 'রাধারাণি'র বদলে 'গুরু গোঁসাই'। তখন একদিন তার মনে হ'য়েছিল—বিরহ প্রেমের টানাপোড়েন আর নয়, বুকে যত জোর থাকলে বিরহের ঝড় ঝাপটাতেও নিশ্বাস টানা যায় ততটা কেন, তার তুলনায় কিছুই নেই তার। কিন্তু ধর্মগ্রন্থ না পড়লেও তো নয়, তারই ফলে আসে মহাভারত।

সারাদিনে তার একমাত্র কাজ সন্ধ্যায় ঘন্টাখানেক ধরে মহাভারত পড়া। আহারাদির ব্যবস্থা কি ক'রে হয় যে খবরটাও সে নেয় না। অনাহারে মৃত্যুর খবরগুলি যখন প্রথম কানে আসতে লাগল সে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ঘুরে বেড়াল, তারপর তার নিজের ভাষায়, তার দৃষ্টি এদিক থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্য ভগবান পাঠালেন ব্যাধি। বুকভরা ব্যাধি নিয়ে বিনা চিকিৎসায় ঘরের মেঝেতে সে পড়ে থাকত, কোথায় দিন, কোথায় রাত। ব্যাধি সারল, এক সময়ে সে উঠেও বসল, কাশি তাকে ছাড়ে নি, হাঁপানির রূপ নিয়েছে। কিন্তু সে মনে প্রাণে মেনে নিয়েছে, এ ব্যাধি ভগবানের আশীর্ব্বাদ। যে নৌকা চালানোর ক্ষমতা তার ছিল না, সেই নৌকার যাত্রী হিসাবে সে যদি ভয় পেয়ে ছটফট করত, তবে তার ছট্‌ফটানিতে নৌকা ডোবা অসম্ভব ছিল না। 'চোখ বেঁধে বৈতরণী পার করালে গুরু গোঁসাই।'

মহাভারতখানায় টোকা দিয়ে ধুলো ঝেড়ে ফেলে শ্রীকৃষ্টদাস মনে মনে বলে,—আর না, বাবা, এই কাশিতেই কাশি পাব। ও ঝঞ্ঝট যখন আপসে আপ খসে পড়ল, ব্যস্‌ আর নয়।

সম্মুখে রামচন্দ্রকে পেলে শ্রীকৃষ্ট বলে,—বুঝলেন, ভাই, আমি পলাইছি এবার, সহজে আর ধরা দিতেছি না।

সব সময়ে রামচন্দ্র উত্তর দিতে পারে না, কিন্তু প্রায়ই বলে,—কিছুই যেন্‌ ভালো না, গোঁসাই আমি কি করি বুঝি না।

শ্রীকৃষ্ট মুহূর্ত্তকাল সান্ত্বনা বাক্যের জন্য মনে হাতড়ায়, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে,—দ্রোণপর্ব পড়ি আজ, কি কন্‌ মণ্ডল ?

শ্রীকৃষ্ট দ্রোণপর্ব খুলে বসে, রামচন্দ্র একখানি রৌদ্রদগ্ধ মেঘের মতো বসে থাকে, বর্ষণের তেমনি নিস্ফল আগ্রহে বুকের ভেতরটা তোলপাড় ক'রে তার।

মহাভারত থেকে একসময়ে কীর্ত্তনের দিকে মনে গেল রামচন্দ্রদের। আকাশ বাতাসভরা অপমৃত্যুর ক্লিন্নতা. যেন শব্দ দিয়ে, ধ্বনি দিয়ে সে বাতাসকে খানিকটা নিশ্বাস নেয়ার মতো করা যাবে। ভক্তা কামার নিজে থেকেই খোল নিয়ে উপস্থিত হ'ল। তারপর থেকে সুরু হ'ল এদের কীর্ত্তন।

কীর্ত্তন বলতে সচরাচর যা বুঝি তা নয়। কতগুলি প্রৌঢ় বয়সি চাষী, মিস্ত্রী, কুমোড় প্রভৃতির বেসুরোগলায় প্রাণপণ চিৎকার আর তার সাথে বেসুরো মৃদঙ্গের শব্দ। দাঁড়িয়ে শুনলে হাসি পায়। এই পুরুষগুলির কারো পক্ষেই সঙ্গীত স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এদের কীর্ত্তনের ব্যাপার নিয়ে শুধু সান্যালমশাই ঠাট্টা করেন নি, সঙ্গীত সম্বন্ধে যার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে সেই করবে।

রামচন্দ্রর কথা ধরা যাক। পৃথিবীতে চাষ ও মাটি ছাড়া আর কিছু সে বোঝে বা জানে, তার প্রিয়জনরাও এতখানি গুণপনা তাকে কোনদিন বর্ষণ করে নি। মাটির রং দেখে, হাতের চেটোয় মাটির ডেলা গুড়ো ক'রে, জিহ্বায় স্বাদ নিয়ে জমির প্রকৃত মূল্য সে ব'লে দিতে পারে, কিম্বা জমির উত্তাপ হাতের তেলোয় অনুভব ক'রে সে অক্লেশে ঘোষণা করতে পারে বিনা বর্ষণে ধানের জমি তৈরী করার দুঃসাহস করা যায় কি না। কিন্তু অন্য অনেকের পক্ষে অসম্ভব এই কথাগুলি বলতে পারলেও ধান, জমি, চাষ এর বাইরে কথা বলতে তাকে ক্বচিৎ শোনা গেছে।

বাল্যকাল থেকে এই মাটির সাথে কতরকম সম্বন্ধই স্থাপন করেছে সে। সুখের দিনে মনে মনে পূজা করেছে, দুঃখের দিনে অব্যক্ত আবেগ নিয়ে বসে থেকেছে মাটির পাশে। জমিদারকে সে সম্মান করে, খাজনা দিতে আপত্তি করা দূরের কথা, বরং তাগাদা আসবার আগেই মিটিয়ে দেয়া তার প্রকৃতি, আর মিটিয়ে দিতে গিয়েও কত বিনয়, কত ভঙ্গি। বাহুল্য দেখে একবার স্ত্রী বলেছিল,—পাওনাদাররা যেন্‌ কুটুম, কত আদর, কত ছেদ্দা। রামচন্দ্র ব'লে ফেলল,—কও কি ? কুটুমের উপরে কুটুম। যার কাছে বৌ পালাম, আর জমি, দু'জনেই ধর যে একই সমান।

রামচন্দ্রের স্ত্রী একদিন অনুভব করেছিল, কথাটা সে বাড়িয়ে বলে নি। দুপুরের খাড়া রোদে সব কৃষক যখন গাছতলায় কিম্বা ঘরের তলায় তখনও রামচন্দ্র মাঠে। বলদজোড়া খেতের একপাশে দাঁড়িয়ে অতি পরিশ্রমে ধুঁকছে আর তাদের মালিক খেতের মাঝখানে মই দিয়ে সমতল করা জমির লক্ষ্যণীয় নয় এমন খাঁজগুলি পাঁচন দিয়ে টেনে টেনে মিলিয়ে দিচ্ছে।

—পাগল, হলা নাকি ? মাথায় রক্ত উঠবি।

রামচন্দ্র স্ত্রীর সাড়া পেয়ে গাছতলাটায় পৌঁছে খেতে ব'সে বলেছিল,—একটুক গায়ে হাত বুলায়ে দিলাম।

—উয়েরই তো দিবা।

স্ত্রীর মুখের দিকে খানিকটা চেয়ে থেকে পুলক-বিহ্বল গলায় ডাক ছেড়ে হেসে উঠে রামচন্দ্র বলেছিল,—কও কি ? কিস্তক বাড়ীতে গিয়ে জামাই যে।

সেই রামচন্দ্র যখন কীর্ত্তনীয়া হ'য়ে ওঠে, তখন চিন্তা না ক'রে ব্যাপারটা বোঝা যাবে না।

কিছুদিন আগে একজন প্রতিবেশী নিলাজের মতো, কিম্বা হয়তো অভ্যাসবশেই, চাষবাসের কথাটা তুলেছিল, জোর দিয়ে নয়, মুদ্রাদোষের মতো মুখে এসে গিয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই অন্য সকলের উদাসদৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে মূঢ় ব'লে মনে হ'য়েছিল তার।

রামচন্দ্রই কি বলতে পারে চাষবাস করে কি হবে। অতি বিশ্বাসীর বিশ্বাস নড়ে গেলে যা হয়, তার চাইতেও বেশী হ'য়েছে তার। যেখানে ছিল বিশ্বাসের দৃঢ়তা, এখন এসেছে ভয়ের অন্ধকার। নিজের ঘরের জীর্ণ দাওয়ায় বসে থাকা আর আকাশের দিকে তাকান ছাড়া কিছু করার নেই তার। তার চোখের সম্মুখে মাঠান জমি, হলুদে আগাছায় ভরে আছে। ফাল্গুন গেছে চৈত্র যায় যায়। সূর্য্যের কাছে তেজ পাচ্ছে না মাটি, রোদে পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে। ভোর রাতের কুয়াসা-গলা স্নিগ্ধতায় মাটি আর কোনদিন উর্বরা হবে না।

—বলার কি মুখ আছে আমার, এই ভাবে রামচন্দ্র। জমির জন্য, জমির লোভই তার মেয়েটির মৃত্যুর কারণ, এই তার বদ্ধমূল ধারণা।

দুর্ভিক্ষের প্রথম পদচারণে যখন জমির দাম কমে যেতে লাগল আর পাল্লার বিপরীত দিকের মতো চড়তে লাগল ধানের দাম তখন চৈতন্যসাহার কাছে সে ধান বিক্রী ক'রে জমি কেনার টাকা সংগ্রহ করেছিল, তখন কাজটা অস্বাভাবিক বোধ হয় নি। এদিকের সুগন্ধি আমন ধান যায় সহরে, আর সহর থেকে আসে কৃষকদের খাবার মতো কমদামি মোটা চাল। অনেক কৃষকই ধান বিক্রী ক'রে দেয় সামান্য কিছু বীজধান রেখে। রামচন্দ্র বুদ্ধি করেছিল খাবার ধান পরেও পাওয়া যাবে নগদ টাকা যদি থাকে, কিন্তু জমির দাম পড়েছে সেটা বাড়তে কতক্ষণ, কিন্তু তখন কেউ বুঝতে পারেনি ধানের দাম এমন সব মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। সে সময়ে যেটা সুযুক্তি ছিল এখন সেটা চূড়ান্ত বুদ্ধিভ্রংশতা ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

তার মেয়েটা বোধ হয় মেয়েদের মধ্যে নরমজাতের ছিল। এতটুকু অনাদর তার সইল না। অনাহারে নয়; কুআহারে সে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

জমি! জমিকে কুলটা ব'লেছে অনেকে অনেক বেদনার সময়ে। রামচন্দ্রর অনুভবটি ঐ কথাটার সাহায্যে সোচ্চার হয় না, কিন্তু ব্যর্থ পাপ-প্রেমের অনুরূপ একটা অনুশোচনা ও ক্রোধ তার বুকে জমে ওঠে।

রোদ পড়ার আগেই রামচন্দ্র শ্রীকুণ্ঠদাসের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়। শ্রীকুণ্ঠ থেমে থেমে বটতলার ছাপা জীর্ণ মহাভারত পড়ে। রামচন্দ্র ভাবে রাজা হরিশ্চন্দ্র, রাজা শ্রীবৎস এদের কি হ'ল ভাবো। রাজ্যে বিশ্বাস নেই, তার জমি।

কীর্ত্তন করে রামচন্দ্র। প্রাণের উদ্বেলতা উৎক্রোশ কণ্ঠে ছড়িয়ে দিতে থাকে। কীর্ত্তনের কথাগুলিতে এক চিরসুন্দরের স্নিগ্ধরূপ আঁকার প্রয়াস আছে, কিন্তু উচ্চারণটা অভিযোগের মতো, ক্ষুব্ধ অভিমানে ফেটে পড়ে বিরাগ জানানোর মতো।

চৈত্র যায় যায়। এই এক দেশ, শাল মহুয়ার নয়, ধানের এবং পাটের। ফাল্গুনে এখানে উদাস করা লালরঙ্ নেই, এখানে গৈরিক অবাস্তর। মাঠের দিকে তাকিয়ে চোখে পড়ে ফাট ধরা কালচে মাটি, মাঝে মাঝে বাবলাগাছ। গাছগুলির পাতা নেই, আছে শুধু শুকনো কাঁটা। প্রাণ শুকনো রোদে দাঁড়িয়ে আরও দৃঢ় আরও কর্কশ হবার তপস্যা করছে কাঁটাগুলি। উদাসীনতা নয়, অত্যন্ত গভীর মোহ।

চৈত্র যায় যায়, এমন সময়ে রামচন্দ্র কীর্ত্তনে মন বসাতে পারছে না। তার জামাই মুঙলা গতবৎসর চাষের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে যেন দেহাতিদের কোদাল দিয়ে জমি চষার মতো হাস্যকর একটা কিছু। কি ক'রে পারবে বলো মুঙলা বাইশ তেইশ বছরের একটি ছেলে অকরুণ পৃথিবীকে পরুষ সোহাগে করুণাবতী ক'রে তুলতে, এ সম্ভব নয়। তাকে সাহায্য করবে এমন চাষীও কাউকে চোখে পড়ল না।

কীর্ত্তনের সুর বাড়তে বাড়তে লয়ে দ্রুততর হ'তে হ'তে একটা নীরন্ধ্র শব্দদুর্গের সৃষ্টি করে, আর পরাজিত চাষীরা যেন তার আড়ালে মুখ লুকানোর জন্য প্রাণপণ করতে থাকে।

কার ধান আছে, কে ছিটাবে ধান! ধান ছিটানোর চিত্রটিতে যে পুলকের আভাস আছে, সেটা যেন মনের এই ধূসরপটে মানায় না। বাঁ হাতে ধামাভরা বীজধান চেপে ধরে, হাঁটার তালে তালে ডান হাতের মুঠি মুঠি ধান ধামার গায়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়ে খেতময় ধান ছিটানো!

কিন্তু অশান্তির শেষ নেই। গ্রামের অশান্তির কিছু কিছু অংশ রামচন্দ্রের গায়ে এসে পড়ে।

সে গ্রামের চাষীদের মধ্যে খানিকটা বিশিষ্ট। এ বৈশিষ্ট্যের কতখানি তার চরিত্রগত আর কতটুকু আকৃতিগত এটার বিচার করা কঠিন। প্রৌঢ়ত্বে পৌছেও যাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে তাদের চাল চলনে স্বভাবতই খানিকটা গম্ভীর্য্য থাকে। এ গম্ভীর্য্য রামচন্দ্রের ছিল; একটু অধিকন্তু ছিল তার। বোধহয় তার দু'পায়ের পেছনদিকের শিরা দুটি কোন কারণে ছোট হ'য়ে গিয়েছিল, তার ফলে তার পায়ের গোড়ালি দুটি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছোট হ'য়ে যায়। হাট থেকে যখন সে তেলের দুর্মূল্যতার কথা ভাবতে ভাবতে ফিরছে, হঠাৎ অচেনা লোকের তখন মনে হ'তে পারে—যেন একজন মল্ল। আখড়ার ধূলো উড়িয়ে পাঁয়তারা কষার অভ্যাস সাধারণ পদক্ষেপেও সংক্রামিত হ'য়েছে।

এমন হ'তে পারে, লোকে তার পায়ের খুঁতটির দিকে লক্ষ্য ক'রে ক'রে তার মনে এধারণাটা এনে দিয়েছে, সে দর্শনীয় কিছু। এরই ফলে সম্ভবত তার কথাবার্তাও নাটকীয় হ'য়ে পড়েছে।

তার ঠোঁটজোড়া মস্ত গোঁফ, নাকের নিচে সূক্ষ্মরেখায় দ্বিবিভক্তি। গোঁফ চারিয়ে দেয়া তার মুদ্রাদোষ। সময় নেই, অসময় নেই, পরম যত্নে সে গোঁফ চারিয়ে দেয়। যেহেতু গোঁফচারা দেয়ার সাথে আমরা খানিকটা বলস্পর্দ্ধা মিশিয়ে ফেলি, সেজন্য তাকে কখনো কখনো অপদস্থ হ'তে হ'য়েছে। শূন্য আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বেদনায় যখন মুখ বিকৃত হ'য়ে যাচ্ছে তখনকার গোঁফচারা দেয়াটা হাস্যকরও বটে।

সে যাই হ'ক রামচন্দ্রকে ওরা টেনে নিয়ে যায়। হরিশ শাঁখারির জন্য তদ্বির করতে তাকে যেতে হয় সান্যাল মশাইএর বাড়ীতে। তার কীর্ত্তনের আসরেও চাষবাসের কথা, জমি জমার কথা এসে পৌছায়।

হরিশ্চন্দ্রের ব্যাপার নিয়ে যেদিন সে সান্যাল মশাইএর কাছে গিয়েছিল সেই সন্ধ্যায় কীর্ত্তনের মুখে ভক্তা কামার তখন তার খোল নিয়ে ঠুকবুক্ করছে, হরিশ শাঁখারি ধুয়ো ধরার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছে, এমন সময়ে আর এক উপদ্রবের সূত্রপাত হ'ল।

রামচন্দ্ররা শুনতে পেল আর একটি কীর্ত্তনের দল যেন তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এরকম হয়, ছোটবেলা এরকম সে দেখেছে, গ্রামের বিভিন্ন পাড়া থেকে, ছোট খাট গানের দল এসে গ্রামের মাঝখানে, প্রায়ই রায় বাড়ীর দোলমঞ্চের সম্মুখে, একত্রিত হ'ত। তারপর সুরু হ'ত অষ্টাহব্যাপী কীর্ত্তনের উৎসব। বোঝ আর না বোঝ, শোন আর না শোন, খোলের বিরামহীন শব্দের সঙ্গে বহু কণ্ঠের শব্দ নেশায় আবিষ্ট ক'রে দেবেই এক সময়ে, মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করবে। তারপর এক সময়ে সেই দলে মিশে নাচতে সুরু করত গ্রামবাসীরা।

রামচন্দ্র হেসে বলল,—বোধায় তোমার পাড়ার হবি, হরিশ। বোধায় সান্ন্যাল মশাই কিছু হিল্লে করেছে।

শ্রীকুষ্ট বলল,—তুমি যখন গিছলা তখনই আমি মনে ব'লে পাইছি।

কিন্তু একি অদ্ভুত গান!

গাইতে গাইতে যখন ছোট দলটি কাছে এসে দাঁড়াল তখন রামচন্দ্র হো হো ক'রে হেসে উঠলো। রামচন্দ্র চিনতে পারল তার জামাই মুঙলা শ্রীকুষ্টদাসের ছেলে ছিদামকে। গানটার একটি কলি গাইছে মুঙলা, ছিদাম তার ধুয়া ধরছে, পালটে নিচ্ছে মুখে থেকে সুর ছিদাম, আখর দিচ্ছে মুঙলা। ঢোলকের তালে তালে মুঙলা গাইল—

চিতিসা চিত্তিরসাপ আসন খেতের বিষ
বিষের বায়ে সোনার ত্যাশে শুকায় ধানের শিষ্

ছিদাম আখর দিল ঢোলকে চাঁটি দিয়ে,—হায়রে আমন ধানের শিষ। মুঙলা তাল দিল তার ঢোলকে,—ছিদাম সুরে ধরল

—চিতিসা খুলল মরি জাহাজি কারবার
বেলাতে চালান দিল ত্যাশের যণ্ড হাড়—

মুঙলা প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ে আখর দিল,—হায় হায় শিশুমান্ষের হাড়। গানের দোলায় দোলায় শ্রীকুষ্ট বলতে লাগল—ঠিক্, ঠিক। রামচন্দ্র বললে,—কও কি, অ্যাঁ, কও কি? যেন চৈতন্য সাহার ব্যাপারগুলি এই প্রথম তার কানে গেল।

মুঙলা ও ছিদাম তখন বলে চলেছে, আকাশে ওড়ে হাউই জাহাজ, মহাজনী নৌকা লাগে ঘাটে। কোথা থেকে কি হ'য়ে গেল, কোথায় গেল ধান, কি হ'ল প্রাণীর। আর দেখ ঐ চিতিসাকে কপালে তিলক এঁকে একটি মাত্র দাঁত দিয়ে কি ক'রে নরনারীর মৃতদেহগুলি খেল, কি ক'রে পৃথিবীর মাটি যা আগুনে পোড়ে না, বন্যাও ফিরিয়ে দেয়, তাই গ্রাস করল।

রামচন্দ্র ও শ্রীকুষ্ট স্তব্ধ হ'য়ে গেল শুনতে শুনতে। ছিদাম বা মুঙলার এই প্রথম গান গাইবার প্রয়াস। সব সময়ে সুর লাগছে না। কিন্তু এই অদ্ভুত গান কোথায় শিখল তারা। রামচন্দ্রের বুকের মধ্যে—বাতাস পাওয়া আগুন হাঁ হাঁ করছে, শ্রীকুষ্ট কাঁদো কাঁদো মুখ ক'রে, বোকা বোকা মুখ ক'রে কেমন যেন ছট্‌ফট্ করছে।

চৈতন্য সাহা এ গ্রামের মহাজন। চিকন্দি ও সানিয়কদিয়ারের যুক্ত সীমান্তের কাছে তার দোকান। প্রতি বছর ধান ওঠার কিছুদিন পরেই হাজারমনি নৌকা এসে লাগে পদ্মার ঘাটে। নৌকার

মাঝিরা চৈতন্য সাহার পুরানো খরিদ্দার। লোহার কড়াই থেকে আলকাতরার টিন, তেল থেকে আম্‌সি এসবই তার দোকানে পাওয়া যায়, মাঝিরা কেনে। কিন্তু আকাশে অদৃষ্টপূর্ব হাওয়াই জাহাজের সাথে সাথে চৈতন্যসাহার কার্য্যকলাপ, অভূতপূর্ব হ'য়ে উঠল। অন্যান্যবার সে মাঝিদের হ'য়ে ধান কেনে, এবার সে নিজে থেকেই ধান কিনতে লাগল। সানিকদিয়ার থেকে বুধেডাঙা, বুধেডাঙা থেকে চিকন্দি আড়াআড়ি পারি দিতে লাগল সে। পদ্মার ঘাটে নৌকার ভিড় বাড়তে লাগল। মাঝির ও চৈতন্য সাহার একটা খেলা সুরু হ'ল। মাঝিরা বলে ছ'টাকায় উঠল ধান। চৈতন্য সাহা বলে সাড়ে ছয়ে আমাকে দাও। দশে উঠল দাম, দেড় টাকার ধান দশ ছাড়িয়ে বারো ধরল, চৈতন্য সাহা তবু কিনছে।

এক সময়ে ধান গেল ফুরিয়ে, বীজ ধানও ধরে রাখলো না কোন চাষী। হাতে নগদ টাকা নিয়ে চৈতন্য সার নিবুর্দ্ধিতার কথা উল্লেখ ক'রে হাসাহাসি করেছিল চাষীরা। কিন্তু সহর থেকে খাবার চাল আনতে গিয়ে চাষীদের হাসি শুকিয়ে গেল। দুদিনেই যেন সহরের সব দোকানদার খবর পেয়ে গেছে, চাষীদের ঘরে খাবার নেই। দু'একজন দোকানদার তো মুখের সামনেই ব'লে দিল, বিক্রী করব কি? কিনব।

এর পরই চাষীদের ছুটোছুটি সুরু হ'ল, হায়, হায়, চাল কোথায়। জমি, ঘর, যার যা সম্বল ছিল দুর্ভিক্ষের মুখে গুঁজে দিতে লাগল। আল ভেঙে গেলে চাষীরা যেমন দিক্‌বিদিক শূন্য হ'য়ে ফাটলের মুখে নিজের বস্ত্রখণ্ড পুরে দিয়ে আল বাঁধবার চেষ্টা করে, তেমনি ক'রে চাষীরা চেষ্টা করল। জমির দাম অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে গেল। প্রথমে বড় চাষীরা, ছোট চাষীদের জমি ধরার চেষ্টা করল, তারপর তারাও প্লাবনে ভেসে গেল। চৈতন্য সাহা এসে দাঁড়াল ক্রেতা হ'য়ে; এবার যেন সে সব কিনবে, পৃথিবী পায় তাও কিনবে। কোথায় ছিল এতটাকা তার কে জানে। কিন্তু সে যেন পাগল হয়েছে। এক বিঘা ধানের জমির দাম দশ টাকা বলে সে, শুনে প্রথম প্রথম চাষীরা না হেসে পারে নি। দেড়টাকার ধান বারোতে কিনেছে, একশ'র জমি দশে চায়। কিন্তু এদিক ওদিক ঘুরে তার ঘরে ফিরে এল চাষীরা—পনর টাকা হয় না?

—তা তুমি যখন বলছ, দশের উপরে আর আট আনা দিতে পারি।

—তাই দাও, তাই দাও, ছাওয়াল মিয়ে খায় নাই।

নিজের পাঁজরার একখানা হাড় খুলে রেখে দশটাকা আর কতগুলি খুচরো নিয়ে চলে গেছে চাষীরা।

নগদ দামে, রেহানে, খাইখালাসি বন্দোবস্তে চৈতন্য সা চাষীদের দশ আনা জমি গ্রাস করেছে।

গান থামলে রামচন্দ্র বলল,—এ তোরা শিখলি কোথায়?

—গুরুর নিষেধ, কবের পারব না।

—এ গান শুনলি, লোকে কি করি?

ছিদাম কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু লোকে কি বলবে, তার মীমাংসা করে দিল আর একজন লোক। এদের গানের সময়ে পথ চলতি দু চারজন লোক জড়ো হ'য়েছিল, তাদের মধ্যে একজন বললে,—কেন ভাই, গায়েন, আমাদের গাঁয়ে একদিন গান শুনাবা না?

—কোন গাঁ তোমাদের ?

—চড়নকাশি।

—তা যাব একদিন।

—যায়ো ভাই, যায়ো, আমার বাড়ীতে যায়ো সেখানে জলসা হবি। আমার নাম যাদো ঘোষ।

—তোমরাও কি চিতে সাকে চেন ?

—হয়। সে গোরুও কিনেছে আমাদের ঘোষেদের কাছে।

—যাব, ভাই যাব।

লোকটি চলে গেলে রামচন্দ্র আবার প্রশ্ন করল,—তোরা কি এখন গাঁয়ে গাঁয়ে এমন সব গান গেয়ে বেড়াবি ?

—হয়। নীলের গাজন ইস্তক এই করব আমরা। আপনেরাও ভগোমানের নাম করেন, আমরাও করি।

—এ কি তোদের ভগোমানের নাম, চিতি সা কি তোদের ভগোমান্ ?

একটু থেমে কথাটা গুছিয়ে নিয়ে ছিদাম বললে—ও আমাদের সব খালো, আর আমরা বললিও দোষ।

—ক'য়ে কি হয় ? রাস্তার লোকেক মুখ ভ্যাংচায়ে কি হয়, নিজের মুখে ব্যথা।

ছিদাম মাথা চুলকাতে লাগল।

মুঙলা বলল,—এখনও গান বাঁধা শেষ হয় নাই, মিহির সান্ন্যালের নামেও গান বাঁধা হবি।

রামচন্দ্র বললে,—সাবোধান। ত্যাশের মালিক, রাজা।

—কিসের রাজা, আমরা তার জমি রাখি না।

—ক'স কি। হাজার হ'লিও সান্ন্যালবংশ, রাজবংশ। এর জমি না রাখ, তার রাখ। কোন না কোন সান্ন্যলের জমি রাখ। তুমি কি মনে করছ, মিহির বাবুর নামে গান বাঁধলি, নোসল্লা করলি, সান্ন্যাল মশাই খুসি হ'ল। কি কও, শ্রীকুষ্ট ভাই।

—ঠিক কইছেন, মোওল, বললে শ্রীকুষ্ট। মিহিরবাবু কি ক্ষেতি করছে তোমাদের।

—আমাদের গ্রাম ছাড়া করতিছে।

—তোমাদের গাঁ ছাড়া করতিছে তোমাদের বাপরা জানল না ?

—আমাদের না হউক, শাঁখারিদের, বললে মুঙলা।

—শাঁখারি আর তোমরা এক হইছ ?

—এক হওয়া লাগবি। মরার সময়ে আগে তোরা পরে আমরা মরছি। মরে এক হইছি, বললে ছিদাম।

রামচন্দ্র ভাবল—হরিশ্চন্দ্রের ব্যাপারটা বোধ হয় এরা শোনে নি। সে বলল,—আচ্ছা, এক যদি হওয়া লাগে, বাপরা এক হ'ক। তোমরা ছাওয়ালরা এ সব কোর না।

ছিদাম মুঙলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাঁইগুই করতে লাগল। রামচন্দ্র মণ্ডল নিষেধ করলে ভাবতে হয়। সে সন্ধ্যায় কীর্ত্তন জমলো না! যারা এলো তারা এই গানের কথাই বলাবলি করল! কেউ

বললে,—ঠিকই করেছে ছাওয়ালরা, বেশীরভাগই বিষয়টির আকস্মিকতায় মুগ্ধ হ'ল। যারা গানের পদগুলি শোনেনি তারা পাশের লোকটিকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে লাগল।

অন্ধকার পথে বাড়ীর দিকে ফিরতে ফিরতে রামচন্দ্রের মনে পড়ল, গানের পদগুলি। ছেলেদের ছেলেমানুষির সম্মুখে হাসা উচিত নয়। হাসিকে দমন করার জন্য গোঁফ চারিয়ে দিল সে, কিন্তু হাসি নয় সবটুকু, গানের সুরগুলি যেন খেপাটে, আবার তার সেই অনুভব হ'ল। বুকের ভেতর হাঁ হাঁ করে জ্বলে উঠে। তার মেয়ের মৃত্যুর সাথেও কি গৌণভাবে চৈতন্য সাহার অদ্ভুত ব্যবসার যোগ নেই ? শোকের রূপ নিয়ে কলিজায় যা আত্মপ্রকাশ করে সেটা বাতাস-পাওয়া আগুন। গলার কাছে কান্না রামচন্দ্রের বুকপাট ফোঁপানোর মতো দুলে দুলে উঠল।

এর আগেও চৈত্রসংক্রান্তির জন্য গ্রামে গান বাঁধা হ'ত। এই গ্রামে ছিল নবীন, সে নিজের পরিচয় দিত—নবনে বুড়ো গাঁয়ের খুড়ো। সেই বাঁধত গান। দুর্ভিক্ষের প্রায় প্রথম গ্রাসে সে গিয়েছে। আর কেউ গান বাঁধেনি গত বছর। নবীন বুড়োর গানেরও বৈশিষ্ট ছিল, জমিতে স্ত্রী জাতীর গুণ দোষ, দুর্বলতা, সোহাগ-প্রিয়তা আরোপিত করার কথা সে-ই প্রথম এই অঞ্চলে চালু করেছে।

কিন্তু একী গান! বাড়ীর কাছাকাছি এসে রামচন্দ্র দাঁড়িয়ে পড়ল। কানের ভুল নয়। দাসপাড়ার ছিদাম-মুঙলার গান শোনা যাচ্ছে। দূর থেকে আখরগুলি কান্নার মতো শোনাচ্ছে।

রামচন্দ্র ভাবল,—এমন গান বাঁধল কে ? একি করল রা, এ কিসের সূচনা করল।

কত রাজপুত্রই তো পাথর হ'ল, তাই ব'লে কি তাদের আসার বিরাম আছে, নোতুন ক'রে আসছে, নোতুন ক'রে আসছেই তারা। রামচন্দ্রর মনোভাব একটা তুলনা দিয়ে বুঝতে সুবিধা হয়। এ যেন অশীতিপরা কোন নর্ত্তকীর প্রীতি লাভের প্রচেষ্টা, তার দৃষ্টি থেকে অনুপ্রেরণা পাবার আশা তার যৌবনের সেই নায়কগুলির বংশধরদের কারো। সে তো ভাবতে পারেনা অন্য দশজনের যেমন এ নর্ত্তকীর বেলাতেও অশীতি বৎসর ফসিল হ'য়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট।

রবিশস্যের সময় এটা। ধানের সময় নয় যে প্রকৃতি নিজে থেকে ধান দেবার জন্য সাধাসাধি করবে। গত আমন চাষ হয় নি এ অঞ্চলে। একেবারে কি হয়নি, যা হ'য়েছে তাকে চাষ বলে না। আর আউস ? কে বোনে আউস? পথ চলতে কোন চাষীর যদি ঘাস ভরা আগাছা ঢাকা আউসের খেত চোখে পড়ে তবু তার দৃষ্টি চক্‌চক্ করে না, মনে হয় না সে আউসের কথা ভাবছে। কানে আসছে চিকন্দীর সীমায় সীমায় সান্ন্যালদের খাস জমিতে, সানিকদিয়ারের খামারগুলিতে, চড়নকাশির আলেক সেখের জমিতে আউসের চাষের যোগাড় হচ্ছে। রবিশস্যও উঠছে। এমন কথাও কানে আসে সরষে এবার এ অঞ্চলে ভালো হ'য়েছে।

চিকন্দির গ্রামের ভেতর আর বুধেডাঙার মাঠে দু'একটি নিলর্জ কৃষক মাঠে নেমেছিল, কিন্তু সে সব চাষ নয় খেলা, যেমন খেলা খেলতে পারে রামচন্দ্রর জামাই মুঙলা কিম্বা শ্রীকুষ্টদাসের ছেলে ছিদাম। আর রামচন্দ্রই একা একথা বলে না। চৈতন্যসাও বলে বেড়াচ্ছে। সে নাকি চাষীদের বাড়ীতে ডাকিয়ে নিয়ে বলেছে,—খেলা খেললে হয় না, কাজ ক'রে খেতে হয়। গত সন টাকা দিছি কাজ কর নাই, খেতে নামে খেলা করলা, যে খেতে দশ মন হবি, হ'ল চার। এবার টাকা পাবা না।

এই বিস্ময়কর অথচ সত্য কথাগুলিই এই পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য। দু'বছর আগে জমির মালিক ছিল যে, আজ সে সেই জমিতেই মজুর। সকলের মনে হয় কিনা কে জানে, রামচন্দ্রর মনে পড়ে যাত্রায় শোনা সেই হীরার কাহিনী। হীরাকে যখন চাষীর ঘর থেকে বাবু বের ক'রে নিয়ে মোটরে চড়াল, হীরার স্বামীকে নাকি সেই বাবু ক'রে একটা চাকরি দিতে চেয়েছিল, মোটর গাড়ীর ধুলো ঝাড়ার কাজ। খাইখালাসিতে জমি আটকে চৈতন্য সাহাও নাকি তাই করছে। গত বছর খেতে না পেয়ে কৃষকরা যখন তার কাছে ধারে ধান কিনতে গিয়েছিল, তখন সে নোতুন ক'রে কাগজ লিখিয়ে নিয়েছে; ধান দিয়েছে চাকরান সর্ত্তে; একবছর জমিতে খেটে দেবার সর্ত্তের নিচে টিপসই দিয়ে ধান এনেছিল। কিন্তু কেউ কি পারে হীরার স্বামীর মতো মোটর গাড়ী ছাপ করতে। গতবছর চৈতন্য সাহার খেত-গুলিতে যে চাষ পড়েছিল তাকে সে জন্যই চাষ বলা যায় না। অবশ্য চৈতন্য সাহার ধার ধারে না এমন চাষী আছে। আছে গহরজান সান্দার, আছে আলেক সেখ, আছে ঘোষপাড়ার বাপ-বেটা দু'জন। কিন্তু দশ আনা জমিতে চৈতন্যসা ব'লে বেড়াচ্ছে—গতবছর ঠকায়েছ। এবার আগাম টাকা পাবা না। দরকার হয় বাঙাল আনাব, চাষ দিব।

ছিদাম মুণ্ডলার গান যেদিন প্রথম শোনা গিয়েছিল তার কয়েকদিন পর এক সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্টদাসের আসরে ধানের কথা উঠে পড়ল কথায় কথায়। স্বর্ণবর্ণ সেই সব ধানের কথা যা সেকালে ছিল ব'লে মনে হয়। সেই আমন ধানের শতেক নাম আওড়ান।

সেদিন ছিদাম-মুণ্ডলা তাদের গান করতে পথে বার হয় নি। ছিদাম বলল,—কেন, জেঠা, বোরোধান কি সোনার মতন হয় না?

রামচন্দ্র বলল,—হয় সব ধানই সেনো।

মুণ্ডলা বললে,—ছিদাম ভাই, তোমার ধানের কথা কও নাই বাবাকে?

কথাটা ব'লে ফেলেই ছিদাম লজ্জিত হ'য়েছিল, নোতুন বউএর কথা হঠাৎ গুরুজনের সামনে উচ্চারণ ক'রে গ্রাম্য ছেলেরা যেমন হয়।

—ধান ক'স কি? হা-হা।

হা-হা শব্দ দুটিতে রামচন্দ্র কি ইঙ্গিত করল বোঝা গেল না। চিকন্দি অঞ্চলে কেউ যদি কোন কালে বোরো ধান লাগায় তবে সেটা সখ ক'রে। দিঘা থেকে আসতে আসতে সড়কটা যেখানে পদ্মার পার ধরে চলতে সুরু করে সেই লবচড়ের সেখরা বোরো ধানের চাষ করে নিয়মিত ভাবে। চিকন্দি অঞ্চলের জমি উঁচু, প্রায়ই পদ্মার পলি পরে না। এদিকে বোরোর আবাদ নেই।

ব্যাপারটা ছিদাম বলল। নোতুন বিষয়ে অভিজ্ঞজনের পরামর্শ নেয়া ভালো। শ্রীকৃষ্টদাসের বাড়ীর পেছন দিকে আখড়ার পুকুরটায় এখন স্নান করার মতো জল নাই। সেটাকে এখন পুকুর না বলে পচাগাড়ে বলে, পুকুর গড়ায় অর্থাৎ খানায় পরিণত হ'য়েছে। শ্রীকৃষ্টর কাশির অসুখটা হবার আগে সে পুকুরের ঢালু পারে কচু, ওল, প্রভৃতি লাগাত। কিন্তু সেই পচা পুকুরের জলের ধারে, জলের মধ্যে নেমে গিয়ে চাষ দিয়েছে ছিদাম। প্রথম যখন সে চাষ দিতে সুরু করে তখন যে চেহারা ছিল এখন তা নেই। লবচড়ের সেখদের কাছে চেয়ে-চিন্‌তে বোরো ধানের কিছু বীজ সংগ্রহ করেছিল সে। এখন পুকুরটা একটা নিচু জমির রূপ নিয়েছে।

মুণ্ডলার চাষ আবাদের চেষ্টাও এমনই হাস্যকর বৈ কি। সে হয় তো ধানহীন দিনে ছিদামের মতো ধান-পাগলা হয় নি, কিন্তু সে তার শ্বশুরের পড়ে থাকা খেতে মটর মসুর লাগিয়েছে। সংসারও চালাচ্ছে, কিন্তু চাষ কি শুধু কায়ক্লেশে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা? তা হ'লে তো রামচন্দ্রও চাষ করছে। গত বৎসর সে ও তো দু'একদিন খেতে গিয়েছে, লাঙ্গলের মুঠিটা কিছু কালের জন্য ধরে মুণ্ডলাকে খেতে যাবার সুযোগ দিয়াছে।

রাবণের মৃত্যুর পর সদ্য-প্রসূত মহীরাবণও নাকি যুদ্ধে নেমেছিল। রামচন্দ্র বোকা-বোকা মুখ করে বসে গোঁফ চোমরাতে লাগল।

(ক্রমশঃ)

পুরুষ:

কাথায়নী মিছে কান্না কেন?
সন্দেহে আর্ত্ত আর না যেন
মনে মেঘ-সন্ধ্যা প্রদোষ আসে,
আশ্বিন আনব ফুলের ঘাসে।

নারী:

তুমি কি করো নি অনুভব
বুকের সে কাঁপা-কাঁপা পাপ
কথায় পাওনা সৌরভ
কেন মিছে বলছ প্রলাপ?

ভারত-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ

ইন্দ্রজিত্

[পূর্ব্বানুসৃতি]

নবদ্বীপের সব বাড়ীই যেন ভেঙে গিয়েছে যুগদেবতার ডাকে :

কাঁদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া
লেপটাইয়া লোটাইয়া ক্ষিতিতলে।
হা নাথ কি করিলে অকুলে ভাসাইয়া গেলে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে ॥

স্বর্ণাধার জল প্রস্তুত হল সমুদ্রে মেশবার জন্যে

চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস
তার শুক্ল পক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।

নবদ্বীপচন্দ্র যে দেশে যান, সে দেশেই পূর্ণিমার আলো ছড়ায়, নভচন্দ্রে দুই পক্ষ, কৃষ্ণ আর শুক্ল পক্ষ। কিন্তু নবদ্বীপচন্দ্রের শুধু শুক্ল পক্ষ। চলারই বা কি বিচিত্র গতি, যে পথেই যান সে পথেই যেন—

চলইতে চরণে সঙ্গে চলু মধুকর
মকরন্দ পানকি লোভে
সৌরভে উনমত ধরণী চুম্বয়ে কত
যাহা যাহা পদচিহ্ন শোভে

চৈতন্য দেখতে গেলেন উড়িষ্যার জগন্নাথের মন্দিরের চূড়ো। পনের শতকের দেব-মানব কিছুকা এখানে থাকবেন।

নতুন শাস্ত্রকারেরা পরাজিত হল নিজেদের গোঁড়ামীর জন্যে, তার পরিণামে বুদ্ধবাদীদের পেছ তাদের নিজেদেরও দিন শেষ হোল মুসলমান শাসকের দেশাক্রমণে।

নতুন শাস্ত্রকারদের অস্পৃশ্যতাবোধ ব্যাধিতে পরিণত হোল, সেই সময়ই মুসলমানরা দেশাক্রম করবার সুযোগ গ্রহণ করল।

চৈতন্য দেখলেন জাতি আজ আর মহাজাতি নেই, মহাজাতি খণ্ড খণ্ড হোয়ে স্বাতন্ত্র্য লা করেছে, কেউ কাউকে তেমন ছোঁয় না, কেউ কারুর তেমন খবর রাখে না। নৌকো চলছে দাঁড়ে দাপ কিন্তু হাল ধরে রাখবার কেউ নেই। নৌকোর গতি আছে কিন্তু গতি স্থির নেই।

বুদ্ধের মতন আবার পরিত্যক্তদের ডাক দিলেন চৈতন্য। যে শত্রুতা করতে গেলো, তার কা নিজেই ধরা দিলেন যেচে। চণ্ডীদাসের মতবাদের আধুনিক সংস্করণই চৈতন্যবাদ। বুঝলেন তিনি জাতিকে আবার গড়তে হোলে, জাতির মনে আনন্দ আনতে গেলে সকলকে আগে এক করতে হবে

একই সূত্রে গাঁথতে হবে নিপীড়িত আর মুসলমানদের। গানের ভেতর দিয়ে দীক্ষা দিতে হবে মানুষের কানে।

বাংলা দেশ জাগার পর তিনি গেলেন উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরীতে, থাকবেন বলে কিছুদিন, এ থাকা তার পূর্ণ উদ্দেশ্য-মূলক।

পুরীতে জগন্নাথ দর্শনপ্রার্থীরদল আসে দাক্ষিণাত্য এবং বাংলাদেশ এই উভয় দেশ থেকে, বলা বাহুল্য, উড়িষ্যার কথা। সুতরাং এই জায়গায় তাঁর কেন্দ্র স্থাপন করলে তিনি তিনটি দেশকেই একসঙ্গে স্পর্শ করতে পারবেন। চৈতন্যের এ চিন্তা ছিল নির্ভুল। উড়িষ্যার প্রতিনিধি তিনি পেলেন বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে, যিনি পণ্ডিত। উড়িষ্যা তখন বুদ্ধবাদের নির্য্যাতশেষ স্বরূপ।

পনের শতক চৈতন্যের যুগ। আর চৈতন্য যুগটা শুধু শাস্ত্রের যুগ নয়, ন্যায়শাস্ত্রের যুগ। তাই তিনি শাস্ত্রকারদের কেন্দ্রে কৃষ্ণকীর্ত্তন গাইলেন, পেছনে দোহার গাইলো নিপীড়িতেরা। ধর্মযাজকদের সঙ্গে তিনি ধর্মে-মতিদের সমন্বয় ঘটাতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

গোটা জাতকে ঢেলে না সাজালে আবার সে জাত দুর্ব্বল হবে আর সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ নেবে শাসকেরা। তাই সকলের জন্যে তাঁর সার কথা হোল :—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরব্যথা।

ঠিক তিনবার ওঁ শান্তি বলে শাস্ত্রকাররা সাধারণদের একদিন শান্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেই সাধারণ ঠিক তিন কথাতেই তার উত্তর দিয়েছিল গচ্ছামি বলে, পনের শতকের চৈতন্য সেই চলে যাওয়া লোকদের ডাক দিলেন ঠিক তিনবার হরের্নাম বলে।

বুদ্ধদেব অজ্ঞদের বুকে নিয়েছিলেন কিন্তু বেদজ্ঞদের নয়। কিন্তু চৈতন্য বুকে নিলেন বেদ, আলিঙ্গন করলেন বেদজ্ঞদের আর মাথায় নিলেন অজ্ঞদের।

বুদ্ধের স্বপ্ন, চণ্ডীদাসের সাধনা আর অদ্বৈতের কামনা একসঙ্গে সার্থকতা লাভ করলো চৈতন্যবাদে।

উড়িষ্যা থেকে চৈতন্য তার মানব প্রীতির ধর্ম ছড়াতে লাগলেন। তাঁর অমানীনা মানং দেয়ং ধর্মমতে কাজ আরম্ভ করলো বাংলাদেশ নিত্যানন্দের নিজ পরিচালনায়, বুঝতে আরম্ভ করলো উড়িষ্যা বাসুদেব সার্ব্বভৌমের মন দিয়ে, আর শুনতে পেল দাক্ষিণাত্য রায় রামানন্দের কান দিয়ে। এরপর মালা গাঁথার কাজ তাঁর সার্থক হোল, ছোট মালা পরিণত হোল বড় মালায়, সে মালায় গাঁথা পড়তে বাদ পড়লো না কেউই বোধ হয়। ভারতের প্রান্তর থেকে প্রান্তর ঘুরে তিনি আলিঙ্গনের অভিযান আরম্ভ কোরলেন। যেখানে তিনি নিজে গেলেন না সেখানেও তাঁর আদর্শ চলে গেল। এ আদর্শের পূর্ব্বাভাষ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকাশ পেয়েছিল, পাঞ্জাবে শিখ গুরু নানকের ধর্মে আর উত্তর ভারতে কবীরের বাণীতে। বুঝেছিলেন নানক, মানুষের কি যেন একটা অভাবের জন্যে আজ সে অমানুষ, আজ সে জীব মাত্র, মানবতাহীন।

মুসলমান তখন শুধু প্রদেশ-শাসক নয়, সমগ্র দেশ শাসক, পঞ্চদশ শতকের পঞ্চনদীর তীরবর্তী

গুরু নানক বুঝলেন হিন্দু মুসলমানকে তার নিজের দেশে একসূত্রে গাঁথার চেষ্টা করবেন, ঘটাতে চেষ্টা করবেন শাস্ত্রীয় ও মুসলমান সমন্বয়, কিন্তু এই সমন্বয় যদি আংশিক সাফল্য লাভ করে তাহলে সেই অংশটিই একটি নতুন সম্প্রদায়ে পরিণত হবে একথা স্থির বুঝলেন। হোলও তাই।

দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল শিখ, নির্ম্মল নির্ভিক বুদ্ধবাদের পর থেকেই গুরুবাদের জন্ম বলা যেতে পারে একদিক থেকে। পরবর্ত্তী নতুন শাস্ত্রকারদের সময়ও এই গুরুবাদ তার নিজের পথ ঠিক মতন করে চলে আসছিল। কোন যুগে এর বিপুল আকার আবার কোন সময় ক্ষীণ। চৈতন্য-দেবের যুগে এই গুরুবাদ বিরাট আকার ধারণ করল এবং মুসলমানদের মধ্যেও এ বাদ প্রচলিত হোল মুর্শিদ নামে। গুরু নানকের মনে এই গুরুবাদই প্রথম উদয় হোল যেটার ভিতর দিয়ে তিনি শিখ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করলেন। নানক প্রবর্ত্তিত শিখরা কোন মূর্ত্তি উপাসনা করত না। তার কারণ সমন্বয়-ধর্ম্মের মূর্ত্তি তৈরী করা দুরূহ ব্যাপার। একথা নানক জানতেন।

চৈতন্য ধর্ম রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তির প্রতি চৈতন্যযুক্ত জনসাধারণকে আকর্ষিত করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সে সময় কিছুলোক এই ব্যাপারটা ঠিক উদার ভাবে নেননি। অনেকের মনে হয়তো সেদিন এ প্রশ্নের উদয় হোয়েছিল, যে, চৈতন্যবাদ নতুন শাস্ত্রকারদের আধুনিক সংস্করণ কি না।

কিন্তু নানককে দেখতে পাওয়া যায় যে যিনি এ বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন, তিনি হিন্দু মুসলমানদের সমন্বয়ে শিখ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করে কোন নতুন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা না করে করলেন তাঁর বাণীর প্রতিষ্ঠা, তিনি তাঁর বাণীগুলো পুথির আকারে দিয়ে গেলেন শিখ সম্প্রদায়ের হাতে, বলে গেলেন তাঁর বক্তব্যের মর্মার্থে আমার এই উপদেশগুলোকেই মেনে চলতে চেষ্টা কর, তাহলেই তোমাদের উপর দেবতা সন্তুষ্ট হবেন, এ বাণী সকল গ্রহণ কর মিলিত ভাবে, কারণ সকলের মিলিত হওয়ার আবেদন আর আনন্দের সঙ্কেত ছড়ান আছে এ সমস্ত বাণীতে। নানকের সে বাণীর গ্রন্থ পরিণত হোল গ্রন্থ সাহেবে, নানক তাঁর পরবর্ত্তী যুগে বিরাজ করতে লাগলেন তার নিজের পুঁথির পাতায়।

কিন্তু শিখ জাতি যোদ্ধা জাতি হোল, সে জাতি ধর্ম্ম যাজকের কাজ করলো না পরবর্ত্তী যুগে। নানক থেকে সুরু করে গোবিন্দ সিং পর্য্যন্ত শুধু যাজক বৃত্তি অবলম্বন করে থাকলেন কিন্তু তার পর আর তেমন কেউ নয়। সে ধর্ম্ম নিজেদের দেশে শুধু মাত্র চলতে লাগল বংশানুক্রমে কিন্তু অন্য প্রদেশে নিজেদের স্বধর্ম ছাড়বার তেমন কোন সুযোগ পেলনা।

রাজপুত জাতির চিত্রকলা থেকে আরম্ভ করে অনেক স্থাপত্য শিল্প যেমন মুসলমান রাজপুতের সংস্কৃতির সমন্বয়ের প্রতিবিম্ব পড়েছিল তেমনি শিখ সম্প্রদায়ের অনেক চিত্রকলার ভিতরে মুসলমান শিল্প অজানিতে হোক বা জানিতেই, প্রবেশ করে গিয়েছিল।

ভারত ভূমির ওপরে মুসলমান ধর্ম তখন নবাগত হোলেও সুপ্রতিষ্ঠিত। এদিকে শাস্ত্রের গোড়ামী-গুলো যুগ পরিবর্ত্তনকে অন্তত আংশিক স্বীকার করে উদার হোল না এতটুকুও, ভাবল উদার হওয়া বোধ হয় ছোট হওয়া। আবার তেমনি আর একদিকে ইসলাম ধর্মও গোলাপী অহঙ্কারে আঙ্গুল বোলাতে লাগল, ভাবটা এই যে আমরাই বা কেন ছোট হতে যাব আর্য্য শাস্ত্রবাদীদের কাছে?

উত্তর ভারতে শাস্ত্রবাদীদের আর ইসলামবাদীদের ভেতরকার গোঁড়ামীর সংঘর্ষ ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করলো। কেউ কারুর সঙ্গে মন মেলাতে চায় না, ছোট হওয়ার ভুল ধারণা তখন এদের দুই দলকেই পেয়ে বসেছে।

দুই ধর্মের নেতারাই দুই ধর্মের মিলন বা সমন্বয় ব্যাপারে বিবেচিত হোলেন অনুপযুক্ত সুতরাং শাস্ত্রবাদীদের ভেতর থেকে যে ভক্তিবাদের প্রচলন অনেক দিন আগে দেখা গিয়েছিল, দ্রাবিড়াঞ্চল দাক্ষিণাত্যে যার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রামানন্দ, সেই রামানন্দই উত্তর ভারতে এসে ইসলাম আর শাস্ত্রের মিলন চেষ্টা করলেন। ইসলাম পক্ষ থেকে সুফীবাদীরা বেরিয়ে এলেন রামানন্দের আন্দোলনে মিলিত হওয়ার জন্যে। রামানন্দের পরিচালনায় যে শাস্ত্র আর ইসলামবাদের সমন্বয়ে চেষ্টা আরম্ভ হোল তার অন্যতম প্রধান প্রচারক কবীর।

কবীর তাঁর স্বরচিত দোহাবলীর ভেতর দিয়ে এই দুই জাতিকে আলিঙ্গন করতে চেষ্টা করছিলেন। পাঞ্জাবে গুরু নানকের সমন্বয়বাদ, উত্তর ভারতে কবীরের সমন্বয়বাদ আর বাংলা দেশে চৈতন্যের সমন্বয়বাদ, এই তিন প্রদেশে প্রায় একই সময় সমন্বয় অভিযান আরম্ভ হয়েছিল।

কিন্তু দেখা গেল যে চৈতন্য নিজেকে ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর দরদ মাখান সুর শুনতে পায়নি এমন লোক বোধ হয় ভারত-ভূমিতে ছিলনা।

চৈতন্যকে আর দেখা গেলনা। কালের অন্তরালে তিনি চলে গেলেন, কি সিন্ধুর অতলে ডুবে নিজেকে অমর করলেন সে ইতিহাস বোধহয় আজও তমসা মাখনো, কিন্তু যে অনুপ্রেরণা তিনি পনের শতককে দিয়ে গেলেন সেটা বোধ হয় বর্ণনার ভাষাতীত।

চৈতন্য-যুগ যেমন আনন্দের তেমনি মানবিকতার উন্মেষের, তেমনি পদাবলী রচয়কদের একান্ত আপনার।

অনেকের মত যে চৈতন্য তাঁর নিজের ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মকে সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু বঙ্গীয় বৈষ্ণববাদের মূল গ্রন্থগুলি পড়লে বুঝতে পারা যাবে যে তিনি কোন ধর্মের মতকে অসম্মান করতেন না।*

সমন্বয়বাদ আর অমানীনা মানং দেয়ং যার চারিত্রিক ধর্ম, যার জীবনের ব্রত, সে লোক অন্য ধর্মের মতকে খণ্ডন করতে পারে স্বকীয় যুক্তির জোরে কিন্তু অসম্মান করতে পারেনা।

চৈতন্য যুগের মতনই তাঁর পরবর্ত্তী যুগ, যে যুগে এক প্রাদেশিক বৈষ্ণববাদীর সঙ্গে অন্য প্রদেশের বৈষ্ণববাদীর একটা অন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

চৈতন্যের ঠিক পরবর্ত্তী যুগ পদাবলী কাব্যের যুগ, প্রথম জীবনী লেখার যুগ, প্রথম প্রাত্যহিক সংবাদ কড়চা লেখার যুগ, চৈতন্য যুগ পণ্ডিতদের যুগ কিন্তু পাণ্ডিত্য প্রকাশের যুগ নয়। [ক্রমশঃ]

---

* ত্রিবেণীতে, কলিঙ্গে, অন্ধ্র দেশে তিনি ধর্ম্ম-পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং জয়লাভ করেছিলেন। সিন্ধুতে তাঁর দেহ মিলিয়ে যাবার কিম্বদন্তী কোন্ সিন্ধুতীরের কাহিনী নিয়ে তৈরী তা অনুসন্ধান-যোগ্য।—সম্পাদক।

সাংস্কৃতিকী

ভারতীয় চিত্রকলায় শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু

প্রাচীন ভারতের সিংহনগড়ের চিত্রকলা অথবা প্রসেনজির চিত্রশালা যেদিন প্রথম নবীন যুগে পদার্পণ করল সেদিনটি কোন্ জাতির সূর্য্যোদয়ে প্রকাশিত, তা নিয়ে কোনো গবেষণা হয়নি। যদি কেউ গবেষণা করেন, আশাকরি তিনি অজন্তা-চিত্রাবলীকে স্মরণ করে ভারতের খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের কথা চিন্তা করবেন। তখন ভারতবর্ষে মৌর্য্যোত্তর যুগ চলেছে। বিদিশায় প্রাচ্যভারত দানসত্র নির্ম্মাণ করছেন, ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার করছেন, আর তখনই অজন্তার গুহাগাত্রে বজ্রলেপনের উপর চিরস্থায়ী ছবি আঁকা হ'য়েছে। বিদিশার দানসত্রে বাংলা-লিপির উদয়ে আমরা জানতে পারি বাঙালীরও সেদিনকার সংস্কৃতিতে বিশেষ একটি স্থান ছিল। তাছাড়া 'অজন্তা'-কথাটিও আমাদের মনে বাংলা-ছড়ার 'জন্তি গাছটি'র কথা-চিত্র ছড়িয়ে দেয়। 'দিকৃনগরের' মেয়েকে আমরা দেখতে পাই হয়ত জন্তিয়া-পাহাড়ে:

'পরনে তার ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে'

ডুরে-শাড়ি-ঘুরে-পড়া মেয়েদের ছবি অজন্তায় আঁকা হয়েছিল।

অজন্তার চিত্রাবলীতে একটি হস্তী-স্নানের দৃশ্য আছে। মনে হয়, কালিদাস এ দৃশ্যটি দেখেই রঘুবংশের নর্ম্মদা-তীরের শোভা এভাবে বর্ণনা করেছিলেন:

"অথোপরিষ্ঠাদ্ ভ্রমরৈর্ভ্র মন্তিঃ প্রাকৃসূচিতান্তঃ সলিল-প্রবেশঃ
নির্ধৌত-দানামলগণ্ডভিত্তির্বন্যঃ সরিত্তো গজ উন্মমজ্জ···"

কালিদাসের রঘু যে-ই হয়ে থাকুন, মোটের উপর গুপ্ত-যুগেয় হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে (বিক্রমাব্দে যে-যুগের সুরু) অজন্তা-গুহার শিল্প-ভাণ্ডার এমন সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত হতে পারতনা। তারপর চালুক্য-যুগ পর্য্যন্ত হাজার বছরের ভারতীয় চিত্র-কলা অজন্তার গুহাবলীতে সঞ্চিত ও রক্ষিত হয়েছে।

বাংলা-দেশের চিত্রাঙ্কণ-পদ্ধতি কেমন ছিল, ঠিক অজন্তা-ভঙ্গীতে নরনারী-পশুপক্ষী পত্রপুষ্প চিত্রিত হত কি না, তা জানবার উপায় থাকলেও এ-শতকের গোড়ার দিকে ছাড়া তেমন উৎসাহ বাঙালীর মনে জাগ্রত হয়নি। তখন বাঙালীর ঘরে-ঘরে রবি-বর্ম্মার আঁকা ছবি শোভা পেতো। রবি-বর্ম্মার মনে অজন্তা-চিত্রাবলী খানিকটা প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে মনে হয়। কালিঘাটের পটের বাজার কলকাতায় কেমন ছিল আমরা জানিনে, তবে পুব-বাংলা থেকে যাঁরা কলকাতা আসতেন, চিত্রোৎসাহী হলে তাঁদের কেউ কেউ রবি-বর্ম্মার আঁকা ছবির মুদ্রিত প্রতিরূপ কিছু-কিছু কিনে নিয়ে যেতেন। দেব-দেবীর ছবি নয়, রামের সমুদ্র-শাসন, শকুন্তলা, মারাঠী পার্শী-বিউটি এইসব।

ঠাকুর পরিবার এ-শতকের বাঙালীর সংস্কৃতির বাহক হবেন এ-যেন বাংলার ইতিহাস-পুরুষের অমোঘ ইঙ্গিত ছিল। বাংলাদেশের চিত্রকলার উজ্জীবনও এই পরিবারের দান। অবনীন্দ্রনাথ যেদিন তুলি আর রঙ হাতে নিলেন, সেদিন হয়ত তিনি জানতেননা যে বিশ-শতকের 'ভারতীয়

চিত্র-কলা'-সরস্বতী তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। মৌর্য্য-যুগ থেকে সুরু করে রাজপুত-যুগ পর্য্যন্ত যতো জাতি তাঁদের সংস্কৃতিঃ ধারা ভারতীয় সংস্কৃতির স্রোতে এনে মিশিয়ে দিয়েছেন, অবনীন্দ্রনাথ ততো জাতির শিল্প-পদ্ধতি অনুধাবন করে ভারতীয় চিত্রকলার যে সমন্বিত রূপ ধ্যান ও দান করে গেছেন তা তুলনাহীন। তবে তাঁর ধ্যানে দ্রাবিড়-ভঙ্গীর অসংস্কৃত রূপাবলী ধরা দেয়নি। সে-রূপ ধরা দিল শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসুর তুলির মুখে প্রথম।

সম্প্রতি আর্ট কলেজে শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসুর আঁকা ছবির একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। তিনি যে-যে অধ্যায় অতিক্রম করে আজ বাঙালীর প্রিয় শিল্পাচার্য্য সে সব-ক'টি অধ্যায়ের চিত্র সংগ্রহ করে উদ্যোক্তাগণ জনসাধারণের নিকট অশেষ ধন্যবাদ-ভাজন হয়েছেন। জনসাধারণ আজকাল ছবি কিনবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত কিন্তু ছবি দেখবার আগ্রহ তাঁদের পুরোপুরিই আছে। অবশ্য 'চিত্র-গৃহে'র ভীড় চিত্র-প্রদর্শনীতে হয়না এবং তা হওয়া-ও হয়ত উচিত নয়। হলে দর্শকরা গলদঘর্ম্ম হন কিন্তু গলদঘর্ম্ম হয়েও অনেকে ছবির মর্ম্ম বুঝতে পারেন না।

কৃতবিদ্য কোনো শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম্ম বোঝা আর শিল্পের ঐতিহ্য বোঝা সমান কথা। এমন সংস্কৃতিবান, দর্শক, শ্রোতা বা পাঠক আজ-পর্য্যন্ত কোনো দেশে ভোটার তালিকার সংখ্যায় গিয়ে পৌঁছয়নি। সুতরাং উৎকৃষ্ট শিল্প-কর্ম্ম খানিকটা অখ্যাতিও পেয়ে যায়।

সাধারণভাবে শিল্পী তিনটি অধ্যায়ে আপন শিল্পসত্তা নির্ম্মাণ করতে চান। প্রথমত, অতীতের কর্ম্মময় ও ভাবময় দিনগুলো তাঁর পেছনে ছায়া ফেলতে সুরু করে। দ্বিতীয়ত, তিনি সেই ছায়াগুলোকে তাঁর বর্ত্তমানের আলোতে আহ্বান করেন। তৃতীয়ত, আলো-ছায়ার মিশ্ররূপ তিনি অনাগত ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করে দেন। কাজেই শিল্প-কর্ম্মে বাস্তব আর স্বপ্ন রাসায়নিক মিশ্রণে উপস্থিত থাকে। শিল্পরসপিপাসু আপন-আপন অভিরুচি অনুসারে স্বপ্নের বা বাস্তবের রস তা থেকে পেতে পারেন না। প্রকৃত রসাস্বাদ করতে হলে পিপাসুকে শিল্পীর সত্তায় বসবাস করতে হবে।

শিল্পাচার্য্য নন্দলালের চিত্রবিদ্যাচর্চ্চা-ও এম্নি তিনটি পর্য্যায়ে বিকশিত। বিচিত্র রঙের খেলার পর সাদা-কালোর আলো-ছায়ায় তিনি কিছুকাল বসবাস করেছেন। অজন্তা-বাঘগুহার মহাভারতীয় অধ্যায়ে এসে যখন তাঁর মনে সতী-দাহের নিষ্ঠুরতায় পরিসমাপ্তির লাভ করল তখন তিনি ইতিহাস-পুরুষের ভঙ্গীতে মগধের ঐশ্বর্য্য-বীর্য্যের দিকে তাকালেন। কিন্তু সেখানেও—ধর্ম্মের অতি-ভাষণের আড়ালে তিনি দেখতে পেলেন 'কুণাল-কাঞ্চনমালা'র ধূলি-ধূসরিত জীবন। সে-জীবন মগধের বর্ণাঢ্য ইতিহাসের রঙে রঙীন নয়—বিবর্ণ, দ্বিধা-সমাকুল, পেন্সিলের দাগের মতো অনুজ্জ্বল-মসীলিপ্ত। শিল্পী আঙ্গিককে বিষয়ের সহোদর করে নেন। অঙ্গারে যে ছবি আঁকতে তাঁর মন যায়, সে-ছবির বিষয়ও থাকে অঙ্গারানুভাবী। প্রাচ্য জীবনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঠিক অঙ্গারের মতো নয়—সীসার মতোও নয়—তার চাইতে হাল্কা। শিল্পাচার্য্য নন্দলাল পেন্সিলের দাগের সঙ্গে প্রাচ্যের প্রাচীন জীবনের রঙের মিল খুঁজে পেয়েছেন।

সাম্প্রতিক কালের চিত্রাবলীতে অতীত থেকে পাওয়া মসীকেই তিনি রূপের বাহন হিসেবে অবলম্বন করেছিলেন। তবে তমসাবৃত হয়েও সে-রূপ কাগজী সাদায় আলোর উঁকি-ঝুঁকি আনে। আর মূর্ত্তির রূপগুলো এনে দেয় দৃঢ় পদভঙ্গী। সে-পদভঙ্গী স্থাবর-জঙ্গমের উভয়-বিধ গতি নির্দ্দেশ

করে। 'বন' কথাটি থেকে যদি 'বঙ্গে'র জন্ম হয়ে থাকে, তাহলে তিনি এ-অধ্যায়ে খাঁটি বাঙ্গালী ঘরোয়ানা শিল্পের আত্মাপুরুষকে রূপায়িত করেছেন বালা যায়। একসময়ে আর্য্যরা বাঙ্গালীকে বুনো বলেই আখ্যাত করেছেন—পক্ষীও বলা হত বাঙালীকে। শিল্পাচার্য্য নন্দলাল এই সব অখ্যাতি স্বীকার করে নিয়েই বাঙালী। তাঁর সাঁওতালী-জীবন প্রীতির মূল এখানে। সর্ব্বশেষেও যে ছবিটিকে তিনি আমাদের চোখের উপর তুলে ধরেছেন, তাতেও করমণ্ডলের 'হুলিয়াদের সমুদ্র-যাত্রা' দৃশ্য। এ-দৃশ্য আমাদের মনে কালিদাসের রঘুবংশের শ্লোকের 'নৌসাধনোদ্যত বঙ্গান্' ধ্বনিই জাগিয়ে তোলে। আর হুলিয়ার কাষ্ঠ-তরীতে আমরা দেখতে পাই, দারুব্রহ্মের পদপাতন ছন্দ। এ চিত্রে মসী সলিল-বিধৌত।

তবে আমাদের মনে তাঁর 'টেম্পেরা'র অধ্যায় অবিস্মরণীয় হয়ে রইল। যুদ্ধান্তে এ-অধ্যায় যে অপুর্ব্ব ও অপূর্ণ বর্ণ-ছন্দ রচনা করেছে তার অম্লান ভারতীয় সৌরভ উরোপার শিল্প কর্ম্মকৃতিকে অনেকদূর পেছনে রেখে নিরবধিকাল সুধাপানের সত্র খুলে দিয়েছে। বাংলার মূর্ত্তি-শিল্পীরা মাটির উপরও ধ্রুবতা-প্রার্থী 'টেম্পেরা' পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। কাগজের উপর এ-পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল সেন আমলের 'গীতগোবিন্দে'র একটি দৃশ্য অঙ্কণ-কালে। চিত্রটি বিলাতে প্রস্থিত। তা হোক, শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু পুনরায় সে-পদ্ধতিটির চিত্র আমাদের পরিবেষণ করছেন।

এ-পদ্ধতিতে আঁকা একটি চিত্রের উল্লেখ এখনে করছি। 'হিমালয়'। যখন পৃথিবী জলমগ্ন ছিল তখন মানব-পিতা মনুর নৌবন্ধন ভূমি ছিল হিমালয়। সে কোন্ 'ওলিগোসিন', 'মাইওসিন' না 'প্লিওসিন' যুগে কেউ জানে না। অনুমানের উপরই সেসব যুগের ইতিহাস নির্ভর করছে। শিল্পাচার্য্য নন্দলাল তেমন একটি যুগ কল্পনা করেছেন হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে। প্রথম শুভ্রতাময় দেবতা জন্ম নিচ্ছেন সে হিমালয়ে, বৃক্ষবৎ বনরাজিনীলার দেহ-পতনের উপর। এই আর্য্যত্ব বা আর্য্যভাব উরোপ থেকে ভাষাতাত্ত্বিকের মারফৎ আমদানী করা হয়নি—নিজের প্রাণ-মন-অনুভব সন্ধান করে হিমালয়ের দিকে তাকালেই শিলীভূত যক্ষরক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরের আবাসস্থলকে দেখতে পাওয়া যায়। একমাত্র ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতন শিল্পীই পারেন এই সৎ দৃষ্টি লাভ করতে এবং জাতীয় মানসিকতার মূলসূত্র অনুভব করতে। অনুকারকরা সামনে পাওয়া সামান্য আলোকেই জ্ঞান বলে মনে করেন। কিন্তু জ্ঞানের উপরে যে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত তা থাকে দেশের কৃতবিদ্য শিল্পীর ধ্যানে—তাঁদের সদন্তঃকরণে।

'বিহু-উৎসব'

কলকাতা-প্রবাসী আসাম-বাসীরা পয়লা-বৈশাখ একটি বিহু-উৎসব অনুষ্ঠিত করলেন। বস্তুত উৎসবটি 'বিবাহ'-মূলক। অনেকে 'বিহু'-কে বিষু-ও মনে করেন। বৈশাখ-বিষু, কার্ত্তিক-বিষু, মাঘ-বিষু প্রভৃতি নববর্ষারম্ভের উৎসব প্রাচীন আসামে অনুষ্ঠিত হত। প্রাচীন আসাম আর বঙ্গ সমার্থক। তন্ত্রের যুগেও তা সমার্থক ছিল। কিন্তু আজ আর তা নয়। বঙ্গই আসামকে ত্যাগ করেছিল, কি

আসাম বঙ্গকে সে হিসেব কোনো বৈশাখের হালখাতায় পাওয়া যাবেনা। এবং হয়ত তার দরুণ বাঙালী ও আসামী উভয়কে আমরা আত্মভোলা জাতি বলে চুপচাপ বসে থাকব।

কিন্তু আসামের 'বিহু'-উৎসবের নৃত্য-গীত উপভোগ করে আমাদের মনে হল, বাংলার প্রতিবেশী ভাইবোনরা মোটেও আত্মভোলা জাতি নন। তাঁরা প্রাচীন সংস্কৃতির আনন্দিত দিনগুলো সুস্পষ্ট স্মরণ করতে পারেন। প্রাচীন সংস্কৃতির স্মরণে একটি সুন্দর মানসিক চিত্র প্রতিফলিত হয়—মনে ভেসে ওঠে প্রাচীন সমাজের প্রাণপূর্ণ একাত্মক মূর্ত্তি। তাতে ছোট-বড়োর, উঁচু-নীচুর ভেদ নেই। সবাই একসূত্রে আনন্দিত হবার সুযোগ লাভ করতেন এসব উৎসবের দিনে। এরই নাম সামাজিক উৎসব। আসামের নৃত্য-গীতময় 'বিহু'-উৎসবগুলো আজও সামাজিক সত্তা ত্যাগ করে চলে আসেনি—কিন্তু বাংলার বেলায় তা নয়। আসামের মতো আমাদেরও 'বিষু'-উৎসব আছে—গাজন, মেলা, নানাজাতীয় আহার-গ্রহণ এ-উৎসবের অঙ্গ। কিন্তু তা আজ সামাজিক সত্তা হারিয়ে ফেলেছে—এধরণের পার্ব্বণ-পালনে উৎসুক নয় সমগ্র বাঙালী, সমগ্র বাংলা নববর্ষে উৎসাহ বোধ করেনা। অতীতকে পরিত্যাগ করে নূতনের আহ্বানে যদি সমবেত কণ্ঠ মেলানো যায় তা আনন্দহীন হয় না। কিন্তু তেমন কোনো অর্কেষ্ট্রা-ও বাংলাদেশ শুনতে রাজি নয়। অতীত পরিত্যক্ত, বর্ত্তমান নিরানন্দ এবং ভবিষ্যৎ শূন্যতাময়, এই হয়ত বাঙালী জাতির পথ-চিহ্ন। এধরণের উন্মার্গী হ'য়েই হয়ত বঙ্গদেশ প্রতিবেশীদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হতে সুরু করেছিল।

হাওড়ায় কবিসভা

পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্র-জন্ম-তিথি হয়ে বাঙালী বাক্‌পতি জাতির একটি নববর্ষ-উৎসব উদ্‌যাপনের সুযোগ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ এ-শতকের মুখে যে ভাষা দিয়ে গেছেন তা শতাধিক সৎ-কবিতায় মুখর। বৈষ্ণব-যুগের অবসানের পর আজকের মতো এমন যুগ আর বাংলায় আসেনি, যখন কবিতা বহুবল্লভা। শুধু কলকাতা-ই যে কবিতা-ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে তা নয়—উপকণ্ঠের সহরগুলোতেও কাব্যোৎসাহ অতিস্ফূর্ত্ত। দুঃসময় কবিতা প্রসব করে থাকে। সুসময়ে কেউ শান্তচিত্তে অতীত ভাবাবেগ স্মরণ করতে যায় না, তাই কবিতার ফসলে তখন প্রাচুর্য্যও আসেনা।

হাওড়ায় সম্প্রতি হাওড়া-বর্দ্ধমান-আন্দুলের কবিবৃন্দ একটি সভায় কবিতা-পাঠ করলেন। কবিতায় বর্ত্তমান ভাবাবেগকে রূপায়িত করতে প্রত্যেকেই সচেষ্ট হয়েছেন কিন্তু সবার রচনাই কাব্যরসে প্রগাঢ় ছিলনা। তবু কবিতা-শ্রবণে আগ্রহশীল শ্রোতার অভাব হয়নি সভাগৃহে। কাব্য-সাহিত্যের প্রতি জনসাধারণের এই আগ্রহ নিশ্চয়ই কোনো সৎ কবির অনুসন্ধিৎসা থেকে জন্ম নিয়েছে। সেই কবির আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের মতো জ্যোতির্ম্ময় না হলে জনসাধারণের মনে আজ যে কাব্যোৎসাহ এসেছে তা অচিরাৎ নির্ব্বাপিত হবে। এখন যাঁরা কবিতা লিখছেন বাংলা সাহিত্যের শুভাশুভ তাঁদের প্রচেষ্টার মুখাপেক্ষী। সর্ব্বদা তাঁদের মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথকে, মনে রাখতে হবে কতো দৃঢ় প্রযত্নে রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় এবং বাঙালীকে মুগ্ধ করা যায়।

সাহিত্য-একাডেমী

পূর্ব্বাশা গত বৈশাখে একটি সাহিত্য-একাডেমী গঠনের সঙ্কল্প করেছিলেন। কিন্তু তা অনেকেরই সম্মতি লাভ করেনি। সুতরাং সে-সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়েছে। ভারত-রাষ্ট্র অতঃপর এ-ধরনের একাডেমীর প্রতি মনোযোগী হয়েছেন, বাংলা-সরকারও রবীন্দ্র-পুরস্কারের ধরণে আরো দু'টি পুরস্কার (বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের নামে) ঘোষণা করবেন জানা গেছে, সুতরাং সাময়িক পত্রিকা দ্বারা পরিচালিত একটি 'একাডেমী' ইদানীং অবান্তর। সাহিত্যিকরা যে-স্থল থেকেই অর্থ আর সম্মান পান—তাঁদের পাওয়াটাই আসল কথা।

স. ভ।

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র-প্রদর্শনী

ইডেন-গার্ডেনস্থিত রঞ্জি ষ্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় প্রদর্শনী সুরু হ'য়েছে ১৭ই এপ্রিল থেকে, চলবেও প্রায় মাসখানেক। ১৭ই এপ্রিল সন্ধ্যায় যথাবিধি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়ে গেছে, উদ্বোধন করেছেন শ্রমমন্ত্রী শ্রীকালিপদ মুখার্জ্জী। এখন সেটা সর্বসাধারণের কাছে উন্মুক্ত, নামমাত্র দর্শনী দিয়ে যে কেউ দেখে আসতে পারেন, জেনে আসতে পারেন গত কয়েক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ কতদূর এগিয়ে গেছে। কোন পরিকল্পনা তার সার্থক হ'য়েছে, কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, অবিলম্বে আরও কি কি হবে ইত্যাদি।

কিংসওয়ে, অক্ল্যাণ্ড রোড, ইডেন গার্ডেন যে কোন দিকের ফটক দিয়ে ঢুকতেই প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনেকটা সাঁচী তোরণের ধরণে তৈরী এই সুদৃশ্য ফটকগুলি। ভিতরে পূর্ব্ব, পশ্চিম, মধ্য, উত্তর ভিন্ন ভিন্ন কোর্ট ভাগ করে ষ্টলগুলি স্থাপন করা হ'য়েছে। প্রায় ৪৮ হাজার ফুট পরিমিত এলাকায় ষ্টলগুলি সাজানো হ'য়েছে। কৃষি, সেচ, মৎস্য, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্বাসন, কেন্দ্রীয় কাঁচ এবং মৃৎগবেষণা ভবন, কুটিরশিল্প, কারাসংস্কার এরকম অনেক অনেক ষ্টল রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান প্রধান সেচ-পরিকল্পনার সুদৃশ্য মডেলগুলি বিশেষ ক'রে চোখে পড়ে; আর নজরে পড়বার মত কারা-সমূহে উৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও উদ্বাস্তু মেয়েদের তৈরী নানারকম হস্তশিল্প। প্রত্যেকটি ষ্টলেই সাজানো দ্রব্যাদি বিশেষ ভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য লোক রয়েছেন, অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা ব্যাখ্যা করছেন না বলে ষ্টলগুলি রক্ষা করছেন বলাই ঠিক হবে। মোটামুটি ভাবে, প্রদর্শনী দেখে পশ্চিম বাংলার নদী, প্রান্তর, লোকবলে নানাভাবে যে সম্পদ ছড়ানো রয়েছে, তার একটা সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়; এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এইসব সম্পদকে জন-কল্যাণে নিয়োজিত করতে যে প্রচেষ্টা করে চলেছেন সেগুলিও এই প্রদর্শনীতে নানা মডেল, মানচিত্র, চিত্র, চার্ট এবং সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে বুঝানোর চেষ্টা হয়েছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে কল্যাণীতেও এই ধরণের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। পশ্চিম-বঙ্গবাসীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পরিচয় করিয়ে দিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারের জনকল্যাণ-মূলক উদ্যোগগুলিকে জনপ্রিয় ক'রে তুলতে এধরণের প্রদর্শনীর মূল্য বর্ণনাতীত। অন্নদায়িনী আশ্র

ভূমির সঙ্গে পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকলে প্রাণের যোগ স্থাপন হওয়া সহজ নয় আর তা না হলে প্রাণের সাড়া মিলবে কি করে?

প্রদর্শনী দেখা শেষে প্রদর্শনীর মূল্য নির্দ্ধারণ করতে বসে একটা কথা স্বভাবতঃই মনে জাগে, উৎসাহী, জিজ্ঞাসু, গ্রহণেচ্ছু মনের কাছে শিক্ষা আর জ্ঞাতব্য তথ্যের দিক দিয়ে এর মূল্য যতখানি বিরাট, অগণিত সাধারণের মনেও কি এর প্রভাব ততটা কার্য্যকরী? নিরুৎসাহ, প্রাণহীন যারা, পশ্চিমবঙ্গে কিছুই কাজ হচ্ছেনা এই যাদের ধারণা, তাদের মনে এ প্রদর্শনী কতটা আশার সঞ্চার করবে কতটা আশ্বাস জাগাবে বলা মুস্কিল।

শুধু সম্পদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েই কাজ শেষ হয় না, সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দশের উন্নতির জন্য দেশের প্রতিটি লোকের যে একটা নিজস্ব কর্ত্তব্য রয়েছে, সে বোধ জাগিয়ে দিতে না পারা পর্য্যন্ত প্রদর্শনীর সার্থকতা অপূর্ণ থেকে যায়। ভাঙ্গনের কাজে প্রাণের অপব্যয়ের খেলা তো অনেক হয়েছে, এবারে শ্রেষ্ঠ শক্তির ব্যয়ে গড়নের কাজ সুরু করার সময় হয়ে গেছে আর তাই চাই নব নব প্রাণে সাড়া।

প্রদর্শনীতে এমন অনেক নীরস বিষয়বস্তু আছে, যেগুলিকে তথ্যবহুল করার সঙ্গে সঙ্গে আরও আকর্ষণীয় করা দরকার ছিল। এছাড়াও, আমাদের রাজ্যে উন্নয়নমূলক যে সমস্ত বিরাট বিরাট কাজ চলেছে প্রদর্শনী দেখে সে সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট কোন ছাপ মনে ধরেনা, আর তাই আশানুরূপ বিস্ময়বোধও জাগেনা। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে এধরণের প্রদর্শনীগুলি আরো আকর্ষণীয় হবে এবং জনমনে আরোও সাড়া জাগাবে।

তবু একথাও ঠিক, প্রদর্শনী দেখা শেষে বৈশাখের তাপদগ্ধ ক্লান্ত সন্ধ্যায়, ইডেন গার্ডেনের পাতাঝরা পথে, স্নিগ্ধ পরিবেশে, বেরিয়ে আসতে আসতে আপনাকে একবার স্বীকার করতেই হবে, 'পশ্চিমবঙ্গ পেছিয়ে নেই, এবং অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় অনেক ব্যাপারে সে এগিয়ে গেছে।

রমা সেন

কবিতার বই

স্বর ও অন্যান্য কবিতা : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : মডার্ণ পাবলিশার্স। দেড় টাকা।

অন্তরা : চিত্ত ঘোষ : অগ্রণী বুক ক্লাব। দেড় টাকা।

"No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone."—

বহুবিদিত এই কথাটির মর্ম আলোচ্য দুজন কবির কাব্যপাঠান্তে একটি বিশেষ স্বীকারোক্তি-ক্রমে স্পষ্ট হ'তে পারে : সেটি হোলো এই : একজন অপেক্ষাকৃত প্রবীণ ও একজন নবীন কবি প্রায় একই কালে যে সুর ও স্বরের খবর এনেছেন তাদের আন্তর বাণী-প্রতিবেশ রচনায় খুব বেশি অভিন্নতার অভাব আছে বলে ত মনে হচ্ছে না। তাই নতুন ক'রে প্রমাণিত হোলো, বিভিন্ন কবির ব্যক্তিত্বের যে ব্যঞ্জনা শব্দ-চিত্র-ছন্দ ধ্বনি-নির্মাণে অভিব্যক্ত হয় তাদের স্বাভাবিক স্বকীয়ত্বকে আপাতত গণ্য না ক'রে বিশেষ দেশকালপাত্রের আধেয় কাব্য-বিষয়টিকে ভাববার চেষ্টা করলে তার মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত সংগতি লক্ষ্য করা যাবে। এইখানেই যদি কবি তাঁর বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত দেশকালসমেত স্বীকৃত হন, তা'হলে সদৃশ্য দেশকালে রচিত বিভিন্ন কাব্যের অন্তর্মিলটি অনুধাবন সহজেই সাধ্য। 'স্বর' ও 'অন্তরা'র সে স্বাভাবিক আন্তর প্রতিবেশ-সাম্যটি কবিবিশেষের দৃষ্টিকোণ কিংবা অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও একটি সাধারণ নৈরাশ-বিধুর তমোময় দৃশ্যপটের ও সেই সংগে আপাত-সংশয়িত মনোলোকের সহযোগে রসায়িত হয়েছে। কাজে কাজেই এখানে কেনো কবিরই স্বয়ম্ভূ স্বভাবের স্বরূপ-নির্ণয় নয়।

'ম্লান ইতিহাসের' পটে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত যে রজনী ও হৃদয়ের ছবি আঁকেন তা কালের চক্রান্তে 'কুয়াশা-স্থবির' (শীত রাত)। এখানে আজ 'জন্ম, মৃত্যু, প্রজননে অজানিতে যৌবন বিকল' (আজ বসন্তে)—কবির তাই মনে হচ্ছে : 'অন্তিম প্রণয়ে ফের আনো বৃথা রক্তিম জোয়ার' (স্মরণী)। এলিয়ট-অনুসারী না হয়েই কবির সহজাত মানস-প্রতিক্রিয়া ধ্বনি তুলছে 'The Hallow Men'-এর : 'প্রখর শীতের শেষে লবণাক্ত রজনী আবার' (আজ বসন্তে), 'এ জীবনে স্বপ্ন নেই ব্যর্থ এই পৃথিবীর মায়া' কিংবা 'তুমি জানো, আমি জানি, জানে তো সবাই। এজীবন কী-ভীষণ ফাঁকা' (স্বর) এবং 'The Waste Land'-এর :

কাস্তে হাতে কৃষকেরা শস্যহীন মাঠে ঘুরে মরে।
বসন্ত বাতাসে ত্যাথ বিজড়িত সুকঠিন জাল। (আজ বসন্তে)

কিংবা

'যখন দুঃসহ দাহে মেঘহীন আকাশ আমার,
যতদূর চোখ যায় দগ্ধপ্রাণ বিষণ্ণ খামার' (সুখ)

—শেষ ছত্র দুটিতেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই 'বিষণ্ণ খামারে'র অভিজ্ঞতা কবির সহজ অনুভূতি-সঞ্জাত, গভীর আসক্ত মনেরই ব্যর্থতাবোধের ছায়াপাত এখানে—এলিয়টের মত বৈজ্ঞানিক চেতনার নিষ্করুণ বিশ্লেষণ-কৈবল্য নয়। সহর-সীমায় এই কবির মন বিব্রত, বিধ্বস্ত ও বিষণ্ণ। 'সহরের সীমা ছেড়ে'

'মাঠের সবুজে' 'মুক্ত শাণিত বাতাসে' ('শাণিত' শব্দটি এখানে অনাদৃত হওয়া উচিত—শব্দচয়নে এহেন অমনোযোগ, কবিতার গড়নে কোথাও বা অসংযম ও অসংহতি এমনি মাঝে মাঝে লক্ষ্যে পড়ে) 'কী গভীর সরলতা!' তাই কবির বোধ হচ্ছে : 'আজ এখানে পেয়েছি এসে সব' (এখানে)। কিন্তু এ আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। হৃদয়ের অনন্ত অভাববোধ এতে শান্তি পায় না, বড়জোর সান্ত্বনা মানে। তাই হৃদয়কেই প্রসারিত করতে হয়। 'উন্মোচিত হৃদয়কে মেলে' দিতে হয় 'তৃণদলে মৃত্তিকার কাছে' (এখনো)। এমন আত্মস্থ হওয়াই কিরণশঙ্করের চারিত্রিক, 'তিমিরহননের গান' তাই এরপরে জমে না, ওটা যেহেতু কেবলমাত্র সাময়িক-ই।

নৈরাশ্যের ঘনঘটায় চিত্ত ঘোষের যন্ত্রী মন-ও 'আশারবী'র আলাপ তুলতে চায়। অন্ধকার বিপত্তির অভাব নেই জীবনে : 'মেঘ জমে' রাত নামে, আলো নেই, সামনে পাহাড়' (মনে পড়ে)—এই দুর্দিনে, দুঃসময়ের রাত্রিতে যদি কিছু মুখ ফুটে বলতে হয় তবে সে 'জীবনের নিয়মের কথা' 'অথবা কিছুর নয়, কিছু নয়, শুধু স্তব্ধতা' (দেখা)। তাই বুঝি এই পংগু বৃদ্ধ জীবনস্রোতের মধ্যে 'অল্পে সুখ-বোধ একান্তই অসম্ভব। অল্পেই কেমন অদ্ভুত তৃপ্তি তারই ছায়া-বিজড়িত কয়েকটি অপূর্ব-মধুর পদের সংগীত এখানে শ্রাব্য :

শ্রাবণের মেঘ হৃদয় আমার বিদ্যুতে ছেঁড়া রাত
বর্ষাধারায় ভেজে একসার শিশু দেওদার বন
চঞ্চল রাতে আলোর দেয়ালি নিভায় হাওয়ার হাত
এই ভাল তবু, এই ভাল তবে, এতেই ভুলেছে মন। (উপজ্ঞা)

চিত্তঘোষের প্রথম পর্য্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা এই 'উপজ্ঞা'—এলিয়টি জীবনবাদকেই প্রশ্রয় দিয়েছে। একটি কাহিনী জাতীয় কয়েকটি কবিতায় জীবনানন্দের স্পষ্ট পদপাত। তবু এগুলি সব নয়। আর্ত-জীবনের মর্মরিত বেদনায়, প্রাণ-ধর্মের উত্তাপ ও অবসাদের চকিত মেলামেশায় প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলিতে যে হৃদয়ের অনর্গল মুহুর্মুহুঃ বিলম্বিতলয়ে আবৃত হয়েছে পরবর্তী কবিতাগুলিতে সেই হৃদয়ই অনুপস্থিত। সেখানে প্রত্যাশিত আশাবাদ আছে সত্য—কিন্তু সে-ইতিহাসের ভূমিকাতেই 'যৌবন জরায় মগ্ন'—এই যৌবনের আশাবাদ তাই স্বয়ং কবিকেই যথেষ্ট আনন্দিত উল্লসিত উদ্দীপিত করতে পারে না—অপরকে তো দূরের। এই দূরকে স্পর্শ করার মত অন্তরের আবেদন এখনও স্ফূর্ত হয়নি—অন্তরার ঘোষণা যতই প্রবল হোক। কিরণশঙ্করের মত আত্মস্থ হওয়ায় চিত্ত ঘোষের আস্থা নেই ততটা যতটা অন্য কোন সার্বভৌম ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষায় আসক্তির আভাস বিদ্যমান। এই আসক্তি বিশ্বাসে কিংবা অনুরাগে রূপান্তরিত হয় নি। তাই এখনো 'খাদে'র শ্লেষাত্মক বক্রোক্তি। 'উদয়াস্ত' 'অন্তরা' প্রভৃতির গদ্য-নির্ভর সংলাপ ও ঘটনাপঞ্জী বিন্যাস (কিরণশঙ্করের 'স্বরে'র স্বাদ এজাতীয় নয়) —নিটোল কবিতার উপযোগী হৃদয়ের আশা-আনন্দ-বেদনার নির্ভেজাল অন্তর্লোকটির এখনো অভ্যুদয় ঘটে নি—না হ'লে 'বৃষ্টিশেষ'—লগ্নের ছবিটি তো মনের মধ্যে বেশ তাজা হয়েই ফুটে উঠছে :

আমরা জানি জানি
রোদের রথে আসবে সকাল আমরা যদি আনি।

—এই স্ফুটনোন্মুখ অধ্যায়টি বিকশিত হোক—তবে চিত্ত ঘোষের উত্তর-পর্য্যায় সম্বন্ধে অন্য কথা বলা চলবে, ততদিন তাঁর পূর্ব-পর্যায়ের 'উপজ্ঞা'র দোলাই স্মরণে থাকবে।

নিখিলকুমার নন্দী

ময়ূরাক্ষী—অরুণ ভট্টাচার্য্য ঃ নিউ গাইড (এক টাকা)

জীবন যতো তাড়াতাড়ি যৌবনের যাতনার রূপ চিনতে পারে সমাজের পক্ষে ততোবেশী মঙ্গল। তরুণ কবিরা যখন প্রেম-তৃপ্তির আমেজে আধো-আধো কবিতা রচনা করেন তখন আমরা ভেবে নিশ্চিন্ত হই, কবিতা রচনার ব্যর্থ প্রয়াসে তাঁরা স্থূল থেকে স্থূলতর বিষয়ে অবতরণ করছেন না। অরুণ ভট্টাচার্য্যের 'ময়ূরাক্ষী' তাঁর দ্বিতীয় কাব্য-গ্রন্থ। এখানে প্রেমানুভূতিতে তিনি পরিচ্ছন্নতর। এ অনুভূতি নিয়ে নানা খেলা চলে কিন্তু সব খেলার মধ্যেও একটি মন হয়ত ধরা পড়ে যা নিরবচ্ছিন্ন। ধরা দেওয়া কবির স্বরূপ। ধরা-পড়া মন সমাজ স্বরূপ। অরুণবাবু জানতে পেরেছেন তার মনের অকৃত্রিম চেহারা আর তাই বলিষ্ঠভাবে বলতে পারছেন: জীবনকে ভালোবেসে দুই হাতে যুঁই একরাশ নিয়ে তাকে বলব এবার…' যে অকিঞ্চিৎকর কথাই তারপর তিনি বলুন, আমরা বলব তরুণ কবিদের তার চাইতে সত্য কথা বলার দরকার নেই।

স, ভ।

আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যের নির্ব্বিচার পরিবেশনে পাঠকের মনে অতীতের কণ্ডুয়ন অথবা রুচির বিকৃতি সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কথাসাহিত্য ও কবিতা পরিবেষণে পূর্ব্বাশা লিমিটেড বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্ব্বাশার সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

কবিতা

অজিত দত্তের
পুনর্ণবা
দেড় টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
নীল আকাশ
দেড় টাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
সংকলিতা
দু'টাকা

প্রাচীন প্রাচী
দেড় টাকা

অপ্রেম ও প্রেম
এক টাকা

পদাবলী
দুই টাকা

তিনজন আধুনিক কবি
(বাংলা কবিতার আলোচনা)
নয় আনা

অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের
সৈনিক
দেড় টাকা

গোপাল ভৌমিকের
স্বাক্ষর
এক টাকা

গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
মহানগর
দু'টাকা

সুবোধ ঘোষের
পরশুরামের কুঠার
দু'টাকা

শুক্লাভিসার
দু'টাকা চার আনা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ফসল
এক টাকা চার আনা

ঋণ
দেড় টাকা

নতুন দিনের কাহিনী
দু'টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
পতাকা
দু'টাকা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
খেলনা
দেড় টাকা

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের
নয়নচারা
দেড় টাকা

উপন্যাস

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
বৃত্ত
এক টাকা বার আনা

মরামাটি
(২য় সং)
দু'টাকা চার আনা

দিনান্ত
(২য় সং)
সাড়ে তিন টাকা

কল্লোল
পাঁচ টাকা

কস্মৈদেবায়
(২য় সং)
তিন টাকা :

রাত্রি
(দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)
পাঁচ টাকা

মৌচাক
পাঁচ টাকা

শৈলেন ঘোষের
তিনরঙ
দু'টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-জীবনী

"রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া গ্রন্থকার একটি বৃহৎ দেশ ও কালের ইতিহাস লিখিতেছেন। ইহা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি শিক্ষাপ্রদ। তাঁহার এই কীর্তি বাঙালী পাঠকের হাতে উপযুক্ত মূল্য পাইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

"...গ্রন্থখানি যেমন বৃহদাকার তেমনি কবির বহুমুখী এবং আপাত পরস্পর-বিরোধী কর্মজীবনকে একটি ঐক্যসূত্রে গাঁথিবার মহৎ প্রয়াস। এই প্রায়-অসাধ্যসাধনপথে জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যে সাফল্যলাভ করিয়াছেন তাহা জীবনী-ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

"...লেখক রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবন ও ভাবজীবন, স্বদেশ-কেন্দ্রিকজীবন ও বিশ্ব-মানবকেন্দ্রিকজীবন, বাস্তব কর্মের জীবন ও স্বপ্ন দেখার জীবন, একই সঙ্গে একটি অখণ্ড জীবনের বিভিন্ন প্রকাশ রূপে দেখাইয়া সত্য জীবনটিকেই দেখাইতেছেন।

"রবীন্দ্রনাথকে এমন সমগ্রভাবে দেখিবার সুযোগ প্রভাতকুমারই প্রথম দিলেন। এ গ্রন্থ দীর্ঘ হইয়াও যথেষ্ট দীর্ঘ নহে, কিন্তু ঠিক সেই কারণেই কবি-জীবনের সমস্তগুলি মুহূর্ত—এমনকি যেসব মুহূর্ত কর্মহীনতার ভ্রান্তি জাগাইয়াছে তাহাও সমগ্রের সঙ্গে মিলিয়া এমন স্পন্দিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে।...

"পাঠ করিতে করিতে মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে থামিয়া যাইতে হয়, মনে হয় কবি যত সহজে সহস্র রকম পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন, পাঠকরূপে আমরা তাহা পারিতেছি না, অনুসরণপথে হাঁপাইয়া পড়িতেছি। বর্ণনা এমনই সুন্দর যে, বিবরণের হ্রস্বতা কোথাও ধাক্কা মারে না, দীর্ঘতা কোথাও দীর্ঘ বোধ হয় না। রবীন্দ্র-কর্মজীবনের ও স্বপ্নজীবনের এই চিত্র পটভূমিরূপে পাঠ করা প্রত্যেক রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠকের অবশ্যকর্তব্য বলিয়া মনে করি।"

—যুগান্তর

প্রথম খণ্ড ॥ ১২৬৮—১৩০৮ ॥ ১৮৬১—১৯০১ ॥ মূল্য সাড়ে আট টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ১৩০৮—১৩২৫ ॥ ১৯০১—১৯১৮ ॥ মূল্য দশ টাকা
তৃতীয় খণ্ড ॥ ১৩২৫—১৩৪১ ॥ ১৯১৯—১৯৩৪ ॥ মূল্য দশ টাকা

¶ রবীন্দ্রজন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ২২শে বৈশাখ হইতে ৫ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় বই রবীন্দ্র-জীবনী রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক গ্রন্থাবলী শতকরা ১২॥ বাদ দিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বিশ্বভারতী

৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

Printer & Publisher by Satya Prasanna Dutta, Purvasa Ltd., 54 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta.

COLOUR ILUSTRATION

আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যের নির্ব্বিচার পরিবেশনে পাঠকের মনে অতীতের কণ্ডুয়ন অথবা রুচির বিকৃতি সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কথাসাহিত্য ও কবিতা পরিবেষণে পূর্ব্বাশা লিমিটেড বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্ব্বাশার সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

কবিতা

অজিত দত্তের **পুনর্ণবা** দেড় টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **নীল আকাশ** দেড় টাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের **সংকলিতা** ছ'টাকা

প্রাচীন প্রাচী দেড় টাকা

অপ্রেম ও প্রেম এক টাকা

পদাবলী দুই টাকা

তিনজন আধুনিক কবি (বাংলা কবিতার আলোচনা) নয় আনা

অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের **সৈনিক** দেড় টাকা

গোপাল ভৌমিকের **স্বাক্ষর** এক টাকা

গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্রের **মহানগর** ছ'টাকা

সুবোধ ঘোষের **পরশুরামের কুঠার** ছ'টাকা

শুক্লাভিসার ছ'টাকা চার আনা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের **ফসল** এক টাকা চার আনা

ঋণ দেড় টাকা

নতুন দিনের কাহিনী ছ'টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **পতাকা** ছ'টাকা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর **খেলনা** দেড় টাকা

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের **নয়নচারা** দেড় টাকা

উপন্যাস

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের **বৃত্ত** এক টাকা বার আনা

মরামাটি (২য় সং); ছ'টাকা চার আনা

দিনান্ত (২য় সং) সাড়ে তিন টাকা

কল্লোল পাঁচ টাকা

কস্মৈদেবায় (২য় সং) তিন টাকা :

রাত্রি (দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ) পাঁচ টাকা

মৌচাক পাঁচ টাকা

শৈলেন ঘোষের **তিনরঙ** ছ'টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা

লীলা মজুমদার

শ্রীমতী

শৈশবে শ্রীমতীর পিতার মৃত্যু হয়েছিল। এক দেবতুল্য আত্মীয় তাকে মানুষ করেছিলেন; তাঁর কাছে শ্রীমতী পেয়েছিল উদার শিক্ষা, বুকভরা সাহস আর ঘরভরা বই। এই কঠিন পৃথিবীতে যখন সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে; যখন তার হৃদয় হাহাকার করছে এক যুবকের প্রেমের আশায়—এমন সময় অকস্মাৎ আবির্ভাব হলো তার মায়ের। তার অনেককালের হারিয়ে যাওয়া মা, বিগতযৌবনা রূপসী এক অভিনেত্রী। ভাগ্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কী করে এই অসামান্যা মেয়েটির জীবন ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠলো—তারই আনন্দবেদনাময় কাহিনী 'শ্রীমতী'। ২।০

নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনের নির্বাচনে ১৩৬০ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ

সংবর্ত

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

'সংবর্ত' গ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ ও জীবনদর্শন দুই-ই সুপরিস্ফুট। তাঁর কাব্যভাবনায় 'উচ্ছ্বসিত স্বপ্নরচনা'র স্থান নেই; নির্বিচার নৈরাশ্যবাদও তাঁর মনঃপুত নয়। তাঁর কবিতা গভীর অনুশীলনে ও চিন্তায় সমৃদ্ধ। চিন্তার ঐশ্বর্যে যেমন, শব্দসম্পদেও তেমনি তাঁর তুলনাস্থল বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে দুর্লভ। ফলে তাঁর কাব্য বাঙালি পাঠকের সশ্রদ্ধ ও সশ্রম অনুশীলনের যোগ্য। দাম ২৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুইবাড়ি

পল্লীগ্রামে পাশাপাশি দুই বাড়ি। এ-বাড়ির ছেলে নিধিরাম মোক্তারী পাস করে মহকুমায় প্রথম যেবার প্র্যাকটিস করতে যায় সেইবারই বহু বছর পর পাশের বাড়িতে জজসাহেব লালবিহারীবাবু ছুটিতে এলেন ছেলেমেয়ে নিয়ে। নিধিরামের ইনি পিতৃবন্ধু। তাঁরই কিশোরী মেয়ে মঞ্জু দরিদ্র মোক্তার নিধিরামের জীবনে অভাবিত ভাবে ভালবাসার যে মর্মর জাগালো, কৈশোরের আলোয় ভরা সেই ভীরু ভালোবাসার কাহিনী এই 'দুইবাড়ি'। পল্লীবাঙলার লাবণ্যময় রচনা। দাম ২৷৹

"একবার আমার টাকার বড় টানাটানি যাইতেছিল..."

আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে আজীবন শিবনাথ শাস্ত্রী দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন। সেই দরিদ্র জীবনের কোথাও কিছুমাত্র গ্লানি ছিল না। তাঁর 'আত্মচরিত'-এর একাংশে তিনি লিখছেন: "একবার আমার টাকার বড় টানাটানি যাইতেছিল। সেই মাসের শেষের দিকে ছেলেরা প্রসন্নময়ীর (স্ত্রী) চুল বাঁধিবার আয়নাখানা ভাঙিয়া ফেলিল। একদিন ব্রহ্মময়ী (বন্ধুপত্নী) অপরাহ্ণে আমাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিয়া দেখেন, প্রসন্নময়ী জালার নিকট দাঁড়াইয়া মুখ দেখিতেছেন ও চুল বাঁধিতেছেন। ব্রহ্মময়ী দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও হেমের মা, ওকি। জলের জালার কাছে কি করছ?'

প্রসন্নময়ী হাসিয়া বলিলেন "ওগো, আয়নাখানা ছেলেরা ভেঙে ফেলেছে ওঁর বড় টাকার টানাটানি যাচ্ছে, তাই ওঁকে জানাইনি। মাস গেলে কিনব ভেবে জালার জলে মুখ দেখে চুল বাঁধছি।"

শিবনাথের হৃদয়ে নির্মল নির্ঝরের মতো একটি সরসতার ধারা প্রবাহিত ছিল। সেই সরতার গুণে 'আত্মচরিত'-এর উপভোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই 'আত্মচরিত' শতবর্ষ পূর্বেকার বঙ্গসমাজের একটি নিখুঁত চিত্র। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেশ চৌধুরী প্রমুখ দেশীয় এবং আর্নল্ড টয়েনবি, জর্জ মুলার, ফ্রানসিস নিউম্যান, রেভারেণ্ড ষ্টপফোর্ড ব্রুক প্রমুখ বিদেশীয় মহাপুরুষদের প্রত্যেকের সঙ্গেই শাস্ত্রীমহাশয়ের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়েছিল। 'আত্মচরিত' উনিশ-শতকী দেশীয় ও বিদেশীয় নারী-পুরুষের চরিত্র-চিত্রশালাও।

বাঙলার সেই গৌরবের যুগ গত হয়েছে—যখন জলে হাওয়ায় জড়িয়েছিল মানুষ তৈরির উপাদান। দুঃখকে তাঁরা অবলীলাক্রমে অতিক্রম করতে পারতেন, দুঃসাধ্য-সাধনে স্বপ্ন দেখতে শঙ্কিত হতেন না, বৃহৎ এবং মহৎ আদর্শের জন্য সর্বস্ব পণ করতে পারতেন সহজেই। শিবনাথ

শাস্ত্রী ছিলেন এইকালের এক অসামান্য পুরুষ। সেই গৌরবময় যুগ এবং যুগস্রষ্টাদের আরেকবার নিবিড় সংসর্গ লাভ করা যায় তাঁর 'আত্মচরিত' এর পৃষ্ঠায়। সচিত্র দাম চার টাকা।

সিগনেট বুকশপ ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
১৪২।১ রাসবিহারী এভিনিউ

পুস্তিকাকারে ছাপানো পূর্ণ কলেবরে 'টুকরো কথা' সিগনেটের যে-কোনো দোকানে চাইলেই পাওয়া যাবে

[illegible]

সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

অজিত দত্তের
পুনর্ণবা
দেড় টাকা

[illegible]
দেড় টাকা

[illegible]
[illegible]
দু'টাকা

প্রাচীন প্রাচী
দেড় টাকা

অপ্রেম ও প্রেম
এক টাকা

পদাবলী
দুই টাকা

তিনজন আধুনিক কবি
(বাংলা কবিতার আলোচনা)
নয় আনা

অজয়কুমার ভট্টাচার্যের
সৈনিক
দেড় টাকা

গোপাল ভৌমিকের
স্বাক্ষর
এক টাকা

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
মহানগর
দু'টাকা

সুবোধ ঘোষের
পরশুরামের কুঠার
দু'টাকা

[illegible]
দু'টাকা চার আনা

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের
ফসল
এক টাকা চার আনা

ঋণ
দেড় টাকা

নতুন দিনের কাহিনী
দু'টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
পতাকা
দু'টাকা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
খেলনা
দেড় টাকা

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের
নয়নচারা
দেড় টাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের
বৃত্ত
এক টাকা চার আনা

[illegible]
(২য় সং)
দু'টাকা চার আনা

দিনান্ত
(২য় সং)
সাড়ে তিন টাকা

কল্লোল
পাঁচ টাকা

কস্মৈ দেবায়
(২য় সং)
তিন টাকা

রাত্রি
(দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)
পাঁচ টাকা

মৌচাক
পাঁচ টাকা

শৈলেন ঘোষের
তিনরঙ
দু'টাকা

পূর্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা

লীলা মজুমদার

শ্রীমতী

শৈশবে শ্রীমতীর পিতার মৃত্যু হয়েছিল। এক দেবতুল্য আত্মীয় তাকে মানুষ করেছিলেন; তাঁর কাছে শ্রীমতী পেয়েছিল উদার শিক্ষা, বুকভরা সাহস আর ঘরভরা বই। এই কঠিন পৃথিবীতে যখন সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে; যখন তার হৃদয় হাহাকার করছে এক যুবকের প্রেমের আশায়—এমন সময় অকস্মাৎ আবির্ভাব হলো তার মায়ের। তার অনেককালের হারিয়ে যাওয়া মা, বিগতযৌবনা রূপসী এক অভিনেত্রী। ভাগ্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কী করে এই অসামান্যা মেয়েটির জীবন ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠলো—তারই আনন্দবেদনাময় কাহিনী 'শ্রীমতী'। ২।০

নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনের নির্বাচনে ১৩৬০ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ

সংবর্ত

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

'সংবর্ত' গ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ ও জীবনদর্শন দুই-ই সুপরিস্ফুট। তাঁর কাব্যভাবনায় 'উচ্ছ্বসিত স্বপ্নরচনা'র স্থান নেই; নির্বিচার নৈরাশ্যবাদও তাঁর মনঃপূত নয়। তাঁর কবিতা গভীর অনুশীলনে ও চিন্তায় সমৃদ্ধ। চিন্তার ঐশ্বর্যে যেমন, শব্দসম্পদেও তেমনি তাঁর তুলনাস্থল বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে দুর্লভ। ফলে তাঁর কাব্য বাঙালি পাঠকের সশ্রদ্ধ ও সশ্রম অনুশীলনের যোগ্য। দাম ২৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুইবাড়ি

পল্লীগ্রামে পাশাপাশি দুই বাড়ি। এ-বাড়ির ছেলে নিধিরাম মোক্তারী পাস করে মহকুমায় প্রথম যেবার প্র্যাকটিস করতে যায় সেইবারই বহু বছর পর পাশের বাড়িতে জজসাহেব লালবিহারীবাবু ছুটিতে এলেন ছেলেমেয়ে নিয়ে। নিধিরামের ইনি পিতৃবন্ধু। তাঁরই কিশোরী মেয়ে মঞ্জু দরিদ্র মোক্তার নিধিরামের জীবনে অভাবিত ভাবে ভালবাসার যে মর্মর জাগালো, কৈশোরের আলোয় ভরা সেই ভীরু ভালোবাসার কাহিনী এই 'দুইবাড়ি'। পল্লীবাঙলার লাবণ্যময় রচনা। দাম ২৷৷০

"একবার আমার টাকার বড় টানাটানি যাইতেছিল…"

আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে আজীবন শিবনাথ শাস্ত্রী দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন। সেই দরিদ্র জীবনের কোথাও কিছুমাত্র গ্লানি ছিল না। তাঁর 'আত্মচরিত'-এর একাংশে তিনি লিখছেন: "একবার আমার টাকার বড় টানাটানি যাইতেছিল। সেই মাসের শেষের দিকে ছেলেরা প্রসন্নময়ীর (স্ত্রী) চুল বাঁধিবার আয়নাখানা ভাঙিয়া ফেলিল। একদিন ব্রহ্মময়ী (বন্ধুপত্নী) অপরাহ্নে আমাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিয়া দেখেন, প্রসন্নময়ী জালার নিকট দাঁড়াইয়া মুখ দেখিতেছেন ও চুল বাঁধিতেছেন। ব্রহ্মময়ী দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও হেমের মা, ওকি। জলের জালার কাছে কি করছ?"
প্রসন্নময়ী হাসিয়া বলিলেন "ওগো, আয়নাখানা ছেলেরা ভেঙে ফেলেছে ওঁর বড় টাকার টানাটানি যাচ্ছে, তাই ওঁকে জানাইনি। মাস গেলে কিনব ভেবে জালার জলে মুখ দেখে চুল বাঁধছি।"

শিবনাথের হৃদয়ে নির্মল নির্ঝরের মতো একটি সরসতার ধারা প্রবাহিত ছিল। সেই সরতার গুণে 'আত্মচরিত'-এর উপভোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই 'আত্মচরিত' শতবর্ষ পূর্বেকার বঙ্গসমাজের একটি নিখুঁত চিত্র। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেশ চৌধুরী প্রমুখ দেশীয় এবং আন'ল্ড টয়েনবি, জর্জ মুলার, ফ্রানসিস নিউম্যান, রেভারেণ্ড ষ্টপফোর্ড ব্রুক প্রমুখ বিদেশীয় মহাপুরুষদের প্রত্যেকের সঙ্গেই শাস্ত্রীমহাশয়ের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়েছিল। 'আত্মচরিত' উনিশ-শতকী দেশীয় ও বিদেশীয় নারী-পুরুষের চরিত্র-চিত্রশালাও।
বাঙলার সেই গৌরবের যুগ গত হয়েছে—যখন জলে হাওয়ায় জড়িয়েছিল মানুষ তৈরির উপাদান। দুঃখকে তাঁরা অবলীলাক্রমে অতিক্রম করতে পারতেন, দুঃসাধ্য-সাধনে স্বপ্ন দেখতে শঙ্কিত হতেন না, বৃহৎ এবং মহৎ আদর্শের জন্য সর্বস্ব পণ করতে পারতেন সহজেই। শিবনাথ

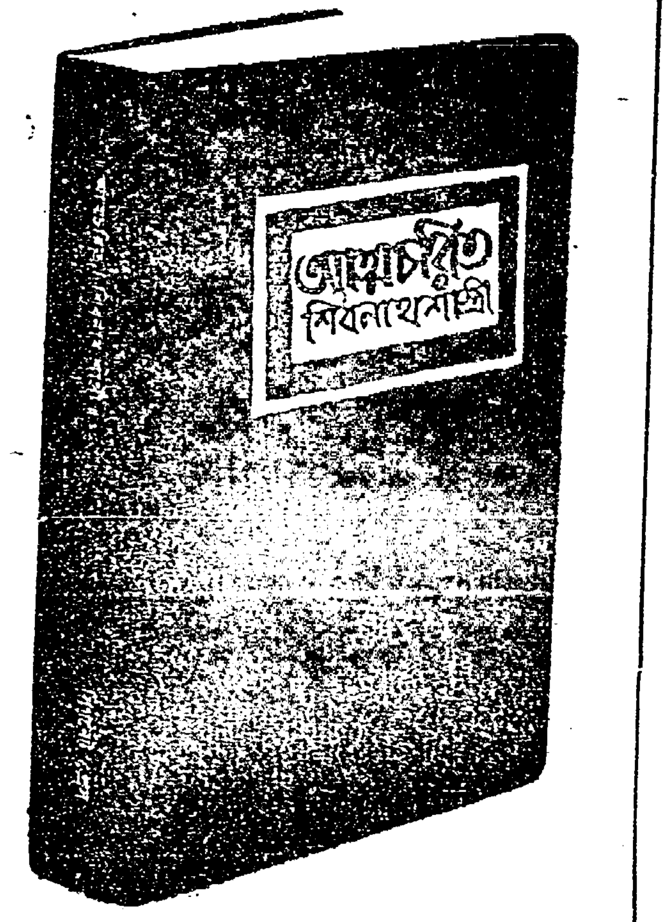

শাস্ত্রী ছিলেন এইকালের এক অসামান্য পুরুষ। সেই গৌরবময় যুগ এবং যুগস্রষ্টাদের আরেকবার নিবিড় সংসর্গ লাভ করা যায় তাঁর 'আত্মচরিত' এর পৃষ্ঠায়। সচিত্র দাম চার টাকা।

সিগনেট বুকশপ ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
১৪২।১ রাসবিহারী এভিনিউ

পুস্তিকাকারে ছাপানো পূর্ণ কলেবরে 'টুকরো কথা' সিগনেটের যে-কোনো দোকানে চাইলেই পাওয়া যাবে

পূর্ব্বাশা

প্রতিসংখ্যা—আট আনা

জ্যৈষ্ঠ—১৩৬১

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
কবিতাগুচ্ছ :	
কখনো নক্ষত্রহীন : জীবনানন্দ দাশ ...	৬৫
সান্ধ্য সঙ্গীত : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ...	৬৬
বিকল্প : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ...	৬৭
একটি কবির জন্যে : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	৬৮
ফেরারি দিনের ডায়রী : পরিমলকুমার ঘোষ ...	৬৯
বিস্ময় : মোহিত চট্টোপাধ্যায় ...	৬৯
একজোড়া হাঁস : শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় ...	৭০
অবরুদ্ধা : আনন্দ বাগ্চী ...	৭১
অবান্তর (?) : মোহাম্মদ কায়মুল হক ...	৭২
অরবিন্দ-দর্শনে বিবর্তন-প্রত্যয় : নির্মল মুখোপাধ্যায়	৭৩
প্রমথচৌধুরী ও আধুনিক বাঙলাগদ্য : সুবীর রায়চৌধুরী	৭৯
একটি বিমর্ষ কাহিনী : মিহির আচার্য ...	৮১
নিরামিষ মুড়িঘণ্ট : সত্যপ্রিয় ঘোষ ...	৯১
গড় শ্রীখণ্ড : অমিয়ভূষণ মজুমদার ...	৯৬
ভারত-সংস্কৃতির-সংক্ষিপ্ত প্রকাশ : ইন্দ্রজিত্ ...	১০৬
একটি কবরের খবর : শংকর চট্টোপাধ্যায় ...	১১০
সাংস্কৃতিকী : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ...	১১৫
নূতন বই : অমল দত্ত ...	১২৫

প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

মনোলীনা— ২॥০

সেতু বন্ধ— ২॥০

সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲

বিচিত্র হৃদয়— ২৲

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ১৯

স্মরণীয় দৃষ্টান্ত

নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ব্যবসার বাজার যখন সাধারণতঃ মন্দার দিকে, তখন হিন্দুস্থান বীমা ব্যবসায়ে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা

২ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার

অধিক কাজ করিয়া সর্ব্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।

নূতন বীমার কাজেও ইহার অগ্রগতি অসামান্য।

১৯৫৩

নূতন বীমা ১৮ কোটি ৮৯ লক্ষের উপর

এই সাফল্য হিন্দুস্থানের প্রতি জনসাধারণের অক্ষুণ্ণ আস্থার উজ্জ্বল নিদর্শন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, ৪নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১৩

কিশোরদের জন্য

বাংলার রূপকথা খুঁজে

এই উপন্যাসটি লেখা

নাবিক রাজপুত্র ও সাগর রাজকন্যা

লেখক :

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

দাম : দু'টাকা

প্রকাশক :

পূর্ব্বাশা লিমিটেড

৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ

কলকাতা

প্রমথ চৌধুরী

প্রবন্ধসংগ্রহ

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

কর্তৃক নির্বাচিত

পঞ্চাশটি প্রবন্ধ

॥ প্রথম খণ্ড ॥

সাহিত্য ভাষার কথা

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

ভারতবর্ষ সমাজ বিচিত্র

প্রথম খণ্ড ৬৲

দ্বিতীয় খণ্ড ৫৲

●

প্রমথ চৌধুরীর

অন্যান্য বই

বীরবলের হালখাতা	৩৲
চার-ইয়ারি কথা	২৲০ ৩৲০
Tales of Four Friends	১॥০
রায়তের কথা	॥০
হিন্দুসংগীত	॥০
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান	॥০

●

প্রমথ চৌধুরী সংখ্যা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

মূল্য এক টাকা

বিশ্বভারতী

কোমল তনুশ্রী

উষসী

অভিজাত প্রসাধন রেণু
সুপ্ত দেহ সৌন্দর্যকে
জাগ্রত করে

বেঙ্গল কেমিক্যাল ● কলিকাতা·বোম্বাই·কানপুর

এই ছোট মানুষ আর ছোটখাট

রাজা

যেদিনে ছিলেন সেদিনকার

সাহিত্য আজ ছোটদের মনের মতো গল্প তৈরী করে। তেম্নি একটি গল্প তৈরী করা হয়েছে **আলোর কুমার** বই-এ। গল্পটি লিখেছেন শিশু-মনস্তত্ত্বে যিনি সুদীর্ঘকাল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করছেন তিনি—

জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তা—

আষাঢ়ে গল্পের মতো শোনাবে বলে বইটি আষাঢ়ে বেরুবে

প্রকাশক ঃ

পূর্ব্বাশা লিমিটেড, কলকাতা

ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া বিল্ডিংস্

৬৪নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা-১৩

১৯৫২ ইং পর্য্যন্ত প্রথম ১৬½ বৎসরে পাঁচটি সার্থক ভ্যালুয়েশান।

প্রতি ভ্যালুয়েশানে পলিসি-হোল্ডারদের বোনাস্ এবং শেয়ার-হোল্ডারদের ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় বীমাজগতে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

এন্, সি, দত্ত
চেয়ারম্যান।

খাদ্যপ্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড্' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

সুপার নিও কড্

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ
কলিকাতা-১৩

পূর্ব্বাশা

জ্যৈষ্ঠ - ১৩৬১

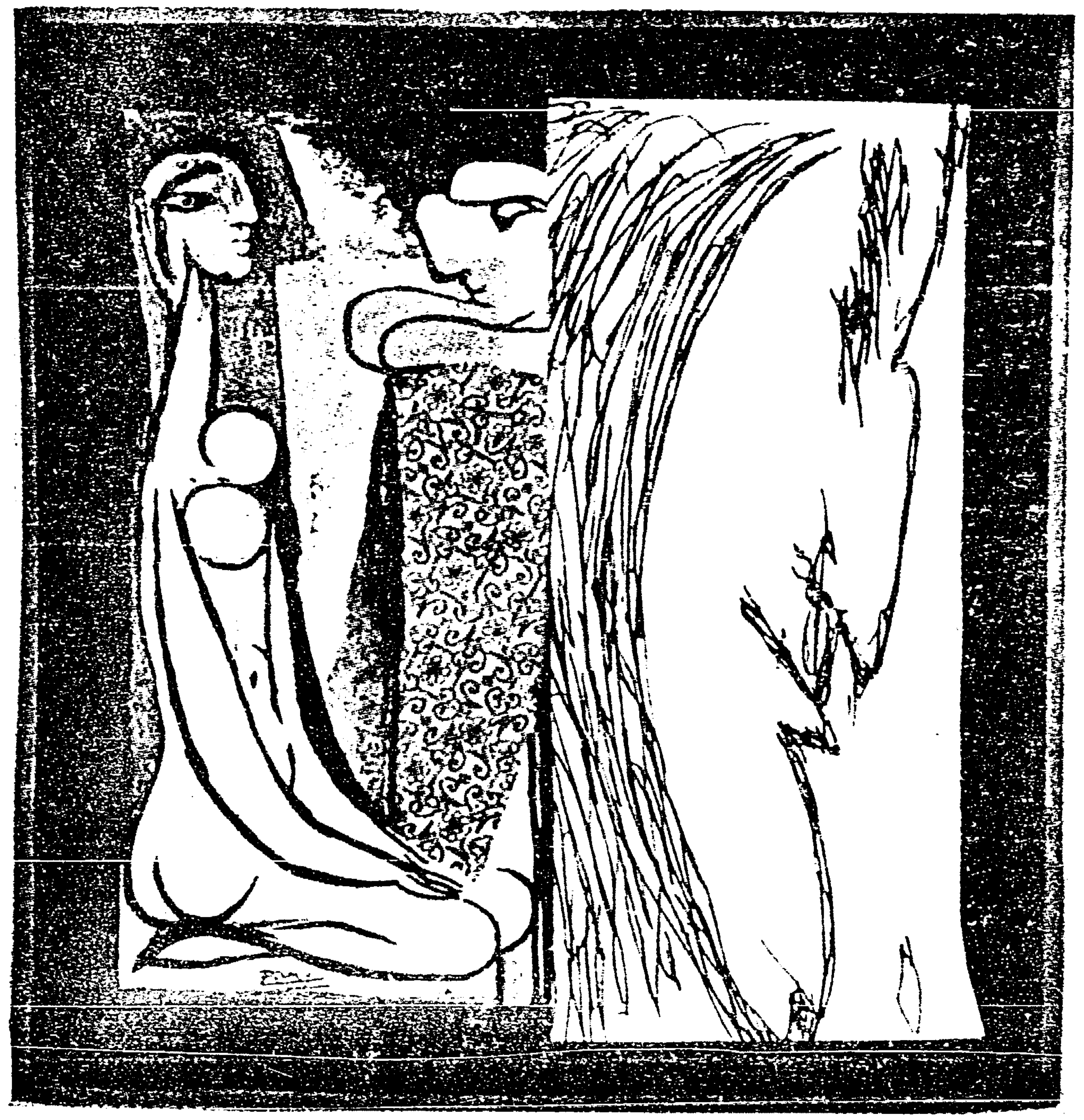

পিকাসোর আঁকা ছবি　　　　রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি

পিউরিটি বার্লি

সবসময়
আমি পছন্দ করি...

আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে পিউরিটি বার্লি সবসময়েই ভাল।
পিউরিটি বার্লি সেরা শস্য থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরি হয় — তা ছাড়া, এই বার্লি তৈরির পেছনে আছে ১৫১ বছরব্যাপী পেষাই-এর অভিজ্ঞতা।

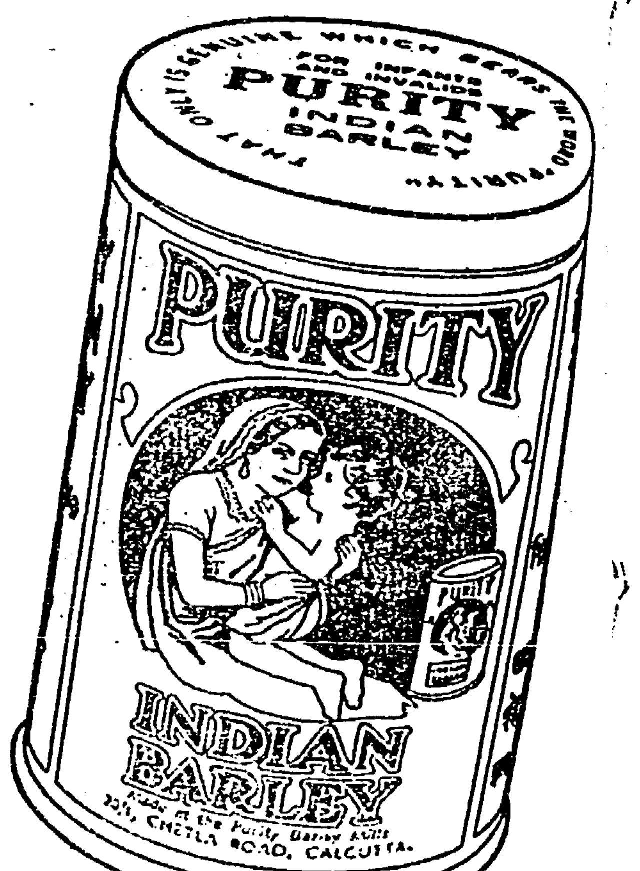

অ্যাটলাণ্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড
পোস্ট বক্স ৬৬৪, কলিকাতা - ১

APBX-II

পূর্ব্বাশা

জ্যৈষ্ঠ - ১৩৬১

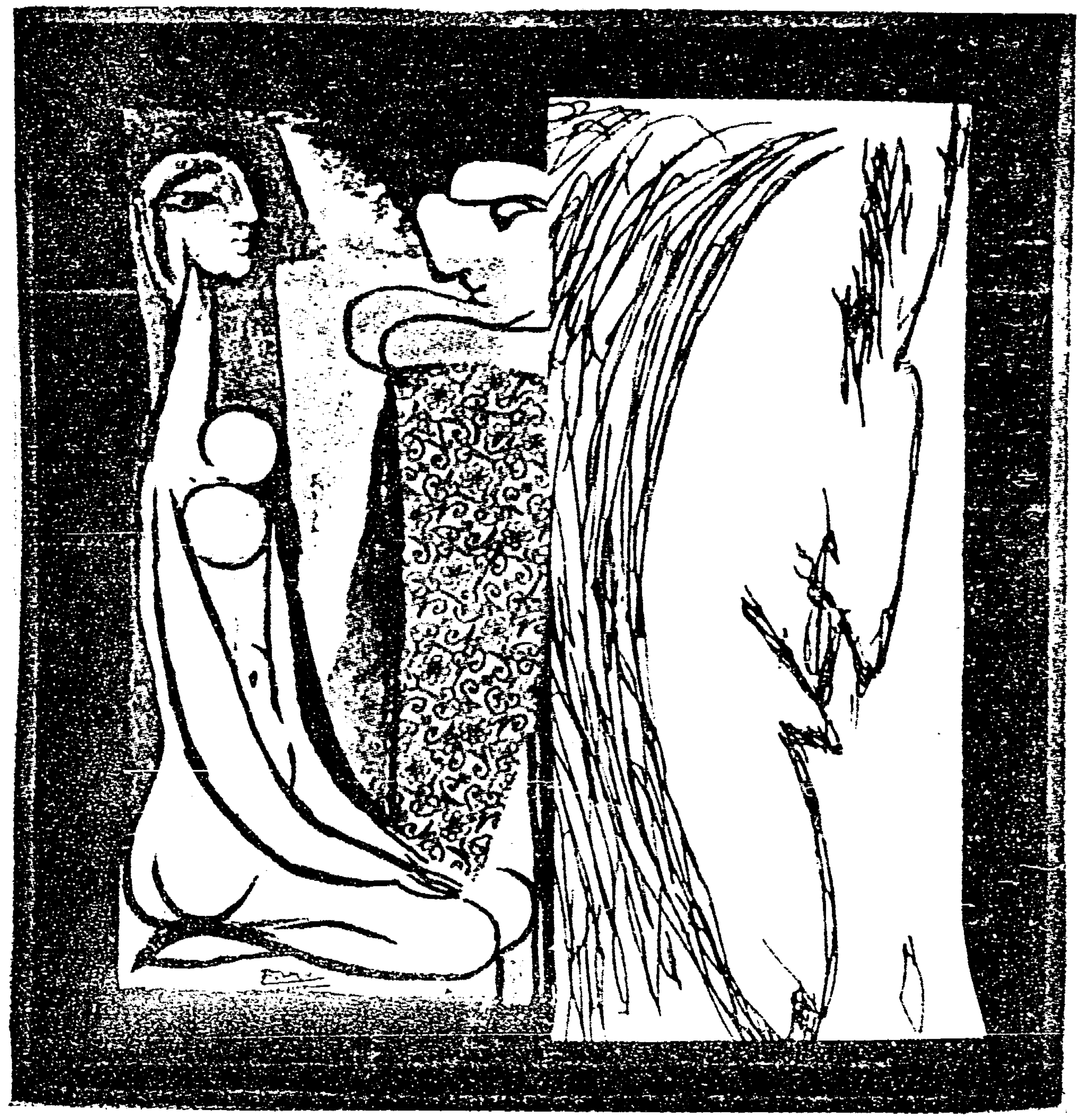

পিকাসোর আঁকা ছবি   রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি

পূর্ব্বাশা

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫১

কথনো নক্ষত্রহীন

জীবনানন্দ দাশ

কথনো নক্ষত্রহীন কুয়াশার রাতে
বাইরের ঝড়ের ঝাপসা আলোড়নের
অন্ধকার থেকে পাখি বাতির আলোয় উজ্জ্বল
ঘরের ভিতরে ঢুকে দু মুহূর্ত ব্যথা চিন্তা ভালোবাসা ভরা
মেঝেয় লক্ষ্মীর আল্পনা মেয়েদের
দেয়ালে ফ্রেস্কোর মূল্য বুঝে নিতে চেয়ে
ধুকধুকে বুকের অনন্ত শূন্যে তার
টের পায়—টের পায় যদি
একটি বিদ্যুৎ শুধু মানুষের মতো চেতনার
দেখা দিয়ে মিলোবার আগে
ব্যক্ত ক'রে যায় বুদ্ধ পতঞ্জলি জানে নি যে মানে ;—
আমিও অনেক দিন পরে আজ তেমনই সজ্ঞানে.
তোমার—আমার—এই পৃথিবীর কারণের দ্রিকে চেয়ে আছি ;
ফল নয়—কোনো নিরসন নয়—দু'জনের খুব কাছাকাছি
আসা নয়,—শুধু সময়ের শাদা-কালোর সাগরে
জল যেন ক্রমে শূন্য অন্ধ হ'য়ে ঝরে :
তোমাকে আমাকে স্থির নিঃশব্দ করে।

সান্ধ্য সঙ্গীত

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

জীবনের খেয়াল

মৃত্যু এক চিল,
চোখে তার দুই ফোঁটা কিরণ-সলিল।
কণ্ঠে সুর কতো যে সুদূর
সুরার মতন ঢালে স্নায়ুতে আবার
অজস্র তারার নিভে-আসা মৃদু অন্ধকার-ধ্বনিত নূপুর।

মৃত্যু-চিল ঝাঁপ দেয় পেয়ে বুঝি পৃথিবীর নীল।

ফিরে কি যাবার
সাধ হয় প্রাণ নিয়ে অপ্রাণের দেশে ?
তাই মৃত্যু থাকে ভালোবেসে
রুপোলি জীবন, তার প্রাণের নিখিল।

উঠে এসো জলকন্যারা
এসো ঘাসে বন-বিছানায়
তোমরাই হতে পারো তারা
যা জানোনা দু'জন জানায়।

মৃত্যুর সমুদ্র-নীল থাক না আকাশে পাখা মেলে,
তুমি সাগরিকা, আমি মাটির তিতির,
হৃদয় জড়িয়ে নেবো নীলা অতিথির
মনোময় কোনো সন্ধ্যা পেলে॥

মৃত্যুর ধ্রুপদ

এখনো সমুদ্র মনে পড়ে,
পূর্ণকুম্ভা পৃথিবীর মুখ।

অপহৃত হৃদয় উৎসুক
হয়ত এখনো, দিবারাত্রিতে শিহরে।
পৃথিবীর হৃদয়ের ক্ষত
হয়ত বা এতোদিনে আকাশের সময়ের মতো।

মনে পড়ে :
আমার জলসাঘর,
মুক্তো কন্যা মীন চোখ ডাগর ডাগর,
পাল তুলে দূরে যায় ভেঙে পড়ে হাজার শীকরে।

তা-ও মনে পড়ে :
কে যেন ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে সবুজে
আয়-আয় ডেকেছিল কাকে খুঁজে-খুঁজে
তবু সে-সমুদ্র ছেড়ে কেউ—
অরণ্যের নীল হতে লীলায়িত ঢেউ—
ফেরেনি পাতার ঘরে।

মাটিতে কি আর জল আছে ?
দুপুরের ছায়া আর বিছানো কি গাছে
এখনো তেমন হয় ?
আছে কি এখনো ফুলরাঙা স্মৃতি মেখে সেই মেয়ের হৃদয় ?

বিকল্প

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ক্ষমা করো, যদি এই জনতার সমুদ্রে আমার
লজ্জাহীন আকাঙ্ক্ষার নৌকা না ভাসাতে পেরে থাকি,
উদ্দাম ইচ্ছাকে যদি সারাক্ষণ বন্দী করে রাখি
আত্ম-অবমাননার ভয়ে, যদি উন্মার্গ লোভের

দাসত্বে রুচি না থাকে, যদি পান্থশালায় সংসার
না-ই পাতি: প্রিয়তমা, এখানে আনন্দে কিংবা শোকে
মগ্ন হওয়া অর্থহীন, দর্শকের নিষ্ঠুর ক্ষোভের
লক্ষ্য হয়ে লাভ নেই প্রহসনপঞ্চাঙ্ক নাটকে।

বরং দু'দণ্ড এই শ্যামশষ্প মাঠের গভীরে
বসে থাকি, স্নেহশান্ত আম-জাম-ঝাউয়ের ছায়ায়
কথা বলি কিছুক্ষণ, বিকেলের নির্জন হাওয়ায়
সমস্ত ক্ষুধার ক্ষোভ করাই নিঃশেষে। প্রিয়তমা,
সেই ভালো, অন্তরঙ্গ হাসির ঝাপটার দাও ছিঁড়ে
ইচ্ছার সমস্ত ক্লান্তি, আকাঙ্ক্ষার দৈন্য করো ক্ষমা।

একটি কবির জন্যে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রেম তাকে দীর্ঘদিন ছেড়ে গেছে; প্রিয়া কালক্রমে
অন্য কোনো নগরীর প্রাসাদে কি চুনখসা ঘরে
পুত্র-কন্যা-পরিবার নাতি-নাৎনী এইসব নিয়ে
হয়তো উৎসবে মত্ত, কিম্বা বুভুক্ষায় হাহাকারে,
যেভাবেই দিন কাটুক বয়েসের আরেক সঙ্গমে
তীর্থ সেরে এতদিন পৌঁছে গেছে ক্লান্তির বন্দরে।

মিতা তাকে যতদিন প্রয়োজন ছিলো সঙ্গ দিয়ে
অধুনা অধিক পরমার্থলাভ পণ্ডশ্রম জেনে
অন্যত্র আদর্শবাদী; কিম্বা যারা দুর্দিনে ও ঝড়ে
ছাড়েনি বারান্দা তার, নেহাৎ সাধুসংকল্পের টানে
সামান্য নুনমাখা ভাতে ভাগ বসিয়ে তাকে ধন্য ক'রে
শত্রুগৃহে দিবারাত্রি বিস্তারিত তারি নিন্দা ভনে।

তবু সে ভাস্কর, চিত্রে প্রতিমায় রঙের বিস্ময়ে
দেখি তাকে অপরূপ প্রীতি সখ্য শপথ আশ্রয়॥

ফেরারি দিনের ডায়রী

পরিমলকুমার ঘোষ

আশঙ্কা উদ্বেল রাত, ছলনার ক্লান্তিমাখা দিন
ঠেলে ঠেলে অবিরাম দিশাহীন এই পথটানা।
প্রাগৈতিহাসিক কোন ম্যামথের ক্ষুধিত, বিশাল,
অন্ধকার গর্ভে তবু হারিয়েছে সে পথের শেষ।
তাই এ চলার গানে আনন্দের মৃদঙ্গের তাল
ওঠেনা ধ্বনিত হ'য়ে, শুধু ক্ষীণ বিলম্বিত রেশ
ভেসে আসে মীড়হারা সেতারের। যদিও ঠিকানা
জানিনা, তবুও চলি,—জীবনের অচ্ছেদ ঋণ।

কিন্তু কখনও যেন ইথারের বাঁধা পথ হ'তে
ছুটে যাওয়া কোন ঢেউ ছুঁয়ে যায় মনের কিনারা
চিত্তহীন মধ্যবিত্ত জীবনের অনেক গভীর,
গভীর অন্তর জুড়ে নিয়ে আসে আশ্চর্য ইশারা।

আশাবরী রাত্রি জ্বলে—চেতনার ম্লান তামসীর
অন্ধকার মিশে যায় আলোকের অপ্রমেয় স্রোতে॥

বিস্ময়

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

ও-মুখ তোমার প্রাগুষা-আকাশ, অগ্নিশুচি,
আমার হৃদয় শ্বেতকরবীর বাহুতে টেনে
মনের নৃত্যে থর থর আনে আত্মদান।
তিমিরস্তব্ধ ঘুমে দিয়ে ঢেউ, হৃদয়ে এনে
তোমার বাসনা দু'চোখে জ্বালার দহন-সুখ
ঘুমন্ত মেঘে তুমি ঢাকো মুখ, এ কোন মুখ?

আমার রাত্রি মেঘেরগুচ্ছ তোমার কেশ
ছুঁয়ে ছুঁয়ে নামে শীতালি-শংকা আঁধারে নুয়ে।
অন্ধকারের দিকভুল-হাতে কখনো তবু
চকিতে তোমার যৌবন-আলো হৃদয়ে ছুঁয়ে
বাসনা আমার কিংশুকে কাঁপে দীপান্বিত।
তোমার বাহুতে মনো-কাতরিমা দ্বিধান্বিত।

বাহুতে তোমার সীমিত-সংগ পৃথিবী বুঝি ;
ত্রিকালে আমার তবু মৈত্রেয়ী তোমার মুখ
হৃদয়ের ঘ্রাণে অসহ পৃথিবী, অপার্থিবা।
তোমার স্পর্শে বেদনাকে ছুঁই, এ কোন সুখ ?

একজোড়া হাঁস

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

একজোড়া হাঁস চোখ মেলে দেখে রাত্রি
পাঁচিলের গায়ে হঠাৎ হয়েছে জড়ো—
সময় চলে না যেন তার সরোবর-ও
পংকিল ধীর ছায়ার ধূসর ধাত্রী !

তাহলে কোথায় তারার রাজ্য ছড়ানো,
অঝোর প্রেমের বন্যায় জমকালো,
আকাশের আলো চাঁদের ঠাণ্ডা আলো
কোথায় থিতোয় কার সারাগায়ে জড়ানো ?

উলুখড়ে বুনো হাওয়া তুলে যায় শব্দ ঃ
দূরপ্রান্তরে সরীসৃপের ভয়,
এইখানে আহা জীবনের নয়-ছয়,
আহত প্রেমে এ-পৃথিবী যে অনুতপ্ত !

এই সময়ের অন্ধ আকাশ পেরিয়ে
কোথায় অসীম সকালের হিম-জল
ভোরের গন্ধে নিভৃতে উচ্ছল
পরিচিত দিন নামবে তিমির এড়িয়ে ঃ

সময়, পৃথিবী, আকাশের পরিসর,
আলো, হাওয়া, গান, আমাদের চারিদিক,
বলো, কথা কও, বলো শুধু ঠিক ঠিক
এরা পাবে কিনা মুক্তির নির্ঝর !

অবরুদ্ধা

আনন্দ বাগ্‌চী

তোমার দরজা বন্ধ দেখেছি জীবন ভর
স্তব্ধ কড়াটা দাঁড়িয়ে নাড়বো সময় কই
তোমার ঘর যা ভেঙে দিয়ে গেছে পঞ্চশর,
ধূসর ফাগুন ভ'রেছে সে ঘর অজ্ঞ নই।

জ্যোস্নার পাখি ছায়াচিত্রের ছড়ায় পাখা
দুচোখে এখন অনেক ক্লান্তি পরায় ঘুম
দুপায়ে দুপুর শ্রান্তির রাঙা-ধূলোয় আঁকা,
এখনো হৃদয় সুপ্ত অধরে ছড়ায় চুম ?

নাড়বো না কড়া কান্না পাক
ডাকবো না নাম সময় কই
থামবো না, মন, বন্য পাক
কালের সুতোয় অজ্ঞ নই।

থামবো না, এই ধনুকরাতের তীক্ষ্ণ শর
পরান কুহরে যদি বিঁধে দেয় তন্দ্রা ভয়,
বুঝবো পলাশ কৃষ্ণচূড়ার কাম্য জ্বর
রক্তিম অনুলিপিই লিখেছে, স্বপ্ন নয়॥

অবান্তর (?)

মোহাম্মদ কায়সুল হক

'কোনো দিনই কি জানবো না এই গাঢ় অন্ধকারের ভাষা,
জানবো না কি করেই বা আমার দরজায় টোকা পড়ে
রোজ শুভ্র ভোরের ;'
—কৌতূহলী চোখ তুলে শুধালো সে।
একটুখানি থেমে থেকে আবার শুরু :
'পূর্ণিমার চাঁদ এতো ভালো লাগে কেন,
জ্যোৎস্নার গুঁড়ো মেখে পাখির শুভ্র পালকের মতো
নিজেকে ছড়িয়ে দিতে এতো সুখ ! কিন্তু কেন ?'

সব চুপ। মুখোমুখী আমরা দু'জন।···
তাকালাম আকাশের দিকে—
আকাশ তারায় গ্যাছে ভরে, (ঘরে আলো দিয়ে গেছে অনেক আগেই।)
বল্লাম, 'কী সুন্দর এই তারা ভরা আকাশ না ;'
(একি, আমার পালা !)
—আর কিছু জোগালো না মুখে ;
উঠে গেলো সে নীরবে।

প্রশান্তির ভারে নিষ্কম্প নিথর হয়ে
আমি সেখানেই বসে রইলাম কতোক্ষণ।···
মায়াবী আকাশ সচকিত করে লাফ দিলো গোলগাল চাঁদ,
(আমিও উঠলাম কেঁপে ;) তাকালাম আকাশের দিকে।

মনে-মনেই আউড়ে গেলুম : 'কী সুন্দর এ পৃথিবী !'

অরবিন্দ-দর্শনে বিবর্তন-প্রত্যয়

নির্মল মুখোপাধ্যায়

[এক]

সাম্প্রতিক পত্র-পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের দর্শন নিয়ে আলোচনা করার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, এধরণের প্রচেষ্টামাত্রই উৎসাহব্যঞ্জক। শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাধারা, তাঁর ধ্যান-কর্ম ও সাধনা আমাদের বুদ্ধিগত চেতনার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক এবং এ-দিক থেকে তাঁর প্রতি 'আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান দৃষ্টি আকর্ষণ মানস-সচেতনতারই পরিচায়ক। কিন্তু সেই দৃষ্টি আকর্ষণের যে পরিণতি তাতে কিছুটা শংকার কারণ হয়েছে। কারণ, তার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই শ্রীঅরবিন্দ হয়ে উঠেছেন একান্তভাবেই যোগী কিংবা একান্তভাবেই ভাববাদী দর্শনের একজন সাধারণ উত্তরসূরী এবং সেই হিসেবেই তিনি গ্রাহ্য হচ্ছেন কিংবা অপাংক্তেয় হয়েছেন। এমন কথাও উচ্চারিত হয়েছে যে, অরবিন্দ-দর্শন শুধুমাত্র ভাববাদীই নয়—তা পরোক্ষে ইতিহাস-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সহায়ক হয়ে উঠেছে, যার প্রমাণ, মার্কিন দেশে শ্রীঅরবিন্দের স্বীকৃতি। এই একান্ত সংকীর্ণ নেতিধর্মী যুক্তিশূন্য প্রবণতার পিছনে যে যথার্থ জ্ঞান-নিষ্ঠা ও সত্য:উপলব্ধির প্রেরণা নেই তা বিশদের প্রয়োজন হয়না। শুধুমাত্র স্মরণীয় এই যে, একদিকে সংকীর্ণ গোষ্ঠী-চেতনা এবং অন্যদিকে বিশ্বাস-পরায়ণ ভক্তের উচ্ছ্বাস—এই দু-ই অরবিন্দ-দর্শন বোঝা ও উপলব্ধির পক্ষে প্রতিবন্ধক। কারণ, জ্ঞানের আলোচনায় এ-মনোভাবের স্থান নেই। অধিকন্তু, অরবিন্দ-দর্শন আলোচনাকালে একথা আরও বিশেষ ভাবে মনে রাখতে:হবে।

শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র দর্শন ও ধ্যান-কর্ম বোঝবার চেষ্টা বর্ত্তমান প্রবন্ধে করা হবেনা। সমগ্র অরবিন্দ-দর্শনের একটি কেন্দ্রগত সত্তার বিশ্লেষণই আমার উদ্দেশ্য ; অরবিন্দ দর্শনের বিবর্ত্তন-প্রত্যয়ের উপলব্ধি শুধু মাত্র তাঁর স্বীয় চিন্তাধারার গভীরে প্রবিষ্ট হওয়া নয়—আমাদের সমসাময়িক যুগের বিজ্ঞান-দর্শনের মূল প্রশ্ন ও সমস্যা এবং মানব-সভ্যতার সংকটকালের প্রকৃতি বোঝাও অনেক পরিমাণে সহজ হয়ে আসবে। অরবিন্দ-দর্শনের সেই ব্যাপকতর পরিধি ও ব্যঞ্জনাময় তাৎপর্য্যের দিকে চিন্তাশীল মানসের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও আমার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

[দুই]

অরবিন্দ-দর্শনে বিবর্তন-প্রত্যয় বহুদিক হতেই অর্থবহ। কিন্তু বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিবর্তনবাদ কিংবা অভিব্যক্তিবাদের সংগে তার পার্থক্য সর্বাগ্রে স্মরণীয়। বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিবর্তনবাদ, বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ, শুধুমাত্র জীবনের বাহ্যিক গতি-প্রকৃতির কার্য-কারণ নির্দেশ করছে। বস্তু থেকে প্রাণ এবং প্রাণ হতে মানস অথবা চিত্তের অভিব্যক্তির একটি সাধারণ সূত্র আবিষ্কারের কাজেই বিজ্ঞান একান্তভাবে নিয়োজিত (*The Life-Divine, P. 5,738,744*)। কিন্তু বস্তু থেকে প্রাণপঙ্ক এবং সেই

প্রাণপঙ্কের মধ্য হতেই মানস এবং চিত্তের বিকাশের গভীর তাৎপর্য নির্ণয়ে বিজ্ঞান আজও অসমর্থ। তাই জীবনের গভীর তাৎপর্য ও তার প্রবাহকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন-বিবর্তন প্রত্যয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে হবে। জীবন তো একটি জৈবিক প্রবাহের দিশারী নয়। প্রবাহ মাত্রই অর্থবহ; এবং সেই মূল অর্থ নির্দ্ধারণ করাই বিবর্তনবাদের মূল্যবান দায়িত্ব বলে মনে করেন শ্রীঅরবিন্দ। আর তার সন্ধান করতে গিয়েই তিনি খুঁজে পেয়েছেন সমগ্র জীবন প্রবাহের কেন্দ্র শক্তিকে : 'Evolution is an inverse action of the involution : what is an ultimate and last derivation in the involution is the first to appear in the evolution; what was original and primal in the involution is in the evolution the last and supreme emergence' (*Ibid, PP. 759-60*).

বলা বাহুল্য, শ্রীঅরবিন্দের বিবর্তন-প্রত্যয় উদ্দেশ্যবাদী (purposive)। তাঁর কাছে বিবর্তনের সাধারণ অর্থই হচ্ছে 'successive creation with a developing plan'। শ্রীঅরবিন্দের বিবর্তন-প্রত্যয়ে উদ্দেশ্যবাদের প্রয়োজনীয়তা সর্বক্ষণই স্বীকৃত হয়ে আছে। এমন কি তার আধ্যাত্মিক-বিবর্তনের প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা এবং সেই বিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী-প্রকৃতিও এই উদ্দেশ্যবাদের সংগে অচ্ছেদ্যভাবে গাঁথা। সুতরাং বিবর্তনের উদ্দেশ্যবাদী-প্রকৃতি বোঝা প্রয়োজন। শ্রীঅরবিন্দ বিবর্তনের উদ্দেশ্যবাদী প্রকৃতি নির্দ্দেশ করেছেন দু-ভাবে। প্রথমত, দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ অথচ তারই মধ্যে বিবর্তিত জীবন-প্রবাহের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন। বস্তুতেই রয়েছে প্রাণ; তাই বস্তু থেকে প্রাণের আবির্ভাব। তেম্নি প্রাণের মধ্যে ছিল মানস; তাই মানসের বিকাশ। নিম্নস্তরে প্রাণীর মধ্যেই ছিল নররূপী বানরের অভিব্যক্তির শক্তি; নররূপী বানরের উন্নতরূপ বুদ্ধিশীল মানবে পরিণতি তাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর অর্থ কি? এর অর্থই বিবর্তন-প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যবাদের স্ব প্রতিষ্ঠা এবং আধ্যাত্মিক-বিবর্তন-তত্ত্বের যুক্তির যৌক্তিকতা। "If the appearence in animial being of type similar in some respects to the ape-kind but already from the beginning endowed with the elements of humanity was the method of evolution, the appearance in the human being of a spiritual type resembling mental-animal humanity but already with the stamp of the spiritual aspiration on it would be the obvious nature for evolutionary production of the spiritual and supramental being" (*Ibid, PP. 744*).

বিজ্ঞানের কষ্টি-পাথরে এই উদ্দেশ্যবাদী বিবর্তন-প্রক্রিয়ার অসারতা প্রমাণ করার চেষ্টা অযৌক্তিক এবং আমার মতে সম্পূর্ণ ভাবে অপ্রাসঙ্গিকও বটে। কেননা, যে দর্শনে স্বজ্ঞা (intuition) স্বীকৃত হয়েছে পূর্ণজ্ঞানের একমাত্র সার্থক পথ হিসেবে এবং বিজ্ঞান ও বুদ্ধিগত ব্যাখ্যাকে বলা হয়েছে মানস সর্ব্বস্ব সত্তার কর্মরূপ, তার বিচার কিংবা মূল্যায়ন বিজ্ঞানের মাপকাঠির বাইরে।

[তিন]

আসল কথা, শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক-বিবর্তন প্রত্যয়ের পিছনে যে প্রয়োজন-বোধ রয়েছে তার দিকে আমাদের দৃষ্টিকে ফেরাতে হবে। বিবর্তনের উদ্দেশ্যবাদী প্রকৃতির যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে তিনি সেই প্রধান কথাটাই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

সুদীর্ঘকাল ধরে মানব-জাতির জীবন-প্রবাহ চলেছে। দেশ ও কাল-ব্যাপী এই প্রবাহের মধ্য দিয়ে তার প্রচুর উন্নতি হয়েছে; দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্পকলা প্রভৃতি কর্মরূপ ও মানস-সৃষ্টির সংগে সংগে নতুন ভাবে এবং নতুন ভংগীতে ব্যবহারিক জীবনকে গড়ে তোলার দুর্নিবার প্রচেষ্টাও অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ও সাধনা মানুষের সাগ্রিক সত্তা ও চেতনায় আমূল কিংবা মৌলিক পরিবর্তন ঘটায় নি; মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান ধ্যান, জ্ঞান ও সাধনা তাকে মানস-বৃত্ত অতিক্রম করার দিকে এগিয়ে নিয়ে নতুন সত্তায় পরিণত করেনি। আজও মানস-সৃষ্ট বৃত্তে কিংবা পরিমণ্ডলেই তার অবস্থান; তাই খণ্ডবোধের প্রাধান্য—তাই খণ্ডিত জীবনাচরণের অসারতা (*The life Divine pp. 749.*)। অথচ বিবর্তনের প্রকৃতি থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মানস-বৃত্তে অবস্থান কোনক্রমেই বিবর্তনের চরম কথা হতে পারে না। মানব-সত্তার গভীরে রয়েছে প্রচলিত আবহ ও অস্তিত্বের সীমাকে অতিক্রম করার প্রেরণা ও সম্ভাবনা: "The spiritual aspiration is inate in man; for he is, unlike animal, aware of imperfection and limitation and feels that there is something to be attained beyond what he now is : this urge towards self-exceeding is not likely to die out to totally in the race." (*Ibid pp. 750.*)

মানব-জীবনের অপূর্ণতা এবং সেই অপূর্ণতার মধ্যেই পূর্ণতার অবশ্যম্ভাবিতার উপলব্ধি সমগ্র অরবিন্দ-দর্শনের, বিশেষকরে আধ্যাত্মিক-বিবর্তন প্রত্যয়ের ঐতিহাসিক প্রয়োজন-বোধ। প্রয়োজন-বোধের এই আবহেই শ্রীঅরবিন্দ-নির্দেশিত আধ্যাত্মিক-চেতনার (spirituality) মধ্যবর্তিতায় অতিমানসে উন্নীত হওয়ার (supermind) ও দিব্য জীবন লাভের আন্তর মূল্য অনেকটা বোধ্য। বিবর্তনের উদ্দেশ্যবাদ জীবনকে পূর্ণতা ও সাযুজ্যের দিকে ইংগিত করছে সত্য; কিন্তু, সমসাময়িক মানুষকেই তার বুদ্ধির স্ববিরোধিতা, সত্তার অপূর্ণতা ও ধ্যানের খণ্ডবোধকে অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক চেতনা, অতিমানস এবং দিব্য-জীবন লাভের দিকে এগোতে হবে—এও শ্রীঅরবিন্দেরই কথা। প্রকৃতির অন্ধ-নির্দেশ কিংবা বিবর্তনের নিয়তির কাছে আত্ম-সমর্পণ নয়—তার গতি ও প্রকৃতিকে জেনে বুঝে নিজের অগ্রগতির প্রাধান্যই স্বীকৃত হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের বিবর্তন-প্রত্যয়ে।

একথাটি মনে রাখলেই বোঝা যাবে যে, দিব্য-জীবন প্রত্যয়ের পিছনে কোন রহস্যময় যোগ সাধনা নেই—মানবিক মূল্যের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠার সাধনাই তার গভীর মর্মার্থ। কারণ, দিব্য-জীবনের যে রূপ শ্রীঅবিন্দের কথায় মূর্ত হয়ে উঠেছে তাকে শুধুমাত্র কৃচ্ছ্র সাধনরত যোগীর মূর্তি বলে ভাবা যায়না। "To become complete in being, in consciousness of being, in force of being, in delight of being and to live in this integrated completeness is the divine living" (*The Life Divine, pp. 909*).

প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় রহস্যময় যোগীদের সাধনা-প্রণালী এবং জীবন-ইতিহাসের সংগে পরিচিতির ফলে আমরা অতি-সহজেই উপযুক্ত জীবন ধারাকে রহস্যময় কৃচ্ছ্র-সাধনার সমগোত্র বলে মেনে নিয়েছি। ভুলে গিয়েছি, শ্রীঅরবিন্দের যোগ-সাধনার সংগে কৃচ্ছ্র-সাধনা, মন্ত্র ও তন্ত্রের ব্যপক পার্থক্য বর্তমান। শুধু তাই নয়, সেই পার্থক্যের অর্থ বোঝার চেষ্টা খুব কমই হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই জন্যই তাঁর বহু শিষ্য ও ভক্তের কৃপায় জীবিতাবস্থাতেই তিনি একজন সাধু এবং অবতারে পরিণত হয়ে

গিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের ত ঐতিহাসিক দৃষ্টির মধ্যে সমসাময়িক মানব-জীবনের যে সমস্যা এবং মানব-সভ্যতার সংকটকালের যে অত্মঘাতী রূপ ধরা পড়েছিল, তা তাঁর অনেক ভক্ত ও শিষ্যদের দৃষ্টির বাইরে থেকে গিয়েছে।

বিজ্ঞানের প্রচুর উন্নতি হওয়া সত্বেও এবং জীবনের নানা দিক সম্পর্কে সমসাময়িক মানুষের অভিজ্ঞতা বহুগুণে বর্দ্ধিত হওয়ার পরেও মানব-জীবনের সামগ্রিকতার মূল্য ও তাৎপর্য উপলব্ধির প্রচেষ্টা আজও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হয়নি। মানুষের কথা-কর্ম ও চিন্তার মূলগত ঐক্যের এবং সাযুজ্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনের দিকে আমাদের সক্রিয়তার অভাব স্বীকার্য। বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে বিজ্ঞান আমাদের সামনে যে তথ্য উপস্থিত করেছে তার উপর ভিত্তি করে সমগ্র অস্তিত্বের প্রকৃতি ও প্রবাহ-ধারা অনুসন্ধানের কাজে এ-যুগের মানস অনেক পশ্চাদ্পদ। বস্তুত দেখা যাচ্ছে, খণ্ডিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার (specialised and knowledge experience) মাধ্যমেই সমগ্র অস্তিত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসা করা হচ্ছে। ফলে, সমগ্র জ্ঞান ও চিন্তার জগতে সংকট উপস্থিত হয়েছে। প্ল্যাঙ্ক্ আইনষ্টাইন-হাইসেনবার্গ শ্রোডিঙ্গারের যুগান্তকারী গবেষণা ও পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে স্বাধীন ইচ্ছার যুক্তি দেখানো হচ্ছে এবং অনির্দেশ্যবাদের পটভূমিতে সমগ্র মানব-জীবনে অসারতা ও জ্ঞানের চিরন্তন সীমাবদ্ধতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ, ভুলে যাওয়া হয়েছে যে, জ্ঞান ও চিন্তা ইতিহাস-বিচ্যুত স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা নয়, কারণ প্রবহমান সামগ্রিক জীবনই ইতিহাসের ধারক ও বাহক। এ বোধ ও উপলব্ধি মার্ক্সীয় ইতিহাস-দর্শনের গভীরে: "...modern materialism sees history as the process of evolution of humanity and its own task as the discovery of the laws of motion of the process"—অ্যান্টি-ডুহ্রিংএ এটা এঙ্গেলসেরই কথা। আমাদের সমসাময়িক যুগের সমাজ বিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহাইমের Sociology of Knowledgeও এই একই কথা বলতে চেয়েছে। জ্ঞানের এই ইতিহাস-নিয়ন্ত্রিত প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রাখলে অনেক বিভ্রান্তির হাত হতে মুক্ত হওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও গবেষণা এবং দর্শনের চিন্তা ও ধ্যানরূপকে ইতিহাস-বিচ্যুত ভেবে বোঝা ও বোঝানোর প্রচেষ্টা আজ তাই বুদ্ধির বিভ্রান্তি ও অনতিক্রম্য স্ব-বিরোধীতায় পর্যবসিত হয়েছে। অথচ, দর্শন বিজ্ঞান ও ইতিহাসের তাৎপর্য নতুনভাবে উপলব্ধি করার দিকেই বিজ্ঞানের ক্রমবর্দ্ধমান বিস্তৃতি ও প্রসারতা আমাদের এগিয়ে নিতে চাচ্ছে। এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমাদের পিছনে পড়ে থাকা অবস্থার পরিপ্রেক্ষাতেই শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক বিবর্তন প্রত্যয় ও দিব্য-জীবনের সত্যকার রূপটি প্রতিভাত হওয়া সম্ভব। কারণ, পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সমগ্র অরবিন্দ-ধ্যানকর্মের মূলে রয়েছে সমসাময়িক মানুষ ও মানব-সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থার আত্যন্তিক উপলব্ধি: "At present man-kind is undergoing an evolutionary crisis in which is concealed a choice of its destiny; for a stage has been reached in which the hnman mind has achieved in certain directions an enormous development while in others it stands arrested and bewildered and can no longer find its ways ... ... science has put at his disposal many potencies of the universal force and has made the life of humanity materially one, but what uses this

universal force is a little human individual or communal ego with nothing universal in its light of knowledge or its movements, no inner sense or power which would create in this physical drawing together of human world a true life of unity a mental unity or a sprititual oneness" (*The Life Divine*, *PP. 932*). এ-চেতনা ও উপলব্ধি, অবশ্যই, অনেকের কাছে ঐতিহাসিক চেতনার সগোত্র বলে মনে হবে না। কারণ, শ্রীঅরবিন্দ সার্বিক সংকটকে অর্থনৈতিক সংঘাত ও অ-ব্যবস্থার মধ্যে খোঁজেন নি। তিনি তা দেখেছেন সমগ্র মানব-জাতির অস্তিত্বের মধ্যে। আমার মতে, এখানেই শ্রীঅরবিন্দের যথার্থ ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসের যে অর্থ পূর্বে কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকেই এটা পরিষ্কার যে, সংকট শুধুমাত্র একটি বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত অবস্থা নয়। সমগ্র জীবন-প্রবাহের মধ্যেই তার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দ তার নিজস্ব দার্শনিক দৃষ্টির মাধ্যমে সেইটেই ধরতে চেয়েছেন। বলা বাহুল্য, অরবিন্দ-দর্শনে সেই জন্যই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কৃচ্ছ্র-সাধন মন্ত্র উপেক্ষিত (*Ibid, PP. 785*), ধর্মের ভিত্তিতে মানব-জীবনের পূর্ণতালাভের পথ অসমর্থিত এবং মায়াবাদী যুক্তির স্ব-বিরোধীতা ও অসারতা স্পষ্ট। (*Ibid, PP. 418, 419*).

অবশ্য, শ্রীঅরবিন্দ নির্দেশিত দিব্য-জীবনের মধ্যেই মানব-সভ্যতার সংকটের মুক্তি এবং মানব-জীবনের ও ব্যক্তি-সত্তার পরিপূর্ণ ও সার্বিক বিকাশ সম্ভব কি না—এই সব মূল প্রশ্ন সংগত ভাবেই আমাদের বিজ্ঞানভিত্তিক মর্নে দেখা দেবে। কিন্তু, দিব্য-জীবন প্রত্যয় আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি একটি চরম প্রশ্ন রেখেছেন যা, এযুগের অনেক চিন্তাশীল মানসেও আন্দোলিত হচ্ছে।

বহু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আবর্তন-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানব-জাতি অগ্রসর হয়েছে সত্য; কিন্তু সেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সত্বেও মানব-জীবনের জটিলতর সমস্যাগুলির সমাধান হচ্ছেনা কেন এবং কেনই বা নয়া অর্থনৈতিক সংস্থায় ব্যক্তি-সত্তার বিকাশের পরিবর্তে বিনাশ হতে চাচ্ছে—এই প্রশ্নগুলো আজ আমাদের সম্মুখে অতি ব্যাপক ভাবে এসে গিয়েছে। উল্লেখযোগ্য এই যে, দিব্য-জীবন গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দ সেই সব প্রশ্নগুলো বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন এবং তারই পটভূমিতে দিব্য-জীবনের যৌক্তিকতা দেখাতে চেয়েছেন। কারণ, তাঁর স্থির বিশ্বাস: "A perfected human world cannot be created by men or composed of men who are themselves imperfect'. (*PP. 906*).

বলা বাহুল্য, শ্রীঅরবিন্দের এই বিশ্বাসের পিছনে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ নেই। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানী ম্যান্হাইমও দেখা যাচ্ছে এ ধরণেই কথা বলতে চেয়েছেন: A transformation of society is inconceivable without the transformations of human personality" (*Man and Society, P. 6*)। ম্যান্হাইমের ঘোষণা ফাঁকা আর্ত্তনাদ নয়; তাঁর চিন্তার গভীরে রয়েছে এযুগের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের গবেষণা এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা। সমাজবিজ্ঞানী ম্যান্হাইম ও আধ্যাত্মবাদী অরবিন্দের মধ্যে এই যোগসূত্র কি নেহাতই আকস্মিক?

ভাববাদ, বস্তুবাদ ও যুক্তিবাদের যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ দীর্ঘদিন ধরে মানুষের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে এবং ব্যক্তি, শ্রেণী কিংবা গোষ্ঠী স্বার্থের পরস্পর বিরোধীতার মধ্য দিয়ে যে সমাজ-চিন্তা গড়ে উঠেছে

তার মারাত্মক ফল ভোগ করছে সমগ্র মানবজাতি। সমগ্র জীবনের একটি অংশ বিশেষের পরিবর্তনকেই সভ্যতার সঠিক পরিবর্তন এবং ইতিহাসের নতুন যুগ বলে মনে করা হয়েছে। অথচ, সমগ্র জীবন প্রবাহের মধ্য দিয়েই যে মানব-ইতিহাস গড়ে উঠেছে তার কথা স্মরণ না রাখায় সামগ্রিক পরিবর্তনের দিকে অগ্রগতি বহু ক্ষেত্রেই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু মানব-জাতি যে শুধুমাত্র একটা স্থবির পিণ্ড নয় এবং মানব-সভ্যতা ও ইতিহাস যে একান্তভাবেই অর্থনৈতিক স্বার্থসংঘাত এবং তারই বিবর্তন নয়—এই ঐতিহাসিক চেতনাকে কেন্দ্র করেই নয়া ইতিহাস ও ইতিহাস-দর্শন গড়ে উঠেছে। এই জন্যই সম্পূর্ণ বিপরীত দর্শনে বিশ্বাসী ব্যক্তির চিন্তার মধ্যেও যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। বলা বাহুল্য এই পরিবর্তিত দৃষ্টি ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হতে পারলেই ব্যক্তি ও সমষ্টি, আদর্শবাদ ও বস্তুবাদ কিংবা যুক্তিবাদ প্রভৃতি দ্বৈত বিরোধের অবসান ঘটবে এবং ব্যক্তি সত্তার মুক্তির পথ উন্মুক্ত হবে। আর তাতেই খণ্ডবোধের পরিসমাপ্তি এবং সাযুজ্যবোধের প্রসার। তাই শ্রীঅরবিন্দ যখন দিব্য-জীবন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "A life of unity. mutality and harmony born of deeper and wider truth of our beeing is the only truth of life...' তখন তাঁর সংগে আমাদের বিজ্ঞানধর্মী মনের বিরোধ কোথায়?

"........................জানিব এবার
মনের রহস্য; জ্ঞান আর অজ্ঞানেরে
লয়ে লীলা মোর, পাপ-পুণ্যে আমি গড়ি
ঊর্দ্ধে উঠি, উভয়ের যথেচ্ছ অথবা
করি ব্যবহার;........................"

শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী'—সপ্তম পর্ব্ব
অনুবাদক: শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

প্রমথচৌধুরী ও আধুনিক বাঙলাগদ্য

সুবীর রায়চৌধুরী

তাঁর সমসাময়িক যুগে প্রমথচৌধুরী সবচেয়ে নিঃসঙ্গ লেখক—প্রতিভাবান হয়েও সেদিন সবার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্রোহকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, কিন্তু গদ্যে প্রমথ-রীতিকে গ্রহণ করতে পারেন নি—'ঘরে বাইরে' এবং 'বীরবলের হালখাতা'র স্টাইল এক নয়। রবীন্দ্রনাথ চলিত রীতির পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু আবেগবর্জিত বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাষা গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অসামান্য মনন-সমৃদ্ধি থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি, বীরবল প্রাবন্ধিক।

সাধারণ লেখকসমাজেও তিনি সেদিন স্বীকৃতি পান নি, পাঠকের কাছ থেকে ত নয়ই। তাই 'সবুজপত্রে'র মধ্যে যে বিদ্রোহের প্রতিশ্রুতি ছিল, একক বিদ্রোহেই তা শেষ হল। অবশ্য একক হলেও ক্ষীণ নয়। মোটের উপর সে প্রচণ্ড বিপ্লবকে গ্রহণ করবার মত মনের ঐশ্বর্য আমাদের ছিল না। প্রসঙ্গত, সুধীন দত্তের উক্তি উল্লেখযোগ্য—"পাণ্ডিত্য তাঁর (বীরবলের) সকারী ব্যক্তিস্বরূপের সমগ্রতাকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে। কাজেই তাঁর রচনা স্বভাবতই সমধর্মীর মুখ চায়। এবং তাঁর প্রতিভা ও সৌভাগ্য যেহেতু অল্প বাঙালীর ক্ষেত্রেই জোটে, তাই সমসাময়িকদের কাছ থেকে তিনি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি পেলেন না, তা হয়ত নিরবধি কাল তাঁকে দেবে (অন্তঃশীলা, স্বগত)।" তাঁর আশা ব্যর্থ হয় নি। বস্তুত, প্রতিভা একদিন স্বীকৃত হবেই। আধুনিক বাঙলাগদ্যের সমৃদ্ধির জন্য বহুলাংশে দায়ী প্রমথ-চৌধুরীর প্রভাব—এ প্রভাব সম্পর্কে লেখকেরা কখনো সচেতন, কখনো কখনো নন।

আধুনিক বাঙলা গদ্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং জনপ্রিয় শাখা হল মনন-প্রধান মন্ময় (subjective) প্রবন্ধ, পশ্চিমে যাকে বেল্-লেৎর বলা হয়। এর লেখকেরা সাধারণতঃ পণ্ডিত অথচ রসিক, মিত এবং মিষ্টভাষী। এঁদের ভাষাও অকারণ উচ্ছ্বাস কোথাও পৃথুল নয়, তবে স্বভাবতই তাঁরা স্টাইল সম্পর্কে সচেতন। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, "ভাষার এখন শানিয়ে ধার বার করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয় (কথার কথা)।" তাঁর নিজেরও লেখার বৈশিষ্ট্য তিনটি—রুচির পরিচ্ছন্নতা, বিষয়বৈচিত্র্য এবং সরসতা। আধুনিক লেখকদেরও লক্ষ্য বা মোক্ষ এই তিন। তবে লেখকভেদে রুচি ও মাত্রার তারতম্য নিশ্চয়ই ঘটবে। 'দেশবিদেশে'র লেখক যতটা সরসতার পক্ষপাতী, 'চিন্তয়সি'-র কথক (ধূর্জটিপ্রসাদ) হয়ত ততটা নন, রঞ্জন স্টাইলের বেলায় যত সচেতন, ইন্দ্রজিত তুলনায় অনেক উদাসীন। তবু এঁরা সবাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট। এঁদের বহুমুখী কৌতুহল, বাঙলা গদ্যের বিষয়সমৃদ্ধির জন্য দায়ী।

সংযম আসে বৈদগ্ধ্য থেকে। প্রমথ চৌধুরী লেখকের বৈদগ্ধ্যগুণে বিশ্বাসী—তাঁর সমসাময়িক অতুল গুপ্ত থেকে শিষ্য অন্নদাশঙ্কর পর্যন্ত সবাই মননের দিক দিয়ে অভিজাত। 'বই পড়া' প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'বৈদগ্ধ্য একটি সামাজিক গুণ।' কথাটার ঈষৎ পরিবর্তন করে বলা চলে,

'বৈদগ্ধ একটি সাহিত্যিক গুণ।' যে সাহিত্যিক বিদগ্ধ নন, তাঁর ভাষার সংযম নেই, ভাবে সম্পদ নেই। অবশ্য পাঠক যথেষ্ট শিক্ষিত না হলে পণ্ডিত লেখকের আদরের সম্ভাবনা কম। তেমনি পাঠকের তুলনায় লেখকের রুচি যদি উন্নত না হয় তবে সাহিত্যের উন্নতি সুদূর পরাহত।

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, আধুনিক বাঙলা গদ্যের যা কিছু উন্নতি প্রমথ চৌধুরীর জন্য। রবীন্দ্র গদ্যও আজকের আদর্শ ভাষা নয়, শরৎ-বঙ্কিম ত নয়ই। এঁদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়—কিন্তু সর্বপ্রয়োজনসিদ্ধ ভাষার সৃষ্টি এঁরা করতে পারেন নি। 'বঙ্গদর্শনে'র বঙ্কিমচন্দ্র কিছুটা পেরেছিলেন, কিন্তু আজকের সঙ্গে তাঁর রীতিগত ব্যবধান বিস্তর। রবীন্দ্রনাথ অনন্য রসসমৃদ্ধ গদ্যের স্রষ্টা, তবু তা কিছুতেই সবার অনুকরণীয় ভাষা নয়। তাঁর ক্রিয়াপদ (করলেম, খেলেম) থেকে সুরু করে অলঙ্কারবহুল কাব্যঘেঁষা গদ্য আমাদের প্রয়োজনে অচল। মহাকাব্যের মত তাঁর গদ্য বিরাট বিস্ময় এবং মহাকাব্যের মতই অননুকরণীয়। একমাত্র প্রমথ চৌধুরীই হয়ে রইলেন "an author for authors (বুদ্ধদেব বসু)।"

এর কারণ তিনি সত্যিকার অর্থেই গদ্যলেখক এবং গদ্য লিখেই সাহিত্যিক (তাঁর সনেটগুলির সাহিত্যিক কৃতিত্ব খুব বেশি নয়)। ঔপন্যাসিক বা গাল্পিক দিয়ে গদ্যের সংস্কার সম্ভব নয়, সেজন্য প্রয়োজন প্রাবন্ধিকের। অবশ্য প্রাবন্ধিক অর্থে বিরাট তত্ত্বসমৃদ্ধ বইয়ের লেখক বোঝানো হয় নি। বুদ্ধদেব বসু যাঁদের বলেছেন, 'pure writers' অর্থাৎ যারা লেখেন "not primarily to impart instruction or convey information, but as practitioners of at art whose validity, apart from the value of the content, they recognise (*An Acre of Green Grass*)".

ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গলে'র ভূমিকায় জানিয়েছেন যে, তিনি প্রচুর পড়াশোনা করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি 'সরল এবং সরসভাবে' মঙ্গলকাহিনী বর্ণনা করছেন। প্রমথ চৌধুরীর আদর্শ ভারতচন্দ্র—তিনি সর্বত্র গভীর, কোথাও গম্ভীর নন।

তবু তাঁর বিরুদ্ধে অনেকে অভিযোগ করেন। অত্যধিক স্টাইল-সচেতনতা, লিটন স্ট্রেচি, যাকে বলেন 'a conscious search for ordered beauty' নাকি সবসময় নিরাপদ নয়। ভঙ্গিসর্বস্বতা অবশ্যই নিন্দনীয়। তবে প্রথম চৌধুরীর কাছ থেকে সে আশঙ্কা কম। ভঙ্গি এবং ভাষণে সম্মিতি রক্ষা করবার মত পরিমিতিবোধ তাঁর ছিল। তাছাড়া তিনি নিজেই বলে গেছেন—"আমি বলেছি যে, প্রসাদগুণ ভাষার গুণ, কিন্তু একথা বলা বাহুল্য যে ভাষা ছাড়া ভাব নেই। নীরব কবিদের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি নে। যা আমরা ভাষার গুণ বলি আসলে তা মনের গুণেরই প্রকাশ মাত্র। অপ্রসন্ন অর্থাৎ ঘোলাটে মন থেকে প্রসন্ন ভাষা বার হতে পারে না। ও বস্তু হচ্ছে মনের আলোক (ভারতচন্দ্র)।"

একান্তভাবে বীরবলীয় যুগ এটা। আধুনিক বাঙলা গদ্যের যা কিছু ঋদ্ধি ঐ মননশীল, অভিজাত গদ্যের কাছে ঋণী।

একটি বিমর্ষ কাহিনী

মিহির আচার্য

বিশ্বজিতের মৃত্যুভীতি তার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রবাদের সৃষ্টি করেছিল। সমীরণের মুখে যখন প্রথম শুনলাম, বিশ্বাস করিনি। সমীরণের কথায় উচ্ছ্বাসের তোড়টুকু এত প্রবল যে আসল বস্তুটিরই খেই হারিয়ে যায়। এরপর যখন কথাটা ক্রমশ আরো বন্ধুচক্রের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে ঘোরালো হয়ে উঠল তখন অবিশ্বাস করবার জোর আমারই ফুরিয়ে যেতে লাগল।

এ যুগে ভয় করবার এত বস্তু থাকতে মৃত্যুর মতো একটি পুরাণো বিষয়কে যে বিশ্বজিতের মতো আধুনিকমনা কলেজেপড়া যুবক কি করে বেছে নিতে পারল সেইটেই আশ্চর্য। মৃত্যু তো জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি—ইচ্ছেয়-অনিচ্ছেয় তাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। তারজন্যে তাকে ভয় করবার কি কারণ থাকতে পারে। আজকের পৃথিবীতে যখন ভয় করবার অজস্র উপাদান যুদ্ধ-মহামারী-দুর্ভিক্ষের রূপ ধরে দরজায় হাঁনা দিচ্ছে তখন মৃত্যুভীতি তুচ্ছ হয়ে যায়।

আরো দশজনের কথা জানি না। নিজের কথা বলতে পারি। কৈশোর কালটাই কেটে গেছে আমার মৃত্যুর বুড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে। আমার দশবছরে মা মরল শুধু পরের বছরে বাবাকে সংগে নিয়ে যাবার জন্যেই। মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে অনাথ জীবনটা উড়তে লাগল আস্তাকুঁড়ের এঁটো পাতার মতো আত্মীয়স্বজনের প্রেমহীন সংসারে গলগ্রহ হয়ে। আজো কি পারলাম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে? উন্নাসিক কেবল অন্ধ অবজ্ঞাই চিরস্থায়ী রয়ে গেল।

কিন্তু আমার কথা থাক।

বিশ্বজিতের কথাই ভাবছি।

প্রায় মাসতিনেক ধরেই ওর সংগে দেখা সাক্ষাৎ নেই। শুনেছি কলকাতাতেই আছে। কয়েকদিন ওর বাসা থেকে ফিরে এসেছি। বাড়ি-ফেরার যেমন অসময় তেমনি নাওয়া-খাওয়ারও। ওর কাকিমাও ওর মতিগতি সম্পর্কে কোন সঠিক খবর দিতে পারলেন না।

সেদিন বিকেলে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। দেশবন্ধু পার্কের ধারে আমার এক ইণ্টারমিডিয়েট ছাত্রীকে পড়িয়ে দ্রুতপায়ে সার্কুলার রোডের দিকে আসছিলাম। মোড় পেরিয়ে গাড়িবারান্দাটার নিচে পৌছতে না পৌছতেই ঝমঝম সুরে কোলাহল করে বৃষ্টি নামল। সংগে ছাতা ছিল না। তাই আটকা পড়লাম। কতক্ষণ ওইরকম দাঁড়িয়ে থেকে পাশের চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লাম।

'কে? সুব্রত না?' কোণের বেঞ্চে থেকে কে ডেকে উঠল।

চোখ ফিরিয়ে দেখলাম বিশ্বজিৎ। হঠাৎ মনের ভেতরটা তুমুল আনন্দে হর্ষ করে উঠল। এতক্ষণকার এই ছাত্রী-ঠেলার বিরক্তিকর জ্বালা আর এই অসময়ে বৃষ্টির তোড়জোড়ে সমস্ত আপত্তি নিমেষে জল হয়ে গেল।

'বিশ্ব! তুই!' বিষম আনন্দে হোঁচট সামলে বললাম আমি।

'ভগবান তুমি যুগে যুগে ভূত পাঠায়েছ বারে বারে। তোকে দেখেই বোধকরি রবিঠাকুর এই কবিতা লিখে গেছেন—' সশব্দে হেসে উঠল বিশ্বজিৎ।

বিস্মিত আবেগে চেয়ে ছিলাম ওর দিকে। বিশ্বজিতের সংগে পরিচিত না হলে এতদিন আমার কাছে মানবচরিত্রের একটি দিকই আবৃত থাকত। বহুকাল পর্যন্ত আমার কেমন এক স্থবির ধারণা ছিল যে-লোক কথায় বার্তায় উচ্ছল হাসিতে ফেটে পড়ে সে কখনো জীবনে গভীর গম্ভীর হতে পারে না। বিশ্বজিৎ আমার এ-ধারনার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ। ওর বাইরের স্বভাবের সংগে ভেতরের মানুষটির কোন মিল নেই। সে মানুষটি বড়ই নির্জন, নিঃসংগ আর দুর্বল। বাইরের রঙটা ওর সিনিক হলেও দেখেছি ভেতরটা অত্যন্ত সেন্টিমেন্ট্যাল। শীতের দেশে জীবজন্তুদের শরীর বাঁচাবার জন্যে যেমন লম্বা-লম্বা লোমের আচ্ছাদন রয়েছে তেমনি স্বভাবদুর্বলতা ঢাকবার জন্যে একদল লোক সিনিকের বর্মে আত্মরক্ষা করতে চায়। বিশ্বজিৎ সেই ধাতের লোক।

ওর পাশে বসে বললাম: 'পুলিসের ভাষায় বলতে হয় তোমার গতিবিধি বড় সন্দেহজনক। তোমার সার্থপরতা সত্যিই দৃষ্টিকটু।'

বিশ্বজিৎ তার লম্বা চুলে আঙুল চালিয়ে দিয়ে সহাস্যে বললে, 'তাই নাকি? কোনটা সত্যি? সন্দেহজনক না স্বার্থপরতা?'

বললাম: 'দুটোই।'

বিশ্বজিৎ বললে, 'সন্দেহের কথাই যদি উঠল তা'হলে বলি: আমরা জীবনে সংশয়বাদী কে নই? আমাদের পাণ্ডিত্যের জাহাজের সংগেই সংশয় গাধাবোটের মতোই পিছু ধাওয়া করে এসেছে। এই সংশয়বাদ বিংশ শতাব্দীর মস্ত বড় রোগ। আর স্বার্থপরতা? ওই অভিযোগের কারণ আমার কাছে স্পষ্ট নয়।'

অভিমানের সুরে বললাম: 'তোমার হয়তো আমাদেরকে প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাদের তো তোমাকে প্রয়োজন থাকতে পারে।'

বিশ্বজিৎ হো হো করে হেসে উঠল: 'jupiter you are angry. You are wrong. আমি যে এখানে ছিলাম না মোটেই।'

'ছিলে না বলেই তো পৌছনোর খবরটা দেয়ার দরকার।'

বিশ্বজিতের চোখে হঠাৎ একটা শ্রান্ত ছায়া ঝিলিক দিয়ে উঠল। আমার হাত চেপে ধরে বললে, 'ক্ষমা কর—'

ক্ষমা না করে আমার উপায়ও ছিল না। যদিও ক্ষমা-চাওয়া মানে- পুনরায় সেই অপরাধ করবার সময় নেয়া। বিশ্বজিতের উপর আমার বিশ্বাস আছে, বিশ্বাস নেই ওর স্বভাবের অস্থিরতাকে।

সহসা মনে পড়ে গেল ওর সম্বন্ধে সেই চমক লাগানো খবরটি। বললাম: 'কি সব শুনছি তোমার সম্পর্কে?'

বিশ্বজিৎ হাত নেড়ে নাটুকে ভঙিতে বললে, 'গ্রাম্যবার্তা না শুনিবে না কহিবে কভু। তবু শুনি ঘটনাটি কি? অপরের আয়নায় নিজেকে দেখবার কুতূহল মানুষের অসীম।'

বললাম: 'তুই নাকি মৃত্যুভীত হয়ে পড়েছিস, এ্যাঁ?'

সহসা এক নিমেষে বিশ্বজিতের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত চেহারা যেন বদলে গেল। একটা সুস্থ প্রাণময় লোক যে এক লহমায় এমন মুহ্যমান হয়ে পড়তে পারে, কল্পনাও করা যায় না। পুরো পাঁচ মিনিট স্তব্ধ অচঞ্চল বসে রইল সে ঘাড় গুঁজে। তারপর যখন মাথা তুলল দেখলাম বেদনায় টলটল করছে চোখ, থরথর করে কাঁপছে ওর ঠোঁট। আর ঘনঘন শক্ত করে চেপে ধরছে ওর হাতের মুঠো।

অবসন্ন শ্রান্ত গলায় বিশ্বজিৎ বললে, 'হ্যাঁ মৃত্যুভীতি। সত্যিই আমি মৃত্যুকে ভয় করি। আশ্চর্য হচ্ছিস। আচ্ছা মৃত্যু দেখেছিস তুই?'

মাথা নেড়ে জানালাম: 'দেখেছি।'

অদ্ভুত এক আবেগে উত্তেজনায় জ্বলতে লাগল বিশ্বজিতের চোখ। দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'না দেখিসনি।'

মানুষ এক-এক সময় এমন মরিয়া হয়ে উঠে যখন তার নিজের জেদই অংহকারী মত্ততায় ফুঁশে উঠে তখন তাকে বাধা দিতে যাওয়া নির্বোধের কাজ। তাই গভীর ধৈর্য আর স্থির গাম্ভীর্য নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বাইরে তখনো গম্ভীর শব্দে বৃষ্টির হিংস্র ফোঁটা আছড়ে পড়ছে কালো পিচের উপর। অন্ধকার আকাশ। ট্রাম-বাসগুলি দ্রুত শব্দে ছুটে চলেছে।

বিশ্বজিতের গলার স্বর শোনা গেল: 'একটি গল্প বলি শোন্—'

'গল্প!'

'হ্যাঁ। গল্পও বলতে পারিস, নাটকও বলতে পারিস। একেবারে পারিবারিক নাটক। আমার মাতুলালয়ের কাহিনী। জানিস তো তুই মাস দুয়েক আগে আমার মেজ মামার ভীষণ অসুখের জরুরী তার পেয়ে মালদায় গিয়েছিলাম।'

বললাম: 'হ্যাঁ। তিনি তো মারা গেছেন।'

বিশ্বজিৎ বললে, 'মামার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত না-থাকলে আজো হয়তো জানতে পারতাম না মৃত্যু জিনিসটি কি ভীষণ। মামার মৃত্যুর তিনটে দিন আগে পর্য্যন্ত আমি তাদের সংগে ছিলাম। দুপুরে আসাম লিঙ্কে মনিহারীঘাট বরাবর কাটিহার জংশন হয়ে পৌছিলাম সন্ধ্যে নাগাদ। পরদিন সন্ধ্যার বিবর্ণ অন্ধকারে বাড়িতে ঢোকবার আগে মনটাকে শক্ত করে বেঁধে নিয়েছিলাম। দুখানি মাত্র ঘর—বারান্দার এক চালায় রান্নার ব্যবস্থা। একটি ঘর রোগ শয্যা। ধীর পায়ে মামার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালাম। জীবনের ঘষাপাথরে ক্ষয়-হয়ে-যাওয়া রোগমসীঢালা শরীর। চেনাই যায়না মামাকে। আজো মনে পড়ে ছোটবেলায় কত বেত ভেঙেছেন তিনি আমাদের পিঠে।

মামা অস্পষ্ট চোখের তারায় আমাকে চেনবার চেষ্টা করে বললেন, 'কে? বিশু।'

মূক হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানিনা। যখন চমক ফিরল দেখলাম ঘরটা কেমন বিশ্রী বোবা-ধরা থমথমে। খাটের পাশে চৌকিতে হেলান দিয়ে ক্লান্ত হাতপাখা থামিয়ে বসে রয়েছেন মামিমা। খোঁপা-ভাঙ্গা মাথার পাতলা চুলের রাশ ঝুলছে কোমর বেয়ে, মাথার ঘোমটা স্খলিত। সিঁথির আর কপালের সিঁদুরের বিন্দুটিও তেমন জ্বলজ্বল করছে না। ঘরের মেঝের দরজার আনাচে-কানাচে পাঁচ-ছটি নাবালক ছেলেমেয়ে। উলংগ, বীভৎস। তাদের চোখে মুখে শূন্য অর্থহীন অভিব্যক্তি।

মামাতো ভাই প্রবাল আমাকে ডেকে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। বললে, 'এস বসো—'

প্রবালকে কয়েক বছর দেখিনি। এই কয়েক বছরে অপরিষ্কার দাড়িগোঁফ ভর্তি রুক্ষ কঠোর মুখভাবে কেমন এক নিষ্ঠুর বিষাদের ছাপ পড়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ সে শুক্‌নো হেসে বললে, 'জানলে বিশুদা সবচেয়ে আমার খারাপ লাগে যখন ভাবি নিজের মূঢ়তার বীজ কেবলমাত্র বংশানুক্রমিক সূত্রেই অতীতকাল উত্তরকালের উপর দিয়ে যায়। এর মতো চরম অন্যায়, ভীষণ স্বার্থপরতা আর কিছুই নেই।'

থমকে নেমে ওর কথার অর্থের জন্য অন্ধকারে হাত পা ছুঁড়তে লাগলাম।

প্রবাল তেমনি নিস্পৃহ গলায় বলে চলল: 'সৃষ্টির কোন্ আদিম থেকে সৃষ্টিকর্তা মানুষের অন্ধকার গুহায় প্রবৃত্তির আগুন জালিয়ে দিলে, সেই আগুনের যজ্ঞশালায় মানুষ নিজেকে পুড়িয়ে উড়িয়ে শেষ করে দিয়ে গেল। আমাদের পিতৃপুরুষের ক্ষণিক যৌনলীলার উত্তেজনা কেবল পরিণামে আমাদের ধ্বংসের ডাক শুনিয়ে চলে গেল।'

অন্ধকারে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়লে যেমন হয় তেমনি একটা ন্যক্কারজনক অসুস্থ অনুভূতি ছড়িয়ে গেল দেহের শোণিতে-শোণিতে। অন্য সময় হলে এই বি, এ, পাশ করা শিক্ষিত চাষাটির গালে সজোরে এক চড় বসিয়ে দিয়ে ওর বিকৃতির ভূত নামিয়ে দিতাম গা থেকে।

কিন্তু সে দিন সব কিছু ঘটনায় যতটা বিস্মিত হয়েছিলাম তারচেয়ে আহত হয়েছিলাম বেশী।

রাত্রে আর কোন ঘটনা নেই।

কোনোরকমে নাকেমুকে গুঁজে দুপুর রাত্রে মামার শিয়রের কাছে বসে মামিমাকে জোর করে পাঠিয়ে দিলাম ঘুমোবার জন্যে। নিস্তব্ধ রাত্রে নিদ্রিতপুরীতে জাগ্রত অতন্দ্র প্রহরী রইলাম শুধু আমি আর পাশের ঘরে প্রবাল। সে ম্যালথসের উপর মূল্যবান থিসিস লিখতে ব্যস্ত।

নিস্তব্ধ রাত্রির স্তব্ধতা চিরে জাপানী দেয়াল ঘড়িটি টকটক করে শব্দ করে চলেছে।

শয্যার উপরে নির্জীবের মতো মামার দেহখানা মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্ত্তে জীবনের লালসা জানিয়ে ধুকধুক করে চলেছে। রোগে-কাতর গর্তে-ডোবা নিমেষহারা চোখ-দুটো ছাদের কড়িকাঠে কিসের গণনায় মত্ত। মাঝে মাঝে রোগের ধমকে ছটফট করে উঠছেন, মুখ থেকে একটা জান্তবধ্বনি বেরিয়ে এসে মিশে যাচ্ছে ঘরের আনাচে কানাচে।

ভোর রাত্রির দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম চেয়ারের বুকে মাথা রেখে। কি-রকম একটা বাইরে থেকে ভেসে আসা বিশ্রী গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাইরের ঘরের দিকে উঠে এলাম।

প্রবালের সামনে চৌকিতে বসে একটি মেদবহুল সজীত লোক আপন মনে গজরাচ্ছে। আর প্রবাল তাকে নিচু গলায় কি বোঝাবার চেষ্টা করছে।

জিগ্যেস করলাম: 'ইনি কে প্রবাল?'

প্রবাল উদাস গলায় বললে, 'বাড়িঅলা। চারমাসের ভাড়ার মৃগয়ায় বেরিয়েছেন। তাঁকে অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করে হয়রাণ হয়ে গেলাম যে বাবার কিছুদিন থেকে বাড়াবাড়ি অসুখ।'

বাড়িঅলা বিশ্রী সুরে কথার মাঝে বলে উঠলেন, 'ওসব বুজরুকি বহু শুনেছি মশায়। তাগাদায় এলে ভাড়াটেদের ওইরকম অসুখ হামেশাই হয়ে থাকে। আমার আজই ভাড়া চাই—চারমাসের দেড়শো টাকা।'

লোকটির কথাবার্তার ধরণে আমার মতো নিরীহ মানুষের রক্তও গরম হয়ে ওঠে। কিন্তু এক্ষেত্রে রাগারাগি করেও কোনো ফল হবে না, বুঝতে পেরেছিলাম। তাই আমিও নম্র হয়ে বললাম, 'দেখুন—সত্যিই মামার কঠিন অসুখ।'

বাড়িঅলা ব্যংগ করে উঠলেন, 'তুমি কে হে বটে! ছুঁচোর গোলাম চামচিকে! সেই যে কথায় বলে না।'

'সাট্ আপ। আপনি এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবেন কিনা বলুন?'

'বটে! আমাকে অপমান! আমি আদালতে যাব—আমি মানহানির নালিশ করব। খুব যে চোখ রাঙিয়ে কথা হচ্ছে। বলি: মামাটি পটল তুললে বাড়িভাড়া কে দেবে, শুনি? না স্বগ্‌গে গিয়ে নালিশ ঠুকব? অ্যাঁ?'

'আপনার যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। যান, এখুনি বেরিয়ে যান—'

'তাই যাচ্ছি—' ছাতা বগলে বাড়িঅলা প্রস্থান করলেন।

তক্তাপোশে মুখ ঢেকে প্রবাল পাথরের মতো বসেছিল। আমি ওর হাত চেপে ধরতে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। তারপর নিজেকে সংযত করে হাসির করুণ অভিনয় করে বললে, 'শরীরটা কিরকম করে উঠেছিল।'

আমি চুপ করে রইলাম।

প্রবাল তেমনি নাকউঁচুঢঙে বললে, 'এই বুড়ো পৃথিবীটা কেমন ভেঙে চুরে শেষ হয়ে গেছে বিশুদা। মানুষগুলো সব নেঙটি ইঁদুর হয়ে গেছে। বাড়িঅলাকে একা দোষ দিয়ে লাভ নেই।'

রোগীর ঘর থেকে মামিমার অস্ফুট কান্নার আওয়াজে চমকে উঠে দুজনে ছুটে গেলাম।

শ্বাসকষ্ট হচ্ছে রোগীর। নাড়ী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

'প্রবাল ভাই—এখুনি একটা ডাক্তার…'

প্রবাল ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্বাভাবিক বুদ্ধি মতো পায়ে হট্ কম্প্রেস করতে লাগলাম। কয়েক মিনিট পরে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল রোগীর অবস্থা। মন্দগতি নাড়ীর সাঞ্চালন অনুভূত হতে লাগল। মামা চোখ খুলে আবার একদৃষ্টে তাকাতে লাগলেন মাথার কড়িকাঠের দিকে।

মামিমাকে বাতাস করতে বলে বাইরে চলে এলাম। এতক্ষণকার শ্বাসরোধী আবহাওয়া থেকে যেন কিছুটা মুক্তির আরাম পেলাম।

একটু পরে প্রবাল কেবল একা।

'ডাক্তার এলেন না?'

'না।'

'কেন?'

'বললেন, আসতে পারবেন না। বাবা নাকি কবে ডাক্তারের বিপক্ষে একটি' পুলিশ কেসে সাক্ষী দিয়েছিলেন। এবার প্রতিশোধ নিবেন ডাক্তার।'

রেগে বললাম: 'শহরে কি আর ডাক্তার নেই?'

প্রবাল বললে, 'যাঁরা আছেন তাঁদের আনতে রিকশাঅলাকেই আড়াই টাকা দিতে হয়। বাহনের পরে আসল দেবতার প্রণামী। আট টাকা।'

'টাকার অভাবে ডাক্তার আসবে না?' বিস্মিত হয়ে উঠি।

'আসছে না সেইটেই তো সত্য।'

বিরক্ত গলায় বললাম: 'তোর কথার ওস্তাদি রাখ। টাকা জোগাড় করতে হবে।'

প্রবাল বললে, 'মা'র অবশিষ্ট চারগাছা সোনার চুড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম বেচবার জন্যে। ওতে নাকি একরত্তিও সোনা নেই, গিল্টি। সুখের সময় বাবা যা একদিন মা'র হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং যা একদিন মা সোনা বলেই চিনে এসেছিলেন, তা আজ মিথ্যে, ফাঁকি হয়ে গেল।'

হাত থেকে আমার ঘড়িটা খুলে দিয়ে বললাম: 'যা এটা নিয়ে যা। ডাক্তার আনা চাইই।'

প্রবাল বললে, 'আমি তা পারব না বিশুদা। আমাকে ক্ষমা করো—'

'ইডিয়ট—' জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাসা থেকে।

দুপুর ঝাঁঝাঁ রোদে ডাক্তারকে নিয়ে ফিরলাম ঘণ্টাখানেক বাদে।

স্বকীয় ব্যবসাসুলভ উঁচুদরের গাম্ভীর্যে মনোযোগ দিয়ে রোগীকে পরীক্ষা করলেন ডাক্তার। সেটা লাইব্রেরী ফ্রেমের চশমায় আর মোটা পুরু ঠোঁটের দৃঢ়তার কঠিন আচরণ ভেদ করে আমার পক্ষে কিছু বুঝে-ওঠাই অসম্ভব ছিল।

হঠাৎ চেয়ারে পিঠ রেখে প্যাণ্ট-পরা পাদুটাকে বিস্তারিত করে দিয়ে ডাক্তার আমার দিকে ফিরে অনেকক্ষণ মৌন হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'আপনারা মানুষ না মশাই?'

এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর ছিল না। তাই চুপ করে রইলাম।

ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। 'চলুন—বাইরের ঘরে গিয়ে বসি—'

একটা লম্বাচওড়া ব্যবস্থাপত্র দিয়ে পকেটে টাকা গুঁজে ডাক্তার প্রস্থান করলেন।

'এবার?' টেবিলে চাপা-দেয়া ব্যবস্থাপত্রটি হাওয়া লেগে পত্‌পত্‌ করে উড়ছিল। তারদিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করল প্রবাল: 'এবার?'

পকেটে এখনো ঘড়ি-বেচা উচ্ছিষ্ট কয়েকটি টাকা পড়ে ছিল। বা'র করে প্রবালের হাতে দিয়ে বললাম: 'ওষুধ নিয়ে আয়।'

'ওতে কি হবে? দেখছ না পনেরো মিনিট অন্তর ইনজেকশনেরই তো ষাট সত্তর টাকার ধাক্কা। তারপর ফি-ইনজেকশনে কম্পাউণ্ডারকে দিতে হবে দু'টাকা—'

মুখ কালো করে বললাম: 'ধার পাওয়া যায় না?'

প্রবাল হিমেল গলায় বললে, 'ধার জিনিষটা বড়লোকদের, গরিবদের একমাত্র পেটেণ্ট ব্যবস্থা ভিক্ষে…কিন্তু বাপ মরছে বলে কি এদেশে কেউ ভিক্ষে দেয়, না বিশ্বাস করে।'

'কিন্তু এইভাবে বিনা চিকিৎসায় মামা মারা যাবে!'

'যাবে, বিশুদা, যাবে।' অস্থির ভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল প্রবাল।

স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম ওর দাড়ি গোঁফে অপরিচ্ছন্ন কুশকুটিল মুখের দিকে। ও হয়তো জানেনা তার নিজের কথাগুলির ওজন। ভালো করে উপলব্ধিও করতে পারে না অপরের উপর কি তার প্রতিক্রিয়া হয়। কিন্তু সেদিন যেন আমার মনে হচ্ছিল হয়তো প্রবালের দৃষ্টিভঙ্গিই ঠিক। অমনি করে সমস্ত নিষ্ঠুরতাকে ততোধিক নিষ্ঠুরতা দিয়ে ফিরিয়ে দিতে পারার মধ্যেই হয়তো টিঁকে থাকবার পথ আছে। বাস্তবের মুখোমুখি যদি দাঁড়াবার সামর্থ নাই-ই থাকে তা হলে পিঠ দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখাই ভালো।

কিন্তু একটা কিছু করতে হবে।

সারাটা দিন সম্ভব-অসম্ভব নানা জায়গায় কিছু টাকার জন্যে ঘুরলাম। প্রবালও ছিল আমার সংগে। কিন্তু ওর থাকা আর আমার থাকা আলাদা। প্রবাল সব জিনিষের চরম দিকটাই আগে থেকে তৈরি করে রাখে, তাই তার হাবভাব বিকারবিহীন। আমি জীবনে আশাবাদী, তাই আঘাত বেশি বাজে আমারই।

সেদিন সারা মালদা শহরটা—ওধারে অভিরামপুর আর এদিকে ফুলবাড়ি চষে বেড়ালাম। মামার উকিল কয়েকজন বন্ধু, কয়েকজন ছাত্রের অভিভাবক; পরিচিত আধা পরিচিত কেউই আমাদের অনুসন্ধান-তালিকা থেকে বাদ গেলেন না। রামকৃষ্ণ মিশনের ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে বোধহয় এরচেয়েও বেশি রোজগার হত!

'কেন এমন হল? জানো বিশুদা?' কথান্তে গলায় কি জানতে চাইল সে।

প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে নাক তুলে চাইলাম ওর দিকে।

প্রবাল বললে, 'মরা ঘোড়ার পর কেউ বাজি রাখতে চায় না। টাকা জমানোর মতো টাকা খরচ করাটাও মানুষের এক ধরণের নেশা। মদ ফুরিয়ে গেলে তারা খাঁটি নির্জলা মদই চায়, বলবে না সাদা জল নিয়ে এস।' একটু থেমে ঘন গলায় বললে, 'আর কেন তারা টাকা দেবে, বলো? আমার শিশু সন্তানের জন্মের সংগে আর একজনের বুড়ো বাপের মৃত্যুর কোনো সম্বন্ধ নেই।'

আশ্চর্য হয়ে বললাম: কিন্তু হৃদয় নামক তো একটা পদার্থ আছে আমাদের মধ্যে।'

প্রবাল বললে, 'ছেলে ভোলানো গল্প। আমার হৃদয় পরিবারের জন্যে, আমার ছেলেদের স্ত্রীর সুখের জন্যে। নিজের সুখকে খাটো করে অপরের জন্যে চিন্তা-করার কাজটা হৃদয় করেনা, করে মস্তিষ্ক। নইলে হৃদয় বস্তুটির মতো স্বার্থপর অন্ধ জিনিস আর কিছু নেই।'

ওর সংগে তর্ক করবার মেজাজ ছিল না। সারাদিনের উত্তেজনায় আর শ্রান্তিতে দেহমনে একটা নোঙ্‌রা অসুস্থতা বোধ করছিলাম।

ডাক্তারখানায় গিয়ে জোড়াতালি দিয়ে আশু দরকারী ওষুধ নিয়ে কম্পাউণ্ডারকে দিয়ে মামাকে ইনজেকশন করা হল।

মামার মৃত্যুর শেষ দিনটির কথা কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারব না। একটি চরম দুঃখী লোকের সারা জীবনের দুঃখের যোগফল করলেও বোধ করি তার পরিমান এত বৃহৎ হবে না।

শীতের শীর্ণ নদীর মন্দা স্রোতের ক্লান্তিতে সন্ধ্যা নামল।

তৃতীয়বার ইনজেকশন দিয়ে এইমাত্র বিদায় নিয়ে গেলেন কম্পাউণ্ডার। রোগশয্যায় সাবিত্রীর তপস্যায় নিশ্চল বসে আছেন মামিমা। হাতে তালপাখাটা যন্ত্রের চালেই সঞ্চারিত হয়ে চলেছে। আশ্চর্য মামিমার সহ্যশক্তি, তুলনায় অহল্যাকেও যেন হার মানায়। এমনিই বোধহয় মানুষ! দিনের পর দিনের বিরামহীন ঘষা খেতে-খেতে পাথরটা একসময় বুঝি এমনি করেই শীতল, হিম, অনুভূতিরহিত হয়ে পড়ে।

তার চেয়েও আশ্চর্য করে দিল ছোট ছোট দিগম্বর অপুষ্ট ছেলেমেয়েগুলি। পৃথিবীর আলোকের সংগে-সংগে তারা বিধাতাপুরুষের অভিশাপ বয়ে নিয়ে এসেছে। শৈশবের একটি দিনও তারা সুখের সূর্যোদয় দেখেনি, কেটেছে মেঘলা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘুপচিতে। অন্ধকারের বিষ তাদের মজ্জায় মজ্জায় মিশে গেছে। কোনোদিন হয়তো স্বপ্ন দেখে কেঁদে কঁকিয়ে উঠেছে, কিন্তু বাস্তবের আকাশে ডানা মেলতে পারেনি। ওদের ছোট ছোট চোখের তারায় আমি কোন জীবনের চাঞ্চল্য খুঁজে পেলাম না। ওরা হয়তো বাবার অস্তিত্বের মানে ভালো করে বুঝতে পারেনি। বাবার বর্তমানেও তারা যে দুঃখকষ্টের কাদায় হামাগুড়ি দিচ্ছে, তাঁর অবর্তমানে এর চেয়ে আর কত বেশি কষ্ট আসতে পারে তার হিসেব তাদের নাগালের বাইরে।

রোগীর গলায় এক দাগ মিকৃশ্চার ঢেলে দিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

প্রবাল মনোযোগ দিয়ে কি একটা ইংরেজী কেতাব পড়ছিল।

'কি বই ওটা?' জিজ্ঞেস করলাম।

প্রবাল বললে, 'শার্লক হোমস্—'

ওর ডিটেকটিভ পড়া কৃত্রিম মনোযোগটা লক্ষ্য করছিলেম চুপ করে।

'আজকে আর খাওয়াদাওয়ার পাট নেই কিন্তু···' বইএর পাতাতে চোখ ডুবিয়েই জানাল প্রবাল।

বললাম: 'খাওয়ার ইচ্ছে নেই—'

'তাই নাকি?' প্রবাল বললে: 'আসল ব্যাপার কি জানো? ভাঁড়ারে মা ভবানী···'

আমি চুপ করে রইলাম।

প্রবাল আবার মলিন হেসে বললে, 'এই অভিজ্ঞতায় অবশ্যি নতুনত্ব নেই এতটুকু। খেতে না পাওয়ার চেয়ে খেতে-পাওয়াতেই আমাদের চমক বেশি।' একটু থেমে হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় হঠাৎ প্রশ্ন করে উঠল: 'আচ্ছা বিশুদা, বলতে পারো, ছোট ছোট ভাইবোনেরা পর্যন্ত খেতে না-পেয়ে কেমন করে চুপ করে থাকে!'

বললাম: 'ওরা যে বুঝতে পেরেছে ভাই—'

প্রবাল বললে, 'ওরা যদি একটু কম বুঝত, যদি একটু চিৎকার করে কাঁদত তাহলেও এত বিশ্রি লাগত না!'

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পথের ধারের মাঠটার বুকে পায়চারি করতে লাগলাম।

আকাশে মেঘের নীরব সঞ্চার। কালো-কুটিল আকাশপট! ওপারের আমগাছের ঘন বনটা অন্ধকারের কালি মেখে স্তম্ভিত।

আজ আর ঘুম নেই চোখে। আজকে জেগে-থাকার রাত। সারা দিনের শ্রান্তিতে স্নায়ুকেন্দ্রগুলি ঝিমঝিম করছে।

পেছন ফিরে প্রেতায়িত অন্ধকার জোড়া বাড়িটির দিকে অপলক চেয়ে রইলাম। অদ্ভুত রহস্যময় দেখাচ্ছে বাড়িটির পরিবেশ। নিশ্চিন্তে জন্মাবার আর মরবার জন্যেই বোধহয় শিল্পী-মানুষের এই গৃহ-রচনার কল্পনা।

'কে?'

'আমি।' প্রবাল বললে, 'আজ বেজায় গরম, না?'

বললাম: 'হুঁ···'

'আচ্ছা বিশুদা, বি,টি, পড়তে কত খরচ লাগবে, বলতে পারো?'

'না।'

'কলকাতায় থাকবার কোনো ব্যবস্থা হতে পারে?'

বললাম: 'চেষ্টা করে দেখব—'

একটুও ভালো লাগছিল না প্রবালের এই ধরণের কথাবার্তা। উদ্বেগাকুল বিষাদ পরিবেশের সংগে খাপ খাচ্ছিল না ওর চিন্তাধারা। আমার চিন্তা আটকে পড়েছে এখনকার এই রূঢ় বাস্তবের চাকায়। প্রবালের এই পাশ কাটিয়ে যাওয়া আর-এক ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সময়োপযোগী ঠেকছিল না।

মামাকে আর এক দফা ওষুধ খাওয়াতে গেলাম। মামিমা তেমনি করে পাখা চালিয়ে যাচ্ছেন। ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ মেঝের উপরেই নেতিয়ে পড়েছে ঘুমে আর অবসাদে।

মামিমা বললেন, 'তোরা এখন ঘুমিয়ে নে। মাঝ রাত্রে জাগিয়ে দেবো তোদের।'

বললাম: 'ঘুম আসছে না মামিমা—'

'একটু বিশ্রাম করে নে বাবা। আরো কত রাত জেগে থাকতে হবে, কে জানে।'

'আচ্ছা।'

প্রবালের বিছানার উপর ক্লান্ত শরীরটাকে গড়িয়ে দিলাম।

মাঝরাত্রে হঠাৎ বিশ্রী স্বপ্নে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

'মামিমা!'

মামিমা বললেন ফিশ ফিশ করে: 'ত্যাখতো বিশু তোর মামা কেমন করছেন···'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম রোগীর ঘরে।

ধীরে ধীরে মুখ হাঁ করে দম নিচ্ছেন মামা। চোখের পলক স্থির। নাড়ীর গতিও অতি মন্দা। মুখ থেকে কেমন একটা চাপা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। আমাকে দেখে কিছু বলতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু বেরুল না গলার ভেতর থেকে কোনো স্বর।

মৃত্যুর রূপ আমি চিনি না। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাকে চিনতে ভুল হল না।

নিজের ভেতরের অসহ্য যন্ত্রণাকে অতিকষ্টে চেপে রেখে জিজ্ঞেস করলাম: 'প্রবাল কোথায়?'

মামিমা বললেন, 'ও ডাক্তার ডাকতে গেছে।'

কয়েকটি উদ্বেগজড়িত মিনিট কেটে গেল। প্রবাল এত দেরি করছে কেন ফিরতে। বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। হয়তো দেখতে পাব একটা রিকশা ডাক্তারের সংগে ছুটে আসছে প্রবাল।

কিন্তু, ল্যাম্প পোষ্টের গায়ে হেলান দিয়ে ও কে দাঁড়িয়ে।

'প্রবাল!'

'হ্যাঁ। ডাক্তার ডাকতে আমি যাইনি বিশুদা। আমি লুকিয়ে আছি এখানে...'

'কিন্তু...'

'তুমি যাও, তুমি ভেতরে যাও বিশুদা। ওদের একটা আশাও অন্তত দাও যে ডাক্তার আসছে, আসবে, সব ভালো হয়ে যাবে।'

'ওটা তো মিথ্যে কথা।'

প্রবালের চোখ জ্বলে উঠল: 'মিথ্যা কি শুধু ওইটুকুই! আগাগোড়া সবটাই তো মিথ্যে। না না তুমি যাও বিশুদা। অন্তত একটা সান্ত্বনাও তাদের থাকবে যে ডাক্তার না-আসার জন্যেই বাবা বাঁচলেন না!'

আমি ভেতরে ছুটে যাবার কয়েক মিনিট পরেই মামা মারা গেলেন...'

বিশ্বজিৎ আবার আরম্ভ করতে যাচ্ছিল তার আগেই রেষ্টুরেণ্টের কর্তা এসে বললে, 'দাদা, রাত হয়েছে। দোকান বন্ধ করতে হবে।'

দুজনেরই চমক ফিরল। বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে। আমার ঘড়িতে চেয়ে দেখলাম রাত দশটা।

বিশ্বজিৎ আবার সামনের তাল তাল অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি ছুঁড়ে বললে, 'তোমরা ঠিকই বলেছ সুব্রত! আমি মৃত্যুকে ভয় করি। এত ভয় কেউ কোনদিন করেনি...' বলতে বলতে থরথর করে কাঁপতে লাগল ওর গলার স্বর যেমন করে হাওয়া লেগে কাঁপতে থাকে দেওদার পাতা।

"নীতিকামশাস্ত্রানুসারেণার্থকামাদেব পুরুষার্থে।"—চার্ব্বাক

নিরামিষ মুড়িঘণ্ট

সত্যপ্রিয় ঘোষ

যা ভয় করেছিল। ফের অমনোনীত।

সেকেণ্ড-কয়েক শুদ্ধ থেকে অবশেষে মরিয়া হ'য়ে ব'লে ফেলে গঙ্গেশ: 'কী দোষ হয়েছে গল্পটার?'

সম্পাদক জবাব দেন তেরিয়া হ'য়ে: 'মহৎ দোষ! এই সবে লেখা ধরেছেন, কাঁচা বয়েস নতুন কলম অথচ লিখেছেন সেই থাড়া বড়ি থোড় থোড় বড়ি থাড়া'—বলতে বলতে সম্পাদক অন্য-একটি চেয়ারে শোভমান একটি প্রধান প্রখ্যাতনামা লেখকের দিকে ফিরে ফের বলতে লাগলেন: 'এই নতুন লেখকদের লেখাটেখা প'ড়ে আমার কি মনে হয় জানেন—যেন এরা জীবনে চান করে না, দাঁত মাজে না, মুখ ধোয় না আর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে রাজ্যের উকুন যেন থিকথিক করছে। বাসি পচা দুর্গন্ধ যেন ভুরভুর করছে। সত্যি বলছি আপনাকে আমার মনে হয় এদেশে সত্যিকারের নতুন লেখক আর হবেই না, নতুন লেখাও বেরুবে না।'

শুনে গঙ্গেশের কানদুটি বেগুনী হ'য়ে গেলো, রক্ত টগবগ ফুটে উঠলো, বললে কঠিন নিষ্পিষ্ট গলায়: 'আপনাদের এই সংখ্যায় ভ্রূকুটি নামে যে গল্পটা বেরিয়েছে সেটা তো পুরনো লেখকের লেখা, তার মধ্যে কোন্ নতুন বিষয়বস্তুটা আছে! যত দোষ নতুন লেখকের?'

সম্পাদক এক-ঝলক তাকান গঙ্গেশের দিকে। মনে মনে বলেন: 'এই নতুন লেখকগুলোর বুক নেই কিন্তু বুকের পাটা আছে!' কিন্তু সোচ্চারে বলেন: 'পুরনো লেখক তো পুরনো বিষয়বস্তু লিখবেই কিন্তু নতুনেরা নতুন-কিছু না লিখলে আমি সে বাসি-পচা আবর্জনা ছোঁব না এই হচ্ছে আমার শেষ কথা। ওহে বরেন, হ'ল তোমার প্রুফটা?'

চ'লে আসে গঙ্গেশ। তিরিক্ষি পায়ে। ধাক্কা লাগে রাস্তায় লম্বমান একটা ষাঁড়ের সংগে। প্রায় উল্টে পড়ে আর কি! 'শালা ধর্মের ষাঁড়'—ভাবে গঙ্গেশ। বাসায় ফিরে এসে খালি মেঝেয় চিৎ হ'য়ে প'ড়ে বলে বৌকে: 'পা-দুটো একটু টিপে দাও তো জিলিপি। ওফ্, সাত মাইল হেঁটেছি।'

'উদ্ধার করেছ আমাকে'—ফোঁস ক'রে ওঠে জিলিপি: 'এক পয়সার মুরোদ নেই পা টিপে দিতে বলে! কী বললে ওরা? ছাপবে? যদি ছাপে তো পয়সা দেবে? না এইটি?'—ব'লে জিলিপি বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলটা গঙ্গেশের নাকের নিচে নাচিয়ে দেয়।

বলা বাহুল্য, এর উত্তরে গঙ্গেশ আপাতত কিছুই বলে না। পিটপিট তাকিয়ে থাকে বৌটার দিকে। ওর ভাবগতিক নিরীক্ষণ করে। যদি ঝটিতি কোন দৈহিক আক্রমণ আসে তো তা তৎক্ষণাৎ ঠেকানোর জন্যে নিজেকে প্রস্তুত রাখে। আর ভাবে মনে মনে: 'সাহিত্যসাধনা কী দুরূহ কাজ। লিটারারি ফ্রণ্ট থেকে তাড়া খেয়ে ডোমেষ্টিক ফ্রণ্টে এসে পড়লাম। এর ওপরে আবার রোজ দশটা-পাঁচটা সামলাই অফিস-ফ্রণ্ট। এত জীবন-সংগ্রাম করছি তবু বলে কিনা—'

'মেনী মুখোর মত ভাবছ কী কুৎকুৎ ক'রে'—পুনরায় খেঁকিয়ে ওঠে জিলিপি: 'র‍্যাশান না এনে

দিলে বিকেলে হাঁড়ি চড়বে না আজ এই ব'লে রাখলুম' - ব'লে রেখে জিলিপি ঘরটার মধ্যে কয়েক পাক প্যাচ খেয়ে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে গেলো ঘর থেকে।

তখন গঙ্গেশ নিশ্চিন্ত হ'ল খানিকটা। হ'য়ে শোয়া-অবস্থাতেই তার বইএর শেলফটার দিকে এগিয়ে গেলো, টেনে নিলো একটা খাতা। কিন্তু হায়, উঠতে তাকে হলই, কলমটা যে পকেটে, অনেক উঁচুতে, শুয়ে-শুয়ে অত-উঁচুতে নাগাল পাওয়া যায় না। অগত্যা প্রাণান্তকর পরিশ্রমে উঠে কলমটা নিয়ে এসে আবার এলিয়ে পড়লো গঙ্গেশ মেঝেয়। এখন সে, ঠিক করলো গঙ্গেশ, একটা রম্যরচনা লিখবে। কেন না খেয়াল হ'ল তার হঠাৎ, বিজ্ঞান জগতে এটা যেমন অ্যাটমিক এজ, ব্যবসা-জগতে এটা যেমন প্লাষ্টিক এজ, সাহিত্য-জগতেও তেমনি শুরু হয়েছে এখন রম্যরচনার যুগ। সুতরাং নতুন-কিছু যদি লিখতে হয়, ঐ-সম্পাদকের যদি নিকুচি করতে হয়, তাহ'লে এখন তাকে কিছু রম্য-রচনা হাতে নিয়ে কয়েক রাউণ্ড খেল দেখাতে হবে। ভয় এই, বেঘোড়ে হঠাৎ শহীদ না-হ'য়ে যাই। যদি না হই তাহ'লে রম্য ভবিষ্যৎ—হবে না কি? কেন হবে না, চেষ্টার ক্ষেত্রে আমি রবার্ট ব্রুসের প্রতিভা দেখাব—দৃঢ়-সঙ্কল্প ক'রে গঙ্গেশ তার কলমের মুণ্ডুটি খুলে ফেলে।

আ! কী সূক্ষ্ম ঝকঝকে রম্য নিব! আশ্চর্য হ'য়ে, সাহিত্য-ধ্যান চেতনায়, গঙ্গেশ তার কলমের নিবটা কী মেড-ইন পড়বার চেষ্টা করলো। যে মেড-ইনই হোক, রম্যরচনা যদি লিখতে হয় তো নিবটি হওয়া চাই এমনই তীরের মত তীক্ষ্ণ, অর্থপুর্ণ ও সাবলীল। একি, মস্ত এক ফোঁটা কালি বমি করলো নিবটা! এক মুহূর্ত স্তব্ধ গঙ্গেশ। কিন্তু ঘাবড়ায় না, কালির ফোঁটাটি ভালো ক'রে নজর ক'রে নিয়ে কলমের রোগটা ডায়াগনাইজ করলো সে তৎক্ষণাৎ, এ হচ্চে পিত্তবমি, পেট খালি হ'য়ে গেছে, চিকিৎসা হাতীঘোড়া কিছু না, কষ্ট ক'রে পেটটি ভ'রে দিলেই ব্যাস, আবার উনি সুস্থ স্বচ্ছতোয়া সূচীমুখী হবেন।

এইটুকু কষ্ট, তার কলমের স্বার্থে, গঙ্গেশ করলো। ক'রে আবার মগ্ন হ'ল রম্যরচনায়। কী-নিয়ে-লিখি করতে করতে গঙ্গেশের মনের দরজায় ঐ সম্পাদকের হেক্সাগন মুখটা হঠাৎ এক ভেংচি কাটলো, খচা-মুখে বলতে লাগলো যা-তা—প্রতিক্রিয়ায় রি-রি ক'রে ওঠে গঙ্গেশ, খাতাটার ওপর এলোপাথারি লিখতে শুরু করে: 'রোজ শালা তিনবার ক'রে চান করি, নিমের দাঁতন দিয়ে ঘণ্টাখানেক ধ'রে দাঁত মাজি রোজ—আর লোকটা বলে কিনা চান করো না দাঁত মাজো না! আবার বলে মাথাভর্তি উকুন! জিলিপির মত স্ত্রীলোকের সংগে সহবাস করতে হ'লে মাথায় উকুন হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না, কিন্তু হে সম্পাদকপ্রবর! তবুও, তবুও আমি তোমার সংগে এই নিয়ে বাজি ধরতে রাজি আছি, তুমি যদি আমার এই ঝাঁকড়া-মাথা চুলের থেকে একটি উকুন বের ক'রে দিতে পারো তো আমি শালা সাহিত্যসাধনাই ছেড়ে দেব। আর না পারলে? না পারলে হে সম্পাদক যাদুমনি, আমি তোমাকে মাথামুণ্ডু ছাইভস্ম আমার সৃষ্টি-অনাসৃষ্টি যা কিছু দেব—সব ছাপতে হবে নির্বিচারে। কেমন, রাজি তো? তাহ'লে এই নাও, তোমার ঐ করতলে, দিলেম এই মাথা পেতে, আনো, একটি উকুন আনো।' —এই পর্যন্ত লিখে গঙ্গেশ তার মাথাটি মেঝেয় পেতে দিয়ে স্থির হ'য়ে রইলো।

'বা-বা-বা! হত্যে দিয়ে প'ড়ে আছেন'—আবার জিলিপির ঝঙ্কার শোনা গেলো ঘরের মধ্যে: 'তা এখানে কেন। তারকেশ্বরে গেলেই হয়। আপিস কামাই ক'রে গাঁজায় দম দিয়ে আমার মুণ্ড

লেখা হচ্ছে—তাও যদি লোকে ডেকে জিগেস করত!'—বলতে বলতে জিলিপি গঙ্গেশের সদ্য-লেখা লেখাটা টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করলো।

গঙ্গেশ কিন্তু আপত্তি করে না বরং সাগ্রহে উঠে বসে। তীক্ষ্ণ চোখে বুঝবার চেষ্টা করে তার প্রথম রম্যরচনার প্রথম পাঠিকার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াটা। এইটে ঠিকমত ঠাহর ক'রে নিতে পারলে তবেই এইপথে খোলসা হবে তার ভবিষ্যৎ। কিন্তু দেখতে-দেখতে, মনে হয় গঙ্গেশের, মুখটা জিলিপির জিলিপির মতই প্যাঁচালো হ'য়ে উঠছে, ঠিক বোঝা যচ্ছে না কেন ও খাতার পৃষ্ঠাটা ওরকম ক'রে ধরলো হঠাৎ, ছিঁড়ে ফেলার মতলব করেছে নাকি? ভাবতে ভাবতে, হা হতোঽস্মি, অসহায়ের মত দেখলো গঙ্গেশ, সত্যিই জিলিপি ফর্‌র্ ক'রে ছিঁড়ে ফেললো পৃষ্ঠাটা, তারপর গোল্লা পাকালো রম্যরচনাটা, পাকিয়ে জানলা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। দিয়ে অত্যন্ত শান্ত অথচ শ্রান্ত ভংগীতে এসে হাত ধরলো জিলিপি গঙ্গেশের, বললে: 'চলো মাথাটা ধোবে, চলো'

'এরা সব এক জাত'—মনে মনে ভাবতে ভাবতে গঙ্গেশ ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে জিলিপির থাবা থেকে: 'এই সম্পাদক, বৌ আর অফিসের বড়োবাবু, সব এরা এক-জাত। কোন কিছুর মূল্য বুঝবে না কিন্তু বাগড়া দেবে ঠিক।'

'মামীমা আপনাদের চিঠি'—ব'লে বাড়ীয়ালার ছোট মেয়েটি ঘরের মধ্যে একটা খাম ছুঁড়ে দিয়ে দৌড়ে চ'লে গেলো।

চিঠি প'ড়ে জিলিপি নাক উঁচিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে গলা পেঁচিয়ে বললো: 'ওঃ, জামাইবাবুর জন্যে দরদ একেবারে উথলে উঠছে মেয়ের! নিরামিষ মুড়িঘণ্ট খাওয়াবে! কচুঘণ্ট খাওয়াব তোমাকে'—ব'লে চিঠিটা খামের মধ্যে ভ'রে গঙ্গেশের নাকের ডগায় অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুঁড়ে মেরে জিলিপি প্রস্থান করলো।

চিঠি প'ড়ে গঙ্গেশ বোঝে ব্যাপারটা। গৌহাটি থেকে লিখেছে তার শ্যালিকা। অন্যান্য সাত-পাঁচের মধ্যে সে নতুন রান্নার একটা নির্ঘণ্ট পাঠিয়েছে, রান্নার পদটার নাম নিরামিষ মুড়িঘণ্ট, লিখেছে জামাইবাবুকে ক'রে খাওয়াস, খেয়ে কী বলেন জানাবি আমাকে। শ্যালিকা তার রান্না সেলাই ইত্যাদি মেয়েলী বিষয় নিয়ে রীতিমত গবেষণা করে এবং বাঙলা দেশের পত্রিকাগুলোর 'নারীর-কথা-'গুলোর মধ্যে সেই অভাবনীয় গবেষণাগুলো মুহুর্মুহু প্রকাশিত হয়। 'তা আমার ওপর এই নিরামিষ মুড়িঘণ্টের এক্সপেরিমেণ্ট হবে'—ভাবে গঙ্গেশ: 'আমি যেমন এক্সপেরিমেণ্ট করতে চেয়েছিলাম আমার রম্যরচনা আমার বৌয়ের ওপর।' আর এই ভাবনার সংগে-সংগেই নতুনতর লেখার একটি পরিকল্পনার বিদ্যুৎপাত ঘটলো তার মস্তিষ্কে, চিঠিটা আবার ধরলো খুলে চোখের সামনে, পড়তে লাগলো নিরামিষ মুড়িঘণ্টের নির্ঘণ্টটা: "উপকরণ—১টা ফুলকপি, ১ পোয়া আলু, ২ মুঠো চাল, তেজপাতা ২টা, হলুদ-বাটা, লঙ্কাবাটা, জিরাবাটা, আদাবাটা, নুন, অল্প চিনি, অল্প ঘি, গরম মশলা ও তেল। প্রণালী—ফুলকপি খুব ছোট ছোট ক'রে কেটে একটি পাত্রে ধুয়ে রাখুন। আলুর খোসা ছাড়িয়ে ছোট ডুমো ডুমো ক'রে কেটে ধুয়ে আর একটি পাত্রে রাখুন। এবারে উনুনে কড়া চাপিয়ে আলু কপি ও ঐ দু-মুঠো চাল তেলে আলাদা আলাদা ক'রে ভেজে রাখুন। এবার কড়াতে পরিমাণমত তেল ঢেলে, তেতে উঠলে তেজপাতা দুটো সামান্য জিরে ফোঁড়ন দিয়ে হলুদবাটা লঙ্কাবাটা জিরেবাটা

আদাবাটা পরিমাণমত দিয়ে একটু কষে নিন ও খুব অল্প চিনি দিয়ে কষুন (চিনি দিলে রঙটা একটু ভাল হয়)। কষা হ'লে আলু কপি ও চাল দিয়ে নাড়তে থাকুন। পরিমাণমত নুন নিয়ে কপি ও আলু যাতে সিদ্ধ হয়, সেই পরিমাণ জল দিয়ে কড়ার মুখ একটা থালা দিয়ে ঢেকে দিন। জল শুকিয়ে গেলে কড়াটি নামিয়ে তাতে ঘি গরম মশলা দিয়ে দিন ও একটি পাত্রে ঢেলে রাখুন। তবেই নিরামিষ মুড়িঘণ্ট প্রস্তুত হ'ল। এটি লুচি, ভাত ও রুটি দিয়ে খাওয়া যায়।"

নতুন রান্নার নির্ঘণ্টের মত, চিন্তা করে গঙ্গেশ, আমি যদি নতুন ধরনের সব রচনার জন্যে আগে এমনি নির্ঘণ্ট মুসাবিদা ক'রে নিতে পারি তো নির্ঘাৎ নতুন-কিছু জম্‌মাবে, চাই কি বাঙলা সাহিত্য আচমকা একটা মোড় ঘুরে যেতে পারে। আর বিসমিল্লা! একবার যদি তালেগোলে এমনি একটা মোড়-ঘোরানো এস্টাব্লিশ করতে পারো তো তোমাকে আর পায় কে, চিরজীবন তোমার আর নতুন-কিছু না লিখতে পারলেও চলবে, চিরকাল সবাই বলবে গঙ্গেশ গাঙ্গুলীর অমুক গল্পে বাঙলা সাহিত্যে গল্পের একটা নতুন মোড় ফিরে গিয়েছিল!

ভীষণ উৎসাহে উঠে বসে গঙ্গেশ। আবার খোলে কলম, টেনে নেয় খাতা। কয়েক সেকেণ্ড ধ্যানস্থ। আর তারপর তার ঝর্না কলম থেকে ঝর্নার মত বেরুতে থাকে:

"উপকরণ—১টি মোটামুটি চেহারার ফিফ্‌থ ইয়ারের ছাত্রী, তার সতীর্থ ৪টি ছাত্র, ২টি অধ্যাপক, ২ পুরিয়া ধর্মঘটরূপ মোদক, ভাববাদ, মার্ক্সবাদ, জাতীয়তাবাদ, বাদবিসম্বাদ, সাসপেন্স, অল্প রক্তপাত, অল্প জাঁ পল সর্তর পরিকল্পিত অস্তিত্ববাদ, স্টাণ্ট ও বাস্তববাদী রোমান্স। প্রণালী—ছাত্র-নায়িকার ফুলকপিরূপ হৃদয়-কোরকটিকে খুব ছোট ছোট ক'রে কেটে গঙ্গাজলে ধুয়ে ধোয়া তুলসীপাতার মত বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশ-বাতাসে ছড়িয়ে রাখুন। সতীর্থ ছাত্র চারটির বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ করে দিয়ে ছোট ডুমো ডুমো ক'রে নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে ধুয়ে প্রেতাত্মার মত ছড়িয়ে রাখুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকোষ্ঠ ও প্রাংগনে। এবারে বৌবাজারে উদ্বাস্তু মিছিলের ওপর সরকার কর্তৃক গুলি-চালনা শুরু করিয়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ শুরু ক'রে দিন এবং নায়কনিচয় নায়িকা ও অধ্যাপক দুটিকে বাস্তববাদী রোমান্সের তপ্ত তৈলে আলাদা-আলাদা ক'রে ভাজাভাজা করুন। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক্লাসে পরিমাণমত বাস্তববাদী রোমান্স ঢেলে রোমান্স তেতে উঠলে ধর্মঘটরূপ মোদকের পুরিয়া দুটি, সামান্য জাতীয়তাবাদের ফোঁড়ন দিয়ে ভাববাদ মার্ক্সবাদ জাতীয়তাবাদ ও বাদবিসম্বাদ পরিমাণমত দিয়ে একটু কষে নিন ও খুব রক্তপাত দিয়ে জমিয়ে আনুন (রক্তপাত দিলে গল্পের বিপ্লবী রঙটা একটু খোলতাই হবে)। এমনি ক'রে গল্প জমে এলে পরে নায়কনিচয় নায়িকা ও অধ্যাপক দুটিকে নিয়ে খুব ঘাঁটাঘাটি করতে থাকুন। পরিমাণমত সাসপেন্স দিয়ে নায়িকা ও নায়কনিচয় যাতে একেবারে সিদ্ধ হ'য়ে যায়, সেই পরিমাণ ঘটনা ঢুকিয়ে দিয়ে গল্পের মুখ চুয়াল্লিশ ধারা দিয়ে ঢেকে দিন। ঘটনাপ্রবাহ বোরিং হ'য়ে উঠলে গল্পটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগণ থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে এসে বটানিকাল গার্ডেনসে এনে ফেলুন এবং সেখানে সার্তর পরিকল্পিত অস্তিত্ববাদ ও স্টাণ্ট দিতে থাকুন এবং তারপর নায়িকাটিকে একটিমাত্র ছাত্রের সংগে একটি কুঞ্জে ঢুকিয়ে দিন। তবেই রসোত্তীর্ণ বিপ্লবী গল্প প্রস্তুত হ'ল। এটি যে-কোন আধুনিক পত্রিকায় প্রকাশ যোগ্য এবং আধুনিক সাহিত্য সম্মেলনে পাঠযোগ্য হবে।"

এই পর্যন্ত লিখে ফেলে গঙ্গেশ গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'ল কী-করে এখন এই অতুল সম্ভাবনাময় উপপাদ্যকে উপপন্ন করা যায়। জিলিপি কি তার নতুন রান্নাটা, ঐ নিরামিষ মুড়িঘণ্টটা, চড়িয়েছে? ভাবে গঙ্গেশ। তাহ'লে আমারও তো চটপট চড়িয়ে দিতে হয়। দেখি কে আগে নামাতে পারে, দেখি কে আগে তার রান্নাটা অন্যকে দিয়ে টেষ্ট করাতে পারে। রসনা লালায়িত হয় তার জিলিপির নতুন রান্নাটির আশু আস্বাদন সম্ভাবনায়। কিন্তু হায় সে যে এদিকে কিছুতেই এগোতে পারছে না তার রান্নাটা। কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছে না কেমন-ক'রে এই সুমহান সুনতুন সুঅদ্ভুত গল্পের পরিকল্পনাটাকে কায়দা করা যায়। জিলিপি হয়ত এতক্ষণে ডুমো ডুমো ক'রে আলু কেটে ধুয়ে আর একটি পাত্রে রাখছে, আর সে? সে এখনো বোকা ছাগলের মত দাড়িতেই হাত বুলোচ্ছে। তবে কি এই দাড়িতে হাত বুলনোই সার হবে তার? তবে কি বন্ধ্যা তার সৃষ্টি-প্রতিভা?

শিথিল, হতাশ, শ্রান্ত, দু-হাতে চুলের জট ছাড়াতে চেষ্টা করে সে, ঝাঁকতে থাকে মাথা। কিন্তু কী হবে ঝাঁকিয়ে, মনে হয় গঙ্গেশের, মস্তিষ্কটি তার গজভুক্ত কপিত্থবৎ শূন্য ঝরঝরে হ'য়ে গেছে একেবারে। আর তা-ই যখন মনে হ'ল উঠে বসলো সে, বড়ো-বড়ো করে লিখলো খাতাটার ওপর: 'আমার পক্ষে গল্প লেখা আর বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্রের চাঁদ দেখা একই কথা। কিন্তু জিলিপির নিরামিষ মুড়িঘণ্টটা এতক্ষণে বোধ হয় হয়ে এলো। হয়ত কড়াটি নামিয়ে ও এখন ঘি গরম-মশলা দিয়ে দিচ্ছে তাতে। রসনা! ধৈর্য ধরো ধৈর্য ধরো!'

"আমাদের শিক্ষা যাকে একসঙ্গে গুলে ঘুলিয়ে দিচ্ছে, আমাদের সাহিত্যের কাজ হওয়া উচিত তাই বিশ্লেষণ করে পরিষ্কার করা।"—প্রমথ চৌধুরী॥

গড় শ্রীখণ্ড

অমিয়ভূষণ মজুমদার

[পূর্ব্বানুস্মৃতি]

সান্ন্যালগিন্নী সান্ন্যালমশাইএর অন্দরের ব'সবার ঘরের দিকে যেতে যেতে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

বিস্মৃতপ্রায় অতীতে সুকৃতি একবার এক সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, আর এতদিন পরে আর একটির সৃষ্টি করেছে সুমিতি। অন্যের সমস্যা হ'লে আলোচনা ক'রে বুদ্ধি বাৎলে দেয়া যায়, কিন্তু যে কথাটা মনে করতে গিয়ে বুকটা মুচড়ে মুচড়ে যাচ্ছে তা কি ক'রে আলোচনা করা যাবে।

তিনি মা, সহ্য করাই তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যাস কিন্তু ঐ লোকটির কেমন লাগবে? পুরাতন পন্থী লোক, হয়তো বা খোকার বিবাহের ব্যাপারে কত উচ্চাশা পোষণ করেছেন, চাপা লোক তাই প্রকাশ করেন না। খোকা বিবাহ করল, একটা সংবাদ দেয়া পর্যন্ত দরকার বোধ করল না। তবু যা হোক, অশ্রুরোধ ক'রে ভাবলেন সান্ন্যালগিন্নী অনসূয়া, ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিবাহ ক'রে এতবড় বংশটার মাথা হেঁট ক'রে দেয়নি। কিন্তু এতে প্রবোধ হয় না, অভিমান অত সহজে ভুলবার নয়।

সান্ন্যালমশাইএর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অনসূয়া দেখতে পেলেন রূপু আলমারিতে বই খুঁজছে আর টেবিলের সামনে বসে সান্ন্যালমশাই সদানন্দ মাষ্টারের সাথে কথা বলছেন।

সান্ন্যালমশাই বললেন,—হরিশ্চন্দ্র ও লঙ্‌ দু'জনেরই অভাব হ'ল, আর তারই ফলে খানিকটা ছন্নছাড়া হ'য়ে গেল আন্দোলনটা।

সদানন্দ বলল,—তা হ'লেও কাজ হয়েছিল।

—তার চাইতেও বড় কথা এমন একটি স্বতপ্রবৃত্ত উঠে বসার চেষ্টা চাষীদের মধ্যে সব সময়ে দেখা যায় না, যেমন হ'য়েছিল নীল আন্দোলনের সময়ে।

রূপু লাল খেড়োয় বাঁধান বড় একটা বই এনে টেবিলের উপরে রাখল। পাতা উল্টাতে উল্টাতে সান্ন্যালমশাই বললেন,—সে সময়ের খবরের কাগজের কতগুলি বাবার পুরানো কাগজপত্রের বাক্সে পেয়ে বাঁধিয়ে রেখেছি। কতগুলি হাতে লেখা কাগজও আছে। এই গ্রামে ও আশে পাশে যে গান তৈরী হ'য়েছিল, তার কিছু কিছু পাবে। পড়ে দেখো সদানন্দ।

রূপু বললে,—বাবা, ওদের গান একদিন শুনলে হয় না।

সান্ন্যালমশাই বললেন,—ওদের গানে যদি তোমার বাবার নিন্দা থাকে।

রূপু বললে,—থাকলেই হ'ল! আপনি কি কখনো কোন অন্যায় কাজ করেছেন?

সান্ন্যালমশাই মৃদু মৃদু হাসলেন।

রূপু বললে,—তা হ'লে কাউকে দিয়ে ওদের একদিন ডেকে পাঠাব তো, গান শোনার জন্যে।

—ওসব পথের গান, বাড়ীতে ডেকে আনতে নেই।

সদানন্দ বললে,—এখন এস, একটু ভূগোল পড়ে নি।

—হ্যাঁ এবার পড় তোমরা। সান্ন্যালমশাই উঠে দাঁড়ালেন।

সান্ন্যালগিন্নী দরজার কাছে থেকে সরে প্যাসেজে দাঁড়ালেন। তাঁর মনে পড়ল তাঁর বড়ছেলের লেখা পড়ার কথা। সবই যেন অতীত, কত সুদূরের অতীত। কিন্তু অতীত ভাবতে গিয়েই মায়ের মন ছট্‌ফট্‌ ক'রে উঠল,—আহা, আহা, তা কেন খোকা মারাত্মক একটা ভুলও যদি ক'রে থাকে তা ব'লেই তার সব কিছু অতীত হবে কেন।

সান্ন্যালমশাই তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন,—ছেলের লেখাপড়ার তদ্বির করতে এসেছিলে? কিন্তু তোমার বাড়ীতে তো আজ অতিথি আছে। অনসূয়া পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললেন,—বড়ছেলের খবর অনেকদিন পাওয়া যায় না।

—যে মহীরাবণ সেটা হ'য়েছে, ভূমিষ্ঠ হ'য়েই যুদ্ধ ক'রতে চায়। খবর দেয়ার সময় কোথায় তার।

—তা হ'লেও নিজের বাপ মাকে—

—ওর ধর্মমায়ের কথা বুঝি শোন নি?

অনসূয়া নিজের বক্তব্য উপস্থিত করার জন্য সূত্রটা পেয়েছিলেন, সেটা হাতছাড়া হ'ল। অন্য আর একটি সূত্র প্রশ্নের আকারে উত্থাপন করলেন।

—ধর্ম মা? বিয়ে করেছে, শাশুড়ীদের কারো কথা বলছ? তোমাকে লিখেছে বুঝি?

—না, খাঁটি ধর্ম-মা। তার চেহারার বর্ণনাও একদিন পড়লাম ওর চিঠিতে। বোধ হয় জেলের মেয়ে, জলে জলেই দিন কাটে, বাড়ীতে পাৎকুয়ো নেই, খালের জলে হাতমুখ ধুতে যায়। দাঁতের বর্ণনা নেই, কিন্তু কপালের বর্ণনা আছে, আকাশ ছোঁয়া কপাল। অনসূয়ার সূত্রগুলি ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেল, তিনি বললেন,—বলো কি, সেই জেলের মেয়ে হ'ল আমার ছেলের মা? আর তার রূপ বর্ণনা করেছে ছেলে তোমার কাছে।

—তা ছাড়া, মেয়েটির রুচিও বোধ হয় ভালো নয়, ছেলেপুলে আছে, তবু নাকি সব্‌জে রঙের শাড়ী পরে আর তার আঁচল হাওয়ায় উড়িয়ে বেড়ায়।

—ধিক্‌ ধিক্‌।

সান্ন্যাল মশাই হেসে বললেন, এতদিন পরে আমার রুচি তোমার অজানা নেই। বড় কপাল আমার কোনদিনই পছন্দ নয়।

অনসূয়া রাগ করে বললেন,—তোমার প্রশ্রয়েই ছেলে এমন বেড়ে উঠেছে। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, তুমি শাসন কর না। ওদের সাথে বন্ধুর মতো ব্যবহার করো। তোমার এই সেকেলে পরিহাসও আমার ভাল লাগে না।

—সেটা আমার দোষ নয়, অনসূয়া। বিলেতি কায়দায় ছেলে মানুষ করার ঝোঁক ছিল তোমার। ছেলেদের স্কুল কলেজে যেতে দিলে না। পাশ করল না যে চাকরি পাবে। মধ্যের থেকে সদানন্দ বেচারার ভবিষ্যতটা গেল। কোন কলেজে মাষ্টারী করবে সে ক্ষমতাও ওর নেই। ভাবছি ওর মাসোয়ারাটা কিছু বাড়িয়ে দেব। আর কিছু না করুক ছেলেকে অন্তত বিলেত ফেরৎদের মতো জেল-

খাটা শিখিয়েছে। জেলখাটার কথায় অনসূয়ার মনে পড়ল কবিদের মধ্যে একজন দেশকে অম্বরচুম্বিত ভাল-হিমাচল ব'লে বর্ণনা করেছেন বটে। জেলের মেয়ের পরিচয় বুঝতে পেরে তিনি হেসে ফেললেন, বললেন,—খুব জেলে বৌএর গল্প বলেছ। এবং তখন তখনই তাঁর বক্তব্যের সূত্র আবার স্থাপন করলেন, কিন্তু এখন তুমি হাসছ তার দেশের কাজের কথায়, যদি সে সবদিক দিয়েই বিপ্লব সৃষ্টি করতে থাকে সহ্য হবে তোমার? সমাজের বিধানগুলি, গৃহস্থজীবনের রীতিনীতিগুলিও যদি সে অগ্রাহ্য করতে সুরু করে—তা কখনো তোমার ভাল লাগবে না।

—তার সেই গৃহ-বিপ্লবের কথা বলছ? সেই দুই হাত দিয়ে পৃথিবীকে সম্মুখে এগিয়ে দেয়া। মন্দ কি। ওটা এক ইংরেজ কবির ভাষা।

—তোমার প্রশ্রয় যে ছেলেগুলিকে আর কতভাবে নষ্ট করবে আমি ভেবে পাইনে। জমিদারের ছেলে হয়েও সে যখন জমিদারী প্রথা ধ্বংস করতে চায় তখনও তুমি চুপ ক'রে থাক। তুমি কি বোঝ না ওদের হাতে পড়লে আমার এই শ্বশুরের ভিটের কি দুর্দশা হবে।

—আমি তো দোষের কিছু দেখি না। অন্দরের বসবার ঘরে নিজের আসনে ব'সে সান্যাল মশাই বললেন,—এ বংশের অনেক ছেলেই বহুদিন ধরে মিনমিন্ ক'রে জীবন কাটিয়ে দিল। বহুদিন পরে যদি এক আধটা ছেলে দুর্দ্দম হ'য়ে ওঠে ভালোই হবে বোধ হয়।

—কিন্তু জমিদারদের উচ্ছেদ করতে গেলে তোমার সাথেই যে প্রথম বিবাদটা বাধবে না তার প্রমাণ কি?

—কোন প্রমাণই নেই। বরং বাধবেই, ধরে নিতে পার। তবে তোমার বিপন্নমুখ করার কোন কারণ নেই। জমিদাররাও আটাশে ছেলে নয়, হট্ বললেই হটে যাবে। আমার সাথে তার বিবাদ হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। লোকে বলবে অমুক সান্যালের ছেলে জমিদারী প্রথার ধ্বংস কামনা করে অথচ নিজের পৈতৃক ব্যাপারে অতি ভালো ছেলে। ছেলের এ অপবাদ আমি কখনো সহ্য করতে পারি না, বড় বৌ। বাপ বেটার বিবাদ সেটা ঠিক ধর্মযুদ্ধ হবে না। এ যুগের কেউই কূট কৌশলের চেষ্টা না ক'রে ছাড়বে না। শুধু আইন বদলানোর আন্দোলন নয়, রক্তপাতও হ'তে পারে। বড় কাজের জন্য রক্তের মতো দামী জিনিসের প্রয়োজন হয় কখনো কখনো। তোমার ঐ চরনকাশির চরের জন্যে নীলকরদের সাথে মারপিট হয়েছিল সান্যালদের।

অনসূয়া শঙ্কিত হ'লেন। এটা রহস্যের সুরে বলা একটা কথামাত্র। তথাপি রহস্যের আড়ালে কিছু কিছু দৃঢ়তা লুকিয়ে রইল, পর পর কয়েকটি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে এ বাড়ীর মা হ'য়েছিল বলে বর্তমানের সান্যাল মশাইএর চেহারায় বলবার মতো কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না, কিন্তু কয়েকটি পুরুষ ডিঙিয়ে সাধারণ একটি মায়ের কোলে খড়্গনাসা একটি শিশু যদি আসতে পারে, এই শান্তিপ্রিয় প্রৌঢ়টির আট-পৌরে স্বভাবের ভেতর থেকে সান্যালদের আক্রোশ বা রোষ প্রকাশ পাবে না, এ জোর ক'রে বলা যায় না। বুদ্ধিমান সে রোষকে আত্মঘাতী বলবে হয় তো, কিন্তু তার প্রতিহিংসা পৃথিবীর যে কোন প্রতিহিংসার চাইতে কম নয়।

দু'দশ বিঘা চাষের অযোগ্য জমি। গ্রামের ভেতরে অমন কত অবহেলায় পড়ে আছে, কিন্তু পদ্মার চড়ের লাগোয়া সেই সামান্য জমির জন্য গুলি-গোলায় লাঠি-সড়কিতে প্রাণ গেল কয়েকটি লোকের।

নীলকর সাহেবকে গুলি ক'রে মারার অভিযোগে ফাঁসি হ'ল সান্যালদের নায়েবের। তার গায়েও নাকি সান্যালদের রক্ত ছিল। সমস্ত অভিযোগ নিজের কাঁধে নিয়ে সে রক্তের ঋণ শোধ করেছিল।

যদি সত্যই মতবাদ নিয়ে পিতাপুত্রে বিবাদ বেধে ওঠে তা হ'লে তিনি কি করবেন, এই দুশ্চিন্তা হ'ল অনসূয়ার। তার যে ভয়াবহ পরিণতি হ'তে পারে তা থেকে কি ক'রে তিনি পরিত্রাণ পাবেন? আর তেমনি একটি মত-পার্থক্যের সূচনা ইতিমধ্যে হ'য়েছে।

সান্যাল মশাই হাসছেন, তিনি হেসে বললেন,—কিন্তু আপাতত দুশ্চিন্তার কোন কারণ তোমার দেখছি না, প্রতিপক্ষ অনুপস্থিত। বরং সদানন্দকে একটু সমঝে দিও। চাষীদের কয়েকটি ছেলে কি গান করল, সেটার সাথে নীলবিদ্রোহের তুলনা রূপের মাথায় যেন ঢুকিয়ে না দেয়।

—সব তাতেই তোমার ঠাট্টা।

—না, পরিহাস নয়। তোমার বড় ছেলের লেখাপড়ার জন্যে আমাকে দায়ী করতে পার না। তার যুক্তিগুলির গোড়ার কথা যে সদানন্দর এমন সন্দেহ আজকাল আমার হচ্ছে।

অনসূয়া সান্যাল মশাইএর হাসি মাখানো মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এই মানুষটির সাথে ত্রিশ বছরের বেশী একসঙ্গে কাটিয়েও যেন এঁর সবটুকু পরিচয় পাওয়া গেল না। কোনটি লঘু পরিহাস, কোনটি কঠোর সত্য, এটা এখনও তিনি বুঝতে পারেন না। অকস্মাৎ এঁর একটি মনোভঙ্গি এত নোতুন, এত অপরিচিত ব'লে বোধ হয় যে, অনসূয়া জীবনের প্রাথমিক সেই দিনগুলির লজ্জার মতো কিছু অনুভব করেন।

সান্যাল মশাই যখন ভৃত্যের হাত থেকে নিয়ম-মাফিক তামাক নিয়ে তাতে মন দিলেন, সেই অবসরে অনসূয়া ভাবলেন,—আর যাই হ'ক, যে অপ্রত্যাশিত ও অপ্রিয় বিবাহ ব্যাপারটির কথা একই কালে স্বামীকে বলতেও চাচ্ছেন, গোপন করারও চেষ্টা করছেন, সেটা বলার সময় এখন নয়। সান্যাল মশাইএর সম্ভাব্য সুপ্তরোষ কিম্বা তাঁর কথা বলার এই হাসি মাখা স্নিগ্ধ ভঙ্গি কোনটিকে আঘাত করাই যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হ'ল না।

কিন্তু রাত্রির অনেকটা সময় বিছানায় এপাশ ওপাশ ক'রে চিন্তা করতে হ'ল অনসূয়াকে। তিনি ভাবলেন,—তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া যায় সান্যাল মশাই নিজে মেনে নিলেন এই বিবাহ, আত্মীয়, পরিজন, বন্ধুবান্ধব এরাও কি মানবে? তার চাইতে বড় কথা গ্রামের লোকেরা কি বলবে। সাধারণ প্রজাদের মনে যদি প্রশ্ন জাগতে থাকে, যদি কুৎসা রটে। সহসা তার চোখে এই প্রজারাই বড় প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়াল, প্রজারা ও দাসদাসীরা, আশ্রিতরা যারা মুখ তুলে চেয়ে আছে, এসব পরিবারের বিবাহের ব্যাপার যাদের কাছে বহুদিন ধ'রে আলাপ করার, আনন্দ করার বিষয়। অবিশ্বাস্য শোনালেও সত্য, যাদের মতামতের খোঁজও কেউ করেনি, তাদের গ্রহণ করার ভঙ্গিটির উপরেই যেন বিষয়টির নিষ্পত্তি নির্ভর করেছে।

তাঁর মনে হ'ল: ছেলে-মেয়েরা একটা কথা বুঝতে চায় না; মানুষ যত বৃদ্ধ হয়, মৃত্যুর দিকে যেতে থাকে, তার বাঁচতে প্রবৃত্তি, মৃত্যুকে অস্বীকার করার প্রবৃত্তি হয় তত তীব্র। সে সন্তানের মধ্যে নিজের আকৃতির প্রতিফলন নয় শুধু, মতামতের অনুকরণও খুঁজে পেতে চায়; সে অন্য আধারে মৃত্যুকে অস্বীকার ক'রে থেকে গেল এই যেন ব'লে যেতে চায়।

তারপর তিনি ভাবলেন: বিবাহটা কি শুধু দুটি প্রাণীর? একটা কাহিনী মনে হ'ল তাঁর। এ বংশের একটি স্ত্রী বিবাহের দু'বছর পরে স্বামীকে হারিয়েছিলেন। স্বামীর মৃত্যু হয়নি, তিনি ইতর স্ত্রীদের নিয়ে ছন্নছাড়া হ'য়ে যেতে লাগলেন ক্রমশ। প্রথমে স্বামীকে ফেরাতে চেষ্টা করেছিলেন বৌটি, তারপর করলেন অস্বীকার। তাঁর মহলে স্বামীর প্রবেশ নিষিদ্ধ হ'ল। এতটা হ'ল যে জমিদারীর মালিক হ'য়েও সে লোকটি স্ত্রীর মহলের দাসীদের মুখে—যেতে পারবেন না আপনি, এই হুকুম শুনে ফিরে গেলেন। সে যেন এক মাতৃতন্ত্রের পুনঃস্থাপন। স্ত্রীর অধিকার শ্বশুরের সম্পত্তিতেও, শুধু স্বামীতে নয় এই যেন প্রমাণ করেছিল সেই বৌটি। শ্বশুর বাড়ী স্বামীর চাইতে অনেক বড়। বিবাহটা শুধু দু'জনের সম্বন্ধ নয়। দু'জনের হৃদয়ের গভীরতায় সীমা পাওয়া যায় না এমন বহু হৃদয়ের সাথে জড়িত। নতুবা বিবাহ আর বাঈজী-প্রণয়ে কি প্রভেদ?

প্রকাশ্যে বিয়ের মন্ত্র পড়ুক ওরা এখানে। সেটা যদি অভিনয় হয়, হোক না। প্রায়শ্চিত্তর মতো লাগছে শুনতে, তা হ'লে তাই। তোমাদের কাছে হয়তো প্রস্তাবটা হাস্যকর শোনাবে, কিন্তু পিতামাতা যদি আঘাত সহ্য করতে পারে, পরিবর্ত্তে তাদের মুখ রাখার জন্য একটা মিথ্যা অভিনয় করা কি খুব কঠিন হবে, সুমিতি?

মনে মনে এই কথাটি ব'লে হুকুমের মতো করে অনসূয়া একটু শান্ত হলেন।

সকালে স্নান সেরে ঘরে ঢুকে সুমিতি দেখল আয়নার সামনে টেবিলটার উপরে একটি সিঁদুরের কৌটা। সেটি সেকেলে, সোনার, ভারি এবং অত্যন্ত বড়। এটা অতিথির জন্য সংরক্ষিত বস্তুগুলির একটি নয়, উপহার দেয়ার জন্য কিনে আনাও নয়। হয়তো বা সান্ন্যালগিন্নীর নিজের ব্যবহার্য্য, কিম্বা হয়তো এই সেকেলে পরিবারের প্রথার সাথে যুক্ত একটি উত্তরাধিকার—চালিত সামগ্রী।

আয়নার সম্মুখে ব'সে সুমিতির মনে হ'ল, সান্ন্যালবাড়ীর প্রথম শাসন কৌটা মারফৎ তার কাছে এসে পৌছেচে। সিঁদুরহীন কপালে এ বাড়ীর বউ হওয়া সম্ভব নয়, একটি মাত্র কথা ব্যয় না ক'রেও সে কথাটি অনসূয়া তার কাছে পৌছে দিয়েছেন।

বিবাহের চিরাচরিত প্রথা যদি না মেনে থাকে তারা, সেটার পেছনে পুরাতনকে অস্বীকার করার ইচ্ছাও যদি থেকে থাকে, সেটা সব সময়ে ঘোষণা ক'রে বেড়াতে হবে এমন কথা নেই। প্রতিবাদ মানে পাহাড়ীদের মতো সর্বদা কুকরী কোমড়ে বেঁধে বেড়ান নয়।

গোল ক'রে কপালে একটি টিপ আঁকতে আঁকতে সুমিতি ভাবল সিঁথিতেও দিতে হবে নাকি? সামান্য একটু চেষ্টাতেই চুলগুলি চিরে সোজা সিঁথি ক'রে সিঁদুর পরতে পারল সুমিতি।

সিঁদুর পরে আয়নার দিকে চেয়ে লজ্জিত হ'ল। তার সে লজ্জাটি অন্য যে কোন নববিবাহিতা অনুভব করে। এটা বুঝতে না পারলেও তার মনে হ'ল কেউবা তাকে দেখে ফেলেছে।

চায়ের অভাব বোধ করছিল সুমিতি, চায়ের সম্ভার নিয়ে ঝি এল না, এলেন সান্ন্যালগিন্নী খালি হাতে।

—এসো তো।

সুমিতিকে পেছনে নিয়ে ঘর থেকে বার হ'লেন অনসূয়া। ঠাকুর ঘরে প্রণাম ক'রে বেড়িয়ে

ঈশ্বরে অবিশ্বাসী সুমিতি দেখল একটা ছোটখাট জনতা তার জন্য অপেক্ষা করছে। অনসূয়ার সঙ্গে সুমিতিকে দেখতে পেয়ে হুলু দিয়ে উঠল তারা। কে একজন শাঁখও বাজাল। সভা ক'রে অনেক সাবাস-বাহবা পেয়েছে সুমিতি কিন্তু সহসা এই স্ত্রী-মণ্ডলের সমবেত কণ্ঠে 'বেশ বৌ' কথা শুনে সুমিতিকে মাথা নত করতে হ'ল।

শুধু একজন এদের কথায় সায় দিল না। অনেক বয়স হ'য়েছে তার। কথা বলতে গেলে গলা কোথাও কোথাও কেঁপে যায়, কিন্তু এখনও তার দেহবর্ণ বয়সের নিষ্প্রভতাকে কাটিয়ে দর্শনীয়। তিনি বললেন,—আমি ভাবি মেমসাহেব বুঝি। অনসূয়া বলে আমারই মতো, তা তোরাই বিচার কর। এ যে আফ্রিকার বুয়ার।

একটা চাপা হাসি কানে এল সুমিতির।

প্রসন্ন হাসিতে অনসূয়া বললেন,—উনি তোমার ঠানদিদি, সুমিতি, প্রথমে ওঁকেই প্রণাম করতে হয়।

প্রণাম পর্ব শেষ ক'রে সুমিতি ঘরে এসে দাঁড়াল। স্নানের ঘর দেখে সুমিতির যে মন সামন্ততান্ত্রিকতা লক্ষ্য ক'রে সচেতন হ'য়ে উঠেছিল সেই মন কাজ করতে লাগল। বিবাহের যজ্ঞের ধোঁয়া শুধু নিঃশ্বাস ও দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে না, মনকেও করে। সেই মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় অকাব্যকে কাব্য ব'লে ভ্রম হয়, নিছক কতগুলি বস্তুতান্ত্রিক প্রতিজ্ঞা এবং কতগুলি কষ্টবোধ মন্ত্রোচ্চারণ রম্য হ'য়ে ওঠে। তেমনি একটি মোহই যেন এরা বিকীরণ করছে। কিছুক্ষণ আগে প্রভাত হ'য়েছে। এরই মধ্যে আয়োজনের এতখানি যারা করেছে, রাত্রিতে পৌছবার আগে দিনটাকে তারা কি ভাবে অনুপ্রাণিত করবে বলা কঠিন।

কাল রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্য্যন্ত একটা সন্দেহ হ'য়েছিল সুমিতির—এরা আদৌ তাকে বধূহিসাবে গ্রহণ করবে কি না, এখন আর সে সন্দেহ নেই; গ্রহণ নয় শুধু, বিপুল আয়োজন করে, চিরাচরিত কোলাহলের মধ্যে গ্রহণ করেন।

পদশব্দে চোখ তুলে দেখল সুমিতি ঘরের ঠিক মাঝখানে অনসূয়া এবং একজন প্রৌঢ় এসে দাঁড়িয়েছেন। আন্দাজ করা কঠিন নয়। সুমিতির মনে হ'ল হাত তুলে নমস্কার জানানো উচিত, কিন্তু অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে সে নতজানু হ'য়ে প্রণাম করল।

—তোমার শ্বশুর সুমিতি। অনসূয়া বললেন।

কি বলা উচিৎ এই ভাবতে চোখ তুলে সুমিতি সান্ন্যালমশাইএর মুখ দেখতে পেল। অতি সাধারণ একটা মানুষ, অথচ এ অঞ্চলে এতবড় একটা মানুষ নাকি কেউ নেই।

সান্ন্যালমশাই বললেন,—কল্যাণ হ'ক। তারপর একটু যেন দ্রুতপদে তিনি চলে গেলেন। সুমিতির মনে হ'ল সান্ন্যালমশাইএর চোখ দুটি টল্‌টল্ করছে।

দ্বিপ্রহরের আহারের ব্যাপারটা সেদিন সহজ হ'ল না। ডালিমফুলী বেনারসি শাড়ী, ওড়না, সদ্য কেনা ঝক্‌ঝকে অলঙ্কারে সজ্জিত হ'য়ে বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত আত্মীয় ও জ্ঞাতিদের আহারের সম্মুখে দাঁড়াতে হ'ল তাকে একবার।

খেতে খেতে কে একজন বলল,—দাদা, আপনি যে এত চাপা তা আমি জানতাম না। বড়ছেলের বিয়ে, দশ গাঁয়ের লোক জানবে; জানাজানি হবার আগেও কানাকানি চলবে; তা নয়—

সদানন্দ সান্ন্যালমশাইএর হ'য়ে উত্তর দিল,—চারদিকে অশান্তি, প্রজাদের ঘরে হা-অন্ন, এখন কি হৈহুল্লোড়ের বিবাহ ভালো হয়।

প্রথম লোকটি হাসতে হাসতে বলল,—মাষ্টারমশাই নিজে যেমন, ঠিক তেমনি মানানসই কথাই বলেছেন। তিনি যে গ্রামে আছেন, এ খোঁজ নিয়েও জানা যায় না বটে।

কয়েকজন মোসাহেবির ভঙ্গিতে হেসে উঠল।

সান্ন্যালমশাই বললেন,—মিহির তুমি সদানন্দর কথায় হাসছ, কিন্তু আসল ব্যাপারটি সে গোপন ক'রে যাচ্ছে, তা ধরতে পার নি।

—না, না, গোপন করব কেন?

—জেলখাটা যাদের উপজীব্য, লোকালয়ে আত্মপ্রকাশ করা যাদের চলে না, তাদের প্রকাশ্যে বিবাহ করারও মুখ নেই, একথাটাই সদানন্দ গোপন করছে।

দু'একজন হাসল।

মিহির বলল,—মাষ্টার যে আমাদের শুদ্ধ জেলে পাঠান নি, এটাই আশ্চর্য্য।

ঘরে ফিরে স্থমিতি, শাড়ী, ওড়না, অলঙ্কার খুলে ফেলতে ফেলতে ভাবল এদের আলাপ ও পরিহাসগুলির কথা। শাড়ীর রং ও অলঙ্কারের গঠনের কথা গণনীয় নয়। অন্যের রুচিমতো সাজসজ্জা করা জ্ঞান হবার পরে তার এই প্রথম। তা হোক, একটা অভিনয় ব'লে সেটাকে মেনে নেয়া যায়। এদের হাসি ও লঘু আলাপের পেছনে একটি প্রয়াস ছিল, সেটা অতিসহজেই চোখে ধরা পড়ে। একজনকে মাঝে মাঝে নিজের মতামত প্রকাশ করার জন্য জেলে যেতে হয়, সে জন্যই যে তাকে বিবাহ ব্যাপারটা গোপনে সমাধা করতে হবে, এটা নিশ্চয়ই এরা বিশ্বাস করেন না।

কিন্তু চিন্তা করতে অবসর আজ এরা দেবে না। কয়েকটি প্রায় তার সমবয়সী স্ত্রী এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। বেশভূষা ও আকৃতিতে আর্থিক দীনতা আছে তাদের, কিন্তু স্থমিতি বিস্ময়ের সাথে অনুভব করল তাদের এই কোলাহলে কিছুমাত্র অভিনয় নেই। বিশেষ ক'রে একটি মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার মনে ছাপ রাখল। তার বেশভূষা সব চাইতে কম সোচ্চার, কিন্তু তার বড় বড় চোখ দুটির ক্ষমতা সম্বন্ধে যে সে সম্পূর্ণ সজ্ঞান তার পরিচয় তার চোখের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজলের রেখায়। স্থমিতি কিছুক্ষণের মধ্যে পরিচয় পেল মেয়েটি সম্বন্ধে তার ননদ।

মেয়েরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, স্থমিতির এই ননদ বললে,—এদিকে জেঠামশাইএর ঘর, জোরে হাসাহাসি করলে ওঁর কানে যাবে। বৌকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চল। স্থমিতির ননদ পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল, আর অন্যান্যদের মাঝখানে স্থমিতিকে যেতে হ'ল, অন্দর মহলের দক্ষিণসীমায় দক্ষিণী একটা ঘরে।

স্থমিতির ননদের নাম একটু অদ্ভুত—মনসা। অবশ্য তাতে খুব ক্ষতি হয়নি। তার স্বামী তাকে মণি, মণিমালা ইত্যাদি বলে থাকেন। এ সব এক মুহূর্ত্তে জানতে পারল স্থমিতি। কথাগুলি ব'লেই মনসা বললে,—হ্যাঁ বৌ, তোমাকে দাদা কি বলেন?

স্থমিতি সুন্দর একটি উত্তর ভেবে নেয়ার আগেই মনসা হেসে বলল,—হ্যাঁ গো দাদার সাথে তোমার কোনদিন সত্যি দেখা হ'য়েছিল তো? তুমি তাঁর বৌ তো, নাকি ঠকাতে এসেছ?

স্থমিতির মুখে একটা ছায়া পড়ছিল, সে হেসে, হোক একটা চেষ্টা ক'রে, বললে,—মণিদিদি, তোমার জিভে বিষ আছে। কিন্তু এতটুকুতে আমার হবে না, তোমাকে আমি শীগগীর শ্বশুর-বাড়ীতে ফিরতে দিচ্ছি না।

মনসা তার চোখদুটি ব্যবহার করল।

স্থমিতির মনে হ'ল কথাটা সে শুনতে ভালো শোনাবে ব'লেই বলে নি, সমস্ত মন দিয়েই বলেছে। মণি ভালোবাসার মতো।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। স্থমিতির ঘরে সোফাটায় শুয়ে গল্প করতে করতে মনসা রৌদ্রের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। স্থমিতি মনসার চিৎ হ'য়ে নিঃসঙ্কোচ শোবার ভঙ্গিটি লক্ষ্য করল। তারপর সে লক্ষ্য করল অনসূয়া ক্লান্ত শ্লথ পায়ে ছাদটা পার হয়ে নিজের ব'সবার ঘরে দিকে যাচ্ছেন। স্থমিতি শুনতে পেল মাটি-উঠোনের বাঁধান চত্বর থেকে যে থামগুলি দোতালার ছাদ পর্য্যন্ত উঠেছে, তারই একটার কার্নিশে বসে একজোড়া ঘুঘু ডাকছে। অনসূয়া কার সাথে নিচু গলায় কথা বলছেন। মাঝে মাঝে রান্না-মহলের চত্বর থেকে ক্ষীণ একটা কোলাহল কানে আসছে।

মনসার সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করতে পেরেছে স্থমিতি। মনসা সরাসরি প্রশ্ন করেছিল,—বিবাহটা কি গন্ধর্বমতে হ'য়েছে, ভাই, বৌদি। স্থমিতি একটু চিন্তা ক'রে, একটু সময় নিয়ে বলেছিল,—না ইংরেজি মতে। মনসা উত্তরটায় হাসির কি পেলে, কে জানে। হাসতে হাসতে সহসা গম্ভীর হ'য়ে সে বিষ ঢালল। বলল,—ভাই বৌদি, যে ইংরেজের সাথে আমার দাদার আকৈশোর বিবাদ নিজের জীবনে সেই ইংরেজ আদর্শ ছায়া ফেলল। তার এ হার স্বীকারের জন্য কি তুমি দায়ী, তোমার চোখ জোড়া?

স্থমিতি নিজের দৃষ্টি আনত ক'রে দেখল মনসার চোখ দুটিতে টল্ টল্ করছে আশ্বাস। সে বললে,—গন্ধর্বমতে হ'লে কি আমাকে গ্রহণ করতে।

—আমাদের গ্রহণ করার মূল্য কি তা আমি নিজে জানি না; নিশ্চয় আছে, নতুবা জ্যেঠাইমা তার জন্যে এত আয়োজন করতেন না। তবু তোমাদের কাছে যতটা সাহস আমরা আশা করি, এ ব্যাপারে তার পরিচয় নেই। অবশ্য এও নবগন্ধর্বমত, শুধু বয়স্য কিম্বা বনস্পতিকে সাক্ষী না রেখে সরকারের দু'একজন কর্মচারীকে সাক্ষী রেখেছ। কিন্তু সাক্ষীর কি প্রয়োজন হ'ল?

স্থমিতি আবার চিন্তা করল। এখানে আসবার প্রস্তাবটা তার নিজের। কারো সাথে সে আলোচনা করে নি, কিন্তু অন্তরঙ্গ যারা তাদের সকলেই যে এই প্রস্তাবে সমস্বরে না না ক'রে উঠত তাতে সন্দেহ নেই। এমন কি এই বাড়ীর বড়ছেলেকে একদিন প্রস্তাব করায় সে বলেছিল,—সম্মানের যদি হানি হয়।

সুমিতি বললে,—মনি, সাক্ষ্য থাকা না-থাকায় আমার নিজের কিছু এসে যায় না। তোমার দাদার হাতে কেউ আমাকে সম্প্রদান করল কি না তারও খুব বড় দাম নেই, কারণ এ ঘরের অনেক আগে আমরা উভয়ের কাছে সম্প্রদত্ত। কিন্তু গন্ধর্বমতকে আমরা গ্রহণ করি নি, বা ঐ জাতীয় অন্য কিছু কারণ—

সুমিতির গাল দুটি লাল হ'ল, মনসা তার কথার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেছে, সুমিতি বললে,—কারণ বিয়ে শুধু দু'জনে শেষ হবে আমি মনে করি নি। সন্তানদের সামাজিক স্বীকৃতির মূল্য আমার জীবনের চাইতেও বড়।

মনসা উঠে এসে সুমিতির পাশে বসে তার একখানি হাত নিজের হাতে নিল কিন্তু এই ভঙ্গির বিপরীত সুরে কথা বললে,—তুমি তো তা হ'লে আমাদের মতোই সাবধান। প্রেমের জন্য সব কিছু দিতে বসেও হিসাবের নাড়িতে টান লাগছে তোমার। হো হো করে হেসে বলল মনসা,—দেন-মোহর ব্যবস্থা করনিতো। পরিত্যাগ করলেও পথে না-বসার ব্যবস্থা করে রেখেছ নিশ্চয়।

—কিন্তু, মনসা গভীর সুরে বলল, আমার আর একটা ধারণা পরিচ্ছন্ন হ'ল আজ। বহুদিন ধারণা ছিল তোমরা যারা ভালোবাস তারা বিদ্রোহী, আমাদের মতো বিধি-নিষেধকে মূল্য দিচ্ছ না। এখন মনে হ'চ্ছে প্রেমের সে বিদ্রোহ রংদার রাংতা।

কিন্তু তা হলেও সুমিতি নিজের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে স্বেচ্ছায় এসেছে, একথা কেউ কি বিশ্বাস করবে। নিজের বাড়ীতে সুমিতি প্রমীলার মতো স্বাধীনা। তার এই যেচে আসা এবং এদের এই গ্রহণ করবার পদ্ধতি সুমিতির চরিত্রে খড় ও বাঁশ ছাড়া আর কিছু কি অবশিষ্ট রাখল। তার সাথে বিপন্ন আর একটা আশ্রয় কামীর কি পার্থক্য রইল। সুমিতি অন্তর্বত্নী একথা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কি লোকে বলবে না বেকায়দায় পড়ে এসেছে সে? এদের চোখে মন্ত্রপড়া বিবাহ ছাড়া আর সব বিবাহ-ই কি অসংযমের গ্লানি মাত্র নয়। বিবাহের যে কোন প্রথাই একটি সামাজিক স্বীকৃতি মাত্র। সেই স্বীকৃতি যদি না থাকে কি মূল্য রইল প্রথার, কি প্রভেদ রইল এই বিবাহের প্রথাহীন মিলনের সাথে।

(তখন কেউ সুমিতিকে দেখলে ভাবত রৌদ্রের ভয়ঙ্কর উত্তাপে মেয়েটির অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে।)

মনসা ঘুমিয়ে পড়েছে, সুমিতি ভাবল,—আর যাই হ'ক নিজের চরিত্র কি সেটা প্রকাশ করার জন্যে সে এখানে আসে নি, যেমন আসে নি এদের প্রথাগুলিতে আঘাত করে নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে। যদি কেউ বলে সে আশ্রয় চায়? উত্তরে সুমিতি হাসল মনে মনে।

অনসূয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে ঘরে এলেন। প্রায় বিশ বছর বাদে তিনি আজ কোমরে কাপড় বেঁধে রান্নার মহলে নেমেছিলেন। বিবাহের পরে এমনি আর একটি ঘটনা ঘটেছিল, সেটা তাঁর দিদি শাশুড়ীর শ্রাদ্ধের সময়ে। তবু সেদিন ছিল একটি সুপরিকল্পিত কার্যক্রম। ব্যাপারটির মর্য্যাদা রক্ষা করাই ছিল তাঁর দায়িত্ব। কিন্তু আজ সকালে যখন আলাদীনের মতো ইচ্ছা কিন্তু তার প্রদীপ না নিয়েই মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়ালেন তখন হুকুম, নির্দেশ দেবার অবসর ছিল না। মুখ রক্ষা করতে হবে এই দৃঢ় সংকল্প ছিল।

এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ ছিল সান্ন্যালমশাইকে খবরটা দেয়া, কাল বিকেল, সন্ধ্যা ও রাত্রিতে যা একান্ত অসম্ভব ব'লে বোধ হ'য়েছে, এখন দু'পাঁচ মিনিটে সেই খবরটা দিতে হবে, এবং খবর দেয়াই শেষ নয়, তাকে অভিমান করার অবসর দেয়া যাবে না, বরং সহায়তার জন্য ডাকতে হবে।

সান্ন্যালমশাই তখন শয্যা ত্যাগ করেন নি। অনসূয়া বিছানার একপাশে ব'সে ব'লেছিলেন,—একটা বউভাতের ব্যবস্থা ক'রে দিতে হয়।

—বউভাত কার? এখনও এ রাজ্যে বউভাত হ'চ্ছে নাকি?

—খোকার।

—খোকার? মানে তোমার বড়ছেলের?

অনসূয়ার ঠোঁট দুটি এই জায়গাটায় কাঁপছিল। সান্ন্যালমশাই লক্ষ্য করলেন সেটা।

তিনি বলেছিলেন,—তোমার বড়ছেলে বিয়ে করেছে? সুমিতি কি সেই বউ? তবে তো বউভাত করতেই হবে।

সর্বাঙ্গ সুন্দর না হ'লেও একটি হাসি আনতে পারলেন সান্ন্যালমশাই, বললেন হাসতে হাসতে,—বেটা এতেও বিপ্লব আনল।

অনসূয়া উঠে দাঁড়ালেন, দ্বিতীয়বার কথা বলার আগে পেছন ফিরে হাতের তেলোয় চোখ দুটি মুছে নিলেন, বললেন,—বস্ত্র, আভরণ—

—নিশ্চয়, সদানন্দ এখনও ঘোড়ায় চড়তে পারে কি না খোঁজ করি।

সান্ন্যালমশাইএর মুখাবয়ব রক্তহীন, যেন একটি মুখোসের আড়ালে ঢাকা রইল সব সময়ে।

কাজকর্ম মিটিয়ে অনসূয়া ঘরে এসে মনে মনে অনুসন্ধান ক'রে জানতে পারলেন, বড়ছেলের একটি নোতুন-তোলা ফটো নেই ঘরে। প্রায় একবৎসর পূর্বে শেষবার তাঁকে তিনি দেখেছেন। মাঝে মাঝে ভাইদের চিঠিতে তার খবর পান। কিন্তু আজ যেমন ক'রে তার চিত্রের অভাব বোধ করলেন এমন অনেকদিন হয় নি।

পদশব্দে চোখ তুলে তাঁর নিজস্ব দাসীকে দেখতে পেলেন অনসূয়া।

—এই সরবৎটুকু পাঠিয়ে দিলেন, বুড়ীদিদি।

—আহা, তাঁর খাওয়া হ'য়েছে তো?—সব উল্টো পাল্টা ব্যাপার হ'ল আজ। তোমরা খেয়েছ?

—আমরা এবার বসব, কিন্তু আপনি এটুকু নিন।

—বড্ড খাটলে আজ তোমরা।

—বুড়ীদিদি বলছিলেন,—বাড়ীতে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার হ'য়েছে, কিন্তু পাঁচ ঘণ্টায় এমন বউভাত সাজাতে আর কেউ সাহস করে নি।

দাসী চলে গেল।

দাসপাড়া, সেনপাড়ার লোকরা হু'কার দিয়ে অন্দরের উঠোনে প্রবেশ করছে, খবর পাওয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

ভারত-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ

ইন্দ্রজিত্‌

পূর্ব্বানুস্মৃতি

এর পরবর্ত্তী সময়ে ধর্মের স্রোত চলতে লাগল বটে কিন্তু সে ধর্মে সার্ব্বজনীন আবেদন ছিলনা। ভারতভূমির পনের শতকের সর্ব্ব-ধর্ম-সমন্বয়বাদের নেতারা একে একে চোখের অন্তরালে চলে যাওয়ায়, পরবর্ত্তী যুগাচার্য্যরা জপে বসলেন প্রশ্ন এড়াবার জন্যে। নতুন যুগের নতুন মানুষ কত প্রত্যাশা নিয়ে যেত যুগাচার্য্যদের কাছে, আর ফিরে আসত হতাশা নিয়ে। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য জনসেবার কাজ ছেড়ে ঠাকুর সেবায় কাজ করবার জন্যে চলে গেল ঠাকুর ঘরের ভেতর ক্রমে ক্রমে। আবার কোন কোন লোক, যাঁরা যোগীর মতন জীবন যাপন করতেন, তাঁরা ধীরে ধীরে ভোগীতে পরিণত হোতে লাগলেন। দিন আর রাত্তিরের বুকে তুলসীর মালা ঘুরতে লাগল শত শত বার কিন্তু জ্ঞান বা কোন রকম বুদ্ধির বিকাশের পরিচয় পেলনা নতুন যুগের নতুন লোক তাৎকালীক বৈষ্ণব আচার্য্যদের কাছে। চৈতন্যের রাধাকৃষ্ণের সমন্বয়-মূর্ত্তি নারী আর পুরুষে পৃথক হোয়ে কণ্ঠি-বদল আরম্ভ করলো বাংলাদেশে। পাঞ্জাবের নানক-পন্থী শিখেরা রোজ রোজ তাদের গ্রন্থ সাহেবের ধুলো ঝাড়তে লাগলেন, উত্তর ভারতের কবীর কবরস্থ প্রায়। শুক্র গেলেন তুলা রাশিতে। ভারতের ভাগ্যাকাশে ঘনান্ধকারের ঠিক পূর্ব্বেকার যুগব্যাপী সন্ধ্যা নাম্‌ল।

পূর্ণিমার আলো দিনে দিনে ক্ষয়ে যেতে লাগল, আবার দেখা দিল অমাবস্যার অন্ধকার। আলোর পরে কালো। এই অন্ধকারের আড়ালে দেখা দিল আত্ম কেন্দ্রিকতার যুগ, দেখা দিল শাক্ত শাস্ত্রের নামে শক্তির অপব্যবহার।

অজানিত কাল[১] থেকে মানুষের সভ্যতায় শক্তি সাধনার ধারা চলে আসছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে নতুন আলোর ঝলকানি লেগে সে সাধনার সাধকরা নিশাচরের গহনে গিয়ে সাধনা করছিলেন, বুদ্ধদেব এ সাধনাকে নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে জন-কল্যাণে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তা তিনি পুরোপুরি ভাবে পারেন নি। কারণ, দেখা গেল এ সাধনা জনের জন্যেও নয়, আবার জনকল্যাণের জন্যও নয়।[২]

যেটা চলতে থাকে, সেটা চলার পথে নিত্য নতুন আলো আবিষ্কার করে নিজেকে পরিপূর্ণ করবার অভিপ্রায়ে, তাই শাক্তবাদ তার একনিষ্ঠার জন্যে যুগে যুগে নিত্য নতুন পথ আবিষ্কার করেছে। এ পথে স্বর্গ ছিল কিনা সেটা অজানিত জনসাধারণের কাছে কিন্তু আত্মোৎসর্গ ছিল।

যুগের নৈরাশ্যের সময় সমাজের বুকে যে ঘনান্ধকার আসে সেই চির পুরাতনী ঘন-তমসার বর্মে নিজেকে আবৃত করে কালী তাঁর মতবিরোধীদের মুণ্ডমালা পরতেন যুগে যুগে। তাঁর সেবকরা রক্ত-

(১) কালটি এখন জানিত। পেরু-মেক্সিকোর রেড-ইণ্ডিয়ানের প্রাক্কালে মায়া-সভ্যতার এই শক্তিতন্ত্রের বীজ নিহিত। সিন্ধুনগরে ঐতিহাসিকরা পেরু-মেক্সিকো সভ্যতার ছোঁওয়া পেয়েছেন। সম্পাদক।

(২) এ বিষয়ে মতবিরোধ আছে। সম্পাদক।

জবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে রক্তলাল রং করতেন কালীর চরণ। লাল জবা ভক্ত হৃদয়ের প্রতীক হোয়ে চুপে চুপে জনান্তরালে কালীর কাছে ক্ষমা চাইতো।

আবার পূর্ণিমার আলো চলে গেল। নিশাচর তান্ত্রিকরা অন্ধকারের ভেতর থেকে উঁকি মেরে দেখলেন তাঁদের চতুর্দ্দশী সমাগত, তাই নির্ভয়ে আরম্ভ করলেন তাদের সাধনা।

চৈতন্য ছিলেন রূপে চন্দ্র আর গুণে সূর্য্য, সেই সূর্য্যের তাপে ভারতভূমির মাটি শক্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই শক্ত মাটির বুকে লুকিয়ে ছিল শাক্তবীজ।

শতাব্দীর শুক্ল পক্ষ অস্ত হোল, ভারতভূমির ওপরে নামলো শোক বর্ষা, সে বর্ষায় ভারতের মাটি আবার হোল নরম আর সেই নরম মাটির বুকে সুযোগ বুঝে আবার শাক্তবীজ তার চারা গাছের ভেতর দিয়ে নতুন রূপে করল আত্মপ্রকাশ, নিলো পুনর্জন্ম। পুরোন বীজের নতুন সংস্করণ। তারপর চল্‌ল তাদের নিজেদের উপাসনা নিজেদের জন্যে। শুক্ল পক্ষের শবের উপর আরম্ভ হোল কৃষ্ণপক্ষের শব সাধনা।

শাক্তবাদের বা তন্ত্রশাস্ত্রের কোন কথা বলবার পূর্ব্বে আমাদের আবার প্রাদেশিক হোতে হবে। আবার ফিরে আসতে হবে বাংলায় কারণ বাংলা আর আসাম হোল অনেকের মতে শাক্তবাদের আদিপীঠ কিন্তু ষোল শতক থেকে অর্থাৎ মুসলমান শাসক যখন এদের বুকে প্রায় কায়েমী শাসকের আসনে বসেছে সেই সময় কিছু সামাজিক পরিবর্ত্তন আমরা লক্ষ্য করি।

ভারতবর্ষে তখন এমন কোন আদর্শ বা ধর্ম ছিল না যা সকলে গ্রহণ করতে পারে। তখন সমাজ ব্যবস্থা আর আদর্শ ছিল মুসলমান শাসকের হাতে আর ধর্ম ছিল প্রজা-সাধারণের মনে! এই আদর্শ আর ধর্মের ভেতরে কোন রকম মিলের পরিবর্ত্তে ছিল গরমিল, কাজেই সেই সময়কার জাতকরা ধর্ম এবং আদর্শ বলে পেলেন যে পদার্থ সে দুটোর কোনটাই তারা পুরোপুরি ভাবে পেলেন না।

চণ্ডীদাসের সহ-সাধিকা, চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে পরিণত হোয়েছিলেন সুখসঙ্গিনীতে। এক যুগের সৃষ্ট কোন কিছুর পরবর্ত্তী কালে রূপ বদলান কোন মতে আশ্চর্য্য নয়। বঙ্গদেশে বা তার পার্শ্ববর্ত্তী দেশ-সমূহে এক কালে গ্রামস্থ মহিলারা জীবন যাপন করতেন সচ্ছল গতিতে, জীবন কাটাতেন নির্ভয়ে। গৃহীর গৃহে ছিল ধান আর খাজনা দেবার এমন কোন বিশেষ তাগিদ জন সাধারণের ছিল না। কিন্তু মুসলমান সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করলো ভোগের পতাকা, এ ভোগ পরের জন্যে নয়, একেবারে নিজেদের জন্যে। শাসকের জীবনের মান রক্ষা করবার জন্যে ব্যস্ত হোয়ে উঠলো সাধারণরা, দেশের নিরক্ষর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমানদের হাত করলেন মুসলমান শাসক।

লোক আর স্ত্রীলোক, সকলের জীবন থেকে বিদায় নিলো জীবনের সচ্ছল গতি। বেদপূর্ব্ব যুগ থেকে স্ত্রীলোকরা বহু ব্রত করতেন আড়ম্বর সহকারে এবং বেদজ্ঞরাও এ সমস্ত আনুষ্ঠানিক ব্রতগুলোকে একেবারে বন্ধ করে দিতে পারেন নি কারণ স্ত্রীলোকের সংস্কার বড় ভীষণ জিনিষ, হাত ভুলে গেলেও মন এ সমস্ত কাজ করতে ভুলবে না, একথা ভাল করেই জানতেন আর্য্যরা। সেই কারণে স্ত্রী-আচারকে তাঁরা সরিয়ে রাখলেও মেরে ফেলতে পারেন নি। এবং পরবর্ত্তীকালে স্ত্রী-আচার লোকাচারগুলো বেদের সঙ্গে রেষারেষি করে বেঁচে থাকেনি, থেকেছিল ঘেঁষাঘেঁষি করে বেঁচে।

কিন্তু বহু পরবর্ত্তী ষোল শতকের শাসকরা যখন নারী সৌন্দর্য্য ভোগ করবার একটি গোপন

অনুসন্ধানী বিভাগ খুললেন, তখন থেকে দেশীয় স্ত্রীলোকদের ভেতরে যে আত্মগোপনের জোয়ার এল সে কথা জানেন ইতিহাস নিজে।

যারা নিজেদের ব্রতের অঙ্গনে বহু রকম আলপনা এঁকে বা সূর্য্যের মণ্ডলাকৃতি এঁকে সারিবদ্ধাবস্থায় ব্রত-নৃত্য করে আস্‌ছিল আনন্দমুখর চিত্তে, তারা আঙ্গিনা থেকে উৎসবের প্রাণ ঘরের ভেতর নিজেকে আবদ্ধ করলো আর ব্রতগুলো আনন্দমুখর রূপ ত্যাগ করে পরিণত হোল মাত্র আনুষ্ঠানিক ধর্মে।

সুন্দর নারী অবগুণ্ঠনাবৃত হোলেন শুধু লজ্জায় নয়, ষোল শতকের ভয়ে।

ষোল শতকের বাংলার বুকে একটি অশাস্ত্রীয় আন্দোলন আরম্ভ হোল। সেটা হোল ধর্ম পূজার প্রচলন। এই ধর্ম পূজাকে একদিক থেকে বৌদ্ধ পূজার আধুনিক বাংলা সংস্করণ বল্‌লে কিছুমাত্র অন্যায় হবে বলে আমি মনে করি না।

নিপীড়িতেরা ষোল শতকের শাসকের নাগপাশ থেকে মুক্তি চাইলো ভারতভূমির প্রথম সমন্বয়-বাদী মহাপুরুষ কপিলাবস্তুর কাছে। যাঁরা এই নতুন অভিযান আরম্ভ করেছিল তাঁদের ইচ্ছে ছিল যে শাসকের হাত থেকে মুক্ত হতে হোলে, শাস্ত্রীয় স্ত্রীলোক আর সাধারণ লোককে সমন্বিত করতে হবে। তাই ধর্ম মঙ্গল গান। বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় সুমধুর স্বরে গান গেয়ে বেড়াতে লাগলেন এ ধর্মের চারণ কবিরা। ষোল শতকের বাংলার শাসকরা বাঙ্গালীর জীবনে প্রকাশ পেলেন, আর নিপীড়িতের ধর্ম পূজার ভিতরেও সেই সুযোগে প্রবেশ করলেন তারা। ধর্ম পূজার শূন্য পুরাণে এ কাহিনীর স্পষ্ট প্রমাণ আছে।

জাজপুর পুরবাসী যোলশত ঘর বাস
বসিল কেবল যে দুর্জ্জন
দক্ষিণা মাগিতে যায় যার ঘরে নাহি পায়
শাপ দিয়া পুড়ায় ভুবন
মা ল দ হে না চিনে আপন পর
জানের মালিক দিশপাশ
বলিষ্ট হইল বড় দশ বিশ হইয়া জড়
সদ্ধর্ম্মীরে করয়ে বিনাশ
বেদ করে উচ্চারণ বাহিরায় অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সভাই কম্পমান
মনেতে পাইয়া মর্ম সভে বলে রাখ ধর্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্রাণ
এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহরণ
ই বড় হইল অবিচার
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম মনেতে পাইয়া মর্ম
মায়াতে হইল অন্ধকার
ধর্ম হইলা যবন রূপী মাথায় ত কালো টুপী
হাতে শোভে ত্রিকচ্ কামান

চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলয়ে দম্বদার
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা এক মন
আনন্দে পরিল ইজার
ব্রহ্মা হৈল মহাঁমদ বিষ্ণু হৈল পেগাম্বর
আদ্‌মফ হইল শূলপাণি
গণেশ হইল গাজী কার্ত্তিক হইল কাজী
ফকির হইল যত মুনী
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা শেখ
পুরন্দর হইল মলনা
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মিলি বাজায় বাজনা
আপনি চণ্ডিকা দেবী তিঁহ হৈলা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হৈল বিবি নুর[৩]
জতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে এক মন
প্রবেশ করিল জাজপুর
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কড়্যা কিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল
ধরিয়া ধর্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিষম গণ্ডোগোল

পশ্চিম বঙ্গে ধর্ম পূজার আড়ম্বরে আরম্ভ আর আড়ম্বরে শেষ হোল কিন্তু বাঙ্গালী সমাজের অন্দর মহলে মুসলমান প্রভাব তার স্বরূপ নিয়ে কায়েমী আসন অধিকার করে রাখতে পারল না। তবে এও বলা যেতে পারে যে যদিও মুসলমান সংস্কৃতি তার স্বরূপ নিয়ে বাঙলা সমাজের অন্দর মহলে কায়েমী আসন অধিকার করে রাখতে পারল না তথাপি পূজা মণ্ডপে বাংলার নিপীড়িত জাতি যারা, ষোল শতকের রক্তচক্ষুর ভয়ে অথবা শাস্ত্র বিশ্বাসীদের দ্বারা আর অপাংক্তেয় না থাকবার ইচ্ছায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নিল বাঙ্গালী সংস্কৃতির সঙ্গে। ষোল শতক যদি এমন কোন কাজ করে থাকে যে কাজের জন্যে স্মরণীয় হয়ে থাকা উচিৎ ইতিহাসের চোখে, তাহলে বলব যে বাংলার প্রাদেশিক সংস্কৃতি, যেটার মূল মন্ত্র অনেক ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় হোলেও বহিরাবরণ লৌকিক সংস্কৃতির দ্বারা আবৃত, তার সঙ্গে নিপীড়িত বাংলার সাধারণ নতুন মুসলমানদের একটা সন্ধি ঘটিয়ে দিয়েছিল। এটাই পরে এমন ঘনিষ্ঠ হোয়েছিল যে বড় ছোটর তারতম্য এই উভয় জাতির কারুর মনে বড় করে দেখা দিত না। (ক্রমশঃ)

(৩) এ-প্রসঙ্গে কলিঙ্গের রাণীনুর গুম্ফার চিত্রাবলী খানিকটা আলোক-সম্পাৎ করে। নান্নুর-বাসিনী পদ্মা-ও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাছাড়া ঋক্‌বেদোক্ত 'বনূঁর' (শত্রু) কথাটিও স্মর্ত্তব্য। ইনি সিন্ধুনগরের সিল-মোহরে ছিলেন। সম্পাদক।

একটি কবরের খবর

শংকর চট্টোপাধ্যায়

রোজ বিকেল হলেই সহরের এই নির্জ্জন জায়গাটায় এসে বসি। দেখি বিকেলের পড়ন্ত আলোয় সামনের রূপসা নদীটার মেঘ-রঙা ঢেউগুলো ফণা তুলে দাঁড়ায় আর তাদের মাথার উপর শেষ সূর্য্যের আলো ঝিকৃমিক্ করে ওঠে। তারপর জলে সূর্য্য-রক্ত জমে জমে ক্রমশঃ কালো হয়ে আসে, তখন আর কিছুই দেখা যায় না। বনঝোপ থেকে ঝিঁঝিঁদের উন্মত্ত কণ্ঠ শুধু শোনা যায়। জ্যোস্নার আঙুল একে একে তারাদের ঝাড়লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে যায় আকাশে। অনেকটা সময় পর, রাত যখন ঝিম্‌ঝিম্ হতে হতে পশ্চিম আকাশে গিয়ে ভর করে, আর আকাশের সবকটা নক্ষত্রের লণ্ঠন যখন জ্বলতে জ্বলতে স্থির জ্যোতি হয়, তখন, ঠিক তখনই অনেকগুলো সিগেরেট ছাই করে দিয়ে আমি উঠে দাঁড়াই রোজ। হেঁটে হেঁটে ফিরে আসি নিজের বাংলোয়। এই নির্ব্বান্ধব সহরে এ ছাড়া কি বা করতে পারি আমি? আর মানুষের জটলা থেকে এই পোড়ো ধ্বংসস্তূপের উপর বসে এই সব দেখতে আমার ভালোই লাগে।

আমার মত আরেক জনকেও আসতে দেখি এখানে রোজ। ছোট্ট একটা বাচ্চার হাত ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে তিনি এখানে আসেন। এসে বসে থাকেন সেই সন্ধ্যা অবধি, আকাশে প্রথম তারাটি জ্বলবার আগ পর্য্যন্ত। স্থির চোখে সেই তারাটির দিকে তাকিয়ে থাকেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বাচ্চা ছেলেটি যখন বলে ওঠে: দাদু রাত হ'ল বাড়ী যাবে না?

ঠিক তখনই বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ান। হেঁটে হেঁটে আবার ফিরে যান রাস্তায়। আবছা অন্ধকারেও তার চলবার ভঙ্গীটা কেমন যেন অবসন্ন দেখায় এবার। অবসন্ন আর ক্লান্ত, একটু যেন নুয়ে নুয়ে হাঁটতে থাকেন তিনি।

রোজই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। রোজই বৃদ্ধকে নাতিটি সেই একই প্রশ্ন করে: আচ্ছা দাদু রোজ তুমি এখানে এস কেন। দাদুও সেই একই উত্তর দেন।

—দেখনা এ জায়গাটা কেমন সুন্দর নিরিবিলি।

কিন্তু নাতির উত্তরটা পছন্দ হয় না। মাথার ঝাকড়া ঝাকড়া চুল ঝাঁকিয়ে বলে,—না মিথ্যে কথা বলছ তুমি, এখানে কি যেন দেখতে এস দাদু।

এবার বৃদ্ধের উত্তর দিতে একটু দেরী হয়। অনেকক্ষণ থেমে আস্তে আস্তে তাকে বলতে শোনা যায়: এখানে কি আর দেখব দাদু। এখানকার সবই ত আমার দেখা।

ওই একই প্রশ্ন আর তার একই উত্তর শুনতে শুনতে আমার কান অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আমি চোখ বুজে এখন বলে দিতে পারি ঠিক কোন শব্দের শেষে এসে খোকার দাদু একটু দাঁড়ান, কোথায় গিয়ে তার গলার স্বরটা একটু অস্পষ্ট হয়ে আসে, একটু যেন কাঁপতে থাকে।

সেদিন কিন্তু আমাকে অবাক হতে হ'ল। একই প্রশ্নের একই উত্তর দিতে দিতে হঠাৎ কি যেন

একটা ঘটে গেল বৃদ্ধের মনে। বাচ্চা নাতি যখন সেই পুরোন প্রশ্নটা সেদিন আবার ছুঁড়ে দিল সেই বৃদ্ধ ভদ্র লোকের দিকে: এখানে কি যেন দেখতে এস দাদু।

তখন, সেদিন তখনই বৃদ্ধকে বলতে শুনলাম

—কি আর দেখব বল। ঐ কবরটা ছাড়া কি আর এখানে দেখবার আছে আমার। কথাটা শেষ করেই থেমে গেলেন বৃদ্ধ। তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা ভারী দীর্ঘ, দীর্ঘনিঃশ্বাস যেন পড়তে শুনলাম বাতাসে।

চম্‌ক লাগল আমার। বৃদ্ধ সম্বন্ধে এতদিনের ধারণাটা হঠাৎ এক পলকে যেন বদলে গেল আমার। অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকালাম। দেখলাম আকাশের সেই প্রথম তারাটির দিকে চোখ রেখে বসে আছেন তিনি। স্থির আর নিস্পন্দ তার দৃষ্টি, বুঝতে এতটুকু দেরী হ'ল না আমার।

পরদিন বিকেলে একটু তারাতারিই এলাম সেই পুরোন জায়গাটায়। সতর্ক চোখে খুঁজলাম কোন কবরের ভগ্নাবশেষকে। বেশীদূর এগুতে হ'ল না। বৃদ্ধ যেখানে রোজ এসে বসেন তারই খানিকটা দূরে ঘাসে ঢাকা, প্রায় সবটুকু তার মুছে আসা একটা কবরের জীর্ণ ভগ্নাংশ চোখে পড়ল আমার। আর সেই সঙ্গে একটা কাহিনীকেও যেন দেখতে পেলাম আমার চোখের সামনে। হয়ত এমনিই করেই কাহিনীটার সুরু হয়েছিল কোনদিন:

কিবা এমন বয়স হবে তখন তপনের! সবে আটের চৌকাঠ পেড়িয়ে নয়ের চৌকাঠে পা রেখেছে। কিন্তু এর মধ্যেই বার তিনেক মাথা ফেটেছে তার, দুহুবার গাছ থেকে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙ্গেছে, একটুর জন্য ডান চোখটা জখম হয়ে গিয়েও হয়নি। আর শেষবার যখন রূপসা নদীতে ডুবতে ডুবতে বেঁচে এলো সে, তখন বিনোদবাবু অতিষ্ঠ হয়ে ভর্ত্তি করে দিয়ে এলেন পাদ্রীদের ছোট স্কুলটায়। দুপুরটায় অন্তত লোকের চোখে চোখে থাকবে সে। আর স্কুলে গিয়ে তপনের মত অনেক দুষ্ট ছেলেও ত শুধরে গেছে। এই ভরসায়ই তপনকে পাদ্রীদের স্কুলে দিলেন তিনি।

বাবার সঙ্গে গাড়ীতে করে ভর্তি হতে গেল তপন স্কুলে। ঝক্ ঝকে ছবির মত স্কুল বাড়ীটা দেখে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে রইল সে, কিন্তু যে মুহূর্তে তপনকে স্কুলে রেখে কোর্টে ফিরে গেলেন বিনোদবাবু সেই মুহূর্ত থেকেই তার দুষ্টুমি সুরু হ'ল। পাশের বেঞ্চের বাচ্চা ডল পুতুলের মত ফুট ফুটে মেয়েটার পায়ে নীচু হয়ে একটা চিম্‌টি কেটে দিলে তপন। মেয়েটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। সমস্ত ক্লাসে একটা হৈ হৈ কাণ্ড সুরু হয়ে গেল। পাশের ঘরে বড়দের ক্লাস নিচ্ছিলেন মিসেস ডরোথি উইলমান্। পড়া থামিয়ে ছুটে এলেন তিনি। অপরাধীকে খুঁজে বের করতে তার বেশীক্ষণ দেরী হ'লনা। তপন তখন গম্ভীর মুখে বেঞ্চের উপর আঙ্গুল দিয়ে ছবি আঁকছে। বার বার চেষ্টা করছে একটা হরিণের মুখ আঁকতে, কিন্তু কিছুতেই হচ্ছে না।

মিসেস ডরোথি উইলমান্ আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন তপনের বেঞ্চের কাছে। তপন মিসেস উইলমান্‌কে দেখেও না দেখবার ভান করল। আরও নিবিষ্ট হয়ে ছবি আঁকায় মন দিল সে। অনেকক্ষণ স্থির হয়ে তপনের পিছনে দাঁড়িয়ে রইলেন মিসেস ডরোথি উইলমান্। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলেন

তপনকে। এক সময় আস্তে আস্তে তপনের ছোট্ট মাথাটার উপর হাত রাখলেন, ঝাকড়া ঝাকড়া চুলগুলোর মধ্যে আস্তে আস্তে আঙ্গুল দিয়ে বিলি কাটলেন, বল্লেন :

—অমন করে কি হরিণ আঁকে নাকি। স্পষ্ট বাংলায় হাসি ছড়িয়ে কথাটা বল্লেন তিনি মৃদুস্বরে।

এবার তপন চোখ তুল্লো কপালে। মিসেস উইলমানের চোখে কি যেন দেখল সে। পরদিন থেকেই ঝিমিয়ে পড়ল বুনো হরিণ তপন মিসেস ডরোথি উইলমানের চোখের মায়ায়।

আর মিসেস ডরোথি উইলমান্ যার স্বামী পিটার উইলমান্‌কে জার্মানরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছিল ট্রেঞ্চের মধ্যে, যার একমাত্র সন্তান এ্যালেন্ বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মরেছিল যার কোলে, তিনি বাচ্চা তপনের মধ্যে কি যেন দেখলেন। দেখলেন আর ভালোবাসলেন।

সেই থেকেই একটু একটু করে বদলাতে স্বরু করল তপন। তার সমস্ত দুষ্টুমি আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এলো। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন বিনোদবাবু। ডরোথি উইলমানের বাংলোয় গিয়ে একদিন সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে এলেন তিনি।

ডরোথি উইলমানের কাছে কাছে, তার নিজেরই ছায়ার মত যেন জড়িয়ে রইল তপন। ডরোথি উলইমানও। স্কুল-শেষ বিকেলে ডরোথি উইলমানের সঙ্গে বাংলোর বারান্দায় পাশাপাশি চেয়ারে যাদের দেখা যেত তাদের একজন হলেন ডরোথি আর অন্য জন তপন। ক্রশ-কাঁটায় নক্সা বুনতে বুনতে বিভিন্ন রূপকথা শোনাতেন তিনি তপনকে। স্থির নিশ্চল হয়ে বসে বসে শুনত তপন। এক একদিন তাদের সময়ের হিসেব পর্যন্ত থাকতনা। সন্ধ্যা হলে, রাস্তার আলো জ্বলে উঠলে লোক পাঠিয়ে তপনকে নিয়ে আসতেন বিনোদবাবু। প্রথম ডরোথি উইলমানকে ছেড়ে আসতে চাইত না সে। বাড়ীতে ফিরে কান্না জুড়ত। তপনের সেই কান্নার আওয়াজ যেন বুকের মধ্যে কান পেতে শুনতে পেতেন ডরোথি উইলমান। তখনি তিনি যেন তার চোখের চকচকে মণিদুটোর পিছনে একটা মুখকে দেখতে পেতেন। শীর্ণ পাণ্ডুর একটা মুখ, চোখের হলুদ মণিদুটো যার একটু নিস্প্রভ, হাল্কা সোনালী চুলগুলো যার সারাদিন বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়ে উড়ে ছড়িয়ে পড়ে সারা মুখে, যার ছোট্ট হাতের মুঠোয় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধরা ছিল ডরোথি উইলমানের একটা হাত, সেই ছোট্ট রোগে জীর্ণ এ্যালেনের মুখটাকে চোখের উপর যেন ভাসতে দেখতেন তিনি। আর সেই সঙ্গে তার সারা শরীর কাঁপিয়ে তার চোখের পাতা দুটোকে ভারী করে দিয়ে নামত একটা কান্নার স্রোত। তাই পরদিন তার চোখের ঝাপসা ঝাপসা মণিদুটোর পাশে পাশে দেখা যেত বিনিদ্রের চিহ্ন।

স্কুল যখন বন্ধ থাকত, যখন সারা দুপুরটা ধরে তপনের চেহারাটা নিজের চোখের সামনে দেখতে পেতেন না তিনি, তখন, সেই মুহূর্তগুলো ছট্‌ফট্ করে কাটত তার। বিকেলের রোদ আকাশে একটু হেলে পড়লেই, বেটে ছাতাটা হাতে দুলিয়ে ডরোথি উইলমান্ তপনদের বাড়ীর দিকে ছুটতেন।

সেবার শ্রাবণ মাসে ভীষণ জ্বরে পড়ল তপন। থার্মোমিটারের পারায় জ্বর উঠল পাঁচের ঘরে। ডরোথি উইলমানের তখন প্রায় উন্মাদের অবস্থা। উস্কখুস্ক চুল, দিনের বেশীর ভাগ সময় প্রায় তার তপনের বিছানার পাশে বসেই কেটে যায়। সন্ধ্যার পর নিজের বাংলোয় ফিরবার মুখে, অন্ধকার নির্জন গির্জার ফ্লোরের উপর তাকে হাঁটু ভেঙ্গে বসে থাকতে দেখা যেত রোজ, অনেক রাত্তির অবধি। চোখ

দুটো বন্ধ, হাত দুটো ক্রশের ভঙ্গীতে বুকের উপর রাখা, শুধু ঠোঁট দুটো বারবার কেঁপে কেঁপে অস্পষ্ট ভাষায় কি যেন বলত। এক এক সময় চোখের কোন দুটো বেয়ে হীরের রঙের কান্নার দুই একটা ফোঁটা স্বর্ণাভ গালের উপর দিয়ে নেমে আসত চিবুক অবধি, তারপর দুলতে থাকত হাওয়ায়। অলটারের উপর রাখা শীর্ণ গলদশ্রু মোমের আলোয় ডরোথি উইলমানের মূর্ত্তিটাকে তখন কেমন যেন অদ্ভুত দেখাত। অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য।

একদিন তারপর সেরে উঠল তপন। ডরোথির চোখে মুখে আবার ফিরে এলো সেই পুরোন ঝল্‌মলে আভা।

কিন্তু তবুও একদিন ডরোথি উইলমানকে ছাড়তে হ'ল তপনের মায়া। তপনের পরিবার কলকাতায় উঠে যাচ্ছে।

তপনের যাবার দিন ষ্টেশনে উঠিয়ে দিতে এলেন ডরোথি উইলমান্। ষ্টেশনের আলোয় তখন তার মুখের চেহারাটা স্থবির আর ঠাণ্ডা দেখাল। প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অনেকক্ষণ স্থির চোখে তিনি তাকিয়ে রইলেন তপনের মুখের দিকে। একসময় ষ্টেশনের শেষ ঘণ্টা বাজল। তপনের ছোট্ট হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় টেনে নিলেন তিনি। বল্লেন।

—গুডবাই তপন। আমি প্রার্থনা করি তুমি অনেক বড় হও। অনেক, অনেক বড়। কথা বলতে বলতে থামলেন তিনি। কি যেন ভাবলেন এক পলক তারপর আবার বলতে স্বরু করলেন।

—তুমি যখন বড় হয়ে ফিরে আসবে তখন হয়ত আমি থাকবনা, কিন্তু তখনও সন্ধ্যার আকাশের প্রথম তারাটি হয়ে আমি তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবো রোজ।

কথা বলতে বলতে কেমন যেন রুদ্ধ হয়ে এলো তার গলাটা। কান্নায় ঝাপসা শোনাল তার স্বর। বেশীক্ষণ তিনি আর সেখানে দাঁড়াতে পাড়লেন না, ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এলেন সেখান থেকে, আর তার প্রথমেই যে রিক্সাটা চোখে পড়ল সেটাতেই চেপে বসলেন তিনি।

—জলদি চালাও। কোন রকমে ওই দুটো কথাই বলতে পারলেন তিনি।

কলকাতায় এসে দিন কয়েক ভীষণ খারাপ লাগল তপনের। বিশেষ করে বিকেলের দিকটায়। মনে পড়তে লাগল ডরোথি উইলমানের কথা। তাই প্রায় প্রত্যেক শনিবার নিয়মিত একটি করে চিঠি ডাকবাক্সোয় ফেল্লো সে। ডরোথি উইলমানের উত্তর নিয়ে কোন পিয়ন তপনদের বাড়ীর কড়া নাড়ল না কোনদিন। একটি বারের জন্যও না।

একে একে স্কুলের ক্লাস ডিঙ্গিয়ে কলেজে ঢুকলো তপন, কলেজ শেষ ইউনিভার্সিটিতে। সেখান থেকে বেড়িয়ে ফিরে এলো আবার সে সেই সহরে। সহরের প্ল্যাটফর্মে ট্রেন থেকে নামতে গিয়েই আবার তার বহুদিন বাদে একটা মুখ মনে পড়ল। আবছা আবছা।

পরদিন ভোর বেলায় হাঁটতে হাঁটতে সে এসে দাঁড়াল পুরোন মিশনারী স্কুলটার কাছে। আর

সেই পুরোন পথটায় হাঁটতে হাঁটতে তার কেবলই মনে পড়তে লাগল ডরোথি উইলমানের কথা। কত অসংখ্য খুটিনাটি ঘটনা একে একে ভীড় করে এলো তপনের মনে।

স্কুল গেটে ঢুকবার মুখেই দেখা হয়ে গেল ফাদার গিবসনের সঙ্গে। তপনকে দেখে ফাদার থমকে দাঁড়ালেন। পিঠ ঝুঁকিয়ে অনেক্ষন ভালো করে দেখলেন তপনকে। এক সময় তারপর বলে উঠলেন।

—তোমার নাম তপন না। তুমি আমাদের স্কুলে পড়েছিলে।

তপন সম্মতি স্থচক ঘাড় নাড়ল। এক সময় সে নিজেই জিজ্ঞেস করে বসল।

—ফাদার ডরোথি, উইলমান্ কি এখানে আছেন ?

তপনের কথা কানে যেতেই ফাদার গিবসনের মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে উঠল। মাথা নুইয়ে বুকে বার দুই ক্রস আঁকলেন তিনি। অস্ফুটে আওড়ালেন।

—My God grant her the peace in Heaven.

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তপন। আশ্চর্য্য ডরোথি উইলমান যে আর বেঁচে নেই একথাটা ভাবতে গিয়েও কেমন যেন বহুদিন পরে তার গলায় কান্না জড়িয়ে এলো। ফাদারই এক সময় বল্লেন।

—তুমি যে রাত্রে কলকাতায় চলে গেলে তার কিছুদিন পরেই that noble lady মারা গেলেন। ফাদার গিবসনের গলাটা শেষ দিকে কেমন ভারী হয়ে এলো।

আর কিছুই যেন শুনতে পেলোনা তপন, কিছু শুনতেও চাইল না। ধীর পায়ে আস্তে আস্তে সে এসে দাঁড়াল। কবরটার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে অনেকক্ষণ, অনেক সময়।

এই কাহিনীর হয়ত এখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কোন কাহিনীই হঠাৎ শেষ হয়ে যায় না।

সেই দিনের পর থেকে অনেক দিন কেটে গেছে তার এ সহরে। একে একে যৌবনের দিনগুলো পায়ে পায়ে পার হয়ে এসেছেন তপন হালদার। এখন বার্দ্ধক্যের সীমায় পা দিয়েছেন তিনি। আজকাল আর যদিও পিঠটান করে দাঁড়াতে পারেন না, এক এক রাত্রে বাতের ব্যথায় সমস্ত শরীরটা তার অসাড় হয়ে আসে যদিও, তবুও একটি দিনের জন্যও বিকেল বেলায় স্কুল বাড়ীর পুরোন ভগ্নস্তূপটার উপর সেই কবরটার পাশে এসে বসতে তপন হালদারের বিরাগ দেখা যায়নি। ঠিক যৌবনের দিনগুলোতে যা হয়ে এসেছে, বার্দ্ধক্যে পৌছেও তার অন্যথা হয়নি তপন হালদারের। রোজ বিকেলে স্কুল বাড়ীটার শীর্ণ ভগ্নস্তূপটার উপর কবরটার পাশে বসে থাকতে দেখা গেছে। বসে বসে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে অনেকক্ষণ, অনেক সময়। ঠিক সেই প্রথম সন্ধ্যা তারাটি উঠবার আগে পর্য্যন্ত। আর সে তারাটির দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় তপন হালদারের যেন মনে হয়েছে, বহুদূর উর্দ্ধে, ঐ সুদূরতম নক্ষত্রটির ভিতর যেন একজোড়া মায়াময় চোখ তার চোখের দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে রয়েছে। আর আশ্চর্য্য সেই এক জোড়া মায়াময় চোখের সঙ্গে ডরোথি উইলমানের চোখের অদ্ভুত একটা সাদৃশ্যও যেন খুঁজে পেয়েছেন বৃদ্ধ তপন হালদার।

সাংস্কৃতিকী

বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ

বাঙালীর বৈশাখী-উৎসব এখন রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে। তাঁর জন্মদিন পঁচিশে বৈশাখের তিথি পেরিয়ে ক্রমেই তা বিস্তৃততর স্থান-কালে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। উৎসবপ্রিয়তা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষমাত্রেরই অন্তরঙ্গ একটি বৃত্তি। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট দিনক্ষণ মেনে পঞ্জিকা-রীতিতে বাঙালী তার অনুষ্ঠান করতে মোটেও রাজি নয়। যে যুগে বাঙালী রীতিমত কথা বলতে শিখেছে সে এক ধূসরতম গুপ্ত যুগ। বাঙালী তাঁকেই তখন গুরু বলতে শিখেছিল, যিনি মূককে বাচাল করতে পারতেন এবং পঙ্গুকে গিরি-লঙ্ঘন শেখাতেন। বিশ-শতকে রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর সেই গুরুর গৌরব পেয়েছেন। আমরা যদি আজ বাচালতা শিখে থাকি বা গিরি-লঙ্ঘনের ঔদ্ধত্য দেখাই তাহলে সে গৌরব বা অগৌরব রবীন্দ্রনাথকেই বহন করতে হবে। কেননা, তিনি বাঙালীর এবং হয়ত সর্ব্বভারতেরই গুরুদেব। যদিও রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি, মূর্ত্তি, জন্মদিবস প্রভৃতি বাঙালীরা অপরাপর ধর্ম্মগুরুর মতোই প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর তবু সম্ভবত শতকরা আশীর ভাগ বাঙালী জানেন না যে দীর্ঘ আশীবছর রবীন্দ্রনাথ বাঙালীকে কোন্ মূর্ত্তিতে গড়া দেখতে চেয়েছিলেন, তার মানে, ধর্ম্ম বলতে কোন্ ধর্ম্মে বাঙালীকে দীক্ষিত দেখতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম যে মানবিক শিল্পী-ধর্ম্ম ছাড়া অন্য কিছু ছিল না—রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাঁরা আজ বিভিন্ন নীতির সওদাগিরি করছেন তাঁদের অন্ততঃ এ-জ্ঞান থাকা উচিত। শিল্পীর জীবনই তাঁর ধর্ম্ম—আর জীবন মানে শিল্পীর কর্ম্ম-কৃতি। সে জীবন শতকরা শতভাগ মানবিক। মানুষ দেবতা-ও নয়, দানব-ও নয়, এই দুইএর সামঞ্জস্য-বিধাতা।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বা চিত্র যেমন তাঁর জীবনের অঙ্গ তেম্নি তাঁর শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন। ১৯৫০-এর পর যখন পশ্চিম-বঙ্গে নব-নগর প্রতিষ্ঠার ও পল্লীসংস্কারের দিকে রাষ্ট্রের প্রযত্ন লক্ষিত হচ্ছে, তখন আমরা মনে করি যে এখনকার ২৫-শে বৈশাখ রাষ্ট্রের পক্ষেও একটি অবশ্য-স্মরণীয় দিবস। রবীন্দ্রনাথের প্রায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতেই বীরভূমের একটি জলহীন শুষ্ক প্রান্তর শান্তিনিকেতনে পরিণত হয়েছিল। এ-কথাটি আজ বিশেষভাবে স্মরণীয় এবং এ-কাজের দরুণ আজ তিনি বিশিষ্ট গৌরবে বরণীয়।

অতএব যখন সোদপুরের পোড়ো অঞ্চলে নূতন উপনিবেশ-স্থাপয়িতারা এবার রবীন্দ্রোৎসব করলেন, আমাদের মনে হল, এ-উৎসব আজকের দিনে পালন করবার অধিকার সাহিত্যিকদের চাইতে এঁদের বিন্দুমাত্র-ও কম নেই। অবশ্য তাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্য স্মরণ করেই আনন্দের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সভায় শান্তিনিকেতন-প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথের আত্মাই যেন সভাপতিত্ব করেছে। তাঁরা এ-কথা উল্লেখ না করলেও এই নগর-নির্ম্মতাদের সভায় আমরা বিশ্ব-কবির অন্তরাত্মাকে অনুভব করতে পারতাম।

এ-সভায় নৃত্য-গীত অভিনয়-আবৃত্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার আলোচনা-ও হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা অস্তগামী সূর্য্যের বিদায়ী আলোর চরণ-ধ্বনি সব আলোর পাখীরা সূর্য্যের সোনার নীড়ে ফিরে যাচ্ছে—রাত্রি এসে জিজ্ঞেস করছে, তোমরা কে, কি অনুভব নিয়ে এলে? বলো, পৃথিবীর কোন্ ঘ্রাণ বহন করছ! ক্লেদাক্ত, হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর প্রাঞ্জল সুঘ্রাণের কথা জীবনশেষে রবীন্দ্রনাথ বল্‌তে পারেন নি, বল্‌তে পেরেছেন আদিপঙ্ক অন্ধকার থেকে উত্থানের কথা। সে-উত্থান এমন নয় যা দেখে মানবিক দৃষ্টি বলতে পারে ; "মরি-মরি!" মানুষ তখনও সুন্দর নয়, কুৎসিত—সৌন্দর্য্য তার পরেকার উপার্জ্জন। এ-উপার্জ্জনের তাগিদ তার অন্তরে জীব-জগতের আদিম অবস্থা থেকে সুরু হয়েছে, আজও গাছের সবুজ রসের মতো প্রাণময় সে-প্রেরণা তার অন্তরে বর্ত্তমান। কিন্তু মানুষের বাস্তব সৌন্দর্য্য বুঝি বা একটি অলীক প্রতিমা। বস্তু যেহেতু বিনাশশীল, তাই তার সৌন্দর্য্যও বিনষ্ট হতে উদ্যত। সৌন্দর্য্যের গতি-রেখা উৎক্ষিপ্ত বস্তুর গতি-রেখার সমতুল্য। প্রথমত উদ্ধত হবে, তারপর তার বিনয়। শৈশব সৌন্দর্য্য জীব-মানবকে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে কিন্তু উৎক্ষিপ্ত বস্তুপিণ্ড তাতে স্বর্গ-সুষমায় মণ্ডিত হয়ে ভূতলে পতিত হয় না। হয় আবহাওয়ার বিরোধিতায়, নয় ত বার্দ্ধক্যে তা অপাংক্তেয়, পতিত হয়ে পড়ে। বার্দ্ধক্য কুৎসিত। বিরোধিতার মতোই রূপের অবসান ঘটায় বার্দ্ধক্য। রূপময় জীবন-মাত্রেরই মাথার উপর বার্দ্ধক্যের এই অভিশাপ ঝুল্‌ছে। রবীন্দ্রনাথ তুলি হাতে নিয়ে পৃথিবীর এই রূপ দেখলেন।

চিত্রাঙ্কণ-কালে পিকাসোর মতো এই ভাবনা তড়িৎ-প্রভাবৎ রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় আসেনি। এসেছে ধীরে ধীরে, সঞ্চিত হয়েছে গাঢ় ঘন ভঙ্গীতে। তারপর তিনি তাদের রূপায়ণ করবার কথা ভেবেছেন। ভাবনা সৎ হলেই তার রূপায়ণ প্রাঞ্জল হয়। রবীন্দ্রনাথের বা পিকাসোর কোন এক অধ্যায়-গত ছবির মূল বিষয়ের প্রাঞ্জলতা অনুধাবনে যদি আমরা অশক্ত হয়ে থাকি সে-দোষ তাঁদের নয়—আমরা যারা শিল্প-ভোক্তা, তাদের। রবীন্দ্রনাথ 'সে'-গ্রন্থখানিও প্রণয়ন করেছিলেন দেব-শিশুদের উল্টোপিঠ শয়তান সন্তানের বিভীষিকা দেখবার জন্যেই। আমরা নিজেদের ছবি উপলব্ধি করতে চাই-নি। এ-বিষয়ে উরোপার শিল্প-বোদ্ধারা আমাদের চাইতে ঢের বেশি প্রবুদ্ধ। উরোপার জনমানস আত্ম-স্খালনেও তৎপর এবং আত্মদর্শনেও বিচিত্রগামী। বিচিত্রগামী আত্মদর্শনে আমরা ইদানিং ভয় বা লজ্জা পাই। সুতরাং অপলাপ আমাদের মজ্জাগত। সাম্প্রতিক যুগে ত অপলাপ চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছেছে। সারা গায়ে পাপ মেখে আমরা পুণ্যের বাণী আওড়াই এবং পাপীতাপী সবাই আমাদের বাহবা দেয়। সম্ভবত এর নামই চারিত্র্য-হত্যা। রবীন্দ্রনাথ মানবিক চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন তাঁর শেষ অধ্যায়ে।

প্রাচীন ভারতে জীব-হত্যা, হিংসা, দুষ্কৃতি, কামাচার প্রভৃতি মনোবৃত্তি জীবনে জাগ্রত দেখে কেউ চোখ বুঁজে রামনাম নেয়নি। সবই জীবনে সম্ভাবিত বলে লিখিত, রেখায়িত ও প্রদর্শিত হয়েছে। শিল্পীরা কোনার্ক, পুরী, খজুরাহো ভাস্কর্য্য নির্ম্মাণে ইতস্তত করেন নি শুধু এ-কথা বলার জন্যে যে পৃথিবীতে সবই দেবশিল্প নয়। দানবের শিল্প বলেও একটা কিছু ভারতবর্ষে ছিল। তাছাড়া দেবশিল্পও কুৎসিত-সুন্দর জড়িয়েই নির্ম্মিত। আসামকে অসুর-পুরী আর কামরূপীই বলি স্বয়ং বিষ্ণুও সেখানে ত্রিবিক্রম মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়ে পাথরের উপর আসুরিক মূর্ত্তি রেখে গেছেন। দেব-দানবের সমন্বয়ে একটি মানবিক রূপ-প্রতিষ্ঠার কল্পনা হয়ত প্রথম বৌদ্ধ আমলেই সম্ভবপর হয়েছিল। সম্ভবত তখন থেকেই শিল্পীরা বুঝতে সুরু করেছিলেন যে শিল্প মানে সৌন্দর্য্যের সেবা। রবীন্দ্রনাথও আজীবন তা-ই অনুভব করেছেন।

সৌন্দর্য্যের এক ও অদ্বিতীয় খাতে জীবনকে প্রবাহিত করে এনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বার্দ্ধক্যে কুৎসিতের মুখোমুখি হলেন। সুপুরুষ রবীন্দ্রনাথ জরার রৌপ্য-শুভ্র রূপের অন্তরালে উষ্ট্রের কুব্জতাও বুঝি চাক্ষুষ দেখতে পেলেন নিজ দেহে। জীবন সুন্দর কিন্তু মৃত্যু কুৎসিত। জরা সেই কুৎসিতের দানপত্র। এই দলিল দর্শনের পর জরাগ্রস্ত পৃথিবী আর 'সুন্দর ভুবন' থাকে না—মৃত্যুর ডাক শোনায় পৃথিবী জীবকে, যার মৃত্যুর সময় হল। পৃথিবীর গ্লানিময় চিত্রাবলী তখন শ্রেণীবদ্ধ হয়ে মৃত্যু-পথিকের চোখের উপর এসে দাঁড়ায়। মৃত্যু-পথিক চিনতে পারেন মৃত্যুর কাছে সমর্পিত যাদের জীবন তাদের ভয়ার্ত্ত বা বিভীষিকাময় রূপ। তখন যারা আছে 'মাটির কাছাকাছি' তাদেরও তিনি সত্য চেহারায় বা মৃত্যু-বৃত স্বরূপে চিনতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কণের অধ্যায় ঠিক এই অভিজ্ঞতার অধ্যায়। চন্দ্রের অপর পিঠের অন্ধকার নিয়ে এ-অধ্যায়ের দেহ নির্ম্মিত। ভূমি-মাতার জঠরের শিল্পরঙ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্র বর্ণময় ও বিচিত্র দুর্গম পথ যাত্রী। 'পাপে জন্ম পাপে স্থিতি' নামক মানব-জীবন জ্ঞাপক প্রবচনটি হয়ত চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের কানে অহরহ ধ্বনিত হচ্ছিল। চিত্রের অধ্যায়ে তাঁর জীবন-বোধ পূর্ণতা লাভ করল। রবীন্দ্র-কর্ম্মকৃতি একটি পূর্ণচন্দ্র যা পৃথিবীর সঙ্গে নাড়ীর সম্পর্কে জড়িত হল। রবীন্দ্রনাথ এ-শতকের খাঁটি অবলোকিতেশ্বর হলেন।

শ্রীঅরবিন্দের কবিতা

দানব, মানব দেবতা যে জীবের মানসিক জীবনের কতকগুলো পর্য্যায় এতত্ত্ব ভারতীয় দর্শনের মূল কথা হলেও শ্রীঅরবিন্দ তা আমাদের বুঝিয়ে না দিয়ে গেলে আমরা উরোপার দার্শনিক জ্ঞানে হতভম্ব হয়ে আজও ভাবতাম ভারতীয় দর্শন বুঝি বা ভোজবাজি। বিশুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বে যে বর্ত্তমান মন আগ্রহান্বিত নয়, সত্তাপূর্ণ জীবনেই অধিকতর উৎসুক এ-কথাও শ্রীঅরবিন্দ জানতেন। তাই তাঁর 'সাবিত্রী' কাব্য-রচনা। সাংখ্যযোগের ভাবধারাকে নর-নারীর জীবনে প্রতিফলিত দেখে তারই একটি বিশেষ কাহিনী তিনি আজকের দিনের মানুষের অন্তরস্থ করে দিতে চেয়েছেন। সাধারণের মনের প্রবেশ-দ্বারে বিচার-বুদ্ধির প্রহরী ততোটা থাকে না যতোটা থাকে ইচ্ছা ও আবেগের প্রহরী জাগ্রত। সাধারণের মনের দ্বার লক্ষ্য করেই শিল্পীরা বেসাতি নির্ম্মাণ করতে সুরু করেছিলেন। মহাকাব্যের ও বিরাট ভাস্কার্য্যের যুগ সম্ভবত সমসাময়িক এবং প্রাচীন শিল্পরীতির দু'টি উদাহরণ।

দার্শনিক পরিভাষার বিচারে শ্রীঅরবিন্দ 'সাবিত্রী'-কাব্য, বিশেষ থেকে সাধারণে নেমে এসেছেন। দর্শন থেকে কাব্যলোকে অবতরণ হয়েছে তাঁর। কিম্বা বলা যায়, কাব্যলোক থেকে তিনি দর্শনে প্রস্থান করেছিলেন এবং দার্শনিক বিশেষত্ব আহরণ করে কাব্যলোকে পুনরাগমন করেছেন। কিন্তু কী অসাধারণ সেই কাব্যলোক :

> "It was the hour before the Gods awake.
> Across the path of the divine Event
> The huge foreboding mind of Night, alone
> In her unlit temple of eternity,
> Lay stretched immobile upon Silence' marge."

কার যুক্তিবিচার, কার ইচ্ছা-আবেগ এ অনুভব পেতে পারে, মহাকবির ছাড়া? এ-ভাষা বিদেশী, তদুপরি বিচার-বিধৌত নয়, এ-ছবি বাস্তবের রঙে রঙীন নয়, তবু হৃদয়ে যেন তার ধ্বনি-বর্ণ সব সরাসরি গিয়ে প্রবেশ করে। অনুভব করি একটি মুহূর্ত্ত যখন দেবভাব সুপ্ত কিন্তু জন্ম নেবে সেই ভাবকোরক, তাই কাল-রাত্রি শয়িতা—তাঁর শাশ্বত শয়ন-মন্দিরের নীরবতা ঘেঁষে। এমন প্রভাত-ছবি আসে এখনো আমাদের দেশের আকাশে, তাই অনুভব করি তার আত্মার রূপ, বিদেশী ভাষার আবরণ তখনই খসে পড়ে।

এই অপূর্ব্ব কাব্য-কথার বাংলা অনুবাদ আমরা আশা করে এসেছি। সম্প্রতি প্রবীণ সাহিত্যিক এবং শ্রীঅরবিন্দের প্রজ্ঞানুধ্যায়ী শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত 'সাবিত্রী'-কাব্যের কিয়দংশ বাংলায় অনুবাদ করে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করেছেন। পরমা-প্রকৃতি 'সাবিত্রী'র পরিচিতি-অংশটি এরূপ :

"হে সাবিত্রী! আমি তব আত্মা অন্তরের
ধরার বেদনাভার বহিতে আসিনু
সকলের সাথে—তুলি' লহি এই বুকে
মোর যত সন্তানের নিখিল বেদনা—
আকাশের তলে যত দুর্ভোগ জমাট,
সেবিকা তথায় আমি, ক্রূর দেবতার
রথ চক্রতলে বিদলিত কাঁদে যারা,
তাদের সবার আমি আত্মা অন্তরের।"

পৃথিবীর এই আত্মার সৌরভ এম্নি সহজ ভাষায় শ্রীনলিনীকান্ত অনুবাদ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। মাইকেলের বঙ্গভাষার প্রতি সুবিচার দেখিয়েও অনুবাদক সাম্প্রতিক বঙ্গভাষার প্রতি অবিচার করেন নি। অসমাপিকা ক্রিয়া-পদে বা স্থানে-স্থানে সমাপিকা ক্রিয়া-পদে প্রাচীন কাব্যের পদ ব্যবহার আমাদের কানে একটু ধ্রুপদী আমেজ নিয়ে আসে, যা এ-বিষয়ের কাব্যে হয়ত অত্যাজ্য।

শ্রীনলিনীকান্ত 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের ষষ্ঠ ও সপ্তম পর্ব্বের দু'টি সর্গ অনুবাদ করছেন। বাঙালীর আগ্রহে সম্ভবত সমগ্র কাব্যখানিই তিনি কালক্রমে অনুবাদ করে বাংলা-কাব্য-ভাণ্ডার পূর্ণতর করে তুলবেন।

বাইবেলের কাব্য

বাইবেলে যে কবিতা আছে তা হয়ত অনেকেই আমরা জানিনে। প্রাচীন ঈশরাইল জাতির রাজা সলোমনের নামে যে গান-গুলো পাওয়া যায় তার খানিকটা আমেজ প্রাচীন চৈনিক প্রেমকাব্যে ও বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা পেতে পারি। খ্রীষ্টজন্মের হাজার-দু'হাজার বছর আগে কী গভীর প্রেমে যে অভিষিক্ত ছিল মানুষের মন তা আমরা এই সব কাব্য-পাঠে জানতে পারব। প্রেমাভিষিক্ত মনের ধ্বনি একই রকম—সময়ের ও স্থানের ব্যবধান সে ধ্বনিতে খুব বেশি বৈচিত্র্য তৈরী করেনা। এক্ষেত্রে তার অবশ্য ঐতিহাসিক কারণও আছে। ইশরাইল কাব্যের "নাভি তোমার যেন সুগোল একটি ভৃঙ্গার, তাতে পানীয়ের অভাব হয় না" এবং "তোমার স্তন দুটি যেন যমজ-হরিণী" প্রভৃতি উপমা-প্রয়োগ

বড় চণ্ডীদাসের "নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপমা" এবং "কুচ কোকযুগলা" প্রভৃতির সঙ্গে মিতালি পাতাতে আসে।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত ইশরাইল-কাব্যের এই প্রেমাত্মক অংশটুকু অনুবাদে বাংলা কাব্যের ভাণ্ডারে এনে দিয়ে খানিকটা চিন্তার অবকাশ করে দিলেন। আমরা অতঃপর ভাবতে পারি সুফীবাদ ও রাধাতত্ত্বের মূল কোথায়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অর্কেস্ট্রা'

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত হতে পেরেছেন তাঁরা অনায়াসে একটি কথা জেনে নিতে পারেন যে কাব্য-পদ-রচনা সযত্নে করতে লয়। যত্ন সত্ত্বেও তা ধ্রুপদী হবে কি না-হবে সে নিশ্চয়তা বা অনিশ্চয়তা বোধ রচয়িতার সাধারণত থাকেনা, তিনি মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ যিনিই হোন। প্রযত্নই কবির পক্ষে ঐকান্তিক সাধনা কি না এ-নিয়েও তর্ক উঠ্‌তে পারে এবং তখন রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ উপস্থিত করলেও কোনো সমালোচক কবিকর্ম্মের আসল বস্তু কি-কি তা মেপে দেখাতে পারবেন না। শুধু এটুকু বলা যাবে যে কবি যেমন প্রযত্নশীল হবেন তেম্নি আবেগ-প্রবণও হবেন। কিন্তু মুস্কিল এই যে আবেগ-প্রবণ হতে গেলে ভাষা জড়িয়ে যায়, মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ভালো ডাক্তার নিজের ছেলের চিকিৎসায় মাত্রাজ্ঞান হারাবার ভয়ে অষুধ দিতে রাজি হননা। ভালো কবি আবেগ-প্রবণতায় ভাসতে থাকলে ভালো ডাক্তারের পথ বেছে নিয়ে কবিতার মঙ্গল-কামনায় কাব্য-রচনা সাময়িকভাবে ছেড়ে দিতে পারেন। 'সংবর্ত্তে'র অন্তর্গত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মনে এই কবি-মন উদ্ভাসিত কিন্তু 'অর্কেস্ট্রা'র রচনার কালে তিনি তেমন আবেগ-সাবধান ছিলেন না। তখনও অবশ্য তিনি আবেগকে উপদ্রব হিসেবেই জেনে নিচ্ছিলেন এবং তদগত ভাষাকে যথাসাধ্য পরিহার করবার জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

কবিতার পক্ষে আবেগ কিন্তু ব্যাধি নয়, ঔষধ। আবেগের ভাষা নিয়ে যে কর্ম্মকৃতি দেখানো হয় তাতে কবির মাত্রাজ্ঞান প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কতোটা বর্জ্জনে ও কতোটা গ্রহণে যে একটি রচনা কবিতার পর্য্যায়ে গিয়ে পৌছুবে কোনো কবিরাজ সেই বিদ্যায় পারঙ্গম হননি। কারণ, আবেগের নদীতে জোয়ার-ভাটা আছে। কবি যদি সামাজিক জীব হতে চান, তাহলে সমাজের সমুদ্র-মনের জোয়ার-ভাটা লক্ষ্য করতে সচেষ্ট হন। আর তিনি যদি স্বকীয় মানবিক মনের নদী-স্রোত লক্ষ্য করতে অভিলাষী হন, তাহলেও দেখতে পান সেখানেও জোয়ার-ভাটা আসে—সমুদ্রের নিয়মেই আসে। কিন্তু সমুদ্রের প্রবল জোয়ার বা অলক্ষ্য ভাটা সমুদ্র-গামী নদীর জীবনেও সামুদ্রিক ভঙ্গীতে দেখা যায় না। নদীর উপমায় কবি-চিত্তের আবেগ-চিত্র পাওয়া যায়।

কবি প্রৌঢ়তার সিদ্ধিতে পৌছিয়ে একবার নিজের চিত্তের গতি-পথ অবলোকন করতে পারেন। পূর্ব্বে কোথায় তিনি সিদ্ধিস্থলের মনোভঙ্গী যথাযথ ব্যক্ত করতে পারেননি এ-ভাবনাও তাঁর মনে উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। 'অর্কেস্ট্রা'র সংশোধিত সংস্করণে (সিগনেট প্রেস-প্রকাশিত) সুধীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ-বছরের কাব্য-অভিজ্ঞতার ছাপ অঙ্কিত করে দিয়েছেন। এতদ্বারা তিনি পাঠকের নিকট নিজেকে প্রাঞ্জলতর ছাড়া আর কিছু করেন নি। কবি-কৃতি এবং কবির কৃতিত্ব নিরবধি স্বভাবকে প্রাঞ্জলতর করা। প্রথম জীবনে যে অনুভবে উজ্জীবিত হন, তাকে ক্রমে সমাজের কাব্য-গৃহে

পরিচ্ছন্ন ভাষায় ব্যক্ত করাই কবির ধর্ম্ম। সে-কাব্যগৃহে সবারই প্রবেশ অধিকার আছে কিন্তু কবিতা-রীতিতে যারা অনুরক্ত নন তাঁরা দ্বার খোলা থাকলেও সেদিকে তাকান না, তাকালেও দ্বার অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করেন না অথবা ভুলক্রমে প্রবেশ করে নিজের দুর্ব্বলতায় কাব্য-গৃহের অনাত্মীয় হয়ে পড়েন। সুধীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্য-গৃহের শ্রীসম্পাদন করবার মতো প্রচুর সুকৃতি অর্জ্জন করেছেন। বক্তব্যে ও ভাষায় তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে দূরে সরে যেতে যে প্রয়াস দেখিয়েছেন তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং বাংলার প্রিয় ও অতি-ব্যবহৃত পয়ার-পদে তিনি বাংলা গদ্য-বাক্যের সুঠাম স্থান করে দিয়ে দেখাতে সমর্থ হয়েছেন যে বাংলা ভাষাই ছন্দসত্তাময়।

সুধীন্দ্রনাথের সংশোধন-প্রয়াসের একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। যাঁরা মনে করেন যে তিনি আবেগ-বর্জ্জনের পালাই অভিনয় করে গেছেন তাঁরা একটি পংক্তিতে একটি শব্দের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করুন :

"পরণের ছিদ্রে ছিদ্রে পরিপূর্ণ অনবদ্য সুর" ('হৈমন্তী'-অর্কেষ্ট্রা-১৯৩৫)

"প্রাণের প্রত্যেক ছিদ্রে পরিপূর্ণ বাঁশরীর সুর" ('হৈমন্তী'-অর্কেষ্ট্রা-১৯৫৩)

যে-পদকর্ত্তা তাঁর 'পরাণে' একটি অনবদ্য সুন্দর সুর শুনে বেরিয়ে পড়েছিলেন নিরুদ্দেশ যাত্রায়, তাঁর 'পরাণ' আজ 'প্রাণে' ঘনীভূত আর সে-সুরও সুস্পষ্ট বাঁশীর সুর। প্রাণে যতো ছিদ্রই থাকুক সাত-রন্ধ্রের একটি বাঁশরী তাকে পূর্ণ করে তুলতে পারে। এই পূর্ণতার ছবি কোন্ বাঙালী মনে অস্পষ্ট?

বাঙালীর 'পদকার' বা 'পয়ারে'র একটি পংক্তি সুধীন্দ্রনাথের রচনায় এমন হতে পারে :

"জানিনা একদা কেন ভালোবেসেছিলাম তোমারে।"

'তোমারে'-কে 'তোমাকে' বলতে পারলে এ-বাক্য নিখুঁত গদ্যের একটি পংক্তি হতে পারত—আঠারো অক্ষরে পদের আকার নিয়েও। ভালোবাসা যেমন আবেগের ক্রিয়া তেম্নি 'তোমাকে'র রূপ-পরিবর্ত্তনও আবেগের ক্রিয়ায় অতীত-কালে সম্পাদিত হয়েছিল। এখানে ক্রিয়া ও ক্রিয়ার উদ্দেশ্য অতীতাশ্রয়ী। সুতরাং উদ্দিষ্টও পুরাতন নমুনায় ঢালাই। তেমনি 'একদা' কথা অতীতের একটি সুন্দর বাহন। এ-বাহনকে সুন্দরতর করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ' 'একদা তুমি প্রিয়ে'—গানে। তা-ও মনে পড়ে এই সঙ্গে।

এসব বিচারের পরও যদি পংক্তিটিতে আমরা গদ্যের গন্ধ পাই—সংস্কারবশত যদি বলি, পয়ারের পর্ব্ব-বিভাগ যে জোড়-ধ্বনি কামনা করে তা এতে অনুপস্থিত এবং অনুপস্থিত 'ভালোবেসেছিলাম' ক্রিয়াপদটির আবির্ভাবে, তখন ছন্দ-বিতর্কে প্রবেশ না করেও আমাদের খানিকটা বক্তব্য আছে। আমরা বলতে পারি, ভাঙা ভালোবাসার ক্রিয়া-পদকে ভেঙে পাঠ করো, কি ক্ষতি? পদই যদি পর্ব্বে পর্ব্বে ভেঙ্গে যায় তাহলে ভাঙুক একটি ক্রিয়াপদ—'ভালোবেসে' পর্য্যন্ত বলে দাড়ি টানো—অতীতের চিহ্ন 'ছিলাম' আর 'তোমারে' একসঙ্গে ভাসিয়ে দাও।

কিন্তু যেম্নি পয়ারের পংক্তিতে তেম্নি ভালোবাসার রীতিতে অনেকে মধ্যচ্ছেদ, অর্দ্ধচ্ছেদ মানতে চাননা। বিশেষ ভাবে ভাষা যখন আবেগ-ময় হয় বা আবেগের স্পর্শে দোল খেতে সুরু করে তখন তা নিরবচ্ছিন্ন নৃত্য-তালে ছুট্তে সুরু করে যতোক্ষণ না বাইরে থেকে উপদ্রব উপস্থিত হয়। ছন্দ-বিচার নৃত্য-তালে ধাবমান শব্দগুচ্ছের ধ্বনি-বিচার। সে বিচার একসময় অবিচার বা উপদ্রব হয়ে উঠতে পারে যদি বিচারক পংক্তির ধ্বনি-সাম্যের অতিরিক্ত কিছু দাবী করে বসেন। অন্যসময় নৃত্যের

আব্দার উল্টো দাবী জানায় যে পংক্তিপরম্পরা ধ্বনি-সাম্য (সংখ্যাগত) রক্ষা করবেনা। ছন্দের তাতেও আপত্তি থাকেনা কিন্তু ছন্দের আইন-জীবী যিনি, তিনি বল্‌বেন : 'মতিচ্ছন্ন পুঁজি নিয়ে ব্যবসা চলেনা'। কবির উদ্দেশ্যে তিনি বল্‌বেন না, ছন্দের উদ্দেশ্যেই এই বাক্য প্রয়োগ করে দেখাবেন যে বাক্যটিকে চৌদ্দ-অক্ষরী পয়ার ছন্দে বন্দী করে রেখেছেন। ছন্দের এই আবির্ভাবের কারণ, ক্রোধও একটা আবেগ, আবেগের ভাষাকে ছন্দ আপনা-থেকেই লুফে নেয়। কি ভাবে যে নেয়, কি ফন্দীফিকিরে, তার তত্ত্ব জানতে পারাই ছান্দসিকের কাজ। পয়ার-পংক্তির আসল কথা চারের তিনের ধ্বনি-সমন্বিত শব্দ সাজানো। চারের দলে 'দুই' দুবার থাকতে পারে, তিনের দলে দুই ও একের যাতায়াত সিদ্ধ। সহজ উচ্চারণ ও শ্রবণ চলতে পারে যে-ধরণের সমন্বয়ে, তাকেই ছন্দ-রীতি বলে মেনে নেওয়া হত। ছন্দ যাঁরা নির্ম্মাণ করেন, তাঁরা রীতি জানলেও রীতি মানতে পারেন না। মধুসূদন মানেননি, রবীন্দ্রনাথ মানেননি এবং সুধীন্দ্রনাথও অমান্যের প্রয়াসী হয়েছেন উদ্ধৃত পংক্তিতে। তবে পয়ারে সাতধ্বনি-সমন্বিত শব্দ বা শব্দগুচ্ছের চাল আমাদের কানে তেমন অপরিচিত নয়। অবশ্য উক্ত পংক্তিতে সাতটি ধ্বনির শব্দকে পৃথক করে পাঠ করবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাটিও কবি হয়ত আমাদের শুনিয়ে দিতে চান যে প্রচলিত পর্ব্ব-বিভাগও এ-ক্ষেত্রে মানা হয়নি।

'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা'

কবিতার বই প্রকাশে এ-যাবৎ যে যে প্রকাশালয় উদ্যোগী হয়েছেন তাদের মধ্যে 'নাভানা'-প্রকাশালয় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। এ-প্রকাশালয় যথাক্রমে বুদ্ধদেব বসুর, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ও জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্কলন পাঠকদের নিকট উপস্থিত করলেন।

বুদ্ধদেব বসুর কাব্য-কৃতি শুধু তাঁর রচিত কবিতার চারিপাশেই আবর্ত্তিত নয়, তাঁর 'কবিতা'-পত্রিকার দ্বারাও নির্ম্মিত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সুকৃতি তাঁর দ্বারা সম্পাদিত 'নিরুক্ত'-পত্রিকার (কবিতা-পত্র) বাইরে বহুদূরে ধ্বনিত। কিন্তু জীবনানন্দ দাশের বিশ্রুতি অপেক্ষাকৃত কম। যাঁরা এঁদের তিনটি গ্রন্থ পর-পর পড়বার সুযোগ পাবেন, নিজকে না ঠকাতে চাইলে, তাঁরা দেখতে সমর্থ হবেন যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টির পরও বাংলা ভাষায় ভাব ফুটিয়ে তুলবার ক্ষমতা ছিল। জানিনে এই তিনজন 'আধুনিক' কবি শ্রেষ্ঠতর কবিতায় আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ বা অবসর পাবেন কি না, যদি না-ও পান, তবু তাঁদের বহু কবিতা বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী স্বতন্ত্র কবিদের মধ্যে সম্ভবত জীবনানন্দ দাশ স্বতন্ত্রতম। সুরু তাঁর নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে নয়, 'ঝরা পালকে'। তবু তিনি 'সূর্য্য-তামসী'র কবি। একটি মহৎ অন্ধকার যেন সূর্য্যের সন্ধানে বাঙ্মুখর। রবীন্দ্রনাথ অস্তমিত হবার বহু পূর্ব্বেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সূর্য্য হারিয়ে যাচ্ছে ঝড়ো মেঘে—সন্ধান করতে হবে দিশারী আলো। এই উপলব্ধির ক্ষমতাই তাঁকে কথা বলিয়েছে, ব্যাকুলতা আবেগের পালা অভিনয় করিয়েছে তাঁকে দিয়ে, তারপর তিনি স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে বলতে পেরেছেন :

"কোথাও পাখির শব্দ শুনি
কোনদিকে সমুদ্রের সুর ;
কোথাও ভোরের বেলা রয়ে গেছে—তবে।"

তাঁর মনোবিহঙ্গম 'শকুন্তক্রান্তির কলরোল' শুনে আশ্বস্ত হচ্ছে। বোঝা যায় যে কবির 'ঝরা-পালক' কোন পাখীর উপদ্রবেরই পরিণতি—ঝড়ের গতি নিয়ে যে পাখীরা এসেছিল এসিয়ার আকাশে তাঁদের দ্বারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সবার মতো তারও জীবন। তবে কবির জীবনও পাখীরই জীবন। সে-পাখী জানে অন্ধকার পার হয়ে ভোরের দিকে যেতে। রাত্রির দিক্‌চক্রহীন তমসায় তার দৃষ্টিই সূর্য্য সন্ধানে স্থির। সূর্য্যের পর যদি 'মহাপৃথিবী'তে আরো কিছু থাকে—থাকে 'সাতটি তারার তিমির'—জীবনানন্দ সেই তিমির ভেদ করে আলোর রাজ্যে যেতে চেয়েছিলেন। আলো-নিবদ্ধদৃষ্টি জীবনানন্দকে আমাদের অন্ধকার পৃথিবী থেকে সব সময় চেনা যায় না—তাঁর কথা অস্পষ্ট, দুর্ব্বোধ্য মনে হয়।

কিন্তু আমরা যদি তাঁর সঙ্গী হতে চাই তাহলে দেখা যাবে তিনি রবীন্দ্রনাথের পরে রবীন্দ্রনাথের মতো আশাবাদী—ইতিহাসে অভ্রান্ত বিশ্বাস স্থাপন করে সঞ্চরণশীল। কিন্তু তাঁর আশাবাদ রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় আশার নক্সায় তৈরী নয়। তাঁর জীবনকে ভাল লাগা একটু আলাদা রঙে রঙীন। বাস্তবতাকে নিরুদ্বেগে সহ্য করতে পারেন তিনি যদি প্রেম নামক বস্তুটি স্বধর্ম্মচ্যুত না হয়। তখন, স্বাধর্ম্ম্যে প্রেমকে দেখে তিনি অনায়াসে বলতে পারেন :

"পৃথিবীতে এই জন্মলাভ তবু ভালো"

যাঁরা মৃত্যুর আগে 'অন্ধকারে দীর্ঘ শীত রাত্রিটিরে' ভালোবেসেছেন কাব্য-জীবনের উষাকালে, তাঁরা দীর্ঘ কাব্য-জীবনের শেষেও পৃথিবীতে জন্মলাভ সার্থক বলে মনে করে যান। এ ক্ষেত্রে জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথের পরম আত্মীয়। একটি তির্য্যক রশ্মি যেন সূর্য্য বিন্দুতে মিলিত। পথ হারিয়ে ফেলেনি রশ্মি—পথ-রেখাও নূতন নয়—নূতন হল, জগতকে, বস্তুর জগতকে প্রগাঢ়-ভালোবাসায়-জড়িয়ে-ধরা রশ্মির রূপ। সে-রূপ তার নিজের ভাষাতেই বলুক সে কী :

"আমার হৃদয়—এক পুরুষহরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়—চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমাকে কি চায় নাই ধরা দিতে ?"

প্রেমকে স্বীকার করা নয়, প্রেমের শিকার হওয়া জীবনানন্দ দাশের কবিতার সোচ্চার কণ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ এমন প্রেমপরবশ্যতা স্বীকার করতে পারলেও সে-অবস্থা থেকে অতি দ্রুত গাত্রোত্থান করে নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের পথে প্রস্থান করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর কবিরা তাঁর অতি নিকটে এসে সময় সময় দাঁড়ালেও তাঁদের নিজস্ব স্থান-কাল-পাত্র-জ্ঞান পরিত্যাগ করেন নি।

এই স্থান-কাল-পাত্রও স্থাণু নয়—চলার বেগে আন্দোলিত। যে দার্শনিক প্রত্যয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্ব্বতে নিরুদ্দেশ মেঘের সত্তা দেখতে পেয়েছিলেন আজ বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ে স্থান-কালও পর্ব্বত-ধর্ম্মী হয়ে নিরুদ্দেশ মেঘের সত্তা লাভ করেছে ! জীবনানন্দ দাশ এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে আসক্ত বলেই তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র শেষ পর্য্যায়ে বলেছেন :

"স্থান থেকে স্থানচ্যুত হয়ে
চিহ্ন ছেড়ে অন্য চিহ্নে গিয়ে
ঘড়ির কাঁটার থেকে সময়ের স্নায়ুর স্পন্দন

খসিয়ে বিমুক্ত করে তাকে
দেখা যায় অবিরল শাদা কালো সময়ের ফাঁকে
সৈকত কেবলি দূর সৈকত ফুরায় ;"

কিন্তু এই সুর বিষণ্ণতার, রবীন্দ্রনাথের বিমুক্তি বিষণ্ণ ছিলনা। এ-সময়কার কবি জীবনানন্দ দাশের আন্দোলিত চিত্ত 'অবিরল শাদা কালো সময়ের ফাঁকে' সহজে চেনা যায়। জীবনানন্দের কাব্য-পাঠে সেই 'উপশান্তি' পাওয়া যায় অশ্বঘোষ যাকে কাব্যের কর্ম্ম বলে জানতেন। কিন্তু এই 'কাব্যোপচার' গ্রহণ করতে হলে 'শ্রোতৃণাং গ্রহণার্থমন্যমনসাং' দরকার।

এখনকার উপন্যাস

বাংলা-সাহিত্যে উপন্যাস-রচনার দিন আগত কি অপগত তা এখন ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা। কিছুদিন আগেও সাহিত্যের পাঠকদের কাছে উপন্যাসের চাইতে উপাদেয় আর কোনো বস্তুই ছিলনা। কিন্তু হঠাৎ উপন্যাসের চাইতেও হাল্কা হাওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হল এবং ফলে সম্প্রতি রম্য-রচনার একটি সুরম্য উদ্যান তৈরী হয়ে উঠেছে। এই মৌসুমী ফুলের বাগান শুকিয়ে যাবে বলে অভিশাপ-বাক্য আমরা উচ্চারণ করবনা কিন্তু ভাবতে বাধ্য হব যে সাবেকী ফুলের গন্ধ আজ অনাদর ভুগতে সুরু করলেও তার বিনাশ নেই। তবে সাবেক দিনের মতো গন্ধ-ফুলের মালা না গেঁথে কেউ-কেউ ফুলের তোড়া তৈরী করতে পারেন এবং তাতে রম্য কয়েকটি মৌসুমী ফুল ঢুকিয়ে দিতে পারেন। তাঁরা হাল-আমলের ফ্লোরিষ্ট—সাবেকী মালাকর নাম নিতে বা পেতে রাজি নন। উপন্যাস-প্রসঙ্গে ফুলের উপমায় গন্ধ কথাটি আবেগের সঙ্গে তুলনীয়। এই আবেগের বাছ-বিচার করা উপন্যাস ক্রমেই ত্যাগ করে আসছিল। তদ্দরুণ তার দেহটি তেমন তুলতুলে ছিলনা যেমন ছিল শরৎচন্দ্রের আমলে। সেই সুযোগে রম্য-রচনা মঞ্চে প্রবেশ করল। দোষ উপন্যাসের অদৃষ্টের, না কি পাঠকের পাতিত্যের, বলা মুস্কিল।

এই সময়ে যাঁরা আবেগের কাহিনীকে সুদীর্ঘ পথে পরিচালনা করে উপন্যাস রচনা করতে প্রয়াসী তাঁদের ধ্রুব-সাহিত্যে প্রীতি মুঞ্চন করা দুঃসাধ্য। বাংলা উপন্যাসের জন্ম যদিও বেশি প্রাচীনতায় নয় তবু তা ধ্রুপদী পর্য্যায়ে চলে এসেছিল। শরৎচন্দ্রের পর উপন্যাসের রূপে ও রসে বিচিত্রগামিতার লক্ষণও সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল দেখা যায়। সুতরাং বাংলা উপন্যাসে কোনোক্রমেই অশক্ত বৃক্ষের উপমা ব্যবহৃত হতে পারেনা। বৃক্ষটি বিষবৃক্ষ নয় বলে অতিবড়ো ছিদ্রান্বেষীরা আফ্‌শোষ করেন কিন্তু নিশ্চয়ই তার মৃত্যু-কামনা করেন না।

রম্যরচনাকার ও উপন্যাস-রচয়িতার মধ্যে নাস্তি-অস্তির ব্যবধান বিদ্যমান। উপন্যাস যিনি রচনা করেন তাঁর জীবন সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হয়—জীবন সম্পর্কে কোনো ধারণা না রাখাই রম্যরচনাকারের বিশেষত্ব। তাঁদের রচনার প্রথম পংক্তিতে চার্ব্বাক ও দ্বিতীয় পংক্তিতে ঈশোপনিষৎ অবাধে বিচরণ করতে পারে। তাঁরা ফুর্ত্তিতে এতো বেশি আগ্রহশীল যেন ফুর্ত্তির দিন ফুরিয়ে আসছে—আর সময় পাওয়া যাবেনা। অনেক গল্প-লেখক এই ফুর্ত্তিতে অবতীর্ণ হচ্ছেন কিন্তু অনেকে আবার গল্পের বদ্ধ হাওয়া থেকে উপন্যাসের মুক্ত হাওয়ায় উত্তীর্ণ হচ্ছেন।

তবু উপন্যাস-ব্রতীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। অন্তত নবাগত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে খুব কম-সংখ্যকই পাঠকের আগ্রহ আকর্ষণ কিম্বা জীবন-রস বিতরণ করতে পেরেছেন। রস কথাটি দ্বারা জীবনের ভূমির রসকেই আমরা বোঝাতে চাই, যে ভূমির উপর চরিত্র এসে দাঁড়ায়। সে রস অম্ল, তিক্ত, কটু, কষায় এবং কালেভদ্রে মিষ্ট-মধুর। উদাহরণত আমরা এখনকার একটি উপন্যাসের নাম স্মরণ করতে পারি যা পূর্ব্বাশায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে গতবৎসর সমাপ্ত হয়েছিল। সম্প্রতি 'নাভানা' প্রকাশালয় গ্রন্থাকারে উপন্যাসটি প্রকাশিত করেছেন। নাম: 'বিবাহিতা স্ত্রী'। লেখিকা: শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসু। যে-বিবাহ মধুর বন্ধনে স্ত্রী-সম্পর্ক স্থাপিত করেছিল অতীতে, তা আজকের দিনে আমাদের ঘোষণা করে বলতে হয়। বিবাহিত জীবনের মূলে এই কটুতা কার অপরাধে ও কোন্ অপরাধে দেখা দিয়েছে তারই বিশ্লেষণ-চিত্র পাব আমরা উপন্যাসটিতে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের কেউ ওই অত্যাবশ্যক ভূমিকাদ্বয় অভিনয় করবার উপযুক্ত নয় এবং যার অপরাধ নীতির বিচারে ভারি সে-ই স্বামী শেষ-পর্য্যন্ত মৃত্যু-কামনা করছে দেখা যায়। মাতৃত্ব ও স্ত্রীত্ব যেমন মেয়েদের নিকট দাবী করে পুরুষরা, তেম্নি পুরুষের নিকট স্বামিত্ব ও পিতৃত্ব দাবী করতে পারে মেয়েরা। কিন্তু 'বিবাহিতা স্ত্রী' প্রমীলা স্বামীত্ব ও পিতৃত্ব কাকে বলে জীবনে চিনতে পারে নি—সুতরাং অপরাধে তার জীবন মসীময়। তার অপরাধের ক্ষমা আছে কিন্তু স্বামী সুনির্ম্মলকে ক্ষমা করা যায় না। সে মাতৃত্বের মধুর নীড়ে পালিত কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীকে সেই মাতৃত্বের আসনে নিয়ে যেতে নারাজ। সুতরাং নীতি বা নিয়তি তাকে ক্ষমা করবে না। লেখিকা নিয়তির ভূমিকায় নিজেকে আগাগোড়া পরিচালিত করে খাঁটি ঔপন্যাসিক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। এ-বৃত্তি বাংলা উপন্যাস রচয়িতাদের মধ্যে দুর্লভ। উপন্যাসটি থেকে আমরা এখনকার জীবনের সবগুলো রস পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু রস-বিতরণের জন্যে কোনো যান্ত্রিক কলা-কৌশল বা অস্বাভাবিক ঘটনার প্রশ্রয় লেখিকা দেননি। তিনি উপন্যাস-ব্রত সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন বলে আমরা মনে করব। আর সব চাইতে লক্ষণীয় বিষয় এই যে উত্তরোত্তর তাঁর রচনা শাণিত হয়ে চলেছে।

এখনকার উপন্যাসের ভবিষ্যৎ নেই এ-কথা, সুতরাং, বলা চলেনা। রম্য-রচনার গোলক ধাঁধার খেলায় আমরা বাংলা-উপন্যাসের ঐতিহ্যের সক্রিয়তা এখনও ভুলে যেতে পারিনে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

নূতন বই

লেডী রম্: পুলকেশ দে সরকার (প্রতিভা প্রকাশিকা, ৩৩, স্কট লেন, কলিকাতা)

'ফাঁসীর আশীর্বাদ' বলে একখানা বই লিখে আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে পুলকেশবাবু অতি তরুণ অবস্থাতেই চিন্তাশীলতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। যে যুগের ভাবপ্রবণতায় লেখকরা ঘন ঘন অবগাহন করছেন, পুলকেশ বাবু যুক্তির পথে তা পরিক্রমণ করলেন। স্থান কাল পাত্রর বিবেচনায় তা খুবই চমকপ্রদ। বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সভ্যতার সম্বন্ধেও তাঁর অনুসন্ধান অডিটর রিপোর্টের মতই আয় ব্যয় পরিকল্পনা সম্পর্কিত একটি সহজ খতিয়ান—এবং সংকটের উৎস সন্ধানে যে কোনো পাঠককেই ভাবিত করে তোলে। পরবর্তীকালে পুলকেশ বাবু আচরণবাদ নিয়ে বুদ্ধিজীবী মহলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেন। মনস্তত্ত্বের ছাত্রদের কাছে আচরণবাদে নতুন মূল্য নির্ধারণ করেন এবং বলা চলে সাহিত্যেও তিনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনেন। সাহিত্য ও সমাজনীতি সম্পর্কে তিনি বরাবরই অগ্রগামী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে আসচেন—ভগীরথের মত নব নব চিন্তাধারাকে তিনি আবাহন করে এনেছেন। তাঁর অতি আধুনিকতম পুস্তিকা 'ভাষাভিত্তিক পশ্চিমবঙ্গ' বিগত এক শ' বছর ধরে বাংলা বিভাগেরই ইতিহাস। বিভিন্ন দিকে পুলকেশ বাবুর চিন্তা পরিব্যাপ্ত হয়েছে, শুধু সাহিত্যিকের তকমা পরে তিনি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে বসে থাকেন নি।

সাহিত্যক্ষেত্রেও পুলকেশ বাবু একটি ক্ষীণ ধারাকে উজ্জীবিত করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। 'লেডী রম' একটি বিরল সাহিত্য প্রচেষ্টা, যা রম্যরচনার পর্য্যায়ে পড়ে না—রসরচনাতেও নয়। যাকে উনিশ শতাব্দীতে বলতো 'রঙ্গ সাহিত্য'। এবং উনিশ শতাব্দীর পরেই এ সাহিত্য প্রচেষ্টা একেবারে স্তিমিত হয়ে গেছে।

'লেডী রম' কয়েকটি নিটোল গল্পের সমষ্টি নয়—গল্পাতীত নায়ক নায়িকার আসন্ন অভিব্যক্তি একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে, যা পাঠকদের নতুন গল্পের প্রেরণা দেবে। এবং সে গল্প সুরাসারের তীব্রতা নিয়ে অন্তর্দাহের কারণ হবে। তাই 'লেডী রম' সম্পর্কে কথাশিল্পীদেরও ঔৎসুক্য থাকবার কথা—এ যেন বীজধান।

সমাজজীবনে যে বিয়োগান্ত ঘটনাবলী অহরহ ঘটছে তা কতকগুলি ব্যক্তিবিশেষের রম্য খেয়ালের মাশুল, এরা আজকের শুধু নয়, গতকালও ছিল, আগামীকালও যে তাদের হৃদয় পরিবর্তন হবে এ কথা জোর করে বলা চলে না। পুলকেশ বাবু সাংবাদিক জীবনে এ ধরণের লোকদের সংস্পর্শে এসেছেন, তাই তাদেরকে তাদের দুর্বলতা অহঙ্কার অভিমান সমেত তুলে ধরতে পেরেছেন, তাদের আচরণ বিচরণ পুলকেশবাবুর ভাষণে অবিকৃত এবং সংক্রমণশীল। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এ সব চরিত্র দুষ্প্রাপ্য নয়। যদি কেউ নিজেদের পরিচিত লোকদের পরিচয় শুধু মনে করেন তা হলে ভুল করবেন। সমাজের কতকগুলি অসুস্থ লক্ষণ বিশ্লেষণ করবার জন্যই লেখক কতকগুলি চরিত্রকে উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করেছেন। তাঁর এ চিন্তা বিক্ষিপ্ত নয়—যে ধারায় তিনি সমাজ সেবা তথা দেশ সেবা করে

আসচেন—তারই পরিণত প্রকাশ সাহিত্য-রচনায় পরিস্ফুট হয়েছে। পুলকেশ বাবুর কোনো কাজই স্বধর্মচ্যুত নয়। 'লেডী রম'ও 'ভাষাভিত্তিক পশ্চিমবঙ্গে'র মতো অনুপ্রাণিত।

'লেডী রম' এ বাংলা ভাষার অভিনব প্রয়োগ নৈপুণ্য দেখা যায়। আজ পর্য্যন্ত আর কেউ এ ভাবে ভাষার ব্যবহার করেন নি। জটিল বাক্য অনেক গুণবাচক উপবাক্যর সংযোগে বহু শব্দের ঝঙ্কার তুলে কল্পনাকে খরস্রোতে টেনে নিয়ে চলেছে। এক চিন্তা বহু চিন্তায় অনুরণিত হয়ে উঠেছে। এ ধরণের বাক্য বিন্যাস ইংরেজী ভাষায় প্রচলিত। বাংলাদেশে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও আবু সৈয়দ আইয়ুব গদ্য রচনায় জটিলবাক্য প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন বটে—পুলকেশবাবুর মত কৃতকার্য হয়েছেন বলে মনে করি না। 'লেডী রম' পড়তে পড়তে উইলিয়াম ফকনারের গল্প বলার ভঙ্গিটির কথা মনে হয়েছে। বাংলা ভাষায় এ রকমের ভঙ্গিটির প্রবর্তন করা প্রায় অসাধ্য সাধন। এ জন্যে সাহিত্যের ইতিহাসে পুলকেশ দে সরকারের নাম বিশেষ উল্লেখ্য।

পরিশেষে এ কথা বলতে চাই,—নিন্দুকের দল যদি 'লেডী রম' পড়ে আত্মশ্লাঘা অনুভব করে তবে পুলকেশবাবুর তাদের চরিত্র চিত্রণেরও প্রয়োজন আছে। কারণ চপলতাও নাকি রম্যরচনা।

অমল দত্ত

আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি—যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পূর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায়—'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পূর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌঁছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস
দুটাকা

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
গান্ধী-পরিকল্পনা
(অর্থনীতি বিষয়ক)
দু'টাকা

গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা
দু'টাকা

ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম
বারো আনা

শিক্ষার বাহন
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
রুশো

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
কার্ল মার্ক্স

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ডারুইন

সুবোধ ঘোষের
সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
বৌদ্ধধর্ম্ম
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
ধর্ম্মবিজয়ী অশোক
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা :

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ভারতীয় নারী ও সমাজ

গোপাল ভৌমিকের
সমাজ ও সাহিত্য

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
সমাজ ও বিজ্ঞান

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
ধর্ম্ম ও নীতি

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
সমাজ ও সংস্কৃতি

নারায়ণ চৌধুরীর
সঙ্গীত ও সমাজ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ

লুই ফিশারের
মহাজিজ্ঞাসা
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা

মিনু মাসানির
নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
মোসলেম রাজনীতি
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি
বার আনা

মিনু মাসানির
খাদ্য
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
বোম্বে পরিকল্পনা
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

PURVASA : REGD. NO. 1512 : JYAISHTHA—1361 B. S.

বাংলা কবিতা যা দিয়েছিলো, যা দিচ্ছে, যা দিতে পারে তার ইঙ্গিতমূলক সঙ্গীত শুনতে হলে একখণ্ড 'পদাবলী' আপনার চাই। আপনি বাংলা কবিতায় অনুরক্ত বলেই আমাদের অনুরোধ, একখণ্ড 'পদাবলী' সংগ্রহ করুন। বৈষ্ণব পদাবলী এ নয়। পার্থিব পুরুষোত্তমের সৌরভের সুর যেন এখানে ধরতে চেষ্টা করেছেন এ-শতকের একটি কবি-চিত্ত।

পদাবলী : রচয়িতা—সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

জীবনানন্দ দাশ বলছেন : "পদাবলী পড়লাম। বেশ ভালো লাগল ; খুব মৌলিক লেখা মনে হল ; আপনার আগেকার লেখার চেয়ে এ-কবিতাগুলো একেবারে বিভিন্ন। আপনার পাণ্ডিত্য, মনের বিস্তৃতি ও গভীরতা এসব রচনার নানাজায়গায়ই স্পষ্ট হয়ে আছে।"

পদাবলী : দাম—দু'টাকা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলছেন : "পদাবলী পেয়ে খুব ভালো লাগল। প্রায় প্রত্যেক কবিতাই রসোত্তীর্ণ তথা নিপুণ কলা-কৌশলের প্রতিমান। আপনার কাছে বাঙালী পাঠকের প্রত্যাশা বেড়েই যাচ্ছে... আমি আর কারো মধ্যে ওরকম ঐতিহ্য-সচেতন মনের পরিচয় পাইনি।"

পদাবলী

সুদৃশ্য প্রচ্ছদ—বোর্ড বাঁধাই—রয়েল সাইজ—ষাট পৃষ্ঠা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের

এখনকার লেখা অপ্রকাশিত ও প্রকাশিত কবিতার সঙ্কলনে নূতন বই

বনরাজিনীলা

ভাদ্রে প্রকাশিত হবে

প্রকাশক :

পূর্ব্বাশা লিমিটেড

৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

Printer & Publisher by Satya Prasanna Dutta, Purvasa Ltd., 54 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta.

পূর্বাশা

আষাঢ়

১৩৬১ বাংলা

॥ সপ্তদশ বর্ষ ॥

সম্পাদক : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি—যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পূর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায়—'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পূর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস
দুটাকা

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
গান্ধী-পরিকল্পনা
(অর্থনীতি বিষয়ক)
দু'টাকা

গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা
দু'টাকা

ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম
বারো আনা

শিক্ষার বাহন
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
রুশো

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
কার্ল মার্ক্স

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ডারুইন

সুবোধ ঘোষের
সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
বৌদ্ধধর্ম্ম
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
ধর্ম্মবিজয়ী অশোক
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা :

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ভারতীয় নারী ও সমাজ

গোপাল ভৌমিকের
সমাজ ও সাহিত্য

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
সমাজ ও বিজ্ঞান

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
ধর্ম্ম ও নীতি

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
সমাজ ও সংস্কৃতি

নারায়ণ চৌধুরীর
সঙ্গীত ও সমাজ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ

লুই ফিশারের
মহাজিজ্ঞাসা
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা

মিনু মাসানির
নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
মোসলেম রাজনীতি
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি
বার আনা

মিনু মাসানির
খাদ্য
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
বোম্বে পরিকল্পনা
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

লীলা মজুমদার

শ্রীমতী

শৈশবে শ্রীমতীর পিতার মৃত্যু হয়েছিল। এক দেবতুল্য আত্মীয় তাকে মানুষ করেছিলেন; তাঁর কাছে শ্রীমতী পেয়েছিল উদার শিক্ষা, বুকভরা সাহস আর ঘরভরা বই। এই কঠিন পৃথিবীতে যখন সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে; যখন তার হৃদয় হাহাকার করছে এক যুবকের প্রেমের আশায়—এমন সময় অকস্মাৎ আবির্ভাব হলো তার মায়ের। তার অনেককালের হারিয়ে যাওয়া মা, বিগতযৌবনা রূপসী এক অভিনেত্রী। ভাগ্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কী করে এই অসামান্যা মেয়েটির জীবন ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠলো—তারই আনন্দবেদনাময় কাহিনী 'শ্রীমতী'। ২।০

নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনের নির্বাচনে ১৩৬০ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ

সংবর্ত

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

'সংবর্ত' গ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ ও জীবনদর্শন দুই-ই সুপরিস্ফুট। তাঁর কাব্যভাবনায় 'উচ্ছ্বসিত স্বপ্নরচনা'র স্থান নেই; নির্বিচার নৈরাশ্যবাদও তাঁর মনঃপুত নয়। তাঁর কবিতা গভীর অনুশীলনে ও চিন্তায় সমৃদ্ধ। চিন্তার ঐশ্বর্যে যেমন, শব্দসম্পদেও তেমনি তাঁর তুলনাস্থল বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে দুর্লভ। ফলে তাঁর কাব্য বাঙালি পাঠকের সশ্রদ্ধ ও সশ্রম অনুশীলনের যোগ্য। দাম ২৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুইবাড়ি

পল্লীগ্রামে পাশাপাশি দুই বাড়ি। এ-বাড়ির ছেলে নিধিরাম মোক্তারী পাস করে মহকুমায় প্রথম যেবার প্র্যাকটিস করতে যায় সেইবারই বহু বছর পর পাশের বাড়িতে জজসাহেব লালবিহারীবাবু ছুটিতে এলেন ছেলেমেয়ে নিয়ে। নিধিরামের ইনি পিতৃবন্ধু। তাঁরই কিশোরী মেয়ে মঞ্জু দরিদ্র মোক্তার নিধিরামের জীবনে অভাবিত ভাবে ভালবাসার যে মর্মর জাগালো, কৈশোরের আলোয় ভরা সেই ভীরু ভালোবাসার কাহিনী এই 'দুইবাড়ি'। পল্লীবাঙলার লাবণ্যময় রচনা। দাম ২॥০

"একবার আমার টাকার বড় টানাটানি যাইতেছিল…"

আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে আজীবন শিবনাথ শাস্ত্রী দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন। সেই দরিদ্র জীবনের কোথাও কিছুমাত্র গ্লানি ছিল না। তাঁর 'আত্মচরিত'-এর একাংশে তিনি লিখছেন: "একবার আমার টাকার বড় টানাটানি যাইতেছিল। সেই মাসের শেষের দিকে ছেলেরা প্রসন্নময়ীর (স্ত্রী) চুল বাঁধিবার আয়নাখানা ভাঙিয়া ফেলিল। একদিন ব্রহ্মময়ী (বন্ধুপত্নী) অপরাহ্নে আমাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিয়া দেখেন, প্রসন্নময়ী জালার নিকট দাঁড়াইয়া মুখ দেখিতেছেন ও চুল বাঁধিতেছেন। ব্রহ্মময়ী দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও হেমের মা, ওকি। জলের জালার কাছে কি করছ?'"

প্রসন্নময়ী হাসিয়া বলিলেন "ওগো, আয়নাখানা ছেলেরা ভেঙে ফেলেছে ওঁর বড় টাকার টানাটানি যাচ্ছে, তাই ওঁকে জানাইনি। মাস গেলে কিনব ভেবে জালার জলে মুখ দেখে চুল বাঁধছি।"

শিবনাথের হৃদয়ে নির্মল নির্ঝরের মতো একটি সরসতার ধারা প্রবাহিত ছিল। সেই সরতার গুণে 'আত্মচরিত'-এর উপভোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই 'আত্মচরিত' শতবর্ষ পূর্বেকার বঙ্গসমাজের একটি নিখুঁত চিত্র। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেশ চৌধুরী প্রমুখ দেশীয় এবং আর্নল্ড টয়েনবি, জর্জ মুলার, ফ্রানসিস নিউম্যান, রেভারেণ্ড ষ্টপফোর্ড ব্রুক প্রমুখ বিদেশীয় মহাপুরুষদের প্রত্যেকের সঙ্গেই শাস্ত্রীমহাশয়ের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়েছিল। 'আত্মচরিত' উনিশ-শতকী দেশীয় ও বিদেশীয় নারী-পুরুষের চরিত্র-চিত্রশালাও।

বাঙলার সেই গৌরবের যুগ গত হয়েছে—যখন জলে হাওয়ায় জড়িয়েছিল মানুষ তৈরির উপাদান। দুঃখকে তাঁরা অবলীলাক্রমে অতিক্রম করতে পারতেন, দুঃসাধ্য-সাধনে স্বপ্ন দেখতে শঙ্কিত হতেন না, বৃহৎ এবং মহৎ আদর্শের জন্য সর্বস্ব পণ করতে পারতেন সহজেই। শিবনাথ

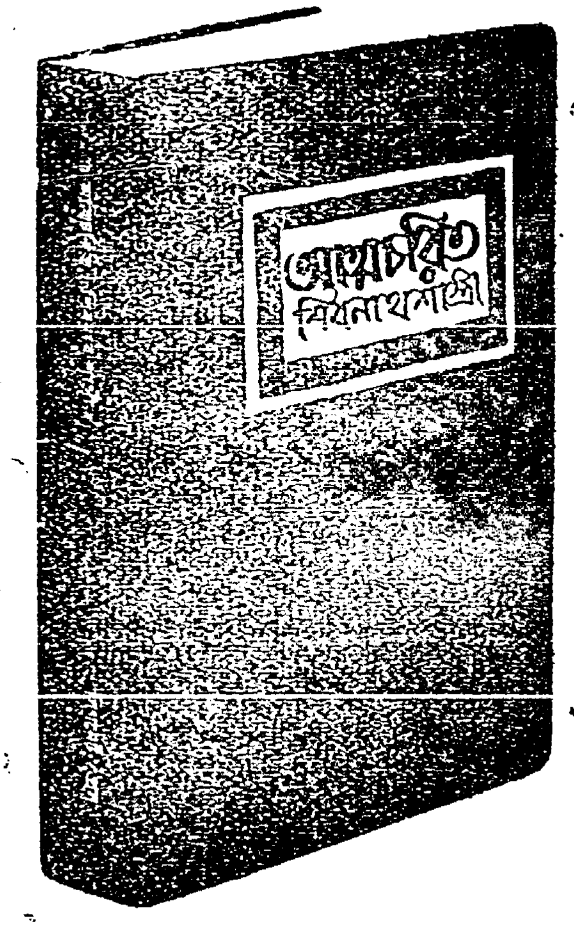

শাস্ত্রী ছিলেন এইকালের এক অসামান্য পুরুষ। সেই গৌরবময় যুগ এবং যুগস্রষ্টাদের আরেকবার নিবিড় সংসর্গ লাভ করা যায় তাঁর 'আত্মচরিত' এর পৃষ্ঠায়। সচিত্র দাম চার টাকা।

সিগনেট বুকশপ ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
১৪২।১ রাসবিহারী এভিনিউ

পুস্তিকাকারে ছাপানো পূর্ণ কলেবরে 'টুকরো কথা' সিগনেটের যে-কোনো দোকানে চাইলেই পাওয়া যাবে

COLOUR ILUSTRATION

আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পুর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি—যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পুর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায়—'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পুর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস
দুটাকা

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
গান্ধী-পরিকল্পনা
(অর্থনীতি বিষয়ক)
দু'টাকা

গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা
দু'টাকা

ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম
বারো আনা

শিক্ষার বাহন
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
রুশো

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
কার্ল মার্ক্স

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ডারুইন

সুবোধ ঘোষের
সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
বৌদ্ধধর্ম্ম
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
ধর্ম্মবিজয়ী অশোক
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা:

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ভারতীয় নারী ও সমাজ

গোপাল ভৌমিকের
সমাজ ও সাহিত্য

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
সমাজ ও বিজ্ঞান

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
ধর্ম্ম ও নীতি

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
সমাজ ও সংস্কৃতি

নারায়ণ চৌধুরীর
সঙ্গীত ও সমাজ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ

লুই ফিশারের
মহাজিজ্ঞাসা
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা

মিনু মাসানির
নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
মোসলেম রাজনীতি
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি
বার আনা

মিনু মাসানির
খাদ্য
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
বোম্বে পরিকল্পনা
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

লীলা মজুমদার
শ্রীমতী

শৈশবে শ্রীমতীর পিতার মৃত্যু হয়েছিল। এক দেবতুল্য আত্মীয় তাকে মানুষ করেছিলেন; তাঁর কাছে শ্রীমতী পেয়েছিল উদার শিক্ষা, বুকভরা সাহস আর ঘরভরা বই। এই কঠিন পৃথিবীতে যখন সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে; যখন তার হৃদয় হাহাকার করছে এক যুবকের প্রেমের আশায়—এমন সময় অকস্মাৎ আবির্ভাব হলো তার মায়ের। তার অনেককালের হারিয়ে যাওয়া মা, বিগতযৌবনা রূপসী এক অভিনেত্রী। ভাগ্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কী করে এই অসামান্যা মেয়েটির জীবন ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠলো—তা'রই আনন্দবেদনাময় কাহিনী 'শ্রীমতী'। ২।॰

নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনের নির্বাচনে ১৩৬০ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
সংবর্ত
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

'সংবর্ত' গ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ ও জীবনদর্শন দুই-ই সুপরিস্ফুট। তাঁর কাব্যভাবনায় 'উচ্ছ্বসিত স্বপ্নরচনা'র স্থান নেই; নির্বিচার নৈরাশ্যবাদও তাঁর মনঃপুত নয়। তাঁর কবিতা গভীর অনুশীলনে ও চিন্তায় সমৃদ্ধ। চিন্তার ঐশ্বর্যে যেমন, শব্দসম্পদেও তেমনি তাঁর তুলনাস্থল বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে দুর্লভ। ফলে তাঁর কাব্য বাঙালি পাঠকের সশ্রদ্ধ ও সশ্রম অনুশীলনের যোগ্য। দাম ২৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
দুইবাড়ি

পল্লীগ্রামে পাশাপাশি দুই বাড়ি। এ-বাড়ির ছেলে নিধিরাম মোক্তারী পাস করে মহকুমায় প্রথম যেবার প্র্যাকটিস করতে যায় সেইবারই বহু বছর পর পাশের বাড়িতে জজসাহেব লালবিহারীবাবু ছুটিতে এলেন ছেলেমেয়ে নিয়ে। নিধিরামের ইনি পিতৃবন্ধু। তাঁরই কিশোরী মেয়ে মঞ্জু দরিদ্র মোক্তার নিধিরামের জীবনে অভাবিত ভাবে ভালবাসার যে মর্মর জাগালো, কৈশোরের আলোয় ভরা সেই ভীরু ভালোবাসার কাহিনী এই 'দুইবাড়ি'। পল্লীবাঙলার লাবণ্যময় রচনা। দাম ২॥০

"একবার আমার টাকার বড় টানাটানি যাইতেছিল..."

আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে আজীবন শিবনাথ শাস্ত্রী দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন। সেই দরিদ্র জীবনের কোথাও কিছুমাত্র গ্লানি ছিল না। তাঁর 'আত্মচরিত'-এর একাংশে তিনি লিখছেন: "একবার আমার টাকার বড় টানাটানি যাইতেছিল। সেই মাসের শেষের দিকে ছেলেরা প্রসন্নময়ীর (স্ত্রী) চুল বাঁধিবার আয়নাখানা ভাঙিয়া ফেলিল। একদিন ব্রহ্মময়ী (বন্ধুপত্নী) অপরাহ্নে আমাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিয়া দেখেন, প্রসন্নময়ী জালার নিকট দাঁড়াইয়া মুখ দেখিতেছেন ও চুল বাঁধিতেছেন। ব্রহ্মময়ী দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও হেমের মা, ওকি। জলের জালার কাছে কি করছ?"

প্রসন্নময়ী হাসিয়া বলিলেন "ওগো, আয়নাখানা ছেলেরা ভেঙে ফেলেছে ওঁর বড় টাকার টানাটানি যাচ্ছে, তাই ওঁকে জানাইনি। মাস গেলে কিনব ভেবে জালার জলে মুখ দেখে চুল বাঁধছি।"

শিবনাথের হৃদয়ে নির্মল নির্ঝরের মতো একটি সরসতার ধারা প্রবাহিত ছিল। সেই সরতার গুণে 'আত্মচরিত'-এর উপভোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই 'আত্মচরিত' শতবর্ষ পূর্বেকার বঙ্গসমাজের একটি নিখুঁত চিত্র। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেশ চৌধুরী প্রমুখ দেশীয় এবং আন'ল্ড টয়েনবি, ম্যক্স মুলার, ফ্রান্সিস নিউম্যান, রেভারেণ্ড ষ্টপফোর্ড ব্রুক প্রমুখ বিদেশীয় মহাপুরুষদের প্রত্যেকের সঙ্গেই শাস্ত্রীমহাশয়ের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়েছিল। 'আত্মচরিত' উনিশ-শতকী দেশীয় ও বিদেশীয় নারী-পুরুষের চরিত্র-চিত্রশালাও।

বাঙলার সেই গৌরবের যুগ গত হয়েছে—যখন জলে হাওয়ায় জড়িয়েছিল মানুষ তৈরির উপাদান। দুঃখকে তাঁরা অবলীলাক্রমে অতিক্রম করতে পারতেন, দুঃসাধ্য-সাধনে স্বপ্ন দেখতে শঙ্কিত হতেন না, বৃহৎ এবং মহৎ আদর্শের জন্য সর্বস্ব পণ করতে পারতেন সহজেই। শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন এইকালের এক অসামান্য পুরুষ। সেই গৌরবময় যুগ এবং যুগস্রষ্টাদের আরেকবার নিবিড় সংসর্গ লাভ করা যায় তাঁর 'আত্মচরিত' এর পৃষ্ঠায়। সচিত্র দাম চার টাকা।

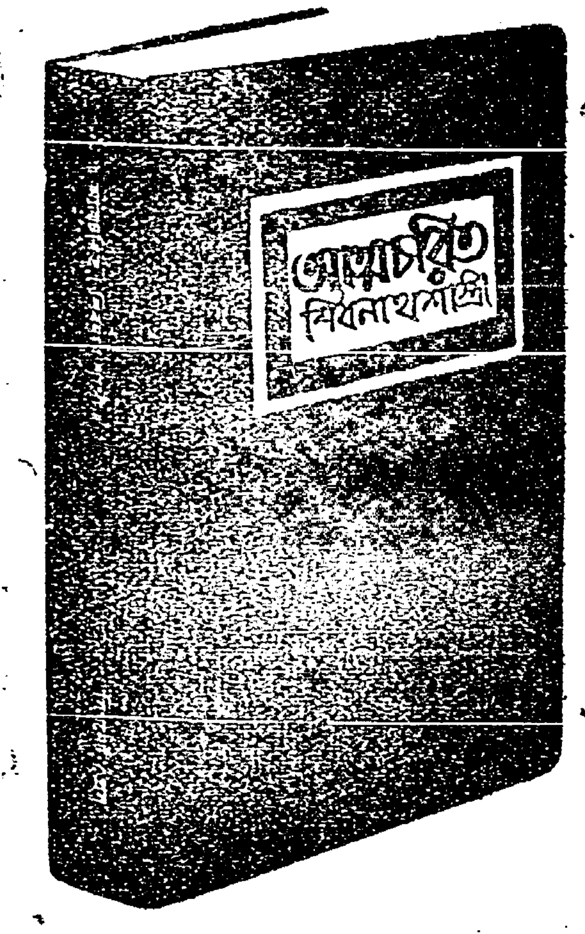

সিগনেট বুকশপ ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
১৪২।১ রাসবিহারী এভিনিউ

পুস্তিকাকারে ছাপানো পূর্ণ কলেবরে 'টুকরো কথা' সিগনেটের যে-কোনো দোকানে চাইলেই পাওয়া যাবে

COLOUR ILUSTRATION

পূর্ব্বাশা

প্রতিসংখ্যা—আট আনা

আষাঢ়—১৩৬১

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
নীতি-বিচার : প্রবাসজীবন চৌধুরী	... ১২৭
কবিতাগুচ্ছ :	
নিরস্ত নির্ঝর : বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়	... ১৩৫
অন্তরাশ্রী : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	... ১৩৬
পাঁচালি : অনিল বিশ্বাস	... ১৩৭
রূপকথা : বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়	... ১৩৮
মাঠ : বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত	... ১৩৯
ছায়াচিত্র : দিলীপকুমার সেন	... ১৪০
নিরালোক : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য	... ১৪১
গড় শ্রীখণ্ড : অমিয়ভূষণ মজুমদার	... ১৪২
অপাপবিদ্ধ : অমল দত্ত	... ১৫৫
ছায়াগীতা : অশেষ চট্টোপাধ্যায়	... ১৬৮
ভারত-সংস্কৃতির-সংক্ষিপ্ত প্রকাশ : ইন্দ্রজিত	... ১৭৬
সাংস্কৃতিকী : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য	... ১৮০
নূতন বই :	... ১৮৪

প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

মনোলীনা— ২॥০

সেতু বন্ধ— ২॥০

সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲

বিচিত্র হৃদয়— ২৲

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯

খাদ্যপ্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

সুপার-নিও-কড

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ

কলিকাতা-১৭

আমি যখন ছোট ছিলাম

আমার মা বরাবর

পিউরিটি বার্লি

খাওয়াতেন

সেরা শস্য থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরি তো বটেই, তা ছাড়া ১৫১-বছরব্যাপী পেষাই-এর অভিজ্ঞতার দরুন পিউরিটি বার্লি চমৎকার অথচ দামে সস্তা।

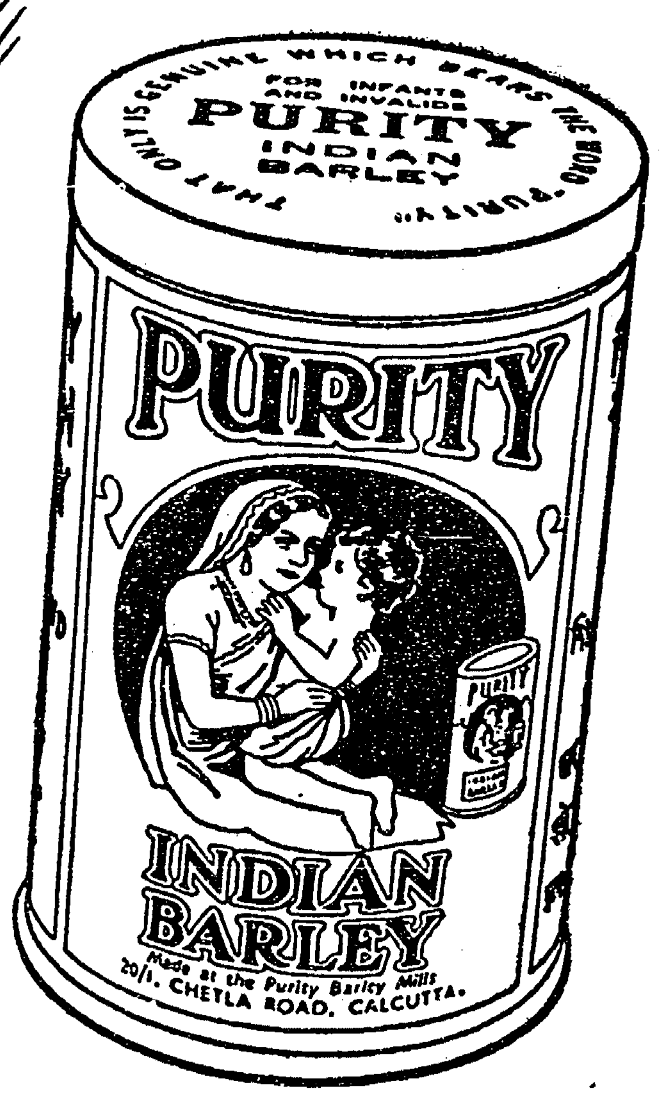

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড পোস্ট বক্স ৬৬৪, কলিকাতা-১

APBX 12 BEN

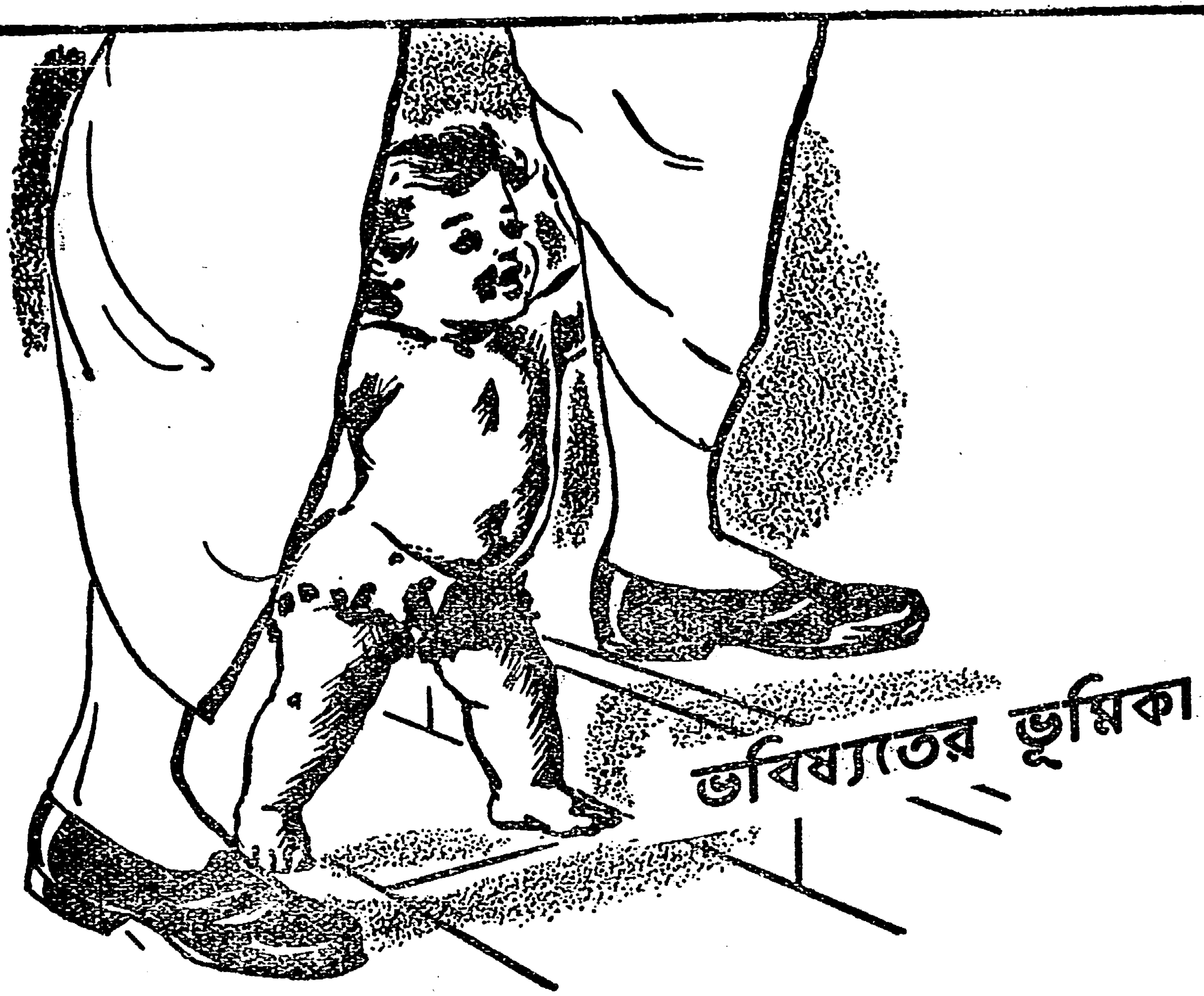

সমাজ-উন্নয়ন সংস্থায় নানাদিক থেকেই পল্লীর গতানুগতিক জীবন ধারার আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। হাজার হাজার বিঘা পতিত জমি আবাদের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। গবাদি পশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি, রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ এবং স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপনের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। পল্লী-অঞ্চল আজ জাতীয়-জীবনের অঙ্গ বলেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রতি আটটি গ্রামের মধ্যে অন্তত একটির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করে তাকে জাতীয় সমৃদ্ধির ভবিষ্যৎ পটভূমিকা রচনার উপযোগী করে তোলা হচ্ছে।

চা

কর্ম-চঞ্চলতার সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয়, কেননা দেহ-মনকে সহজে সতেজ ও সরস ক'রে তুলতে এই পানীয়টি সত্যি অতুলনীয়।

টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

PSTB 120

শ্রীযুক্ত রথেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—অঙ্কিত 'বাউল'

পূর্ব্বাশা
আষাঢ়—১৩৬১

নীতি-বিচার

প্রবাসজীবন চৌধুরী

॥ ১ ॥

নীতি বিচারের গোড়ার কথা হলো—নীতির কোনো বাস্তবতা আছে কি না। অর্থাৎ উহা ভালো-মন্দ আত্ম-নিরপেক্ষ ব্যাপার না আত্মগত মাত্র? নৈতিক অবনতি আর ইচ্ছাশক্তি ও ব্যবহার-রীতিকে ভেদ কোরে বুদ্ধি বিবেচনা করে, তখন নীতির বিষয়-ধর্মিতা বা বাস্তব-নিরপেক্ষতা অস্বীকৃত হয়। এমন হয়েছিলো গ্রীসে সোফিস্ট্‌দের যুগে—এবং যে-কোনো দেশের অধঃপতনের সময়েই—যখন মানুষের শ্রেয়োবোধ অন্ধকার কোরে দাঁড়ায় তার প্রেয়োবোধ। আর এমন হয়েছে আজকের দিনের বিশ্ব-জগতে—বিগত দুই ও আগত এক মহাযুদ্ধের মধ্যকালীন সন্ত্রাস-ঘন সময়ে। এখন ভূত ভবিষ্যত অস্পষ্ট—আত্মকেন্দ্রিক একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের বাহিরে সব প্রীতি-মমতা। মৃত্যুর কৃষ্ণা ছায়ায় দেশ-কালের গণ্ডী সংকুচিত হয়ে ব্যক্তির চারিপাশে এসে স্তব্ধ হ'য়ে আছে। মানুষের মনঃ-সংযোগের পরিসর কমে এসে কেবল নিজেকে ঘিরে ঘুরে মরছে। অর্থাৎ "চাচা আপ্‌না বাঁচা" বা "আপ্‌নি বাঁচলে বাপের নাম"—এইটেই বেদবাক্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর যা দেখা যায়—অপরের জন্য প্রভূত মাথা-ব্যথা—এক দেশের অন্য দেশকে আর্থিক বা সামরিক সাহায্য-দান, বিস্তর বক্তৃতা ও শুভেচ্ছা, বহু দূত প্রেরণ ও সাংস্কৃতিক সন্নিকর্ষের নানা আয়োজন—বৈঠক হ'তে বিবাহ পর্যন্ত। এ সব বাহ্য অন্তঃসারহীন ও আত্মকেন্দ্রিকতার আচ্ছাদন-মাত্র। কিম্বা দল কোরে আত্মকেন্দ্রিকতার নানান কলা-কৌশল। মোটকথা, ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর (জাতি বা শ্রেণীর) স্বার্থে যা সাময়িক ভাবে উপযোগী তার বাহিরে ভালো কিছু হতে হলে, ভালোমন্দ ও উচিত-অনুচিতের কোনো সর্বসাধারণ আবশ্যিক মাপকাঠি থাকেনা। এই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত নীতিই আজকের দিনে আরাধিত। শুধু ভারত

হয়তো এই দিকের প্রতিবাদ করে—কারণ তার ইতিহাসের ধারা একটু বিশেষ প্রকারের এবং তার বর্তমান স্বাধীন সত্তার পিছনে রয়েছে গত এক শতাব্দীর আদর্শবাদ—অনেক আত্মত্যাগ আর রামমোহন, বিবেকানন্দ, তিলক, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। বিগত ও আগত মহাযুদ্ধের কোনোটিই ভারতকে ঠিক স্পর্শ করেনি। তার নব জন্মলাভ ও আত্মপ্রত্যয় হচ্ছে এই মহাযুদ্ধের যুগেই এবং কিছুটা এই যুদ্ধের পরোক্ষ পরিণামেই। কিন্তু যুদ্ধের যে কালিমা—বিশ্বমানব-প্রেমকে যা কলংকিত করে তা ঠিক ভারতের স্বাভাবিক আত্মা-সুলভ আত্মীয়তা-বোধকে নষ্ট কোরতে পারেনি। সে আজ তার কাছের বা দূরের কোনো জাতিকেই শত্রু বলে সন্দেহ বা ঘৃণা কোরতে পারছে না—কারুর সঙ্গে মিলে অন্য কারুর বিপক্ষে দল পাকাতে চাইছে না। স্বার্থের যে বিকারাবস্থা সকল জাতিকেই পেয়ে বসেছে—যার তাড়নায় তারা কেবলই যুদ্ধের জল্পনা-কল্পনা এবং মন্ত্রণা ইত্যাদিও নানান্ হঠোক্তি ও শক্তি-পরিদর্শনীতে ব্যস্ত—অর্থাৎ সোজা কথায় "তাল ঠুক্‌ছে,"—সে-রোগ এখনও ভারতে সংক্রামিত হয়নি। যাই হোক জাতি হিসাবে ভারত কিছুটা নৈতিক সুস্থতার পরিচয় দিলেও—ভারতবাসী যে ব্যক্তিগত ভাবে তার আদর্শে অধিষ্ঠিত—তা' বলা যায় না। এখানে যে স্বৈরাচার চলছে তার প্রমাণ আমরা উঠতে বসতে পাই এবং এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক অল্প-শিক্ষিত ব্যক্তি যে ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়ে বসেছেন তা' কোনও উচ্চ আদালতের বিচারক বা উচ্চ বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের আজীবন চাকুরীর দ্বারাও দুষ্প্রাপ্য। সর্ব্বত্র এক মনোভাবের পরিচায়ক—যার বুলি হচ্ছে ভালোমন্দের বিচার-নিরীক্ষা হয় না, সর্বজনীন ঔচিত্য বা ন্যায় বলে কিছু নেই। যখন যে-সূত্রে কাজ হবে তখনকার মতো সেই ভালো। বিত্তহীনদের পক্ষে বিত্তের সমান ভাগ-বণ্টনের সূত্রই লাভজনক সুতরাং ভালো। অতএব নীতি-বিচার একটি বিশিষ্ট ও বিশুদ্ধ দর্শন না হয়ে পর্যবসিত হয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ-সম্পর্কিত একটি ফলিত বিজ্ঞানে। নীতি-বিচারের পূর্ব-প্রতিজ্ঞাই হচ্ছে নীতির বিষয়-ধর্মিতা—যার অস্বীকৃতিতে এই সাধনা-বিশেষের লয় প্রাপ্তি ঘটে।

নীতি-রাজ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের আত্মসংস্থাপন বা নীতি-বিষয়ে আপেক্ষিক-বাদের আগমনে নীতি-বিচারের মূল-উৎপাটন এবং তার পুনঃ-আরোপ হয় ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সর্বজনীন শাশ্বত নীতি-বিশ্বাসের প্রবর্তনা হ'তেই। গ্রীসে সোফিস্ট্‌দের পরে এলেন সক্রেটিস ও প্লেটো। বিশ্বে আধুনিক যুগেও আসবেন হয়তো তাঁদেরই মতো কোনো মহাপুরুষ—যিনি পুনরুদ্ধার কোরবেন নীতিবিচারকে তার ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-স্বার্থ-বিজ্ঞান-রূপ সমাধি-স্তূপ হ'তে। তারা দেবেন ভালো-মন্দ প্রতীয়মানের অতীত ভালোমন্দের সংজ্ঞা—সাময়িক প্রেয়-অপ্রেয়-নিরপেক্ষ শ্রেয়-আশ্রয়-বোধ।

॥ ২ ॥

এই সর্বসাধারণ ভালো-মন্দের কোনো ধারণা বা আদর্শ না-পাওয়া পর্যন্ত মানুষের সত্য মুক্তি নেই। কারণ বাস্তব-বাদে ও কার্যকারিতায় বিশ্বাসী মানুষ নীতিকে নিজের ব্যক্তিগত জৈবিক স্বার্থসিদ্ধির উপায় রূপে দেখে বেশীদিন স্থির থাকতে পারে না। কারণ স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত সুনিশ্চিত

এবং তখনই প্রশ্ন ওঠে ঔচিত্যের। যা কোরলে কেবলমাত্র আমার উপকার হয় তাহাই প্রকৃত ভালো কিনা এ সন্দেহ জাগে, কারণ পরের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। এবং যাহা কেবল ব্যক্তিগত ভাবে ভালো তাহার মর্যাদাও অল্প, কারণ ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির মান উচ্চে—বিশেষের চেয়ে সামান্যের। তাই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-স্বার্থে সত্যকে সংকীর্ণ কোরেই পাই এবং মানুষ চায় তার জ্ঞানে ও কর্মে সত্যকে বড়ো করে পেতে। যা তার নিজের কাছেই সত্য—সকলের কাছে নয়—তা তাকে লজ্জাই দেয়। সে জানে সত্য সর্বজন-স্বীকৃত এবং ব্যক্তিগত গোষ্ঠীগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অতীত। সত্য কোনও মতবাদের অপেক্ষা রাখে না—কাহারও বিশেষ উপকারেও লাগে না। যাহা ন্যায্য—তাহা সত্যই কর্তব্য—সুতরাং তাহা কাহারও মতামত, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, উপকার-অনুপকারের সহিত জড়িত না হয়েই নিজের সত্তায় স্বপ্রতিষ্ঠিত ও স্বপ্রকাশ। মানুষ যখনই নিজের ক্ষুদ্র অন্ধ সংস্কার ও স্বার্থবুদ্ধির গণ্ডী কাটিয়ে যথার্থ জ্ঞানের রাজ্যে অগ্রসর হয়েচে—তখন এই সর্বজনীন সত্যকে স্বয়ংসিদ্ধরূপেই পেয়েছে। কর্মের জগতেও সে তার কর্তব্যকে এমনই স্বতঃসিদ্ধ ভাবে জেনেচে। অর্থাৎ সত্যের পরিপন্থী আমাদের জৈবিক বৃত্তিগুলি। এরা বুদ্ধিকে বেধে রাখে আপাত-উপযোগী মত ও কার্যে। এইসব বৃত্তির বন্ধন হ'তে ক্রমমুক্তিই সত্যভূমিতে আগমনের উপায়। সত্য সর্বসাধারণের, সত্য নির্বিশেষ ও সত্য অব্যবহার্য। সুতরাং সত্যনিষ্ঠা মানুষকে সংকীর্ণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-চেতনা হ'তে নিয়ে যায় বৃহৎ বিশ্ব-মানব-চিত্ত-ভূমিতে। আর এইতেই তার প্রকৃত মুক্তি। আত্মকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও প্রযোজ্য যে ভালোমন্দ সত্যাসত্য—সে তো বিশেষ ও সাময়িক মাত্র; এতো তার মনগড়া পদার্থ—তার মনে-হওয়ার ও তার আপাত-কার্যোদ্ধারের ব্যাপার। সত্য অর্থেই বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান, ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বিষয়-নিশ্চয়তা। যেহেতু এই সত্যের আবেদন আসে মানুষের চিত্তে সে ছুটে যায় তার ব্যক্তিস্বার্থ ও সকল সংস্কার ফেলে। তাই মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার জৈবিক বৃত্তিসমূহ দিয়ে নয়—ধন-উপাদন-বণ্টন ব্যাপারে তার স্থান-গ্রহণের বিশেষত্ব দিয়েও নয় বরং তার এই আত্মভোলা সাধনা দিয়েই হয় বিশ্বমানব-চিত্তের সহিত একাত্মবোধের সাধনা। ব্যক্তি নিরপেক্ষ সত্য এই বিশ্বমানব-চিত্তেই অধিষ্ঠিত সুতরাং সত্যানুসন্ধান-অর্থেই মানুষের এই বৃহত্তর চিত্তভূমিতে অবতীর্ণ হবার প্রয়াস। মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করে সর্বমানবের সহিত ঐক্যসাধনে—তার দৈহিক ও মানসিক পারস্পরিক বিচ্ছেদকে তার "তটস্থ লক্ষণ" ও তার চিত্ত বা আত্মাগত একতাকে তার "স্বরূপ লক্ষণ" প্রতিপন্ন করায়। মানুষের পরিচয় তার সম্পূর্ণতায়, অখণ্ডতায়। তার কাজ তাই মানুষের সঙ্গে যোগ-সাধনায়—যা সম্পন্ন হয় তার জ্ঞান, কর্ম ও শিল্পের মাধ্যমে—যেখানে সে নিজের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ধারণাগুলিকে অতিক্রম কোরে উত্তীর্ণ হয় সর্বজনীন সত্যে, শিবে ও সুন্দরে। মানুষের কাজ তার সত্য পরিচয়কে প্রকাশ করা—সে প্রকৃত যা তা-ই উপলব্ধি করা ও প্রতিপন্ন করা। তাই তার জ্ঞানে, কর্মে ও শিল্পে একদিকে যেমন তার বহির্জগৎ ও জীবনের সহিত পরিচিত হবার সাধনা আবিষ্কারের প্রয়াস, অপরদিকে তার সর্বসাধারণ ধারণা-আবিষ্কারের প্রয়াস ও তাদের মাধ্যমে সর্বসাধারণ বা বিশ্বমানব-চিত্তকে স্পর্শ-করার সাধনা দেখি। জ্ঞানী, কর্মী ও শিল্পী চায় মিলন, সর্বাঙ্গীন ঐক্যবোধ তার আপাত-অপর পারিপার্শ্বিকের সাথে। তার আনন্দ এই দ্বৈত মিলনে—তার এই আত্মপরিচয়ে, আত্মপ্রসারে। কারণ যা-কিছু সে উপলব্ধিতে পায় ও যে-কোনো মানব-

চিত্তের সঙ্গে সে একাত্মতা বোধ করে তার সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের সমানুভূতিতে—সে সবই মূলতঃ তারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, কেবল পূর্বে তাহা স্পষ্ট হয়নি তার জৈবিক সত্তার দাবী-দাওয়া আচ্ছন্ন ছিলো বলে'। এ তার পরিচিত বস্তুরই নব-পরিচয়, নিজস্ব সম্পত্তিরই পুনরাবিষ্কার। এইরূপই তার মনে হয় এবং এইটাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ যার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই—তার জ্ঞান কেমন কোরে হয় এবং যে-মানস আমার ব্যক্তি-মানসের নিতান্তই অপর তার প্রতি আমার কোনো আকর্ষণের হেতুই বা কী? অর্থাৎ জ্ঞানের, কর্মের ও সৌন্দর্যানুভূতির বিষয় আমার বিশেষ ব্যক্তির অপেক্ষা না রাখলেও তাহা একেবারে আগন্তুক হতে পারে না। সুতরাং মোট কথা দাঁড়ায় এই যে এইসকল সাধনায় আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম কোরে একটি মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হই,—যে ব্যক্তিত্ব আমাদের মধ্যে পুর্ব হ'তেই অবস্থিত, শুধু তার উপলব্ধিটুকু হয়নি। এসব অত্যন্ত গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কথা বলে উড়িয়ে দেবার মনোবৃত্তি তাদেরই হবে যারা কোনো বিশেষ কারণে সত্যের সম্মুখীন হ'তে অপারগ। আধুনিককালে অনেক দার্শনিক মতবাদ সত্যকে এইভাবে অস্বীকার কোরেই আরম্ভ হয়েছে। সত্যের সংজ্ঞাকে কোনো বিশেষ জৈবিক সূত্রের দ্বারা নির্ধারিত কোরেই তারা দর্শনে অগ্রসর হয়। যেমন সত্য তাই—যা সংবেদনা বা প্রত্যক্ষণের দ্বারা পরীক্ষিত বা যা মানুষের কার্যসিদ্ধির উপযোগী। কিন্তু এইভাবে সত্যকে গোড়া হ'তেই গণ্ডীবদ্ধ কোরে যে-দর্শন অগ্রসর হয় তার সত্যাসত্যের যথার্থ বিচার সে-দর্শনে অসম্ভব। আমাদের জৈবিক সুখ-সুবিধার পক্ষে কোনো অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব, যেমন বিশ্বমানব-চিত্তভূমি ও বিশ্বপ্রেম ইত্যাদি, অনুপযোগী ও অবাস্তর হতে পারে—কিন্তু তাহলে আধুনিক দর্শন-বিচারকালে—যেমন মাক্‌র্স-বাদ, নিশ্চয়বাদ (Positivism) কার্যকারিতাবাদ (Pragmatism)—আমাদের একথা স্পষ্ট কোরে নিতে হবে যে-সত্তার বিচারে অর্থাৎ দর্শনে আমাদের জৈবিক-ধর্ম কতোখানি প্রভাব বিস্তার কোরতে পারে। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানে, কর্তব্য-কর্মে ও শিল্পসৃষ্টিতে আমাদের স্থূল ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কামনা-বাসনাময় দেহমনের হস্তক্ষেপ কতোখানি গ্রাহ্য হবে তাহা স্থির করা প্রয়োজন। আমরা যে দেহমনের আশ্রয়াধীন এই তথ্যটি কি আমাদের দর্শন আর সাধনাগুলিকে শাসন কোরবে?

॥ ৩ ॥

নীতি-দর্শনে ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্যের সন্ধান বারেবারে নানারূপে স্বার্থ ও সংকীর্ণতার আবিলতায় ব্যাহত হলেও তাহা কখনও নিশ্চল হয়ে যায়নি। আজকের দিনেও এ-সন্ধান চলছেই। মানুষের অতি দুর্দিনেও তার আত্মিক ধর্ম একেবারে অন্তর্হিত হয় না। স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরও মনে কোথাও না কোথাও বাজে তার এই সত্যকে দূরে ঠেলে রাখার বেদনা—তার সুপ্ত চেতনায় সঞ্চিত হয় আপনাকে অপর হ'তে বিচ্ছিন্ন করার আত্মনিগ্রহ—যা প্রকাশ্যে প্রতিভাত হয় আত্মসংস্থাপন ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আত্মপ্রসাদে। মানুষ শত দুর্যোগেও তার মূল ধর্মকে অতিক্রম কোরতে পারে না। যা কিছু তার অধঃপতন ঘটে তা' তার স্বরূপকে আচ্ছাদন করে মাত্র—নষ্ট কোরতে পারে না। সব পতন ও পাপই

মায়িক ও সাময়িক এবং সবেরই শেষ আছে—সব সমাধি-স্তূপ হতেই বার হয়ে আসে সেই অবিনশ্বর আত্মা—যার ধর্ম আত্মীয়তা-করা ও সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করা। এ বিশ্বাস মানুষের প্রায় সকল ধর্মেই পাওয়া যায় তাই তারা আশার আলোয় উদ্ভাসিত মানব-প্রেমে মধুর প্রায় সকল ধর্মপ্রবর্তক মহামানবই মানুষের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন কিন্তু সকলেই মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে আস্থাবান্ ছিলেন, কারণ সকলেই মানুষকে স্বরূপতঃ ঈশ্বরেরই অংশ-জ্ঞান করতেন। যাই হোক এঁদের বা এঁদের প্রবর্তিত ধর্মের দোহাই দিয়ে এই নব্যযুগে মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে বিশ্বাস আনতে যাওয়া বৃথা। কিন্তু তাই বলেই মানুষের এ-প্রকৃতি মিথ্যা হয়ে যায় না। মানুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপের প্রধান পরিচায়ক ইতিহাসে তার পুনঃপুনঃ স্বার্থবুদ্ধির সংকীর্ণতা হ'তে নিষ্কৃতি,—তার জ্ঞানে, কর্মে ও শিল্পে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নৈরাচার হ'তে বারেবারে সমষ্টিগত শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্যে মুক্তিলাভ। নীতি-বিচারে যাকে কর্তব্য-কর্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞানকাণ্ড বলা যায়—এই আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ সেখানে কেমন করে হয় তাই আপাততঃ দেখা যাক।

নীতি যে আত্মগত সুখ-সুবিধার ব্যাপার নয় তাহা স্বাভাবিক মানুষের কাছে স্বতঃসিদ্ধ রূপেই প্রতিভাত হয়। সন্দেহের অবকাশ আনে তার স্বার্থান্ধতা। তখনই প্রয়োজন হয় তার বুদ্ধির বা যুক্তির। এই বুদ্ধি কিন্তু তাকে ভুল পথেও নিয়ে যায় যদি তার লক্ষ্য সত্য না হয়ে তার জৈবিক স্বার্থই হয়। কিন্তু বুদ্ধি সাধারণতঃ সত্যনিষ্ঠই হয়—অবশ্য যদি না মানুষের স্বার্থপরতা বা লোভের মাত্রাধিক্য-বশতঃ তার বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে থাকে। কিন্তু সেই নিদারুণ অবস্থাও সাময়িক—যেমন মানুষ তার আদিম বন্যাবস্থা হ'তে ক্রমশঃ নৈতিক সভ্যতার শিখরে উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছে, কারণ সে স্বরূপতঃ সভ্য, তেমনি সে বুদ্ধিভ্রংশতা ও মূঢ়াবস্থা হ'তে মুক্তিলাভ করে বুদ্ধির দীপ্তিতে। সে সম্ভাবনা না থাকলে আমাদের সব যুক্তি, তর্ক, ব্যাখ্যা, উপদেশ অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই বুদ্ধি যখন সুস্থাবস্থায় থাকে তখন তার যোগ থাকে মানুষের চিত্তভূমির তলদেশে অবস্থিত অস্পষ্ট সত্যের সাথে। তাই সে যখন তৎপর হয় সত্যানুসন্ধানে, সে ডুব দেয় এই চিত্তের গভীরে আর খুঁজে বার করে এই সত্যকে আর তুলে ধরে তাকে প্রকাশ্যে। জ্ঞানবস্তু আগন্তুক হ'তে পারে না—জ্ঞান লুপ্ত বস্তুর পুনরুদ্ধার বা বিস্মৃত পদার্থের স্মৃতিমাত্র। বুদ্ধি যে সত্যকে পেয়েছে, অন্য কিছুকে নয়, তার প্রমাণ বুদ্ধির এই জ্ঞানবস্তুর প্রত্যভিজ্ঞানের বোধ। এ ছাড়া সত্যের কোনো প্রমাণ নেই। কারণ বুদ্ধি বলাতে যদি ন্যায়-সম্মত যুক্তি বোঝায় তো এই যুক্তির নিজস্ব কোনও প্রামাণিকতা নেই। তার দৌড় প্রতিজ্ঞা হ'তে প্রতিজ্ঞায়, ন্যায়ের নিয়মে—সে কেবল বলতে পারে কোন প্রতিজ্ঞা কার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে বা করে না—সে তাদের সত্য মিথ্যার কথা বলে না। যদি পুর্ব প্রতিজ্ঞা সত্য হয় তাহলে তার অনুবর্তী প্রতিজ্ঞাও সত্য হবে, নতুবা নয়। কিন্তু এই পুর্ব প্রতিজ্ঞার সত্যাসত্য স্থিরীকৃত কোরবে কে? বিশুদ্ধ যুক্তি না স্বতঃজ্ঞান বা প্রজ্ঞা-অধিষ্ঠিত বুদ্ধি?

এই বুদ্ধি যখন নীতি-বিচারের এই গুরুতর প্রশ্নটির সম্মুখীন হয় যে নীতির ব্যাপার কী মানুষের লৌকিক সুখ-সুবিধার সম্পর্কিত, না ইহা তদতিরিক্ত অধ্যাত্ম সম্পর্কিত আর কিছু, তখন সে নৈতিক ভালো-মন্দের যে অর্থ আমাদের চিত্তের গভীরে অবস্থিত তার অনুসন্ধান করে। এই অনুসন্ধানে যে যুক্তির প্রয়োগ সে করে—সে কিন্তু নৈয়ায়িকের শুষ্ক তর্ক নয় যা আমাদের কোনও সত্যেই উপনীত কোরতে পারে না,—বরং এমন যুক্তির অবতারণা করে যাহা এই গোপন অর্থটুকু স্পষ্ট কোরতে সাহায্য

করে। সে বলে যদি নৈতিক ভালো-মন্দ আমাদের লৌকিক সুখ-সুবিধারই ব্যাপার হোত—তাহলে এই সুখ-সুবিধা ভালো কি মন্দ—এ প্রশ্ন অন্তর্বিরোধী অর্থহীন হ'য়ে পড়তো। যেমন মিষ্টতা অর্থে যদি শর্করার স্বাদকেই বোঝায় তাহলে এই শর্করা মিষ্ট কিনা এ প্রশ্ন অর্থহীন। কিন্তু প্রথম প্রশ্নটি কি অর্থহীন মনে হয়? হয় না। সুতরাং নৈতিক ভালো-মন্দ বোধহয় লৌকিক সুখ-সুবিধার ব্যাপার নয়। যদি আত্মসুখ বা গোষ্ঠীসুখ কিংবা আত্ম অথবা গোষ্ঠীক্ষমতা প্রতিপত্তি ইত্যাদি দ্বারাই ভালো-মন্দের বিচার হ'তো—তাহলে এই সকল বস্তু স্বতঃই ভালো হয়ে যেতো, এবং তখন ইহারা কোনো অবস্থাতেই যে মন্দ হ'তে পারে এ সন্দেহই চিত্তে উদিত হতো না। কিন্তু তা তো হয় না। সুতরাং ভালো-মন্দের ধারণা অন্যরূপ মনে কোরতে হবে। মঙ্গলের বেদীতে মানুষ তার সুখ-সুবিধা এবং জীবনকে অনায়াসে বলি দিয়েছে, এর উদাহরণ তো অসংখ্য আছেই—সে কথা এখানে সত্য-প্রমাণে যতোটা না কার্যকরী হোক—তার চাইতে বেশী এই যে আমরা আমাদের মানসতলে অবগাহন কোরে পাই মঙ্গলের এমন এক অর্থ বা ব্যঞ্জনা যা আমাদের বক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থবোধ দিয়ে ধারণা করা অসম্ভব—যা একে অতিক্রম করে অতি দূর প্রসারিত।

বুদ্ধি ঈষৎ অন্যরূপ যুক্তি দিয়ে অন্তরের গভীরে মঙ্গলের যে অর্থ বা তত্ত্বটি আছে তাকে ধরতে পারে। যা সুখ-সুবিধার ব্যাপার তা নিয়ে তো বাদবিতণ্ডা হয় না। আমার যদি কিছু খেয়ে বা কোনো কাজ করে সুবিধা হয় এবং সেজন্যই আমি সে বস্তু খাই বা সে কাজ করি তাহলে এইটুকুই শুধু তর্কের অবকাশ থাকে যে সত্যই আমার সুখ-সুবিধা হয় কি না। কিন্তু যদি এই ভোজন বা কাজকে মঙ্গলপ্রদ বলতে চাই তাহলেই অনেক তর্কের অবতারণা হয়। কেবল আমার পক্ষে যাহা উপযোগী তার অনুসরণ করাই আমার কর্তব্য কি না—এ প্রশ্ন প্রথমেই ওঠে। এবং শেষে, সকলের পক্ষে উপযোগী হলেও এমন অনেক কাজ আছে যাহা অকর্তব্য হ'তে পারে—এ কথাও মনে জাগে। মোট কথা উপযোগিতা বা সুখকারিতা কর্তব্য-কর্মের একটি ফলস্বরূপ আসতে পারে—কিন্তু তার দ্বারা কর্তব্য-অকর্তব্যের বিচার হয় না। অর্থাৎ কর্মের লৌকিক কোন উদ্দেশ্য বা ফল দ্বারা মঙ্গলের বিচার অ-সার্থক মনে হয়। মঙ্গলের যেন নিজস্ব একটি স্বরূপ আছে যাহা লৌকিক বা ব্যবহারিক কোনো পদার্থ হ'তে স্বতন্ত্র। মহাত্মা গান্ধী তাই বুঝি বলেছিলেন যে তিনি সত্য ও যথার্থ মঙ্গলের জন্য যদি প্রয়োজন হয় ভারতের স্বাধীনতাও বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।

নীতির ভালোমন্দকে যদি কোনো লৌকিক পদার্থ দিয়ে ধরা যাচ্ছে না দেখি, তাহলে কি মনে কোরতে হবে যে ইহা আমাদের একটি খেয়াল-খুশীর বা মেজাজের ব্যাপার মাত্র। "ইহা ভালো" বলতে আমরা কি এইটুকুই বোঝাতে চাই যে "ইহা আমার ভালো লাগে"? এ-ও নয়। কারণ তা' যদি হতো তাহলে তো এই ভালো-লাগা বা মন্দ-লাগা নিয়ে কোনো বাদ-বিবাদের অবকাশ থাকতো না, যেমন থাকে না আমাদের ভোজন-পান সম্পর্কিত ভালো মন্দ মন্তব্যের ক্ষেত্রে। তাছাড়া যাহা নীতিগত ভাবে ভালো তাহা ভালো না-ও লাগতে পারে। আবার "ইহা ভালো" বলতে ইহা সাধারণতঃ সকলের ভালো লাগে এ-ও মনে করি না—কারণ যাহা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে হয় তাহা সর্বসাধারণের ভালো না-ও লাগতে পারে এমনও মনে হয়। অনেক কর্তব্যই কোনও ব্যক্তিবিশেষের বা সমষ্টির ভালো লাগে না—তবুও তারা নীতি হিসাবে ভালো বলেই প্রতীত হয়। তবে কি নীতি

বিচারে যাহা ভালো বলে ধারণা হয় তাহা সমাজ বা রাষ্ট্রের অনুজ্ঞা, যাহা আমাদের ভালো লাগা না লাগার অপেক্ষা রাখে না? এ-ও না। কারণ লৌকিক কোনো অনুজ্ঞা বা অনুশাসন আমরা পালন করি নির্বিবাদে নিষ্ক্রিয়ভাবে। স্বাধীন সক্রিয় বিচার-বুদ্ধির স্থান সেখানে নেই এবং এইজন্য তাহাতে আমাদের কোনও গৌরব বা আনন্দও থাকে না। কিন্তু যথার্থ কর্তব্য-কর্ম পালন করা তো এ-ধরণের ব্যাপার নয়। এখানে আমরা স্বাধীন ও জাগ্রত চিত্ত নিয়েই যা-কিছু করি এবং যে অনুপাতে আমরা কোনও কাজ শুদ্ধ কর্তব্য বলেই নয় কেবল সমাজ বা রাষ্ট্রের অনুশাসন বলে পালন করি—সে অনুপাতে আমরা অন্ধ যন্ত্র-চালিতের ন্যায় ব্যবহার করি এবং এ-ও মনে করি যে এই অনুপাতে আমরা নীতিগতভাবে সাধু না হয়ে কেবলমাত্র সুচতুর বা কৌশলী হয়েই চলি। কারণ অনুশাসন অমান্যের শাস্তি এড়াবার পন্থা অবলম্বনকে সৎকার্য্য বলা যায় না—ইহা মানুষের স্বাভাবিক পটুত্বেরই পরিচায়ক, যাহা জীবনযাত্রায় অপরিহার্য। সুতরাং দেখছি শ্রেয়োবুদ্ধি বা সাধুতা কূটবুদ্ধি বা চাতুর্য হ'তে ভিন্ন।

কিন্তু যদি মঙ্গলকে আমরা একদিকে আমাদের প্রেয় বস্তু বা অপরদিকে পালনীয় অনুজ্ঞা অর্থে না পাই—তাহলে কি ইহার সম্পর্ক কোনও লৌকিক ব্যাপারের সহিত না হয়ে অলৌকিক ধর্ম বিষয়ের সহিত মনে করা যায়? অর্থাৎ নীতির ভালোমন্দ কি ঈশ্বরের প্রিয় বস্তু বা তাঁর আদেশ বলে মনে করা যায়? এর উত্তরও সরল। আমরা তো কর্তব্য কর্ম অনুসরণে এইরূপ ঈশ্বরের কথা ভাবিনা। তাছাড়া, কোনও কর্ম যদি আমার অবশ্য কর্তব্য শুধু এইজন্যই যে তাহা ঈশ্বরের প্রিয় বা তাঁর আদেশ—তাহলে আমি ঈশ্বরভক্তই হয়ে পড়ি এবং নীতি-বিচারে সাধু হই না। আমার কর্তব্য পালন তখন বাহ্যিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। কর্তব্যের জন্য নয় বরং ঈশ্বরের জন্যই তাহা করি এবং ঈশ্বরকে তুষ্ট করাই তখন আমার কাছে সৎকর্ম মনে হয়—সেই বিশেষ কর্মটি নয়। আবার ঈশ্বর কেন এইরূপ কর্ম ভালোবাসেন বা আমাদের করতে বলেন সে প্রশ্নও ভক্তের মনে উদয় হবে না সুতরাং সে তার কর্তব্যকে না বিচার কোরেই একরূপ অন্ধের মতো বিশ্বাস-বশেই কর্ম গ্রহণ ও সম্পাদিত করে। চিত্তের এ অবস্থা নীতি-বিচারের দিক হতে সৎকর্মের পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী, কারণ এর মধ্যে বাধ্যতা ও অন্ধ বিশ্বাস বর্তমান এবং সক্রিয়তার অভাব থাকে। অর্থাৎ ঈশ্বর-ভক্তি বা ধর্মাচরণ হলো এক বস্তু আর নীতিপালন আর এক বস্তু। একটিকে অপরটি দ্বারা ধারণ করা যায় না। যদি ঈশ্বরভক্ত বা ধার্মিক কোনো ব্যক্তি বলেন যে তিনি বিনা বিচারে ঈশ্বরের যাহা প্রিয় তাই করেন এবং ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করেন কারণ ঈশ্বর মঙ্গলময়—তাহলে তিনি নীতিকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন ঈশ্বর বা ধর্মকে নয়। আর যদি তিনি বলেন যে ঈশ্বরকেই তিনি ভালোবাসেন এবং ঈশ্বরের যাহা কাম্য বা আদেশ তাই তিনি বিনা বিচারে অনুসরণ করেন—তাহলে তিনি নিজেকে নীতিমুক্ত কোরেই ঈশ্বর ও ধর্মকে নীতির উর্ধ্বে সংস্থাপন করেন। সুতরাং তিনি হয় সে-ধর্মকে নীতির অন্তর্গত করেন, নয় তাকে নীতি-নিঃসম্পর্ক করেন। সুতরাং নীতিকে ধর্ম দ্বারা স্পষ্ট করা যায় না।

অতএব আমাদের এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতেই হয় যে—নীতির বা নৈতিক ভালোমন্দের একটি বিশিষ্ট ধারণা আমাদের আছে যাহা অন্য কোনও লৌকিক বা অলৌকিক ধারণায় ধরা যায় না। নীতি বিচারের প্রথম কাজই হচ্ছে এই সত্যটিকে স্বীকার করা। এবং তার পরবর্তী কাজই হচ্ছে

এই ধারণাটিকে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি ও প্রকাশ করা। প্রত্যেক সাধনার কাজই হচ্ছে প্রথমে তার বিষয়বস্তুটি অন্যান্য বিষয়বস্তু হ'তে পৃথকীকৃত করে তাকে তার নিজস্ব সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং সেই সঙ্গে সেই সাধনাটিরও একটি বিশেষ ও স্বাধীন স্থান নির্ধারিত করা। সাধারণতঃ কোনো সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তি তাকে নিজেরই পরিপোষক হিসাবে নিজের অধীন কোরে রাখতে চায়। মানুষ তাই সেই সাধনাকে তার সুখ-সুবিধার উপায়রূপে দেখে এবং তার জীব ধর্মের সংজ্ঞা দ্বারাই সাধনার উৎকর্ষ বিচার করে। সুখকারিতা বা জীবনসংগ্রামে উপযোগিতা—এর দ্বারাই নীতি, ধর্ম ও সাহিত্যকে সে বিচার করে। কিন্তু এ অবস্থা সহায়ী হয় না। কারণ পূর্বে কথিত হয়েছে যে মানুষের পুর্ণ পরিচয় তার দেহ মন নয়, বরং তার আত্মা—তার জীবধর্ম নহে, বরং তার আত্মধর্ম। সে যাহা ছিলো বা এখনও আছে তাহা দিয়ে তার পরিচয় হবে না বরং সে যা হবে—যার দিকে সে চলছে সে-অবস্থা একেবারে আগন্তুক হ'তে পারে না; কারণ যা কোনোকালেই ছিলোনা তা কি কোরে হয়? সুতরাং যা সে হবে—তা সে প্রকৃতপক্ষে হয়েই আছে, শুধু তা স্পষ্ট হয়নি। এবং যা সে হতে যাচ্ছে, তাই তার আজকের বিবর্তনের কারণ এবং এই কারণটি বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ এবং ইহাকে জানাই বস্তুর যথার্থ জ্ঞান আহরণ করা। কার্য-কারণের এইরূপ বিশ্লেষণ কিছু কৃত্রিম বা অতি সূক্ষ্ম বা জটিল নয়। ইহা আরিষ্টটলের দান এবং ইহাকে অনেকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছেন—যেমন দার্শনিক হেগেল, কবি ব্রাউনিং ও রবীন্দ্রনাথ। কার্য যে কারণাত্মক এবং কারণ কার্যাত্মক নয়—এ শঙ্করেরও অভিমত। সুতরাং মানুষের সম্যক পরিচয় তার আদর্শ দ্বারা, তার সাধনার লক্ষ্য দ্বারাই নির্ধারিত হয়। অতএব নীতি, ধর্ম ও সাহিত্য-বিচারে যদিও সে প্রথমে তার জীবস্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত হয় সে অবস্থা সে অতিক্রম করে সহজেই এবং তখন সে এই সকল সাধনার সঠিক পরিচয় পায় এবং ইহাদের উন্নতি সাধনে বা সাধন বস্তুর সম্যক উপলব্ধিতে ও প্রকাশে তৎপর হয়। নীতি সাধনায় মানুষের ইতিহাসে ধূলিধূসর অন্ধকার ছেয়ে এলেও তাহা পরিষ্কার হয়েও গেছে। আজও সেই আশাই করা যায়। মানুষের আত্মস্বরূপ ও আত্মধর্ম বারবার তার জৈবিক প্রবৃত্তি দ্বারা রাহুগ্রস্ত হলেও সে কেবলই রাহুমুক্ত হয়ে নিজের আলোক-স্নানে শুচি হয়েছে—স্মিতহাস্যে ভুলেছে তার সাময়িক পরাভব-গ্লানি।

"আত্মনঃ স্বপ্রকাশত্বম্ কো নিবারয়িতুং ক্ষমঃ?"

কবিতা-গুচ্ছ

নিরন্ত নির্ঝর

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ নেই এই নির্ঝরের
অজানা শিখরে উৎস যে উৎসুক।
ছড়ানো শিলায় অঙ্কুর জাগে
স্রোতের আঘাতে রৌদ্রের দাগে
হেসে ভেসে ওঠে ফুটে-ওঠা যতো বর্ণের কিংশুক!
শেষ নেই এই নির্ঝরের
সুনীল প্লাবনে মাঝে মাঝে বুঝি তাই ভ'রে ওঠে বুক।

লক্ষ্যেরা সব কেন্দ্রাভিসারী
সন্ধান করে একটি পরম বিন্দু।
পরিধির থেকে কেন্দ্র!
রয়েছে কোথায় বিলীন হবার দূর উত্তরোল সিন্ধু।

সাগরের থেকে বাষ্পিত মেঘ
উৎসের বুকে জমায় আবেগ
বৃত্তের পথ আধখানা তার শিখরের থেকে সিন্ধু!
—পরিণামী পরমার্থ।
সিন্ধুর থেকে শিখরের দিকে উদ্বায়ী অপরার্ধ,
—অদৃশ্য যার সঞ্চার-পথ আকাশের উত্তল!
সেই বৃত্তেরই পথে শেষহীন অবিরল চলাচল।
সমুদ্র থেকে শিখরের দিকে, শিখরের থেকে সিন্ধু
মাঝখানে তার ব্যক্তিত্বের স্থির নিশ্চল বিন্দু।
আকাশ-পৃথিবী জুড়ে আছে যেই
নিরন্ত সেই বৃত্ত—
যুগে যুগে চংক্রমিত সে-পথে
চিরন্তনের চিত্ত।

অন্তরাশ্রয়ী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তুমি কি শীতের সূর্য, মুঠো মুঠো রাত্রি ছড়াও
ক্লান্তির আঁচল তুলে শরীরে-জড়াও ?
তুমি কি চঞ্চল হাওয়া—মাঠের ফসলে দোলা দাও
এবার সে রুক্ষ ধূ ধূ, তবু তার হৃদয় উধাও।

জ্যোৎস্নার নদীতটে একটি শালিক
এখোনো ফেরেনি নীড়ে, হারিয়েছে দিক ;
নদীর উন্মাদ গানে লোভমত্ত প্রকৃতির ভাষা
স্বর্ণময় বালুতটে রেখে যায় রূপের পিপাসা।
পাড়ি ভাঙা দুর্নিবার বাসনার প্রবল প্রতাপ
অরণ্যে রেখেছে ঘ্রাণ, রাত্রিকে দিয়েছে উত্তাপ।

তুমি কি তোমার প্রেম, রেখেছো বসুধা চিত্রপটে,
সইতে পারিনে তাকে যৌবনের ঝড়ের ঝাপটে।
ভোরের অম্লান আলো তোমার শরীর মনে হয়
শুভ্র কোরকের মত মেলে দাও আশ্চর্য হৃদয়।

দুহাতে ছড়াই

ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়

আকাশ তো দিলো ডুব
অসীম নীলে,
পৃথিবী তাকালো আর

কাঁদলো শুধু।
আমি তবু বেঁচে রই
কান্না মুছে—
দু'হাতে ছড়াই সুর, গানের সিঁদুর॥

পাঁচালি

অনিল বিশ্বাস

পথের পাঁচালি শোনো, যম, ভারতীর :
বর এলো
রাজার দুলাল জল পথে,
মুকুটে দিলেম মালা সোনামোড়া রথে।
শেষ হ'লো আত্মরক্ষা
পল্লী কুমারীর।
বাঁচার বস্তিতে
মৃত্যু হ'লো আমাদের—
গাঁয়ের দধীচি প্রাণ দিলো বেদীমূলে,
মজুরের হাড়ে হাড়ে
হাড়ময় শূলে,
গড়া হ'লো নগর-শহর
বণিকের।
সোনায় শানানো
সভ্যতার ছুরি চেরে
মানুষের হৃদ্‌পিণ্ড—কোরিয়া, মিশরে
কান্না শোনো বলির ছাগের।
শরে শরে
কলিখেত কলিকাতা আজো
ঘোরে ফেরে !
মৃত্যুপারে
তাই, যম,
তোমাকে শুধাই
অমৃতের পথ ব'লো, কোথা গিয়ে পাই ?

রূপকথা

বাসন্তী কুমার মুখোপাধ্যায়

সময়ের হাত ধ'রে রঙের মিছিল
গোধূলি-আকাশে নদী : রাঙা ঝিলমিল
আবীরে হলুদে মেশা বেগনি ও লাল
লজ্জায় রেঙে-ওঠা তরুণীর গাল....
সে-নদীর স্রোত ধ'রে যতদূর যাই
একটি মেয়ের মুখ কোনোখানে নাই।

(কিছু বাসি দর্শন, রসিকতা ওঁচা···
ময়লা রুমালে নাক ঘন ঘন মোছা।)

পথচলা মেয়েদের শরীরে ও মনে
যে-মেয়েটি আছে, ছিল পৃথিবীর কোণে
সে এখন রূপকথা, পরীদের দেশে
যেখানে আকাশ-নদী পৃথিবীতে মেশে
সে-মেয়েটি ছুটে এসে দরজার খিল
খোলে, কালো-দীঘি-চোখে আকাশের নীল
রঙের-আগুনে-পোড়া ঠোঁটে জ্বলে ছাই :
তেমন মেয়ের মুখ কোনোখানে নাই।

(কিছু বাসি দর্শন, রসিকতা ওঁচা···
ময়লা রুমালে নাক ঘন ঘন মোছা !)

কখন যে অনুভবে পথ চিনে চিনে
রজনীগন্ধা-রাতে মল্লিকা-দিনে
যামিনীরায়ের ছবি কালো-দীঘি-চোখে
কখন কবিতা হোলো শোকে ও অশোকে।

যার চোখ আকাশের মতো ছিল নীল
সে-মেয়েটি নেই, আছে রঙের মিছিল।

মাঠ

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

দূরে দূরে মাঠ
একটি ছবির মত ঢেকে আছে নীল অরণ্যানী :
মনে হয়, কাগজের সবুজ মলাট।
তারই মাঝে আঁকাবাঁকা মিশে গেছে কত পথ-ঘাট ;
মানুষের পায়ে-পায়ে তৈরী পথ অনেক মসৃণ,
সিল্কের সুতোর মত চিকন মিহিন।

প্রভাতে-দিনান্তে সূর্য উষ্ণস্পর্শ রেখে যায় মাঠের ললাটে
চেয়ে-চেয়ে দেখি আমি, মন যেন সাদা হাঁস উড়ে যায় মাঠে,
উড়ে-উড়ে যায়
প্রভাতে-সন্ধ্যায়।
ওখানে হয়ত কত অনেক মেয়ের পুরুষের
রঙিন স্বপ্নের মালা ঝরে গেছে, অনেক হৃদয় নিয়ে খেলা,
ভালবাসা-ফুলঝুরি সাদা, নীল নিভে গেছে ঢের :
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা তাদের।

মনে হয়, ঘুরে আসি একটু ওখানে।
ও-মাঠ যে কথা কয় ধূসর বিলীয়মান
মেয়ে আর পুরুষের গানে।
অনেক বিস্মৃতস্পর্শ মাঠের শরীর-ঘ্রাণে
হয়ত-বা পাওয়া যায়
তাদের পায়ের চিহ্ন খোঁজো যদি মাঠের পাখায়।
হাতছানি দেয় মাঠ ধূসরিত ভৌতিক ইসারা,
এখানে দাঁড়িয়ে থেকে চেয়ে-চেয়ে হারা।

ছায়াচিত্র

দিলীপকুমার সেন

করুণ কান্নার মতো কেঁদে কেঁদে খুঁজে মরে এঘর-ওঘর
ঘুরপাক খেয়ে এলো চৈতালি ঝড় !
খড় কুটো ঘূর্ণী ওড়ে ওড়্না-বাতাসে
ঝির-ঝিরে সোনা গলে মৌসুমী হাসে ;
রাঙা ধূলো, শালবন, উড়ো পাতা ঝাপ্টায় দেওদার গাছে
বারেক চমকায় এসে এঘরের কাছে।
জানলায় ঘেরা মুখ শার্সির কাঁচ
চোখেতে উব্‌ছে পড়ে আগুনের আঁচ ॥

কুচি চুল উড়ে পড়ে ঘাম ঝরা চোখে মুখে সোনার কপোলে
আয়নায় আঁকা মুখ, চোখ দেখে চলে।
এই'ত বেবাক হ'ল অনাবিল চুরি ক'রে দেখার সময়
আধছায়া—আব্‌ছায়াময় ॥

মনের কোণেতে ছিল একটু প্রান্তর,
খোলা জমি, নদী তীর, পাহাড়ের সানুদেশে টালি ছাওয়া ঘর !
নুয়ে-পড়া তাল বন, নারিকেল, সুপারির সারি
ঘাস জমি উঁচুনিচু পাড়ি ॥

উধাও মনের স্বপ্ন দুরান্তে বুনে চলে কত আলো-আহ্লাদী দিন
জানলা শার্সি কাঁচ নিমেষে উড্ডীন !
মুখে-চুলে-চোখে ঝরে সদ্য ফোঁটা জল
ভিজে ভিজে সোনার কপোল ॥
এখনো পর্দ্দার গায়ে লেগে থাকা কাঁপা দুই ঠোঁট
এ-ঘরে ও-ঘরে ঝড় ওলট-পালট ॥

নিরালোক

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

আমার এ-টেবিলের পাশে,
আমার চেয়ারে রেখে হাত,
এসেছিল জ্যোৎস্নার রাত
দূরের নীলচে রঙ মেখে,
যে-রঙ থাক্‌তে পারে দিনের আকাশে
মেঘের রেশমে মুখ ঢেকে।

একটি মেয়ের মুখে রাত
মেঘের দিনের মতো ভারি।
অনেক দিনের মুখে পারি
ঢেলে দিতে মেয়েদের মেঘ
চোখ থেকে জলেরও প্রপাত,
পারিনে ধরতে শুধু রাতের আবেগ।

টেবিলের আশেপাশে আজ
মেঘ থেকে আসে বহু জল,
সোনালি-রুপোলি আলো হয়তো সলাজ।
চেয়ারে লোকটা লিখে চলে
জ্যোৎস্নার কথা অবিকল,
বীতরাগে দিনগুলো জ্বলে।

গড় শ্রীখণ্ড

অমিয়ভূষণ মজুমদার

[পূর্ব্বানুস্মৃতি]

একদিন রামচন্দ্র আলেক সেখের বাড়ীতে যাচ্ছিল। আলেক সেখের বাড়ী চড়নকাশিতে। আলেক সেখের তিন জোড়া বলদই নাকি অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে। নোতুন একজোড়া সে কিনেছে গত সপ্তাহে অরনকোলার হাট থেকে, তাদের থেকেই সবগুলো অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে। বুধেডাঙার প্রান্ত পর্য্যন্ত এসে রামচন্দ্র মাঠের পথ ধরল। শূন্য মাঠ পেরিয়ে সে সোজা পাড়ি দেবে চড়নকাশির জোলা পর্য্যন্ত, জোলা পার হ'লেই আলেক সেখের বাড়ী।

হঠাৎ রামচন্দ্র থেমে দাঁড়াল। দৃশ্যটা অবিশ্বাস্য। ভরুই পাখী! ধানের সাথে তাদের যাওয়া আসা, ঝাঁক বেঁধে তারা আসে, ধোঁয়ার মতো ধানের শিশগুলির উপরে ভেসে বেড়ায়। তেমনি আসে এদেশে দক্ষিণ থেকে ধান কাটতে চাষীরা। মাথায় টোকা, হাতে ছোট ছোট লাঠি, কাঁধে একটি ক'রে ঝোলা, তাতেই তাদের সর্বস্ব। ধানের দিনে আসত তারা, তখন তাদের আসাটাই ছিল স্বাভাবিক। তাদের আসা সূচনা করত ধান, তাদের হাসি তামাসা, কথাবার্ত্তায় গ্রামের পথে গ্রামের চাষীদের আত্মতৃপ্তির নিশানা দিয়ে বেড়াত।

রামচন্দ্র অবাক হ'য়ে দেখল ঠিক তাদের চেহারার মতো চেহারা নিয়ে কয়েকজন দল বেঁধে আসছে। ছিদামের ধান কাটতে এল নাকি এরা? কথাটা মনে হ'তেই রামচন্দ্র শূন্য মাঠের মধ্যে একা একা হেসে ফেলল।

কাছাকাছি এসে ওরা বললে—চৈতন্ সার বাড়ী কোন দিকে যামু?

—যাও এই পথেই।

ওরা চলে গেলে রামচন্দ্র পথ চলতে লাগল আবার। তা হ'লে এরা চৈতন্য সাহার খোঁজে এসেছে, তার সেই কুখ্যাত হাড়চালান দেয়ার ধানীনৌকার দাড়ি-মাল্লা হবে বোধ হয়। চৈতন্য সাহার জমি হ'য়েছে, এত হ'য়েছে যে খাইখালাসির হিসাব ধরলে গোটা গ্রামখানির মধ্যস্বত্ব তার, কিন্তু ধান কোথায় যে কাটবে এরা? রামচন্দ্র ঠিক করল ফিরবার সময়ে বাড়ী যাবার পথে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্টকে কৌতুকের খবরটি দিয়ে যাবে।

কিন্তু চৈতন্য সাহা নাবালক নয় যে ছিদামের ধান কাটার খবর পাঠিয়ে দাঁড়ি মাল্লা ডেকে আনবে। বাঙালরা, এ অঞ্চলে ধান কাটার জন্য যারা দক্ষিণ থেকে আসে তাদের প্রচলিত নাম, কেন এসেছে বোঝা গেল। এ বছর বোধ হয় চৈতন্য সাহা এ গ্রামের চাষীদের আগাম টাকা দিয়ে চাষ করতে ডাকবে না। সব চাষী রামচন্দ্র নয়, যারা প্রাণের দায়ে চৈতন্য সাহার কাছে গিয়েছিল কথাবার্ত্তা বলতে তারা ফিরে এল। চৈতন্য সাহা তাদের বুঝিয়ে দিয়েছে—এবার সে অন্য দেশ থেকে

চাষী এনে তার খাইখালাসি জমি চাষ করাবে। চাষীরা ভয়ে দিশেহারা হ'য়ে গেল। তারা গত ফসলের সময়ে যে অপমান বোধ করেছিল ভয়ে তাদের সে অপমান-বোধ আর রইল না।

কথাটা তার কাছে দু'একজন উত্থাপিত করলে রামচন্দ্র ভক্ত কামারের কাছে বললে,—এমন তো হয়ই, খাইখালাসিতে জমি বাঁধা পড়লে চাষীর তো এই হালই হবে।

—কিন্তুক, ধর যে নিজের জমিতে মজুর খাটে গত সনে প্রাণ বাঁচছে, এবার কি হবি? এবার যে মজুর খাটেও দিন চলার উপায় নি। এ সনও, পরের সনও না, তারপর জমি ফিরে পাবা। ততদিন কোন ধানে বাঁচবা?

ব্যাপারটা দেখতে দেখতে অন্যতর পরিণতি নিল।

শ্রীকৃষ্ট সেদিন অসুস্থ। মহাভারত পড়ার ক্ষমতা তার নেই। রামচন্দ্র তার দাওয়ায় ব'সে বলল,—শুনছেন না গোঁসাই।

শ্রীকৃষ্ট সবই শুনেছে, খানিকটা সময় চুপ ক'রে থেকে সে ধীরে ধীরে বলল—আপনাকে নিয়ে আমি একবার সান্যাল মোশাইএর কাছে যাব। কব, এখন আমরা মরে গেলে যদি দেশে শান্তি হয় হউক।

রামচন্দ্র বলল,—দেশে আর শান্তি হবি নে।

গভীর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল তার।

ঘরের মধ্যে থেকে আর একজনের দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা গেল। সে শ্রীকৃষ্টর শেষ বৈষ্ণবী পদ্ম।

শ্রীকৃষ্ট বলল,—কেন, কন্যে, তুমি কি কও?

পদ্ম বলল,—আমাদের দেশে লাঙ্গলের পূজা হয়, তাতে শান্তি আসে।

—সে কি পূজা?

পদ্ম বলল,—দেখছি নোতুন কাঠ দিয়ে এক লাঙ্গল তৈরী করে, পাটবানেয় পূজার মতো পূজা হয় তার, তারপর সেই লাঙ্গলে খানিক মাটি তোলা হয়, গাঙের জল তুলে কাদা করা হয়, সেই কাদায় গড়ায়ে, সারা গায়ে কাদা মাখ্যে আমার দাদারা খেতে নামত চাষ দিতে।

—খেত? না, কন্যে? এ দেশে আর খেত নাই।

আলোচনাটা আর এগোল না। প্রায় অন্ধকার পথ ব'য়ে দশ পনর জন লোক এসে দাঁড়াল শ্রীকৃষ্টর ঘরের সম্মুখে।

—তুমি এখানে আছ মণ্ডল, আমরা খুঁজতেছিলাম—ওদের মধ্যে একজন বলল।

—কেন, ভাই, আমাকে কেন্?

রামচন্দ্র বলল,—আমি কি বলব, এমন ক'রে তো আগে তোমরা আমাকে কও নাই, আমি কি পরামর্শ দেব? আমি কি কোন কালে পরামর্শ দিবের শিখছি?

তারা বললে ভক্ত কামারের দুই ছেলে অনেকদিন থেকে ওপারের মিলে কাজ করে। বড় ছেলে ভক্তকে নিতে এসেছে। তার কাছে শোনা গেছে ওপারের ধানের কলে এখন অনেক মজুর নিবে। ভক্তর কাছে গিয়েছিল গ্রামের অনেক, সে বলেছে রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা কর, সে বললেই—যাওয়া।

রামচন্দ্র কথা বলার ভঙ্গীতে নড়েচড়ে বসল, কিন্তু কথা খুঁজে না পেয়ে গোঁফে হাত রাখল।

এদের মধ্যে একটি বোকা বোকা লোক ছিল, কথা বলতে তার 'র' ও 'ন' দুইটি 'ল' হয়ে যেত; সে বলল,—মল্‌ডল্‌ বুঝি গাঁ ছাল্‌বা লা? যখন আমলা লা খায়ে মলাম, তখন জমিদালও গাঁ ছালে পলাইছিল।

রামচন্দ্র বললে,—কোথায় যাব?

তার বক্তব্য ছিল: কোথায় যাব, সর্বত্রই তো একই পৃথিবী।

প্রশ্নটা সকলেই করতে পারে, উত্তর দেবে এমন কে আছে?

রামচন্দ্র বলল, এবার তার গলাটা আবেগে কেঁপে গেল,—কোথায় যাব, কও তোমরাই কও। ভক্ত আসে নাই কেন?

তাদের মধ্যে ভক্তর ছেলেও ছিল, সে বলল,—বাবা ক'ল মুখ দেখাতে লজ্জা করে। আমি কই, না খায়ে মরার চায়েও কি লজ্জা বড়?

এখন হয় কি পুনঃপুন এই একই নাটক অভিনীত হ'চ্ছে। যারা মঞ্চে থাকে তারা ঠিক ঠাহর করতে পারে না, কি রকমটা তারা চলবে। তারপর এ ওকে কথা যুগিয়ে দেয়, এর কাজের থেকে ওর কাজের সৃষ্টি হয়। একটা সামান্য কথা, এতটুকু ইঙ্গিতবিভঙ্গ থেকে জন সমুদ্র উদ্বেল হবার গতিবীজ পায়। মেয়েরা যতই উহ্য থাক পুরুষদের আলাপ আলোচনায় মাঝে মাঝে তাদের দু'একটি কথা ছিটকে বাইরে এসে পৌছায়। তার গুরুত্ব কম নয়, বরং দেখা যায় পুরুষদের সম্মিলিত যুক্তির আধখানা সৃষ্টি করেছে সেই স্বল্পোচ্চারিত কথা কয়টি।

এতগুলি লোক শ্বশুরকে খুঁজছে কেন এ জানবার আগ্রহে আগন্তুকদের সাথে মুঙলাও এসেছিল। ঘরের ভেতর থেকে তাকে ডেকে পদ্ম বলল,—বাবাকে একটা কথা কবা, আপনারা যেন যাবেন, মিয়েছেলের কি হবি? তাদের সেখানে আব্রু থাকে না।

মুঙলা ফিরে এসে কথাগুলি বলল, সেগুলি, অবশ্য ইতিপুর্বেই এদের অনেকে শুনতে পেয়েছে।

—তুই কি ক'স? ওদের একজন প্রশ্ন করল।

—মনে কয়, আমার মাকে নিয়ে আমরা যাব না।

কয়েকজন প্রায় সমস্বরে বলল,—তোমরা শ্বশুর জামাই রোজগার ক'রে সেখানে খাওয়াবের পারবা না? তোমরা থাকতে আব্রুর কি ভয়?

মুঙ্‌লা বললে,—অচেনা জায়গায় কি কাম যায়ে, পারিতো এখানেও খাওয়াতি পারব। কি কও ছিদাম-সখা?

—নেচ্চায়!

যারা চলে যেতে কৃতসঙ্কল্প হ'য়েছিল তারা বললে,—কিন্তুক চৈতন্য জমির খাজনা দেয় নি; জমিদার জমি জব্দ করবি, চৈতন্য খাজনা দিবি নে; খাইখালাসি সব খাস হবি, কোনদিনই আর আমাদের হাতে ফিরবি নে।

মুঙ্‌লা বললে, তা হউক, জমিদার জমি বাক্সে পুরবি নে; খাস করে, বরগা চায়ে নেবে।

—বাকি খাজনা না দিলে কোন জমিদার বরগা দেয় না।

অবিশ্বাসের হাসি হাসল অনেকে।

একজন হাসিটা কথায় প্রকাশ করল,—যেমন ছিদামের বোরো ধান লাগান! বরগা চষা কি গানের পালা বাঁধা নাকি?

অতি দুঃখে কয়েকজন হো হো ক'রে হেসে উঠল।

হাসি থামলে হরিশ শাঁখারি কথা বলল,—রামরে আমি কি করি তাই কও?

—কেন্‌, ভাই, হরিশ?

—আমার খাইখালাসি সে জমিদারের কাছেই। মিহির সান্যালকে চাপ দিবি কে? মঙ্‌লা, আমি যে বরগাতেও জমি ফিরে পাব না।

রামচন্দ্রের মনে হ'ল এবার সে কেঁদে ফেলবে বলল,—তোমরা যদি থাক, আমি তোমাদের ছাড়ে যাব না।

আগন্তুকরা ধীরে ধীরে চলে গেল। তাদের চলবার কায়দায় মনে হ'ল রামচন্দ্রের কথায় তারা কিছুমাত্র আশ্বাস পায় নি।

কি করা উচিত রামচন্দ্র কিছুতেই ঠাহর করতে পারছে না। ভাবতে না-ভাবতে একদিন সে একটা অনুচিত কাজই ক'রে ফেলল।

ছিদামের বোরো ধান আগুই হ'য়েছে, এই কৌতুকের খবরটা সারা গ্রামে রাষ্ট্র হ'য়ে পড়ল। সকলে একটা হেঁসো নিয়ে বন্ধু মুঙলার সাহায্যে ধান কাটার জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছে এমন সময়ে তারা দেখতে পেল পুকুরটার অন্যদিকে চৈতন্য সাহার পেয়াদারা এসে দাঁড়িয়েছে।

মুঙ্‌লা বললে,—কেন ভাই, তোমরা আসছ কেন?

ওদের একজন বললে,—এ পুকুর কার?

—কেন ছোট-সান্যাল মিহির বাবুর প্রজা শ্রীকৃষ্টদাসের।

—খাজনা দেও না, কয় বছর?

—খজনা দিবার কি আছে কও? মাছ হয় না—জলকর দেব, ফসল হয় না-খাজনা শোধব। পচা হাজা পুকুর। মুঙলা বললে যুক্তি দিয়ে।

—তাইলে খাইখালাসি বন্দোবস্ত করছিলা কেন্‌ চৈতন সা'র সাথে?

—তা করছি, কিন্তু খাইখালাসির মধ্যে কি এই ধানের কথা ছিল? এ মুল্লুকে এই ধান কোনকালে হয়? যে ফসল এ জমিতে সচরাচর হয় তার উপরই মহাজনের দখল। কিন্তুক যে ফসলের কথা কেউ ভাবে নাই, মহাজন নিজেও কোন কালে ভাবে নাই, তার উপর তার দখল হয় কি ক'রে? জমিতো তাকে চিরকালের জন্যি বেচি নাই। সে খাউক না যে ফসল মনে মনে জানা ছিল কাগজ করার সময়। এ ফসলের কথা কাগজের সময় তার মনে ছিল না। এর পর তার হক্‌ কি, কও।—ছিদাম যুক্তি দিল।

—জমি তো তার, তোমার দখল নাই; সে খালাস না দিলে তুমি ইয়েতে লাঙল ছোঁয়াবা কেন্‌? ধান কাটবের আমরা দিমু না। মিহির বাবুর খাজনা দেও, আর চৈতন্যসার ট্যাকা, তারপর কাট ধান।

মুঙ্‌লার মনে হ'ল এদের সাথে তর্কাতর্কি করা বৃথা। এরা যুক্তির কথা শুনতে আসে নি,

গায়ের জোর দেখিয়ে এ ধানটুকুও নিয়ে যেতে চায়। সে বললে,—ছিদামসখা ধান তুমি কাট।

—কিয়ের ধান কাটবা, ওরা পাঁচ ছ' জন এক সঙ্গে গর্জে উঠল।

ছিদাম বললে—ধান কাটাই লাগবি মেঁয়া ভাইরা, এ ধান আমার সখের ধান। ধান কাটে বেচব। বেচে যে টাকা হয় দিব চৈতন্যদাকে। এক বিশ ধান আর তিনটাকা নিয়ে বন্দোবস্ত করছিলাম পুকুরের ডাঙা। এক বিশ ধান আর তিনটাকা আমি তাক্ ফিরায়ে দিব। পুকুরের জল তাকে দিই নাই, জলের ধান আমার।

লোকগুলির পেছন দিকের একটা ছোট ঝোঁপের আড়াল থেকে চৈতন্যসা'র মুখ দেখা দিল, —আর সুদ, সুদ দিবি কে?

ছিদাম বললে,—সুদ? সুদের কথা তখন কও নাই, মহাজন মিছা কয়ো না। খাইখালাসিতে সুদের কথা নাই।

চৈতন্য সাহা ঝোঁপের পেছনে ডুব দিল।

মুঙলা বললে,—আমাদের যা বলার তা শুনছ, এই ধান আমরা কাটে নিব। তারপর সে জমি থাক।

মুঙ্লা নিচু হয়ে বসে এক গোছা ধানের গোড়ায় কাস্তে দিল। চৈতন্যসার পেয়াদাদের একজন এগিয়ে এসে মুঙলার একখানা হাত চেপে ধরল।

—হাত ছাড়, অন্যায় কোর না। বলল ছিদাম।

মুঙলা নিজেই হাত ছাড়িয়ে নিল, কিন্তু ধানের গোছা ছাড়ল না, পেয়াদাদের আর একজন এগিয়ে এসে মুঙ্লার হাতের উপরে তার লাঠিটা দিয়ে একটা গুঁতো মারল।

মুঙ্লা ধান ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সে এ গ্রামের জামাই। সমবয়সিদের সাথে খেলা ধূলোর সময়ে চড়চাপড় দেয়া নেয়া সে করেছে, কিন্তু, এমন তিরস্কারের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে এতবড় অপমান তাকে কেউ করে নি। কি একটা তীব্র কথা সে বলতে গেল, কিন্তু তার আগে দু চোখ ব'য়ে অশ্রু নেমে এল।

ছিদাম বললে,—সখা, চল, ধান আমরা কাটব না, আমার জন্যি তোমার অপমান সয় না।

মুঙ্লা বললে—না তুমি থাক; খেতে দাঁড়ায়ে মরে যাও, সখা, খেত ছাড়বা না। আমি সান্নাল মশাইএর কাছে যাব, গায়ের লোকের কাছে যাব, খাইখালাসি মানে কি তা বোঝাব। তারপর আমিও মরব।

ছিদামকে খেতের পাহারায় রেখে মুঙলাকে বেশীদূর যেতে হ'ল না। সে তেমাথার মোড়টায় পৌঁছে দেখল সেখানে একটা জটলা হ'চ্ছে। রামচন্দ্র বোঝাচ্ছে আর তার চারপাশে দাঁড়িয়ে দশ পনরজন চাষী এক সঙ্গে তর্ক করছে। এমন কি বুধে ডাঙার রজব আলি সান্দারও এসে জুটেছে। সে কথা বলছে না, পাগলের মতো দলটির চারপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সহসা এমন ব্যাপার ঘটে না। ভক্ত কামারের ছেলেরা আজ ভক্তকে নিয়ে গেল। নদীর ঘাটে তাকে নৌকায় তুলে দিতে যে দু'একজন গিয়েছিল তারা লক্ষ্য করেছিল, শুধু তারা দু'একজন নয়, আরও অনেকে এসেছে ভক্ত কামারের চলে যাওয়া দেখতে। রেল এঞ্জিনের মতো শব্দ ক'রে

নয়, ভিজে মাটিতে লগির বাঁশের কিছুমাত্র শব্দ হ'ল না যখন ভক্ত কামারের নৌকা এ গ্রামের মাটি ছেড়ে নদীতে ভেসে গেল।

স্তব্ধ হ'য়ে খানিকটা পথ চলার পর কথাটা উঠে পড়েছিল এর তার মুখে। বুধে ডাঙার রজব আলি দু'সনে যে জরাজীর্ণ হ'য়ে গেছে এদের আলোচ্য বিষয়ে আকৃষ্ট হ'য়ে নিঃশব্দে এদের পেছনে পেছনে চলে এসেছে।

চাষীদের মধ্যে একজন শেষ কথা বলার ভঙ্গিতে বলল,—গত সন যা হইছে তা হইছে এ সন আর নয়। খাইখালাসি দিছি তার দলিল কই?

—তোমরা তার কাগজে টিপ দেও নাই? রামচন্দ্র প্রশ্ন করল।

—সই টিপ দিছি, কিন্তুক রেজেষ্টারি হয় নাই, সব ভুয়া। লাগে লাগুক মামলা।

রামচন্দ্র বললে,—বুকের ভেতর হাতড়ায়ে দেখ তার কাছে টাকা খাইছ কি না খাইছ।

—তখন যে না খায়ে মরি, তা দেখে কে? আর একজন চাষী বলল।

—সেই তো বড় কথা, তার টাকায় প্রাণ বাঁচছে।

অন্য একজন অল্প বয়স্ক চাষী তেড়ে উঠে বলল,—মানিনা ও সব দলিল। টাকায় নিছি টাকায় দিব। চিতি সাপ্। দলিল সাপের খোলস।

—দলিলের দোষ কি ভাই, সবই জমিরই কোন না কোন দলিল আছে। চৈতন্যর দোষ কি কও, সে খাইখালাসি না করলি আর একজন করত। নিয়ম আছে তাই সে করছে, না থাকলি সে করত না।

এমন সময়ে জনতার মধ্যে থেকেও রামচন্দ্রর দৃষ্টি পড়ল মুঙলার মুখের উপরে। তখনও মুঙলার মুখ আবেগ ও অবমাননায় আকুঞ্চিত হ'চ্ছে।

—কি হইছে রে?

—ও পাড়ার থিকে মার খায়ে আলাম।

—মার খায়ে?

রামচন্দ্রর ডান হাতখানা বারবার গোঁফের কাছে উঠে পড়তে লাগল। ক্রোধে, ক্ষোভে বিচলিত হ'য়ে পড়েছে সে, বুদ্ধিতে কিছু ঠাওর হচ্ছে না; কিন্তু দর্শকদের মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় সে প্রতিবিধিৎসায় মনস্থির ক'রে ফেলেছে।

—কার হাতে মার খালে মুঙলা?

মুঙলা ছিদামের ধান কাটার কথা ব্যক্ত করল।

রামচন্দ্রর চারপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের একজনের হাতে একটা বড় লাঠি ছিল। হঠাৎ সেটাই রামচন্দ্র নিয়ে হাঁটতে লাগল; মাঝে মাঝে তার হাত উঠে যেতে লাগল গোঁফে। ভারি দেহে দ্রুত হাঁটার ফলে তাকে দেখে মনে হতে লাগল যেন একটা রাস্তা সমান করার এঞ্জিন, ধ্বস্ ধ্বস্ শব্দ ক'রে ছুটছে, যত তাড়াতাড়ি যন্ত্র চলছে, ততটা পথ অতিক্রম করছে না। গ্রামবাসীদের ছোট দলটি রামচন্দ্রের পেছনে পেছনে চলছে।

ছিদামের ধান খেতের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়ে রামচন্দ্র দেখল দু'জন বাঙাল ছিদামের দুপাশে

পাহারায় দাঁড়িয়েছে আর জন তিনচার বাঙাল বিপরীত দিক থেকে ধান কাটছে। রামচন্দ্রর মনে হ'ল সে হো হো ক'রে হেসে ফেলবে—এই ধানের এত হাঁক্ ডাক।

কিন্তু হাসিটা ফুটবার আগেই তার মনে পড়ল মুঙ্‌লাকে অপমান করেছে এরা।

রামচন্দ্র বলল,—মুঙলাকে মারছে কে? অন্যায় করে সে, আমাকে কলেও হ'ত। ছিদাম বলল,—অন্যাই কেন্? অন্যাই আমার। আমি ধান দিছি খেতে, চিতিসাপের থু-থু লাগা খেতে; সেই মহাপাতক।

রামচন্দ্রর রাগটা অকস্মাৎ যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, লাঠির উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে প্রচণ্ড স্বরে বলল,—তাফাৎ।

ওপাশের জঙ্গলটা নড়ে উঠল, বোধহয় চৈতন্য সাহা স্থান পরিবর্ত্তন করল। খেতের বাঙাল চাষীরা ধানের গোড়া ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

—ধান কাট কোন সোম্মুন্দি, কোন চিতিসার বাপের খেত এটা?

একজন বাঙাল চাষী বলল,—গাল মন্দ ক'রেন না, ভাই।

—ভাই! শালা আমার চোদ্দপুরুষের।

ক্রুদ্ধ বাঙালরা একসারি হ'য়ে দাঁড়াল, কাস্তে মাটিতে রেখে তারাও হাতে লাঠি নিল। ছিদাম আর মুঙলা রামচন্দ্রকে বাধা দেয়ার জন্য কি বলতে গেল; কিন্তু তার আগে রামচন্দ্র খেতের মাঝখানে গিয়ে ঘাড় বেকিয়ে দাঁড়িয়েছে, হিংস্রতায় তার দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, ক্রোধে তার পিঠ, বুক ও পাশের পেশীগুলি ছিড়ে যাবার মতো টান টান।

পেছন থেকে রজবআলি ফিস্ ফিস্ ক'য়ে বলে দিল,—রাগ কমান মণ্ডল, গা-ঢিল দেন; লাঠি চলবি নে।

ওপাশের জঙ্গলের পেছন থেকে চৈতন্য সাহা কি যেন বলল। একজন 'বাঙাল' কান পেতে শুনল, তারপর সব 'বাঙাল' পুকুরের পারে উঠে দাঁড়িয়ে বলল সমস্বরে হুলাহুলি ক'রে—আমরা ধান কাটার নাইগা আসছি, মারপিট আমরাও জানি আজ তা কয়ে গেলাম।

বাঙালরা চলে গেলে রামচন্দ্রর দেহ থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল। সে জল কাদায় মেশান ধানের মধ্যে বসে পড়ল। তার বুক তখনও সাপের ফণার মতো বারংবার আকুঞ্চিত ও বিস্ফারিত হচ্ছে।

গ্রামবাসীরা ঘিরে দাঁড়াল রামচন্দ্রকে, ছিদাম আর মুঙলা রামচন্দ্রের সম্মুখে কাদার উপরে বসে পড়ল। গ্রামবাসীরা নিজেরাই এসে দেখল একজন স্ত্রীলোকও এসে দাঁড়িয়েছে ভিড়ের মধ্যে। খাটো হলদে শাড়ী পরা, আঁটসাট দেহ, চুলগুলি খুব টেনে বাঁধা, বড় বড় চোখ। চাষীদের যদি ভাষাজ্ঞান থাকত বলত, তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটি উপাসনার মতো কতকটা। সে শ্রীকৃষ্টের বৈষ্ণবী পদ্ম।

রজবআলি এতক্ষণ একবার খেতের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছিল, একবার পিছিয়ে যাচ্ছিল, এবার সে প্রায় রামচন্দ্রর পাশে বসে দুই হাঁটুর উপর দিয়ে হাত দুটি ধানের দিকে অগ্রসর ক'রে দিয়ে খুঁত খুঁত ক'রে হাসতে লাগল।

ছিদাম বললে,—কেন্ জেঠা, ধান কাটি?

রামচন্দ্রর হ'য়ে মুঙলা বললে,—এবেলা না হয়, ওবেলা কাটব। ভাই সব, তোমরা সকলে আসবা। আমার সখার এই ধানে ভোজ হবি, আকাশে ছিটায়ে ছড়ায়ে দেব।

কিন্তু রামচন্দ্র মাথাদোলাল, গোঁফে একবার চাড়া দিয়ে মনটাকে স্ববশে এনে সে কথা বলল,—ধানে হাত দিবা না, ও ধান তোমার না।

—তবে?

—আগে বিচার কর, রাজার কাছে যাও, তার কথা শোন। যদি রাজা বলে ধান তুলবা।

—রাজা তো এখন শহরে। উকীল দিয়ে মামলা ক'রে তার কথা শুনতে চার মাস; ততদিনে ধান মাটিতে পড়ে নোতুন ক'রে গাছ হবি। হরিশ বললে কথাটা।

—গাঁয়ের রাজা সান্ন্যাল আছে, তাদের কাছে যাও।

—তোমার সে রাজা মহাজনের পক্ষ, মিহির সান্ন্যাল খাইখালাসি কারবার করে।

রামচন্দ্র একটু থামল, তারপর কথাটা বুঝিয়ে বলার ভঙ্গিতে বলল,—যে খাজনা খায় তাকে রাজার কাজও করতে হবি। রাজা-মহাজন এদের তো কওয়া হয় নাই আমরা দেনা-খাজনার দায়িক হব না। ক'য়ে বলে দেনা-খাজনা বন্ধ করবের পারব না ভাই। যা করব জানায়ে শুনায়ে।

রামচন্দ্র উঠে দাঁড়াল। মুঙলা-ছিদাম অন্যান্য সকলকে বিস্মিত ক'রে সে বলল,—আমি এই কাদা গায়ে সান্ন্যাল মোশার কাছে যাতেছি, যদি তিনি মহাজনের বিপক্ষে আচ্ছয় দেয় তবেই আমাকে আবার দেখবা।

রামচন্দ্র খেত পার হ'য়ে সান্ন্যালবাড়ীর পথ ধরল।

পদ্মর মনে হ'ল—কি ভীরু, কি ভীরু।

কিন্তু সেটা শেষ কথা নয়। আদর্শটা কি ক'রে তৈরী হয় কে জানে। মেয়েদের বেলায় বোধ হয় নিজের বাবাই আদর্শবীজ। বাবার মতো এমন শক্তিশালী কেউ নেই, বাল্যের এই বোধ পুরুষদের সম্বন্ধে বিচার করার আদর্শের মূলে চিরকালের জন্য থেকে যায়। নিজের ভাইরা, নিকট আত্মীয় পুরুষরা এই আদর্শের পুষ্টি করে, এবং পরবর্ত্তী জীবনে অপরিচিত যে পুরুষকে মেয়েটি গ্রহণ করে প্রথম ভাবালুতা কেটে যাওয়ার পর সেই পুরুষ তত বেশী নিকটে আসে যতখানি মেয়েটির পুর্বপরিচিত আত্মীয়-পুরুষগুলির সাথে তার চরিত্রগত ঐক্য আছে। পদ্মর কল্পনায় এমন একটি পুরুষ কেন্দ্রীভূত হ'য়ে গেছে। এটা সে এর আগে কোনদিন অনুভব করে নি, এখনো তার চিন্তায় একথাগুলি ভেসে উঠল না। এমন কালো তেল চুইয়ে পড়া রঙ, এমন পেশীবহুলতা, এমন ভারভারিক্কি গোঁফ, এমন পাকা কাঁচায় মেশান একরাশ চুল মাথায়,—পদ্মর অনুভবে অপুর্ব একটি একাত্মবোধ ফুটে উঠল। নিজের মনের সাথে সে সওয়াল জবাবে নামল,—না ভীরু নয়, ভীরু নয়। পাঁচ ছ'জন 'বাঙাল' চাষীর সম্মুখে, তারাও নিরস্ত্র নয়, লাঠি-হেঁসো ছিল, যে হাঁক দিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় সে ভীরু নয়।

গ্রামময় রাষ্ট্র হ'য়ে গেল। খাইখালাসি আর বন্ধকী, বরগাদারী, কিম্বা পত্তনি হঠাৎ যেন তার প্রতি দুর্ভিক্ষের আগেকার দিনগুলির মতো মমত্ব বোধ করল চাষীরা।

সন্ধ্যার পর চাষীরা শুনল রামশিঙা বাজছে, খোলে ঘা পড়ছে, ঢোলকে আখর ফুটছে:

চিতিসাপ চাঁদ শাহে লাগল বিসম্বাদ
শোনো শোনো দেশবাসি তাহার সম্বাদ
—চাঁদ হেন্তাল হাতে নিল।

তখন দুপুরবেলা, মানুষের স্নান আহারের সময়; কাদা মাথা, অস্নাত অভুক্ত একটি লোক আঙিনায় এসে দাঁড়িয়েছে দেখা করতে এই সংবাদ পেয়েছিলেন সান্ন্যালমশাই। সহরে যাদের দারোয়ান থাকে তার তুলনায় দারোয়ান-বরকন্দাজের সংখ্যা তার বাড়ীতে বেশী, কিন্তু দারোয়ানের মুখে কথা দিয়ে লোককে ফিরিয়ে দেয়ার অভ্যাস তাঁর নেই ; কেন নেই—সেটা অন্য কথা। সরাসরি অন্দরের আঙিনায় আসবার জন্য রামচন্দ্রর উপর সান্ন্যালমশাই যৎপরনাস্তি বিরক্ত হ'য়েছিলেন, কিন্তু তবু তাঁকে সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল।

সান্ন্যালমশাই সম্মুখে এসে দাঁড়াতেই রামচন্দ্র নিচু হ'য়ে ব'সে সেকালের কায়দায় তার হাতের লাঠি তাঁর পায়ের কাছে রাখল।

—আছ্রয় চাই, আজ্ঞা।

—কি করেছ ?

—অন্যাই করছি করছি, আছ্রয় দেন, কবুল আপনার কাছে।

—কি আশ্চর্য্য, রামচন্দ্র, তুমি অন্যায় করবে, আর তার প্রশ্রয় আমি দেব, এমন আশা তুমি কোর না ; মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা ক'রে থাক তার ব্যবস্থা আদালতে হবে। তুমি কি আমাকে ফৌজদারিতেও জড়াতে চাও। সান্ন্যালমশাই বিরক্ত হ'লেন।

—না, আজ্ঞা। গড়ছিরিখণ্ড এটা, তার জমিতে দাঁড়িয়ে আপনার কাছে কথা ক'চ্ছি। নীলকর সাহেব আমাদের জেরবার করছিল, আজ্ঞা, আমাদের বাপ সান্ন্যাল গুলি ক'রে মারল নীলকর সাহেবকে। ফৌজদারিতে কি হয়, পুলিশ ক'লে ডাকাতি। আমরা জানি, হুজুর, দু'বিঘে জমির জন্যে অমন রাগ হয় না, সান্ন্যালদের। অনেক অপমান ছিরিখণ্ডের লোকরা সহ্য করছিল, সেই সকলের রাগ ফাটে পড়ল ঐ দু'বিঘে জমির ছুতা ক'রে।

রামচন্দ্র যাই বলুক, কথা বলার সময়ে তার চোখদুটির যে পরিবর্ত্তন হ'তে থাকে সেটা চোখে পড়লে তার আন্তরিকতায় সন্দেহ করার কিছু থাকে না।

রামচন্দ্র ব্যাপারটা বলল। চৈতন্যসার খাইখালাসি বন্দোবস্ত, চাষীদের বিপদ, ছিদামের ছেলেমানুষি ইত্যাদি বর্ণনা ক'রে অবশেষে সে বললে,—ও জমিও আমার না, ও ধান বোনার একপয়সাও দামও আমি দিই না। কিন্তুক ছাওয়ালদের কৌশলে জড়ায়ে পড়লাম। এখন লোকে কবি ছিদাম-মুঙলাকে আমি শিখায়ে দিছি।

রামচন্দ্র বিস্মিত হ'ল, সান্ন্যালমশাইও আশ্চর্য্য হয়ে পাশের দিকে চাইলেন। রূপনারায়ণ কখন এসে দাঁড়িয়েছে, এরা কেউ লক্ষ্য করে নি, শুধু রূপু নয়, রূপুর পাশে সুমিতি।

রূপু বললে,—তুমি কিছু অন্যায় করনি, রামচন্দ্র, লোকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যারা তাদের আরও বিপদে জড়াতে চায় তারা সভ্য সমাজে বাস করার উপযুক্ত নয়। তুমি কিছুমাত্র অন্যায় করনি, এটাই বুঝবার চেষ্টা কর।

রূপু থেমে গেল। বোধ হয় আর কথা খুঁজে পেল না। সে আর দাঁড়াল না। একটা মৃদু সুঘ্রাণ ও সুমিতির অলঙ্কারের মৃদুশিঞ্জন রইল।

রামচন্দ্রকে যা বলবেন ভেবেছিলেন সেটা ঠিক হবে না রূপুর কথার পরে, রূপকে যেন তাতে

হীনমান করা হবে—এই মনে হ'ল সান্ন্যাল মশাইএর। তিনি বললেন,—আচ্ছা রামচন্দ্র, তুমি যাও খবর নিচ্ছি।

দ্বিপ্রহরের নিদ্রার পরে সান্ন্যালমশাইএর মনে পড়ল এই কথাগুলি। রামচন্দ্র কথা বলার সময়ে ছিরিখণ্ড কথাটা বলেছিল। কথাটা শ্রীখণ্ড, এখন ভাষার বিবর্ত্তনে চিকন্দি, জমিদারির কাগজপত্রে চিকনডিহি। আশপাশের আর দশখানি গ্রামের সাথে চিকন্দির কি পার্থক্য আছে এটা এখন খুঁজে খুঁজে বার করতে হয়। রায়দের বাড়ীর ধ্বংসাবশেষের উপর যে জঙ্গল সেদিকে অতি প্রয়োজনও কেউ যায় না ; আর আছে সান্ন্যালদের এই বাড়ী ; কিন্তু সান্ন্যালদের বাড়ীর ঐতিহাসিকতা বড়জোর দেড়শ' বছরের এবং সে ইতিহাসের সাথে কোন গড়েরই কোন সম্বন্ধ নেই।

তবু কারো কারো মনে চিকন্দি এখনও গড় শ্রীখণ্ড। রামচন্দ্র যেন সেটাই এইমাত্র প্রমাণ করে গেল।

আর লক্ষ্য কর কি কৌতুকের বিষয় এটা হ'তে পারে। রামচন্দ্র তাঁকেও যেন অতীতে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে। এরকম লোকের সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে পাওয়া যায় যারা বর্ত্তমান পৃথিবীতে বাস করে কিন্তু অতীতের অদৃশ্য এক আবরণ যেন থাকে তাদের। কথাটা চিন্তা করতে গিয়ে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর বড়ছেলে একবার কলেজ-ছুটিতে বাড়ীতে এসে বলেছিল: তাদের কলেজের এক অধ্যাপক সারাজীবন ছেলেদের ক্রিকেট খেলতে অনুপ্রাণিত করে পেন্সান নিয়ে কাশীতে যান। সহসা একদিন তিনি পেন্সান নেয়া বন্ধ ক'রে দিলেন, কাশীতে এখন তিনি দণ্ডী সন্ন্যাসি হ'য়ে আছেন। ভিক্ষালব্ধ খুদই তাঁর আহার্য্য। অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক নৈমিষারণ্যের আবহাওয়া সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছেন এমন দৃঢ়তার সঙ্গে যে ব্যাপারটাকে লঘু ক'রে ভাবতেও সঙ্কোচ হয়। এমনি অতীত প্রয়াসী মন রামচন্দ্রের, এবং তার প্রয়াসেও যেন এতটুকু ছলনা নেই।

সে যাই হ'ক মূল ব্যাপারটার সাথে ছেলেমানুষির যোগ আছে, এবং সেটা রামচন্দ্রও ব'লে গেছে। চৈতন্য সা'কে বিষয়টির এ দিকটাতেই নজর দিতে বলবেন, এবং ছেলেমানুষি ব্যাপারটাকে মামলা মোকদ্দমার পর্য্যায়ে নেবার চেষ্টা করার জন্য রামচন্দ্র চৈতন্য উভয়কেই তিরস্কার করবেন, এই স্থির করলেন তিনি।

এমন সময়ে নায়েব এল।

—কি সমচার ? প্রফুল্লমুখে আলাপের সূত্রপাত করেলেন সান্ন্যালমশাই।

—আজ্ঞে, আপনাকে ব্যাপারটা জানানো দরকার। চৈতন্য সাহার খাজনার হিসাব নিচ্ছি।

—তার খাজনা কি খুব বেশী বাকি ? তেমন তো মনে হয় না।

—আজ্ঞে না, সে নাকি এ অঞ্চলের বহু প্রজার জমি খাইখালাসি বন্দোবস্ত নিয়েছে, খবর নিতে হচ্ছে সেটা গত অষ্টমের আগেও বহাল ছিল কি না।

—এমন গর-ঠিকানা ব্যাপার তো তোমার কাছারীতে হয় না।

—ঠিক তা তো নয়। দুর্ভিক্ষের জন্য নিজগ্রামের প্রজাদের খাজনা আদায়ে একটু ঢিলে দেয়া হয়েছিল। এখন যেন মনে হচ্ছে চৈতন্য সা ঠকিয়েছে। সে যদি খাইখালাসি বন্দোবস্ত করে থাকে

তবে খাজনাটাও তারই দিয়ে দেয়া উচিত ছিল। ছোটবাবু এই কথাই বলেছেন। সে তো দুর্ভিক্ষের ফৌত প্রজা নয়।

—ছোটবাবু আজকাল দপ্তরে আসছেন না কি?

নায়েব পুলকিত হ'য়ে বলল,—কোনদিনই আসেন না। আজ দুপুরে প্রথম এসেই দপ্তরের গাফলতি ধ'রে ফেলেছেন।

রূপনারায়ণ কাছাকাছি ছিল। হুকুমটা এই প্রথম দিয়েছে সে, সান্ন্যালমশাই ডাকলেন,—এস, ছোটবাবু, এস। নায়েবমশাইএর সাথে তোমার কথাই হ'চ্ছিল।

—নায়েবমশাইকে আমি একটা কাজের কথা বলেছি, শুনেছেন।

—শুনলাম, কিন্তু হঠাৎ এমন কড়া হ'লে কেন?

—দুষ্ট প্রজাকে শাসন করা দরকার।

সান্ন্যালমশাই কপট গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে বললেন,—তা ভালো, হঠাৎ কিনা।

—হঠাৎ হ'ল। কাল গ্রামের পথে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে শুনলাম সব। চৈতন্য সাহাকে শাসন করা দরকার, সে যা ব্যবস্থা করেছে তাতে খাইখালাসি বলুন কিম্বা বন্ধক বলুন চাষীরা কোনদিনই আর তাদের জমি ফিরে পাবে না।

সান্ন্যালমশাইএর হাতে গড়গড়ার নলটা দুলতে লাগল। রূপু বলল,—এর আর একটি দিক আছে। বেশীর ভাগ চাষী চৈতন্য সার কাছে বন্ধক দেয়া জমিতে চাষ দিতে অনিচ্ছুক। চৈতন্য সার এমন ক্ষমতা নেই নিজে সে জমি চাষ করে, তার ফলে সারা গ্রামের আধখানা খেতে ফসল উঠবে না। আহার্য্য দুর্মূল্য হবে, চাষী-সম্প্রদায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে।

—কিন্তু তা হ'লেও চৈতন্যসা'কে খাজনার তাগিদ দিয়ে কি হবে।

ফলটা ঠিক কি হ'তে পারে তা ভেবে দেখেনি রূপনারায়ণ, ফ্রেজারসাহেবের কাহিনী শুনে তার স্থলভূত চৈতন্যসা'কে তাগিদ দেয়ার কথা মনে হ'য়েছিল। সে কথাটাই বললে সে।

—ফ্রেজারকে একেবার তাগিদ দেওয়া হয়েছিল, মাষ্টার মশাই বলছিলেন।

—কাকে, ফ্রেজারকে? তার কথা তুমি কি জানো?

সান্নাল মশাই বিস্মিত হ'লেন, যতনা ফ্রেজারের নাম শুনে তার চাইতে বেশী ফ্রেজারের সাথে চৈতন্যসাহার তুলনায়। ছেলের মনে বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছে, শুধু বইএর পাতায় লেখা ব্যাপার নয়, শুধু মাত্র আলাপ-আলোচনা ব্যাপার নয়, ব্যক্তিগতজীবনে সেই বিদ্বেষ দৃঢ়মূল হবে এমন সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। প্রাপ্ত-বয়স্কদের জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে যার মূলে থাকে বিদ্বেষ। তেমনি একটি ঘটনা ফ্রেজার-নীলকরের। রামচন্দ্র বলেছিল বটে। কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে নীলকর ফ্রেজার স্যান্নালদের প্রজাদের অনেক জমি দখল করেছিল, তারপর লাগে ছোটখাট বিবাদ। ফ্রেজারকে অবশেষে একদিন তার বাংলোয় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল, তখনও নাকি তার হাতে বন্দুক ধরা ছিল। কিন্তু এই বিদ্বেষ প্রকাশের বয়স নয় রূপুর। অন্তত ছেলে মানুষ করার যে বিশিষ্ট পরিকল্পনা তাঁর আছে, তার সাথে রূপুর এই বিদ্বেষ-পরায়ণতা মেলে না। কথাটা সদানন্দকেও বলা দরকার। ঠিক করলেন, বললেন,—কলেজের পড়া শেষ হওয়ার আগে এমন সব কাজে যেন হাত না-দেয় রূপু।

কিন্তু আর একটি দিকও আছে। রূপুর এই ব্যাপারটায় খুসী হবার মতো কিছু কিছু যেন পেলেন তিনি। এই তো সেদিনও রূপু সবগুলি যুক্ত বর্ণের পরিচ্ছন্ন উচ্চারণ করতে পারত না। তার আজকের কথাগুলি শুধু পরিচ্ছন্নভাবে উচ্চারিত হ'য়েছে তা নয়; চিন্তা ক'রে, ধীরে ধীরে বিশিষ্ট একটা অর্থ প্রকাশ করার জন্য বলেছে সে কথাগুলি। তার গলার স্বরে তার মায়ের কণ্ঠের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এখনও ততটা নিটোল এবং পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে নি, একটু যেন খন্‌খন্‌ ক'রে ওঠে, কিন্তু স্বরটি যে মায়ের তা বোঝা যায়। এ ব্যাপারটা আকস্মিকভাবে আজই অনুভব করলেন সান্ন্যাল মশাই এবং উপভোগও করলেন।

সন্ধ্যার পর অনসূয়া বললেন,—শরীর বা মনের একটা কিছু তোমার খারাপ হ'য়েছে।

—অশান্তি বোধ করছি। গ্রামের চাষীদের মধ্যে অসন্তোষ, সেটা তোমার ছেলে টেনে আনছে বাড়ীতে।

—কোন্ ছেলে?

—ছোটছেলে, রূপু।

সান্ন্যালমশাইএর মুখের দিকে খানিকটা সময় চেয়ে থেকে অনসূয়া বিব্রত বোধ করলেন। নিজেকেই অশান্তির মূলীভূত ব'লে মনে হ'ল। বড়ছেলের দেয়া আঘাতটা সহ্য করেছেন ব'লেই আরও বেশী তাঁকে সহ্য করতে বলা যায় না।

সমস্যার সমাধান হিসাবে অনসূয়ার মনে হ'ল রূপুকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য অন্য কোথাও যাওয়া যায়, কিন্তু তিনি তার কোন কাজকেই সমস্যার সমাধান হিসাবে চিহ্নিত করতে কুণ্ঠিত হ'লেন। রূপুকে যদি কিছু দিনের জন্য গ্রামের বাইরে রাখতেই হয়, তাহ'লে তাকে বুঝতে দেয়া চলবে না যে সে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে ব'লেই তাকে অন্যত্র যেতে হ'ল। এই কুণ্ঠা থেকে তিনি সমাধানটা চিন্তা ক'রে রাখলেন কিন্তু স্বামীর সম্মুখেও প্রকাশ করলেন না।

বরং বললেন,—রূপুকে বলো ব্যাপারটি তুমিই হাতে নিয়েছে, তাহ'লে ও নিশ্চয়ই নিরস্ত হয়।

কিন্তু সান্ন্যালমশাইএর চোখের প্রান্তে প্রান্তে ত্বক কুঞ্চিত হ'ল। কঠিনতম ব্যাপারগুলি নিয়ে আলোচনা করতে করতেও এমন হয়, তখন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে তাঁর মুখের কথার অর্থ বোঝা কঠিন হয়; রহস্যের সুর লাগে কথায়, রহস্য ব'লে গ্রহণ করাও যায় না।

সান্ন্যালমশাই বললেন,—এমনি ভাগ্য বটে আমার। ছেলের কাঁচা হাতে যে জমিদারির প্যাঁচগুলি খেলছে না। সেগুলি আমার হাতে দেখতে চাও?

অনসূয়া সান্ন্যালমশাইএর মুখের দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন, কাজেই তাঁর কানে এই কথাগুলি খানিকটা রহস্যের আভাস দিল। সহসা উত্তর দিলেন না তিনি। এই অবসরে খাসভৃত্য এসে তামাক দিয়ে গেল; একগোছা বিলেতি কাগজের সাপ্তাহিক সঞ্চয় সে সঙ্গে এনেছিল। এগুলি সদানন্দ মাষ্টারের হাত ঘুরে এসেছে, পড়ার মতো খবর ও আলোচনায় টিক্ দিয়ে দিয়েছে সে। বর্ত্তমানে তার একান্ত সচিবত্বের এটুকুই কর্ত্তব্য ব'লে নির্ণীত হয়েছে।

ভৃত্য চলে গেলে অনসূয়া বললেন,—অনেকদিন পরে একটা কথা মনে পড়ে গেল।

এই মনে পড়ার ব্যাপারটা কৌতুকের। এক সময় ছিল যখন অনসূয়া তাঁর নিজের এবং সান্ন্যাল

মশাইএর মধ্যে একটি ব্যবধান লক্ষ্য করতেন, এবং কল্পনায় সেটাকে দুর্লঙ্ঘ্য ব'লে মনে করতেন। সেই সব দিন এখন নেই, এ সাপ্তাহিক খবর ও আলোচনা ছাড়া আর কিছু এখন পারস্পরিক আলাপ আলোচনার চাইতে বড় নয়। সেজন্য এই সাপ্তাহিক কাগজের গোছা দেখে অনসূয়ার মনে পড়ল পুরানো কথা।

অনসূয়া বললেন,—এককালে তোমার যখন গুরুদেব ছিল, তখন আমারই হ'য়েছিল সব চাইতে বেশী বিপদ।

—কালু খাঁ স্বরোদিয়ার কথা বলছ?

—বোধ হয়, ঐরকমই নাম ছিল।

—কেন বলো তো, তিনি কি আবার তোমাকে পত্র দিয়েছেন? তাঁর মাসোয়ারাটা কি ঠিক মতো যাচ্ছে না?

—না, আমার কষ্টটাই বৃথা গেল।

—তা বটে, তা বটে। একদিন আবার দেখতে হয়।

সঙ্গীতকলা সম্বন্ধে কিছুকাল স্মৃতি আলোচনা করে অনসূয়া সংসারের তদারক করতে বার হ'লেন। সান্যালমশাই কালু খাঁর কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

একটা সমস্যার চারিদিকে সমাধানের আবরণ দিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা যদি হয় এটা অনসূয়ার, তবে তিনি খানিকটা সফল হ'লেন বলতে হবে।

(ক্রমশঃ)

"আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়।" ॥ বীরবল ॥

অপাপবিদ্ধ

অমল দত্ত

দৈনিক কাগজের পাত্রপাত্রী বিভাগে একটি বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। বিজ্ঞাপনটার হুবহু নকল দেওয়া গেল:

পাত্রী চাই—সওদাগরী অফিসে চাকুরে (৫০০৲) ঘোষ বংশজ বঙ্গজ কায়স্থ পাত্র (বয়স অনধিক ৩৫) অবস্থাপন্ন যে কোনো জাতের পাত্রী বিবাহ করিতে প্রস্তুত—মধ্যম শিক্ষিতা হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষ দাবী আছে। অনুসন্ধান করুন পোঃ বক্স ৭১৮ (অবশ্য পত্রযোগে সাক্ষাৎকার সময় ইত্যাদি)।

কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবকদের অনেকে এই বিজ্ঞাপনদাতার প্রতি উৎসুক হয়ে উঠেছেন—বলা তো যায় না, যদিই টোপ গেলে। তাছাড়া পাত্রটি নিশ্চয়ই উদার, বঙ্গজ কায়স্থ হয়েও জাতিবৈরিতা নেই, ফুল মেলের বালাই নেই, অথচ, বেতন প্রথম শ্রেণীর পর্য্যায়। তবে 'বিশেষ দাবী' আছে। এমন পাত্রের আর 'বিশেষ দাবী' কীই বা থাকতে পারে? বাড়ি বাঁধা রাখতে হবে না নিশ্চয়ই। অতএব—

চিঠির স্তূপ এবং কয়েক ডজন টেলিগ্রাফ ঘেঁটে সুরঞ্জন পাঁচটি প্রস্তাব মাত্র অনুমোদন করলে এবং পত্রযোগে সাক্ষাৎ সময়ও নির্দেশ করে জানালে। এই সমস্ত ভাগ্যবানরা যথাবিহিত এসে তাঁদের দীর্ঘদিনের অভ্যাস-প্রসূত পাত্রীর গুণাগুণ ও তাঁদের শক্তি-সামর্থ সম্পর্কে সবিনয় নিবেদন করলেন। কিন্তু টিকলেন মাত্র একজন। তিনি সুরঞ্জনকে কলকাতায় একটি ছোটখাট বাড়ি দিতে প্রতিশ্রুত হলেন।

পাত্রীর পিতা নবকিশোর দাস জাতে কুলীন না হলেও ব্যবসায় কুলীন। মেয়েটিকে ইস্কুলের গণ্ডী ছাড়িয়ে কলেজেও ভর্তি করিয়েছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত পাত্র যোগাড় করতে পারেন নি। পাত্ররা যে ইম্পোর্ট লাইসেন্সের মত সহজলভ্য নয় এটা তিনি বিগত সাত বছর ধরে বুঝেছিলেন, সে জন্য ব্যবসায় ছ' মাসের ক্ষতি ধরে সুরঞ্জনকে একটা বাড়িই কবুল করে ফেললেন। এবং তা-ই ছিল সুরঞ্জনের 'বিশেষ দাবী'।

অন্যান্য অভিভাবকরা অবশ্যি ফিরে গেলেন দুঃখিত চিত্তে, নিজেদেরকে বারবার ধিক্কৃত করলেন তাঁদের অসঙ্গতির জন্যে। কিন্তু বিরক্ত হতে পারলেন না, বরঞ্চ আশা রাখলেন যদি সুরঞ্জন কোনো দিন বিগতদার হয়। কারণ ছেলেটি বেশ—কথায় বার্তায় আচার-ব্যাভারে মর্যাদায় চমৎকার, এর জন্যে পুরণো কুলীন প্রথাও চলতে পারে—অথবা শরিয়ত প্রথা!

সুরঞ্জন গললগ্নীকৃত টাই ধরে ওঁদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন, আমার অফিসের তাড়া আছে—নইলে আপনাদের সঙ্গে আত্মীয়তাটি পাকা করে নিতেম।

তাঁরা উত্তর দিয়েছিলেন,—তাতে কি, আরেকদিন না হয় আসবো।

সুরঞ্জন বললে, ও কথাটাই সাহস করে বলতে পারছিলেম না।—আর যাঁকে বিয়ে করবো, তিনিও তো আপনাদের মেয়েরই সামিল।

দাসমশাই উচ্ছ্বসিত হলেন,—ঠিক বলেছো বাবা! মশাইরা, আপনাদের ঠিকানা দয়া করে রেখে যাবেন।

তাঁরা ঠিকানা জানিয়ে আচ্ছা বলে কপালে হাত ঠেকিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। কেউ কেউ ভাবলেন—এমন রুই-ও বাজারে পাওয়া যায়।

শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহের পবিত্র কাজটি হয়ে গেল। সুরঞ্জনের সঙ্গে বরযাত্রীর বালাই বিশেষ ছিল না। হৈ চৈ তো নয়-ই। কন্যাপক্ষের জনতা আসর গরম করে রেখেছিল। জড়োয়া গয়না, রূপোর কাঁসার কাচের চীনেমাটির বাসন-পত্তর, কাঠের আসবাব, নানা বসনালয়ের প্রায় সমস্ত বসন, নিউ মার্কেটের ফুলের কাড়ি, নানা প্রকার অপাঠ্য পুস্তক ছাড়াও আরো একটি দানসামগ্রী ছিল। তা হলো যাদবপুরে একটি ক্রীত বাড়ির কবলানামা।

বিয়ের শেষে দাসমশাই গদগদ ভাষায় বললেন, বাবা তোমার হাতে আমার নন্দরাণীকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

প্রত্যুত্তরে সুরঞ্জন জানালে, আজ্ঞে আমিই আপনার কেয়ারে এসে কৃতার্থ হলেম। আমি বড় অসাংসারিক, কোনো কিছুই গুছিয়ে রাখতে পারিনে—পৈত্রিকসম্পত্তি তো আত্মীয়রাই লুলেপুটে নিয়ে গেছে, শুনেছিলেম আমাদের সামান্য জমিদারিও ছিল। এখন যা-ই করি আপনার পরামর্শ নিতে পারবো।

দাসমশাই মাথা নেড়ে বললেন, সে তো নিশ্চয়ই। এক শ' বার। তুমি বাবা বিদ্বান লোক, তুমি থাকতে আমাকেও উকিলের বাড়ি বেশী ছুটোছুটি করতে হবে না।

—আজ্ঞে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আইন পাশ করেছিলেম—বিদ্যেটা কাজে লাগাতে পারি নি। এ বার ঝালিয়ে নিতে পারবো। তবে অফিসেও আমার ঐ জন্যেই একটু প্রতিপত্তি আছে। ইনকম ট্যাক্স ব্যাপারে আমিই তদবির করি।

দাসমশাই আকর্ণ হেসে বললেন, তা হলে তো আরো ভালো।

তারপর তিনি ডবল জোরে চাকর বাকরদের ডাকাডাকি করেলেন, গোপনে গিন্নীকে গিয়ে জানালেন অসম্ভব সৌভাগ্যোদয় হয়েছে। এবং বিদায় বেলায় সুরঞ্জনকে বারে বারে কবলাটা সম্বন্ধে অবহিত করলেন।

নন্দরাণীর সংসার সাজানো গুছানো। সামান্য ক'দিন ভাড়াটে বাড়িতে থেকে সুরঞ্জন নিজ বাড়িতেই উঠে এসেছে। নিজেদের বাড়ি, চাকুরে স্বামী আর দুপুরে ঘুমোবার মত প্রচুর অবসর—খুব কম স্ত্রীর ভাগ্যেই জোটে। তাই নন্দরাণী বড়ো খুশী বড়ো সুখী।

সুরঞ্জন শুধোয়, তুমি একা একা কাটাচ্ছ—খুব কষ্ট হচ্ছে তো!

—না, কষ্ট আর কী। অনেকদিন গোলমালে কাটিয়ে এমন নিরিবিলি বেশ লাগছে।

—ওখানে অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল—তা ওদেরকে নেমন্তন্ন করলেও তো পারো। চেনা চেহারা দেখলে একঘেয়ে লাগবে না।

নন্দরাণী হেসে বললে, মেয়েদের বেড়ালের স্বভাব—সহজে ঘর ছাড়তে চায় না।

—মেয়েরা চায় না বলে কি ছেলেরাও চায় না।

নন্দরাণীর মুখ রাঙা হয়ে উঠলো।—সবার কি আর ছেলেবন্ধু থাকে। তা তোমার বুঝি খুব মেয়ে বন্ধু আছে?

—থাকা তো উচিত।

নন্দরাণী ফিক করে হেসে বললে, তা হলে ওদেরকেই নেমন্তন্ন করো, সময়টা কাটবে ভালো।

সুরঞ্জন তাড়াতাড়ি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অফিসের সময় হয়েছে ভেবে বাথরুমে ছুটলো। নন্দরাণী একাই কৌতুক উপভোগ করলে, আর কেউ থাকলে জমতো ভালো। আরো মজা হতো।

সুরঞ্জনের কাছে নন্দরাণীর এখনও অনেকটা অপরিচিত। জীবন যাত্রার কতগুলি দাবি-দাওয়ার বাইরে অপরিচয়ের রহস্য তার মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। তা ছাড়া উৎসব তখনো শেষ হয় নি। আত্মীয়তার বেড়াজাল ক্রমশঃ প্রশস্ততর হচ্ছিল।

তাতে সামান্য আদর আপ্যায়নের খরচে সুরঞ্জন লাভবানই হচ্ছিল। উপহারের আয়টা কম নয়। সুরঞ্জন সংসারী নয় এবং নন্দরাণী নিতান্ত দায়ে না পড়লে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খায়নি—এ জন্যে দাসমশায়ের বাৎসল্যরস প্রতিদিনই কিছু না কিছু ক্ষরিত হয়ে সুরঞ্জনের জমা-খাতায় জমে উঠেছিল।

শ্বশুরের গাড়িতে চড়ে হাওয়া খেয়ে সুরঞ্জনের শুধু অম্বলের ধাতটাই শুধরে যায় নি—উপর আলার প্রসন্ন দৃষ্টিও লাভ করে বেতন বাড়াবার ব্যবস্থা হয়েছিল। বাড়িতে গুরুজনের অভাব। নন্দরাণী নিজেই সুরঞ্জনকে বললে, তা হলে আমি একজন লক্ষীমন্ত বউ। কী বলো? আমার জন্যে তোমার চাকরীর উন্নতি হলো।

সুরঞ্জন ঠিক যেন কথাটি ঠাহর করতে পারে নি—একটু পরেই মৃদু হাসির আভাস দেখা গেল, খুব নতুন কিছু বললে না। অফিসে এ কথা আগেই বলা হয়ে গেছে।

—তাদেরকে ডেকে এনে মিষ্টি খাইয়ে দেবো।

—মিষ্টির চেয়ে ওরা মিষ্টি মুখই পছন্দ করে বেশী—

—তা নিজের ঘরেই দেখতে পায়।

—যারা দেখতে পায় না তাদেরকেই ডেকে আনবো।

নন্দরাণী লজ্জিত হয়ে বললে, যাও। কী যে বলো!

সুরঞ্জন সিগারেটের বোঁটাটা ছুঁড়ে ফেলে বললে, ওতে লজ্জার কী আছে—তোমার সঙ্গে বিয়ে না হলে আমিই তোমার প্রেমে পড়তুম।

নন্দরাণী খিল খিল করে হেসে উঠলো,—তা এখনো পড়ো না—কেউ বাধা দেবে না।

সুরঞ্জন মুচকি হেসে বললে, প্রেমের তুমি কিছু জানো না।

ঠিক কবির কথা নয়। আপ্তবাক্যও না। এমন একটা প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরে নন্দরাণী উল্লসিত হয়ে উঠলো।

বাড়ি-বদলের দরুন কিছু বইপত্তর ট্রাঙ্কজাত হয়েছিল। নতুন বুক কেসে সেগুলো সাজাতে গিয়ে নন্দরাণী একটা ফটোগ্রাফ আবিষ্কার করলে। সুরঞ্জনের সঙ্গে কেউ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। নন্দরাণী বই গোছানো বন্ধ রেখে খুব গভীর মনোনিবেশে ফটোগ্রাফখানা পরীক্ষা করেও ঠিক ঠাহর করতে পারলে না—কে এই মেয়েটি। শুভরাত্রিতে যে সব মহিলা এসেছিলেন কারোর সঙ্গেই এর আদল নেই। তা হলে নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা হৃদয়গত ব্যাপার আছে যা অনেক কাল অতীতের। নন্দরাণী ফটোখানা শাড়ির আঁচল দিয়ে ঝেড়ে মুছে সুরঞ্জনের টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখলো।

সুরঞ্জন হাসিমুখেই অফিস থেকে ফিরলো, হাসিমুখেই নন্দরাণী চায়ের তদারকে গেল—কিন্তু চা জলখাবার নিয়ে নন্দরাণী ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে সুরঞ্জনের দিকে তাকাল; ফটোখানা টুকরো টুকরো হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে আছে, সুরঞ্জনের চোখে জল টলমল।

নন্দরাণী ব্যাকুল হয়ে শুধাল, কি হয়েছে?

—কিছু না। তুমি আমাকে না জেনে রূঢ় আঘাত দিয়েছো।

—কী বলছো! এটা কার ছবি?

—গঙ্গাপদ বোস বলে যে ভদ্রলোক তোমাকে মেয়ে ডেকে একটা আংটি দিয়ে গেলেন, তাঁরই মেয়ে ছিল। মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে—

—আত্মহত্যা করেছে! কেন?

—কুমারী মেয়েরা যে কারণে আত্মহত্যা করে—

—ওর মাথায় যেন সিঁদুরের ফোঁটা দেখলুম—হাতে শাঁখা ছিল মনে হচ্ছে।

—শাঁখা নয়, তোমার চোখের ভ্রম। ওটা আমার মনে হয় বোটানিক্যাল গার্ডেনে তোলা ছবি—

—না, বোটানিক্যাল গার্ডেন নয়!

—ও তাহলে লেকের ধারে।

—না। একটা ষ্টুডিয়োতে ছবি তুলেছো নিশ্চয়ই। মেয়েটির কী নাম ছিল?

—রাজ্যশ্রী বোস।

নন্দরাণী চমকে উঠলো,—তোমার অনেকগুলো বইয়ে এর নাম লেখা আছে, লেখা আছে রাজ্যশ্রী ঘোষ।

সুরঞ্জন গম্ভীরভাবে বললে, গঙ্গাপদ বাবুর ইচ্ছে ছিল আমি ওকে বিয়ে করি। কিন্তু তুমি কি মনে করো আমি যা-তা মেয়েকে বিয়ে করতে পারি?

—কিন্তু—

সুরঞ্জন অধীর হয়ে বললে, তুমি আমাকে পরখ করছো, করো। তবে কোনোদিনও গঙ্গাপদবাবুর পরিবারের লোকজনের সামনে ও নাম উচ্চারণ করো না—গঙ্গাপদবাবুর মনে করেন, রাজ্যশ্রী নামে ওনার কোনো মেয়েই ছিল না। আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো গ্লানি ওর সঙ্গে ফটো তোলা!

নন্দরাণী বললে, চা-টা খাও, জুড়িয়ে যাচ্ছে।

রাজ্যশ্রী গঙ্গাপদ বোসেরই মেয়ে। সুরঞ্জনের প্রথমা স্ত্রী। সুরঞ্জনের মনে পড়ুক বা না পড়ুক, গঙ্গাপদবাবুর মনে ও নাম শূলব্যাথার মতো মাঝে-মাঝে চাড়া দিয়ে ওঠে। বিশেষত সুরঞ্জন যখন অপ্রতিভ হাসি দিয়ে স্নেহাতুর কাঙ্গাল নয়নে গঙ্গাপদবাবুর স্বাস্থ্য অন্বেষণ করে।

গঙ্গাপদবাবুর মেয়ে বিয়ে করে সুরঞ্জনের চাকরী স্থায়ী হলো। কেরাণী থেকে অফিসার হতে দক্ষতার পরিচয় দিতে হলো না। গঙ্গাপদবাবু অবসর নিলেন মেয়ের ভবিষ্যত অত্যুজ্জ্বল রেখে। আদুরে মেয়ে রাজ্যশ্রীর ডাক নাম মন্টি। গঙ্গাপদবাবু আদর করে বলতেন, আমার মন-টি। সেই মনই তাঁর ঝলসে গেল।

কিন্তু সুরঞ্জন জলধরপটলবৎ গর্জালও না বর্ষালও না। তুচ্ছ হাসির ঝিলিক মেরে পরম উদাসীনতার পরিচয় দিল। এমন মহামহিমতা গঙ্গাধরবাবু ও অন্যান্য আত্মীয়দের মুগ্ধ করে রাখলো। প্রতিবেশীদেরও এবং যারা জানে তাদেরও। কাজেই, সকলেই এই বেদনাময় পরিস্থিতি নিয়ে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলবে না বলে একরকম মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললো।

শুধু অনেকদিন পরে অকারণ আলোড়ন জাগাল নন্দরাণী।

কলেজের রঙিন দিনগুলো যবে শুরু হয়েছে, রাজ্যশ্রী বধূবেশে একদিন সুরঞ্জনের বাড়িতে উঠে এলো। সুরঞ্জনের মা তখনো বেঁচে আছেন, একটি দূরআত্মীয় মেয়ে তাঁর হুকুমে রান্নাবান্নার কাজ চালাত—চাট্টি খেতে পেত। রাজ্যশ্রীর আসার সঙ্গে সঙ্গে সেও বাপের ঘরে দূর হলো।

সুরঞ্জন তখন ধাপে ধাপে উঠছে—তাই মায়ের এ ব্যবস্থাটা তার মনোমত হয় নি। তাছাড়া গঙ্গাপদবাবু বললেন, একটা লোক দেখে নাও সুরঞ্জন—মাইনেটা আমিই দেব।

অগত্যা তার মাকেই দেখা গেল হেঁসেলে ঢুকে রান্নার ব্যবস্থা করতে—এতে রাজ্যশ্রী আরও লজ্জিত হয়ে পড়লো। ওর অপটু হাতে শ্বাশুরীর কাজে বাধাই সৃষ্টি করলো মাত্র।

রাজ্যশ্রী সুরঞ্জনকে বললে, তুমি মাকে বলো—আমিই করে নিতে পারবো।

সুরঞ্জন জানাল,—ওতে মা'র বাতের উপকার হবে। কাজ করুক না।

মুশকিল হয়েছে—অর্ধাহারে আধপেটা অবস্থায় কোনো লোকই থাকতে চায় না। কয়েক মাসের মধ্যে সুরঞ্জনের মা'র তত্বাবধানে যে কোনো মোটা লোক রোগা হয়ে যেতে পারে। রাজ্যশ্রীকে দেখে গঙ্গাপদবাবু শঙ্কিত হলেন। জোর করেই একটা লোক রাখলেন এবং মাঝে মাঝে বাজার সওদার তত্ত্ব পাঠাতে লাগলেন।

কিছুদিনের মধ্যে সুরঞ্জনের পদোন্নতি হলো—সুরঞ্জনের মাও মারা গেল। যা করবার গঙ্গাপদবাবুই করলেন।

একটু অবসর সময়ে রাজ্যশ্রী একটা বাঁধানো খাতা আর কলম নিয়ে গভীরভাবে উদাস হয়ে থাকতো।

এ খবরটা আগে সুরঞ্জনের জানা ছিল না। জেনে উৎসুক হয়ে উঠলো।

—তুমি কবিতা লিখতে পারো তা আগে বলতে হয়।

—মাসিক কাগজে পাঠাতে নাকি ?

—লোকজন ডেকে পড়ে শোনাতেম।

—মাফ করো। লোকজনের সামনে আমি নেই। মাঝে মাঝে খেয়াল হয়, তাই খাতাটা নিয়ে বসি। ও আমায় প্রাইভেট ব্যাপার।

স্বরঞ্জন হেসে বললে, তুমি কি বলতে চাও তোমার কবিতা আর কেউ শোনে নি ? আমিই প্রথম শ্রোতা ?

রাজ্যশ্রী হেসে ফেললে। কুপিত কণ্ঠে বললে, তুমি তো জোর করে শুনলে, তোমাকে কি শুনিয়েছিলুম—না জানাতে চেয়েছিলুম।

—তুমি ভেবেছিলে আমি কবিতার সমঝদার নই, তুমি কবিতা যখন লিখছ, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ তোমায় উৎসাহ দেবার আছে। আমার মনে হয় আমাকে তারা নিতান্ত গদ্য মনে করে আসতে সাহস পায় না—

রাজ্যশ্রী জোরে হেসে উঠলো—ঠিক তাই। অন্তত অতীনদা তাই মনে করেন। তুমি তো বেশ ধরতে পেরেছ !

—আরে ছি ছি। তাঁকে আসতে বলো। তিনি এমন একটা ধারণা করে বসে রইলেন। না হয়, আমিই অনুরোধ করবো—

—আচ্ছা, আমিই আসতে চিঠি লিখে দেবো।

সদলবলে অতীন ভট্টাচার্য এলো। কিছু ছেলে, কিছু মেয়ে। স্বরঞ্জন তাদের সঙ্গে বিনয়-নম্র বচনে সামান্য কথাবার্তা বলে কাজ আছের অজুহাতে বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো।

তারপর থেকে ওরা প্রায়ই আসে। অন্তত অতীন আসে। ক'দিন দেরী হয়ে গেলে স্বরঞ্জনই উদ্বেগ প্রকাশ করে বলে, আমি ভেবেছিলেম বুঝি আপনার অসুখবিসুখ করেছে।

অতীন লজ্জিত হয়ে বলে, না তা নয়। আমারও তো এক আধটু কাজকর্ম আছে। ইচ্ছে থাকলেও আসা হয়ে ওঠে না।

—আপনি কী করেন ?

—এই ছোটখাট টুকটাক বইয়ের ব্যবসা করি। চাকরীবাকরী তো আর জুটলো না।

স্বরঞ্জনের সস্তায় বই কেনার একটা সুযোগ হয়ে গেল। অনেক সময় অতীন বই দিয়ে দাম নিতেও ভুলে যেত। স্বরঞ্জনও ভুল শুধরে দিত না।

গঙ্গাপদবাবু অতীনকে কোনোদিনও সুনজরে দেখেন নি। কলাচর্চায় কেউ বৃথা কালক্ষেপ করে এটা তিনি চাইতেন না। আর শ্রেফ কথা বলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কী করে এরা কাটিয়ে দেয় এটা তাঁর ধাতে পোষাত না—কিন্তু অতীন পাড়ার ছেলে, গঙ্গাপদবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে একটা মাসীমা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা ছাড়া আপদবিপদে ডাকলেই সাড়া দেয় এবং ছাত্র হিসেবেও সুনাম ছিল—কাজেই গঙ্গাপদ-বাবুর কোন আপত্তি নিজের কাছেও টিঁকতো না।

মন্টির বিয়ের পর গঙ্গাপদবাবু নিশ্চিন্ত হলেন। মেয়েটা সীতা সাবিত্রীর পথে গেল।

স্বরঞ্জনের বাড়িতে অতীনের প্রবেশাধিকারে তিনি খুব খুশী হলেন না, তবে স্বরঞ্জনের উদারতায় মুগ্ধ হলেন।

স্বরঞ্জনদের বাড়িটা তেতালা ছ'টা ফ্ল্যাট। দোতালার মুখোমুখি দুটো ফ্ল্যাটের একটাতে স্বরঞ্জন থাকতো। দোতালার দুটো পরিবারের মধ্যে প্রতিবেশী সম্বন্ধ ছিল আর অন্যান্যরা পরিচিত নয়, তবে অপরিচিত ছিল না। এ বাড়ির কোথাও কিছু ঘটলে সেটা রটে যেত। স্বরঞ্জনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি বৃদ্ধির কথাটা অজানা থাকে নি।

সিঁড়ির মুখে অতীনকেও অনেকে চিনে নিয়েছিল। ভদ্র মহিলার বন্ধু।

স্বরঞ্জন কখন বাড়ি থাকে তাদের অজানা ছিল না।

রাজ্যশ্রী যদি স্বরঞ্জনকে অনুযোগ করতো—সারাদিন খালি অফিস নিয়েই থাকবে—তোমায় সঙ্গে কোথাও যেতে পারিনে—কতগুলি দরকারী জিনিসের লিষ্টি একটা করেছি না কিনলে আর চলছে না—

স্বরঞ্জন বলতো—আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই বেশী কিনবে, তার চেয়ে বলো কতটাকা লাগবে—অতীনবাবু সঙ্গে যাবেন।

—বারে, অতীনদা কি আমাদের ঘরের লোক যে ফাইফরমাশ খাটাবো !

—অতীনবাবু আমার একজন বন্ধু তাঁকে আমার কথা বলো !

—বেশ তো, তুমিও যাবে।

—আমার কি সময় আছে ! চাকরীটা বজায় রাখতে হবে তো—অতীনবাবু সেদিন সিনেমার টিকিট কিনে আনলেন, কিন্তু যেতে পারলেম কোথায় !

—লোকে কি বলে বলো তো।

—লোকে বলে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে না হয়ে অতীনবাবুর সঙ্গে হলেই ঠিক মানাত।

—যাও ! বকো না—

গঙ্গাপদবাবু চাকরী থেকে অবসর নিলেন, স্বরঞ্জন অফিসে আরও বেশী করে জড়িয়ে পড়লো। অন্তত স্বরঞ্জন তাই বলতো।

রাজ্যশ্রীর মাঝে মাঝে মনে হতো স্বরঞ্জন তাকে অবহেলা করছে। কারণ অফিস ছুটির পর স্বরঞ্জন কোনদিন সিনেমায় গেছে এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে—অথবা গঙ্গাপদবাবু এসে বলেছেন, কাল জামাই গিয়েছিল, শুনলুম তোর নাকি শরীরটা ভালো নেই মা !

স্বরঞ্জনকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো বলে, আর বলো না, পথে একজন পুরণো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—জোর করেই ছবি দেখাতে নিয়ে গেল !

অথবা বলে, অফিসের ব্যাপারে অনেক কিছু শ্বশুরমশাই থেকে জেনে নেবার আছে বালিগঞ্জ থেকে তোমাকে নিয়ে মাণিকতলা যেতে হলে আর যাওয়া হতো না।

একবার মায়ের অসুস্থতায় খবর নিয়ে এলো অতীন। রাজ্যশ্রী স্বরঞ্জনের কাছে ফোন করে খবরটা

দিয়ে বাড়ি বসে রইলো ওর সঙ্গে মাণিকতলা যাবে বলে। কিন্তু সুরঞ্জন ফিরে এলো অনেক রাতে, একাই মাণিকতলা থেকে ঘুরে।

পরের দিন রাজ্যশ্রী একা গেল মাকে দেখতে। সবাই তাকে দেখে নীরবে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। রাজ্যশ্রী গুমোটের কারণ ঠিক ঠাহর না করতে পেরে চোখের জল ফেললে।

মা রোগশয্যার পাশে ডেকে বললেন, কাঁদছিস কেন। সংসারে চলতে গেলে বুঝে শুনে চলতে হবে—খেয়ালে চলবে না।

রাজ্যশ্রী অবাক হয়ে গেল,—তুমি কি বলছো মা। আমি যে তোমার জন্যে ভেবে মরছি।

—পাগল মেয়ে, আমার তো দিন শেষ হয়ে আসচে! নিজের কথা একটু ভাব দিকি।

রাজ্যশ্রীর মনে হলো মা প্রলাপ বকছেন, তার চোখে আবার জল এলো।

কিন্তু সবার চোখ শীতের আকাশের মতো কালসে হয়ে গেল, যখন রাত্তিরের দিকে অতীন এলো রাজ্যশ্রীকে নিয়ে যেতে।

—চলো রাত হয়ে গেছে, বাড়ি যাবে না?

—অফিস থেকে এসে নিয়ে যাবে।

—উনি বাড়ি এসে অফিসের ফাইল নিয়ে বসেছেন—আমাকে দেখতে পেয়ে নাকি বেঁচে গেছেন।

তারপর রাজ্যশ্রী আর কোনো কথা না বলে লম্বা পা ফেলে রাস্তায় এসে থামলো। অতীন অনুসরণ করলে মাত্র।

রাজ্যশ্রী অসুস্থ হয়ে পড়লো। ঘুসঘুসে জ্বর। প্রথমে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা। তারপর যখন ব্যাপারটা নিউমোনিয়ায় দাঁড়াল, তখন একজন এলোপ্যাথী ডাক্তার ডাকা হলো। গঙ্গাপদবাবু মেয়ের জন্যে চিন্তিত হলেন, সুরঞ্জনকে দেখে মনে হলো কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

অতীন একাই সমস্ত দায়িত্ব বহন করে একটি নার্স নিয়ে রুগীর শিয়রের পাশে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিল।

সুরঞ্জন চুপিচুপি বললে, অতীনবাবু আমি কিন্তু আনাড়ি। আপনার উপরেই সব ভার। যখন যা খরচ লাগে করবেন, যে ডাক্তার দেখাতে হয় দেখাবেন, পরে বিলটা আমায় জানিয়ে দেবেন।

অবশ্য এ দুঃসময়ে টাকা পয়সার হিসেব করতে অতীনের দ্বিধাই ছিল।

রাজ্যশ্রী চোখ মেলে দেখেছে, অতীন শিয়রের পাশে দাঁড়িয়ে আছে—আরো দূরে চোখ ঘুরিয়ে দেখেছে—আর কেউ নেই নার্স ছাড়া।

একটু সুস্থ হয়ে রাজ্যশ্রী বললে, অতীনদা তুমি ছাড়া বুঝি আমার কেউ নেই—

সান্ত্বনার সুরে অতীন উত্তর দিল—দুষ্টু মেয়ে অভিমান হয়েছে বুঝি!

সুরঞ্জনের উৎকণ্ঠার কথা শুধু গঙ্গাপদবাবুই শুনলেন এবং তাঁর মুখ থেকে শুনলো পরিবারের অন্যান্যরা। শুধু মায়ের মনে হলো, অভিমানী মেয়ে ইচ্ছে করেই বুঝি অসুখটা ডেকেছে!

ডাক্তার মনে করেন একটু হাওয়া বদল দরকার। সুরঞ্জন একটু চিন্তিতভাবেই বললে, তা আমার পক্ষে তো যাওয়া সম্ভব নয়—তুমি বরং অতীনবাবুকে রাজী করতে পারো কী না ত্থাখো।

—অতীনদা রাজী হলেই বা আমি নিয়ে যাবো কেন।

—তাতে দোষ কি—তাঁরও হাওয়াবদল দরকার।

—তুমি দেখছি ওর সম্বন্ধে বেশী ভাবছো?

সুরঞ্জন হেসে বললে, সে ভাবনা তুমিই ধরিয়ে দিয়েছ—

—তার মানে?

—অতীনবাবুকে আমি আলাদা লোক মনে করিনে, আমার ভাবনা আর উনার ভাবনা এক। আমরা একই ব্যবসার পার্টনার কী না—

—সে আবার কী ব্যবসা?

সুরঞ্জন উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অতীন কথাটা শুনে রাজ্যশ্রীকে বললে, আমার মনে হয় কিছুদিন তোমার বাড়ি না আসাই উচিত—

—না তুমি আসবে বই কি।

—তুমি বুঝতে পাচ্ছো না মন্টি, ওতে তোমার ক্ষতি হবে।

—আমি তো ব্যবসাদার নই, ওসব লাভ ক্ষতির চিন্তা আমার না করলেও চলবে।

—ও ছাড়া কী সংসার চলে?

— ও রকম সংসারে আমার দরকার নেই। তুমি আসবে—আসবে—আসবে

—তোমরা কি আমায় মেরে ফেলতে চাও?

রাজ্যশ্রী কেঁদে ফেললে।

অতীন আসে বিকেলের দিকে। রাজ্যশ্রী প্রস্তুত হয়ে থাকে বাইরে বেড়াতে যাবার জন্যে। কোনোদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আশে পাশে—কোনোদিন লেকের ধারে—কোনোদিন বেহালার গ্রামাঞ্চলে দুজনে ঘুরে আসে।

রাজ্যশ্রীর মুখে ধীরে ধীরে রঙের ছোঁয়া লেগেছে।

ওরা ফিরে এলে সুরঞ্জন হয়তো কাগজের আড়াল থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে—আজকে যেন একটু তাড়াতাড়ি এসে গেলেন?

—হ্যাঁ, মন্টির আবার আপনার জন্যে ভাবনা আছে তো!

—ওতে আবার না শরীর খারাপ হয়!

অতীন জোরে হেসে বলে, শরীর থাকলেই খারাপ হয়।

—হ্যাঁ তা বটে। তবে ইতরবিশেষ আছে।

এরমধ্যে বইবিক্রীর মরশুম এসে গেল। অতীন অনিচ্ছাসত্ত্বে অনুপস্থিত হয়ে পড়লো। কয়েকদিন প্রতীক্ষা করে রাজ্যশ্রী চিন্তিত হয়ে উঠলো—অসুখ বিসুখ করতে পারে তো!

সুরঞ্জন যেন বিশেষ উদ্বিগ্ন এমনি ভাবেই বললে, আশ্চর্য অতীনবাবু লোকটা বেঁচে আছে তো!

রাজ্যশ্রী চমকে বললে, কেন কী হয়েছে?

—কী হয়েছে, জানলে কি ও কথা বলতেম।

—ও মরতে যাবে কেন।

—বেঁচে থাকলে অন্ততঃ একবার করে আসা উচিৎ।

—অসুখবিসুখ করতে পারে তো।

—তা নয় কথাটা হলো তোমাকে না দেখতে পেয়ে থাকাটা মরনেরই সামিল!

রাজ্যশ্রী চটে বললে, ও ধরনের ঠাট্টা করো না।

সুরঞ্জন আরো বিনয় করে বললে, ঠাট্টা কোথায়! নির্জলা সত্যি। অতীনের অসুখবিসুখ করতে পারে রাজ্যশ্রী মনেও করতে পারে নি—এ ভাবনা মাথায় চেপে তার উৎকণ্ঠা খালি বাড়তে লাগলো। তুপুরে বেলা খাওয়া দাওয়া সেরেই আর দেরী করলো না, অতীনের খোঁজে বেরিয়ে গেল।

মানিকতলায় বাপের বাড়ি গিয়ে জানলে, অতীন শেষ এই বাড়িতে এসেছে ওরই একটা চিঠি নিয়ে। রাজ্যশ্রী আর ওখানে দাঁড়াল না, অতীনদের বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়লো: অতীন বাড়ি নেই, বেরিয়ে গেছে।

রাজ্যশ্রী বাস ধরে সোজা চলে এলো কলেজ স্ট্রিটে—বই-এর বাজারে। অতীন রাজ্যশ্রীকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

—কেন, সুরঞ্জনবাবু কিছু বলেন নি? উনি যে আমার মারফত ওঁদের অফিস-লাইব্রেরীর জন্যে অনেকগুলো বই কিনে নিলেন। বেশ মোটা কমিশন পেয়েছেন ভদ্রলোক—

—বুঝেছি। আর কিছু বলো না। অতীনদা, বাবা কি শুধু টাকাটাই দেখেছিলেন? উনি তো জানতেন ছেলেবেলা থেকেই আমার কতরকমের সখ আছে—

—আমার কাছে তো ভদ্রলোককে মন্দ লাগে না। মণ্টি, কেন যে তুমি ওঁর উপর বিরূপ হয়ে উঠেছ!—এসো, 'জ্ঞানদা'র চায়ের দোকান-এ বসে কথা বলা যাক—

তারপরেও অনেকদিন অতীন আর এলো না। রাজ্যশ্রীর দিকে তাকিয়ে সুরঞ্জন খুব কিছু বলতে পারলে না। একদিন একটা চিঠি এসে গেল অতীনের কাছ থেকে সুরঞ্জনের নামে; অতীন কিছু চেক পাঠিয়েছে সুরঞ্জনের নামে, বই বেচার কমিশন। রাজ্যশ্রী হাতের লেখা দেখে চিনতে পারলে কিন্তু চুপ করেই রইলো। সুরঞ্জন ভাব দেখালে যেন একটা মহা গোপন দলিল।

পরের দিন সুরঞ্জন বললে, অতীনবাবুকে বলো তো যেন আমার সঙ্গে একবার দেখা করেন।

—অতীনদার সঙ্গে আমার দেখা হলে তো—

সুরঞ্জন চোখ ঠেরে বললে, তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। বলো কি!

—ক'দিন ধরেই তো উনি আসচেন না।

—বাইরেও তো দেখা হতে পারে!

—বাইরে গেলে তো দেখা হবে।

—ও আমি ভাবছিলেম তোমরা বুঝি অন্যত্র হাওয়া বদল করছো—

—কেন, তোমার সঙ্গে তো ব্যবসার সাঁট আছে—তোমার তো জানা উচিত। সুরঞ্জন মুচকি হেসে বললে, ব্যবসা তো তোমার সুখের জন্যে সে তো তোমার—

—মুখ সামলে কথা বলো! তুমি অত্যন্ত ছোটলোক!

সুরঞ্জন গম্ভীরভাবে বললে, তা বটে।

—তোমার কাছে অতীনদার চিঠি আসে—আমার সঙ্গে রসিকতা করে কী লাভ?

—চিঠির জবাবটাই তাঁকে সামনাসামনি দিতে চাই—

—চিঠিতেই দাও গে—

—তোমাকে পার্শেল করে পাঠাতে পারলে তা-ই করতেম!

—কী বললে!

—অতীনবাবুর সঙ্গে বোঝাপড়া করে এসো, অনর্থক এখানে চেঁচামেচি করো না।

সুরঞ্জনের কথায় বিন্দুমাত্র বিরক্তির চিহ্ন ছিল না।

রাজ্যশ্রী মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লো, অনর্থক অপমান করো না। আমাকে বিয়ে করেছিলে বলেই আজ বাবার পোষ্টে কায়েমী হতে পেরেছ।

—হ্যাঁ, গঙ্গাপদবাবু আমার মুরুব্বি। তাই বলে আমি তাঁর মেয়ের দালালি করতে পারবো না।

রাজ্যশ্রী রাগে ফেটে পড়তে চাইলো। কিন্তু কিছু বলবার আগেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

সুস্থ হয়ে আর সুরঞ্জনকে দেখতে পেল না। তখনো তুর্বল, মাথা ঝিম ঝিম করছে, ক্ষিধে অনেক আগেই মরে গেছে—তবু সে আস্তে আস্তে রাস্তায় এসে নামলো, ট্রামে চেপে বসলো।

অতীন শুনে তুঃখিত হলো। কোনো সান্ত্বনার ভাষা নেই। কিছু বলবারও নেই। তবু বললে, আমার মনে হয় মুখোমুখি কথা বলে আমি সুরঞ্জনবাবুর ভুল ভাঙতে পারবো। বেশ তো, তুমি যদি ওখানে না যেতে চাও, আজকের রাতটা মানিকতলায় তোমার বাপ-মা'র কাছে কাটিয়ে দাও—কাল সকালে সন্দেহ আর রাখবো না। সত্যি, আমি বুঝতে পারি নি মণ্টি, তোমার জীবন আমি এভাবে নষ্ট করতে বসেছি। হয়তো সুরঞ্জনবাবুরও দোষ নেই, বাজে কানাঘুঁষো শুনে এমন বিগড়ে গেছেন—

রাজ্যশ্রী চোখ মুছে বললে, তুমি জানো অতীনদা, ওঁর দাঁতে সাপের বিষ!

গঙ্গাপদবাবু মেয়েকে দেখেই ফুঁসে উঠলেন। রাজ্যশ্রী বাপের এমন মনোভাব আশা করতে পারেনি! দাঁড়িয়ে একঠায় কাঁদতে লাগলো। মা এসে টেনে মেয়েকে নিয়ে গেলেন! রাজ্যশ্রী জানতে পারলে কিছুক্ষণ আগে মাত্র সুরঞ্জন এ বাড়ি ত্যাগ করেছে। তার কলঙ্ককর কাহিনী বলতে গিয়ে নাকি সুরঞ্জনের চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে। সারাদিন বেচারা কিছু খায় নি, এখানে একমুঠো ভাত কোনোরকমে মুখে দিয়ে এক গ্লাস জল মাথায় ঢেলে অত্যন্ত অসহায় ভাবে বিদায় নিয়েছে।

মা মেয়েকে বুঝালেন,—যা বাড়ি যা, অনর্থক রাগারাগি করিস নে। গঙ্গাপবাবু শেষ জবাব দিয়ে দিলেন—যে মেয়ে স্বামীর ঘর করতে পারে না, বাপের দোরও তারজন্যে বন্ধ।

শুকনো মুখে শুকনো চোখে রাজ্যশ্রী সেখান থেকে বিদায় নিল।

ক্লান্ত শ্রান্ত পদক্ষেপে রাজ্যশ্রী সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো। মন ভরা বিতৃষ্ণা, তবু তাকে এসে দাঁড়াতে হলো ফ্ল্যাটের সামনে। দরজায় ঠক ঠক করে কোনো সাড়া মিললো না। রাজ্যশ্রীর পরে খেয়াল হলো—দরজায় একটা মস্ত বড়ো তালা ঝুলছে।

রাজ্যশ্রী দরজার সামনে নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো বহুক্ষণ।

তেতলার অনেকে উপরে উঠলো সকৌতুকে। কেউ কেউ নেমে আবার উপরে উঠলো। উপর থেকে মেয়েরা তাকিয়ে দেখে ফিস ফিস করে কী বলাবলিও করলো। সামনের ফ্ল্যাটের কর্তা ধূর্জটিবাবু একবার দরজা খুলে রাজ্যশ্রীকে দেখেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ভেতরে একটা ধমকের আওয়াজও পাওয়া গেল। হয়তো বাড়ির বধূ আসতে চাইছিল।

রাজ্যশ্রী ধীরে ধীরে বসলো। রাত বেড়ে চলেছে। আশেপাশে কোলাহল নীরব হয়ে গেছে—ট্রামের ঘর্ঘরও শোনা যাচ্ছে না। চারদিক যেন ছমছম করছে। আশ্চর্য, চাকরটা পর্যন্ত বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

বাড়ির দারোয়ান সদর দেউড়ি বন্ধ করে দিয়ে উপরে উঠে এলো। —আপনার কুছু ভয়ডর নেই, মাইজী, বাবু এখুনি এসে লিবেন—হামার খাটিয়া ইখানে ভেজ দেই, আপনি নিদ যান। বাবু এলে ডেকে লিব।

কিন্তু রাজ্যশ্রী রাজি হলো না। বললে, এই বেশ আছি। তুমি গিয়ে শোও, আমিই তোমাকে ডেকে দেবো।

রাজ্যশ্রী ঘুমিয়ে পড়েছিল। বসে থেকে চোখ জড়িয়ে এলো, রাজ্যশ্রী শুয়ে পড়লো। শেষরাত্রে ঠাণ্ডা বাতাসে আর ট্রামের গোঙানিতে হঠাৎ চমকে জেগে গেল।

তারপর প্রথম ভোরের আলোয় দারোয়ানকে ডেকে দরজা খুলিয়ে বেরিয়ে গেল।

অতীন অবশ্য প্রস্তুত ছিল না। তার বাড়ির লোকজনও এত ভোরে একজন মেয়েছেলে ডাকাডাকি করতে পারে ভাবতেও পারে নি।

—কী হয়েছে মন্টি?

—বাবা কাল বাড়িতে থাকতে দিলেন না—

—তারপর?

—স্বরঞ্জনবাবুর দরজায় তালা লাগানো—

—সে কি, তা হলে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছো!

—আজ থেকে ঘুরতে হবে—

—দাঁড়াও, জামাটা গায়ে দিয়ে আসি—

দরজাটা ভেজানো। অতীন রাজ্যশ্রীকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। স্বরঞ্জন যেন প্রস্তুত হয়েই আছে এমনি ভাবে বললে, আসুন, আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। অফিসের সময় হয়ে গেছে।

ধূর্জটিবাবুকেও আটকে রেখেছি, তাঁর সামনেই আমি রাজ্যশ্রীর জিনিসপত্তরগুলো বুঝিয়ে দিতে চাই। রাজ্যশ্রী, এই তোমার এটাচি কেস, এই তোমার ট্রাঙ্ক আর এই তোমার বিছানা—

অতীন কিছু বলবার আগে ধূর্জটিবাবু বললেন, এই যে জিনিসের লিষ্টটা আমার করা আছে—

অতীন চেঁচিয়ে উঠলে, আপনার কী মতলব, স্বরঞ্জনবাবু?

স্বরঞ্জন হেসে বললে, আর কি! আপনার পথ নিষ্কণ্টক করা।

বদমাশ! ভণ্ড! চালাকি পেয়েছো?—অতীন ছুটে গিয়ে স্বরঞ্জনের গলা টিপে ধরলো।

ধূর্জটিবাবু হৈ হৈ করে উঠলেন। আরো লোক জড়ো হলো। সবাই মিলে স্বরঞ্জনকে ছাড়িয়ে আনলে।

স্বরঞ্জন দম নিয়ে বললে, যাক, আমি পুলিশ ডাকতে চাইনে—আমার বাড়ি থেকে আপনারা দু'জন বেরিয়ে যান! এটা বেলেল্লাপনার জায়গা নয়।

জিনিসপত্তর প্রতিবেশীরা ফুটপাথে নিয়ে রেখে এলো। ধূর্জটির লিষ্টিতে দামী জিনিসগুলো ছিল না। আর ছিল না জড়োয়া গয়নাগুলো। সে সব ব্যাঙ্কের ভল্টে জমা আছে স্বরঞ্জনের নামে।

অতীন বললে, চলো মন্টি। কষ্ট করে যা রোজগার করি তাতে আমাদের দু'জনের চলে যাবে। আর তোমাকে এই পশুর হাতে তুলে দোব না।

ওরা যখন ফুটপাথে এসে দাঁড়াল এই বাড়ির লোকজন তখন তামাশা দেখবার জন্যে জানালায় বারান্দায় এসে ভিড় করলে।

"আমরা ইংরেজি-সাহিত্যের সোনারুপো যা চুরি করি, তা গলিয়ে নিতেও শিখিনি।" ॥ বীরবল ॥

ছায়াসীতা

অশেষ চট্টোপাধ্যায়

রাত্তিরে, অনেক রাত্তিরে, যখন শেষ জানালাটির সাদা চোখের ওপোর নামে অন্ধকারের ঢাকনা, আকাশে তারার ছড়াছড়ি, আর মাঝে মাঝে ঝরে যাওয়া দীর্ঘশ্বাসের মত একরাশ হাওয়া কাঁপায় নারকেল পাতার অজস্র সরু সরু আঙুল তখনই, ঠিক তখনই, সাউদার্ণ পার্কের অনেক ঘুমোন, আধঘুমোন মনের উপকূল ছুঁয়ে যেত স্বরোদের ধাতব সুর। উনিশ নম্বর বাড়ীটার সীমানা ডিঙিয়ে ছাড়িয়ে যেত। প্রিয়দর্শনবিধুরা অভিসারিকা বেহাগ কিংবা পুরুষ গম্ভীর মালকোষ। রোজই এক অভিনয়। আশে-পাশের অনেক কৌতুহলী মন প্রশ্নের কোন উত্তর পায় নি। উনিশ নম্বর বাড়ীর সব সময় বন্ধ দরজার কপাট খুলতে পারেনি কেউ। তবু মাঝে মাঝে কেউ কেউ দেখেছে বিপিনবিহারীকে। বয়েস বোধহয় পঞ্চাশের ক'ধাপ ওপোরের সিঁড়িই ছুঁয়েছে। দেহের কাঠামোতে ভাঙন ধরেনি বিশেষ। দীর্ঘ ঋজু দেহ। মেদবাহুল্যে পৃথুল নয়। একসময়ের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সময়ের উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে পুড়ে তাম্রাভ। রেখাকুটিল বিস্তৃত কপাল: বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার শিলালিপি। তবুও আরেক ধূসর অতীতের আশ্চর্য প্রতিভাস সেই মুখে। মাটি খুঁড়ে পাওয়া কোন প্রাচীন মূর্তির মতো।

তারপরে আরেকদিন সকালে অবাক হ'ল অনেক চোখ। উনিশ নম্বর বাড়ীর জানলাগুলো খুলে গেছে। আর ঝুলছে নীল পর্দা। এসেছে কারা যেন।

অবাক বিপিনবিহারী নিজেও কম হ'ন নি। সুদীর্ঘ পঁচিশটা বছর ধরে নিজেকে হিঁচড়ে টেনে এনেছেন অনেক মুহূর্তের এবড়ো খেবড়ো খোয়া ছড়ান সময়ের অমসৃণ রাস্তার ওপোর দিয়ে দিয়ে। বাড়ীটা কিনেছিলেন প্রায় উনচল্লিশ যুগেরও অনেক আগে। তখন এদিক ফাঁকা। সহরতলীর সীমানা। ট্রামবাসের টার্মিনাশ থেকে হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা হ'য়ে যাওয়া দূরত্ব। তারপর চোখের সামনে আধুনিকতম স্থপতিবিজ্ঞানের বিজ্ঞাপন এঁটে গজিয়ে উঠল অগুনতি বাড়ী। বাড়ীটার সর্বাংগে জমা হয়ে উঠল শ্যাওলার তকমা। কানিশে কার্নিশে অশ্বথ শিশুরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সবই বদলে গেল। বদলালেন না শুধু বিপিনবিহারী।

তাই সেদিন সকালবেলার খবরের কাগজে নিজেরই দেওয়া বিজ্ঞাপনটার ওপোর বিপিনবিহারীর চোখদুটো দাঁড়াল। একতলায় স্বয়ংসম্পূর্ণ তিনখানি ঘর নির্ঝঞ্ঝাট স্বামীস্ত্রীকে ভাড়া দেওয়া হইবে। বিপিনবিহারী রায়চৌধুরী। ১৯ নং সাদার্ণ পার্ক। আসবে হয়ত নতুন লোক। আর তাঁর পঁচিশ বছরের বরফ জমা শীতার্ত মনটাকে হয়ত উত্তপ্ত করে নিতে পারবেন অন্য প্রাণের উত্তাপে।

সাড়া এলো যথাসময়। সুবিমলকে দেখে মন্দ লাগল না বিপিনবিহারীর। চেহারায় একটা ফুটিয়ে তোলা জৌলুষ আছে। যাকে বলে স্মার্টনেশ। কিন্তু সন্ধানী চোখের সামনে ধরা পড়ে যায় ফাঁকটা। কথা বলে একটু বেশী। দশমিনিটের মধ্যে বিপিনবিহারী জানতে পারলেন সুবিমল বছর

খানেকের জন্যে বিলেতের মাটি ছুঁয়ে এসেছে, যার জোরে একটা মাঝারী মাইনের চাকরী জোটানো বিশেষ কঠিন হয় নি তার পক্ষে। বিয়ে করেছে বছর খানেক। নিঃসন্তান এখনো।

বিপিনবিহারী বিরক্ত হ'লেন মনে মনে। ভাবলেন, এর সঙ্গে এক বাড়ীতে কাটাতে হ'লেই হ'য়েছে। কিন্তু যত লোক এসেছে সকলেরই আছে চতুরংগ বাহিনী। সেদিক দিয়ে সুবিমল আদর্শ। সুবিমলের বিরুদ্ধে যুক্তিগুলো সাজিয়ে নিজেই আবার কাটলেন সেগুলো।

ওপোর নীচ ঘুরে দেখল সুবিমল। কাপড়ের ঢাকনায় ঢাকা স্বরোদটা দেখে বললো, ওটা কি? সেতার নাকি?

স্মিত হেসে বিপিনবিহারী শুধরে দিলেন, না স্বরোদ ওটা।

আপনি বাজান বুঝি? নিজের ধরে পড়ে যাওয়া অজ্ঞতাটাকে আমোল না দিয়ে সুবিমল বলে।

এই কিছু কিছু। বিনয়ে অবনত হ'লেন উজীর খাঁর শিষ্য বিপিনবিহারী।

আমি মশাই প্র্যাকটিকাল লোক। গানবাজনা বিশেষ বুঝি না। আর সময়ও নেই। তবে সীতা মানে আমার স্ত্রী কিন্তু চমৎকার গায়।

তাই নাকি? ঈষৎ ব্যঙ্গে তির্যক হ'লো বিপিনবিহারীর গলাটা।

হ্যাঁ। কত কম্পিটিশনে যে কাপ মেডেল পেয়েছে তার ইয়ত্বা নেই। ওর বাবা মস্ত বড় ওস্তাদ রেখে ওকে গান শিখিয়েছিলেন। রীতিমত ক্ল্যাসিক্যাল গান। সুবিমল প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দেয়।

শুনে সুখী হ'লাম; বললেন বিপিনবিহারী। আসলে দুঃখিতই হ'লেন। বাঁদর এবং মুক্তোর প্রবচনটা মনে হ'লো তাঁর।

তাছাড়া বিয়ের আগে রেডিওতে গাইত ও। আর একটুখানি জুড়ে দিল সুবিমল।

এখন গান না কেন?

আমি ওসব পছন্দ করি না। বিরক্তভাবে সুবিমল কেটে দেয় কথাটা।

তা হ'লে শুনতে পাব তো। কৃত্রিম সংশয় প্রকাশ করেন বিপিনবিহারী।

নিশ্চয়। এবারে হেসে ফেলে সুবিমল। আমি তো আর গানবাজনা বুঝি না কিছু। আপনার মতো সমজদার লোক পেলে নিশ্চয়ই খুব খুসী হ'বে সীতা।

বাড়ীটা পছন্দ হ'ল। আরও খানিক এলোমেলো কথাবার্তার পর আগামী কাল আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল সুবিমল।

পরদিন সকালে লরী করে মালপত্র এলো। ট্রাংক, বাক্স, খাট, বিছানা, আলমারী, চেয়ার, টেবিল, ফটো: একটা চলন্ত সংসার। এমন কি ছিটের কাপড়ের খোলে মোড়া একটা তানপুরা পর্যন্ত। বিপিনবিহারী নিজেই দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করলেন সারা সকাল। নিজের সুদীর্ঘ নিষ্ক্রিয়তাকে তবু যা হোক একটা কিছুর মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পেরে মনে মনে খুসীই হ'লেন। হাঁকডাক করে কুলীদের দিয়ে মালপত্র তোলালেন। কোন খানে কোন জিনিষটা রাখলে ভাল দেখাবে এ নিয়ে সুবিমলকে অযাচিত উপদেশ দিলেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব গোছান হ'য়ে গেল।

বিপিনবিহারী সুবিমল আর তার স্ত্রীকে এ বেলা খাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। সুবিমল সম্মতি

জানিয়ে গেল তার স্ত্রীকে আনতে। চাকর নাথুকে বাজারে পাঠিয়ে অপেক্ষার সিঁড়ি ভাঙলেন বিপিনবিহারী। মনে হ'ল পঁচিশ বছর আগেকার আরেক সকালের প্রতিচ্ছায়ায় সহজ হ'য়েছে আজকের সকাল। মুঠো মুঠো রোদ। গাছের পাতারা আরো সবুজ। সব কিছুর সঙ্গে যেন আবার নতুন করে শুভদৃষ্টি হ'লো বিপিনবিহারীর।

ট্যাক্সীটা এলো খানিক বাদে। প্রথমে নাবল সুবিমল। নাবল আর একটি মেয়ে। চমকে উঠলেন বিপিনবিহারী। কোন নির্জন পর্বতচূড়া থেকে নেমে এলো যেন তপঃক্লিষ্টা বিষণ্ণা ভৈরবী। মাথায় নেই শুধু পিংগল জটার ভার। তপস্বিনী ভৈরবী উমা যেন আজও খুঁজে পায় নি তার ঈপ্সিতকে। না পাওয়ার সেই অপূর্ণতা মেঘভেজা শ্রাবণের অংগরাগ হ'য়েছে দুই চোখে।

সুবিমল পরিচয় করিয়ে দিল, আমার স্ত্রী সীতা। আর ইনি বিপিনবিহারী বাবু। সংগীত সমঝদার লোক। বিপিনবিহারী কোন রকমে হাত দুটো জড় করলেন। প্রতিনমস্কার করল সীতা। হাসল। ফুরিয়ে আসা বিকেলের বিষণ্ণতায় ম্লান হ'ল সীতার মুখ।

দুপুরে খেতে বসে আয়োজনের আতিশয্য দেখে সুবিমল আর সীতা দু'জনেই অনুযোগ করলো। বিপিনবিহারী হাসলেন অপ্রস্তুতের মতো। বললেন, প্রায় পঁচিশ বছর ধরে একরকম অজ্ঞাতবাসই করছি। তার ওপোর সেকেলে মানুষ। একেলে আদব-কায়দা কিছু জানি না। ত্রুটি হ'লে মার্জনা করবেন।

সুবিমল সশব্দে হেসে ওঠে। আর একটি হাসিও জলতরংগ হয়। এ বাড়ীর অনেকদিনের পুরোন গুমোট হাওয়া যেন চমকে ওঠে সে হাসিতে। সুবিমল বলে, আপনি অবিনয়ী এ অপবাদ আপনাকে কেউ দেবে না।

পঁচিশ বছর ধরে একা আছেন এ বাড়ীতে? সীতার গলায় যেন একটা নতুন প্রশ্ন শুনলেন বিপিনবিহারী। যে প্রশ্ন এর আগে তাঁকে কেউ করেনি কখনো।

প্রায় সেরকমই। বলেন বিপিনবিহারী।

কেন আপনার স্ত্রী? একরাশ বিস্ময় ছড়িয়ে পড়ে সীতার গলায়।

নেই।

মারা গেছেন বুঝি। চোখ নামিয়ে আস্তে আস্তে বলে সীতা।

বেঁচেও কোনদিন ছিলেন না। হাসলেন বিপিনবিহারী।

ও, আপনি বুঝি বিয়েই করেন নি। হাসিতে অসমতল হয় সীতার মুখ। একা একা পঁচিশ বছর মানুষের মুখ না দেখে আছেন কি করে?

না, একেবারে একা আর কোথায়। সংগী আছে নাথুটা। আর সংগিনী এই স্বরোদ। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসে হাওয়ায় দাগ কেটে বললেন বিপিনবিহারী।

তবে বাড়ীটা ভাড়া দিলেন যে হঠাৎ। কথার শেষে একটা ছোট্ট টান দিয়ে বলে সীতা।

কি জানি বিজ্ঞাপনটা দেবার আগে পর্যন্ত ভাবি নি। পঁচিশ বছর ধরে নিঃসংগতার যে দুর্গটা

বানিয়েছিলাম, একদিনেই সেটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেললাম। অনেকদিন পরে প্রাণখুলে হাসলেন বিপিনবিহারী। অনেকখানি অর্থহীন হাসি।

হাসল সুবিমলও। বুঝে কিংবা না বুঝে। হাসল না শুধু সীতা। এই অসংবদ্ধ হাসির সমান্তরাল আর এক বেদনার অনুভূতিকে যেন অনুভব করলো মনে মনে।

কিন্তু বিপিনবিহারী যা ভেবেছিলেন তা হ'ল না। ওদের তরফের আন্তরিকতাটা প্রথম দিনের পরই ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। চোখাচোখি হ'লে একটুখানি হাসি, দুএকটুকরো মামুলী কথা। তার বেশী নয়। কখনো কখনো একতলা থেকে ভেসে আসে তানপুরোর অস্পষ্ট গুঞ্জন। আর সীতার গলাটা যেন আশ্চর্য সাবলীলতায় এঁকে দেয় একএকটি রাগরাগিণীর রেখাচিত্র। সাংগীতিক অলংকারগুলোর নিখুঁত বিশ্লেষণ সে গলায়। তবু কোথায় যেন একটা বেদনাবোধ করেন বিপিনবিহারী; মনে মনে কাছিয়ে-আশা দিনগুলোকে ইচ্ছেমতো প্রসাধিত করেছিলেন। এখন আবার সেই বৈচিত্র্যহীন পৌনঃপুনিকতা। রাত্তিরে রোজকার মত স্বরোদ এখনও বাজে। তবু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান বিপিনবিহারী। পিষ্টনের উল্লাসে আঙুলগুলো নেচে উঠেই থেমে যায়।

তবু একদিন এলো সীতা। দুপুরবেলায় তামাক টানছিলেন বিপিনবিহারী। পর্দার তলাকার সংক্ষিপ্ত অবকাশ দিয়ে উঁকি মারল নীল শাড়ীর ভগ্নাংশ। আলবোলার নলটা রেখে ডাক দিলেন অন্তরালবর্তিনীকে, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে আসুন।

পর্দা সরিয়ে ঢুকলো সীতা। দাঁড়াল দরজা ঘেঁষে। মাটিতে চোখ রেখে। আলগোছে খোঁপা ছুঁয়ে থাকা ছোট্ট একটুখানি ঘোমটা। সিঁথিতে হাল্কা সিঁদুর।

আসুন, দাঁড়িয়ে কেন। আবার বললেন বিপিনবিহারী।

একটু নড়ল সীতা। দূরত্বের প্রণালীটা কমিয়ে এনে বসল ফরাশের ধার ঘেঁষে।

রোজই আসব ভাবি। কতকটা কৈফিয়ৎ দেবার সুরে বলল সীতা।

আমিও রোজই আশা করি। হেসে বললেন বিপিনবিহারী। হাসল সীতাও। সুবিমল বাবুতো বেরিয়ে যান সেই নটার সময়, তারপর সারাদিন করেন কি?

কি আর করব, কিছুই না। একটু থেমে সীতা আবার বলল, আমাকে কিন্তু আপনি বলে কথা বলবেন না।

সেই ভাল। আমিও অস্বস্তিবোধ করছিলাম। সহজভাবে বললেন বিপিনবিহারী। কিন্তু বিকেলেও তো বোধ হয় বেরোও না বড় একটা।

কি করে বেরোব বলুন। অফিস থেকে বেরিয়েও উনি বসেন কাজ নিয়ে। বেরোবার অবকাশ কোথায় ওঁর।

তা উপরে চলে আসলেই তো পারো।

উনি তা-ও বিশেষ পছন্দ করেন না। আস্তে খুব নিচু গলায় কথাগুলো গড়িয়ে দিল সীতা।

তাই নাকি। ছাপিয়ে-ওঠা বিস্ময়কে ছড়িয়ে দেবার মতো আর কোন কথা খুঁজে পেলেন না বিপিনবিহারী।

সীতা মুখ নীচু করে ফরাশের ওপোর আঙুল বুলোতে লাগল। কি যেন বলতে গিয়ে একটু থামল। কাঁপল ঠোঁটদুটো। লাল হ'ল অল্প ঘেমে ওঠা নাকের ডগা। দুবার পলক পড়ল চোখের। তারপর বলেই ফেলল, আমি কিন্তু আপনার বাজনা শুনবো বলে এসেছি।

এই মুহূর্তটির জন্যে যেন অপেক্ষা করছিলেন বিপিনবিহারী। বললেন, বেশ। পাড়লেন স্বরোদটা। চিকারীর তার মিলোতে মিলোতে বললেন, শোন তবে গৌড় সারং। ভারী মিঠে রাগ। কথায় বলে দিনকা বেহাগ।

তরফের তারগুলো একসঙ্গে সাড়া দিয়ে উঠল। এলোমেলো আঙুলে কে যেন একরাশ সুরের নকশা বুনে দিল। ধুলো ওড়ান ধূ ধূ হাওয়া থমকে দাঁড়াল জানালার পাশে। নির্জন দুপুরে অবহেলায় ঝরে যাওয়া কৃষ্ণচূড়ার বেদনা গান হ'লো। গৌড় সারং মূলতানী ছুঁয়ে ভীমপলশ্রী হ'লো। সীতা অল্প উশখুশ করলো। বিপিনবিহারী বাজনা থামালেন।

এবারে উঠি। সীতা বলল।

সেকি, পুরো বাজনাটা শুনে যাও।

না, আজ আর হ'বে না। ওঁর আসার সময় হ'লো। ম্লান হ'লো সীতার গলা।

আচমকা একটা ধাক্কা খেলেন যেন বিপিনবিহারী। আর কিছু না বলে স্বরোদটা নাবিয়ে রাখলেন কোল থেকে। সীতা উঠে দাঁড়াল।

কই কেমন লাগল কিছু বললে না তো। জিজ্ঞাসা করলেন বিপিনবিহারী।

আপনার বাজনা আমার মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে না। হেসে বলল সীতা। চলে গেল। আর পড়ন্ত বিকেলের আলোর চেয়ে অন্ধকারটাই অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ হ'লো বিপিনবিহারীর মনে। একলা বসে অনেক কীটদষ্ট স্মৃতির উচ্ছিষ্ট নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন। কবে যেন শেষবার আর এক আশ্চর্য চোখের প্রতিভাসে তাঁর নিষ্প্রদীপ আকাশ একদিন কাকজ্যোৎস্নায় ধুয়ে গেছে। সে চোখ কৃষ্ণাবাইয়ের। সুর্মার বঙ্কনীঘেরা দুটুকরো উপমাহীন রাত। অমন সূক্ষ্ম মীড়ের কাজ আর ভরাট বোলতান আর শোনেন নি বিপিনবিহারী। তারপর কবে সরে গেছে জোয়ারের বেনোজল। মনের বালিতে পুরোন পলিমাটির দাগ এঁকে। কবে যে লোকালয়ের শেষ তোরণ ছাড়িয়ে এই প্রব্রজ্যা নিয়েছেন তা আজ ভাল করে মনেও পড়ে না। অসংখ্য চৈত্রশেষে অনেক বছর ইতিহাসের কফিনে বিশ্রাম নিয়েছে। সময়ের নীরেট পাথরটাতে তুরপুন চালিয়ে সমানে গর্ত করে চলেছেন। ভুলেই গিয়েছিলেন যে এখনো আকাশভরা কান্না নিয়ে শ্রাবণ আসে। কৃষ্ণচূড়ার সমারোহে বসন্ত প্রচারপত্র বিলি করে। হঠাৎ আজকের দুপুরে বিপিনবিহারী আবিষ্কার করলেন তিনি বিস্মৃত মৃত অতীত নন। তাঁর স্নায়ুতে এখনো চেতনার ক্ষীণ স্পন্দন কাঁপছে, অনুভূতির সূক্ষ্ম তারে টোকা দিলে এখনো প্রতিধ্বনি ওঠে। আরেক উপস্থিতির সান্নিধ্য তাঁকে উত্তপ্ত করে। তার অপসৃতিতে বেদনার জলকণা জমে মনের শার্শিতে। আর সে বেদনা কোনো হঠাৎ পাওয়া অসহ্য আনন্দের মতো আবেগে থরথর।

তারপরের দিনও এলো সীতা। তারপরের দিনও। ক্রমে রোজ। এই সময়টুকু একান্ত করে পাবার জন্যে রোজ একবুক আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেন বিপিনবিহারী। অতীত অধ্যায়গুলো হাতড়ে

অবচেতনার অন্ধকার থেকে অনেক বিস্মৃত অর্ধবিস্মৃত কাহিনীকে টেনে আনেন স্মরণের আলোতে। সীতা শোনে অবাক হ'য়ে, বিপিনবিহারীর সঙ্গে পা মিলিয়ে ঘুরে বেড়ায় কখনো না দেখা না শোনা আরেক জগতে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রকাণ্ড হলঘর। জ্বলছে হাজারবাতির ঝাড়লণ্ঠন। পুরু গালচের ওপোর বসে আছেন মীর সাহেব। টকটকে ফর্শা রং। মেহেদীরাঙান দাড়ী। দুহাত মেলে মেঘমন্দ্র-কণ্ঠে আলাপ ধরেছেন দরবারীর। যেন দেখতে পায় কৃষ্ণাবাইকে। সেই কৃষ্ণাবাই যার দুচোখে ছায়া ফেলে শ্রাবণের বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ। কৃষ্ণাবাই গান ধরেছে মিঞা-কি-মল্লারে, উমড ঘুমড ঘিরি বাদর আয়ে। শুদ্ধ কোমল দুটি নিখাদের আন্দোলনের মধ্যে ঝরে পড়ছে বৃষ্টির কান্নাঝরা আকুলতা। অবাক হ'য়ে সীতা দেখে বিপিনবিহারীকে। নতুন করে আবার চেনে যেন। বিপিনবিহারীর বাইরের রুক্ষ কর্কশ বার্ধক্যের বালি খুঁড়ে আর এক বেদনার নদীকে আবিষ্কার করে যেন সীতা। আর সে নদীর গভীরতা বুঝি সমুদ্রের মতই অতলান্ত।

তবু একদিন এর ব্যতিক্রম ঘটল। সেদিন বুঝি তন্ময় হ'য়ে বাজাচ্ছিলেন বিপিনবিহারী। শ্রীরাগ। সীতাও শুনছিল তন্ময় হ'য়ে। খেয়াল ছিল না যে বাইরের আকাশে অন্ধকারের ছোঁয়াচ লেগেছে।

সীতা, নীচে থেকে একটা কর্কশ চীৎকার ধাওয়া করে এলো। গলাটা নিঃসন্দেহে সুবিমলের।

চমকে ওঠে সীতা। বিবর্ণ হ'য়ে যায় সারা মুখ। ফিসফিস করে বলে: এই রে ও এসে গেছে। আমি যাই। তাড়াখাওয়া পাখীর মতো বেরিয়ে গেল সীতা।

বিপিনবিহারী বুঝলেন সবই। তবু বুঝতে চাইলেন না। অপেক্ষা করলেন পরের দুপুরের দিগন্তে তাকিয়ে। দুপুর কাছিয়ে বিকেল হ'লো। তবু সীতা এলো না। মনের ফাঁকটা অন্য চিন্তার মাটি দিয়ে ভরাট করতে চাইলেন বিপিনবিহারী। কিন্তু পারলেন না। শুধু ভাবলেন সীতাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। চুপিচুপি নীচে নাবলেন বিপিনবিহারী। তাকালেন দরজাটার দিকে। দরজাটায় একটা মাঝারী ওজোনের তালা। সুবিমলের নীরব প্রতিবাদ।

সীতা, গলা নাবিয়ে ডাকলেন।

দরজাটা একটু ফাঁক হ'ল। তবে বেশী নয়। কড়ায় টান পড়ল। ইঞ্চি খানেক চওড়া ফাঁকের মধ্যে সীতাকে কেমন জানি অবাক লাগল বিপিনবিহারীর।

হাসল সীতা। বলল, দেখতেই পাচ্ছেন তালা দিয়ে গেছে। স্বচ্ছ, স্বাভাবিক গলা।

কিন্তু কেন? অবাক হ'য়ে বলেন বিপিনবিহারী।

এ কেনর জবাব নেই। বিয়ের পরের দিন থেকেই দেখে আসছি ওর এই সন্দেহ আর অবিশ্বাস। জীবনে একটা দিন প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে পারি নি। কারুর সঙ্গে মিশলে বা কথা বললে একেবারে সহ্য করতে পারে না। থামল। আবার বলল, চেষ্টা করছে অন্য বাড়ী খোঁজার।

কিন্তু একথা তো কোনদিন বল নি তুমি।

বলার প্রয়োজন হয় নি। আর ও এরকম আপনি আগে একথা জানলে আমাদের সম্বন্ধটা এতটা সহজ হ'ত কি না সন্দেহ।

বিপিনবিহারী তালাটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরলেন। মনে মনে অসংখ্য ঘৃণার তীরে বিদ্ধ করলেন সুবিমলকে।

একরাশ ভাঙা পোর্সিলেনের টুকরো ছড়িয়ে গেল সীতার হাসিতে। বলল, তালাটা অনেক বেশী মজবুত। আর তার চেয়ে অনেক বেশী মজবুত ওর পাহারা। এটা না হয় কোনরকমে ভাঙলেন, দ্বিতীয়টা ভাঙবেন কি করে? আমি এই অশোকবনে চিরবন্দিনী, এর থেকে মুক্তি নেই।

বিপিনবিহারী যেন অন্য কোন মেয়ের পরিচয়পত্র পড়লেন সীতার মুখে। এ যেন সেই দুর্বল, অসহায়, লাজুক মেয়েটি নয়। তীক্ষ্ণ, ঋজু, নির্মম কৌতুকময়ী আরেক মানবী। কোথা থেকে এলো এত সাহস, প্রশ্নটার কোন স্বাভাবিক জবাব পেলেন না। অবশ্য একটা নিষিদ্ধ সমাধান মনের দরজায় ভীতু চোখে উঁকি দিল। নিজের মনকে ধমক দিতে গিয়ে হঠাৎ যেন কেমন দুর্বল বোধ করলেন বিপিনবিহারী।

আর নয়, ওর আসার সময় হ'ল। সীতা হঠাৎ স্মরণ করিয়ে দিল।

বিপিনবিহারী চমকে উঠলেন, বললেন, ও।

আর আসবেন না কাল।

কেন? দুর্বল শোনাল বিপিনবিহারীর গলাটা।

সম্ভব হ'লে আমিই আবার দেখা করব আগের মতো, নইলে লুকিয়ে এ দেখা করার কোন দরকার নেই। দরজার ফাঁক থেকে সরে গেল সীতার মুখটা। বিপিনবিহারীর মনে হ'ল দোতলার সিঁড়ির সংখ্যাগুলো বোধ হয় হঠাৎ বেড়ে গেছে।

আরও কটা দিন বিপিনবিহারী নিজেকে টেনে নিয়ে গেলেন অসহ্য দীর্ঘ মুহূর্তগুলোর ওপোর দিয়ে। কৃষ্ণাবাই একদিন বৃষ্টিহীন নির্মম বোশেখী বাতাসের মত ছড়িয়ে গেছে অজস্র বেদনার অগ্নিকণা। মনের সমস্ত রস নিঃশেষে শুষে নিয়ে রেখে গেছে রুক্ষ স্মৃতির কাঁড়ি কাঁড়ি বিবর্ণ হলুদ খড় শুধু। সীতার চোখে ছিল শ্রাবণের অভিষেক। যে চোখের ছোঁওয়ায় অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যেও মনের কর্কশ পোড়ামাটিকে ভিজিয়ে নিতে পেরেছিলেন সান্ত্বনার জলে।

ঘুম নেই বিপিনবিহারীর। ঘুম চিরদিনের মত ফেরারী হ'য়েছে বুঝি চোখের গারদ থেকে। তাই ঘুমের ওষুধের পুলিশ পাঠিয়ে পলাতক ঘুমটাকে ফিরিয়ে আনতে হয়।

অনেক রাত্তিরে টোকা পড়ল বিপিনবিহারীর দরজায়। স্নায়ুর সমুদ্রে পলাতক হাওয়ার ছোঁওয়া লাগল যেন। দরজাটা খুলে দিলেন বিপিনবিহারী। আর মুহূর্তেই মুঠো মুঠো নরম উষ্ণতাকে মেখে নিলেন সর্বাংগে।

সীতা, তুমি। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন কোন রকমে।

হ্যাঁ, শীগগীর দরজাটা বন্ধ করে দিন। পালিয়ে এসেছি।

সুবিমল?

ঘুমোচ্ছে।

দরজাটা আস্তে বন্ধ করে দেন বিপিনবিহারী। সীতা দুহাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে খাটের ওপোর

নিজের পেয়ে-হারান অতৃপ্তির পাশাপাশি সীতার কোন কিছু না পাওয়া অপূর্ণতাকে সাজিয়ে কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পেলেন বিপিনবিহারী। আর সেই মুহূর্তেই সীতাকে অনেক কাছে অনুভব করলেন। মনে হলো সীতা আছে, তাই তিনিও আছেন। তাঁর নিছক অস্তিত্ব-সর্বস্বতার মাঝখানে সীতা চেতনার প্রাণ-প্রদীপ। সীতা তাঁর জীবনের শেষ ভাষ্য সপ্রমাণ করার বীজমন্ত্র।

সীতা। সীতার পিঠে হাত ছোঁয়ালেন বিপিনবিহারী। সীতা মুখ তুলল না, কোন কথা বলল না। শুধু কেঁপে উঠল ওর দেহটা। আর কোন কিছু না বলাতেই বিপিনবিহারী তাঁর সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলেন।

বাইরে পশ্চিমের জানলা ডিঙিয়ে ফ্যাকাশে বিবর্ণ চাঁদ উঁকি দিল। আচমকা ঘুমভাঙা একদল পাখী কিচমিচ করে উঠল।

হঠাৎ সীতা চেপে ধরল বিপিনবিহারীর হাতদুটো। কেঁপে গেল ওর গলা। বলল, আমায় নিয়ে চলুন আপনি।

আচমকা দশলক্ষ ভোল্ট বিদ্যুতের আলোয় যেন চোখ ধাঁধিয়ে যায় বিপিনবিহারীর। বুকের মধ্যে ভরা কোটালের সমুদ্রের স্পন্দনকে অনুভব করেন। চেপে ধরেন সীতার হাতদুটো। শরীরের সমস্ত স্নায়ুকে একসঙ্গে জড় করে নিঃশেষে নিংড়ে নিতে চান ওই নরম উত্তাপটুকু। হাতের তালু ঘামে ভিজে ভিজে হ'য়ে আসে। মনে হয় জীবনের প্রতীক্ষা-রঙীন ধূ ধূ পথ বুঝিবা কামনার দিগন্তের নাগাল পেয়ে গেছে। ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করেন, কোথায়?

যেখানে হোক, অন্য কোথাও। যেখানে অন্ততঃ একবার প্রাণভরে বাঁচতে পারি। সীতার ঝাপসা গলাটা অনেক কাছিয়ে আসে।

বিপিনবিহারীর মনে হয় সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের ফাঁকে ভরাট হ'য়ে গেছে। বুকের ভিতর অনেক হাওয়ার গান। অনেক সুর।

তুমি পারবে। একবার শুধু বললে বিপিনবিহারী।

পারব।

তবে কাল এসো। অনেক কাছে সীতাকে টেনে নেন বিপিনবিহারী। ছেড়ে দেন। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় সীতা। তুলে নেয় লুটিয়ে পড়া আঁচল। বেরিয়ে যায়।

বিপিনবিহারী তেমনি বসে থাকেন। মনে হয় সবকিছু বুঝি ভুলে যেতে পারেন। কৃষ্ণবাই, সীতা সব। ভুলে যেতে পারেন শুধু হঠাৎ পাওয়া একটি মুহূর্তকে সম্বল করে।

ঘুমের ওষুধের শিশিটা পাড়েন। সবকটা ট্যাবলেটই একসঙ্গে গুলে নেন জলে। তারপর অনায়াসে সেই তেতো জলটা ঢেলে দেন মুখে। স্বরোদটা অনেকদিন পরে পেড়ে বাজাতে আরম্ভ করেন। বাজান সেই সুর, যার ঠিকানা কোন সাংগীতিক অভিধানে পাওয়া যাবে না, যে সুর মিশে থাকে মনের গোপন ইচ্ছায়, আকাশ-ঢালা রূপোলী জোৎস্নায়, মাঝরাতের বৈরাগী বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে।

ভারত-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ

ইন্দ্রজিত্

পুর্ব্বানুস্মৃতি

ঐতিহাসিকদের কাছে পুর্ব্বোক্ত ষোল শতকের লৌকিক সংস্কৃতিত্রয়ের মিলন হয়তো চিত্র-বর্ণনা বলে মনে হোতে পারে অর্থাৎ যুক্তি তাঁরা চাইতে পারেন এই ত্রিবেণী সঙ্গমের, সেই কারণে তার মূল যুক্তিগুলো যতদূর সম্ভব দিতে চেষ্টা করব।

মুসলমান আমলের ভোগের পতাকা যখন থেকে ভারত ভূমির ওপর উড়তে আরম্ভ করে তখন থেকেই ভারতে গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে রিক্ততার সঙ্কেত দেখা দেয় জনসাধারণের ভেতর। শাস্ত্রকারদের দ্বারা নিপীড়িত জাতি বৈদিক যুগের পর কপিলাবস্তুর ডাকে চলে গিয়েছিল বুদ্ধবাদে, আবার বুদ্ধবাদের সামাজিক ও ধর্মজীবনে যখন পঙ্গুতা দেখা দিল তখন আবার নতুন বেদজ্ঞ দলের প্রাদুর্ভাবে সেই জনসাধারণ (যারা নানারকম লৌকিক মূর্তি পূজো করত নিজেদের গণ্ডীর ভেতর) পরিণত হয়েছিল নিঃসহায়তায়। কিন্তু লোকে চায় সমাজ, লোকে চায় ধর্ম, পরিবার। কিন্তু যে নিপীড়িত সাধারণ জন্মালো তারা নিজেদের মনে করল পরের রক্তচক্ষুতে আর জ্ঞানীর বঙ্কচক্ষুতে অবহেলিত। যেন তাদের নিজেদের কোনো কাজ করবার বা আনন্দ করবার কোনোও রকম অধিকার নেই। ভ্রাম্যমান হোয়ে যখন সমাজ-শাসকের চোখে তারা হেয় প্রতিপন্ন হোয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারপর চৈতন্যের ভারতব্যাপী ডাক শুন্‌লো তারা। শুন্‌লো চৈতন্য জনসাধারণকে বলছেন হরের্নামৈব কেবলম্ আর পণ্ডিত আর মানীদের বল্‌ছেন অমানিনা মান দেয়ং। নানক ও শিখবাদের ভেতর দিয়ে উপদেশের মর্মার্থ বল্‌ছে ভগবানকে ডাকবার অধিকার সকলেরই আছে। উত্তর ভারতের কবীরও বল্‌ছেন তাঁরা দোহাবলীর ভেতর থেকে সত্যের পথ দেখাচ্ছেন সকলকে। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পরে আবার যেমন অন্ধকার তেমনি পরবর্ত্তী অন্ধকারে যুগে কে কোথায় ছড়িয়ে গেল, পালিয়ে গেল, তার খোঁজ কোন লোক তেমন নিতে পারলো না।

কিন্তু এতদিন যে আকর্ষণের বিকর্ষণের খেলা, ভাগ্যের পরিহাস সেটা, নিজের দেশেই নিবদ্ধ ছিল এতদিন, বাড়ীর ঝগড়ার মতন মান অভিমান রাগ অনুরাগ আকর্ষণ বিকর্ষণের খেলা। কিন্তু মুসলমান আসার পর থেকে ভারতভূমির সাধারণ আর অসাধারণরা উভয়েই নতুন মানুষের গন্ধ পেল যাদের সঙ্গে তাদের কোন রকম সংযোগ নেই কোনো কালে। এর পুর্ব্বে লুটতরাজ করবার জন্যে যে ডাকাতরা দেশের প্রচুর সোণা নিয়ে গেল তাদের সঙ্গে শত্রুতা করেছে ভারতীয়রা কিন্তু সে ডাকাতের দল এখানকার মাটির বুকে কায়েমী হোয়ে বসবার চেষ্টা করেনি যেটা করলো মুসলমানরা। কিন্তু উপকারী সেজে তারা অপকারীর কাজ করতে লাগ্‌ল। সে সাম্রাজ্যবাদীর দল এদেশের কিছু লোকদের মুসলমান করলো লোভ দেখিয়ে আর কিছু লোককে, যারা এ ধর্ম্মে দীক্ষিত হোলনা, ক্ষমতাহীন করবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল।

মুসলমান বাদ্‌শাদের দরবার জাঁকজমকের হোতে লাগল কিন্তু জনসাধারণ এই দরবার সভ্যতায় কতদূর উপকৃত হোল সে খবর কেউ রাখবার চেষ্টা বোধহয় করলো না।

শাসকের অনুগ্রহ লাভ করবার জন্যে সাধারণ একদল যারা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হোল তারা এমন কোন উচ্চ মর্য্যাদা পেল না। সুখের জন্যে তারা এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে গিয়ে আশ্রয় চাইলো। আশ্রয় মিল্‌ল কিন্তু সুখ মিল্‌ল না, কিন্তু শাসকের দরবারী চক্ষু জনসাধারণকে, সে মুসলমান সাধারণ হোক আর যেই হোক, গ্রহণ করলো প্রজাপুঞ্জ হিসেবে।

এই রকম ভাবে যখন ভারত জুড়ে প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি হোচ্ছে সেই সময় ষোল শতকে বাংলায় মুসলমান টুপী পরা সাধারণ আর সামাজিক কর্ণধাররা গোপনে সন্ধি করলেন নিজেদের ভেতর বাঁচবার অভিপ্রায়ে। ফলে সত্যপীরের আলখাল্লা উঠে গিয়ে তিনি সত্যনারায়ণে পরিণত হলেন আর মুসলমান পীরের সিন্নী খেতে আরম্ভ করলো হিন্দুরা। বুদ্ধবাদও থাক্‌ল এদের দুই দলের অস্তিত্বের ভেতর ও কিছুটা চড়ক মেলা ও গম্ভিরার অনুষ্ঠানের ভেতরে।

কিন্তু মুসলমানরা ভারত-ভূমির ওপর কেন্দ্রীভূত শাসন প্রণালী প্রচলন করেন। কিন্তু ঠিক এই কেন্দ্রীভুত শাসন প্রণালী যখন কায়েমী আসন প্রতিষ্ঠা করবে এখানে সে সময় একটি কবিকে আমরা পাই যাঁর নাম কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, যাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ কবিকঙ্কণ চণ্ডীর পরিচয় পাই আনুমানিক ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে।

শাসকের রক্তলাল চোখকে সাধারণ সকলে ভয় করতে পারে, কিন্তু বলিষ্ঠ কলম যার সম্পদ, যে লোক অন্যায়কে ঠিক অন্যায় বলে স্বীকার করে, তারস্বরে সে অন্যায়কে সাহিত্য বা সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করে দিয়ে যায়। সংস্কৃতির ইতিহাসে তার মূল্য অনেকখানি।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাবে তিনি শাসক মুসলমান শ্রেণীর অত্যাচার লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডী তাই শুধু সাহিত্যের ইতিহাসেই উল্লেখিত হোতে পারে না, ভারত সংস্কৃতির ইতিহাসে তার রচিত সেই কাব্যটি একটি মূল্যবান উপাদান বলে পরিগণিত হবে। সে কাব্যে রাজা জমিদারের অত্যাচার কর্ম্মচারীদের দ্বারা কিন্তু তার পর অর্থাৎ সেকালে অত্যাচারের বিবরণ প্রকাশ করবার পর, আমরা কালকেতুকে পেলাম। এ কালকেতু ঠিক কাব্যের নায়ক নন, এ যেন কবির মানস পুত্র যে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়াবে, দাঁড়াবে ডিহিদার মামুদ সরিফের বিরুদ্ধে, দাঁড়াবে মোগলের প্রেরিত ভারতীয় প্রতিনিধি মানসিংহের বিরুদ্ধে যে মানসিংহ মোগলের পরাধীনতার শেকল সঙ্গে করে বাংলায় নিয়ে এলেন জাতির হাতে শেকল পরিয়ে তাদের বন্দী করতে। কালকেতু বন্দী করবে, অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে তাই কালকেতুকে সৃষ্টি করেছেন কবি, তাঁর মানস লোকে সেখানে—

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু
বলে মত্ত গজপতি রূপে নব রতি পতি
সবার লোচন সুখ হেতু

কালকেতু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন পশ্চিম বাংলার ধর্ম মঙ্গল কাব্যের লাউসেনের কথা। কালকেতু যেন ধর্ম মঙ্গল কাব্যের লাউসেনের নবীনতম সংস্করণ।

কিন্তু কালকেতুর পরাজয় বোধ হয় হোয়েছিল কালের হাতে।

বাংলার বুকে শুধু নয় ভারতবর্ষের বুক জুড়ে তখন মুসলমানী সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সভ্য রীতি-নীতি ও রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অমৃত বীজের ভেতর দিয়ে যেমন বিষবৃক্ষের আত্মপ্রকাশ হয় তেমনি বিষবীজের ভেতর থেকেও আবার অমৃত ফল ফলে। এখানে মাত্র এইটুকুই বলা চলতে পারে যে কোনটা পাওয়া গেল, আর কোনটা পাওয়া গেল না এবং এর তুলনা মূলক বিচারই করা উচিত বলিষ্ঠ মনের দ্বারা।

মুসলমান যুগে আমরা বহু জিনিষ পেলাম, পেলাম তাদের স্থাপত্য শিল্প, দরবারের সাজ সজ্জা, রাগ রাগিণীর স্বরলিপি প্রবর্ত্তন, নতুন রাগ-রাগিণীর আত্মপ্রকাশ, বিলাসিতার বৈশিষ্ট্য, খাদ্যের বৈশিষ্ট্য, হেকিমি ওষুধ, ফার্সীভাষা, কবরের শিল্প, সন তারিখ সহযোগে ইতিহাস রচনা, রোজনামচার প্রবর্ত্তন। আবার শাস্তির ভেতরে যেমন জীবন্ত কবর দেওয়া বা মানুষের চারিদিক থেকে পাচিল ঘিরে পুঁতে ফেলা, সম্রাটকর্ত্তৃক সযত্নে বিষবড়ি অপরাধীকে দান।

সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী মুসলমান শাসকরা যে সাম্রাজ্য করতে পেরেছিলেন এর মূলে স্বদেশীয় জাতির ভেতরে ঘনিষ্টতা না থাকবার এক কারণ আর এক কারণ হোল সাম্রাজ্য করবার মতন দৃঢ় ক্ষমতা নিয়ে এসেছিল এই মুসলমান সাম্রাজ্যবাদী, যারা জানতো যে কেমন করে এই ভারতভূমির বিবিধ ধর্ম সংস্কারের ওপরে সহজে নিজেদের কায়েমী আসন প্রতিষ্ঠিত করে নেওয়া যায়।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদিরা যত রকমই সাম্রাজ্য চালান ভারতের ওপরে, এদেশের নিপীড়িত হিন্দু আর নিপীড়িত মুসলমানের ভেতর সেই যে কোন এককালে মনের সঙ্গে মনের কোলাকুলি হোয়ে গিয়েছিল সেটা কোন প্রকারে মুছে গেলনা। বাংলার মুসলমান বৈরাগী, গৌরাঙ্গের প্রেমের ওপর আর বুদ্ধবাদের দেহতত্ত্বের ওপর আবার হিন্দু লোককবি গাজীর গান গাইলেন। লক্ষ্মীর ছড়া আর গাজীর গানের ভেতরে কোন বিশেষ জাতির প্রভাব নাই কিন্তু দুই বা তিনটে মিলিত জাতির গন্ধ আমরা পাই। শত শত বছরের ধর্মান্ধ নেতাদের আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিকে সন্তর্পণে সরিয়ে এই নিপীড়িতেরা কোন রকমে মিলিত হয়ে বাঁচতে শিখেছিল সেই পনের শতক থেকে।

এমনি করে দিন কাটে। সমাজশক্তি তখনও কালীশক্তি রূপে বিরাজিত আর কালের প্রতীক মহাকাল তার পদতলে। তন্ত্র উপাসকরা তখন দশ মহাবিদ্যা যথা কালী, তারা, মহাবিদ্যা, ছিন্নমস্তা, কমলা, বগলামুখী, ধূমাবতী, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবীর উপাসনা করে চলেছে। সমস্ত ভারতবর্ষে এই শাক্তবাদ ছড়ালো গোপনে কিন্তু সমস্ত জাতকে কোন নতুন পথ বলে দিল না। এ বিদ্যা সেই লোক বুঝে কানে মন্ত্র দেওয়া গোছের। পূর্ব্বে বলেছি শাক্তবাদের আদি পীঠ এই বাংলা বা আসাম কিন্তু বাংলা আসাম তখন ছিল অভিন্ন, কাজেই বাংলা বলাই যুক্তিযুক্ত। সেই বাংলায় আবার এলাম, এলাম বাংলার গ্রাম হালিসহরে ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে যখন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেই বিগত যুগের চণ্ডীদাসের মতনই তাকাচ্ছেন তমসাচ্ছন্ন দেশের ওপর। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে সেই যুগের চণ্ডীদাসও ছিলেন শাক্ত উপাসক। আঠার শতকের রামপ্রসাদের মতনই তিনিও শাক্তবাদের ভেতর থেকেই মুক্তিবাদ পেয়েছিলেন।

বৈষ্ণব পদাবলী কীর্ত্তনে আমরা পাই যে সে-পদাবলীর নায়িকা রাধিকার পায়ের কাছে বসে নায়ক শ্রীকৃষ্ণ প্রেম ভিক্ষা করেছেন সবিনয়ে:

রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব।
পদতলে ধরণী লোটাই ॥
দুই করে দুই পদ ধরি রহুঁ মাধব।
তবহি বিমুখ ভেল রাই ॥

রাধার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছেন নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, চাইছেন প্রেম সেই হেমকান্তির কাছে। কিন্তু আরও পরবর্ত্তী যুগে আঠারো শতকের, বৈষ্ণব পদাবলীর নিজস্ব রূপ ও প্রাণধর্ম কতকাংশে বদলালো প্রয়োজন বোধে।

আঠার শতকে তন্ত্রের যুগে বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকা রাধিকা প্রণয়িনীর আসন থেকে উঠলেন মাতৃত্বের কোঠায় আর নায়ক শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়াকাংক্ষীর থেকে পরিণত হলেন সন্তানে। মুক্তি ভিক্ষা করতে লাগলেন নায়ক সন্তানরূপে, প্রেম ভিক্ষা করার পরিবর্তে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রণয়ী আর প্রণয়িণী আঠারো শতকে পরিণত হলেন মাতাপুত্রে। প্রেম উঠল ভক্তির পর্য্যায়ে।

রামপ্রসাদ কালী উপাসনা আরম্ভ করলেন এক অপুর্ব্ব উপায়ে। কালীকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি গান রচনা করলেন, বার বার তিনি চাইলেন মুক্তি ভক্তির ভেতর দিয়ে, যুক্তি তাঁর কাছে বড় বলে দেখা দিলনা। তিনি সহজ ভাষায় নিজের মানবীয় মনকে জাগতিক প্রলোভন থেকে সরিয়ে এনে সম্পূর্ণ রূপে তাঁর উপাস্য দেবীর পায়ে উৎসর্গ করলেন।

(ক্রমশঃ)

"দেখো, সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে
আমি করি দুখের বড়াই।" ॥ রামপ্রসাদ সেন ॥

সাংস্কৃতিকী

এখনকার সাহিত্য

অতীত এমনই একটি বস্তু যা নিয়ে রচনা চলে, কল্পনা চলে, সত্য কথা বলা চলে না। তাই অতীতে বিচরণশীল ইতিহাস সত্য কথা বলেনা, অতীতে বিচরণশীল মানবচিত্ত আত্মকাহিনী বিবৃত করতে সত্য-গোপন করে থাকে! বর্ত্তমানের যাচাই চলে, অতীতের যাচাই করা জটিল ব্যাপার। তাই বর্ত্তমানের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্ম নিয়ে আলোচনা, তাদের সত্যাসত্য নির্ণয়, সব কিছুই সুসাধ্য। দুঃসাধ্য শুধু অতীতের সঙ্গে কারবার।

কিন্তু বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্য নানাভাবে অতীত-বিষয়-আশ্রয়ী। বর্ত্তমানের বিষয়সম্পদ নিয়ে যাঁরা এককালে অকপটে সাহিত্য-রচনা করে গেছেন, ক্রমেই তাঁরা পশ্চাদপটে সরে গিয়ে অতীতাশ্রয়ী সাহিত্যিক সম্প্রদায়কে সামনে স্থান করে দিচ্ছেন। দৃশ্যটি পাঠক সম্প্রদায়ের দরুণই হয়েছে নাকি লেখকদের উৎসাহেই তৈরী, তা বিচার করা দরকার। বিচারের অভাবেই যতো দুর্ভোগ আর দুরবস্থার উৎপত্তি। কিন্তু বিচারের দৌড়ও অগ্র-পশ্চাৎ-গামী।

সত্য-মিথ্যা যাচাই-এর দর্শন-প্রস্থানে প্রস্থান না করে সাদাসিধেভাবে আমরা বলব, আমাদের চোখে ও মনে এখনকার পৃথিবীই সৎ। সাহিত্যই যদি আমরা তৈরী করি, তাহলে এখনকার পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে, এখনকার মনের মাপেই তা তৈরী করব। এখনকার পৃথিবী তার অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। সুতরাং বাংলা-সাহিত্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করতে বাধ্য। বাংলা সাহিত্যে যদি ইংরেজী, ইয়াঙ্কি, রুশ, ফরাসী, চীন-নিপ্পনী প্রভাব আসে, তাতে হা হতোস্মি বলে রোদন করা হাস্যকর। ওসব দেশে মানবিক জীবন কাল্পনিক বিষয় নয়, নিতান্ত সৎ ও বাস্তব। আমাদের জীবনের তারা কতোটুকু আত্মীয় হতে পারে, তা-ই আমাদের দেখতে হবে।

কিন্তু তা সম্ভবত আজকের দিনের বাংলাদেশের সাহিত্যিকরা দেখতে রাজি নন। তাঁরা স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী। আলাদা থালায় ভাত খাওয়া খারাপ নয়, কিন্তু ভাত ত খাবেন অথবা রুটি। খাদ্যটি ষ্টার্চ—এক। ষ্টার্চের মতোই সাহিত্য। বাংলাদেশের সাহিত্য যদি কদন্নের মতো হয়ে ওঠে, তার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আমরা কোন্ সামন্তগিরি করতে পারি? দুঃখিত চিত্তে আজ তা-ই ভাববার কথা। আমি যদি একথালা কদন্নের পরিবর্ত্তে একটুকরো ফিরপোর রুটি চিবুই তা-ও খাওয়াই হবে। ষ্টার্চের কাজই করবে তা উদরস্থ হয়ে। শুধু গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন না নিলেই হ'ল। খাওয়াটা সাহিত্যিক ভঙ্গী—জীবনগত ব্যাপার। ভঙ্গীটুকুই স্বতন্ত্র হতে পারে। জীবনগত ব্যাপার এক। অতএব বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় সাহিত্যিকদের ভেবে দেখা উচিত, একই জীবন যে বিচিত্র খাতে মাত্র প্রবাহিত।

কিন্তু তাঁরা তা-ও দেখতে রাজি নন। তাঁদের জেদ বজায় থাকুক, আমরা শুধু এই কামনাই

করব। তাঁদের সঙ্গে লড়াই করতে রাজি হব না। তবে তাঁরা সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করে লড়াই করতে উন্মুখ। অতীতে কবির লড়াই হতো—সেই কুসংস্কার তাঁরা ত্যাগ করতে পারেন নি। অতীত-আশ্রয়ীদের এখানেই বিপদ—এই কুসংস্কারের জগতেই তাঁরা বদ্ধজীব। মানুষকে তাঁরা দেব-দৈত্য যা-খুশী ভেবে নেন। শুধু মানুষ ভাবতে পারেন না অতীতের মানবগোষ্ঠীকে। তার মানে, মানুষের মনের ভঙ্গীগুলোই থাকে তাঁদের জ্ঞানে দুর্ব্বোধ্য। তাঁদের চিন্তা বা বুদ্ধি সহজ সরল পথ নিতে জানেনা। মানুষের মনে যে সব বস্তুই ভাবময় অবস্থায় বসবাস করে এবং ভাববিচ্ছুরিত শক্তিই যে নূতন বস্তু তৈরী করতে অগ্রসর হয়, এ-কথাটা অতীতাশ্রয়ী স্বাতন্ত্র্যবাদী সাহিত্যিক ও সাহিত্যের সমালোচকদের নিকট অপরিজ্ঞাত। তাঁরা অতীতের কপিবুকে দাগা বুলোতে চান। কিন্তু কোথায় সেই কপিবুক? ইতিহাস? বাঙালীর বাস্তব ইতিহাসই রচিত নয়, মনের ইতিহাস কোথায় পাওয়া যাবে? চাই প্রসন্ন মনের ইতিহাস, যাতে জীবনের অবিকল ছায়াপাত হয়। কোনো বাঙালী তেমন আত্মচরিত কি লিখে গেছেন? নবীনচন্দ্র বা প্রথম চৌধুরী যতোটুকু সাহস দেখিয়েছেন এদিকে, ততোটুকুও আর কেউ দেখাতে চাননি বা পারেন নি।

একটি অপরিজ্ঞাত অতীতের পুঁজি নিয়ে সাহিত্য-কর্ম্মে ব্রতী হওয়ার চাইতে বর্ত্তমান জীবন নিয়ে রোমান্টিক রচনায় মনোনিবেশ করা ঢের ভালো। তাতে অন্তত বাঁচবার স্পৃহা আসে। অতীতের প্রয়োজন বর্ত্তমানকে সুদৃঢ় অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে। অপরিজ্ঞাত অতীতকে নিয়ে সে-কাজ চলেনা। এ-কথাটি যে এখনকার কোনো মন গ্রহণ করছে না, এমন নয়। এখনকার বাংলা কবিতার দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারব 'বর্ত্তমান জীবন নিয়ে রোমান্টিক রচনা' বস্তুটি কি। বাংলা কবিতায় নূতন হাওয়া এসেছে—যে হাওয়া ফুসফুসে টেনে নিয়ে বাঁচা যায়। কিন্তু বাংলা গদ্য-রচনায় কদন্নের এতো সমাদর যে সেখানে পংক্তিভোজনে মন বসে না।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য

অনেকের ধারণা, বাংলা গদ্য-সাহিত্যে না হোক, এখনকার বাংলা গদ্য-ভঙ্গীতে প্রমথ চৌধুরীর যুগ প্রবর্ত্তিত হয়েছে। কথাটি নিছক মিথ্যা হয়ত নয়। কিন্তু আমাদের তখন মনে রাখতে হবে যে গদ্য-ভঙ্গীতেমাত্র আমরা প্রমথ চৌধুরীকে অনুসরণ করতে উন্মুখ। গদ্য বাক্যগুলোতে প্রাঞ্জলতার স্পর্শ এলেই যে তা প্রমথ চৌধুরীর মন ও মনন বহন করবে, এমন সৌভাগ্যোদয় বাংলা-সাহিত্যের হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়না। বরং তার উল্টো ফল দেখা যাচ্ছে। আমরা ক্রমেই মনন-বিসর্জ্জিত পথে এগিয়ে চলেছি।

প্রমথ চৌধুরী মূলত সমালোচক মেজাজের সাহিত্যিক। সাহিত্যিকরা আত্মসমালোচনা করেন কি না জানিনে, কিন্তু প্রমথ চৌধুরী আত্মসমালোচনার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর ভালো লাগা আর মন্দ লাগা স্পষ্টত অভিব্যক্ত হয়েছে তাঁর রচনাগুলোতে। অর্থাৎ তাঁর মন ও মনন কোথাও লুকিয়ে নেই। শেষপর্য্যন্ত আত্মকথায় তিনি আপন চরিত্র উদ্ঘাটিত ও উদ্ভাসিত করে রেখে গেছেন। এ

ধরণের মেজাজ আজকের দিনের বা অতীত দিনের বাংলা-সাহিত্যে দুর্লভ। অতএব আমরা বলব যে আজকের দিনে প্রমথ চৌধুরীর কঙ্কাল-সাধনা হচ্ছে। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক কর্ম্মকৃতির প্রতি আমাদের নজর নেই, নজর দিয়েছি তাঁর প্রাঞ্জল গদ্যভঙ্গীর দিকে।

প্রমথ চৌধুরী সমালোচকের ভূমিকায় এসে যুক্তিবাদের সঙ্গে ভাববাদের মিশ্রণ ঘটিয়ে গেছেন। তার জন্যেই তাঁর রচনায় ফরাসী আমেজ এসেছে। একটি ঘরে ভাব ও বস্তু অক্লেশে বসবাস করতে পারে। প্রত্যেক মানুষ তেমন একটি ঘর। মানুষ যুক্তি দেখায় বাস্তবতার জমিতে দাঁড়িয়ে, আবার একেক সময় ভাবাবেগে ঢলে পড়ে। একটি দেশ-ও এ-ভঙ্গী নিতে পারে। ফরাসী তা নিয়ে বসে আছে। চৈতন্য মহাপ্রভুর আমলে বাংলাদেশও এ-ভঙ্গী নিয়ে দাঁড়িয়েছিল—নৈয়ায়িকের আবহাওয়ায় ভাববন্যা এসে প্রবেশ করেছিল তখন। মহপ্রভুর আমলের বাংলাদেশের এখনও মৃত্যু হয়নি, প্রমথ চৌধুরীর কালেও তা মরে যায়নি। হয়ত মরে যাচ্ছিল তখন, প্রমথ চৌধুরীর কণ্ঠে শোনা গেল তার বাঁচবার ধ্বনি—প্রাণের লক্ষণ সোচ্চার হল। প্রমথ চৌধুরী অবশ্য ফরাসী সাহিত্যে তাঁর মেজাজ শানিয়ে নিয়েছেন কিন্তু তা নিজের মেজাজেরই তাড়নায়। এ মেজাজ যে-যে সাহিত্যে তিনি দেখতে পেয়েছেন, (সংস্কৃত-সাহিত্যে বা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও তা অবিষ্কার করতে পেরেছেন) সে-সে সাহিত্যের প্রতিই তাঁর ঝোঁক পড়েছে। সুতরাং তাঁকে ফরাসী মেজাজের মানুষ বলা অত্যন্ত অযৌক্তিক।

প্রমথ চৌধুরী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে মানুষের বিবেচ্য বিষয় মানুষ। সে-মানুষ পাপে-পুণ্যে, সদসদ বিবেচনায়, বাস্তবতায় ও ভাববাদে ভরপুর। তাকে অবহেলা করে এক পাশে যিনি সরে গেলেন তিনি সাধু বা শয়তান হতে পারেন, শিল্পী কদাচ নন। শিল্পী এই মানুষের দ্বারস্থ হন কারণ নিজেও তিনি আত্মসমালোচনায় তদ্রূপ। এ মানুষের স্তরভেদ আছে সুতরাং শ্রেণী ও জাতিভেদও আছে। সবাই শিল্পী নন, সবাই সমালোচক নন, সবাই পাঠক নন। আবার শিল্পীমাত্রেই প্রাবন্ধিক, কবি, ঔপন্যাসিক, গীতজ্ঞ, নৃত্যবিদ, চিত্রকর হতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথের মতো অমিত-প্রতিভ শিল্পী পৃথিবীতে কদাচিৎ আসে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাই বাংলাদেশের শিল্পী প্রাণকে নানা ধারার আত্মোৎকর্ষের পথে টেনে নিয়েছে। প্রমথ চৌধুরী তেম্নি একজন আত্মোৎকর্ষ-পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যেটুকু অভাব ছিল প্রথম চৌধুরী সেটুকু পুরণ করেননি, রবীন্দ্রনাথের স্বভাবকে প্রাঞ্জল করে দেখিয়েছেন তিনি। শরৎচন্দ্র যেমন রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসকে কোথাও প্রাঞ্জল, কোথাও বা আবেগময় করে প্রকাশ করেছেন, প্রথম চৌধুরী তেম্নি রবীন্দ্রনাথে উহ্য যুক্তিবাদ বাঙালী পাঠকের দরবারে পেশ করে গেছেন।

যদি এমন সুদিন বাংলা-সাহিত্যে আসত যখন বলা যায় যে প্রমথ চৌধুরীর যুগ সমাগত, তাহলে আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথও ঘরে ঘরে পঠিত হতেন। ঘরে-ঘরে রবীন্দ্রনাথের যুক্তিবুদ্ধি উপলব্ধ—এ অবস্থা যেদিন কল্পনা করতে পারব সেদিন বাংলাদেশ আর হতশ্রী থেকে আমাদের মনে হা হুতাশ আনবে না। কিন্তু তেমন শুভদিন আসেনি, আসবে কি না সে প্রশ্নও সন্দেহস্থলে আছে—নিশ্চয়তা-বোধ নেই। ইতিমধ্যে সাহিত্যের যে হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে তা সর্ব্বৈব আশাপ্রদ নয়। বাংলাদেশ নৈরাশ্যে

ডুবছে আর আবেগের ঘরে আশ্রয় নিচ্ছে কিম্বা অতীতে পলায়ন করে মুখরক্ষা করছে। অতীতের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য বর্ত্তমানকে শক্তির ভিত্তিতে আনবার জন্যে, বর্ত্তমানকে দিক্‌ভ্রান্ত করকার জন্যে নয়। বাংলা-সাহিত্য অধুনা পাঠকদের দিক্‌ভ্রান্ত করে দিচ্ছে। সাহিত্যে ঠুনকো মণিহারি-দোকান বসে গেছে—নানাবিধ সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে—যার যা-খুশী কিনে নাও।

'সাহিত্য' কথাটি সম্ভবত 'হিতের সহিত বর্ত্তমান'—জাতীয় কোনো বস্তুর সংজ্ঞা রূপে প্রচলিত হয়েছিল। সে-সংজ্ঞা খানিকটা অধ্রুব। কারণ হিতের ধ্রুবতা নিয়ে বিতর্ক চলবে। কোন্ বস্তু যে কখন হিতকর তা যেমন বোঝা মুস্কিল, তার বোঝা বহন করা-ও তেম্নি কষ্টকর। অবশ্য শিল্পীর পক্ষেই এই অবস্থাটি জটিল। পাঠকের এতে দায়-দায়িত্ব নেই। তিনি মেজাজ-মর্জ্জি-মাফিক সাহিত্য খরিদ করবেন। তাঁর মস্তিষ্ক যদি অঙ্কের গোলকধাঁধাঁর ঘূর্ণায়মান হয় তাহলে গোয়েন্দা-কাহিনী তাঁকে সবচাইতে বেশি তৃপ্তি দিয়ে থাকে। পাঠক যদি প্রেম-পর্ব্বে প্রবেশ করে থাকেন, তাহলে ফ্রয়েডে তিনি উৎসাহিত হবেন। তবে প্রেম বস্তুটি এম্নি সার্ব্বজনীন যে সাহিত্য অনিচ্ছাসত্ত্বেই যেন ফ্রয়েডিয়ানাতে ঢুকে পড়েছে। ডাক্তার ফ্রয়েড যদি মানবের হিতকামী হয়ে থাকেন, তাহলে সাহিত্যের ডাক্তারি-বিদ্যাও হিতকর। কিন্তু গোয়েন্দা-কাহিনী বা লম্প-ঝম্প কাহিনী (অ্যাড্‌ভেঞ্চার, ব্যায়ামবিদ্যা নয়) সাধারণ নাগরিকের পক্ষে কোন্ দিক দিয়ে হিতকর বোঝা একটু কঠিন। কিন্তু এসব বিষয়েরও সাহিত্যে ঠাঁই আছে। সম্ভবত যুক্তি দেওয়া হয় যে এতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিতে বা কল্পনা-প্রবণতায় শান পড়ে। অতএব দেখা যায়, হিতকর সাহিত্য মানুষের মনের নানা অলিগলিতে সক্রিয়। অর্থাৎ সাহিত্য যে ভঙ্গীই নিচ্ছে তার সবকিছুই জগদ্ধিতায়। ক্রমপ্রসর্য্যমাণ সাহিত্যিক সাম্রাজ্যবাদ আজ বাংলাদেশে কোলাহল তুলেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বই এই সাম্রাজ্যবাদের সব চাইতে বড়ো দুর্লক্ষণ।

এ অবস্থা রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রমথ চৌধুরী কেউ সাহিত্যিক অবস্থা হিসেবে সহ্য করতে পারতেন কি না সন্দেহ! অধুনা-সমাদৃত ভঙ্গী বা বিষয়, কোনো দিকই হয়ত তাঁরা পছন্দ করতেন না। কারণ, তাঁরা সবাই সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী ছিলেন।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

নূতন বই

দীঘ নিকায় (দ্বিতীয় খণ্ড) ঃ ভিক্ষু শীলভদ্র—মূল্য ২৸৹

কিছুকাল পূর্ব্বে ভিক্ষু শীলভদ্র-কৃত দীঘ নিকায়ের প্রথম খণ্ডটি দেখার সুযোগ হয়েছিলো, এবার তারই দ্বিতীয় খণ্ডটি হাতে এলো। আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদক প্রবীণ পণ্ডিত নানাভাষাবিদ জ্ঞানব্রতী ভিক্ষু মহোদয় দীর্ঘদিন যাবৎ ত্রিপিটকের অনুবাদ-কার্যে ব্রতী আছেন। ত্রিপিটকের অনুবাদ-কার্যে এঁর দান বড়ো সামান্য নয়। দীঘ নিকায়ের অনুবাদ রূপ দুরূহ কাজে ইনিই প্রথম সফলকাম হলেন। অনুবাদের সাফল্যের কথা ছেড়ে দিলেও পথ-প্রদর্শক হবার দাবীও এর সর্ব্বাগ্রগণ্য। অল্পকাল মধ্যেই তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হবে এবং হলে পর বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ বিভাগের একটা স্থায়ী অভাব মিটবে। বৌদ্ধশাস্ত্র সম্পর্কে যাঁরা প্রকৃত উৎসাহী, মর্মজ্ঞ ও জিজ্ঞাসু, তাঁদের কাছে এজন্য তিনি নিঃসংশয়েই অভিনন্দনীয়। ত্রিপিটক অনুবাদের ক্ষেত্রে এরকম মানুষ অবতীর্ণ হলে এই সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা পোষণ করা যায়।

ভিক্ষু শীলভদ্রকৃত অনুবাদগুলির সম্পর্কে একটি কথা বলতেই হয় যে, সাধারণত বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যে-বাংলা লেখেন তা কোনক্রমেই বিশুদ্ধ হয় না, সেটাকে 'ভিক্ষু বাংলা' বলাই সঙ্গত। সে-বাংলা অনেকক্ষেত্রেই লোক-বিশেষের হাতে প্রায় পাদ্রী-বাংলারই রকমফের হয়ে পড়ে। কিন্তু এঁদের মধ্যে আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম এই ভিক্ষু শীলভদ্র—এঁর বাংলা শুধুই বিশুদ্ধ বাংলা নয়, সাহিত্যিক বাংলা। এঁর হাতে ভাষা কোথাও একেবারে খেলো হয়ে প'ড়ে না, গাম্ভীর্যও বজায় থাকে অথচ স্বচ্ছতা, বিশদতা, ও প্রাঞ্জলতা প্রভৃতি গুণ থেকেও কদাচ ইনি বিচ্যুত হন না। এই ভাষাগুণের জন্যই বোধহয় একখানি মৌল পুস্তকের মতোই পড়তে লাগে এঁর অনুবাদগুলি। আমি তো এখানি উপন্যাসের মতোই প'ড়ে ফেলেছি—এটা অনুবাদকের বড়ো কম কৃতিত্বের নিদর্শন নয়। প্রার্থনা করি তিনি যেন দীর্ঘায়ু লাভ ক'রে এই দুরূহ স্ব-নিযুক্ত কর্মভার যোগ্যতার সঙ্গেই বহন করতে সমর্থ হন। বৌদ্ধশাস্ত্রানুবাদের ক্ষেত্র তথা বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যও এঁর চেষ্টায় দিনে-দিনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠ্‌বে।

এই বইয়ের বহুল প্রচার আমি সর্বান্তরেই কামনা করি এবং আশা করি এঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারলে সকলেই তাই করবেন।

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

সময় ও সাহিত্য ঃ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ঃ প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী।

আলোচ্য গ্রন্থ সাহিত্যিক ও সাহিত্য-প্রাসঙ্গিক কয়েকটি প্রবন্ধ-সমষ্টি। লেখক কবি হিসেবে পরিচিত। এবং আমাদের দেশে কবিরাই যেহেতু কবিতা সম্পর্কে উৎসাহে এবং উৎসাহ-প্রকাশে

অগ্রগণ্য, এ ঃও তাই কবি এবং কবিতা-সম্বন্ধীয় আলোচনায় যে বিশেষ ঔৎসুক্য—এ-গ্রন্থে তা উদাহৃত।

বইটির সূচনাংশে আটটি সুলিখিত প্রবন্ধের মধ্যে পাঁচটি কাব্য-কবিতা বিষয়ে – বাকী তিনটির একটি 'বাংলা উপন্যাসের একদিক' ও অবশিষ্ট দু'টি সমালোচনা সম্পর্কিত। পরিশিষ্টাংশে আলোচিত দুজন লেখকই কবি—মধুসূদন ও নজরুল—তৃতীয় ব্যক্তি প্রধানতঃ প্রাবন্ধিক ও গল্পলেখক, উপরন্তু বিদগ্ধ মনে অন্যতম বিশিষ্ট কবি বলেও শ্রদ্ধেয়—ইনি প্রমথ চৌধুরী।

সূচনাংশের প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'রূপকের সঙ্কট' ও 'কাব্যনাট্যের ভূমিকা' প্রবন্ধ দুটিই সর্বাধিক যথাযথ ও উপাদেয় হয়েছে। 'কাব্য-বিচার' প্রবন্ধে কবি-অভিজ্ঞতার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করতে গিয়ে বারংবার শেক্সপীয়র থেকে উদ্ধৃতি উপযুক্ত হয়নি। তাঁর নাটকের বিশেষ কোন চরিত্র বিশেষ কোন নাটকীয় অবস্থায় যেমন চিন্তা ও তার অভিব্যাপ্তি করেছে তাকে সাধারণ গীতি-কবিতার পর্যায়ে নিয়ে আসা ঠিক হ'তে পারে কি? সেখানে সেই বিশেষ চরিত্রটির তাৎপর্য এবং নাট্যকারের অনন্যসাধারণ situation-জ্ঞানের বিশ্লেষণ চলতে পারে মাত্র। কবি ও পাঠকের মধ্যে 'অভিজ্ঞতার ঐক্য' সপ্রমাণ করাই যখন প্রবন্ধকারের অভিপ্রেত, তখন রবীন্দ্রনাথ যেমন উদ্ধৃত হয়েছেন তেমনি অন্য কোন গীতি-কবিকেই তাঁর স্মরণ করা উচিত ছিল—সেখানে Macbeth-এর সংলাপ বা স্বগতোক্তি ত খুব কাজে লাগতে পারে না—নাটকের প্রধান গুণই যখন নাটকীয় চরিত্রে ও তার শ্রোতায় বিভেদ-বোধ ঘুচানোয় অথবা অন্যভাবে জাগানোয় নিহিত। এই প্রবন্ধে পাচ্ছি, কবিতা যথেষ্ট ইন্দ্রিয়ভোগ্য এবং আবেগপূর্ণ হলেও নিতান্তই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত বলে গণপাঠকের কাছে জটিল ও উপেক্ষিত থাকে। দৃষ্টান্ত হয়েছেন এলিয়ট ও জীবনানন্দ। এই অতি সাধারণ ব্যাপারটিকে লেখকের আরো ঘনিষ্ঠভাবে ভেবে দেখা উচিত ছিল—নিজের বক্তব্যও স্পষ্ট হ'ত—আবার 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত' বলেই যে কবিতা ইন্দ্রিয়ভোগ্য এবং আবেগপূর্ণ হ'তে পায়—এই সাধারণ সত্যের নিশ্চিত উদ্ঘাটন হ'ত।

নিখিলকুমার নন্দী

উপল মুখর ঃ অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় (প্রকাশক ঃ পরেশ সাহা, ১৪৭, কেশব সেন ষ্ট্রিট, কলিকাতা—দাম তিন টাকা)।

পূর্ব্বাশার পাঠকদের নিকট গল্পকার হিসেবে শ্রীযুক্ত অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের একটি পরিচয় সুবিদিত। তাঁর প্রথম উপন্যাস এই বইটি। গল্প বলায় যাঁর ভাষা তৈরী হয়ে গেছে উপন্যাসের ছকে তিনি ভাষা নিয়ে বিশেষ বিপদগ্রস্ত হননা কিন্তু গল্প-লেখকের সমূহ বিপদ থাকে উপন্যাসের বিন্যাস-ব্যাপারে। একটি বড়ো পটভূমিকায় গল্পের ছোট বিষয়টিকেই ধরার ঝোঁক থাকে তাঁদের বেশি। ব্যাপারটা সাহিত্যের পক্ষে অরুচিকর নয় যদি আমরা 'ছোট উপন্যাস' বলে একটি স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে পারি। তবে ছোট উপন্যাসের কলেবরও ছোটই হওয়া চাই—দেড়শ' দু'শ পৃষ্ঠার বেশি

একটি গল্পকে বাড়িয়ে নেওয়া চলেনা। চালালে বেশিরকম জলো-দুধ হয়ে যায়। গল্পকার ঔপন্যাসিক-শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে চাইলে সাধারণত জলো দুধের বেসাতি সাজিয়ে বসেন। অমলেন্দুবাবুর 'উপল মুখর' পৌনে তিনশ পাতার বই না হয়ে দু'শো পাতায় সম্পূর্ণ হলেই একটি চমৎকার ছোট উপন্যাস হতে পারত। অবশ্য পৌনে তিনশ পৃষ্ঠার বই হলেও একটি পৃষ্ঠা কোনো পাঠকের নিকট ক্লান্তিকর মনে হবেনা তার ভাষার গুণে। বিষয় এবং চরিত্রও নূতন স্বাদ বহন করে' পাঠকদের আনন্দ দিতে পারবে বলে আমাদের ধারণা, যদি পাঠক আপন পরিবারের সঙ্গে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক উত্থান-পতনের কোনো মিল খুঁজে পান।

স. ভ.

অহল্যা ঃ দিনেশ দাস। পরিবেশক ঃ সিগনেট বুকশপ।

দিনেশ দাসের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'অহল্যা' নতুন সম্ভাবনাময়। এতে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে জানবার ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে, যাকে বলা চলে নতুনতরো অনুভাব।

যে কোনো বক্তব্যকে সহজ করে বলবার ক্ষমতা দিনেশ দাসের আছে, আর আছে সহজাত সরলপথে চলার প্রেরণা—এতে দিনেশের কবিচিত্তের 'ভালোমানুষি'ই প্রকাশ পেয়েছে। দুঃখকে সৌন্দর্যময় করবার ক্ষমতাও দিনেশ রাখেন। তাই তাঁর হাত মিষ্টি, পরিবেশন করেন মিষ্টি। শিশু দেখে যে আবেগে হৃদয় আপ্লুত হয়, দিনেশের কবিতা পাঠেও সেই আবেগই যেন নাড়া দেয়। মধুময় আবেগ।

কিন্তু এ কবিতাগ্রন্থে দিনেশ দাস প্রৌঢ়ত্বের দাবী করেছেন, নিছক মাধুর্য নয়, কবিতার ছত্রে ছত্রে রয়েছে প্রজ্ঞার ইঙ্গিত, রয়েছে শব্দচয়নে ভাবগাম্ভীর্য। এবং আগের ভক্তিবাদে আচ্ছন্ন মন যেন হঠাৎ বিপ্লবী হয়ে উঠেছে—গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বে তিনি এতদিন আশ্রয় খুঁজে এসেছেন, আজ আপন ব্যক্তিত্ব যেন খুঁজে পেলেন 'অহল্যা'র কবিতাগুলির মাধ্যমে। এ পরিবর্তন আশ্চর্যজনক এবং দিনেশের কবিজীবনের দীর্ঘায়ু সূচনা করছে। দিনেশের কথা—

আমাদের মন
দু'খানি ইটের ফাঁকে
ঘাসের মতন
জেগে থাকে,
নড়ে চড়ে
বসন্তের সবুজ প্রহরে।

এ কথাই সত্যি হোক, তা হইলেই আমরা তাঁর কবিতায় আরো নতুন অভিব্যক্তি পাবো। গোপাল ঘোষের প্রচ্ছদপটখানাও একটি প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। এ গ্রন্থে কয়েকটি আরবী কবিতার অনুবাদ দিনেশ সংযোগ করেছেন। আরবী কবিতা সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য বেড়ে গেল।

অমল দত্ত

আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যের নির্ব্বিচার পরিবেশনে পাঠকের মনে অতীতের কণ্ডুয়ন অথবা রুচির বিকৃতি সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কথাসাহিত্য ও কবিতা পরিবেষণে পূর্ব্বাশা লিমিটেড বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্ব্বাশার সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

কবিতা

অজিত দত্তের **পুনর্ণবা** দেড় টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **নীল আকাশ** দেড় টাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের **সংকলিতা** দু'টাকা

প্রাচীন প্রাচী দেড় টাকা

অপ্রেম ও প্রেম এক টাকা

পদাবলী দুই টাকা

তিনজন আধুনিক কবি (বাংলা কবিতার আলোচনা) নয় আনা

অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের **সৈনিক** দেড় টাকা

গোপাল ভৌমিকের **স্বাক্ষর** এক টাকা

গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্রের **মহানগর** দু'টাকা

সুবোধ ঘোষের **পরশুরামের কুঠার** দু'টাকা

শুক্লাভিসার দু'টাকা চার আনা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের **ফসল** এক টাকা চার আনা

ঋণ দেড় টাকা

নতুন দিনের কাহিনী দু'টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **পতাকা** দু'টাকা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর **খেলনা** দেড় টাকা

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের **নয়নচারা** দেড় টাকা

উপন্যাস

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের **বৃত্ত** এক টাকা বার আনা

মরামাটি (২য় সং) দু'টাকা চার আনা

দিনান্ত (২য় সং) সাড়ে তিন টাকা

কল্লোল পাঁচ টাকা

কস্মৈদেবায় (২য় সং) তিন টাকা:

রাত্রি (দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ) পাঁচ টাকা

মৌচাক পাঁচ টাকা

শৈলেন ঘোষের **তিনরঙ** দু'টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা

PURVASA : REGD. NO. 1512 : ASHARAH—1361 B. S.

ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া বিল্ডিংস্

৬৪নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা-১৩

১৯৫২ ইং পর্য্যন্ত প্রথম ১৬২ বৎসরে পাঁচটি সার্থক ভ্যালুয়েশান।

প্রতি ভ্যালুয়েশানে পলিসি-হোল্ডারদের বোনাস্ এবং শেয়ার-হোল্ডারদের ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় বীমাজগতে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

এন্, সি, দত্ত
চেয়ারম্যান।

স্মরণীয় দৃষ্টান্ত

নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ব্যবসার বাজার যখন সাধারণতঃ মন্দার দিকে, তখন হিন্দুস্থান বীমা ব্যবসায়ে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা

২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার

অধিক কাজ করিয়া সর্ব্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।
নূতন বীমার কাজেও ইহার অগ্রগতি অসামান্য।

১৯৫৩

নূতন বীমা ১৮ কোটি ৮৯ লক্ষের কিঞ্চিদধিক

এই সাফল্য হিন্দুস্থানের প্রতি জনসাধারণের অক্ষুন্ন আস্থার উজ্জ্বল নিদর্শন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, ৪নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১৩

Printer & Publisher Satya Prasanna Dutta, Purvasa Ltd., 54 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta.

পূর্বাশা

আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যের নির্ব্বিচার পরিবেশনে পাঠকের মনে অতীতের কণ্ডুয়ন অথবা রুচির বিকৃতি সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কথাসাহিত্য ও কবিতা পরিবেষণে পূর্ব্বাশা লিমিটেড বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্ব্বাশার সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

কবিতা

অজিত দত্তের
পুনর্ণবা
দেড় টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
নীল আকাশ
দেড় টাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
সংকলিতা
দু'টাকা

প্রাচীন প্রাচী
দেড় টাকা

অপ্রেম ও প্রেম
এক টাকা

পদাবলী
দুই টাকা

তিনজন আধুনিক কবি
(বাংলা কবিতার আলোচনা)
নয় আনা

অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের
সৈনিক
দেড় টাকা

গোপাল ভৌমিকের
স্বাক্ষর
এক টাকা

গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
মহানগর
দু'টাকা

সুবোধ ঘোষের
পরশুরামের কুঠার
দু'টাকা

শুক্লাভিসার
দু'টাকা চার আনা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ফসল
এক টাকা চার আনা

ঋণ
দেড় টাকা

নতুন দিনের কাহিনী
দু'টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
পতাকা
দু'টাকা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
খেলনা
দেড় টাকা

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের
নয়নচারা
দেড় টাকা

উপন্যাস

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
বৃত্ত
এক টাকা বার আনা

মরামাটি
(২য় সং):
দু'টাকা চার আনা

দিনান্ত
(২য় সং)
সাড়ে তিন টাকা

কল্লোল
পাঁচ টাকা

কস্মৈদেবায়
(২য় সং)
তিন টাকা :

রাত্রি
(দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)
পাঁচ টাকা

মৌচাক
পাঁচ টাকা

শৈলেন ঘোষের
তিনরঙ
দু'টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা

৩৭,৫০০ কপি নিঃশেষিত

প্রথম খণ্ড 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের নতুন সংস্করণ (৬ষ্ঠ মুদ্রণ) প্রকাশিত হল। অচিন্ত্যকুমারের এই স্মরণীয় সাহিত্য কীর্তি বাঙালী পাঠকের মনে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে।

প্রথম খণ্ডে শৈশব থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্পূর্ণ জীবন ভাষ্যের সূচনা। ইতিহাস, কাব্য ও উপন্যাসের নৈবেদ্যে ভক্তিপবিত্র অর্চনা। তার ভাষায় আত্ম-নিবেদনের স্নিগ্ধতা! ধর্মে নয়, সাহিত্য-স্বাদে যাঁদের অভিরুচি, তাঁদের কাছেও অমূল্য মনে হয়েছে এই রচনা।

সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও এ-গ্রন্থের একটি বিরাট ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক যত বিখ্যাত বাঙালী জন্মগ্রহণ করেছেন, প্রসঙ্গক্রমে তাঁদের অনেককেই প্রথম খণ্ডে একত্রিত করা হয়েছে। পরবর্তী খণ্ডের অন্যতম আকর্ষণ উনিশ শতকের স্মরণীয় প্রতিভাবান বাঙালী পুরুষদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যোগাযোগ।

স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ (রামকৃষ্ণ ইনষ্টিটিউট অফ কালচার) অচিন্ত্যকুমারকে লিখেছেন—আপনার লেখার নিপুণতা ঠাকুরের আদর্শ ও ভাবধারার প্রতি বাংলার জনসাধারণের আগ্রহকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।...... ঠাকুর যথার্থই তাঁহার ভাবপ্রচারের জন্য আপনাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন।

স্বামী বেদানন্দ (১৯বি, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা) লিখেছেন—পড়তে পড়তে মনের মধ্যে ঠাকুরের দিব্য-জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলি সব যেন দেখতে পেলুম। মনে হল চোখের সামনে সব ঘটছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার বিশেষ কৃপা না হলে এটি সম্ভব হত না।

হরিপদ মোদক (সম্পাদক, স্বামীজী সংঘ পাঠাগার, রসুলপুর, বর্ধমান) লিখেছেন—ধর্মগ্রন্থের চিরাচরিত একঘেয়েমি থেকে ভক্তিস্নিগ্ধ ভাষায় রচিত 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' বাঙালীর প্রাণে এক নতুন আশার সঞ্চার করেছে।...দেশে এক নতুন ভাবের সঞ্চার করেছে। সচিত্র। ৬ষ্ঠ মুদ্রণের নতুন দাম ৫৲

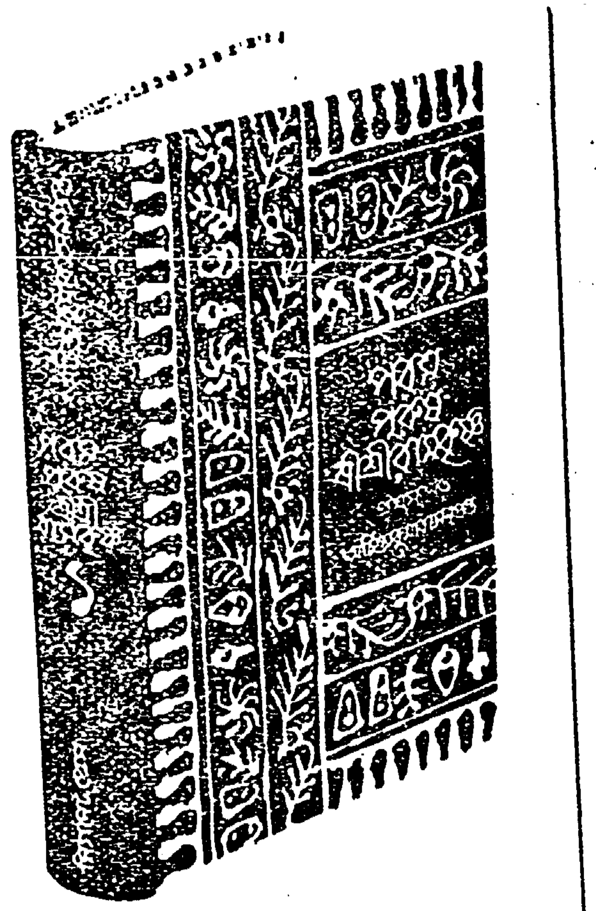

নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতা
নীলনির্জন

ছন্দো-রূপময় বেদনালব্ধ কাব্যের একটি বিশিষ্ট পরিমণ্ডল নিয়ে নীরেন্দ্র চক্রবর্তী শক্তিশালী কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। তরুণতরদের মধ্যে অগ্রণী এই কবি আধুনিক হয়েও দুর্বোধ্য নন। তাঁর কবিতার লাবণ্য মনকে স্নিগ্ধ করে, সুর অনুরণন জাগায়। নীলনির্জন নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর প্রথম কবিতার বই। দাম ২৲

বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ
সাহিত্যচর্চা

সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর বিশ্লেষণ-প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয় কবির উপলব্ধি এবং রচনা হিসেবে সমালোচনাকেও তিনি সম্পূর্ণাঙ্গ একটি সৃষ্টিকর্মে রূপান্তরিত করেন।

বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়: 'রামায়ণ', 'মাইকেল', 'বাংলা শিশু-সাহিত্য', 'বাংলা ছন্দ', রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', 'রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সমালোচনা' 'সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য' ও 'শিল্পীর স্বাধীনতা'। প্রবন্ধ-গুলি গ্রন্থাকারে এই প্রথম প্রকাশিত হল। দাম ৩৲

সাহিত্য বিষয়ে যে কোনো প্রচলিত মতের সহজ পুনরুক্তি করা বুদ্ধদেব বসুর স্বভাব নয়।

অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাস
নবনীতা

নবনীতার বাবা ছিলেন ইস্কুলমাষ্টার। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর সঞ্চিত অর্থের সঙ্গে সে-ও এসে পড়েছিল তার কাকার হাতে এবং দুর্নীতির সেই বিষম দুর্গে অবরুদ্ধ থেকেও নবনীতা একটি যুবককে ভালোবেসেছিল। এমন নয় যে সে সাংসারিক অর্থে সুখী হতে চায় নি। তার চাইতেও বেশি চেয়েছিল প্রেমিকের মধ্যে সেই উদ্দাম পুরুষের প্রকাশ যে তাকে অবরোধ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে জোর করে, অভিভূত হতে হবে যার উদ্দামতায়। কিন্তু তেমন অলজ্জ প্রেমের আহ্বান যদি শেষ পর্যন্ত না আসে? সে যন্ত্রণা তাকে যে দুঃখের কুটিল আবর্তে তলিয়ে দিতে পারে তারই স্মরণীয় কাহিনী এই উপন্যাস।

প্রথম প্রেমের সুখে সংশয়ে ভরা মধুর বিষাদ, উত্তরজীবনে ট্রাজেডির নিষ্ঠুরতায় রূপান্তরিত হওয়ার এই কাহিনী মনকে তীব্র আলোড়িত করবে। দাম ২॥০

সিগনেট বুকশপ
১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
১৪২।১ রাসবিহারী এভিনিউ

পুস্তিকাকারে ছাপানো পূর্ণ কলেবরে 'টুকরো কথা' সিগনেটের যে-কোনো দোকানে চাইলেই পাওয়া যাবে

বুদ্ধকথা

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য
পালি প্রকাশ
মূল্য পাঁচ টাকা

পালিভাষার সুগম ব্যাকরণ পাঠাবলী ও শব্দকোষ। পাঠাবলীতে সহজ ও কঠিন, গদ্য ও পদ্য সবরকম রচনাই আছে। পাঠাবলীর সমস্ত বাক্যই কোনো না কোনো প্রসিদ্ধ পালিগ্রন্থ হইতে সংকলিত। বৌদ্ধেরা সাধারণত যে সব স্তুতি-বন্দনা করেন, পাঠের মধ্যে তাহাও দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধদের মৈত্রী-ভাবনা প্রসিদ্ধ, ইহাও সংকলিত হইয়াছে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য
মূল্য আট আনা

"বৌদ্ধধর্মের জন্মস্থান ভারতবর্ষে।···ভারতীয় জীবনে শিল্পকলায় ও সাহিত্যে, নৈতিক আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে বৌদ্ধপ্রভাব গভীর ও অক্ষুণ্ণ। তাই বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনায় শিক্ষিত ভারতবাসীর উৎসাহ ও আগ্রহ থাকা বাঞ্ছনীয়।···বৌদ্ধধর্মের শাস্ত্র নানা দেশে নানা ভাষায় লিখিত হইয়াছে।···ডক্টর বাগচী বহু ভাষাবিদ্ এবং তাই বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান যেমন ব্যাপক, তেমনি গভীর, অবিদ্বানের নিকট তাঁহার সাধনালব্ধ বিদ্যা সহজে পৌঁছাইয়া দিবার কৌশলটি তিনি জানেন।" —আনন্দবাজার পত্রিকা

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
হিউএনচাঙ
মূল্য আড়াই টাকা

"চীনা পরিব্রাজক হিউএন চাঙের ভারত-ভ্রমণকথা। এ কাহিনী যেমন উত্তেজনা-পূর্ণ, যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। সত্য কী তাহা জানিবার জন্য অদম্য বাসনায় আটাশ বৎসর বয়সের যুবক কী অমানুষিক দুঃখ বরণ করিয়া অতি ভয়াবহ ঘোর বিপদসংকুল পথে একাকী যাত্রা করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিয়াছিলেন, সে কাহিনী উপন্যাস অপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক। প্রাচীন ভারতকে জানিবার ও চিনিবার পক্ষে ইহা প্রামাণিক গ্রন্থ।" —যুগান্তর

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত
দুই খণ্ড। প্রতি খণ্ড দেড় টাকা

"বৌদ্ধদের এই প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ এই প্রথম। অনুবাদ মর্যাদাবান গম্ভীর অথচ সরস গদ্যে করা হয়েছে। পাণ্ডিত্যের দিক থেকে আলোচনা না ক'রে আমরা শুধু এইটুকু উল্লেখ করছি যে, বইখানা সাধারণ পাঠককে ভীত করবে না এবং সম্ভবত পণ্ডিতকেও তৃপ্ত করবে।" —কবিতা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন
ধম্মপদ-পরিচয়
মূল্য আট আনা

"লেখক স্বল্পায়তনের মধ্যে ধম্মপদের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা নেহাৎ স্বল্প-মূল্যের স্বল্প পরিচয় নয়। ইহা লেখকের দুইটি বিশেষ কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমাদিগকে শ্রদ্ধান্বিত করিয়া তোলে। প্রথমত, বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট তথ্যজ্ঞান এবং স্পষ্ট ধারণা; দ্বিতীয়ত, বক্তব্যকে স্বল্পাকারে বুঝাইয়া বলিবার বাক্-সংযম।" —দেশ

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিদেবের বোধিচর্য্যাবতার
মূল্য আড়াই টাকা

যাহাতে পৃথিবীর কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের মতভেদ নাই, যাহা সমস্ত ধর্মের ভিত্তি ও প্রাণস্বরূপ, যাঁহারা ধর্ম মানেন না, এমন কি যাঁহারা সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের উচ্ছেদকামী এমন অনেক মানবসংঘেরও যাহা মূলমন্ত্র, সেই সাম্য ও মৈত্রীই এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত
সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা
মূল্য আট আনা

বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে সিংহলের সভ্যতা গড়ে উঠেছে এবং তার যা-কিছু সম্পদ তাই ফুটে উঠেছে সেখানকার স্থাপত্যে ভাস্কর্যে শিল্পে চিত্রে সংগীতে ও সাহিত্যে। সিংহলের এই দীর্ঘ ইতিহাস লেখক এই পুস্তকে বড় সুন্দর ও সংহত ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। —জগজ্জ্যোতি

বিশ্বভারতী

৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭

কোমল তনুশ্রী

উর্বশী

অভিজাত প্রসাধন রেনু
সুপ্ত দেহ সৌন্দর্য্যকে
জাগ্রত করে

বেঙ্গল কেমিক্যাল • কলিকাতা·বোম্বাই·কানপুর

খাদ্যপ্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীরে রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড্' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

সুপার-নিও-কড্

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ
কলিকাতা-১৩

স্মরণীয় দৃষ্টান্ত

নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ব্যবসার বাজার যখন সাধারণতঃ মন্দার দিকে, তখন হিন্দুস্থান বীমা ব্যবসায়ে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা

২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার

অধিক কাজ করিয়া সর্ব্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। নূতন বীমার কাজেও ইহার অগ্রগতি অসামান্য।

১৯৫৩

নূতন বীমা ১৮ কোটি ৮৯ লক্ষের কিঞ্চিদধিক

এই সাফল্য হিন্দুস্থানের প্রতি জনসাধারণের অক্ষুণ্ণ আস্থার উজ্জ্বল নিদর্শন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, ৪নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১৩

ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া বিল্ডিংস্
৬৪নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা-১৩

১৯৫২ ইং পর্য্যন্ত প্রথম ১৬½ বৎসরে পাঁচটি সার্থক ভ্যালুয়েশান। প্রতি ভ্যালুয়েশানে পলিসি-হোল্ডারদের বোনাস্ এবং শেয়ার-হোল্ডারদের ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় বীমাজগতে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

এন্, সি, দত্ত
চেয়ারম্যান।

ডাক্তারদেরও পছন্দ

পিউরিটি বার্লি

কারণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সেরা শস্য থেকে
এই বার্লি তৈরি তো হয়ই, তা ছাড়া,
এর পেছনে আছে ১৫১ বছরব্যাপী
পেষাই-এর অভিজ্ঞতা।

অ্যাটলাণ্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড পোস্ট বক্স ৬৬৪, কলিকাতা - ১

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি
শিল্পী : শ্রীযুক্ত যামিনী রায়

পূর্ব্বাশা
শ্রাবণ—১৩৫১

দার্শনিক আলোচনায় যুক্তিবাদ ও ঈশ্বর

তারাপদ গংগোপাধ্যায়

ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে আবার নতুন করে সন্দেহ, আশাবাদ—আমাদের দেশেই না শুধু, নানা দেশেই তৈরী হ'চ্ছে। এটা আশার কথা এক হিসেবে বলতে পারি, যে যুক্তিবাদের দ্বারা এক সময় এই চেতনা চাপা পড়ে গিয়েছিলো, সেই যুক্তিবাদই এখন এই চেতনাকে দাবিয়ে রাখতে পারছে না। এর কারণ, যুক্তিবাদ যতই বিজ্ঞান হিসাবে ধরি না কেন, সেই বিজ্ঞান বুদ্ধির দ্বারস্থ হোয়ে এমন এক যায়গায় আটকে যায় যে তার থেকে উদ্ধারের অন্য কোন উপায় থাকে না, এমন কি বেরুবারও ব্যবস্থা নেই। কারণ বুদ্ধি এমন-ই একটা জিনিষ যা পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারস্থ হোয়ে এর বাইরের অন্য কোন উপলব্ধি কিম্বা ব্যাপ্তি ধরবার ও বুঝবার ক্ষমতা দেয় না। মনে হয়, যে-জিনিষ চাক্ষুষ দেখেছি, সেটাই সত্য এবং এই সত্যের দ্বারা জীবন-নির্ধারণের একমাত্র ব্যবস্থা বুদ্ধিমানরা করে নিতে চায়—যার জন্যে জীবন কিম্বা চেতনার উপলব্ধি বহু দুরতর নেপথ্যে আত্মগোপন করে থাকে। নেপথ্যকে গোচরে আনবার জন্যে যে বিশেষ চৈতন্য থাকা দরকার, তাকে আমরা এদেশীয় ভাষায় ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলি, কিম্বা বের্গসীঁয় নীতিতে ইনট্যুইসন বলি, তা ছাড়া জীবনের চরম সত্যকে জানবার দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। মার্কস-পূর্ববর্তী ভাববাদী ধারণার (মার্কসের ধারণা অনুসারে ঐশ্বরিক ধারণা ভাববাদ বলেই গ্রাহ্য) ঈশ্বরের অস্তিত্বকে যুক্তির দ্বারা খণ্ডন না করে পূর্ববর্তী বুদ্ধিগত ধারণাকে এমন ভাবে খণ্ডন করলেন যার দরুণ মার্কসের বুদ্ধির কৃতিত্ব আছে বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু যে জন্যে মার্কসবাদ খুব বেশী স্থানলাভ করলো, তার জন্যে মার্কসের বুদ্ধি যতটুকু দায়ী, তার চেয়ে মার্কসের ধারণার রাজ্যে সেই কাল তার চাইতে বেশি সহায়ক ছিলো। এবং কালক্রমই মার্কসের বুদ্ধিকে বর্তমানে বরবাদ করতে চলেছে।

যুক্তি কথাটাই বুদ্ধিনির্ভর। এই বুদ্ধিনির্ভরতা আমাদের দেশেও ছিলো (সাংখ্যদর্শন) যার জন্যে লজিক্যাল সেন্স 'ন্যায়সূত্র' নাম পেয়েছে। ওদের দর্শনে আরো গাম্ভীর্য আনবার জন্যে এই শব্দের পেছনে 'রিজন' শব্দ সংযোগ করেছে। কিন্তু সমস্ত উদ্দেশ্যই বিজ্ঞান-নির্ভর হওয়া উচিৎ,

যে বিজ্ঞান-নির্ভরতা আমাদের দর্শনে পুর্বেও ছিলো এখনও আছে (বৈদিক মন্ত্রের সূত্র নির্ধারণের কারণগুলো থেকে রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ দর্শন স্মর্তব্য)। কিন্তু মার্কস চূড়ান্ত বিজ্ঞানবিদ হোয়েও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানগত ব্যাখ্যায় গিয়েছেন কিনা আমি জানি না। ঐশ্বরিক সত্তা-চিন্তাটাই ভুল—মার্কসের এই চিন্তার জন্যে বোধহয় তিনি এই ভুল চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামান নি। কিন্তু শংকর যেমন বুদ্ধের নির্বাণতত্ত্বকে এই বলে ব্যংগ করেছিলেন, যার আসল তত্ত্বই শূন্যের ওপর নির্ভর, সেই আলোচনাও অবান্তর—কিন্তু শংকরের এই ব্যংগ কিম্বা কৌতুকপ্রিয়তার জন্যে যেমন বৌদ্ধের নির্বাণ-তত্ত্বের সত্য থেকে বিচ্যুতি হয় নি, তেম্নি মার্কসের চিন্তাও কি বর্তমানে সেই অবস্থায় পৌঁছে গেছে? আলোচনা করা দরকার এবং সে আলোচনা খুব বেশী করেই হওয়া উচিত।

আমি যদি বলি, আমি ঈশ্বর দেখেছি, যেমন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে বলেছিলেন—রামকৃষ্ণের এই প্রত্যক্ষত্বের চিন্তা যুক্তিবাদে কতটুকু প্রমাণসিদ্ধ হোতে পারে? বহু সন্দেহ নিয়ে আসার পরও বৈদান্তিক বিবেকানন্দকে পরে একথা স্বীকার করতে হোয়েছিলো, এমন কি ভগবানে চরমতম অবিশ্বাসী রসায়নের অধ্যাপক রামচন্দ দত্তকে (পরে রামচন্দ্র সেবক) পর্যন্ত এই আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হোয়েছিলো। এবং রামকৃষ্ণের বিজ্ঞান উপলব্ধির জন্যে যে সহজ ব্যাখ্যা—যে দুধ দ্যাখে নি সে অজ্ঞানী, যে দুধ দেখে দুধের রং জানলো সে জ্ঞানী, যে দুধ খেয়ে তার স্বাদ বুঝলো সে বিজ্ঞানী,—তাতে যে প্রবেশ করেছে, মার্কসের বুদ্ধিগ্রাহ্য মনও তার সেখানে ওলটপালট হোয়ে যায়। এমন কি, শেষ পর্যন্ত মার্কসের শেষ অস্তিত্ব ডায়েলেক্‌টিকস্ দিয়েও (মার্কসীয় ধারানুসারে) ঠাঁই পাওয়া যায় না, রামকৃষ্ণের সম্পূর্ণ অস্তিত্বের ব্যাখ্যা মিলে না। এবং এই বুদ্ধিগ্রাহ্য মন নিয়ে ঈশ্বরের বিচার চলে না। রামকৃষ্ণ যেটা বলেছেন—প্রথমে দুধ দেখার প্রয়োজন, সেই দেখতে গিয়ে যদি মনে হয় দুধের অস্তিত্বটাই নেই, তখন সে সত্তার শুভ অশুভ নিয়ে বিচার চলতে পারে না। মার্কসে এ অস্তিত্বই অনুপস্থিত। ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করবার জন্যে তিনি বিজ্ঞানগত ব্যাখ্যায় না গিয়ে পাশ কাটিয়ে গেলেন, এটা কি তাঁর বুদ্ধির নমুনা? বল্লেও হেসে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। তাঁর মত বিজ্ঞানবাদী মনও কেন এভাবেই প্রশ্নটি এড়িয়ে গেলেন এটাও একটা প্রশ্ন। হেগেলিয়ান দর্শনের যেটা মূল প্রতিপাদ্য, ঈশ্বরই সব, মার্কসীয় দর্শনে এই মূল প্রতিপাদ্য অস্বীকারের ব্যবস্থা কোথায়? ঈশ্বর নেই এবং এ চিন্তা কাল্পনিক ও ভ্রান্তরূপ যারদ্বারা প্রতিক্রিয়াশীলতার আশ্রয় পায়—এ চিন্তাই কি সব? কেউ যদি কোন সৎবস্তুর গুণাবলী না পায়, তাহ'লে সেই বস্তুটাই কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা? চার্চ এবং রাষ্ট্রের রথীরা প্রতিপাদ্যের ভ্রান্ত মানস নিয়ে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সমাজ-ব্যবস্থায় যে বিশৃংখলা এনেছিলো, তার জন্যে ক্রাইষ্টের বস্তুচিন্তাটাই ভুল? এবং এই সূত্র অনুসারে কেউ যদি বলেন—টিটো মার্কসের চিন্তার এবং কর্মের অনুসংগী হোয়ে যেভাবে কম্যুনিষ্ট ব্লক ছেড়ে সম্পূর্ণ কম্যুনিষ্ট ব্লকের বিপরীতমুখী হোয়ে উঠলো, এবং সেইজন্যে যদি মার্কস-এর চিন্তাটাই কাল্পনিক ও ভ্রান্ত বলে কোন মাকর্স বিরোধী উড়িয়ে দ্যান—মার্কসবাদী কি সেটা মেনে নেবেন?

অতএব সত্য-অসত্যের যাচাইএর পথটাই ভিন্ন, যুক্তির দ্বারা নিরসন হয় না। সেজন্যে ভিন্নতর চেতনা কিম্বা ধৃতি প্রয়োজন, যার সহায়তায় প্রতি অবস্থার গুণাগুণ নিজস্ব চেতনা ও অনুভূতিদ্বারা বোঝা যায়। তবু মার্কসের ভিতর বস্তুজীবন পুর্ণ চৈতন্য পেয়েও কেন বস্তুর বাইরে

হাত বাড়াতে পারলো না? এ জানতে হলে কিছুটা য়ুরোপীয় জীবনের ইচ্ছা-অনিচ্ছাগুলো নিয়ে আলোচনা করা দরকার—তাদের দর্শন, মনোবৃত্তির কারণ এবং সামাজিক সম্পর্ক। সেখানে বুদ্ধির দ্বার দিয়ে জ্ঞানগত অনুধৃতির কারণ কি জন্যে এবং এই ইতিহাসগত প্রেরণাও কি কারণের জন্যে?

য়ুরোপীয় প্রতিটি দেশে ভৌগোলিক সংস্থান, তার পরিবেশ, ও জনসংখ্যা এমনই একটা অবস্থায় ছিলো কিম্বা এখনো আছে যা কোনদিন একক নির্ভর হোয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পায় নি, এমনকি প্রচেষ্টা হিসেবে দাঁড়াবার সৌভাগ্যও হয়নি। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সংযোগ আনবার চেষ্টা ওদের ভিতর নেই। ওদের দৈনন্দিন জীবন চালাবার অপ্রাচুর্য, গ্রাসাচ্ছাদন তৈরী করবার নানারূপ অসুবিধা (এমনকি এমন দেশও আছে যাদের তিনমাস চালাবার আহার্য-সংস্থানও নেই), এর জন্যে নিজেরি প্রয়োজনে অন্যের প্রয়োজনের ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করতে চেয়েছে। ব্যক্তির সীমার গঠন ছোট করতে করতে এমন যায়গায় পৌছে গেছে, যেখানে নিজে ছাড়া অন্য ব্যক্তি নেই। পারিবারিক গঠন নিজেদের প্রয়োজনে, শুধু স্বামী-স্ত্রী এই সম্পর্কের জন্যে, যে সম্পর্ক ওদের শৈশবগত, অন্যের ভোগ্য সামগ্রীকে হাতে না-আনা ছাড়া উপায় নেই। এবং এইসব নানা প্রকৃতিগত কারণের জন্যে তাদের নিজেদের দেশ ছেড়ে অন্য দেশের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তে হোয়েছিলো—ডাচ, স্পেন, ফরাসী, বৃটিশ—যার জন্যে 'কলোনাইজেসন' একান্ত হোয়ে দাঁড়িয়েছিলো, নিজেদের প্রয়োজনে, নিজেদের বাঁচাবার জন্যে একান্ত বৃত্তি হিসেবে। একের অধিকার ছিনিয়ে আনবার জন্যে এবং নিজেদের সম্পদ বাড়াবার একান্ত প্রয়োজনের তাগিদে প্রতিব্যক্তির চেতনায় বুদ্ধিটাই একমাত্র উপলক্ষ হোয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কূটনীতির জন্যে য়ুরোপে একমাত্র বৃটিশ পৃথিবীর বহু ভুমির অধিকারী হোতে পেরেছিলো এবং যে অধিকারী-মনোবৃত্তির জন্যে ফরাসীর দ্বারা য়ুরোপের অন্যান্য দেশগুলো পদানত করবার জন্যে নেপোলিয়নের কাহিনী কিম্বা এ্যাংলো-ফরাসীর চিরন্তন বিরোধ এবং যে ইচ্ছা নিয়ে জার্মান জাতির পদচারণা, ইতিহাসের নজীর সেইসব অন্তরনিহিত কারণের জন্যেই। এবং এই অন্তর্নিহিত কারণের ক্রমপরিণতি হিসেবে পঁচিশ বছরের ভিতর আমরা দু'টো যুদ্ধ দেখেছি এবং আর একটা যুদ্ধ দেখবার জনে সবাই শংকিত ও ভীতিগ্রস্ত। আর যেখানে বাঁচবার তাগিদটাই আগে সেখানেই 'Struggle for existence' এর দর্শন আসতে পারে যা ওদের রক্তগত সম্পর্কের দ্বারা তৈরী। অবশ্য এইসব কার্মিক স্পৃহার ভিতর বুদ্ধির ক্রিয়া কৌশল, কূটনৈতিক সম্পর্ক, জীবনধারণ উপযোগী ব্যবস্থা তৈরীর জন্যে নানারূপ বিতর্কের দ্বারা এইসব সম্ভাবনার একান্ত পরিণতি হিসেবে আন্তরচেতনা এসে যাচ্ছে। অবশ্য এইজন্যে একটা বিচিত্রতার স্বাদ পাওয়া যায়—বহু রদবদলের পর যে জীবন আরম্ভের জন্যে উদ্যোগ আয়োজন, তার কার্মিক চেতনায় সেই বিচিত্রতার জন্যে য়ুরোপীয় সাহিত্য কাব্যে যে জীবন প্রদক্ষিণ চলছে, তা অচিন্তনীয়ই বলা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের এ আলোচনায় সাহিত্য একান্ত নয়, যদিও সাহিত্য দর্শনের সাথে অংগাংগী সম্পর্কিত তবুও এ আলোচনা বহির্ভূত রাখতে চাইছি অন্যকারণে। শীলার, শেলিং প্রভৃতি দার্শনিকদের বক্তব্য ছিলো চরমসত্যকে প্রজ্ঞানের দ্বারা বোঝা যায় না, শিল্পীর প্রত্যক্ষ বোধির দ্বারা অবগত হওয়া যায় এবং হেগেল যুক্তিবাদী হোয়ে যেভাবে তা অস্বীকার করেছিলেন—আমি সে কারণে এ বন্ধ রাখতে চাইছি না। আমার কারণ অন্য, আমি যুক্তির স্বীকৃতিকে ধোলাই মোছাই করে দেখতে চাই।

এবং এইসব কারণ সামনে রেখে যদি ওদেশীয় দর্শন-অনুধ্যান সামনে রাখা যায়, যে বিরোধ ওদের জীবনধারণের জন্যে রক্তের সাথে সম্পর্ক সেই বিরোধ-ই ওদের দর্শন-অনুধ্যানের প্রতি সোপানে সোপানে, সমীকরণ নয় (সমীকরণ শব্দ 'সিনথিসীস' শব্দের পরিবর্তেই ব্যবহার করছি, কিন্তু গূঢ় তাৎপর্যগত অর্থে, সেই তাৎপর্য পরে বলছি)। তত্ত্ব হোলেই মানুষ স্বীকার করতে পারে না, তার সাথে সৎ জনোচিত ক্রিয়াকর্ম প্রয়োজন যে ক্রিয়াকর্মের রূপ দেখে সাধারণ মানুষ জীবন চালাবার জন্যে আস্থা পায়। কিম্বা এই বর্তমান অবস্থার ওপর একমাত্র স্বীকৃতি—মানুষের সাথে মানুষের, সৎ প্রবৃত্তির সাথে চিরন্তন ব্যবস্থার। ফরাসী বিপ্লবে যে গণজাগরণ ঘটলো এবং যে রক্তাক্ত স্মৃতির স্বাক্ষর য়ুরোপের বুকের-ই এক জলন্ত স্বাক্ষর—আর সেই বিপ্লবের পর ফরাসীতে যে সমাজ স্থাপিত হলো সেই সমাজে কেন এত শ্রেণীবৈষম্য ছিলো? সাম্য মৈত্রীর বাণী নিয়ে যে ফরাসীতে এত বড় কাণ্ড ঘটে গেলো, সেই মূর্তি ফরাসীর রাষ্ট্রীয় জীবনেও স্থান পেলো না—স্থান পেলো বহু ধুরন্ধর, ফরাসীর চেয়ে বহু বিষয়ে বৈষয়িক সেই বৃটিশের জমিতে ডিমোক্রেসীর রূপ নিয়ে? কিম্বা যে হেগেলীয় দার্শনিক চেতনা য়ুরোপে এতবড় যুগন্ধর ছিলো, সেই হেগেলও প্রুসিয়ার সম্রাটের ও সেই সময়কার রাষ্ট্রীয় রথীদের আমলাতন্ত্রীমত, যা সাধারণ জনমতের বিরুদ্ধে ছিলো, সেই মত সমর্থন করতে পারতেন? এর একমাত্র কারণ তাঁরা নিজের জীবনের সত্য ছেড়ে জীবনধারণের তাগিদের সেই অস্তিত্বটাই বড় করে দেখেছিলেন। এই জীবনস্বীকৃতির পর্যায় দেখতে গিয়ে, তাঁদের দর্শনেও যে সত্যস্বীকৃতিটুকু ছিলো, তা কোনদিন সম্পূর্ণতা পায় নি। এই বীক্ষণের জন্যে প্রথম প্রয়োজন, আমি কি বলছি এবং যা বলছি তা সত্য কিনা—তার জন্যে সম্পূর্ণভাবে অনুকর্ষণ। রামকৃষ্ণের উপমা দেখিয়ে আগে যে অজ্ঞান ও জ্ঞানবাদীর দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি, য়ুরোপের দর্শন সেই জ্ঞানবাদের অনুকর্ষণের জন্যেই ছিলো—এমনকি জ্ঞানবাদীর পর্যায়ে যাবার জন্যে যে 'দুধ দেখার' প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনও সীমীত। কিন্তু ভারতীয় চীকীর্ষায় বৈদান্তিক অনুধ্যান, বৌদ্ধধর্মত, চৈতন্যপরিচয় কিম্বা রামকৃষ্ণ-অনুধ্যান। তাঁরা যা বলতে চেয়েছেন আগে বুঝে নিয়েছেন, এর সত্য কতটুকু। আমার কোন কথা বলার মূল্য নেই, যতক্ষণ কোন গুণগত পরিচয়ের আমার কর্মের দ্বারা প্রকাশ করতে না পারছি। তারজন্যে এ দেশীয় দার্শনিক-ভুক্তির প্রথম তত্ত্বই হ'চ্ছে সাধনতত্ত্ব, সাধনতত্ত্বই হ'চ্ছে সেই জিনিষ, বহু অনুধ্যানের পর জীবন সংকেতের একমাত্র চিহ্ন আবিষ্কার, আমার চৈতন্যসত্তার সত্য পরিচয়। বৈদান্তিক অধ্যায়-এর পর বৌদ্ধযুগের এত বড় বিপ্লবাত্মক ঘটনাও ঘটতে পারতো না যদি এমান কোন পরিচয় যেখানে না থাকতো। কিম্বা বৌদ্ধযুগের পর শাংকর মতের শক্তিচেতনা কিম্বা তারপর চৈতন্যের প্রেমামৃত কিম্বা হাল আমলে রামকৃষ্ণের সর্বধর্মের সমন্বয় সাধনা। রামকৃষ্ণ এই প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানবাদীর মতের বিরুদ্ধ হিসাবে প্রত্যক্ষ প্রতীক। হাল আমলে বুদ্ধি, শিক্ষা, বিত্ত, অর্থ যা জীবনগত প্রয়োজনের খাতিরে একমাত্র সত্য বলে ধরে নিয়েছি, সেখানে তিনি এইসব থেকে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ থেকে কোন্ শক্তি নিয়ে এই যুক্তিবাদীর জড়বাদী চিন্তাকে বরবাদ করলেন—এখানে জড়বাদীর চেতনায় এক চূড়ান্ত প্রশ্ন। এর একমাত্র কারণ, ভারতীয় দর্শনের এটাই নিয়ম, মানুষের অমৃতত্বের সন্ধানের জন্যে নিজেই সে অমৃত চেখে দেখেছে। কিন্তু য়ুরোপীয় জীবনবাদের মস্তবড় ভ্রান্তি তারা নিজকে তৈরী না করে, অন্যকে তৈরী করার ভার নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের-ই একটা কথা আমরা এখানে মনে করতে পারি—'যদি আমরা জানতে চাই আমাদের

বুদ্ধিশক্তিটা কি, তবে কোনখানে সন্ধান করবো? যেখানে মানুষের গণনাশক্তি চিরদিন ধরে পাঁচের বেশী এগুতে পারলো না সেইখানে?'

এবং য়ুরোপের ভাববাদী দর্শন এই বুদ্ধির দ্বারে পৌছে গিয়ে আটকে গিয়েছিলো এবং বুদ্ধির দ্বারাই মার্কস এই গেরো খুলে অন্য পথে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন আর বুদ্ধির দ্বারাই এক একজন এক-একজনের দর্শনের অধ্যায়কে কুপোকাৎ করেছেন। ইলিয়টিক দার্শনিকদের মতে যা প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাই একমাত্র সত্য নয় কিন্তু প্রোটোগোরাস তা মানতে চান নি—তাঁর মতে দৃশ্যবস্তুই একমাত্র সত্য জ্ঞান এবং এই সত্যের কোন সার্বিক রূপ নেই। এবং প্লেটো আবার প্রোটোগোরাসের মতকে খণ্ডন করলেন—সত্য প্রত্যক্ষগম্য নয় এবং সার্বিক সত্যকে বুঝবার একমাত্র কষ্টিপাথর অনুভূতি এবং দেশকালের অতীত কোন জ্ঞানগম্য জগতে এই সত্যসমূহের 'একজিসটেন্স'। এ্যারিষ্টেটল আবার অদৃশ্যজ্ঞানগম্য অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। এই 'না' এবং 'হ্যাঁ' এটাই য়ুরোপীয় দর্শনের উপলব্ধি। যেটা জ্ঞানমার্গের বস্তু। কান্টিয় দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিতে যে নতুন তত্ত্ব এলো, তাতেই জীবন স্বীকৃতির একমাত্র অংগীকার কোথায়? তাঁর জ্ঞানবাদী দর্শনের একমাত্র বিষয়, মানুষের সেই চূড়ান্ত সত্তাকে জানবার উপায় নেই-চরম সত্য কান্টিয় জ্ঞানরাজ্যে অজ্ঞেয় বলেই ধরে নেওয়া হোয়েছে। কান্ট এবং ফিক্টের স্বকীয় ইচ্ছাশক্তিকে চরমবাস্তব বলে ধরা—এটা কি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সেই প্রকাশ, যে প্রকাশ য়ুরোপের ব্যক্তির নিজস্ব জীবন নিয়ে বাঁচবার একান্ত তাগিদ? যে তাগিদ বার্কলিতে পর্যন্ত পর্যবসিত? এবং সব চেয়ে আশ্চর্য, হেগেল কান্টিয় স্পিনোজীয় দর্শনকে বুদ্ধির ব্যবস্থা বলে আখ্যা দিয়েছিলেন এবং মার্কস এংগেলস হেগেলীয় দর্শনকে ব্যংগ করে মগজের পদ্ধতি বলেছিলেন। এবং হেগেল ও মার্কস তাঁদের পূর্ববর্তী দার্শনিক ব্যবস্থাকে যে আখ্যা দিয়েছিলেন, এটাই ওদেশীয় দর্শনের রূপধৃতির ব্যবস্থা। প্রত্যেকে বুদ্ধির দ্বারা, কান্টের যে ইচ্ছা ছিলো বুদ্ধির দ্বারা যোগসূত্র আবিষ্কার—সেই যোগসূত্রের দ্বারা একে অন্যের দর্শনকে কুপোকাৎ করে নিজকে দাঁড় করিয়েছেন, যা য়ুরোপীয় জীবনের একমাত্র ব্যসন। এবং মার্কসও এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, আর গ্রহণ করার পর, আসল সত্যকে স্বীকার করার পর যে যুক্তিকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন, তাও আবার আজকে বুদ্ধির কাছে দেউলে হোয়ে যাবার উপক্রম হোয়েছে।

তবু মার্কসের চিন্তার যতটুকু দোষত্রুটি থাকুক (এবং এটা স্বীকার করে নেওয়া ভাল, মার্কসের যেটুকু সত্য, সেটুকু স্বীকার করা), মার্কসের চিন্তা চেতনা দর্শন, যে দর্শন মানুষকে কেন্দ্র করেই তৈরী হোয়েছে। ফরাসীয় রুশোর চিন্তার পর য়ুরোপ আবার নতুন করে দেহ খুঁজে পেয়েছিলো—যে দেহের কথায় তাদের নিজেদের কথা, নিজেদের চিন্তা, নিজেদের বিষয়, নিজেদের চেতনা এবং এইজন্যেই মার্কস উনবিংশ শতাব্দীর একমাত্র সত্য দর্শন, যে দর্শন মানুষকে বাদ দিয়ে তৈরী হয় নি। কিন্তু বুদ্ধির কাছে গিয়ে সেই রিজন, যে রিজন তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, শেষ পর্যন্ত দিশেহারা হয়। বস্তুর ভিতরেই সৎ অসৎ সত্তা বর্তমান এবং সেই বস্তুর নিরন্তর পরিবর্তনে-ই চেতনার উদ্ভব—এটাই মার্ক্সীয় সংজ্ঞা। কিন্তু এ পরিবর্তন কিসে হয়? সাধারণ প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে বস্তুর নিজস্ব কোন গতির সত্তা নেই, বাহ্যিক আলোর উপাদানই তার প্রাণিক সত্তার নিয়ম। এবং এইরকম ক'রে যদি বস্তু ধরে ধরে যাই, তার শেষ বস্তুর প্রাণিক সত্তা কোথায়? মার্কস এখানে

উনবিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক জড়বিজ্ঞানকে স্বীকার করেন নি, তিনি বস্তুকে গতিশীল বলেছেন যে গতি অন্য বস্তুর অপেক্ষার সূত্রে তৈরী হ'চ্ছে, (কিন্তু বস্তুর কি কোন একক গতিময়তা আছে, না বস্তুর নিজের অন্তরেই সৎ-অসৎ এনার্জি সুপ্ত, অন্য কোন বস্তুর আলোক কণায় তা তখন প্রকাশের জন্যে উন্মুখ ও চঞ্চল ?) এবং এই প্রাকৃতিক নিয়মে বস্তুজগৎ বিবর্তিত—বাহ্যিক কোন শক্তির নিয়মে নয়। মন কি এখানে থেমে যেতে পারে, যেখানে বস্তুকেই স্বীকার করলুম, সেখানে প্রকৃতিকে পর্যন্ত বস্তু ছাড়া ভাববার অবসর কোথায় ? সেই প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্বগত প্রাণিক সত্তা কি ? মার্কস অবশ্য প্রকৃতিকে সময় ও স্থান বলে ধরে নিয়েছেন। আইনষ্টানীয় আপেক্ষিক নিয়ম যদি স্বীকার করি, তবে রিলেটিবিটি মার্কসের ডায়েলেকটিকস্ নীতির একমাত্র সোপান ? কিন্তু আইনষ্টানীয় রিলেটিব ট্রুথ শুধু ট্রুথ নিয়েই থেমে থাকে নি, সেখানে তিনি আবার এ্যাবসলিউট টথের কথা স্বীকার করেছেন যে ট্রুথ ছাড়া বিশ্বচিন্তাই ভ্রান্ত। ভারতীয় দর্শনের সেই ব্রহ্ম চিন্তা—যা অনাদি, অক্ষয়, অব্যয়, নিরাকার, অচিন্ত্য ; যা থেকে সমস্ত কিছু প্রকাশ কিম্বা আহৃত, সেই ? কিম্বা রামকৃষ্ণের ব্রহ্ম ব্যাখ্যা ছাড়া আরো সহজ ব্যাখ্যা—ডেকচীতে আলু পটল লাফাচ্ছে, কিন্তু যেই মুহূর্তে উনুনের তলা থেকে গনগনে আগুনটুকু সরিয়ে নেওয়া হোলো তখন কি সেই লাফানি থাকবে ? মার্কসের চিন্তা কি এইখানে বরবাদ হ'লো ? যুক্তির খাতিরে যে সময়কে তিনি বস্তু বলে ধরলেন—আইনষ্টানীয় বিজ্ঞানের খাতিরে সেই সময়-ও তো অদৃশ্য, অস্পৃশ্য—তার স্থিতি-স্থাপকতাও অচিন্তনীয়।

তবু যুক্তির খাতিরে মার্কসীয় এ ব্যাখ্যা আরো ভাল করে বুঝবার জন্যে স্বীকার করলুম। মার্কসীয় বস্তুজ্ঞানের ভিতরেই সৎ-অসৎএর দ্বন্দ্বে মানসচেতনার প্রকাশ। কিন্তু সে সৎ আর অসৎএর ডেফিনেশন মার্কসের সমস্ত থিসীস উদ্ধার করে বলা যায়—সৎ হ'লো সেই জিনিষ, যেখানে মংগল আছে, যে মংগল মানসিক গতি ও উন্নতির জন্যে—এটাই সৎ আর তার সাথে যার পূর্ণ অনৈক্য তা অসৎ। এবং এই বস্তুর আভ্যন্তরিক প্রেরণায় সৃষ্টি ও ধ্বংস সংযোজিত - যার জন্যে বিবর্তন আর পরিবর্তন। কিন্তু আমার সৎএর রিলেসন অন্যে মানবে কি না ! অন্তত চাক্ষুষ দেখছি, বর্তমানের সোভিয়েট বিশ্বাস অন্য রাষ্ট্র মানছে না। কিন্তু মার্কসের উত্তর, একটা অবস্থা থেকে আর একটা অবস্থায় রূপান্তর ডায়েলেকটিক্যাল। এবং এই ডায়েলেকটিক্যাল গতিবেগ নিয়েই মার্কসীয় দর্শনের বিজ্ঞান। কিন্তু প্রতি অবস্থার ভিতর যদি বিনাশের বীজ লুক্কায়িত থাকে, এবং এটাই যদি আমি বুঝতে থাকি, আমার প্রতি কর্মের পেছনে ফাঁক থেকে যাচ্ছে (বিনাশের বীজের জন্যে) এবং সেই ফাঁক পূরণের জন্যে আবার থেমে চূড়ান্ত বীজ বপন নির্ধারণ নিতে হবে—তাহ'লে কোন ভরসায় মানুষ সৃষ্টিকর্মে প্রযুক্ত হবে ? কারণ মানুষ মৃত্যুভয় নিয়ে বাঁচতে চায় না আনন্দের জন্যে, সে আনন্দ যদিও কষ্টসাধ্য হোতে পারে, কিন্তু এই আনন্দই মানুষকে বাঁচবার প্রেরণা দেয়, অন্তত এটাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু এই প্রবৃত্তির স্বাক্ষর কি মার্কসীয় দর্শনে আছে ? নাকি মার্কসীয় দর্শনের সেই নিরন্তর সংগ্রামের আয়ুধই লক্ষ্য ? মানুষের চিরন্তন ইচ্ছা, যা মার্কস নিজেও বলেছেন—মানুষের জন্মগত ইচ্ছা, সুখ, ভালবাসা—মানুষের এই নিরন্তর সংগ্রামের পদক্ষেপে সেইসব বৃত্তি কি ফিরে পাবে ? এরপর আরো যদি সেরকম যুদ্ধ রাশিয়ার বুকের ওপর আসে, এই মানুষ-ই হাতিয়ার ধরার পর পরবর্তী সোপানের জন্যে স্থির থাকতে পারবে ? সত্যগত ধারনার বশবর্তী হোয়েই বলা

যায়—মানুষ কোনদিন চিরন্তন সংগ্রামের উপচার নিয়ে বাঁচতে চায় না, এ চিন্তা মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তির বিরুদ্ধগত ধারনার চিন্তা। যে মানুষ দাঁড়াবার জমি পায় না তার কাছে এই থিসীসগত চিন্তা অচল। যে ভগবানের দোহাই দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর ভাবমানস সে দেশের মানুষকে আটকে রাখতে পারে নি, মার্কস-এর এই ভাবমানস সেই অবস্থায় পৌছে যাবে না তার কি প্রমাণ আছে ?

এইসব যুক্তির উত্তর মার্কসীয় দর্শনে নেই। অবশ্য তাঁর বুদ্ধি উনবিংশ শতাব্দীর ঐশ্বরিক চেতনাকে বরবাদ করবার জন্যে যতটুকু যুক্তি প্রয়োজন, সেটুকুই দিয়েছে। আর বুদ্ধি প্রত্যক্ষকে ছেড়ে এগুতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে এই প্রত্যক্ষ বুদ্ধির দ্বারা বিচারতত্ত্বে মার্কসীয় দর্শনের চরমমূল্যের স্বীকারে তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। আর সে জন্যে মার্কসীয় দর্শনও চূড়ান্ত পর্য্যায়ে পৌছে গেছে। চার্চে যাবার সংখ্যা রাশিয়ায় বেড়ে গেছে কেন এবং কেনই বা য়ুরোপের চিন্তামানসিকতা দু'ভাগে ভাগ হোয়ে পড়ছে ? ক্রিশ্চিয়ানিটি অভ্যুদয়ের জন্যে আবার নতুন চেষ্টা। হোয়াইটহেড আলেকজান্দার প্রমুখ দর্শন অনুধ্যানীদের ঐশ্বরিক অনুভূতি নিয়ে দর্শন এবং বের্গসঁর মধ্যপথীয় দর্শন ঐশ্বরিক উপলব্ধিকে স্বীকার করে নি কিম্বা দ্বান্দ্বিক জড়বাদের স্বাধীন উপাধিকেও। সাহিত্যে এলিয়ট মারিয়াক প্রমুখের ঐশ্বরিক চিন্তা নিয়ে সাহিত্যে পদচারণ কিম্বা সার্ত্রের এই দুই দর্শনকে স্বীকার না করে অন্যতর জীবনদর্শন নিয়ে সাহিত্য প্রচেষ্টা এইসব মার্ক্সের চরমতম কোন মূল্যের অভাবের জন্যে চলে আসছে। বর্তমান জাগতিক অবস্থা এমন একটা অবস্থায় পৌছে গেছে, যেখানে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রত্যক্ষ মীমাংসা দ্বারা তার ভবিষ্যৎ একান্ত অনিশ্চিত, এমনকি চরমতম অশেষের আশংকায় ভরপুর। যে অতিরিক্ত জড় ব্যাখ্যার জন্যে চার্বাক দর্শনও ভারতীয় মানসিক অবস্থার ভিতর শিকড় চালাতে পারেনি, মার্কসের দ্বান্দ্বিক জড়বাদীর চেতনাও সেই অবস্থায় পৌছে গেছে।

এবং সেইজন্যেই বলা যায়, যত চিন্তাই হোক যুক্তির দ্বার দিয়ে চরমসত্তায় পৌছনো যায় না। থিসীসের পর সিনথিসীস আনবার প্রচেষ্টা যুক্তির দ্বার দিয়ে ঝেটিয়ে বিদায় করা যায়, বুদ্ধির কৌলিন্য যদি একজনের থেকে অপরের বেশী থাকে। তবু আমরা আলোচনা করতে করতে এমন এক যায়গায় পৌছে গেছি, যদি মার্কসীয় দর্শনকে স্বীকার না করে, তাঁর বিরুদ্ধবাদী দর্শন (মার্কসের মতে) স্পিনোজীয় ঐশ্বরিক সত্তার 'নির্গুণ' ব্যাখ্যা কিম্বা হেগেলীয় 'সগুণ' পরিচয় কিম্বা এদেশীয় বৈদান্তিক অধ্যায় থেকে রামকৃষ্ণ পর্যন্ত, সেই ব্রহ্মপরিচয়--তিনি 'হাঁ' থেকে 'না', সাকার থেকে নিরাকার, বস্তু থেকে অবস্তু, অস্পৃশ্য, অব্যক্ত, অব্যয় যে ভাবেই বলি না কেন, স্বীকার করে নিই, এই ঈশ্বর যে বর্তমান তার প্রমাণ কি ? প্রশ্নটা সাংঘাতিক। তার আগেই বলে নেওয়া ভাল—কথাটায় যুক্তিগত বিচারে না গিয়ে যদি বিজ্ঞানগত চেতনার ধারে যাওয়া যায়, উত্তর সেখানে সহজ। (বৈজ্ঞানিক শব্দ ওদেশীয় মতে 'on practice' অর্থে ব্যবহার করছি)। কারণ কথাটা বুদ্ধির না, প্রজ্ঞার শুধু জ্ঞানের না বিজ্ঞানের। তবু যুক্তির খাতিরে কেউ যদি বলেন, যে আমি ঈশ্বর দেখেছি—আপনার উত্তর, প্রমাণ দাখিল করুন। কারণ যুক্তিটাই আমরা শিখেছি, কর্ম না।

এবং প্রমাণের জন্যে যদি আইনষ্টানীয় আপেক্ষিকতাবাদ আবার টেনে আনি, আর যদি আমি বলি এই আইনষ্টানীয় বৈজ্ঞানিক সত্য কতটুকু প্রমাণগ্রাহ্য ? কিন্তু কথাটা বলা যায় না। কারণ আইনষ্টানীয়

বৈজ্ঞানিক সত্য ইতিপূর্বেই প্রমাণিত হোয়েছে, সেখানে আমার মত অবৈজ্ঞানিকের এ জিগ্যেস করাই বাতুলতা। কিন্তু আপনার ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করার কারণও যদি এমনিভাবে প্রমাণ করি? এমন কোন বিজ্ঞানী, যিনি ঈশ্বরের এই উপলব্ধি নিয়ে এই ল্যাবরেটরীতে জ্ঞানমগ্ন, তিনি কি বলেছেন এর অস্তিত্বই মিথ্যা এবং অবান্তর ? আর আপনি তার ধারে কাছে না গিয়েই যদি বলেন এ মিথ্যা—আপনার কথা অন্যের স্বীকারের জন্যে কি যুক্তি ? যে এদিকে বৈজ্ঞানিক তাঁর কথাই চরম সত্য বলে স্বীকার করবো, না যিনি এদিকে অবৈজ্ঞানিক ?

উত্তর বোধ হয় দেওয়ার প্রয়োজন করে না।

তাই যুক্তিবাদ দিয়ে চরমসত্য নির্ধারণ হয় না, কারণ যুক্তি নিজস্ব প্রয়োজনে শুধু যুক্তিই খোঁজে, সত্য নয়। মগজের উপঢৌকন কোনদিনই চেতনায় হয় না। চেতনার জন্যে ভিন্নতর পথ প্রয়োজন যুক্তির আংশিক চেতনা দিয়ে বাঁচবার প্রয়োজন নয়। এমন কোন বিশ্বাস, যা শান্ত এবং নিশ্চয়, ধ্রুব এবং সত্য—যেখানে পৌছুনোর ইচ্ছাটাই চরম, পথের কণ্টকজনিত উপসর্গ নয়। মার্কসের দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা এমন কোন চরমতমের সন্ধান দিতে পারে না, আর তাঁর দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যায় দেওয়ার উপায়ও নেই। ঈশ্বরের উপলব্ধিটাই যখন সৎ, যে সৎএর অনুচেতনা থেকে কেউ দ্বিমত নয়—ক্রাইষ্ট, মহম্মদ, এমন কি আধুনিক অরবিন্দ মানসচেতনা পর্যন্ত এবং এই উপলব্ধির জন্যে দ্বন্দ্ব আছে, যে দ্বন্দ্ব মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক অনুপ্রেরণার মতই কিন্তু মার্কস শুধু আরম্ভটাই বলেছেন, চরম নয়। রামকৃষ্ণের সেই ব্যাখ্যা যে দুধ খেয়েছে, সেই বৈজ্ঞানিকের কাছে মার্কসের বস্তুজীবনের এই প্রথম ব্যাখ্যা অনেক পেছনে পড়ে যায়। সেখানে চিদানন্দ থেকেই মহানন্দ, যেখানে আইনষ্টানীয় এ্যাবসলিউট ট্রুথ আর রামকৃষ্ণের ব্রহ্ম ব্যাখ্যা এক।*

* এই প্রবন্ধে যে সব আলোচনা উঠিয়েছি, এরকম কথা আমার মনে বহুদিন থেকেই ঘোরাফেরা করছিলো। এই গ্রীষ্মে শ্রদ্ধেয় শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা এসেছিলেন। প্রবন্ধে আমি যে সব আলোচনা উঠিয়েছি, এগুলো আমি তাঁর কাছে উত্থাপন করি। শেষপর্যন্ত কথাপ্রসংগে তিনি জানিয়েছিলেন, এই ধরণের কোন লেখা বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে কেউ লিখছেন কিনা? তাঁর ঐ কথার পর আমি এই প্রবন্ধ লেখার প্রেরণা পেয়েছি। কোন একটি ব্যক্তিগত কারণে এ কথা জানাতে বাধ্য হ'লাম।

সুরাসুর

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

অসুর কথাটির সঙ্গে আমরা অতি-পরিচিত। ইতিহাস যে-ভাবে পরিচিত, সে-ভাবে পরিচিত নই ; কাব্য-ভাবেও পরিচিত নই। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে ও চারিত্রিক দোষাবলী বা দুরন্ততা নির্ণয়ে 'অসুর' কথাটি আমরা ব্যবহার করে এসেছি। অসুরের চিত্র বা প্রতিমাও অঙ্কিত বা নির্ম্মিত হয়। তাতে তাকে সমুদ্র-মন্থনের দৃশ্যে বা দেবী দুর্গার পদতলে যুধ্যমান অবস্থায় পাওয়া যায়।

বস্তুত অসুর কি একটি ভাব? এর বাস্তব সত্তা কি কোনো কালে ছিলনা? আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে এবং কিম্বদন্তীতে কিন্তু অসুরের উল্লেখ আছে। আমার জিজ্ঞাস্য, সে-উল্লেখ কোন্ ধরনের, ভাবাত্মক না বিষয়াত্মক? ভারতে ও বহির্ভারতে কেউ-কেউ, কোনো জাতি বা গোষ্ঠী, অসুর নামে নিশ্চয়ই পরিচিত ছিলেন। ঐতিহাসিকরা বহু অসাধ্য-সাধনে তৎপর, কিন্তু ভারতীয় অসুররা 'এসিরিয়া'র সঙ্গে জড়িত ছিলেন কি না এ-সম্পর্কে টু-শব্দটি করতে অনিচ্ছুক। কেন যে অনিচ্ছুক—অনিচ্ছাটা শালীনতার দায়ে কিনা, তা অবিদিত। এসিয়া-মাইনরে ঋক্‌বেদী সংস্কৃতি আবিষ্কৃত হলে পর ৺ভাণ্ডারকর বলেছিলেন যে ঈশোপনিষদে উল্লেখিত 'অসূর্য্য'-দেশটি 'এসিরিয়া' হতে পারে।* ভারতীয় ঋক্‌বেদের তথ্যাদির সম্পূর্ণ জ্ঞান পেতে হলে এসিয়া-মাইনরে প্রাপ্ত ফলকগুলো যে অত্যন্ত মূল্যবান, এ কথা ৺ভাণ্ডারকর স্বীকার করলেও ভারত-ইতিহাসের অসুরস্মৃতি তিনি গ্রাহ্যে আনেন নি।

এসিরিয়া এসিয়া-মাইনর অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। তদঞ্চলে বৈদিক সংস্কৃতি

* 'অসূর্য্য' কথাটি যে অসুর ব্যঞ্জক তা ঋক্‌বেদ-পাঠেও জানা যায়। 'উষা'-স্তুতির কালে প্রচেতস্ (বৃহস্পতি), ইন্দ্র, সবিতৃ, অগ্নি, সোম, রুদ্র, বরুণ 'অসূর্য্য' বা 'অসুর' উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন। প্রথমত অসূর্য্য মানে ছিল স্বর্গীয়। তারপর পিতৃপুরুষরা প্রেতযোনী-প্রাপ্ত হয়ে 'অসুর' হয়ে গেছেন। তাছাড়া ইন্দ্র আকাশ-দুহিতা উষাকে তাড়িতা করেছেন। নারী-ঘাতক হিসেবেও তিনি এবং তাঁর কতিপয় সহচর 'অসুর' আখ্যা পেতে পারেন। 'প্রচেতা' কথাটি মৌর্য্য-অনুশাসনে আছে। চেত বা চেদীকুল প্রচেতা বংশ। চোড়-পাণ্ড্য-কেরল-সতীয় সন্ততিও এই বংশ। করমণ্ডল উপকূলে উদয়-গিরি প্রভৃতি পর্ব্বতগাত্রের প্রস্তর-শিল্পে এসিরিয়া-সুলভ মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়েছিল দেখা যায়। মহাভারতের যুগে চেদীরাজ ছিলেন শিশুপাল। শিশুপাল-স্মৃতি আসামেও আছে। এসিরিয়ার কতিপয় রাজা 'পাল' উপাধি নিয়েছিলেন। ৺ভাণ্ডারকর হয়ত বলতে চেয়েছিলেন, এসিয়া-মাইনরের ঋক্‌বেদী ঘাঁটি হট্টি-রাজধানীতে প্রাপ্ত মৃৎ-ফলকগুলো চেট্টি বা চেদী রাজধানী থেকে যেতো। অবশ্য তখন তাঁদের রাজধানী হয়ত এসিরিয়াতেই ছিল। সেখান থেকেই আর্য্য-রূপে চেদীরা প্রাচ্যে আসতে পারেন। ইন্দ্র-প্রভৃতি বাস্তব সংস্কৃতি-পরায়ণ করিতকর্ম্মা পুরুষরা চেদী-আদর্শ অনুসরণ করেছেন মনে হয়। তাঁদের অসুর-উপাধির এ-ও একটা কারণ হতে পারে। —লেখক।

তুর্কীজাতির মারফৎ বিস্তৃত হয় বলে অনেকে ভাবতে পারেন। প্রাগৈশ্লামিক তুর্কীকে তুষার জাতি বলা হত। অন্তত সিলভ্যাঁ লেভী তা-ই মনে ভেবে গেছেন। আমরা জানি, দেবী দুর্গাকে 'তুষার-কন্যা'-ও বলা হয়। এই দেবীর আবির্ভাব হিমালয়-সানুর তুষার (তোখার=তুর্কী) অঞ্চল থেকে। এ-দেশের মানবগোষ্ঠীর ভাষা থেকেই সেল্টো-ইতালীয় ভাষা জন্ম নিয়েছে। তুর্কী বা তুরস্ক কথাটির মূল তুরানীয় জাতির অস্তিত্বে। 'তুরানীয়'-কথাটির মূল সংস্কৃত 'তুর' (ক্ষিপ্র) শব্দ থেকে। ব্রাহ্মণ-যুগে 'তুর কাবাষেয়' নামে একজন পাণ্ডব-পুরোহিতের নাম পাওয়া যায়। তুর্কী-শব্দের উৎপত্তিস্থল হয়ত তিনি এবং তাঁর অঞ্চল তক্ষশিলা। পরে কুশান রাজবংশকেও অল্-বীরুনী তুর্কী নামে অভিহিত করেছেন। তাঁদের পূর্ব্বপুরুষ তিব্বতাঞ্চলে ছিলেন। হিমালয়ের সানুদেশে মৌর্য্যস্মৃতিলিপ্ত 'রামপূর্ব্বায়' কুশানরাজ 'কুজল কদফিসা'-কর্ত্তৃক অঙ্কিত লিপিও দেখা যায়। মৌর্য্যদের সিংহমূর্ত্তির গায়ে ভোট্টজাতির কুজল মীন-হংস-চিহ্ন-সম্বলিত আপন স্বাক্ষর খোদিত করে গেছেন। 'মীন-হংস' সম্ভবত সু-প্রাচীন প্রাচীর 'মিনহস্‌স'-সভ্যতার সংস্কৃত রূপ। বৈদিক ভাষায় 'হস্‌' কথাটি গতি-বোধক। মৎস্য-গতিতে উজানে যাওয়া বোঝাত 'মীনহংস' চিহ্ন। সিন্ধু-সভ্যতায় এ-সভ্যতার চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন স্যর জন মার্শ্যাল।

তুর-জাতির প্রাচীন নাম তুর্কী, তোখার, তুরানী প্রভৃতি কিছুই ছিলনা। তাঁরা প্রাচীন ইতিহাসে কখনও কুশ-জাতি (কুশান-সুশান) কখনও বা হট্টিজাতি নামে পরিচিত হয়েছেন। অসুরজাতির সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ বাধে এসিয়া মাইনরে। তখন তাঁরা হট্টি নামে পরিচিত। হট্টি-নৃপতি ঐল 'সুব্বল-উমা'-র নামটির সঙ্গে ঐতিহাসিকরা পরিচিত। তাঁর মৃত্যুর পর এসিরিয়ার আধিপত্য বাড়ে। 'সুবল-উমা' নামটি দেবী দুর্গার স্মৃতিবাহী বলে মনে হয়। 'সু'-কথাটি তুর্কী ভাষায় নদীজ্ঞাপক শব্দ হয়ে গেছে।

অসুর-আধিপত্যের পূর্ব্বে ও পরে এসিয়া-মাইনরের সাংস্কৃতিক অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটে। হট্টিরা পূর্ব্বে মিশরীদের সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—পরে হয়ত অসুর-সংস্কৃতিতে লিপ্ত হয়ে যান। এই মিশ্র-সংস্কৃতির মানুষদেরই শক, কুশান প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে পরবর্ত্তী যুগে। কিন্তু মিশরীদের সঙ্গে মিশ্রণে গিয়ে যে আর্য্যত্ব ঘুচতনা, তা হট্টিদের ইতিহাসে দেখা যায়। উরোপা-খণ্ডেও হট্টিরা বিস্তৃত হয়েছিলেন। সম্প্রতি তুরস্কে প্রত্ন-ইতিহাসের সন্ধানে যে খনন-কার্য্য সমাধা হয়েছে, তাতে হট্টিদের পূজার তৈজসপত্র পাওয়া গেছে। পূজার তৈজসাদি সিন্ধু-সভ্যতায়ও প্রচুর ছিল। হট্টিজাতি থেকে 'বদর'-শব্দটি আমরা পেয়েছি, যার অর্থ 'জল'। দেখা যায়, পূজাপার্ব্বণও এই জাতির দান। ভারতীয় বৈদিক আর্য্যরা 'পূজা'-কে বলতেন 'যক্ষ'। 'ম্যাজিক' কথাটিই 'যক্ষ'-শব্দে তাঁরা বোঝাতেন—তাঁরা জানতেন স্তুতি (ঋ. সপ্তম-মণ্ডল)। সম্ভবত ইন্দ্র

যজ্ঞ বা 'পূজা' প্রবর্ত্তক। ইন্দ্রের আবির্ভাবের পর বরুণ-স্তুতি ম্লানতর হয়ে পড়ে। এসিয়া মাইনরে 'ইলু-ইন্দর'-কে (ঐল ইন্দ্র) পুরুষ দেবতা হিসেবে পাওয়া যায়; কিন্তু মিত্র, বরুণ, ও নাসত্যা নামের অগ্রে 'ইলানি' শব্দ-যোজনা স্ত্রীবাচক ইন্দ্রাণী শব্দব্যঞ্জনা দেয়। 'ইলানি'-কে ইরাণি ভাবতেও কষ্টকর নয়। 'যক্ষ' নামটি 'অরণি' ও 'জল' বোধক্ শব্দদ্বয়ের সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতায় প্রথম ব্রাহ্মী অক্ষর-লিপি হিসেবে পাওয়া গেছে।

হট্টমালারদেশে ত্রিশক্তিসমন্বিত ইন্দ্র অসুর-বধ করেছেন, আদ্যাশক্তি অসুর-মর্দ্দিনী দুর্গা-শক্তিও তা-ই করেছেন। ইন্দ্র এসিরিয়ার শক্তির উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছেন, দিকে-দিকে—শুধু ভারতের নদীতীরে নয়; বর্ম্মামুলুকে যেমন, এসিয়া মাইনরেও তেম্নি। তাঁকে ভারতে বেদোক্ত বিশ্বামিত্র পুনরাণয়ন করেন। ইন্দ্র একটি চাঞ্চল্যকর কর্ম্ম-শক্তির প্রতীক। ইন্দ্র-পূজার ধুম পড়ে যায় চতুর্দ্দিকে ঋক্‌বেদী যুগে। ইন্দ্র-পূজা ও প্রজাপতি-পুরুষ-পূজা এক কথা।

পুরুষ-শক্তি-পূজার রীতি পূর্ব্বাপর নারী-শক্তি-পূজার রীতিতে ভারতে অবস্থিত হয়। নারীশক্তি-পূজা ভারতাঞ্চলে (শারদ বর্ষে) প্রাধান্য লাভ করে। 'শক্তি'-কথাটি সংস্কৃত ভাষায় স্ত্রী-বাচক। দেবগণশক্তির প্রতীক দুর্গা। তিনি অসুর-বধকল্পে উত্থিতা। অনেকে বলেন, কালী পুরাকন্যা এবং দুর্গার চণ্ডী-শক্তি। এসব বলার ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য যদি কিছু থাকে, তাহলে বিভিন্ন মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অবস্থিতি ও বিবর্ত্তন লক্ষ্য করে তা পাওয়া যাবে। এবং এ-বিষয়ে তন্ত্রশাস্ত্র, যজুর্ব্বেদ ও আরণ্যক ছাড়া যদি আর কোনো নিদর্শন সন্ধান করি, তাহলে তা পাহাড়পুরে-প্রাপ্ত মৃৎ-ফলকে নারী-চিত্রে দেখা যাবে। শুঙ্গ-যুগের একটি দেয়ালে-ও যক্ষিণীর এবং ভগবতীর (বুদ্ধজননী) মূর্ত্তি-দানস্মৃতি এ-অনুসন্ধানে যথেষ্ট আলোকদান করে। আমার ধারণা, হট্টিরা আত্মরক্ষা বা কৌলীন্য কল্পে আপন-কন্যা ভারতীয় ইন্দ্রোপম যোদ্ধার হস্তে সমর্পণ করতেন। ভারতীয় নারী অনেকেই হয়ত হট্টি-কন্যা। তেম্নি আবার, পতনের দিনে মিশরের বিধবা মহিষী একটি হট্টি রাজপুত্রকে স্বামী হিসেবে কামনা করেছেন দেখা যায়—তাঁর কামনা ঘাতকের ষড়যন্ত্রে সফল হয়নি। ভারতীয় ও ইরাণীয় শক্তি হট্টি-জাতির মূলাধার।

প্রাচীন সভ্য-অসভ্য সর্ব্বজাতির মানসিকতায় 'শক্তি'-কথাটিই সর্ব্বাধিক জরুরী ছিল। এই শক্তির বিচিত্র চিত্রে ও ফলকে পশু-প্রতিকৃতি ও শিকার-দৃশ্য পাওয়া যায়। দুর্গা মহিষাসুর বধ করছেন সিংহবাহিনী হয়ে। সিংহকে বাহন করা, বধ করা এবং সিংহমূর্ত্তি-রক্ষা করা একটি শক্তি-সংস্কৃতির উপর নানা জাতির বিচিত্র মনোভাবের পরিচয় জ্ঞাপক। বেদ-পূর্ব্ব ভারত যেমন সর্প-শক্তির উপাসক ছিল তেম্নি সম্ভবত সিংহ-শক্তিকেও বশীভূত করতে পারত মিশরীদের মতো। সিংহভঙ্গী বুদ্ধও পছন্দ করতেন।

সিংহকে বধ করা, খাঁচায় পোষা (রোমানদের মতো), এবং তার স্মৃতি-রক্ষা

করা ছিল এসিরিয়ার সংস্কৃতি আর সিংহকে বাহন করা হয়েছিল ভারত-মিশর সংস্কৃতি। মৌর্য্যরা যে সিংহের স্মৃতি-রক্ষা করতেন, তা সিংহ-বশীভূত করার স্মৃতিও প্রকাশিত করতে পারে। মিশরে সিংহিনী-বাহন যে মূর্ত্তি দেখা যায় তা না কি টুটাঙ্খমেনের। তাঁর জীবনাবসানে রাজ্য টুটে যায় দেখে তদীয় পত্নী হট্টি-রাজের শরণ নেন। হট্টিরা গো-রক্ষায় সম্পূর্ণত ভারতীয়। শুধু শ্রীহট্ট নামেই যে (শ্রীহট্টে প্রাপ্ত দুর্গামূর্ত্তি সম্ভবত প্রাচীনতম) হট্টি-নাম ভারত-সংলগ্ন হয়ে আছে তা নয়—'বৃষ'-বাহন মূর্ত্তির পাশে আমরা ইচ্ছা করলেই সিংহবাহিনীকে খুঁজে নিতে পারি। হট্টি ও মিশর শিব-দুর্গার মূর্ত্তি এনে দিয়েছে কি না, ঐতিহাসিকের ও ভাষাতাত্ত্বিকের অনুসন্ধানে তা হয়ত একদিন প্রকাশিত হবে।

অসুররাজবৃন্দ সিংহ-অধ্যুষিত অঞ্চলের ঐশ্বর্য্য-লোভে সিংহ-সিংহিনী বধ করে ফলকে সেই বীরত্ব স্পষ্টত বিলিখিত করে গেছেন। পল-উপাধিবিশিষ্ট অসুর-রাজরা অশ্বারোহী। তাঁরা অশ্বশক্তির উপর নির্ভরশীল ছিলেন। 'তুর'-কথাটি অশ্বের সঙ্গে যুক্ত। অশ্বকে কিন্তু ঋক্‌বেদী আর্য্যরাও একটি মহৎ বাহন হিসেবে পেয়েছেন। ঘোড়-দৌড়ের বিবরণও ঋক্‌বেদে আছে। 'বিপলা' মেয়েরা সওয়ারী হতেন। বিদিশা-গুহায় তার ফলক রক্ষিত। সম্ভবত সাম-ঋক্‌বেদী শুঙ্গ যুগের কীর্ত্তি। আর্য্য অগ্নি ছিল 'সলিলাশ্রয়ী সিংহ' (গুর্জ্জরে)। শুঙ্গদের সঙ্গে বাঙ্গালীরা লিপি-মিশ্রণ করেছেন বিদিশায়। পরিচিত দুর্গা-মূর্ত্তির পরিকল্পনা সে-যুগের সুরথের সঙ্গে আসা স্বাভাবিক। হয়ত তারপর থেকেই বাঙালীর ঘরে সিংহবাহিনীর আগমন। বাঙালী অবিমিশ্র আর্য্য না হতে পারে যেহেতু অসুরের ভয় তাঁদের ছিল।

অসুর-ভাষায় নদীকে বলা হত 'হু'। 'হুগলী' নদীটি এই ভাষাকে খানিকটা বহন করছে। কিন্তু এ-অঞ্চলে তেম্নি 'দুর্গাপুর'-ও ছিল। ভারতের প্রত্ন ইতিহাসের সন্ধান যাঁরা করেন, তাঁরা দুর্গাপুরে পৌরাণিক যুগের কিছু প্রহরণ আবিষ্কার করে প্রমাণ করেছেন যে আসুরিক ঐতিহ্য নেহাৎ অমূলক নয়। দশপ্রহরণধারিণী কথাটি দুর্গাপুর থেকে জন্ম নিতে পারে। 'দুর্গাপুর' নাম প্রাচীন বাঙলার নানা অঞ্চলেই আছে। তার মানে এই, দেবী-স্মৃতিতে নানা স্থানের অন্ধকারের দুয়ার ভেঙে গেছে। রাঢ়াঞ্চল থেকে এই বৈষ্ণবী শক্তির প্রথম আবির্ভাব কি না, তা একমাত্র মূর্ত্তি-প্রমাণে প্রমাণিত হবেনা। গৌড়ীয় শাক্ত ও বৈষ্ণব মতবাদের ভিত্তিমূল অনুসন্ধান করতে হবে। বৈষ্ণব মতবাদ ঋক্‌বেদ-সম্মত। কিন্তু শক্তি-আরাধনা তুষারযুগাশ্রয়ী। এই শক্তিকে ক্রমে কে কতোটুকু শ্রী-মণ্ডিতা করেছে তা নিয়েই সভ্যতার ইতিহাস। অসুর-শক্তি উৎপীড়ন দান করে আর সুর-শক্তি দুঃখোত্থিত করে। যেখানে অসুর বাস্তব বন্য ব্যাপার, দুর্গা সেখানেই উৎপীড়িত মানসিকতা—পাবনী, ক্ষাত্রা শক্তি ; ইন্দ্রের ওপিঠ বামদেবের 'আহুরা'।

ভারত-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ

ইন্দ্রজিত্‌

পুর্ব্বানুস্মৃতি

রামপ্রসাদ জানতেন যে ধর্ম সাধনায় ব্যক্তিত্বের সিদ্ধি আছে কিন্তু জাতির পক্ষে সেটা সহজলভ্য নয়। আর একটা কারণ হোল তন্ত্রবাদকে সে সময় লোকে জাতির ধর্ম বলে গ্রহণ করেনি। কারণ তান্ত্রিক ধর্ম এবং আচার সমগ্র জাতিকে ডাক দিত না, মুক্তির পথ দেখাতো না সকলকে। চৈতন্যের আবির্ভাব বা নানক ও কবীরের আবির্ভাবের পুর্ব্বে ভারতবর্ষ যেমন কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে দিন যাপন করছিল রামপ্রসাদের সময়ও তিনি দেখলেন ঠিক তেমনি অন্ধকার ভারতব্যাপী। রামপ্রসাদ উপলব্ধি করলেন যে সহজ ভাষার ভেতর দিয়ে লোককে ডাকতে হবে। শাক্তবাদের শক্ত কথা বাদ দিয়ে সহজ কথায় ডাকতে হবে সকলকে। তা না হলে সাধারণ-মানব-মুক্তির আবির্ভাব হবে না।

রামপ্রসাদ তার নিজস্ব প্রসাদী সুরে গান গাইলেন, সে গান শুন্‌লো জনসাধারণ, বোধ করলো সকলে। রামপ্রসাদ গান গেয়ে চলেছেন একটার পর একটা। সাধনার ফল ফলতে সুরু করল। জনসাধারণ যে কালীর রূপকে ভয়ঙ্কর বলে জানতো সে কালী সাধারণের চোখের সামনে তাঁর রুক্ষ আবরণ ত্যাগ করে পরম কমনীয় কন্যা মূর্ত্তি ধারণ করলেন। যে কালীকে তান্ত্রিকরা আখ্যা দিয়েছিলেন নৃমুণ্ডমালিনী খড়্গ-ধারিণী ভয়ঙ্করী, সে ভয়ঙ্করী পরিণত হোলেন করুণাময়ীতে।

মাতৃ-সাধনার নতুন পথ দেখালেন রামপ্রসাদ, ভারত সংস্কৃতিতে তাঁর দান অমর হোয়ে থাকলো চিরকালের মতন। রামপ্রসাদ হোলেন এমন যুগস্রষ্টা যার ধর্ম প্রেরণা দিল পরবর্ত্তী বহু যুগাচার্য্যদের।

তান্ত্রিক কালী সাধনা রামপ্রসাদের শক্তির জোরে অন্ধকারের কবল থেকে মুক্তি পেল। রামপ্রসাদের সাধনাকে যারা প্রগতিবাদের বা সমন্বয়বাদের ভেতরে ফেলেন না তারা হয়তো না বুঝেই তা করেন, কারণ বুদ্ধ, চণ্ডীদাস, চৈতন্যের পর এত বড় সমন্বয়বাদী যদি ভারতভূমিতে কয়জনও জন্ম পরিগ্রহণ করে থাকেন সেই রামপ্রসাদের যুগে, তাহলে বলব রামপ্রসাদ তাঁদেরই একজন অন্যতম ব্যক্তি।

ভারত সংস্কৃতির ওপর সব চেয়ে বড় আঘাত এসেছিল মুসলমান আক্রমণের সময়, কারণ এই মুসলমান সংস্কৃতি ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ জীবন থেকে একেবারে বিরোধী। নিপীড়িত ভারতীয় ও ভারতীয় মুসলমান ধর্মীরা কোন রকমে ষোল শতকে নিজেদের ভেতরে একটা সন্ধি করে নিয়েছিল একথা সত্যি কিন্তু সেটার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পনের শতকে চৈতন্য, নানক, কবীরের আন্দোলনে ভারতব্যাপী পাই, সেরকম ভাবে ষোল শতকের আন্দোলনে অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান নিপীড়িতদের ভেতরে তেমন ভাবে পাইনা অর্থাৎ ষোল শতকের আন্দোলনটা বাংলাদেশেই পুরোপুরি ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সেই কারণে ষোল শতকের আন্দোলনকে প্রমাণাভাবে ভারতীয় আন্দোলন না বলে, বাংলার প্রাদেশিক আন্দোলন বা সমন্বয় আন্দোলন বল্‌লে মিথ্যার পরিবর্ত্তে সত্যি কথাই বলা হবে। কিন্তু ষোল শতকের শেষ ভাগে ও সতেরো শতকের প্রথম ভাগে মহারাষ্ট্র বীর শিবাজী বুঝতে পেরেছিলেন যে মুসলমানের সঙ্গে কোনও কারণবশতই কোনও সমন্বয় হোতে পারেনা। এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বিশেষ চিন্তা করে। সেই চিন্তা করবার ও সহায়তা করবার মতন

সাহায্যকারী তিনি পেয়েছিলেন তাঁর গুরু রামদাসকে; রামদাস তাঁকে সর্ব্বভারতীয় হিন্দু মৈত্রী স্থাপনা করবার জন্যে উপদেশ দিয়েছিলেন, বলেছিলেন তাঁর বাণীর মর্মার্থে যে হিন্দুসংস্কৃতি হিন্দুভারতীর পুনরুত্থানের ভেতরই লুকিয়ে আছে জাতির মুক্তির আনন্দ। বলেছিলেন আরও তাঁর বাণীর মর্মার্থে যে, শাসকের শাসনই নাগপাশ, এ নাগপাশ থেকে মুক্তি আসবে স্বজাতির ভেতরে সমন্বয় আসলে, প্রাদেশিকতার ভাব ভুলে নীচতা ভুলে আবার সমস্ত ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের একসূত্রে গাঁথতে হবে। শূদ্র বলে নীচ বলে ঘৃণা করতে হবে নীচ কাজ যারা করে তাদের, কিন্তু নীচ হিসেবে কোন ভারতীয় জাতকে দেখলে আবার ভারতীয় সংস্কৃতির বুকে ফাটল আসবে।

বলেছিলেন আরও তাঁর বাণীর মর্মার্থে যে ভারতীয়দের জীবনের মূল আনন্দ ভোগে নয়, ত্যাগে। যখনই কোন ভারতীয় ধর্ম ত্যাগের পরিবর্ত্তে ভোগ আরম্ভ করেছে তখনই সে ধর্মে ধ্বংসের বীজ করেছে আত্মপ্রকাশ। শিবাজীকে তাঁর গুরু রামদাস গৈরিক কাপড় পরিয়েছিলেন কিন্তু ধ্যানযোগী বা জ্ঞানযোগী তৈরী না করে, রামদাস শিবাজীকে বদলে দিয়েছিলেন কর্মযোগীতে। শিবাজীর মূল মন্ত্র হোল ভারতীয় তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী মুসলমান শাসকের হাত থেকে ভারতশাসন নিজের হাতে নিতে হবে। প্রয়োজনবোধে সবলে। তারপর সমগ্র ভারতভূমিকে পরিণত করতে হবে অখণ্ড হিন্দুস্থানে বিদেশীয় শাসনের অবসান ঘটিয়ে।

ভারত ভূমির ধর্ম আন্দোলনের ভেতরে রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা গিয়েছিল সেই বুদ্ধ-যুগ থেকে কিন্তু সে যুগ থেকে আরম্ভ করে শিবাজীর যুগ পর্য্যন্ত সে রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল সঙ্গোপনে। কিন্তু শিবাজীর আন্দোলনে তার প্রথম বহিঃপ্রকাশ হোল। ভারত সংস্কৃতির আলোচনায় এই অধ্যায় একটা অন্যতম প্রধান উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

শিবাজীর আন্দোলনে সারা ভারতবর্ষের ভেতরে বিপুল সাড়া পড়ে গেল। মুসলমান শাসক উঠলেন ক্ষেপে। কারণ কাফেরের এ বিদ্রোহ কোন মতে তিনি সহ্য করবেন না। আরম্ভ হোল ভারতবর্ষের বিদ্রোহী যোদ্ধা জাতির সঙ্গে শাসকের বিদ্রোহ।

কে হারলো আর কে জিতলো এটা বড় কথা নয়, বড় কথা হোল ভারতবর্ষ দুঃখের সমাধান চায়, ভারত সংস্কৃতি অন্যের সঙ্গে হাত মেলাতে চায় মন মেলাবার জন্যে। এই চাওয়া চাইছে শুধু মুষ্টিমেয় নয়, সমষ্টিও।

মহারাষ্ট্রীয় ধর্মগুরু রামদাসই হোলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ। মহারাষ্ট্রের উপাস্য দেবদেবীর সঙ্গে অন্য প্রাদেশিক দেবদেবীর মূর্ত্তির উল্লেখযোগ্য তারতম্য আছে। মহারাষ্ট্রে শাক্তবাদ ঠিক শাক্তবাদের মতন চোখে পড়ে না, বৈষ্ণববাদও তাই। তবে এই দুই মত ও পথকে সমন্বয় করবার চেষ্টা হোয়েছিল পরবর্ত্তী মহারাষ্ট্রীয় ধর্মে। মূলত মহারাষ্ট্রীয়রা শৈববাদী একদিক থেকে।

দক্ষিণ ভারতের রামানন্দ যেমন উত্তর ভারতে তাঁর হিন্দু মুসলমান সমন্বয়বাদ ছড়িয়েছিলেন, তেমনি সেই রামানন্দের প্রভাব পরবর্ত্তী যুগে মহারাষ্ট্রেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রের রামদাস রামানন্দের ধর্মকে একটু ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন বলে মনে হয়।

মহাভারতীয় আদর্শে, হিন্দু ভারতের আদর্শে শিবাজী গড়তে চেয়েছিলেন ভারত ভূমিকে একথা একবার পূর্ব্বে আলোচনা করেছি। কিন্তু ভারত ভূমির ভেতর সেই বিরাট আন্দোলন বহন করে আনলো

একটা বিরাট ফাটল এই হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির ভেতরে। আশপাশ থেকে যারা সর্ব্বদাই ভারতবর্ষের ওপর লোলুপ দৃষ্টি রাখত, সেই দেশগুলো থেকে একটি দেশের একটি লোক একটি দিন হঠাৎ চলে এল ভারতবর্ষে, দেখল যখন যে ভারতবর্ষ ঠিক আবার সেই দলাদলি আন্দোলন আরম্ভ করেছে সুতরাং আক্রমণ করবার এই সময় অনুকূল।

ভারত ভূমি আক্রান্ত হোল নাদীর শার দ্বারা সন ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে এই পূর্ব্বোক্ত আন্দোলন কর্ত্তা শিবাজী নাদীর শা ভারত আক্রমণ করবার পূর্ব্বেই ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে মারা গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর ও তাঁর গুরুর প্রবর্ত্তিত আন্দোলন পরিণামে নাদীর শাকে আবাহন জানালো, একথা বললে বোধ হয় অসত্য কথা বলা হবে না।

নাদীর শাহের ভারত আক্রমণ আবার নতুন করে পুরোণ বিপদের পুনরাবৃত্তির সঙ্কেত দিল ভারতবাসীদের, জীবন যেখানে সমাধান চাইছে মানুষ সেখানে তার পরিবর্ত্তে আনছে সমস্যা বার বার যুগ যুগ ধরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী। জানিনা কোন মহাশাস্তি ভারতবাসীকে দেওয়ার জন্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভাগ্য বিধাতা মানুষের মানবিকতাকে অগ্নি পরীক্ষা করে নিচ্ছেন। মানুষ নিজেও জানেনা কবে তার সে পরীক্ষা করবার আগুন নিভে যাবে, মানুষ পাবে পরম শান্তি। যে শান্তি সকলের, যে শান্তির রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন "তথাগত" নিজে।

নাদীর শা ভারতসাম্রাজ্যের ময়ূরসিংহাসনে বসতে আসেন নি। তিনি এসেছিলেন সেটাকে নিয়ে যেতে নিজের দেশে। শুধু তাই নয় মুসলমানদের রত্ন মণিমাণিক্যখচিত ছয়টি কেদারাও তিনি ভারতবর্ষ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের দেশে স্থাপনা করবার চেষ্টা করেন।

মুসলমান সম্রাট ভোগ করেছে যেমন আবার তেমনি তারা তৈরী করেছে ভারতীয় সম্পদকে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে সেই আদি সিন্ধুসভ্যতার দানও আছে। স্থাপত্যের ভেতর দিয়ে তেমনি বৈদিক ভারতের সংস্কৃতিতে আমরা যত দোষ দেখি না কেন, তা যে দেশীয় সম্পদ, উচ্চ চিন্তাধারা, কুকর্মে নিবৃত্তির পথও দেখিয়ে গিয়েছে সে বিষয়ে কারুর কোনদিন কোন কথা বলবার কোন অবকাশ নেই। যাঁরা বলবেন যে তাহলে তার সমাপ্তি আসে কেন, তার আলোচনা আমি পূর্ব্বেই করেছি।

সিন্ধুসভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা, আর্য্যসভ্যতাও ভারতীয়, আবার বহিরাগত মুসলমান সংস্কৃতি ভারতবর্ষের নরম মাটির গুণে নিজেদের প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ না হোক অনেকখানি বদলে নিয়েছিল, যেমন তা কেড়েছিল গ্রামীন সম্পদ, কৃষির সম্পদ তেমনি তা সৃষ্টি করেছিল নতুন ধরণের নাগরিক জীবন, আর নবাগত নাগরিক চিন্তা যে নগর সংস্কৃতি, এই মুসলমান আমলে হোয়েছিল, সে কথা পূর্ব্বে অন্যভাবে আলোচনা করেছি কিন্তু নাগরিক সভ্যতার বিষয় বিশেষ করে কোন কথা সে সময় বলা হয়নি। সেটা এই যে, মুসলমান আমলে যে কয়টি নগর যথা দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, লাহোর, কাশ্মীর ইত্যাদি। এ ছাড়া সে আমল দুর্গ তৈরী করতে যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিল সেটা আজও একটা ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম প্রধান প্রমাণ। অবশ্য দুর্গ তৈরী করে তার ভেতরে ধনসম্পদ রাখা বা সম্রাটদের বাস করা সে দুর্গের ভেতরে সেটার প্রয়োজন হয়েছিল সে যুগে এবং রাজপুত জাতির ভেতরও এই দুর্গ সংস্কৃতি বহুকাল থেকে ছিল। রাজপুত স্থাপত্য শিল্পে অবশ্য প্রাচীন মুসলমানপূর্ব্ব

যুগের পরিচয় আছে কিন্তু রাজপুত চিত্রের ভেতরে এক বিষয়বস্তু ব্যতীত মোগল শিল্প নিজেই সকলের
অগোচরে বোধ হয় প্রবেশ করেছে।

উত্তরভারতীয় নাগরিক সভ্যতাতে প্রথম দিকে বৌদ্ধপ্রভাব ও পরবর্ত্তী যুগে মুসলমানপ্রভাব লক্ষ্য
করা যায় যেমন বারাণসী, মথুরা ও তার নিকটবর্ত্তী স্থান ও সহরগুলো।

হিন্দুভারতের নগরসংস্কৃতি অম্লান থাকল চিরদিনের তরে দ্বারকা কেদার বদ্রী লছমনঝোলা
প্রয়াগ ইত্যাদি স্থানে। হিন্দুসংস্কৃতির প্রাচীনতম স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ।*

চিত্রাঙ্কণ বিদ্যা ও স্থাপত্য শিল্পের বিষয় আর কয়টি কথা বলা হয়নি সেটা হোল অজন্তা ও
ইলোরার চিত্র ও স্থাপত্য শিল্প। অজন্তা শিল্পের বহু চিত্রাঙ্কণ বৌদ্ধপূর্ব্ব হিন্দুভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয়
দেয় ও বৌদ্ধশিল্প প্রভাব তারপর সব প্রদেশেই পড়ে।

এ সব কথা এক নিঃশ্বাসে আলোচনা করার কারণ হোল যে আঠারো শতকে ভারতবর্ষীয়
নাগরিক জীবনে যে অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন আসে তার ফলে ভারতীয় হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান সংস্কৃতি
কারুর কোন স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে তারা অগ্রগামী হোল না।

স্থাপত্য ও চিত্রশিল্প সংস্কৃতির এই অস্তিত্ব ও আয়ুর সমস্যা বড় করে দেখা দিল আঠারো শতকে।

ভারতসংস্কৃতির হিন্দু যুগে আনুমানিক নয় শতকে সুলতান মামুদের আক্রমণে সে যুগের অন্যতম
শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্প সোমনাথের মন্দির নামে শিবমন্দির ধ্বংস হয় তারপর উড়িষ্যার ওপর পরবর্ত্তী যুগে
আক্রমণ হয়। তারপর মুসলমান যুগে উড়িষ্যায় এক বাধা আসে, কিন্তু দক্ষিণভারত বা উড়িষ্যায় মুসলমান
সভ্যতার তেমন কোনরকম স্থাপত্য শিল্পের প্রভাব রেখে যেতে পারেনি। এ ছাড়া কালাপাহাড়কর্ত্তৃক
উড়িষ্যার প্রাচীন সূর্য্যমন্দির, কোনারকের ধ্বংসের কাহিনী যা শুনতে পাওয়া যায় সে বিষয়ে পণ্ডিতরা
আজও ঠিক একমত হোতে পারেন নি। ধ্বংসের মূল কারণ আজও ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা
করছে। কিন্তু বার বার আঘাত পেয়ে পেয়ে গোটা ভারতবর্ষ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হোয়ে পড়লো। তাই
আঠারো শতকের বিপদের সঙ্কেতে ভারতভূমির অধিবাসী শঙ্কিত হোল নিজেদের সংস্কৃতিকে পরের হাতে
হারাবার ভয়ে। কারণ যুদ্ধ করবার মতন তারুণ্য ভারতবর্ষ হারিয়েছে, রক্ত হয়েছে ঘন।

ভারতীয় ঐতিহাসিক আর যুগপ্রবর্ত্তকদের চিন্তার ধারা আলোচনা করবার সময়ে, সেই সঙ্গে
যুগের অবদানও কিছু কিছু আলোচনা করেছি কিন্তু পরিপূর্ণ আলোচনা হয়নি, কারণ সিন্ধুসংস্কৃতি
থেকে মুসলমানসংস্কৃতি পর্য্যন্ত ইতিহাসের কাঠামো ঠিক করতে হয়েছে। সেই সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির
সাহিত্য, সঙ্গীত ও শাস্ত্র আলোচনা করলেও মুসলমান যুগের শেষ পর্য্যন্ত না এসে স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের
আলোচনা করাটাকে সঙ্গত মনে করিনি। আঠারো শতকে মুসলমান সাম্রাজ্যের পতন হোল, সাত
সমুদ্দুর দূর থেকে ইংরেজ ভারতবর্ষে সাজাহানের সময় থেকে আসছিল, এইবার নাদীর শাহের
আক্রমণের পর ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ ভারতভূমির ওপর কায়েমী হোয়ে দেখা দিল।

* সিন্ধুসভ্যতার নগর-নিগমগুলো অনার্য্য-আর্য্য-যুগের। দক্ষিণাপথেও আর্য্য-পূর্ব্ব যুগের নগর আবিষ্কৃত হয়েছে।
—সম্পাদক।

শ্বেতি

পুলকেশ দে সরকার

এই এতটুকু দাগ। কপালের ওপরকার সীমায়। চুলের সীমানা যেখানটায় হারিয়ে গেছে কপালের প্রাঙ্গণে। ডান দিকে। এইটুকু দাগ।

ফোস্কা পড়ে' পোড়া শুক্‌নো চামের প্রথম পর্দা উঠে গেলে যেমন দেখায়। সাদার ওপর লাল্‌চে আভা। একদিন চোখে পড়তেই অনুরাধা চম্‌কে উঠ্‌লেন। ধুক্‌ধুকে বুকে স্বামীর নজরে আন্‌লেন। বিশ্বনাথের মুখ শুকিয়ে গেল।

একমাত্র মেয়ে। একরাশ ফুলের মতো দেখ্‌তে—সবাই বল্‌ত, যে দেখেছে সেই বলেছে। রংটিও হল্‌দেপনা। নাক চোখের সুখ্যাতি সবাই কর্‌ত। এমন মেয়ে।

শেষটায় এই হ'ল?

শেষটায় আর কি! সবে ছয় বছর। কিন্তু শেষটা যেন দেখ্‌তে পাচ্ছেন অনুরাধা। ও তো পোড়া দাগ নয় যে, একদিন অঙ্গের বরণ নেবে? ও যে সর্বনেশে—

শ্বেতি!

ঘুমন্ত মেয়েটার কপালে এসে ঠিক্‌রে পড়েছে ঘরের ৫০ শক্তির বাল্‌বের বিদ্যুতের আলো। ঐ খানটায়ও, ঐ দাগটায়।

অনুরাধা অহেতুক একটি প্রশ্ন কর্‌ল: কি বল তুমি, এ সত্যিই তো তাই।

বিশ্বনাথ প্রত্যুত্তরে ঢোক গিল্‌ল মাত্র।

কারো মনেই কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু উপায়? কোন উপায়ই কি এর হবেনা?

অনেকের সঙ্গে পরামর্শ কর্‌লেন বিশ্বনাথ। অনেকের সঙ্গে, বহুলোকের সঙ্গে নয়। একথা চট্ ক'রে এখনই সকলকে বলা যায়? ঢি ঢি পড়ে' যাবে সারা জগতে। লোকে অনুকম্পা কর্‌বে, কিন্তু এড়িয়ে যাবে। বল্‌তেই হবে অনেককে, কিন্তু যার মন্দভাগ্য, তাকেই বল্‌তে হবে সব চাইতে কম, যেন-না সে ব্যথা পায়। অথচ তাকে নিয়ে যেতেও হবে চিকিৎসকের কাছে।

বিশ্বনাথ একে ওকে জিগ্‌গেস ক'রে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন পড়ে এক অব্যর্থ ওষুধের সন্ধান পেলেন। বেঁটে প্রলেপ দিতে হয়। রোজ। এক নাগাড়ে একমাস।

শ্যাওলার মতো ছড়ায় ক্ষণে ক্ষণে, এতটুকু থেকে এতখানি হয়। বাঁটা প্রলেপে ঢাকাও পড়ে ক্ষণকাল ঐ অস্বাভাবিক শাদা লাল্‌চে রঙ্, মনে হয়, প্রবল আশা হয়, হয়তো বাঁটা প্রলেপ শুকিয়ে ঝরে' পড়্‌লে দেখা যাবে স্বাভাবিক রঙ্, উল্লাসের সীমা থাক্‌বে না বিশ্বনাথ-অনুরাধার।

কি-রকম রঙও পড়ে ওর ওপর, দুদিন ওষুধ না দিলে তবেই বোঝা যায়, ও রঙ ওষুধের, নীচেকার সাদা-লাল্‌চে আজ তেম্‌নি ঝক্‌ঝক্ কর্‌ছে। বাড়ছে ওর চৌহদ্দি।

টোট্‌কা প্রলেপ ছেড়ে বিশ্বনাথ পাকা কব্‌রেজের পরামর্শ নিলেন। কব্‌রেজ শুধু পরামর্শ দিলেন না, পনের দিনের পাঁচনও দিলেন। মেয়ে সেই বিস্বাদ পাঁচনই গিল্‌ল পনের দিন।

সেদিন সকালবেলা হাতেও আর একটি ছোট্ট সিকির মতো সাদা চিহ্ন চোখে পড়ল অনুরাধার। স্বামীকে ডেকে বল্‌লেন, কি ছাইভস্ম দিচ্ছে তোমার কবরেজ!

বিশ্বনাথ এক হোমিওপ্যাথের কাছে গেলেন। হোমিওপ্যাথ জিগ্‌গেস করতে লাগলেন: আপনার আছে? আপনার বাবার মা'র বা কারো—কাকা জ্যেঠার? বংশের আর কারও? নেই? আপনার স্ত্রীর? নেই? তাঁর বাপ-মার বা আত্মীয়স্বজনের কার ও? নেই?—কি ক'রে জান্‌লেন? বড্ড ঘাম হয়? পেচ্ছাব—রং কেমন। পায়খানা—না, না, সব দরকার মশাই। শরীরে কোন জ্বালা বোধ করেন, আপনি অথবা আপনার স্ত্রী, করেন না? মুখ তেতো তেতো লাগে ঘুম থেকে উঠলে……

শুন্‌তে শুন্‌তে বিশ্বনাথের মনে হয়, কোন কোন উপসর্গ তার তো আছে! তবে কি……

হপ্তায় এক দাগের ডাক্তার অবশ্য ততক্ষণে তাঁর ঠিক ওষুধটি বেছে ফেলেছেন। তাই খাওয়ালেন মেয়েকে কিছুকাল। আশা-নিরাশার মধ্যে সময় কাটে, অবাঞ্ছিত দাগ তো বিলীন হয় না। বরং বাড়ে।

মেয়েটির মুখখানা মায়াবীর। বিশ্বনাথের স্বাভাবিক স্নেহ আরও বেগে উৎসারিত হয়। কোন কাজে মেয়েকে একটি শক্ত কথা বলতে মনে সায় পান না। মন কাতর হয়। আহা, ওর তো সারাটা জীবনই গেল! অনুরাধা চোখের জল মোছেন, হতভাগীর জন্য নিজের ওপরেও রাগ হয়, কিন্তু আশ্চর্য, ঐ মেয়ে যখন আর পাঁচটি মেয়ের সঙ্গে বাইরের কোন তামাসা দেখতে ছুটে বেরোয় তখন মন আরও বেদনার্ত হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুরাধা তাই সঙ্কোচে মেয়েকে ডেকে বলেন, মা, তোমার বয়স বাড়ছে, আর তোমার এ ছুটোছুটি মানায় না। নাই বা গেলে ওসব তামাসা দেখতে।

আর একটু বড় হ'লে মেয়ে মা'র এই নম্র মানার জবাব দিল—অকস্মাৎ। অনুরাধার সচেতন মনও এজন্য প্রস্তুত ছিল না। মেয়ে বলল, কেন তুমি আমায় ছুটে যেতে মানা কর, আমি জানি, মা। আমার যে শ্বেতি।

মা তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করতে গেলেন। কিন্তু মেয়ে বাধা দিয়ে বল্‌ল, তোমাদের এ লজ্জার কারণ কাটবে না তাও শুনেছি। ও সারে না।

বিশ্বনাথ শুনে কল্পিত শত্রুকে লক্ষ্য ক'রে হৈ হৈ করতে লাগলেন: কে বলে এসব কথা! রোগ আবার নাকি সারে না এই বিংশ শতাব্দীতে। আলবৎ সারে। তেমন ডাক্তারের নাগাল পাওয়া যাচ্ছেনা, এই যা। সারবে, নিশ্চয়ই সারবে। মা'র আমার দেবীর মতো ঐ মুখ নিখুঁত হয়ে জ্বলবে।

মেয়েকে নিয়ে বিশ্বনাথ কলকাতা রওনা দিলেন। কলকাতা বিশেষজ্ঞের সহর। একটা-না-একটা নিদান নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। অনুরাধা বিশ্বনাথের যাত্রাকালে সব ক'খানা গয়নাই স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন, এ অলঙ্কারের ভার আর আমি বইতে পারছি না। রেখেছিলাম মেয়ের জন্য। কিন্তু যে-কারণে রাখা তার কোন আশা নেই। পারতো চিকিৎসায় এই সোনাগুলো কাজে লাগিও। মেয়ে গরীব হয় হোক, শরীরের কলঙ্কের কাছে কোন দারিদ্র্যই বড় নয়, দুঃসহও নয়।

বিশ্বনাথ বাধা দিতে চেয়েছিলেন, দেশের এক বিঘা জমি বিক্রীর কথাটা অনুরাধার কাছে গোপনই রেখেছিলেন; কিন্তু কি মনে ক'রে স্ত্রীর দেওয়া গয়নাগুলোও তুলে নিলেন।

কিছুই কর্‌বার নেই নিশ্চিন্ত জেনেও কলকাতার কয়েকজন বিশেষজ্ঞ স্বর্ণপ্রসবী বিশ্বনাথকে বারে বারে কাটলেন; মেয়ের মল-মূত্র-স্বেদ-রক্ত-শ্লেষ্মা, বুক-পিঠ সব-কিছু পরীক্ষা করলেন। মেয়ের রোগের মূল কারণ বারে বারেই বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল; বিশ্বনামের স্বর্ণডিম্বের ওপর থেকে তাঁদের দৃষ্টি কিন্তু একবারও স্খলিত হ'ল না।

গবেষক ডাক্তারদের নাড়াচাড়ায় এবং তাদের কাছে হামেসা আনাগোনায়, তাদের প্রশ্নে বা ঔৎসুক্যে মেয়েটির সেই সম্বন্ধে যে-চেতনা হয়তো বা আরও দু'বছর পরে আসত তা বছর দশেকেই এসে গেল। মা-বাবার চোখেও তা পড়ল না। কিন্তু মেয়ের মন দ্রুত পরিণত হয়ে উঠতে লাগল।

মেয়ে শুনেছে বাপকে ফিস ফিস করে ডাক্তারের কাছে কাতর কণ্ঠে কিছু বলতে; মনুষ্য বোধ বর্জিত যন্ত্রপ্রেমিক ডাক্তার সজোরেই ঘোষণা করেছে, হ্যাঁ, ও দাগ দেখলে কোন পরিবারে তো ওর স্থান হবেই না, কোন ছেলেও প্রেমে পড়বে না। কি বলছেন, ও, হ্যাঁ, তা বাপ-মার কাছে সন্তানমাত্রেই সুশ্রী—কিন্তু ও যে শ্বেতি!

মেয়ে কান পেতে শোনে, বিশ্বনাথ মেয়ের দিকে তাকাতে পারেন না, গলার কাছে কি একটা ঠেলে আসে, নিজেকে অপরাধী মনে ক'রে মাথা নামায়। ট্রপিকালের ওঁরাও ভরসা দিলেন। কিন্তু একটি বছর এক নাগাড়ে চিকিৎসা চাই—তবে চেষ্টা ক'রে দেখা যেতে পারে।

ইতিমধ্যে বিশ্বনাথের পিতৃধন শেষ, স্ত্রীধনও শেষ, ফিরে যাবার ভাড়াটা এখনও আছে। বিশ্বনাথ ইতিমধ্যে কলকাতায় বহু লোককে লক্ষ্য করেছেন। সহরে শ্বেতির সংখ্যা কম নয়। এরা এখানে থেকেও রোগ সারাতে পারেনি। সুতরাং এখানে একবছর থাকার মতো অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব যদি করাও যায়, রোগ যে যাবেই এ নিশ্চয়তা কোথাও নেই। ট্রপিকালে হাজার লোক দাঁড়িয়ে যায় সারি দিয়ে—সবাই চিকিৎসা প্রার্থী। কারও মুখে শোনা যায় না কেউ সেরেছে।

মেয়ে ভাল করে, খুব স্পষ্ট ক'রে বুঝে নিয়েছে, আর পাঁচ জনের মতো বিয়ে করে সংসারে গিন্নীপনা তার করা হবে না। স্কুলেও সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে পড়ায় ডুবে যাওয়া সম্ভব নয়।

কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর ঐ অতটুকু দশবছরের মেয়েও কেমন উদাসীন হয়ে গেল। ব্যবস্থাবিধি ডাক্তারেরা অনুমানে ভর ক'রে যা দিয়েছিলেন তা খেতে চাইত না। মা কান্নাকাটি করে খাওয়াতেন বা যা প্রলেপ দেওয়ার তা প্রলেপ দিতেন।

কিন্তু বয়স আর রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেল। প্রসাধনের দিকে মেয়ের লক্ষ্য দেখে মা অবাক হয়ে গেলেন, বাধা দিলেন না। কি নিয়েই বা থাকবে ও, কি সম্বলই বা ওর রইল! বিশ্বনাথ নির্বিবাদে মেয়ের প্রসাধন দ্রব্য জোগাতে লাগলেন। মেয়ে পাউডার দেয়, ওয়াক্স মাখে, কব্জি পর্যন্ত হাত ঢাকা নূতন প্যাটার্নের জামা পরে, কোন কোন সময় শাড়ী ছেড়ে সালোয়ার পাঞ্জাবী পরে, বার বার আয়নার কাছে আর বারান্দায় আনাগোনা করে। ভ্রূর কাছাকাছি দাগ পড়েছে বলে, বাবাকে দিয়ে আনানো প্রসাধনের পেন্সিল দিয়ে ভ্রূ আঁকে। মা মেয়েকে ঘর-কন্নার কিছুই করতে দেননা। মেয়ে সাজগোজ করে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ছেলেদের ডেকে ডেকে তাদের সঙ্গে আলাপ করে। 'আজ কাতে কাতে খেলা হ'লরে? ক'গোলে হারলো ইষ্ট বেঙ্গল? এই নন্তু, নন্তু,

শোন, কাল বাবুঘাটে কি হয়েছিল রে? জানিস না, খবরের কাগজে বেরিয়েছে যে। দেখবি কাগজ? কত হল মাছটা, বিনয়দা? আজ নাকি মাছ খুব সস্তা। আমি-না, ইলিশ মাছ ভালবাসি না।'

মেয়ে সারাদিন বকর্ বকর্ করে যাকে পায় তার সঙ্গে। মা চুপ করে সহ্য করেন। মাঝে মাঝে বলেন, মা, যে কথা বল্‌তে চায় না তার সঙ্গে কথা কয়ো না যেন। মেয়ে কলকল্ করে অন্ত কথা পাড়ে। ঐ হাবাগোবা ছেলেটা না, মা, ঐ যে হরু না কে, যেতে আসতে এমন ক'রে তাকাবে, অসভ্য!

মা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন ধীরে ধীরে—পাছে মেয়ে শোনে! কিন্তু মেয়েই জবাব দিয়ে বলে, তাকাক, বিয়ে তো আর কেউ করবে না আমাকে, না, মা!

মা স্তম্ভিত হ'য়ে মেয়ের দিকে তাকাতে যান। মেয়ে অপেক্ষা করে না। বারান্দায় এসে কারও না কারও সঙ্গে আলাপ স্থরু করে।

মেয়ে একদিন এসে বল্‌ল, মা আমি বাইরে বেরোব।

বজ্রপাতের মতো লাগলো অনুরাধার।

তাকিয়ে দেখছ কি মা? যে-ভয়ে আর পাঁচটি মেয়ের বাইরে যেতে নিষেধ আমার তো সে ভয় নেই।

মা বল্‌লেন, না, মা, পথে আরও কত রকমের মেয়ে আছে।

মেয়ে বল্‌ল, না, আমি গান-বাজনার ক্লাসে ভর্তি হব।

মা বল্‌লেন, তাই নাকি? বাবাকে বলেছিস? অনুরাধা উৎসাহই প্রকাশ করলেন। বিশ্বনাথও শুনে বললেন, একটা পথ পাওয়া গেল। পথই আমি খুঁজছিলাম। একবছরের মধ্যেই বাপ মা স্বীকার করলেন, মেয়ের চেষ্টা আছে। একবছরের মধ্যেই মেয়ে সঙ্গীত আর সেতারে চলনসই হ'য়ে উঠল। নানা অনুষ্ঠানে মেয়ের ডাক পড়ছে শুনে তাঁরা যেমন উল্লসিত হলেন তেমনি একটি অব্যক্ত বেদনাও বোধ করতে লাগলেন। আহা, এই মেয়ে—সাংসারিকক্ষেত্রে অবাঞ্ছিতা হ'য়ে থাক্‌ল?

মেয়েও বুঝত অত বড় বড় ভীড়ে সে একা; তার সঙ্গীত, তার সেতারের ঝনৎকার লোকে দূর থেকে উপভোগ করে, হর্ষধ্বনি ক'রে ওঠে, কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে তার সান্নিধ্য এড়িয়ে যায়। সে অস্পৃশ্যা। ভীড়ের এই বর্জন-প্রয়াসকে যত সে লক্ষ্য করে ততই তার চিত্তে বিদ্রোহের ভাব জাগে। আধুনিকাদের সাজসজ্জার কোন ত্রুটী সে রাখে না। অভিমানী ব্যাগের ফ্যাসান যতবার পাল্টায় ততবার যে হাল ফ্যাসানের নতুন ব্যাগ কেনে। শাড়ী, জুতো, লিপষ্টিক, রুজ, সবটাতেই আধুনিকার নির্ভুল স্পর্শ। অনুরাধা আর কোন কিছুতেই বাধা দেন না। বিশ্বনাথও ভাবেন, কি নিয়ে থাকবে ও তবে?

কিন্তু মেয়ে প্রতিদিন আয়নার কাছে নিজের দেহের হিসেব নেয়! সর্বাঙ্গে ছেয়ে এল শ্বেতি। চুল উঠতে স্থরু হয়েছে, কোথাও কোথাও রূপালী আভাস। টাসেল দিয়ে বাঁধে এত বড় খোপা, নয়তো ঝুলিয়ে দেয় দুজোড়া বেণী, নয়তো আল্‌তো এলোকেশ। শরীরের অন্যান্য অনিবার্য পুষ্টিকে শিখেছে সে প্রকাশ করতে। ভয়ানক ব্যস্ত মেয়ে। কলকাতায় অনুষ্ঠানেরও অবধি নেই; মেয়েরও বাড়ীতে থাকার অবকাশ জোটে না। রাত্রে মেয়ে যখন ফেরে তখন ক্লান্তিতে গোটা শরীর ভেঙ্গে আসে। সারাদিনে বহু সান্নিধ্য চেয়েও পাওয়া যায়নি, রাত্রে মার অযাচিত সান্নিধ্য। এক এক সময় বিরক্ত

লাগে মেয়ের, এক এক সময় অসহায়র মতো মা'র কোলে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। রাত কাটে মায়ের সান্নিধ্যে।

ভোর হয়, আয়নার বিস্রস্ত অবস্থায় নিজেকে নিজের কাছেও কুৎসিত দেখায়, ধিক্কার জাগে মনে, কিন্তু তারপরই চটপট গুছিয়ে ফেলে সব— কি জানি, কে কখন এসে পড়ে।

কি অসাধারণ পরিশ্রম করতে পারে মেয়ে। এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধন সঙ্গীত, ওখানে সমাপ্তি সঙ্গীত, সেখানে সেতার, রবীন্দ্র সঙ্গীত—কোথাও ক্লান্তিবোধ করে না। আমন্ত্রণ না থাকলেও মেয়ে মনে করে না কিছু, অনাহূত উপস্থিত হবে সেখানে, কোন না কোন কাজের ভার নেবেই। সঙ্গীত সেতার যেখানে নগন্য, প্রগ্রাম বিলির ভার নেবে সেখানে, নয়তো লোককে অভ্যর্থনা করবার। বাস বা ট্রামের কোন টার্মিনাসে সে উঠবে না, উঠবে এমন জায়গায় বা ষ্টপেজে যেখানে ক্বচিৎ কখনো কেউ দাঁড়ায়—ঘেঁস করে বাস বা ট্রাম থামবে, বাস বা ট্রামসুদ্ধ লোক দেখবে তার ওঠা, ঝলমলে পোষাকের মেয়ে কিন্তু দর্শকের দৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীনা। প্রায়ই বসবে সে পুরুষের আসনে—যেন খেয়াল নেই এমনি ভাবে। একেবারে আধুনিকতম অভিমানী ব্যাগ থেকে অনেকক্ষণ ধরে পয়সা বের করবে, টিকিট নেবে, অনেকক্ষণ ধরে তা ব্যাগেই রাখবে, তারপর তাকাবে বাইরের দিকে। কিন্তু নামবে ঝুপ ক'রে তেমনি অকস্মাৎ মাঝখানেই, হয়তো তিনটে ষ্টপেজও পার হয়নি। অত্যন্ত ব্যস্ত মেয়ে।

অত্যন্ত ব্যস্ত সময়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে মেয়ে সময়ের দ্রুত গতি। চুল উঠে গেছে অনেক, রূপালীকেশের প্রাধান্য এসেছে মাথায়, সর্বাঙ্গের রঙ গেছে বদলে। মস্ত সিঁদুরের টিপ পরল মেয়ে কপালের মাঝখানে, কি খেয়াল হল, সীমান্তেও টেনে দিল সিঁদুরের সূক্ষ্ম রেখা। তারপর অতবড় সেতারটাকে আবদ্ধ করল আলিঙ্গনে। একটা রিক্সা ডেকে তাতে চাপল, বলল, ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট।

অপরেশদের জলসা।

অপরেশের পেছনে অপরেশের কাঁধের ওপর দিয়ে অপরেশের হাতে অনুষ্ঠান-সূচী দেখতে গিয়ে বলল, কি সূচী করেছ দেখি অপরেশ।

অপরেশ কাগজটি নিঃশব্দে এগিয়ে ধরল মেয়ের দিকে, পরে বলল, তুমি দেখ, আমি আসছি।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে ডাকল, শোনো অপরেশ, আমার আরও দুটো গান-বাজনা দাও, নতুন দুটো শিখেছি।

অপরেশ বলল, সময় যে সংক্ষেপ।

মেয়ে বলল, শেষের দিকে দাও, যদি হয় তো হ'ল।

শেষের দিকে সেতার বাজালো মেয়ে অনেকক্ষণ ধরে। স্থন্দর হাত। হলটা গমগম করতে লাগল। বিমুগ্ধ শ্রোতারা নিশ্চল হয়ে গেছেন। অদ্ভুত অদ্ভুত হাত। বাজনা থামলে চারদিক থেকে তারিফের প্রকাশ হ'তে লাগল। দূর থেকে উঠল হাত তালির সাইক্লোন। মেয়ের কানে এল, কিন্তু একজনও এগিয়ে এল না এই অনুষ্ঠান-বেদী পর্যন্ত ছুটে।

মেয়ে অপরেশকে বলল, বড় ক্লান্ত লাগছে।

অপরেশ বল্‌ল, হবে না, কি বাজনা বাজালে তুমি! সত্যিই সেতারে তোমার হাত যা হ'চ্ছে না!

মেয়ে আবার বলল, বড় ক্লান্ত লাগছে অপরেশ।
অপরেশ বলল, লাগবেই তো, রিক্সা ক'রে দি, বাড়ী যাও।
মেয়ে বলল, রাত অনেক হ'ল অপরেশ।
অপরেশ বলল, বেশী নয় তো পৌনে দশটা।
মেয়ে বলল, সে তোমাদের পক্ষে অপরেশ, মেয়েদের পক্ষে নয়।
কিন্তু তুমি তো একাই যাও বরাবর।
বড় ক্লান্ত অপরেশ।
কাউকে সঙ্গে যেতে বলছ?
তুমি চলো অপরেশ। আর কারও সঙ্গে আমার ভয় করবে।
না—না, কিসের ভয়? দাঁড়াও। হাতের কাজটা সেরে নি।
ঠায় দাঁড়িয়ে রইল মেয়ে। অপরেশের কাজ আর শেষ হয় না। হল শূন্য। দারোয়ানরা বন্ধ করতে লেগেছে দরজাগুলো। আর কি কাজ অপরেশের।
নাও, চল, অপরেশ এসে বলল।
রিক্সায় যাব অপরেশ।
নিশ্চয়।
রিক্সা থামিয়ে অপরেশ মেয়েকে উঠতে বলল। মেয়ে উঠে একপাশে বস্‌ল। অপরেশ রিক্সা-
ওয়ালাকে বলল, চালাও।
মেয়ে বলল, রোখো। সে কি অপরেশ, তুমিও এসো, বাঃ!
আহা, এইতো এতটুকু পথ, পাশে হেঁটে যেতে পারব।
তবে আমিও হাঁটতে পারব—ব'লে মেয়ে নামে আর কি!
বিপদ। ব'লে অপরেশ রিক্সায় উঠল। যথাসম্ভব নিজকে দূরে রেখে বস্‌তে চাইল। কিন্তু ছড়িয়ে বসেছে মেয়ে।
সব শরীর ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছে অপরেশ। কাঁপছে। হাত কি রকম ঠাণ্ডা, দেখ, দেখ—
অপরেশ নিতান্ত নিরুপায় হয়ে মেয়ের হাতের তেলোয় ওর হাত ছোঁয়াল। ছোঁয়াতেই মেয়ে ধরল অপরেশের গোটা দুই আঙুল চেপে। হিম হ'য়ে আসছে না?
অপরেশ বলল, আর এইটুকু তো তুমি যেতে পারবে, আমি নামি এইখানে।
মেয়ে তড়িতে অপরেশের পিঠে হাত দিয়ে বলল, না অপরেশ বড় ভয়, বড় ভয় আমার।···
বাড়ীর কাছে রিক্সা থেকে নেমে মেয়ে অপরেশকে বলল, তুমি আমায় বাঁচালে অপরেশ। ব'লে আর দাঁড়ালো না।
অভিমানী ব্যাগটা তক্তপোষে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল, মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে বলল, মা আমার বিয়ে হয়েছে।
অনুরাধার বিস্ময়ের সীমা রইল না। একটু জোরেই বললেন, সে কি! কার সঙ্গে?
মেয়ে মুখ লুকিয়েই বলল, অপরেশের সঙ্গে।

কবিতা-গুচ্ছ

জলরঙ ছবি

বটকৃষ্ণ দাস

যে-পথে সময় যায়, সে-পথে তুমিও গেছো ব'লে
এখনো নিভৃত নদী বালুচরে নিপুণ রেখায়
জলরঙ ছবি আঁকে। এখনো হৃদয় ভেসে যায়
মায়াবিনী ভাবনার এলোমেলো রঙিন আঁচলে—
যখন নিবিড় নীল জ্যোৎস্নায় হাওয়ার রাখাল
আকাশে মেঘের পাল আনমনে একলা চরায়,—
ঝাউয়ের ঝালরে শুয়ে ললিতকলার প্রতিভায়
নীল চাঁদ বোনে তার রেশমি সূতোর মায়াজাল
ঘুমের সবুজ দ্বীপে,—তখন তোমার পথে পথে
আমার হৃদয় যেন নদী হয় হঠাৎ আলোতে।

পুরনো পাথরে আঁকা ধূপছায়া কথার রেখায়
আবার কাঁপন লাগে। মনে হয়ঃ তারা যেন আর
কথা নয়। তারা যেন কবেকার রূপসী কথার
নারী সব। গভীর হাওয়ার হাতে ম্লান বিছানায়
জেগে উঠে, ফিরে আসে উতরোল ডানার ঝাপটে
সোনার শরীর নিয়ে। সে-শরীরে সময়ের দাগ
মুছে দিয়ে গাঢ়তর রূপরঙগন্ধের পরাগ
ঝ'রেছে তাদের কেশে, নাভিমূলে, ক্ষীণ কটিতটে,
জঙ্ঘায়, স্তনাগ্রচূড়ে। মায়াময় জ্যোৎস্নার ভিড়ে
তাদের শরীর যেন নীড় খোঁজে আমার শরীরে।

নদীতে জোয়ার আসে। শেষ রাতে পূর্ণিমার নদী
থরোথরো মোহানায় কূলে কূলে শাণিত কোটালে

উতরোল বাঁকা জলে আলাপে প্রলাপে তালে তালে
মীড়ে মীড়ে তরঙ্গের ছলোছল ধ্বনির ধ্রুপদী
ছড়ায় গভীর শূন্যে, অপরূপ জ্যোৎস্নার জলে।
সেই জলে বিবসনা মদিরাক্ষী রূপসী নারীরা
শরীরে শরীরে জ্বেলে নিরিবিলি কামনার হীরা
স্নান করে। তাদের রূপের রাঙা মদির অনলে
শেষরাত পুড়ে যায়। আবার অরণ্যে আসে ঝড়।
কাকের কর্কশ ডাকে ন'ড়ে ওঠে স্তিমিত নগর ॥

স্বপ্ন-মঞ্জরী

সুনীলকুমার নন্দী

মায়াবী রাত্রির প্রতিশ্রুতি সখী, হয়তো রাখা আর
হ'লো না। বারো মাস তীব্র বৈশাখী ঢালিছে রুক্ষতা
অভীপ্সার বীজ ছড়ানো প্রান্তরে; আকাশ-গঙ্গার
বুক তো শুকু শুকু, ছিন্ন মেঘমালা, শ্রাবণী রূপকথা

ভুলেছে রিমঝিম কাজরী মুর্চ্ছণা ;—স্বপ্ন-মঞ্জরী
তাই তো খাঁ খাঁ মাঠে দোলে না। ঘরে যাবো বেদনা-জর্জর
দিনের শূণ্যতা জড়িয়ে বুকে মুখে ?—ব্যাকুল বিভাবরী
প্রতীক্ষার দীপ জ্বালিয়ে ব্যথাতুর করো না। যাযাবর

পথের ইসারায় হৃদয় উন্মনা : নীলাভ তারা গোনা
সোনালি অবকাশ আসে নি কতোকাল! সবুজ ঘন ঘাস
বিছানো শয্যায় রাত্রি ভোর হবে, মেঘের আলপনা
পাহাড়া নীল হ্রদে পেতে-ও পারি। বুকে স্নিগ্ধ আশ্বাস

বৃষ্টি ঝরে যদি বন্ধ্যা প্রান্তরে দুলবে ভীরু সোনা
স্বপ্ন-মঞ্জরী ; তখন ডেকো সখী, তোমাকে ভুলবো না!

ভোর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একটি দুটি ফুল ঝরলো হাওয়া লেগে শিশিরে ভেজা
ঝরলো অথবা সে মাটীকে ভালোবেসে ভাঙালো ঘুম
রাত্রিময় মুখে সূর্য মেখে নেয় প্রতিটি দিন
মাটীরও ঘুম ভাঙে, সে যেন তার বুকে প্রাণ কুসুম।

রোজই এক মেয়ে কুড়োয় সেই ফুল, যত্নে তোলে
আঁচল ভরে নেয়, আলোর মত মালা সুতোয় গাঁথে
সে মালা কাকে দেবে—আকুল হয়ে খোঁজে সারাটা দিন
আবার ভোর হয়, আবার ফিরে এসে আঁচল পাতে।

ক্ষণস্বপ্ন

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রীষ্মের অনেক পাতা শুকোবার পর,
যেদিন প্রথম বৃষ্টি লিখে গেল নাম—
বাতাসের কানে কানে পিপাসু মর্মর
বলেছিল,—'এইবার পেলাম, পেলাম'

সেদিন আমার ঘরে অকস্মাৎ এসে
সাথী হয়েছিল এক অসম্বৃত রাত,
নির্বাক আলাপে দুটি মুহূর্তের সীমা
পেরোতেই দেখি নেই। শুধু ভালবেসে,—
রেখে গেছে শীতসিক্ত স্পর্শের মহিমা,
ফেলে গেছে এক রাশি সুরের প্রপাত।

হাতে নিয়ে সেই কটি জমাট বিস্ময়,
আনত মেঘের সংগে দৃষ্টি বিনিময়,
জানিনা কখন সারা হতে হতে ফের,—

মাটীর নরম গন্ধ ভিজে ভিজে হাতে,
আর ছত্র দুই গান রবিঠাকুরের
দিয়েছে ঘুমের ছোঁয়া চোখের পাতাতে।

পরদিন ভোরে দেখি দিনের কৌতুক,
ভুলে গেছে রাত্তিরের অশ্রুময়ী মুখ,—
মনের কবিতাপত্র খালি দিকে দিকে
ভরে আছে রোদ্দুরের অজস্র লিরিকে।

উত্তমা

অনাদি চক্রবর্তী

কৈশোর কেটেছে স্বপ্নে। তারপর নির্জন যৌবন
তাকে অন্য সমুদ্রের অকলঙ্ক জলে
একাকী নাওয়ালো কতোবার,
অবশেষে একদিন তোমার আমার
ধ্যানহীন পদচিহ্নহীন পৃথিবীতে
এলো সে ; জানিনা কোন্ দিবাস্বপ্নে প্রাণ ভরে নিতে।

কল্যাণ সঞ্চয় ভেবে সে যে ক্লান্ত নির্জনতা টানে
আমাদের চেতনার অভিধানে তারি অন্য মানে
নেই দিন নেই রাত্রি, কী অনুসন্ধান!—
এই তার প্রাণ।
মনের অতলে তার যে-কোরক যে-সুরভি ছিলো,
(সে কখনো চায়নি হারাতে) ;
তথাপি কেন যে এক তারা-ভরা রাতে
বৈরাগী দক্ষিণ হাওয়া সব মুছে দিলো—
ম্লান মুখ মুছে নিয়ে আলোর রুমালে
তাই তার অন্বেষণ : স্বপ্নভরা দিন
কী অস্পষ্ট সন্ধ্যার অকূলে

ডুবে গেল যৌবনরাত্রির চিহ্নহীন
অন্ধকারে, চিন্তা ঢেউ কান্না ওঠে দুলে।

যৌবন যে তন্বস্থির আবেগের দোলা
সে কথা স্বগত মৌনে মেনে নিয়ে আজ
ক্লান্ত পায়ে এলো এই আবরণহীন
পৃথিবীর পরিচয়ে ; প্রেমের প্রণতি মন্ত্রে কবে
প্রাণ প্রতিষ্ঠার লগ্ন হবে—

কে জানে সে কোন্ রাতে, কি কামনাকুসুম সৌরভে।

সওদা

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

সেই পাণ্ডুর বাজারে গেলাম।
সেখানে বাতাসে প্রাচীন সুরভির ম্রিয়মাণ স্মৃতি,
আর এক নির্মম রাণীর নিষ্ফল ভালোবাসার জ্বরাতুর ছায়া।
সমস্ত সেই ফলগুলোয় মারাত্মক সৌন্দর্যে চিহ্নিত,
অপিচ বর্ণাঢ্য !
আমি সেখানে গেলাম, আমি সেখানে গেলাম !

ধাতব আকাশের নিচে
সেখানে পাখিরা সঙ্কেতময়
নীলাতল চোখ ক্ষুরধার ফলওয়ালির,
সকল সময় এক পড়ন্ত দিনান্তের ঘোর
পোড়া ইঁট আর মরাসোনার রং !

বাজারের সেই ম্লান ভিড়ে যার দিকে তাকাই,
কেউ আগে দেখা নয়,
তবু সবাই গভীর রক্তে চেনা ;
সবাই সওদায় এসেছে।

প্রতিটি জনের বাঞ্ছিত সওদার দাগ
তার চোখের দৃষ্টিতে গভীর রেখায় আঁকা ;
কেউ কথা বলে না,
শুধু ফলওয়ালির চোখে ঝকমক করে ওঠে
শাণিত বাঁকা জিজ্ঞাসা ;
তারপর, হায়, হাত দেয় সে লাল ফলে,
সোনালী ফলে কিংবা কাঁচা সবুজ ফলে !

আর সত্য কথা এই, সত্য কথা এই
প্রত্যেকটি সেই ফলগুলো পাথরে পড়ে যায়
তার বাড়ানো হাত থেকে,
ঠিক নেবার আগে, যখন হাত এগিয়ে যায় !

অনেক পাথর সেখানে ক্ষয়ে গেছে।

বস্তুত
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়া ও প্রতিমা নিয়ে অনেক ক'রেছি আমি সাধ
সাজায়েছি কবিতার রামধনু আশ্চর্য বসনে
সেই সব মেয়েদের, আলোর-পায়রার মতো স্তনে
রাত্রি ভোর ডুবে গেছি ; আযৌবন অগাধ, অবাধ
অতৃপ্তি, তৃপ্তি ছাড়িয়ে চেতনার, অবচেতনার
সাত সমুদ্র তেরোনদী পেয়ে গেছি, চেয়েছি যখন···

কিন্তু আজ শ্রান্ত আমি, নুনমাখা-ভাত, রুটির মতন
পৃথিবীতে কিছু নেই ; তোমার ঘরে গান নেই আর ॥

দেবা ন জানন্তি···
মনি ঘোষ

বন্ধুবর বলছিলেন : "সুযোগ আর ক্ষমতার কথা ছেড়েই দিলাম, ধরে নেওয়া যাক, ইচ্ছার দাবী এসে পৌছেছিল লোভের সীমানায়, তবু কি রবীন্দ্রনাথ পেরেছিলেন, কোপাই নদীর ধারের স্বচ্ছন্দ-সাঁওতাল মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করতে ?"

সত্যি কথা। আর আর পাঁচজনের মতো মনের অবচেতন গহ্বরে, সে ইচ্ছার শ্বাস-রোধ না করে থাকলেও, সেই ঋষি তপোভঙ্গকারী রূপশিখায় পূর্ণাহুতি কি দিতে পেরেছেন তিনি, তার অমরা-দুর্লভ অমর কবিতা দিয়েও ? বড় জোর সভ্যতা কলুষহীন সেই বন-লাবণ্যকে ভাষার কাপড় পরিয়ে এনে পৌছে দিয়েছেন সভ্য সমাজের দরবারে। পৌছুতে পারেন নি সে পুজা সাঁওতালনীর মনের দুয়ারে। হায়রে সাম্যবাদীদের দুঃস্বপ্ন !

কড়া নীতি-বাগীশদের ভয়ে বন্ধুর পিলে-চমকান কথাটা না হয়, যা-খুসী-বুঝে-নাও গোছের হাসি হেসে এড়িয়েই যাওয়া গেল। কিন্তু ঐ যে কষ্টিপাথরে কোঁদা, ঋজু সাঁওতাল ছেলেটি ; যার সঙ্গে কবি মানস দিনের পর দিন পলাতক বালকের মতো ছুটত, শালবনের ছায়ায় ছায়ায় সারাদিন বাঁশী বাজিয়ে বেড়াতে, তাকেও কি প্রত্যক্ষে কোল দিতে পেরেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ?

আপনি বলবেন,—"অভিশাপ"। সভ্যতার অভিশাপ, (বোধ হয় তার চেয়েও বেশী করে) ভব্যতার অভিশাপ, অভিশাপ বড়ো হবার, বিরাট হবার,—অভিশাপ অসাধারণত্বের। কিন্তু সাধারণত্বের অভিশাপ ? সেও বা কি কম। একটা উদাহরণ দিই।

যৌবন-সমাগমে দেখবেন, অতি সাধারণ মেয়েও হয়ে উঠছে, একটি ক্ষুদে 'ফ্লার্ট'। একেই বোধ হয়, দুষ্মন্তের জবানীতে "স্ত্রীলোকদের অশিক্ষিত পটুত্ব" আখ্যা দিয়ে, কবি কালিদাস খানিকটা বিজ্ঞের হাসি হেসে নিয়েছেন।

মেয়েরা কিন্তু ফ্লার্ট হতে শেখে, নিছক প্রয়োজনের খাতিরে,—নেহাৎই প্রাণের দায়ে। ওরা গোছায় করে যেমন কাজ-অকাজের দু'রকম চাবিই নির্ব্বিচারে ঝুলিয়ে বেড়ায়, তেমনি কেমন করে যেন শিখে ফেলে, বাঞ্ছিত, অবাঞ্ছিত সবাইকে আঁচলে গেঁথে ঝুলিয়ে রাখতে। যতদিন না সাচ্চা আর মেকী বেছে নেবার মত অভিজ্ঞতা জন্মায় ; কিংবা ঠিক ঠিক মনের-মতো একজনকে খুঁজে নিতে পারে বিনা পরখেই।

কিন্তু সাচ্চা হীরে থেকেই শুধু আলো ঠিকরে বেরোয় না, ঝুটো পাথরেও থাকে যতন-করা আলোর চমক। এ নিয়ে বেশী বাছাবাছি, ঘাঁটাঘাঁটি করলে চোখের বিভ্রম ত ঘটবেই। চোখে ঝলসানো দ্যুতি শুধু মজায় না, ক্লান্তিও নিয়ে আসে চোখের। সেই অবসাদে রতন ভ্রমে কাচের টুকরো কিনে ব্যবসাও যেমন সম্ভব তেমনি সম্ভব কোনো মূল্য নেই ভেবে, অমূল্য রতন তাচ্ছিল্যভরে ফিরিয়ে দেওয়া।

তাছাড়া যাচাই করার আছে একটা মোহ,—আছে মাদকতা। সেটা অনেককে নেশার মতো পেয়ে বসে। রূপ আর রঙের জৌলুষ মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। বেলা যায় গড়িয়ে, গন্ধ যায় উড়ে। তারপর হঠাৎ একদিন খেয়াল হয়, কোন কিছুর কণ্ঠলগ্ন করার বয়সই গেছে পেরিয়ে। বক্ষের মনি চেপে বসেছে বুকের উপর, অচল অনড় পাথরের মতো। সময় থাকতে ঝুটো পাথরের মনভোলান ফাঁকিও হোত, এর চাইতে শ্রেয় না হোক, প্রিয় ত নিশ্চয়ই। সত্যিকারের ট্র্যাজিডিরও স্থুরু হয় এখান থেকেই। যৌবনের জয়ের মালা ঝরে গিয়ে উপহাসের মতো বেরিয়ে পড়ে সেটাই, অতি সাবধানীর গলায় যা জোটার কথা।

এই ট্র্যাজিডিই দেখা দিতে স্থুরু করেছে আমাদের সমর সোমের জীবনে।

নাম জিনিষটা অনেকের পক্ষেই শেষ পর্য্যন্ত পরিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেবেলায় দেওয়া নাম পরিণত বয়েসের লোকটাকে কেবলি মুখ ভেঙচাতে থাকে। কিন্তু সমর সোমের বেলায় হোল তার উল্টো। জীবন রণাঙ্গন যে তার জন্য বিরাট সমরায়োজন করে রেখেছে, তাকে যে একদিন হয়ে উঠতে হবে স্থকৌশলী সামরিক, এটা যেন কোন ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের মারফৎ জানতে পেরেছিলেন সোমপুঙ্গবের নামা-করণকারী। ভুল করবেন না অর্থকরী জীবন সংগ্রাম কিন্তু নয়, সম্পূর্ণ অন্যার্থের ইতিহাস এটা।

যে বয়েসে বড়লোকের ছেলেদের সময় কাটে অভিনেত্রীদের ছবি কেটে, সেঁটে, fan letter রচনা করে, (যা সব সময় সাহস করে পাঠান যায়না বা হয় না)--ফিল্ম কোম্পানীর দোরে দোরে ঘুরে বেড়িয়ে, অথবা ফুটবলের heroকে চা-সিঙ্গারা খাইয়ে আর বায়োস্কোপ দেখিয়ে, তেমনি কাঁচা বয়েসে, সমর হয়ে বসল, বাপের রেখে যাওয়া বিপুল বিষয় আর ব্যবসার অভিজ্ঞতাহীন একক কর্ণধার। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, মিষ্টার সোমের বিলিতি চালের বিরাট ব্যবসায়ে ছিলনা একটিও ফুটো, ছিলনা কোনো আশু বিপদপাত বা ওলট-পালট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। একেবারে ইংরেজিতে যাকে বলা হয়, ভরা-পালে ভেসে চলা নৌকা। সেই জন্যই আবার সমরের পক্ষে সেটা হয়ে উঠল আরো গুরুভার। ঝড়ের মুখে নৌকো উল্টোলে, লোকে দোষ খুঁজতে ব্যস্ত হয় না বরং সমবেদনাতেই হয়ে ওঠে মুখর। কিন্তু নিস্তরঙ্গ সলিলে, সচ্ছন্দগতি নায়ে এক ঝলক জল উঠলেও সবাই 'ছি' 'ছি' করে উঠে। বলে "আনাড়ী নেয়ে।"

এ অবস্থায় যা হবে, বা হতে পারে বলে সবাই আশা করেছিল (কোনো বিশেষ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী, একথা ষ্ট্যাম্পের ওপর লিখে রাখতে পারেন বলে তড়পেও নিয়েছিলেন দু একজন অতিবিজ্ঞের দল) তার কোনোটাই কিন্তু হোল না। হঠাৎ মাথা ফুলে গিয়ে, যথেচ্ছাচারে গা ভাসিয়ে, মস্তিষ্ক-তারল্যের লক্ষণও দেখালে না সমর ; আবার অনাবশ্যক সংযম, আর অতিসাবধানের শিরস্ত্রাণ এঁটে, মাথাটির নিরেটত্ব প্রমাণ করতেও ব্যস্ত হয়ে উঠল না সে।

সবাই অবাক হোল। বললে ধন্যি ছেলে। বালক অভিমন্যুকে ঘিরেছিল মাত্র সপ্তরথী। সমরের ভাগ্যে জুটল শতশত আধুনিক মহারথীর দল, আর রথিনী না বললেও, যাদের রথবিলাসিনী বলা চলে (বুইক, বেঞ্জ, বেলিলা, কাইজার, ফ্রেজার রথ) তাঁরাও দলে বড় কম নন। আর এ যুগের অস্ত্র সম্ভারই বা কি বিচিত্র।

স্বর্ণ-সন্ধানী মেয়ের দল ধেয়ে এল জোয়ারের জলের মতো। দুকূল ডুবিয়ে দিতে চাইল, দৈহিক আর ঐহিক স্থখের উপকরণ উজার করে ঢেলে দেবার লোভ দেখিয়ে। ভীড় করে এল সেই স্বার্থান্বেষী স্থবিধাবাদীর দল, অর্থের লোভে অনর্থ ঘটানোর কোনো কৌশলই যাদের অজানা নেই। ছেঁকে ধরল সেই সব সামাজিক পরগাছারা, উঠতি বাবুদের উড়তে শেখানোই যাদের পেশা আর নেশা করার সহজ পথ। একজনের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নামক ইহকাল ঝাঁজরা করে দিয়ে যারা দিন গোনে নুতন কাপ্তেন উড়বার ও ওড়াবার আশায়।

সমরের কিন্তু দেখা গেল যুগোপযোগী সবগুলি বিদ্যাই প্রায় আজন্মলব্ধ। গায়ের জোরে শত্রুজয়ের জেদ বা লুকিয়ে আত্মরক্ষা, এ দুটোই যে এ যুগে অচল এও দেখা গেল তার বেশ জানা। নিজের চারদিক ঘিরে 'ম্যাজিনো লাইন' গড়বার প্রয়াস না করে, প্রথম থেকেই সে নিজেকে প্রচার করলে 'ওপেন্ সিটি' বলে।

বয়াটে বন্ধুদের প্রতি অযথা ধর্ম্মোপদেশ আর নীতির লেকচার না ঝেড়ে, সহজভাবে তাদের দলে ভিড়ে গেল সমর। ওজর আপত্তির বেড়া দিয়ে ওদের জেদ বাড়িয়ে না তুলে, হয়ত দুপাত্র মদও খেলে সঙ্গে বসে। তারপর সহজ গলায় বললে, "এ কিন্তু ভাই ভাল লাগল না আমার একটুও। তার চাইতে তোমরা খাও আমি দেখি ; আমার সত্যি খুব ভাল লাগে দেখতে। তবে খরচাটা কিন্তু আমার, সে ব্যাপারে কোনো আপত্তিই শুনবনা আমি।" এমনি ভাবে ওদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াল সম্পূর্ণ নিস্পৃহ পুরুষের মত ; (গীতায় না সাংখ্যে কোথায় যেন আছে এমন সব পুরুষের কথা।) অথচ ওদের বকামীর খরচ জোগানর জন্য এমন ভাবে জেদ করতে লাগল যে ওদের উৎসাহ মিলিয়ে এল দুদিনেই। পাপের সঙ্গী জোটাতে লোকের যতখানি উৎসাহ, ঠিক ততখানি আপত্তি পাপের সাক্ষী রাখতে। একটা সামান্য ছেলেকে দলে টানতে না পারার নিষ্ফল আক্রোশে দুচারজন অসামান্য (অন্ততঃ নিজেরা মনে করত তাই) পষ্টাপষ্টি ঝগড়া বাঁধিয়ে দিলে দলের মধ্যে। আর বাকী কটিও শেষ পর্য্যন্ত নীরবে কেটে পড়তে বাধ্য হল, ব্যর্থতায় আর লজ্জায়।

ছোটখাট ধারের টাকা ফেরৎ দিতে এলে সমর বলত : "থাক না এখন ওটা আপনার কাছেই আমারও ত হঠাৎ প্রয়োজন হতে পারে আপনারই মতো"। যারা নূতন ধার করতে শিখেছে তারা খুশীতে আটখানা হলেও, পোড়-খাওয়া পুরোণো ঘাঘীরা সহজেই বুঝতে পারত, ভবিষ্যতে ধার চাওয়ার পথটাই কেমন করে বন্ধ হল চিরদিনের জন্য।

কোন বিশেষ স্থবিধা আদায়ের, অথবা সহজে কাজ হাসিল করার প্যাঁচোয়া মতলব নিয়ে, অত্যন্ত হুঁসিয়ার বুড়ো বুড়ো লোকগুলো পর্য্যন্ত যখন "বড়দা" "মেজদা" "ছোট্দা" ডেকে, নিরীহ ভক্তের মতো সবিনয়ে ঘিরে বসত ; কিংবা অনাবশ্যক খোসামুদী প্রশংসায় হয়ে উঠত মুখর ; তখনও কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে উঁচু চেয়ার থেকে মাষ্টারী বক্তৃতা দিতে সমরের আটকাতনা একটুও। শেষে নিজেদেরই বেড়াজালে জড়িয়ে গিয়ে, চোরাই কিল হজম করে, তাদের সরে পড়তে হত চুপচাপ। যারা এসেছিল কিছু বিকোতে তাদের ফিরতে হত কিছু কিনে। পচা মাল পাচার করা দূরে থাক নূতন বোঝার ভারে তাদের ঘাড় পড়ত নুয়ে।

মেয়েদের বেলাতেও সমরের তূণীরে তীরের অভাব হতনা। স্পষ্টত-প্রসাধন-পটু কোনো মেয়ের

দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে, সে অপাপবিদ্ধ শিশুর মতো বলে উঠত : "যাই বল, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের তুলনা নেই কিছু, মিছেই বিদেশী মেয়েরা রং মেখে বেরোয় মুখে। কোথায় পাবে তারা এই সহজ লালিমা,—এই নবারুণ রক্তিমাভাষ ?" শুনে রুজ্-মাখা মেয়ের গাল সত্যি লাল হয়ে উঠত লজ্জায়। "এনামেল-করা মুখের" চলতা খসে না পড়লেও 'ম্যাকস্‌ফেকটার' আর 'কোটি'র-পলেস্তারা চড়চড় করে উঠে জ্বালা ধরিয়ে দিত মুখে।

ওদের দিক থেকে বহুকষ্টে ঘটিয়ে তোলা নিভৃত আলাপের বহুমূল্য অবসরটি অনায়াসে ভরিয়ে তুলত সে, মেয়ে-ভুলোনো চাটুকথার বন্যায়, আর অতিপ্রশংসার ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে। কোনো অসাবধানী মুহূর্ত্তকে যে ব্যবহার করবে, ওকে প্যাঁচে ফেলার কাজে, সে সুযোগই ঘটে উঠতনা তাদের। ওর ক্ষুদ্রতম ব্যবহারেও থাকত এমন আপাত-সারল্য, এমন গলা-কাঁপন আবেগের প্রলেপ মাখিয়ে দিতে পারত সে তার সামান্য কথাতেও, কারণে, অকারণে এমন দুরন্ত হাসি হেসে উঠতে পারত সে, যে মেয়েদের মনে কেবলি সন্দেহ জাগত। এ কি সহজলভ্য নির্ব্বোধের মুগ্ধ প্রলাপ না তীক্ষ্ণতম বুদ্ধির সযত্নে লুকোনো জ্বালাধরা চাবুক ? ফন্দিবাজ মেয়ের দল ভেবেই পেতনা, ওকে অবহেলা করবে, না ভয়, ভালবাসবে না ঘেন্না করবে। সমরের মত বড় কাৎলা গাঁথতে গিয়ে, শুধু নাস্তানাবুদ হওয়া নয়, জল কাদা মাখামাখির অগৌরবও জুটত অনেকখানি। সে লজ্জা ঢাকতেই তারা পালাবার পথ পেতনা খুঁজে।

এভাবে কৌশলে আত্মরক্ষার বিপদ কিন্তু কম নয়। প্রথমতঃ কৌশল মানে ধাপ্পা ছাড়া ত আর কিছু নয়। যাদুকরের চটকদার হাত-সাফাইয়ের মতো, সত্যিকারের ক্ষমতা নয়, চোখে ধূলো দেওয়া ভেল্কি শুধু। দ্বিতীয়তঃ যা দাম দিয়ে কিনতে হয়না বাইরের খোলা-বাজারে, মনের কাছ থেকে সেটাই চোরাবাজারী দাম আদায় করে নেয়। ফাঁকি দিতে দিতে নিজেরই ফাঁকে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয় কিছুই। অনবরত বর্ম্ম এঁটে এঁটে ভেতরকার পেশীগুলোই যদি যায় শিথিল হয়ে তখন আর রক্ষাকবচের প্রয়োজন থাকে কি ? ঠকে যাবার ভয়ে সে সন্দেহের কীটকে পুষতে হয় নিজেরই জারক-রসে, সেই কুরে কুরে যখন ফোঁপড়া করে দেয় ভেতরটা ; তখন খেচর-খেদান জালের আবরণ আর ভূচর-ভোলান রঙের আস্তরণ, দুই-ই সমান অর্থহীন হয়ে পড়েনা কি ?

কৌশল করে করে কৌশলী হওয়া যায় বটে (বোধ হয় বড়দরের কৌঁসুলী ও) কিন্তু কুশল হয়না কিছুই। ফাঁকিবাজদের লোকে ফক্কর বলে ঠাট্টা করে, বড় জোর ঈর্ষা করে মনে মনে, কিন্তু মানুষ বলে ভালবাসে না।

তাছাড়া অভ্যাসের ভূত ঘাড়ে চেপে বসলেও মুস্কিল। সিন্দবাদের বুড়োর মতোই তাকে ঘাড় থেকে নামানো যায়না কিছুতেই। মহাপুরুষ বলেন—সাধুতার ভেক ধরে থাকলেও, বাধ্য হয়ে কিছুটা সাধুভাব বর্ত্তাবে তোমাতে। আমাদের সমরেরও হোল তাই।

যে সুতীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির কৃপাণ নিয়ে সে প্রথম যুদ্ধে নেমেছিল, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অনবরত ব্যবহার করে করে, তার ধার ত কমে এলই, এমন কি তার প্রয়োজনও এল ফুরিয়ে। মরণান্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত সৈন্যদল যেমন শেষপর্য্যন্ত তালে তালে পা ফেলে চলে নেহাৎই অভ্যাসের বশে ; তেমনি সমরের প্রতিদিনকার হিসেব-করা-ব্যবহারে প্রয়োজন হতনা কোনো হিসেব করার। বহু দিনের কষ্টসাধ্য অভ্যাসের ফলে তার প্রতিক্রিয়াগুলো হয়ে পড়ল সম্পূর্ণ যান্ত্রিক।

তোমাদের ভাল লেগে থাকলে আর কথা নেই, ধরে নিতে পার সমরের খারাপ লেগে বসে আছে সেটা ; তাতে তার মনের সায় থাক বা নাই থাক। আর যুক্তি ? তার প্রয়োজন ত শুধু ভাল না-লাগার সপক্ষে ওকালতী করতে। সর্ব্ববাদী সহজ পথ খুঁজে পাওয়া মাত্র দেখবে তার পা দুটো চলতে সুরু করে করে দিয়েছে উল্টো ধরে ; মস্তিষ্কের অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই,—মনের মানা না মেনেই। তুমি যদি 'হাঁ' বল তার মুখ দিয়ে 'না' বেরুতে সময় লাগবে না একটুও। দম-দেয়া উল্টো কথার গ্রামোফোন যেন।

* * * *

সেদিন রিণি মিত্তির আর সামলাতে পারলোনা নিজেকে। যে কান্না, যে অভিমান এতদিন ধরে জমা হয়ে উঠছিল শুধু রাতের আঁধারের নিঃসঙ্গ গোপনতায়, তা আজ সামনাসামনি ফেটে পড়ল বাঁধ-ভাঙ্গা দুর্দ্দমতায়।

"কিন্তু কেন ? কেন এমন হবে ? কেন তুমি হবে এমন স্বার্থপর ? আসল কথা, তোমার মুখের ওপর সত্যি কথাগুলো সাহস করে কেউ বলে না,—কেউই না। যে সব আয়নায় তুমি মুখ দেখে থাক তা'র একটাও নির্দ্দোষ নয়। হয় স্বার্থের চাপে ভাঙ্গা, নয় তোমাকে ভালবাসার রঙে রাঙা। তাই নিজের আসল চেহারাটা দেখবার সুযোগ পাওনা তুমি, দেখ অন্যের মনগড়া জমকালো মিথ্যাকে। তোমার সামান্য ইচ্ছাকেও বেদের বিধানের মতো মেনে নেয় সকলে,—বিশেষ করে যারা তোমায় ভালবাসে, যাদের কাছে তুমি কাম্য ভগবানের চাইতেও বেশী করে। এমনি একটা ভূয়ো রাজত্বের সহজে-আদায়-করা রাজস্ব ভোগ করে করে তুমি মনে প্রাণে হয়ে উঠছ মোগলাই,—তোমার মেজাজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বাদশাহী। আধুনিক হারেম গড়ে তুলছ তুমি তোমার ভক্ত মেয়েদের নিয়ে ; না থাক তাতে অবরোধের দেয়াল,—না থাক দরজায় শেকল আর পাহারা, হারেম সেটা, সন্দেহ নেই কিছু। তুমি যে মেয়েদের দেখ কেনা বাঁদীর মতো। তোমার চারদিক ঘিরে শুধু ঘুরে মরতে হবে তাদের চিরদিন, শুধু তোমার আলোয় আলোকিত হয়ে ; নয়ত খসে পড়তে হবে চির অন্ধকারে।

"তোমার মন যখন চাইবে না, তখন এই পৃথিবীকে ভুলে গিয়ে শুধু স্বপ্নের জালবুনে খুশী থাকতে হবে তাদের। তাও বাধাহীন খেয়াল খুশীর স্বপ্ন নয়, তোমারি ছকে দেওয়া গোলকধাঁধাঁর পথে হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন সে।

"তোমার মেজাজের রঙে রঙ মিলিয়ে বার বার করে শাড়ী আর বেশ পাল্টাতে হবে তাদের। নিজের সাধ, নিজের ইচ্ছার গলা টিপে মারতে হবে, অবিশ্যি যদি তখনো বেঁচে থেকে থাকে কিছুই। এক কথায় তোমার খুশীর খেয়ালে নাচতে হবে তাদের, তোমার হাতের সুতোয় বাঁধা পুতুলের মতো।

"না না, এ আমি হতে দেব না কিছুতেই ! পৃথিবীতে অন্ততঃ একজন মেয়ে থাক যে তোমার জুলুমবাজ মর্জ্জির কাছে বলি হতে রাজি হবে না কিছুতেই,—হবে না সে কাদার পুতুল যাকে তুমি খেয়াল মাফিক ভাঙ্গবে আর গড়বে।

"তুমি কি করে বুঝবে, কিসের লোভে নির্লজ্জের মতো ফিরে এসেছি দিনের পর দিন। (এইখানে ভারী হয়ে এল রিণির গলা। দু ফোঁটা জল টলমল করে উঠল চোখের কোণে) "কান্না

ঢেকেছি জোর-করা হাসি দিয়ে। চাবুক খাওয়া কুকুরের মতো লুটোপুটি খেয়েছি পায়ে। তবু আশা হারাইনি,·· ভেবেছি···কিন্তু থাক সেসব কথা। নিজের কথাটি ছাড়া আর কিছু ভাববার অবসর কি পেয়েছো তুমি কখনো, যে, বুঝতে পারবে অন্যের ব্যথা,—অপরের আশার কথা। যদি কোন দিন স্বীকার করতে পার অন্যলোকের অস্তিত্ব, যদি কখনো বোঝবার চেষ্টা করো যে, তোমায় যারা ভালবাসে তারাও তৈরী রক্তমাংস দিয়ে, তাদেরও আছে সাধ, আহ্লাদ, দুঃখ,—আছে বেদনা বোধ, তবেই হয়ত আবার দেখা হবে একদিন,···নইলে······"

রিণি ছুটে পালাল। দুচোখ-ছাপিয়ে-আসা অবুঝ কান্না লুকোতে, না আরো কিছু কেলেঙ্কারী করে ফেলবার ভয়ে, কে জানে!

* * * * *

কিছুতেই ঘুম এলোনা সমরের চোখে। সখেদ ভাবনায় এপাশ ওপাশ করে কাটালে সারাটি রাত। আত্মধিক্কারে তেতো আর বিস্বাদ হয়ে উঠল সব কিছু। ব্যথাতুর গ্লানিতে ভরে গেল সমস্ত অন্তর।

রিণি ঠিকই বলেছে। একি হোল তার? কেন সে এমন হবে? সে ত এমনটি ছিল না, মনে প্রাণে এখনও ত সে এমন নয়। তবে কেন সে ক্রমশ হয়ে উঠছে এমন অহেতুক স্বার্থপর, এমন অকারণ নিষ্ঠুর? এমন একটা অদ্ভুত জীবে পরিণত হবে সে কোন দিন, একথা কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল? সবাইকে পর্য্যুদস্ত করার, বিপর্য্যস্ত করার এই দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষা কখন জন্ম নিল তার মনে? কেমন করেই বা শেকড় গাড়ল এমন শক্ত করে? কোথা থেকে এল এই শিশুদের মতো সব কিছু একা ভোগদখল করবার লোভ, রোগীর কুপথ্যের আকর্ষণের মতো অসহ্য প্রবল?

ফেলে-আসা দিনগুলির দিকে, ভাল করে তাকিয়ে দেখবার সুযোগ পেল সমর, সে রাত্রে। সেখানে সে দেখতে পেল শুধু পরাজয়। শুধুই ব্যর্থতার ইতিহাস বলে মনে হল তার সমস্ত জীবনটাকে। সে সহজ বিদ্রূপ আর শ্লেষের কষাঘাতে, হাসতে হাসতে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করে দিয়ে খুশীতে ভরে উঠেছে তার মন, তার ভেতর নিজেরই ভয়াতুর আর্ত্ত-চীৎকার ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলনা সে। যে আত্মবিশ্বাসের জোরে কাউকেই সে সমকক্ষ মনে করেনি, তার ভেতরেও বড়াই করবার মতো কিছুই খুঁজে পেল না সে; শুধু দেখতে পেল নীচ প্রতিহিংসা-পরায়ণের এক বীভৎস রূপ। একটার পর একটা ব্যর্থতা এসে যতই তাকে কোণঠাসা করবার চেষ্টা করছে, ততই তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, —হয়েছে অনড়, শক্ত, নিষ্ঠুর। ক্রমাগত দেয়ালে পিঠ রেখে লড়তে গিয়ে নিজেই সে গড়ে তুলেছে বিরাট এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর,—বেরুবার জন্যেও রাখেনি কোনো ছিদ্র পথ!

কিন্তু সত্যিই কি নেই কোন পথ? কেন বয়ে বেড়াতে হবে তাকে, এমন অভিশপ্ত জীবনের বোঝা? ঘৃণ্য জুলুমবাজ বলে অন্যের নাক সিঁটকোবার সুযোগ কেন দেবে সে? কেন সে কৃপার পাত্র হয়ে উঠবে, অন্ততঃ একজনের কাছেও? তার কি সাহস নেই জীবনকে নূতন করে সুরু করবার,—অধিকার নেই নূতন করে গড়ে তোলবার? নিশ্চয়ই আছে।

ভালবাসার আগুনে একজনের পর একজনকে পুড়িয়ে মারার আছে সুতীব্র আনন্দ,—আছে বুক-

ফুলে-ওঠা পৌরুষ; কিন্তু সে আগুনে নিজে পুড়ে মরবার ও কি নেই কোনো বুক-জুলে-ওঠা তৃপ্তি? সবলে বশে আনার, অজেয়কে জয় করে নেবার, আছে বাহবার নেশা-চরানো চটকদার সুখ; তাই বলে দুর্ব্বলের কাছে ইচ্ছে করে হেরে গিয়েও পাওয়া যায়না কি কোনো নূতন স্বাদ,—কোনো অতি সহজ ভাল-লাগা? সমর কি পারে না নিজেকে বিলিয়ে দিতে, বিলীন করে দিতে, অন্যের সুখের স্রোতে নিজেকে নিঃশেষে উজার করে ঢেলে দিয়ে, পৌছুতে পারেনা সে সুখের চরমতায়? সে সুখই ত সুখ। সেই ত আসল পাওয়া।

ঘুরে ফিরে রিণি মিত্তিরের কথাই মনে পড়তে লাগল তার। কী অদ্ভুত সুন্দর মেয়ে এই রিণি! অসাধারণত্ব নেই কিছুই, তবু যেন সাধারণ দল থেকে আলাদা। অনেক সময়ে যেমন দেখা যায় জমকালো উৎসবের আসরে, কেবলমাত্র পরার গুণে, সাধারণ আটপৌরে শাড়ীতে আপনার জনের মতো মিশে গেছে, চোখকে ধাক্কা দিচ্ছেনা অথচ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে পুরোপুরি—তেমনি কি যেন একটা যাদু আছে এই মেয়েটির মধ্যে লুকিয়ে। নেহাৎ সহজ ঘরোয়া সে, অথচ বেমানান হয়না কোনো পরিবেশেই। চমক-লাগান ঔজ্জ্বল্য নেই বটে কিছু, কিন্তু জোলো-উপেক্ষায় তাকে পাশ কাটানও সম্ভব হয়না। আর কত সংযত, কত নির্লোভ অন্য মেয়েদের তুলনায়। সমরের মনে পড়তে লাগল কেমন করে দিনের পর দিন, রিণি ছায়ার মত ঘুরেছে পাশে পাপে, কিন্তু জোর করে জাহির করবার চেষ্টা করেনি নিজেকে। ক্ষুদ্রতম দাবী জানিয়েও অসহ্য করে তোলেনি নিজের উপস্থিতিটাকে। কেবলি দিয়ে গেছে,—সয়ে গেছে; মুখ ফুটে চায়নি কিছুই,—প্রতিবাদ করেনি পক্ষপাতিত্বের। এই ত মেয়ে! এমনটি ছাড়া আর কার কাছে নিশ্চিন্তে ছেড়ে দেওয়া যায় নিজেকে!

ধরা পড়বার ভয়ে আর পালানো নয়, ধরা দেবে সে রিণির কাছে। সমর ঠিক করে ফেললে মনে মনে। আর শুধু ধরা দেওয়াই বা কেন, সমর্পণ করবে সে নিজেকে। হ্যাঁ—সমর্পণ। নিজের বলতে কিছুই না রেখে সম্পূর্ণ তুলে দেবে সে নিজেকে রিণির হাতে। রিণির ভালবাসার স্রোতে ভাসিয়ে দেবে সে, তার যা কিছু সম্বল,—যা আছে সযত্ন-রক্ষিত পুঁজি।

একটা পরম তৃপ্তিতে, একটা অনাস্বাদিত আবেশের পরিপূর্ণতায় ঘুমে জড়িয়ে এল সমরের চোখ।

বাইরের আকাশ ফিকে হয়ে এল। ভেতরকার অন্ধকারগুলো যেন বিদায় বেলার শেষ আলিঙ্গনে জমাট বেঁধে রইল ঘরের কোণে কোণে। সশব্দে জানলা কাঁপিয়ে চলে গেল, ভোরবেলাকার জল দেওয়া ট্রামখানা।

* * * * *

সকালবেলাতেও একটা সুখকর পরিতৃপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে রইল সময়ের সমস্ত দেহমন। স্নানের ঘরে গুণ গুণ করে গান গেয়ে উঠে নিজেই অবাক হয়ে গেল সে। এমনটি ত ঘটেনি তার জীবনে অনেকদিন ধরে। অ—নে—ক—দিন পায়নি সে এমন উপছে-পড়া আনন্দের স্বাদ।

রিণির সঙ্গে আজ তার হবে নূতন করে বোঝাপড়া······সম্পূর্ণ নূতন যোগসূত্রে গাঁথা পড়বে সে আজ একটি মেয়ের সঙ্গে। নূতন চোখে সে দেখলে পৃথিবীকে। আজ থেকে তার নূতন জীবনের সুরু। রিণি, রিণি, রিণি······

রিণি—রিণি—রিণি……টেলিফোন বেজে উঠল।

"কে সমরদা……শোন"—রিণির কুণ্ঠিত কণ্ঠ শোনা গেল। "খুব রাগ করে আছ নিশ্চয়ই আমার ওপর…সত্যি কথা সমরদা… কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি একফোঁটা—কী ছটফট করে কেটেছে সারাটি রাত…আচ্ছা বলত কী ভূতে পেয়েছিল আমায় কাল…বিশ্বাস কর সমরদা, সারারাত ভেবেও বুঝতে পারিনি কেমন করে তোমায় অমন ব্যথা দিতে পারলুম…কেমন করে পারলুম আমি? কী যে হয়েছিল আমার…জানি এ দোষের ক্ষমা নেই…তবু…একটি বারের জন্যেও কি ক্ষমা করবেনা তুমি আমায়…তোমাকে…"

—"তোমাকে ক্ষমা করার কথাই ওঠেনা রিণি। দোষ ত আমার। তুমি সত্যি কথাই বলেছ কাল। আমাকে শোধরাতে হবে নিজকে…বদলাতে হবে আমার অন্যায় অভ্যাসগুলো। কাল সারারাত ধরে সে প্রতিজ্ঞাই আমি করেছি মনে মনে, আজকে…"

"এসব তুমি কি বলছ সমরদা? আর যাই কর, দোহাই তোমার, নিজকে বদলাবার চেষ্টা করোনা তুমি…না, না…তুমি করতে যেওনা কখনো। তুমি ত জান না, কী ভাল লাগে তোমার ঐ খেয়ালীপনা—তোমার অন্যায় আব্দার! কী মিষ্টি যে লাগে তোমায়, যখন তুমি জেদ ধরে বসে থাক অতি-আদরে বয়ে-যাওয়া দুষ্ট ছেলের মতো। জোর করে যখন বাধ্য কর তুমি, তোমার স্বার্থপর ইচ্ছার জুলুম মেনে নিতে, তখন কি পুলক-লাগা-ভয়ে দুলে ওঠে মেয়েদের বুক,—কি শিহরণ লেগে যে কেঁপে ওঠে তাদের সমস্ত সত্তা, তা তুমি তো বুঝতে পারবে না কোনদিন। তুমি যে রাজা, তুমি যদি নেমে এলে আসন ছেড়ে দিয়ে, তবে আর কিসের লোভে ভীড় ঠেলে এগুবো বল? তোমার কেড়ে নেওয়া কড়া শাসন সইতে পারব, সইবে না দীন হীনের মতো হাত পেতে চাওয়া। তাও বলছি যেমন আছ তুমি, তেমনি থাক। তোমার পায়ে পড়ি সমরদা, চেষ্টা করোনা অন্য কিছু হবার…সে হবে তোমায় না পাওয়ার চাইতেও অসহ্য। আর আমার কথা শোন—আজ থেকে আমাকে তুলে দিলাম আমি তোমার হাতে…যা খুশী করো তুমি আমায় নিয়ে…আজ থেকে…"

ফোনটা রিসিভারে রেখে দিল সমর। দু হাত দিয়ে চোখ ঢাকল সে। ফাল্গুন-শেষের রদ্দুর সত্যি বড় কড়া।

"অজ্ঞো যো যস্য বা নাস্তি প্রিয়ঃ প্রগ্নো ভবেন্ন সঃ।"—শ্রীভট্টি

গড় শ্রীখণ্ড

অমিয়ভূষণ মজুমদার

[পূর্ব্বানুস্থৃতি]

চৈতন্য সাহা বিপদ দেখতে পেল। পথে ঘাটে চলা কঠিন হ'য়ে উঠেছে। শুধু নিজের গ্রামে নয়, আশেপাশের দু পাঁচখানা গ্রামেও তাকে দেখলে ছেলেরা হো হো ক'রে হাসে, বড়রাও সে হাসিতে পরোক্ষ যোগ দেয়, দু'এক জায়গায় অভিযোগ করতে গিয়ে ফল উল্টা হয়েছে।

সকালে উঠে রামচন্দ্রর সাথে জড়িত বিশ্রী ব্যাপারটা ঘটে গেল। তার প্রথম ইচ্ছা হয়েছিল দরজা বন্ধ ক'রে ঘরে বসে থাকে যে ঘরে দলিল আছে, আর দুষ্প্রাপ্য পণ্যগুলি। ভয় কমলে নিজের পাড়ার দু'একজনেয় সাথে কথাও হ'য়েছিল, তাদের একজন পুলিশকে খবর দিতে বলেছিল। এ প্রস্তাবে সহসা চৈতন্য সাহা রাজি হ'তে পারে নি। তার বাবার সময়ে জমিজিরাতের ব্যাপার নিয়ে এমন লাঠি ধরেছে কেউ কেউ, কিন্তু তার দরুণ পুলিশে খবর দেয়নি মহাজন পক্ষ। আছে, অস্ত্র আছে, যাকে মহাজনি চাল বলে। চৈতন্য সাহার একজন কর্মচারী দা দিয়ে কুচান তামাকে চিটে গুড় মিশিয়ে বিষ্ণুপুর লেখা একটি টিনে তুলছিল, তার উপরে লক্ষ্য রাখতে রাখতে চৈতন্য সাহা চিন্তা করছিল এমন সময়ে সে তহশীলদারের মুখ দেখতে পেল।

বয়স্ক কোন তহশীলদার নয়, কাল পর্য্যন্ত মুণ্ডাদের দলে খেলেছে এমন এক ছোকড়া। তবু সঙ্গে তার তক্‌মা আঁটা পাইক দেখে সসম্ভ্রমে তাকে বসতে দিয়ে চৈতন্য সাহা বলল, দেখেন, ভাই, সবই আমার লোকসান। খাজনা দিব কি, এক পয়সা লাভ হয় নাই। টাকা দিলাম, যখন ওরা না খেয়ে মরে তখন খাবার জন্য টাকা দিলাম, তার শোধ নিল ভগোবান্। এমন নিমকহারাম ভগোবান্, জমি চষল না ওরা।

—খাইখালাসি জমি চষবে এমন বাধ্যবাধকতা নাই।

—তাও গত সন আগাম মজুরি নিয়ে চাষ করলিও করছিল, এ সন জমি ছুলো না।

—গত সনে ওরা ঠক্‌ছিল।

চৈতন্য সাহা মাথা নেড়ে বলল, ইছ্ ইছ্। আমাকে ঠকাল। যে জমিতে দশ মণ আমন উঠত, উঠল ওঁকরা। বেলা ডোবার দিকে চায়ে চায়ে দিন কাটাইছে।

—কিন্তুক, লাভ হোক, লোকসান হ'ক, খাজনা দেয়ার দায় আপনার। আপনার খাই-খালাসির লিষ্টি আনেন, আমার জমার বই রেডি। টাকা এখন না দেন, হিসাব হ'ক, বৈকালে আসে টাকা নেবোনে।

—অস্, অস্, দু'একমাস সবুর করলি হয় না? চৈতন্য সাহার মুখের সম্মুখভাগে একটিমাত্র হলুদ রঙের দাঁত অবশিষ্ট ছিল। সেটিকে সে ঘন ঘন চুষতে লাগল।

তহশীলদারের সম্ভবত ব্যক্তিগত কিছু অপ্রীতি ছিল, সে কিছুমাত্র বিচলিত না হ'য়েই বলল,—লিষ্টি ধরেন, লিষ্টি। কত বিঘে জমি রাখছেন খাই-খালাসিতে।

—একশ' কি পঁচিশ'। সে যৎসামাইন্ন।

…তা হ'লি বছরে আড়াই হাজার নিরিখে কম ক'রেও পাঁচ হাজার। কি ভয়ঙ্কর, আমার চাকরিটাই যাবি। আর নজর, নজরের কি ব্যবস্থা? আমাদের তহুরির?

—আজ্ঞে, খাই-খালাসিতে নজর-তহুরি কিসের?

—সাজি মশাই, মরা জিনিসের কারবার করেন, তাজা জিনিসের মর্ম কি বুঝবেন! জমি হতেছে তরতাজা। তহুরির ব্যবস্থা না করলি আমরা শোনব কেন? এ মরা-জিনিসের কারবার না।

—বারবার মরা জিনিস কি কন। আপনি কি চাষিদের মতন মনে করেন আমি হাড় চালান দেই?

তহশীলদারের হাসি পেল। গানটা সেও শুনছে, কিন্তু আদায় তহশীল করতে এসে হাসাহাসি করা যায় না। সে বলল,—তা ধরেন যে, আলকাতরাও তো মরা জিনিস। আর দেরী করেন না।

—একটুক্ চিন্তা করবার সময় দেন।

—সময় সময় ক'রে আর সময় কাটাবেন না। ছোটবাবুর কড়া হুকুম: তিনদিনের মাথায় সব খাজনা শোধ না হ'লি কোটকাচারি হবি।

—ছোটবাবু? ঐটুকু গ্যাদা ছাওয়াল?

—তোমার আমার ছাওয়াল না, সাজি মশাই। খোদ নায়েবকে হুকুম করেছেন—প্রজা হয়ে দেখা করে না, কতবড় সে মহাজন, আমি দেখব। অবশ্য খাজনা না দেন লোকসান নাই, লাভ আছে।

তহশীলদার চলে গেলে চৈতন্য সাহা শূন্য দেখল পৃথিবী। তহশীলদার নোতুন কিছু বলে নি ভাবা যেত, যদি সে খাজনা আদায়ের উপরেই জোর দিত। কিন্তু সে বলে গেছে, খাজনা না দিলেই সুবিধা, আসলে ওরা মামলা করতেই চায়।

চিন্তা করতে গিয়ে সে ভীষণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠল। তার সবটুকু রাগ গিয়ে পড়ল রামচন্দ্র, তার জামাই মুণ্ডলা আর তার সঙ্গীদের উপরে। না খাওয়ার দিনে ধার দিলাম, টাকা দিলাম, তার এই শোধ, না? অন্যদেশ থেকে কৃষক এনেছে তার উপরে জুলুমবাজি। বে-আইনি কাজ ক'রে তার উপরে লাঠিবাজি! ঐ রামচন্দ্র বেটাকে পুলিশে দেব। একটি গারদে গেলে আর সব কটা শায়েস্তা হয়।

রাগের মাথায় উঠে দাঁড়িয়ে সে কনক দারোগার থানার দিকে ছুটতে লাগল।

থানায় এজাহার দিয়ে চৈতন্য গ্রামের দিকে ফিরছিল। সকাল থেকে এখন প্রায় সন্ধ্যা পার হ'ল, এ একই ব্যাপার নিয়ে নানা রকম ভেবেছে সে। এখন রাগটা পড়ে আসছে,. থানায় এজাহার দেয়ার পরিণতি যে একটা মামলা এটা সে বুঝতে পারছে। সাক্ষীসাবুদের প্রয়োজন, তাদের কথা ভাবতে গিয়ে মনে হ'ল ভালো মজবুত সাক্ষী দিতে হবে। নিজগ্রামের লোকদের দিয়ে ভরসা নেই। নিজগ্রামের বাইরে তার টাকা লেনদেনের ব্যাপারে যাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, তারা হ'চ্ছে চড়নকাশির আলেফ সেথ ও সানিকদিয়ারের হাজি সাহেবের ছেলে। এদের বলে রাখা দরকার। ধানের কারবারে সেই বৎসর এরা সহায়তা করেছিল।

চৈতন্য সাহা কখন চড়নকাশিতে এসে পড়েছেন খেয়াল করেনি। এক সময়ে সে দেখলে সে শূন্য মাঠের উপর দিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যার পর পরই আলো হ'য়েছে। সেই আলোতে শুকনো খট্‌খটে বন্ধ্যা

মাঠ চারিদিকে ছড়ান। চৈতন্য সাহার মনে হ'ল এগুলিও তার কাছে বন্ধক রাখা জমি, নতুবা চাষের জমি কেন এমন পড়ে থাকবে। আর এরই জন্য কিনা জমিদার খাজনা চায়! লোকসান, লোকসান, কি আহাম্মুকি হ'য়েছে এই জমি রেখে! নিজেকে বিদ্রূপ করে সে বলল,—সব ধান ঘরে উঠবে, ধানের রাজা হবে?

সম্মুখে কে যেন ছাতিমাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভালো করে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না, তার ছাতিমাথায় দেয়ার মতো বিশিষ্ট ব্যাপারটাও লক্ষ্য করতে পারল না চৈতন্য। সে বলল,—এও বুঝি, এ সবই বুঝি চৈতন্যসার খাইখালাসি?

ছাতিমাথায়, সবজে রঙের আচকান-জাতীয় পোষাক পরা লোকটির মুখ দেখা গেল না; এক বুক সাদা দাড়ি দেখা গেল,—কি কন চৈতনসার খাইখালাসি?

লোকটি চৈতন্য সাহার চারিপাশে একটি অদৃশ্য বৃত্ত রচনা করে ঘুরে এল ধীরে ধীরে।

—কি ক'লেন? এর নাম চড়নকাশি। কে জাগে?—না, আলেফ সেথ। আপনি? তা বেশ গান বাঁধেছে ওরা। চিতিসা—চিত্তিসাপ, আমন ধানের বিষ।

লোকটি সুর করে গান ধরল।

চৈতন্য সাহা আর দাঁড়াল না। এই তার সাক্ষী, এই তার সম্ভাব্য সহায়! রাগ করতে গিয়ে কান্না পেল তার। ছুটে পালানোর ভঙ্গিতে সে চড়নকাশির আলেফ সেথকে ছাড়িয়ে এল।

আলেফ সেথ গদ্‌গদ্ করে হেসে উঠল।

সন্ধ্যার পর চৈতন্যসাহা বেরুল, তখন সে অন্যমানুষ। রামচন্দ্রর পাড়ায় যেতে সাহস হলনা। নিজের বাড়ির কাছাকাছি যে সব চাষী ছিল, তাদের দু'একজনের কাছে গেল।

—শুনছ, না? তোমরাও গেলে, আমিও গেলাম। জমিদার বাকি খাজনার নালিশ করবি। জমি তো সবই খাস হবি।

—কন্ কি!

—তাই হ'ল। তোমরা চাষ করলে না। কত ক'লাম, বাবা সোনা, মজুরি আগাম নেও, জমিতে চাষ দেও। যদি বা দিলা চাষ, সে ঠুগ্‌বুগ্। ফসল উঠল উনা। কিন্তুক এখন, এখন আমি খাজনা শোধব কেন?

—আমরা খাজনা দিব আর আপনি জমি খাতে থাকবেন, এমন কাগজ করা হয় নাই।

—আমি খাজনা দিবার পারি কনে? খেতের ফসল উঠবের চায় না ঘরে, রামচন্দ্র লাঠি নিয়ে ধাওয়া করে। টাকা আমার অমনি গেছে—মিছা মিছা আর জমিদারের খাজনা শুধি কেন। দুই সনে জমিদারের পাওনা—পাঁচ হাজার।

কথাটা এতদিন কানাঘুসো চলছিল, এবার সত্যের রূপ নিয়ে রাষ্ট্র হ'ল। জমিদার লোক পাঠাচ্ছে সদরে চৈতন্যের নামে বাকি খাজনার মামলা দায়ের করতে। কিছু চৈতন্যসাহার কাছে গেল, কিছু গেল রামচন্দ্রর কাছে। যারা ব্যাপারটি গুরুত্ব বোঝে তারা দিশেহারা হ'য়ে গেল। কিন্তু বিশেষ ক'রে ছেলেছোকড়ার দল তাদের পুরানো যুক্তি আবার তুলল,—চৈতন সা জমি খাবি? তা খাক না, কত খাবি ঐ একটা দাঁত দিয়ে।

একদিন সকালে রামচন্দ্র ক্লিষ্টমুখে দাওয়ায় উবু হ'য়ে বসে তামাক খাচ্ছে। গত সন্ধ্যার কথাগুলি অনেকটা থিতিয়ে গেলেও সমস্যার মতো হ'য়ে আছে। প্রভাতটা আজ তাকে স্নিগ্ধ করেনি। এখনই হয়তা লোকজন কেউ এসে পড়বে আর সঙ্গে ক'রে আনবে তাদের সমস্যা। কাল সন্ধ্যায় কথাটা জানা গেছে হালদার পাড়ার ছ'ঘর লোক চলে যাবে। তা প্রায় পঞ্চাশটি প্রাণী হবে, ছেলে বুড়ো ধ'রে। এদের সঙ্গে রামচন্দ্রর প্রত্যক্ষ জানশোনা ছিল বটে, পরিচয়ের নৈকট্য ছিল না। তা হ'লেও গ্রামের লোক, চিকন্দির লোক তো বটে। ভক্তকামার কি পথই দেখাল! রামচন্দ্র জানে হালদার অর্থাৎ জেলেরা এক-রকম যাযাবর। পদ্মার মাছের সঙ্গে তাদের চলা ফেরা। পদ্মা যখন চিকন্দির দিকে মাটি ফেলে ফেলে সরে যেতে লাগল তখন, এখন থেকে প্রায় দু'পুরুষ আগে, জমিতে মন বসিয়ে দেয় এরা। কিন্তু জাত চাষী হ'য়ে উঠতে পারে নি। খেতখামারে এমন কিছু বাড় বাড়ন্ত হয় নি। আমসি আর ভাত খেয়ে ঝড়ো বাদলায় দিনরাত জলে স্যাৎসেতে হাত পা নিয়ে মাছ ধ'রে টাকা উপায় ক'রে ঘরে ফিরে এনে দু'দিনে সে টাকা ফুরিয়ে হা অন্ন অন্ন করতে করতে জলের দিকে ছোটা এদের রক্তে। খেতখামার করার সময়েও তাই করেছে। কিন্তু শত হ'লেও গ্রামের লোক, যাবার কথায় শূন্য মনে হয়।

কিন্তু যে লোকটি তখনই এল তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য রামচন্দ্র প্রস্তুত ছিল না। পরিচ্ছন্ন কাপড়-জামা পরা একটি প্রৌঢ়।

—আপনে রামচন্দ্র?

—জে। আপনে?

আমি চড়নকাশির আলেফ সেখের ভাই এরফান সেখ।

রামচন্দ্রর বুকটা ধক্ ধক্ করছিল, হয়তো বা থানার লোক ভদ্রবেশে এসেছে। ভয়টা কেটে যেতে সে আগন্তুককে উপলক্ষ্য ক'রে অজস্র হেসে ফেলল। কথা বলার আগে সুচারু রূপে গোঁফের কোন-ডুটি পাকিয়ে সে বলল,—আসেন মিঞাসাহেব, এমন সৌভাগ্যি কেন্। এরফান বলল,—বড়ভাই ক'লে যে বা এরফান একবার চিকন্দি, সেখানে চাষীরা নাকি জমিজিরাৎ ছিটায়ে ছড়ায়ে দিতেছে।

—কেন্, তা দেয় কেন্?

—তারা ব'লে চলে যাতেছে?

—আপনেরাও শুনেছেন?

—হয় ভাবলাম, খানটুক্ জমি যদি ধরা যায়।

রামচন্দ্রর মনে হ'ল সে বিদ্রূপ ক'রে বলবে—জমি কি পদ্মার ভাসা কাঠ, ধরলিই তোমার হ'ল। কিন্তু আগন্তুকের প্রতি অশ্রদ্ধা জানানো হয় বলে সে সংযত হ'ল, বলল—শুনছি ওরা কে কে যাবি! তা খোঁজ নেন, কিন্তুক সে সব জমি খাইখালাসি বাঁধা, জব্দ-সামিল।

এরফান ঘনিষ্ঠ হওয়ার ভঙ্গিতে হেসে বলল,—খাইখালাসি ছাড়াও তো কিছু কিছু জমি আছে, তাইলে আর আপনার কাছে আসছি কেন্?

ইঙ্গিতটা ধরি ধরি ক'রেও ধরতে পারল না রামচন্দ্র, কিন্তু কথাটি যে ইঙ্গিত-প্রাণ তা বুঝতে পেরে মণ্ডলী কায়দায় বলল,—আচ্ছা সে রকম যদি খোঁজ পাই কব আপনেক।

এরফান সেখ কুমোরপাড়ার দিকে চলে গেল। সে চলে যাবার পর ইঙ্গিতটার অর্থ ধরা দিল

রামচন্দ্রর কাছে। সে স্বগতোক্তি করল,—কেন্‌রে, আমার জমি বুঝি ধরতে আসছিল? একটা অপমান বোধ হ'ল রামচন্দ্রর।

কোন কোন দিন মানুষের জীবনে অভূতপূর্ব বেদনা নিয়ে আসে। আত্মীয়বিয়োগের ব্যথা এ অর্থে অভিনব নয়। সে শোকটা মানুষের পরিচিত, হাহাকার ক'রে কেঁদে শোকপ্রকাশ করার পথটা মানুষের জানা আছে। কিন্তু সারাদিন ধ'রে রামচন্দ্র যে ক্লেশটা অনুভব করল সেটা কোনভাবেই নির্দ্দিষ্ট করা গেল না।

দুপুরের ঠিক পরেই হালদার পাড়ার লোকরা চিরকালের জন্য গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। মলিন শীর্ণ কতগুলি নরনারী শিশু। তাদের যাবতীয় পার্থিব সম্পদ ছোট ছোট মলিন কাঁথা কাপড়ের পুটুলিতে বাঁধা। তাদের যাওয়ার পথ রামচন্দ্রর বাড়ীর পাশ দিয়ে। একটা কান্নার মতো শব্দ হ'চ্ছিল। খবর পেয়ে রামচন্দ্র দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যারা চলে যাচ্ছিল তারা সকলেই মাটির দিকে চোখ নামিয়ে নিল যেন সম্মুখের পথ অত্যন্ত পিছল।

রামচন্দ্র ছটফট্ করে ঘরবার করতে লাগল। কারণ-অকারণে অত্যন্ত পরিচিত দৃশ্যগুলিতে তার চোখ গিয়ে পড়ল। আকাশের সর্বদাই পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে, কিন্তু তার বাড়ীর সম্মুখে গাছগুলির মাথা দিয়ে ঘেরা আকাশটুকুকে সীমা-সহরদ্দ যুক্ত জমির মতোই আপনার ব'লে বোধ হ'তে লাগল।

সন্ধ্যায় আর একজন লোক এল তার কাছে। এ লোকটি তার পরিচিত। মাণিকদিয়ারের হাজি-সাহেবের ছেলে ছমির মুন্সী। লোকটির সাথে রামচন্দ্রর আবাল্য একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব আছে। পাঠশালা থেকে চাষী জীবন পর্য্যন্ত। দিনকাল যখন এদেশের ভালো ছিল, রামচন্দ্র তাই মানিকদিয়ারের কোলঘেসে জমি নেবার চেষ্টা করত আর ছমির চেষ্টা করত চিকন্দি অনুপ্রবেশে। এ ব্যাপারটা নিজেদের অজ্ঞাতেই হ'ত মাঝে মাঝে।

ছমির হাঁক দিয়ে বলল,—কেন্, রামচন্দ্র আছে?

—কে, ছমির ভাই, না?

—হয়। বারও দেখি।

—কি মনে ক'রে।

রামচন্দ্র বারান্দায় এসে ছমিরকে বসতে দিল।

ছমির রামচন্দ্রের দেয়া তামাকের কলকেটি নিঃশেষ করে বলল,—ওপারে কবে যাবা?

—যাব একদিন, সেদিন খবর পাবা; হরিধ্বনি দিবে।

—আরে, সে পার না; মিলে কবে যাবা?

—মিলে? তুমি বুঝি জমির খোঁজে আসছ?

—তা দেখ তোমাকে কওয়া থাকল ভাই, যে যাই দিক, তার উপর বিঘায় পাঁচটাকা দাম ধাইরয থাকল আমার। তোমার জমিগুলে সোনা। আর কেউ না জানুক আমি জানি।

জমির প্রশংসায় রামচন্দ্রের মন গলে গেল। ছমিরের জমি কেনার কথায় যে জ্বালা সুরু হ'য়েছিল তার কিছুটা প্রশমিত হল।

রামচন্দ্র বলল,—তামাক দি?

—না যাই এখন। কওয়া থাকল ভাই, সেটা মনে রাখো।

ছমির চলে গেলে জমির প্রশংসাসূচক কথা কয়টি খানিকটা সময় রামচন্দ্রর মন জুড়ে রইল। অনেকদিন জমির দিকে এমন অনুভবটা হয় নি, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুর্দম্য ক্ষোভ এল তার মনে। মুঙলা পাটের সুতলী পাকাচ্ছিল, তাকে লক্ষ্য ক'রে রামচন্দ্র বলল,—কেন্‌রে একি ভাগাড়, শকুন উড়ে?

কথাটা বুঝতে না পেরে মুঙলা মুখ তুলল, ততক্ষণ রামচন্দ্র সরে গেছে।

রাত্রিতে রামচন্দ্রর স্ত্রী বলল,—কথা কই তোমাকে!

—কও

—তুমি কি যাবাই?

—কি করি কও, বুঝি না। থাকে কি করি, যায়ে কি করি।

—বৈষ্ণবী আসছিল, কয় যে তুমি চলে গেলে কার ভরসায় গাঁয়ে থাকব।

—হুম্।

—আর কয় সেগানে মিয়েছেলের লজ্জা-হায়া থাকে না। পচ্ছিমাদের তাড়ি খাওয়া আছে। সেখানে নাকি তুলসীবোনার জায়গা নি।

রাত্রিতে ঘুম হ'ল না রামচন্দ্রর। ওরা যখন প্রস্তাব করেছিল তখন সে বলিষ্ঠভাবে কিছু বলতে পারে নি—নিজের এই দুর্বলতাটি এখন অতলস্পর্শী ব'লে মনে হ'ল তার। এর থেকে উঠবার জন্য তার মন অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় আঁকুপাঁকু করতে লাগল।

এরফান সেখ এবং ছমির মুন্সির কথা মনে হ'ল। জমি, জমি, বুকের হাড় ভেঙে নিতে চায় ওরা। হায় ভগোমান্, হায় ভগোমান্।

পরদিন সকালে দেখা গেল রামচন্দ্র লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে বার হয়েছে; একটা বলদ ও একটা বুড়ী গাইকে মুঙলা বাঁচিয়ে রেখেছিল, সে দুটিকে তাড়িয়ে নিয়ে খেতের দিকে যাচ্ছে।

কিছুদূর যাবার পর লজ্জায় যেন তার মাথাটা নুয়ে আসতে লাগল। কি বলবে লোকে—গ্রামের সব মাঠ যখন আগাছায় ঢেকে আছে, তখন ভাঙা নড়বড়ে লাঙ্গল নিয়ে সে বেরিয়েছে বেহালের গোরুবলদে ভুঁই চাষ করতে। এতবড় শোকটাও কি তবে তার লাগে নি। ম্লান প্রাণে আকাশের দিকে মুখ তুলে সে অনুচ্চারিত উৎক্রোশ কণ্ঠে বলতে লাগল,—কি উপায় আছে কও, যাবের পারব না যে।

কিন্তু জমির উপরে লাঙ্গল নামিয়ে গোরুবলদকে যোয়ালে জুড়তে জুড়তে হঠাৎ তার শিরা উপশিরাগুলো বিস্ফারিত হ'য়ে গেল আরও গভীর রক্তপ্রবাহের পথ করে দিতে। মুঠি দিয়ে দৃঢ়ভাবে লাঙ্গলটা চেপে ধরা নয় শুধু, আরও কঠিন ক'রে ভূমিকে পীড়িত করতে লাঙ্গলের পিছনদিকের বাঁকা অংশটিতে পায়ের চাপ দিতে লাগল রামচন্দ্র। তার মনোভাবটিকে রুদ্ধ আক্রোশের কাছাকাছি বলা যায়, কিন্তু যতনা আক্রোশ তার চাইতে বেশী অভিমান।

একটা বেলা হ'তেই রামচন্দ্রর পাড়ার লোকরা দেখল, রামচন্দ্রর একটা জমির আধাআধি লতাঘাসের জঙ্গল উপড়ে গিয়ে কালো কালচে জমি বেরিয়ে পড়েছে। হ'ক নাবলা, মণ্ডল চাষ দিছে, বৈশাখের বাতাসের মতো খবরটা হাল্কা হ'য়ে উড়তে লাগল।

মুঙলা সকালেই বেরিয়েছিল, আজকাল প্রায়ই তার সঙ্গে একটি ছোট সমবয়সী মানুষের দল থাকে।

সেই দলটি নিয়ে সে এসে দাঁড়াল খেতের ধারে। দৃশ্যটার বিস্ময় কাটলে মুঙলা বলল,—শুনেছ, না, বাবা, চৈতনসা পুলিশে খবর দিছিল, পুলিশ আসে না। জমিদার সদরে লোক পাঠাইছে নালিশের জন্যে। জমি খাস, টাকা জব্দ।

—তারপর?

—কয় চৈতন্য সাহা: বাপ সকল এই এক বছর তোমরা খাইখালাসিগুলা নিজের জমি মনে ক'রে চষে দাও; এক বছরের ফসল শুধু আমি নিব, তোমাদের সব দেনা ওয়াশিল; জমিদারের খাজনা শোধ করব।

—আমরা যে খাটব তার দাম? হেদি। তারপর?

—ক'লাম লেখো নোতুন দলিল। তিরিশ টাকায় তিনবছর খাইখালাসি, বিশ টাকা ওয়াশিল পাইছ লেখো। নোতুন দলিলে শুধু দশটাকার কথা থাকবি।

—সে তো অমনি ফিরবি। ডানি-ডানি। এক বছর পরতো জমি আপনি ফিরবি। তারপর কি হ'ল কও।

—ক'লাম। ছিদামও কলে; একসন তোমার জমিতে খাটব খোটব, খাবার ধান দিবা।

—ক'স কি? হেদি-ভোর।

—ক'লে; রাজি, রাজি। কলে: বাপ সকল, আর এক কথা,—গান করবা না।

রামচন্দ্র গাঁক গাঁক করে হেসে উঠল।

মুঙলা যথাসাধ্য গম্ভীরমুখে তার বিজয় কাহিনী বর্ণনা করল,—ক'লাম কিন্তক সাজিমশাই, ঢোল তোলা থাকবি ঘরে, রামশিঙা গোঁজা থাকবি বাতায়। কয় যে: হবি, হবি, সব হবি। বাপ সকল, গান থামাও। আলেফ মিয়াও দাড়ি ভাসায়ে নাচে নাচে গান শুনায়। কয়, আমাকে হাড় চুষে খাতে দেখেছে।

রামচন্দ্র বজ্রের মতো ফেটে পড়ল হাসিতে, যেমন ভাবে আকাশ ফেটে বৈশাখী ধারাবর্ষণ সুরু হয়।

(ক্রমশঃ)

"জীবন এবং সৌন্দর্য্য এই অসীম জীবলোকের উপর একটা চিত্রিত পর্দা ফেলে রেখেছে—কোনো নিষ্ঠুর দেবতা যদি হঠাৎ একদিন সেই লাবণ্যময় চর্মযবনিকা সমস্ত নরসংসার থেকে উঠিয়ে ফেলে, তাহলে অকস্মাৎ দেখতে পাওয়া যায় আরক্ত অধর-পল্লবের অন্তরালে গোপনে বসে বসে শুষ্ক শ্বেত দন্তপংক্তি সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে।"

—রবীন্দ্রনাথ ॥

ঝড়ের পরে

রাণু ভৌমিক

এক মুহূর্ত্ত আগে আচমকা কোন নোটিশ না দিয়েই স্বরু হয়েছিল কালবৈশাখীর প্রলয় নৃত্য। রেসের দৌড় স্বরু হয়ে গিয়েছিল ধূলায় আর গাড়ী ঘোড়ায়। দোকান পাট বন্ধ হবার ধ্বনি, দ্রুত পদবিক্ষেপ, হর্ণের ঐক্যতান। এর মধ্যেই নামলো জল। রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, গাড়ীগুলি যাচ্ছে আসছে, কোথাও কোথাও আচম্‌কা দাঁড়িয়ে গেছে বড় বড় গাড়ী। লোকজন সব এদিক ওদিক গাড়ী-বারান্দার তলায়, দোকানের সামনে জটলা করছে। অসময়ের বৃষ্টি এত অস্থবিধায় ফেলেছে সবাইকে, তবু কারও মুখে অনুযোগ নেই। সে যে বহু প্রার্থিতা অভিসারিকা।

আমরা তুজনেও ছুটতে ছুটতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম এক ভাঙ্গা বাড়ীর নীচে। নীচে ঠিক নয়—দরজা খোলাই ছিল—সিঁড়িতে উঠবার পথে সরু এবং নোংরা প্রবেশপথ। সেই পথেই দাঁড়িয়েছিলাম আমরা তুজন। বর্ষণ কমে বিতুৎতের চমক স্বরু হলো। সেই আলোতে একটা জিনিস দেখে শরীরের রক্ত আমার হিম হয়ে গেল। সঙ্গীকে ধাক্কা দিয়ে বল্লাম—

‘এ কোথায় এসেছি জানিস্?

“কোথায়?”

উত্তর দিতে দেখলাম, সিঁড়ির আলোটা জ্বলে উঠেছে। ম্লান নিষ্প্রভ দীপ্তি সে আলোর। তদপেক্ষা দীপ্তিহীন আলোর নীচে যে দাঁড়িয়ে আছে সে। কায়াহীন ছায়ার মত সে নারী। নারী? —নারী কি? হাঃ, নারীই বটে, তবে তার নারীত্বের প্রমাণ তার অঙ্গ নয় অঙ্গাবরণ। কে সে? কার কন্যা, কার ভগ্নী, কার প্রিয়া, কার মাতা! কে সে? ভাল করে একবার তার দিকে তাকালুম—তার পরিচয় লেখা আছে তারই মধ্যে—তার লজ্জাহীনতার নির্লজ্জ অভিসারে, দারিদ্রের চিরন্তন অক্ষরে আর সঙ্কোচহীন, অপরিসীম শঙ্কায়। ধীরে সে বললো—

“আপনারা আমার ঘরে আসবেন!”

আকস্মিক আবির্ভাবের চেয়ে ওর আহ্বান আমাকে আরও চমকে তুললো। আহ্বানের বিষয়বস্তু নয়—কারণ, সে কথা আগেই অনুমান করা গিয়েছিল—কণ্ঠ। চিরদিনই কণ্ঠ আমার নিকট বক্তার চরিত্র বহন করে আনে। আর একি কণ্ঠ? যার দেহে রূপের গভীরতা নেই, যৌবনের উজ্জ্বলতা নেই, বয়সের পরিমাপ নেই, সে এ কণ্ঠ কোথায় পেল? তবে কি তার আত্মা দেহকে ত্যাগ করে দেহাতীত কণ্ঠকে আশ্রয় করেছে। পারিপার্শ্বিক তার দেহকে বিনষ্ট করেছে সত্য কিন্তু সেই অপূর্ব্ব কণ্ঠাশ্রয়ী আত্মা অবিনশ্বর। কল্পনায় ছবি ভেসে উঠতে লাগল, আত্মার সেই অপরূপ রূপ! কিন্তু—কিন্তু—সে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।

বিরুদ্ধ প্রকৃতির বাস্তব এক মুহূর্ত্তেই কল্পনাকে দেশ ছাড়া করলো। মেয়েটি বোধ হয় পূর্ব্বের অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছিল—হঠাৎ থেমে গেল। কিছুটা সময় তাকিয়ে রইল সমীরের

মুখের দিকে। তরল দৃষ্টি কঠিন হয়ে এলো—তুধ যেন ধীরে ধীরে জমে দই হলো। কণ্ঠ নয় যেন তীক্ষ্ণ তরবারি—

“কে? ডাক্তারবাবু না?”

অবাক হয়ে তাকালুম মেয়েটির দিকে। সত্য কথা যে, সমীর ডাক্তার। কিন্তু, সে পরিচয় কিছু তার গায়ে লেখা নেই। মেয়েটি এভাবে কথা বললো যেন সমীরের ডাক্তার পরিচয়ই তার নিকট একমাত্র সত্য। সমীরকে আমি যতটুকু জানি, এ পাড়ায় এভাবে চিহ্নিত হবার মত ছেলে সে ত……

চিন্তায় বাধা পড়লো—কানে এলো—

“আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না—না? না পারাটাই সম্ভব, একবার মাত্র দেখে কি কেউ কাউকে মনে রাখতে পারে? আমি কিন্তু ভুলি নি। কারণ, আপনি যে আমার জন্মদাতা”—

দ্রুত পাদবিক্ষেপে ওপরে চলে গেল সে। শুধু, তার শেষ শান্ত কথা তুটির ইঙ্গিত যেন ঘুরে বেড়াতে লাগলো চুনবালিহীন দেয়ালের গহ্বরে, ওঠা নামা করতে লাগলো সিঁড়ির ধাপে ধাপে, আর অটল স্থির দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল বাতির শিখায়।

বৃষ্টি কমে গেছে। আমরা বেরিয়ে এলাম। কেমন ভাবে যেন চুপ করে রয়েছে ও। কাউকে সাঁতার শেখাতে যেয়ে অকস্মাৎ তার মৃত্যুর কারণ হলে যেমনি হয় তেমনিই মুখের ভাব ওর। একটা ট্যাক্সী নিলাম। ওকে একটা নাড়া দিয়ে বললাম—

“কি ব্যাপার বল তো?”

এক মুহূর্ত্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইল ও। বললো:

“শুনতে খুব কৌতুহল হচ্ছে, না?”

“স্বাভাবিক।”

“আচ্ছা, তবে শোন্”—

* * * * *

“চার বছর আগে অর্থাৎ সত্ত ডাক্তারী পাশ করে আমি যশোহর জেলায় এক গ্রামে কাজ পেয়েছিলাম। ছোট একটা হাসপাতালের ইনচার্জ্জ। বাইরে ‘প্র্যাকটীস্’ করা নিষেধ ছিল না। সেদিন সন্ধ্যাবেলা নিজের ‘চেম্বারে’ বসে আছি—একটি মেয়ে ঢুকলো। কিশোরী কন্যা রূপহীনা কিন্তু যৌবন বিপণি-সম্ভার সাজিয়ে সে দেহকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সাগর-উর্ম্মির মত উচ্ছলতা তার সর্ব্বদেহে। আমি কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই ও বলতে লাগল—

“আমি আবাঞ্ছিত ভাবে মা হতে চলছি, আপনি আমাকে মুক্তি দিন।”

আশ্চর্য্য—অশ্রুহীন, আকুতিহীন, নিষ্কম্প সে স্বর। ঘৃণায় আমার সমস্ত শরীর রি রি করে উঠলো। বললাম—

“তা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না”,—বলে, কথাটা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে এভাবে একটা বই টেনে নিলাম।

কিন্তু, শেষ করতে চাইলেই ত' আর শেষ হয় না। তাই, তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন শুনলাম—

"কেন ?"

"কেন ?"—অপরাধিনী আবার এই প্রশ্ন করতেও সাহস করে। ভ্রুটা আমার বেঁকে উঠলো বিরক্তিতে, তবু, নিজকে যথা সম্ভব সংযত রেখে বললাম—

"আইনের চোখে আমি অপরাধী হতে পারব না।"

"আইন !"—একটুকরো নিঃশব্দ হাসি ও হাসলো : "জীবনের চেয়ে আইন কি বড় ?"

"সে প্রশ্ন এখানে উঠছেই না—কারণ, এখানে জীবন রক্ষার জন্যই আইনের সৃষ্টি হয়েছে।"

এক মুহূর্ত্ত ও চুপ করে রইলে। পরে, বলল "আমার যদি টাকা থাকতো তবে দেখতুম, এই আইনের প্রশ্ন কোথা দিয়ে গড়িয়ে যায়।"

ওর প্রগলভতায় এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে অসহ বিস্ময় আমার মনে জমা হচ্ছিল এই এক কথায় তা যেন দুঃসহ ক্রোধে পরিণত হলো। চীৎকার করে বললাম—"দুনিয়ার সব কিছু কি টাকা দিয়ে পাওয়া যায় ? আপনি এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে চলে যান, নইলে……।"

"নইলে, চাকর ডেকে বার করে দেবেন, এই তো। দেখুন, আমার স্বগতোক্তি আপনার সম্বন্ধে ছিল না, আপনার বিবেক যে অর্থের উত্তাপে গলবে না তা জানি। কিসে গলবে কে জানে! হয়ত ভবিষ্যতে নিজেরই কৃত কোন কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তে। যাক্ সে কথা, কিন্তু, আমি এখন কি করবো আপনি বলতে পারেন !"

মেয়েটির কথায় এমন একটি আন্তরিকতার স্বর, এমন এক বিষাদের ঝঙ্কার ফুটে উঠলো যে, আমার রাগ চলে গেল। বললাম :

"সৃজন যখন করেছেন তখন পালন করার দায়িত্ব আপনারই। ভুলের পথে যাকে এনেছেন ত্যাগের পথেই তাকে সার্থক করে তুলুন।"

আরও অনেক ভাল ভাল জ্ঞানগর্ভ কথা বলেছিলাম, ও তার একটিরও উত্তর দেয় নি। শুধু, ওর মুখে ফুটে উঠেছিল একটুকরো বিষাক্ত হাসি।

একটু সময় সমীর চুপ করে রইলো, পরে ধীরে ধীরে বললো, "সেই হাসির বিষ আজ দেখতে পেলাম বিষবৃক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামান্য একটু ভুল, যার মুলে প্রেম ছিল কি প্রতারণা ছিল তা আমি জানি না,—তারই মাশুল গুনবে ও সারাজীবন ভরে।"

আমি হেসে উঠলাম, এবং আমার কণ্ঠ প্রাচীন শাস্ত্রকারদের অনুকৃতি শোনাল আমারই কাছে। আর তা থেকে অব্যাহতি পাবার আশায় বললাম "মেয়েটি যা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল তা ত হয়েই গেছে—তবে আর কি ?"

সমীরকে এত অসহায় দেখালো যে, ওর সাহায্যার্থে পুনরায় আমাকে বলতে হলো : "কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত ত' হল—কনফেশানে !"

সমীর প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল কিন্তু ট্যাক্সী তখন ঠিকানায় পৌছে গেছে।

সাংস্কৃতিকী

২২শে শ্রাবণ

২২শে শ্রাবণ, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর তিক্ত তিথিতে, একটি কথা আমাদের ভেবে দেখা উচিত, যে, তেরো বছর আগে এদিনে আমরা বস্তুত কাকে হারিয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কে ছিলেন এ প্রশ্নটাই আমাদের মনের গভীরে পাঠানো দরকার। তিনি আমাদের কতোটুকু ঐতিহ্য এবং কতোটুকু বা বর্ত্তমানের শক্তি ছিলেন, এ-কথা যদি জানতে না পারি তাহলে তাঁর সম্পর্কে উৎসাহ আর নিরুৎসাহ একই কথা। জেনে কি করব, না-করব, সে বিচার পরে আসবে—আগেকার আসলটুকু হল তাঁকে জানা।

রবীন্দ্রনাথ ঋষি, দেবতা, অতিমানব, অবতার প্রভৃতি কিছুই ছিলেন না। ছিলেন কবি, যে কবি একটি জাতির প্রাণে শক্তি-দান করবার কামনা করতেন। এ-কামনা জনসাধারণের কণ্ঠ থেকে স্ফুরিত হতেও শোনা যায় এবং বিশশতকের অনেক বাঙালীর মুখেই আমরা তা শুনেছি। কিন্তু তাঁরা রাষ্ট্রনৈতিক নেতা—তাঁদের প্রচেষ্টাও বাঙালীর রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম্মোদ্যমে সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি কোন বিশেষ নীতির উপর নির্ভর করে বাঙালীকে প্রাণশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি। তবু যদি নীতির প্রস্তাব ছাড়া আমরা রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে না চাই, তাহলে বলব, তিনি মনোনীতির পরিপোষক ছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর সমৃদ্ধচিত্ততা কামনা করে গেছেন, যেহেতু তিনি নিজে চিত্তের সমৃদ্ধিতে অতি উচ্চ স্থানে যেতে পেরেছিলেন। অন্যান্য নীতির দোষ এই, নীতির নেতারা নীতির খুব উঁচুস্তরে উঠ্‌তে পারেন না। ফলত দেখা যায় সে-নীতি ও সে-নেতা একটি দেশের মনে ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী আসন লাভ করতে অসমর্থ। শিল্পের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাপার হয়ে থাকে। কোন শিল্পী যখন একটি নীতির পরাকাষ্ঠা দেখাতে সমর্থ হন, তখন তিনি মহৎ শিল্পী আখ্যা লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ যে ধরনের মহৎ শিল্পী সে-ধরনের মানবের আবির্ভাব বিশ্বক্ষেত্রে খুব কম সংখ্যকই হয়েছে।

এই শিল্পী যখন শিক্ষিত জনসাধারণের বোধাতীত ও দুর্দ্ধর্ষ বুদ্ধিজীবীর বিচারে উপহসিত হন তখন অবাক হয়ে ভাবতে ইচ্ছা করে আমরা বুঝিবা নেহাৎ একটা হট্টগোলের সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছি। স্থির চিন্তা, মনন, প্রাণবত্তা প্রভৃতি হারিয়ে গোলমালের তরঙ্গে ভেসে পড়া আমাদের নিয়তি হবে কি না তা ই আজকের দিনে বিবেচ্য। তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে আমরা তাঁকে যতোটুকু লাঞ্ছিত করি, তাঁর প্রতিকৃতি পূজা করেও ততোটুকুই গঞ্জনা দিই।

মানুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর জীবনে ব্যর্থ। কারণ আজ বাঙালী সর্ব্বাধিক নিষ্প্রাণ জাতি। কিন্তু প্রাণশক্তির কবি হিসেবে তিনি সম্ভবত বাংলার কবিতার ক্ষেত্রে আজও ব্যর্থ নন। আজকের ভাষা রবীন্দ্রনাথের ভাষা নয় কিন্তু আজকের ভাষাতেও যাঁরা সুন্দর কবিতা তৈরী করতে পারছেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রাণবত্তারই উত্তর-সাধক। মুষ্টিমেয় কয়েকজন কবি যদি রবীন্দ্রচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাব্য-সাধনায় বদ্ধপরিকর হন তাহলেই যে জাতি প্রাণবন্ত হয়ে উঠ্‌বে এমন মিথ্যা আশা করে লাভ নেই। কবিতার প্রতি অরুচি, যে অরুচি মনোচর্চ্চার অভাব থেকে ঘটে থাকে, যতোদিন না সাধারণ শিক্ষিত

সমাজ দূর করতে পারছেন, ততোদিন কোনো কাব্য- প্রচেষ্টা জাতিকে প্রাণ-শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথের সময়কার সমাজ কাব্যে যতোটুকু আগ্রহশীল ছিল—এখনকার সমাজ কাব্যে ঠিক ততোটুকু বীতশ্রদ্ধ। কি-কি বাস্তব কারণে মানসিকতার এই পট-পরিবর্ত্তন, তার একটা ফর্দ্দ তৈরী করা যায়, কিন্তু সে ফর্দ্দের ব্যাপারে সোপর্দ্দ করব কোন্ দায়রায়? কবিতার দায়ভার কে গ্রহণ করবেন? তবু একটি কারণ এখানে উপস্থিত করছি। কবিতার পাঠক পূর্ব্বাপর মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই শ্রেণীটি বাঙলায় ইদানীং অন্তর্দ্দশায় উপস্থিত। মনোচর্চ্চা দূরে থাক, তাঁরা ক্রমেই মন হারিয়ে ফেলছেন। কোনো একটি শ্রেণীর সর্ব্বান্তঃকরণ সমর্থন না থাকলে যেমন রাষ্ট্রের ভিত শক্ত হয়না, তেম্নি কোনো একটি শ্রেণীর পোষকতা ব্যতিরেকে শিল্প-সাহিত্যও সমৃদ্ধ হয়না।

কবিতার প্রতি অনাদর ও উপেক্ষা দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ব্যাপারটা অন্তঃসার-শূন্য। এ-শ্রদ্ধার যেম্নি মানে নেই, তেম্নি নেই মান বা পরমায়ু। অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে যদি আমরা দেবতা বানিয়ে রেখে দিই, তাহলে বহুদিন কাঁসর ঘণ্টা বাজবে। সে-ধ্বনি রবীন্দ্রনাথ অন্তত জীবদ্দশায় পছন্দ করতেন না।

রাষ্ট্রনীতি ও উপন্যাস

জীবনের উপর রাষ্ট্রনীতির ছায়া যে কী প্রবল তা গত-শতক অবধি রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ভিন্ন অন্য কেউ খুব স্পষ্ট দেখতে চাইতেন না। কথাসাহিত্যিক-মহলে এই ছায়াটি চিন্তনীয় বিষয় হিসেবে প্রবেশ করে ফরাসী ঔপন্যাসিক স্তাঁদালের মারফৎ। পথ-প্রদর্শকের যে দুর্ভাগ্য তা স্তাঁদাল ভোগ করে গেছেন। তিনি যে-শ্রেণীর জন্য রাষ্ট্রনৈতিক জীবন তাঁর গ্রন্থে পরিবেষণ করেছিলেন সে-শ্রেণী এই নগ্ন জীবন-দর্শনে রাজি হননি। নিকট অতীতকে উপন্যাসে রূপায়িত করবার দক্ষতা ও সাহসিকতার জন্যে স্তাঁদাল ফরাসী-উপন্যাসকারদের নিকট এখন স্মরণীয় হচ্ছেন। আজ উপন্যাসের পাঠকরা জানেন যে তাঁদের পরিচিত পরিবেশ থেকেও উপন্যাসের উপাদান আহৃত হতে পারে। ভূত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালেই ঔপন্যাসিকের মন বিচরণ করে থাকে। যাঁর মনের উপাদান বর্ত্তমানে স্থিত, তিনি বর্ত্তমানের সুখদুঃখের আলোচনা করেন, যিনি ভবিষ্যতে ভীত, তিনি ভবিষ্যতের করাল চিত্র পরিবেষণ করেন।

আমাদের এখনকার বাংলা-উপন্যাসে ত্রিকালদর্শীরা বিরাজিত। এখনকার সামাজিক রুচি যখন ত্রিধা বিভক্ত, তখন উপন্যাসের এই পরিণতি অস্বাভাবিক নয়। তবে অতীত-প্রীতিটা নেহাৎ নাবালক মনোবৃত্তি, বার্দ্ধক্যের একটি সহজাত সহচর। ভবিষ্যৎ-ভীতিও সুস্থ, শক্ত মনের পরিচায়ক নয়। তাছাড়া, ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা করার কোনো হেতুই যদি বর্ত্তমান জীবনে খুঁজে না পাওয়া যায় তবে এসব কাল্পনিক ব্যাপার শুধু অসার্থক নয়, অহিতকর। উপন্যাসে কল্পনার স্থান আছে কিন্তু তা নক্ষত্রলোকে প্রসারিত করা যায় না। আজগুবি গল্প শোনান আর উপন্যাস-রচনা আলাদা জিনিষ।

এ-শতক এখন মধ্যাহ্ন কাল যাপন করছে। বাংলাদেশের পক্ষে শতকের মধ্যাহ্নে আগ

নিরুপদ্রব ছিল না। রাষ্ট্রনীতির ছায়া-উপচ্ছায়াতে উদ্‌ভ্রান্ত থাকতে হয়েছে বাঙালীকে দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর। বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যেও রাষ্ট্রনীতি ছায়া-পাত করেছে। বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম্মকৃতির আলেখ্য অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে পরিবেষণ করেছেন প্রথম শরৎচন্দ্র। তাঁকে আজ আমরা স্তাঁদালের মতোই স্মরণ করতে পারি।

শরৎচন্দ্র এ উপন্যাস লিখে ব্রিটিশের শাসনকে শ্লথ করে দিন আর না-ই দিন, এ-উপন্যাস যাঁদের জন্যে লিখিত তাঁরা সবাই এর আবির্ভাবে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। রাষ্ট্রনীতিগত জীবনও যে উপন্যাসের চমৎকার বিষয় হতে পারে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' প্রকাশের আগে বাংলা সাহিত্যের গালগল্প-প্রিয় লেখক বা পাঠক হয়ত এ-কথা হৃদয়ঙ্গম করেন নি। সমাজ-সচেতন ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র যদি 'পথের দাবী'র পথে পা না বাড়াতেন, তাহলে আজ বলতাম যে তাঁর সমাজ-সচেতনতা পুর্ণতা-প্রাপ্ত হয়নি। 'পথের দাবী'-তে যে কল্পনার প্রশ্রয় ছিলনা এমন নয়, তবু তা এমন উঁচুতে নয় যে মাটিতে পা রেখে হাত বাড়িয়ে নাগাল পাওয়া যাবে না।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর গত মহাযুদ্ধের সময়টাতে নানা ধরনের রাষ্ট্রনীতি নিয়ে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা আপন-আপন সচেতনতা ব্যক্ত করেছেন। সে-সচেতনতায় কে কতোটুকু খাঁটি বলা মুস্কিল। জোরে যখন রাষ্ট্রনীতির এলোপাতাড়ি হাওয়া বইছে, তখন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির প্রতি স্থির দৃষ্টিতে অনেকেই তাকাতে পারেন নি। তাছাড়া বাংলার স্বকীয় সন্ত্রাসবাদকেও অনেকে খাঁটি মূল্য দান করতে সমর্থ হননি। খাঁটি মূল্য-দান মানে সামাজিক মনের উপর তার প্রভাব বর্ণনা। প্রভাব মানেই যে শুভদৃষ্টি, তা নয়। মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনে সন্ত্রাসবাদ সুখের চাইতে দুঃখের বোঝা-ই বেশি চাপিয়ে দিয়েছে। রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে যে সমাজ-জীবন বনিবনাও করে চলতে পারছেনা, ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে সর্ব্বপ্রথম এ-দৃশ্যটিই উপস্থিত হয়। স্তাঁদাল বা শরৎচন্দ্রের মনে যদি তা উপস্থিত না হত, তাহলে তাঁরা রাষ্ট্রনীতিকে উপন্যাসের বিষয়ীভূত করতেন না। ঔপন্যাসিকের মনে সমাজই দেবতা—আর সব অপদেবতা বা উপদেবতা।

সাম্প্রতিক কালে রাষ্ট্রনৈতিক জীবন বিবৃত করে যতোগুলো উপন্যাস বাংলা ভাষায় লিখিত হয়েছে তার ভেতর একটি উল্লেখ্য উপন্যাস শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'কৃশানু'। গত আন্দোলন থেকে সুরু করে ইদানীংকার বাঙালী জীবন রাষ্ট্রনীতির বাত্যায় যে অকূলে পথ হারিয়ে ফেল্‌ছে তারই চিহ্ন দেখতে পেলাম 'কৃশানু'-তে। যা জ্বলে ওঠে তা-ই যে গৃহাগ্নিবৎ নয়—তা যে আলেয়া-ও হতে পারে, এ-চিত্রটিই লেখক পরিচ্ছন্ন করে এঁকে দেখিয়েছেন এই বই-এ।

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী নবীন ঔপন্যাসিক নন—আমার মনে হল 'কৃশানু'-তে তিনি প্রাণবহ্নি খুঁজতে বেরিয়েছেন। শীতার্ত্তের জন্যে আগুন তিনি পেলেন কি পেলেন না, তা বড়ো কথা নয়—তাঁর মন ও মনন কতোটুকু পথ বিচরণ করল, তা-ই এ-গ্রন্থে দেখবার বস্তু। এ-মন সর্ব্বৈব আজকের দিনের মধ্যবিত্ত বাঙালীর দ্বন্দ্বগ্রস্ত মন। এ-মন অক্লেশে বলতে পারে: "সকল দেশেই জনসাধারণ বলতে এইই বোঝায়: একটা নিষ্ক্রিয়, বাক্‌সর্ব্বস্ব, আত্মসুখপরায়ণ মানবসমষ্টি।" যে মধ্যবিত্ত রাষ্ট্রনেতা এ-সত্য-কথাগুলো মুখে নিয়ে উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরই কর্ম্মকৃতির বিয়োগান্ত দৃশ্যাবলী বিন্যস্ত করে উপন্যাসটির কলেবর নির্ম্মিত। কর্ম্মকৃতি সম্ভাব্যতার ঘর ছেড়ে দূর অতীতে বা ভবিষ্যতে পলায়ন

করেনি। তবু যেন পাঠকচিত্তে কর্ম্মীর চরিত্র সুদূর-পথ-গামী। চরিত্রের সঙ্গে বর্ত্তমানের দূরত্ব-নির্ণয় করাই ঔপন্যাসিকের কৃতিত্বের বা অকৃতিত্বের কাজ। সরোজবাবু এ-দূরত্বের সঠিক সন্ধান পেয়েছেন।

এ-সন্ধান হয়ত তাঁরাই করেন, যাঁরা উপন্যাসকার হিসেবে একটি স্মৃতিস্তম্ভ তুলে যেতে চান। সুতরাং নিজের মনকে ক্ষুদ্রতার অন্ধকারে ঢেকে, অসতের আড়ালে-আবডালে হৃদয় ঝুলিয়ে রেখে এ-কর্ম্ম করা যায় না। বেগের আবেগও দরকার নেই এই শিল্পশালায়। বেগবানরা এ-শিল্পনির্ম্মাণ-কৌশলে প্রবেশই করতে পারেন না। এখানে থাকে মৃদু স্রোত—দিনরাত্রির মতো অলক্ষ্য আলস্য-স্রোত। যাঁরা এতে ক্লান্তি অনুভব করেন, তাঁদের জন্যে বা তাঁদের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ-স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হয়না। বর্ত্তমানের ইতিহাস হিসেবে তা থেকে যায়, যদি অদূর ভবিষ্যৎ এসে তা পরীক্ষা করে এই ভরসায়।

সাহিত্য ও হাস্যরস

ঈশ্বরগুপ্ত মশায় বলে গিয়েছিলেন যে বাংলাদেশ রঙ্গ-ভরা। বাংলাদেশ যে কোন্ কারণবশত রঙ্গ-ভরা হতে পারে তা বোঝা মুস্কিল। একে অপরের দুর্গতি দেখে যদি বাঙালী-চরিত্র কোনো কালে মজা পেয়ে থাকে, তাহলে সেকাল নিয়ে গর্ব্ব করাবার কিছু নেই। যদি বাঙালী নিজেদের দুরবস্থাকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে সে চারিত্রিক দৈন্য প্রশংসার্হ নয়। যদি পরনিন্দায় হাততালি দিয়ে নেচে উঠে থাকে কিম্বা আত্মসুখে ডগমগ হয়ে হাসির লহর তুলে থাকে সে-কর্ম্মগুলোকেও সদ্বৃত্তিজাত মনে করা যায় না। আমি বলতে চাই, চতুষ্পার্শ্ব যদি হাস্যোজ্জ্বল না থাকে তাহলে হাসাহাসির কোনো মানে নেই। তেমন দিন বাঙালীর ছিল কি?

আজ আমরা প্রচুর হাস্যরসের সাহিত্য ও কথাবার্ত্তা দেখতে শুনতে পাই। অথচ আমরা সবাই জানি বাংলাদেশ নানা দিক থেকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত। সম্প্রতি একটি সাহিত্য-সভায় বক্তৃতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুনে এলাম। তরুণ বয়স্ক প্রত্যেকটি বক্তাকে লোক-হাসাবার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর দেখে আমার মনে হল, আমরা সম্ভবত আজ সত্যি হাস্যাস্পদ হয়ে চলেছি। বাঙালীকে আজ গোপাল ভাঁড়ের ঐতিহ্যরক্ষক বলাই সম্ভবত উচিত।

বিদূষকরা বিশেষভাবে দোষ-কীর্ত্তন করে লোক হাসাতেন। গুপ্ত-রাজ আমলে কবি কালিদাস যে রঙে বিদূষক চিত্রিত করেছেন, গথ-রাণীর আমলের কবি সেক্সপীয়রও অনেকটা তেমন রঙেই বিদূষক চরিত্র বা হাস্যরস নিবেদন করেছেন। রাষ্ট্রকর্ণধারদের বা সামাজিক রীতিনীতির দোষ কোথায়, বিবেকী বিদূষক তা হাসির মুখোসে নিবেদন করত সাহিত্যের মারফৎ রঙ্গমঞ্চে। তরলমতি দর্শকরা বিদূষকের রঙ্গভঙ্গ দেখে হাসতেন কিন্তু বোদ্ধা ও রসিক দর্শক হাসির আড়ালে রসাস্বাদ পেতেন, অতীত বা ভবিষ্যতের একটা আশঙ্কা নিয়ে। এ-হাস্যরসের মানে আছে। কিন্তু আজ হাস্যরসের নামে সভা-সমিতি, সাহিত্য, সিনেমা জুড়ে যা চলেছে তা যদি শয়তানী, ইয়ার্কি প্রভৃতি না-ও হয়ে থাকে, তাকে আফিং বলতে বিন্দুমাত্র বাধা নেই। অবশ্য নেশার প্রবণতার মতোই হাসির প্রবণতাও মানুষের আছে। দুঃখেও আমাদের হাসি পায়। হাসি পাওয়া খারাপ কথা নয়। হাসতে নিষেধ বসাবার কথা-ও নয়। কিন্তু কি দেখে কখন হাসা দরকার সে বোধ যাঁদের নেই তাঁরাই সমাজের পক্ষে অহিতকর আবহাওয়া তৈরী করে তোলেন।

বাঙলা-সংস্কৃতির আলোচনা

সম্প্রতি পত্রান্তরে শ্রদ্ধেয় ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইদানীংকার বাঙালীর সাংস্কৃতিক কর্ম্মকৃতির খানিকটা আলোচনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর বিচার-ভঙ্গীর সঙ্গে একান্তভাবে আমাদের মনোভঙ্গী হয়ত মিলে যাবেনা কিন্তু তবু বল্‌ব যে তিনি কতগুলো স্পষ্টোক্তি করেছেন যা আর কেউ করতে রাজি হননি। স্পষ্টকথা অনেক সময় আমাদের হৃদয়গ্রাহী হয়না কারণ হৃদয়ে আমরা অস্পষ্ট আবেগ পোষণ করবার পক্ষপাতী। এখনকার বাংলা দেশে আবেগের অপরিচ্ছন্ন বা ঘোলা ঢেউ চলেছে। দুঃখ, নৈরাশ্যবোধ বা আপাতমধুর দৃশ্যাবলী এই ধরনের আবেগের তরঙ্গ আনয়ন করে। তাকে নয়ন থেকে শীঘ্র অপসারিত করতে না পারলে সম্মুখের পথ দেখা কঠিন ব্যাপার হয়ে ওঠে। আমরা যদি এখন আমাদের কঠোর সমালোচক হতে না পারি তাহলে ভবিষ্যৎ সুখের হবে না।

অতীত-প্রীতি যে সবসময়ই সুফল এনে দেয় তা নয়—অথচ বেশির ভাগ বাঙালী আজ অতীতের ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখ্‌ছেন। যদৃচ্ছা স্বপ্ন দেখবার অধিকার ভিক্ষুকেরও থাকে, সুতরাং স্বপ্ন দেখা বা স্বপ্ন দেখতে পারা খুব একটা বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা জাগ্রত জীবনকে স্বপ্নের মতো সুন্দর করা। ভিক্ষুকের অক্ষমতা নিয়ে এ-কাজ করা চলেনা। নিজের ভেতর যথেষ্ট ক্ষমতা অর্জ্জন করতে পারলে তবে এ-কাজ সম্ভবপর। ক্ষমতা-অর্জ্জনের পথ বিচিত্র। কিন্তু বিচিত্র হলেও তা পৃথিবী ত্যাগ করে শূন্যাশ্রয়ী হয় না। বাঙালীর অতীত-ইতিহাস যদি সৎ-উপাদানের উপর নির্ভর করে লিখিত হত, তাহলে আমরা জানতে পারতাম এই জাতিটির চরিত্র কোন্ বাস্তব আবহাওয়ায় উজ্জ্বলতম হয়েছিল।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

৺সুরেশচন্দ্র মজুমদার

আনন্দ বাজার পত্রিকা মণ্ডলীর কর্ণধার সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জীবনাবসান হয়েছে।

জীবনের প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে যে সব তরুণ দেশপ্রেমিক পরাধীনতার নাগপাশ সহজপন্থায় ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন, সুরেশচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। দুঃখ, ক্লেশ ও অত্যাচার সহ্য করতে তিনি পরাঙ্মুখ হন নি। বিপ্লবী বাঘা যতীনের সঙ্গে নির্জন কারাপ্রকোষ্ঠে দিনের পর দিন যাপন করে রাজশক্তিকে উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু রাজশক্তি কারাবরণেই অপসারিত হয়না, সে বোধ তাঁর নির্জনবাসেই নিশ্চিত ভাবে জাগ্রত হয়েছিল, তাই তিনি কর্মের মাধ্যমে বন্ধন মুক্তির প্রচেষ্টায় ব্রতী হলেন।

সুরেশচন্দ্র কর্মযোগী। তাঁর কাজ করবার অনাড়ম্বর প্রচেষ্টা বহু মহৎ সাধনায় চিহ্নিত হয়ে আছে, কিন্তু কোন কীর্ত্তিই তাঁকে আড়াল করে রাখতে পারে নি—নতুন উদ্ভাবনী শক্তি নিয়ে তিনি মহত্তর প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত হয়ে গেছেন। কর্মনির্দিষ্ট করে তিনি সার্থকজীবনের আরাম অনুভব করতে পারতেন, কিন্তু জীবনের গোড়ায় যে সামান্য মুদ্রাকর হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেন, অন্তিম কালেও নিরভিমানী লোকটি সেই মনোভাব বজায় রেখে গেছেন। তাই তাঁকে ঘিরে যে সব কর্মীদল ধীরে ধীরে জড়ো হয়েছে, তাঁরা চুম্বকচালিতবৎ তাঁকে অনুসরণ করছেন সানন্দে তীর্থ যাত্রীর মত।

স্বাধীনতার সংগ্রামে আনন্দবাজার পত্রিকা রাজশক্তির বিরুদ্ধে গণ জাগরণের অপরিসীম দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। ক্ষুব্ধ রাজশক্তির প্রবল ঝাপটা সহ্য করে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবার আশঙ্কায় বিপন্ন হয়েও জাতীয়তা-বোধ প্রচার করে, সুদূর পল্লীতে পল্লীতে গঠন শক্তির প্রসার করে, জীবনের উত্তাপ সঞ্চার করে, অন্যকোনো সংবাদপত্রই জনতার শ্রদ্ধার আসনে এতটা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। অকুতোভয় নির্ভিক দেশপ্রেমিক সুরেশচন্দ্রের আদর্শই তাতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কারাগারে বন্দীজীবন যাপনই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের চরম চিন্তা ছিল না—দেশবাসীকে স্বাধীনতা গ্রহণ করবার মত এবং স্বাধীন চিন্তা করবার মত শিক্ষিত ও সংস্কৃতবান করতে তিনি চেয়েছিলেন। সেই বোধেই তাঁর পত্রিকা সংস্থা সংবাদপত্রের ইতিহাসে অপরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করেছে। এ তো সুরেশচন্দ্রেরই গৌরব।

কিন্তু যে অবিস্মরণীয় গৌরবে তিনি সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন—প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিভাত হবেন আমাদের দৃষ্টিপথে, তা হলো মুদ্রাকর সুরেশচন্দ্রের মুদ্রণ শিল্পের উন্নতি সাধন। সুদীর্ঘ ছয় বৎসর গবেষক ছাত্রের মত তিনি বাংলা হরফ 'লাইনো প্রথায়' সুসংহত করতে ব্রতী ছিলেন। সূর্যোদয় থেকে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বিভিন্নমুখী কর্মধারায় ব্যস্ত থেকেও হরফের মুখাকৃতি নতুনভাবে গড়ন, যুক্ত হরফের জটিলতা ছিন্ন করা, ছয়শত বর্ণমালা থেকে দেড় শতে কমিয়ে আনার কাজে দিনের পর দিন প্রচুর ধৈর্য ও সংযমের পরীক্ষা দিয়ে গেছেন। আজ তাই বাংলা লাইনোটাইপ ও বাংলা টাইপরাইটার, তাঁর তপস্যালব্ধ ফল, আমরা আশীর্ব্বাদ স্বরূপ পেয়েছি। তাঁর সর্ববিধ কর্মে একটি বিজ্ঞানী মন কাজ করে গেছে বলেই তিনি কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়েছেন, স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হন নি।

অমল দত্ত

ইয়েষ সা কর্তুমবন্ধ্যরূপতাম্
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ।—কালিদাস ॥

বাংলা বই

বাংলা ছন্দ : শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (মূল্য দুই টাকা)

বাংলা ছন্দ সম্পর্কে কোনো মূল রীতি আজ অবধি আবিষ্কৃত হয়নি। তিনটি পদ্ধতির ছন্দ বাংলা কাব্যে প্রচলিত। তিনটির মূলাধার নিশ্চয়ই একসময় লৌকিক ছড়া-পাঁচালিতে বা প্রাকৃত পৈঙ্গলের রচনায় অবস্থিত ছিল। সেদিকে কারো ঔৎসুক্য নেই। যাঁরা বাংলা ছন্দ নিয়ে আজ অবধি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, তাঁরা ইংরেজি ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের মাপ মিলিয়ে কতগুলো সূত্র খাড়া করেছেন দেখতে পাই। অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যও তাই করেছেন।

ছন্দ শব্দশাস্ত্র। বাক্-ধ্বনির বর্ণ নিয়ে তার কারবার। বর্ণ কথন অক্ষর-রূপ নিয়ে দাঁড়ায় এবং তেমন অবস্থায় তার অন্তর্গত ধ্বনির গতিবিধি কিরূপ হয় তা বুঝিয়ে দেওয়াই ছন্দের শিক্ষকতা। ইংরেজি ছন্দের কোনো সূত্রের প্রবেশ-পথ এখানে নেই। আছে ধ্বনি-শ্রুতির কথা, শ্রোতার অবস্থিতির কথা, অবস্থিতির দূরত্ব অনুসারে ধ্বনির কালক্ষেপের বা সোচ্চার হবার কথা। ধ্বনির প্রতীতি সবার শ্রুতিতে সমান নয়, বর্ণের উচ্চারণ সবার বাক্‌যন্ত্রে একরকম নয়—ছন্দশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এসব কথাও ভেবে দেখতে হয়। অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এসব কথা ভেবে চিন্তে পুস্তকটি রচনা করেন নি।

স. ভ.

মুস্কিল আসান : দিলীপ রায় (দাম দেড় টাকা)

তরুণদের কাউকে সুরেলা বলে কবি হিসেবে বিশিষ্ট হ'তে শুনি, কেউবা প্রকৃতি ও প্রেম-স্বভাবাশ্রয়ী, কারও কবিতায় বা অতি সামাজিক দায়ভাগ—কিন্তু কেউ কি ইদানীং তিরিশের তরুণকালের একজন কবির মতোও আশ্চর্য্য ভাবে প্রতিভাত হয়েছেন ?

—হননি। যা হয়নি তা নিয়ে আক্ষেপ হ'তে পারে, কেন হচ্ছেনা তার কারণ নিয়ে বহুমতও থাকতে পারে কিন্তু আচরিত কাব্য-স্বভাবের যে জীর্ণতা ঘটছে, তার থেকে মুক্তির আকুলতা এবং সেই বিরহীর অব্যক্ত স্বভাবের সার্থক অতৃপ্তি তরুণতমদের কাব্যচেষ্টায় স্বল্পই অনুভূত হয়।

এতদ্‌প্রসঙ্গে একটি কথা মনে হয়েছে যে তরুণদের সম্প্রতি-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থে বিষয়মুখীন কবিতার একান্ত অভাব। অথচ যে অনুভাবনায় কবিতার দিন কাটে তা কী আমাদের অস্তিত্বের নানাবিধ জাগতিক উপকরণের দ্বারা অধিগত নয়? যদি বিষয়মুখীন কবিতা আরও লেখা হয়, তবে কাব্যের চিরাচরিত মূল্য চমৎকার হয়ে ওঠে না কি ?

দিলীপ রায়ের সম্প্রতি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে পূর্বোক্ত ভাবনাতেই অধিকতর স্বস্থ হতে

পেরেছি। 'মুস্কিল আসানের'—অধিকাংশ কবিতা নির্ম্মোহরূপে বিষয়মুখীন। ফলতঃ সমকালীন তরুণদের কাব্যগ্রন্থ হতে তা সম্পূর্ণতর নূতন এবং ভিন্নস্বাদবাহী।

সংসার লোকের যে করুণ দৃশ্যপট সতত আমাদের চোখে পড়ে, 'মুস্কিল আসানে'র—অনেক ক'টি কবিতার অনুভাবনা তাই নিয়ে :

চাদরে পাশের পালঙ্কে বাঁধা
দড়িতে দেহ
কালো মূর্তিরা এখনি টিকিট লাগিয়ে কেহ
নিয়ে যাবে দূর মাছিপড়া
বদ্ধ ঘর,
সেখানে তীক্ষ্ণ ছুরি বিদীর্ণ
এ বালুচর

বিষয়মুখীন অনুভাবনা থেকে বিমূর্ত আবেগ অন্যত্র তাঁর কবিতায় আশ্চর্যরূপে আন্তরিক :

আমি ভাবলাম
একটা প্রকাণ্ড জলন্ত মোমবাতির মতো
আমি বোধ হয় আস্তে আস্তে গলে যাবো, পুড়ে যাবো
এক বছরেরর মধ্যে * * *

'মুস্কিল আসানে'র অধিকাংশ কবিতায় গদ্যভঙ্গীকে আশ্রয় করা হয়েছে, আজকাল গদ্যকবিতা বিশেষ কেউ আর লিখছেন না, দিলীপ রায় এই বর্জিত ভঙ্গীটিকে যে তার কবিতায় পুনর্বার উপস্থাপিত করেছেন, কবিতার পাঠক তাতে কিছুমাত্র অখুসী হবেন বলে মনে হয়না। তবে 'মুস্কিল আসানে' চিত্ররূপ স্বয়ং-সাদৃশ্য নয়, বহুলাংশে সে কাজ তুলনায় সারা হয়েছে এবং মিলান্তক চেষ্টায় কোনও চমৎকারিত্ব নেই বলে মনে হ'ল।

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য ঃ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী (বিশ্বভারতী)

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী মহাশয়ের 'বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য' বইটি আদ্যোপান্ত প'ড়ে একথাই মনে হ'লো যে যথাযোগ্য আত্তীকরণ সম্ভব হ'লে তবেই একজন পণ্ডিত ব্যক্তি এত স্বল্প-পরিসরে এমন একটি তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা সাধারণের উপযোগী ক'রে রচনা করতে পারেন। মাত্র ৬৬খানি পৃষ্ঠার এই তথ্যবহুল পুস্তিকাটি ব্যবহারযোগ্যতায় একটি ছোটো খাটো কোষগ্রন্থের তুল্য। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য

সম্বন্ধে অনধিকারী কিংবা স্বল্পাধিকারী ব্যক্তির পক্ষেও উক্ত বইখানি অবশ্য পাঠ্য ব'লে নির্বিবাদে নির্ণীত হ'তে পারে। বিশেষ ক'রে পরিশিষ্ট অংশটি জ্ঞাতব্যে ঠাসা। কতোটুকু কম জায়গায় যে কতো বেশী বলা যায় অথচ কতো বিশদ ভাবে বলা যায় তারই একটি মূল্যবান নমুনা এইখানে চোখে পড়লো। একে যথেষ্ট প্রশংসা না করলে সত্যের অপলাপ হবে। একাধারে পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা ও মনস্বিতার পরিচয় রয়েছে এর প্রতিছত্রে। এই সফলকর্মা পণ্ডিত ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জানাই।

এই ক্ষীণ পুস্তিকাটি ছয়টি অধ্যায়ে মণ্ডিত যথা—১। বৌদ্ধ সাহিত্য ২। বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র ৩। হীনযান—বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক ৪। মহাযান—নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক দর্শন ৫। মহাযান—যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ ৬। বজ্রযান ও সহজযান। এ ছাড়া অত্যন্ত মূল্যবান একটি দশপৃষ্ঠাব্যাপী পরিশিষ্ট সংযোজিত আছে যে সম্পর্কে মন্তব্য পুর্ববর্তী অনুচ্ছেদেই করা হ'য়েছে।

মহাযান সম্পর্কে আমরা জানি অনেক কম। সে-সম্বন্ধে মোটামুটি খানিকটা ধারণা হ'বে এ বইটি পড়লে। আমরা জানি অশোকের বেশ কিছুদিন পূর্বেই প্রাচীন সংঘের মধ্যে আঠারোটি শাখার উদ্ভব হ'য়েছিলো তার মধ্যে দশটি শাখা বিশেষ প্রভাবশালী হ'য়ে ওঠে যথা :—স্থবিরবাদ। হৈমবতী, ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সর্বাস্তিবাদ, মূলসর্বাস্তিবাদ সম্মিতীয়, মহাসাংঘিক ও লোকোত্তরবাদ।

এদের মধ্যে সর্বাস্তিবাদীরা এক সময়ে অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে উঠেছিলেন এবং কালে এই সর্বাস্তিবাদ থেকেই যে দু'টি হীনযানী সম্প্রদায় উদ্ভূত হয় তারা হচ্ছে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক। ও দিকে মহাযান আচার্য নাগার্জুন-প্রবর্তিত মাধ্যমিক সম্প্রদায়ও বেশ পুষ্ট হ'য়ে ওঠে। আর একদিকে মহাযান-আচার্য অসঙ্গ-প্রবর্তিত যোগাচারও বেশ পরিপুষ্টি লাভ করে। আচার্য বসুবন্ধু প্রথম জীবনে বৈভাষিক (হীনযান) শাস্ত্র প্রণয়ন করলেও পরে ইনি যোগাচারের (মহাযান) প্রতি আকৃষ্ট হন এবং উক্ত সম্প্রদায়ের দর্শনশাস্ত্রকেও পুষ্ট করেন। ইনি যোগাচারের আর একটি নাম দেন বিজ্ঞানবাদ বা বিজ্ঞপ্তি-মাত্রতাবাদ।

নাগার্জুন, অসঙ্গ ও বসুবন্ধু এঁদের প্রত্যেকের দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিতে গ্রন্থকার চেষ্টা করেছেন। যেহেতু মহাযান দর্শন সম্বন্ধে স্বভাবত আমরা কম জানি সেহেতু এই কয়খানা মাত্র পাতা আমাদের বেশ কাজে লাগে। তাছাড়া বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা ও উদ্ধৃতি আছে যা মুল্যবান মনে হ'লো। এ রকম মানুষ লোকশিক্ষার কাজে নামলে আমরা আশ্বস্ত হই। এই গ্রন্থের প্রকাশক এবং বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষও অভিনন্দন যোগ্য। ছাপাও ভালো, দামও কম, মুদ্রণপ্রমাদও অপেক্ষাকৃত অল্প।

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বপ্ন সম্ভবা ঃ শ্রীদীপ্তিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (রঙ্গালয় প্রকাশনী)

একটি অভিনব নৃত্যনাট্য। রবীন্দ্রনাথ যে পদ্ধতিতে নৃত্যনাট্য রচনায় পথপ্রদর্শন করেছিলেন, লেখক সে পদ্ধতি অনুসরণ করেন নি। তাই বোধ হয় এ নাটকের অভিনবত্ব সম্বন্ধে তিনি নিজেও

সজাগ। চিত্তের গীতিপ্রবণতা নৃত্যের দিকেও সহজভাবে মনকে নাড়া দেয়—দীপ্তিপ্রসন্ন তাই গীতি-নৃত্য-সংলাপে একটি রূপময় জগতের পরিকল্পনা করেছেন। সাহিত্য বিচারের মাপকাঠিতে এর মূল্য নিরূপণ করা চলে না, রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমেই এর পরিচয়। গানগুলির স্বরলিপি দিয়ে দীপ্তিপ্রসন্ন বইটি মঞ্চস্থ করবার সুযোগ সহজতর করেছেন। নৃত্যনাট্য রচনায় আমরা খুব বেশী এগুতে পারি নি। দীপ্তিপ্রসন্ন যদি এ পথে আরো অগ্রসর হন তা হলে রবীন্দ্রনাথকেই শ্রদ্ধা জানানো হবে।

অমল দত্ত

বসন্তে একটি দিন : গৌরাঙ্গ দত্ত (দাম দু'টাকা)

বসন্তের একটি দিনে পাখীর বা ফুলের মতো প্রগল্‌ভ হওয়া চলে। মানুষও তেম্নি প্রগল্‌ভ হয়- প্রেমের অজস্র অনুভূতি একটি যুবকচিত্তে অজস্র কথা কওয়ায়। প্রেমের স্পর্শে কথা-কওয়া একেক যুগে একেক রকম। এখনকার তরুণ কবিরা যে ভঙ্গীটি পাল্টে ফেলতে পেরেছেন তা নয়—তবে প্রচুর ভাবে প্রগল্‌ভ হয়েছেন। প্রগল্‌ভতা কখন দোষের এলাকায় চলে যায়, কখন তা গুণাশ্রয়ী হয় অনেকের নিকট এই মাপটা-ও অজানা। সুতরাং তা নিয়ে যখন তাঁরা কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হন তখন কবিতার ধর্ম্ম অতিক্রম করতে তাঁদের একটুও বেগ পেতে হয় না। মনের এই তারুণ্যকে প্রদমিত না করতে পারলে ভালো কবিতা রচনা করা দুঃসাধ্য। শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গ দত্ত একুশটি কবিতায় তাঁর প্রেম-মানসিকতা নিবেদন করেছেন কিন্তু একটি পংক্তিও স্মরণীয় করতে পারেন নি।

স. ভ.

আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি—যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পূর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায়—'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পূর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস
দুটাকা

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
গান্ধী-পরিকল্পনা
(অর্থনীতি বিষয়ক)
দু'টাকা

গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা
দু'টাকা

ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম
বারো আনা

শিক্ষার বাহন
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
রুশো

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
কার্ল মার্ক্স

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ডারুইন

সুবোধ ঘোষের
সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
বৌদ্ধধর্ম্ম
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
ধর্ম্মবিজয়ী অশোক
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা :

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ভারতীয় নারী ও সমাজ

গোপাল ভৌমিকের
সমাজ ও সাহিত্য

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
সমাজ ও বিজ্ঞান

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
ধর্ম্ম ও নীতি

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
সমাজ ও সংস্কৃতি

নারায়ণ চৌধুরীর
সঙ্গীত ও সমাজ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ

লুই ফিশারের
মহাজিজ্ঞাসা
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা

মিনু মাসানির
নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
মোসলেম রাজনীতি
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি
বার আনা

মিনু মাসানির
খাদ্য
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
বোম্বে পরিকল্পনা
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

নাবিক রাজপুত্র ও সাগর রাজকন্যা

এই রাজপুত্র আর এই রাজকন্যা বাংলা-দেশের ছেলেমেয়ে ছিল এক সময়। যে-সময়ে এম্নি সব ছেলেমেয়ে ছিল সে-সময়কার কাহিনী. হল 'নাবিক রাজপুত্র ও সাগর রাজকন্যা'। বড়-রা যদি পড়েন, তবে ছোটদের জন্যে তাঁরাই বইটি সংগ্রহ করবেন।

লেখক ঃ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

দাম ঃ

দু'-টাকা

প্রকাশক ঃ

পূর্ব্বাশা লিমিটেড

Printer & Publisher Satya Prasanna Dutta, Purvasa Ltd., 54 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta.

COLOUR ILUSTRATION

ভাদ্র

১৩৬১ বাংলা

॥ সপ্তদশ বর্ষ ॥

সম্পাদক ঃ সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যের নির্ব্বিচার পরিবেশনে পাঠকের মনে অতীতের কণ্ডূয়ন অথবা রুচির বিকৃতি সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কথাসাহিত্য ও কবিতা পরিবেষণে পূর্ব্বাশা লিমিটেড বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্ব্বাশার সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

কবিতা

অজিত দত্তের
পুনর্ণবা
দেড় টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
নীল আকাশ
দেড় টাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
সংকলিতা
দু'টাকা

প্রাচীন প্রাচী
দেড় টাকা

অপ্রেম ও প্রেম
এক টাকা

পদাবলী
দুই টাকা

তিনজন আধুনিক কবি
(বাংলা কবিতার আলোচনা)
নয় আনা

অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের
সৈনিক
দেড় টাকা

গোপাল ভৌমিকের
স্বাক্ষর
এক টাকা

গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
মহানগর
দু'টাকা

সুবোধ ঘোষের
পরশুরামের কুঠার
দু'টাকা

শুক্লাভিসার
দু'টাকা চার আনা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ফসল
এক টাকা চার আনা

ঋণ
দেড় টাকা

নতুন দিনের কাহিনী
দু'টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
পতাকা
দু'টাকা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
খেলনা
দেড় টাকা

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের
নয়নচারা
দেড় টাকা

উপন্যাস

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
বৃত্ত
এক টাকা বার আনা

মরামাটি
(২য় সং)
দু'টাকা চার আনা

দিনান্ত
(২য় সং)
সাড়ে তিন টাকা

কল্লোল
পাঁচ টাকা

কস্মৈদেবায়
(২য় সং)
তিন টাকা

রাত্রি
(দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)
পাঁচ টাকা

মৌচাক
পাঁচ টাকা

শৈলেন ঘোষের
তিনরঙ
দু'টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা

৩৭,৫০০ কপি নিঃশেষিত

প্রথম খণ্ড 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের নতুন সংস্করণ ৬ষ্ঠ মুদ্রণ) প্রকাশিত হল। অচিন্ত্যকুমারের এই স্মরণীয় সাহিত্য কীর্তি বাঙালী পাঠকের মনে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে।

প্রথম খণ্ডে শৈশব থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্পূর্ণ জীবন ভাষ্যের সূচনা। ইতিহাস, কাব্য ও উপন্যাসের নৈবেদ্যে ভক্তিপবিত্র অর্চনা। তার ভাষায় আত্মনিবেদনের স্নিগ্ধতা! ধর্মে নয়, সাহিত্যস্বাদে যাঁদের অভিরুচি, তাঁদের কাছেও অমূল্য মনে হয়েছে এই রচনা।

সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও এ-গ্রন্থের একটি বিরাট ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক যত বিখ্যাত বাঙালী জন্মগ্রহণ করেছেন, প্রসঙ্গক্রমে তাঁদের অনেককেই প্রথম খণ্ডে একত্রিত করা হয়েছে। পরবর্তী খণ্ডের অন্যতম আকর্ষণ উনিশ শতকের স্মরণীয় প্রতিভাবান বাঙালী পুরুষদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যোগাযোগ।

স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ (রামকৃষ্ণ ইনষ্টিটিউট অফ কালচার) অচিন্ত্যকুমারকে লিখেছেন—আপনার লেখার নিপুণতা ঠাকুরের আদর্শ ও ভাবধারার প্রতি বাংলার জনসাধারণের আগ্রহকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।...... ঠাকুর যথার্থই তাঁহার ভাবপ্রচারের জন্য আপনাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন।

স্বামী বেদানন্দ (১৯বি, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা) লিখেছেন—পড়তে পড়তে মনের মধ্যে ঠাকুরের দিব্যজীবনের সমস্ত ঘটনাগুলি সব যেন দেখতে পেলুম। মনে হল চোখের সামনে সব ঘটছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার বিশেষ কৃপা না হলে এটি সম্ভব হত না।

হরিপদ মোদক (সম্পাদক, স্বামীজী সংঘ পাঠাগার, রসুলপুর, বর্ধমান) লিখেছেন—ধর্মগ্রন্থের চিরাচরিত একঘেয়েমি থেকে ভক্তিস্নিগ্ধ ভাষায় রচিত 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' বাঙালীর প্রাণে এক নতুন আশার সঞ্চার করেছে।...দেশে এক নতুন ভাবের সঞ্চার করেছে। সচিত্র। ৬ষ্ঠ মুদ্রণের নতুন দাম ৫৲

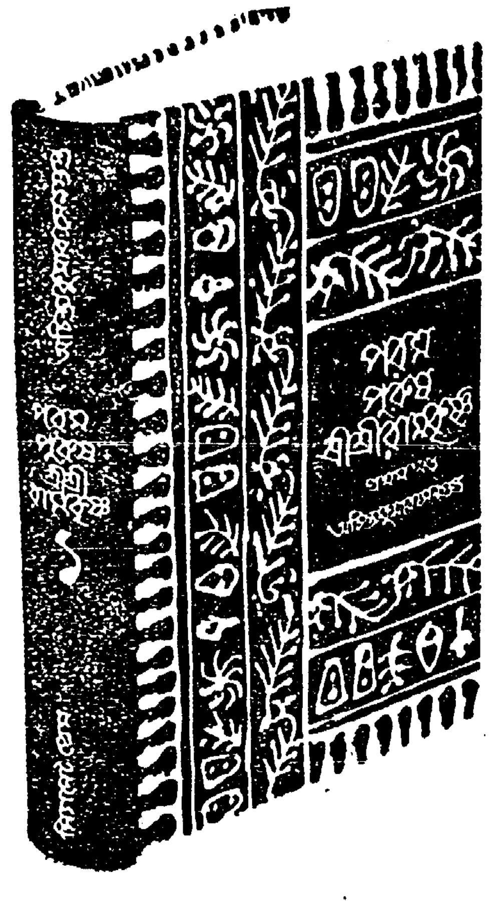

নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতা
নীলনির্জন

ছন্দো-রূপময় বেদনালব্ধ কাব্যের একটি বিশিষ্ট পরিমণ্ডল নিয়ে নীরেন্দ্র চক্রবর্তী শক্তিশালী কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। তরুণতরদের মধ্যে অগ্রণী এই কবি আধুনিক হয়েও দুর্বোধ্য নন। তাঁর কবিতার লাবণ্য মনকে স্নিগ্ধ করে, সুর অনুরণন জাগায়। নীলনির্জন নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর প্রথম কবিতার বই। দাম ২৲

সিগনেট বুকশপ
১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
১৪২।১ রাসবিহারী এভিনিউ

বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ
সাহিত্যচর্চা

সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর বিশ্লেষণ-প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয় কবির উপলব্ধি এবং রচনা হিসেবে সমালোচনাকেও তিনি সম্পূর্ণাঙ্গ একটি সৃষ্টিকর্মে রূপান্তরিত করেন।

বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়: 'রামায়ণ', 'মাইকেল', 'বাংলা শিশু-সাহিত্য', 'বাংলা ছন্দ', রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', 'রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সমালোচনা' 'সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য' ও 'শিল্পীর স্বাধীনতা'। প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে এই প্রথম প্রকাশিত হল। দাম ৩৲

সাহিত্য বিষয়ে যে কোনো প্রচলিত মতের সহজ পুনরুক্তি করা বুদ্ধদেব বসু স্বভাবনয়।

অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাস
নবনীতা

নবনীতার বাবা ছিলেন ইস্কুলমাষ্টার। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর সঞ্চিত অর্থের সঙ্গে সে-ও এসে পড়েছিল তার কাকার হাতে এবং সুনীতির সেই বিষম দুর্গে অবরুদ্ধ থেকেও নবনীতা একটি যুবককে ভালোবেসেছিল। এমন নয় যে সে সাংসারিক অর্থে সুখী হতে চায় নি। তার চাইতেও বেশি চেয়েছিল সে প্রেমিকের মধ্যে সেই শক্তিমানের প্রকাশ যে তাকে জানা থেকে অজানায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে সমুদ্রপাখির মতো, জীবনে যে তাকে দেবে নব-নব আস্বাদ। কিন্তু আহ্বান যদি শেষ পর্যন্ত না আসে? সে যন্ত্রণা তাকে যে দুঃখের কুটিল আবর্তে তলিয়ে দিতে পারে তারই স্মরণীয় কাহিনী এই উপন্যাস।

প্রথম প্রেমের সুখে সংশয়ে ভরা মধুর বিষাদ, উত্তরজীবনে ট্রাজেডির নিষ্ঠুরতায় রূপান্তরিত হওয়ার এই কাহিনী মনকে তীব্র আলোড়িত করবে। দাম ২॥০

পুস্তিকাকারে ছাপানো পূর্ণ কলেবরে 'টুকরো কথা' সিগনেটের যে-কোনো দোকানে চাইলেই পাওয়া যাবে

COLOUR ILUSTRATION

পূর্ব্বাশা

প্রতিসংখ্যা—আট আনা

ভাদ্র—১৩৬১

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
সমসাময়িক কাল ও মানবেন্দ্রনাথ রায় : বটকৃষ্ণ দাস	২৪৩
কবিতাগুচ্ছ :	
বাড়ি ফিরে : শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় ...	২৪৯
রজনী-গন্ধা কন্যা : বটকৃষ্ণ দে ...	২৪৯
নীল দ্বীপ : বংশীধারী দাস ...	২৫১
বর্ষাদিনে : স্বগত : শান্তিকুমার ঘোষ ...	২৫১
সূর্যাস্তের পরে : গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য ...	২৫৩
কুমারসম্ভব থেকে : অনুবাদ—দিলীপ দত্ত ...	২৫৪
জনান্তিকে : বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২৫৫
জলৌকা : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ...	২৫৬
গড় শ্রীখণ্ড : অমিয়ভূষণ মজুমদার ...	২৬৫
ভারত-সংস্কৃতির-সংক্ষিপ্ত প্রকাশ : ইন্দ্রজিত ...	২৭২
ছায়া মুখ : মনোজ রায় ...	২৭৫
নেশা : অনিল ভট্টাচার্য্য ...	২৮২
সাংস্কৃতিকী : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ...	২৮৯
: অমল দত্ত ...	২৯০
মনিলাল সেন ...	২৯২

প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

মনোলীনা— ২॥০

সেতু বন্ধ— ২॥০

সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲

বিচিত্র হৃদয়— ২৲

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯

খাদ্যপ্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

সুপার-নিও-কড

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ

কলিকাতা-১৩

"কি উজ্জ্বল আমার ভবিষ্যতের দিনগুলি! কত আশা-আকাঙ্খার পূর্ণতার আশ্বাস রয়েছে এই পাঁচটি বছরের মধ্যে। নদীর বুকে গড়ে উঠছে ইস্পাত আর কংক্রিটের বিশাল প্রাচীর ··· ওরা নদীতে বাঁধ দিচ্ছে। আমার ক্ষেতে আর ঐ মাঠের পর মাঠে চাষের জলের আর অভাব থাকবে না। জলের জন্যে আর আমায় আকাশের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হবে না"।

সরলপ্রাণ কৃষকের এই আগ্রহদীপ্ত কথা ক'টির মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে একটা জাতির সঙ্কল্প।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নে ৭৯৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে—দৈন্যপীড়িত এই ভারতবর্ষ আবার সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে। জাতীয় পুনর্গঠনের এই বিরাট কাজে অনেকখানি অংশ গ্রহণ করবে কৃষকেরা। দেশের ভাগ্য তো আজ এরাই রচনা করছে।

চাষীর হাতে সোনার ফসল

উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন কাজে হাজার হাজার টন ইস্পাত ব্যবহৃত হবে। নানাদিকে, নানাভাবে আমাদের দেশ এবং জাতির জন্য আরও সফল ও সমৃদ্ধিপূর্ণ ভবিষ্যতের ভিত্তি গঠনে সাহায্য করবে ইস্পাত।

টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী লিমিটেড

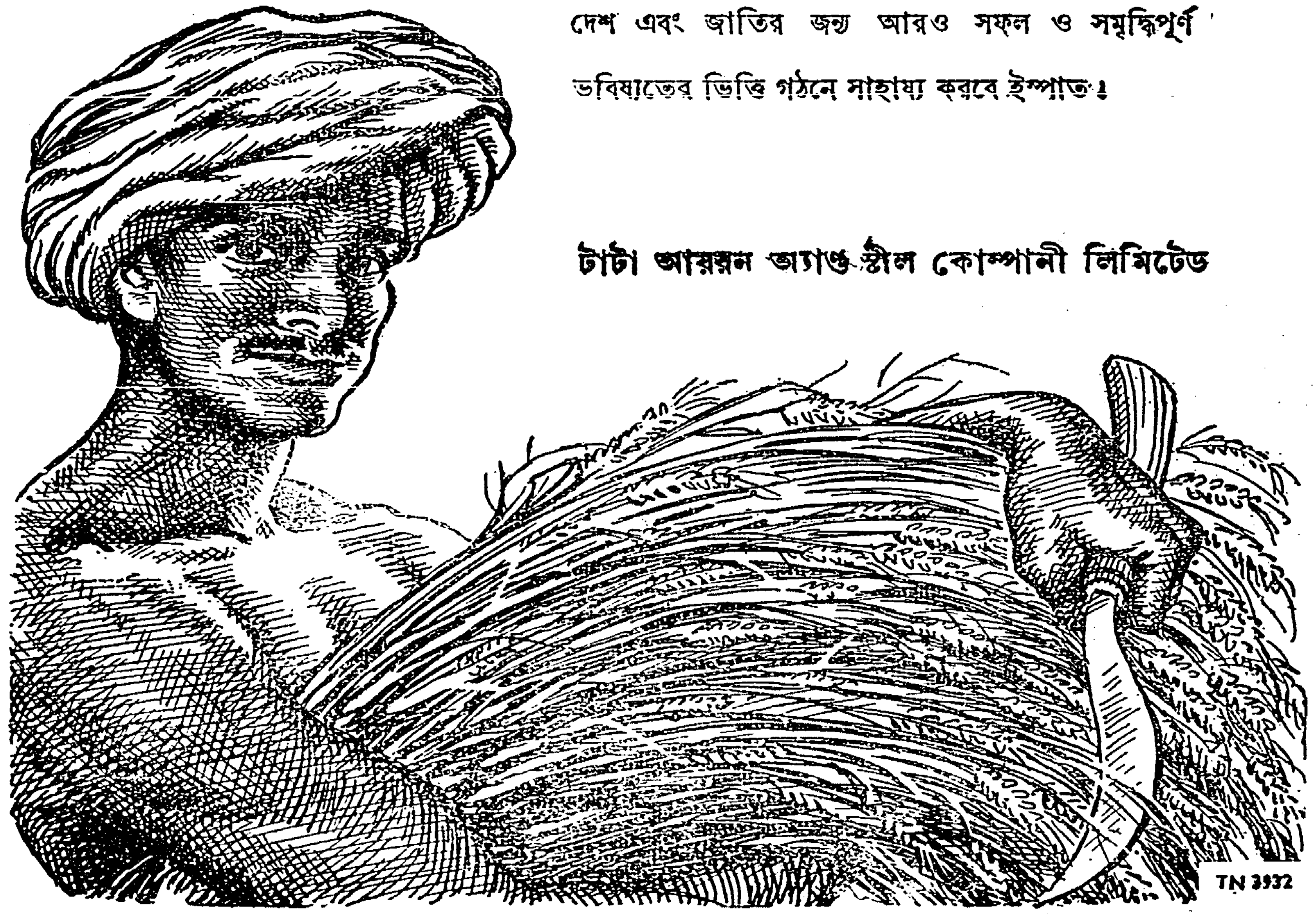

TN 3932

স্মরণীয় দৃষ্টান্ত

নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ব্যবসার বাজার যখন সাধারণতঃ মন্দার দিকে, তখন হিন্দুস্থান বীমা ব্যবসায়ে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা

২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার

অধিক কাজ করিয়া সর্ব্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।
নূতন বীমার কাজেও ইহার অগ্রগতি অসামান্য।

১৯৫৩

নূতন বীমা ১৮ কোটি ৮৯ লক্ষের কিঞ্চিদধিক

এই সাফল্য হিন্দুস্থানের প্রতি জনসাধারণের অক্ষুণ্ণ আস্থার উজ্জ্বল নিদর্শন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, ৪নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১৩
বি. সি. রায়,—সেক্রেটারী

ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া বিল্ডিংস্
৬৪নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা-১৩

১৯৫২ ইং পর্য্যন্ত প্রথম ১৬½ বৎসরে পাঁচটি সার্থক ভ্যালুয়েশান।

প্রতি ভ্যালুয়েশানে পলিসি-হোল্ডারদের বোনাস্ এবং শেয়ার-হোল্ডারদের ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় বীমাজগতে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

এন্, সি, দত্ত
চেয়ারম্যান।

পিউরিটি বার্লি

সবসময়
আমি পছন্দ করি...

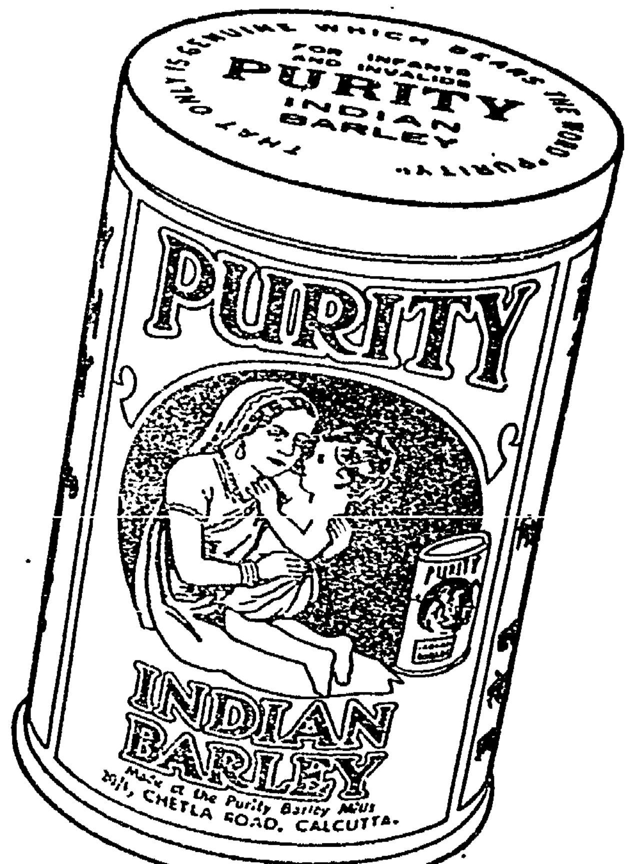

আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে পিউরিটি বার্লি সবসময়েই ভাল।
পিউরিটি বার্লি সেরা শস্য থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরি হয় — তা ছাড়া, এই বার্লি তৈরির পেছনে আছে ১৫১ বছরব্যাপী পেষাই-এর অভিজ্ঞতা।

অ্যাটলাণ্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড
পোস্ট বক্স ৬৬৪, কলিকাতা - ১

APBX-11 BEN

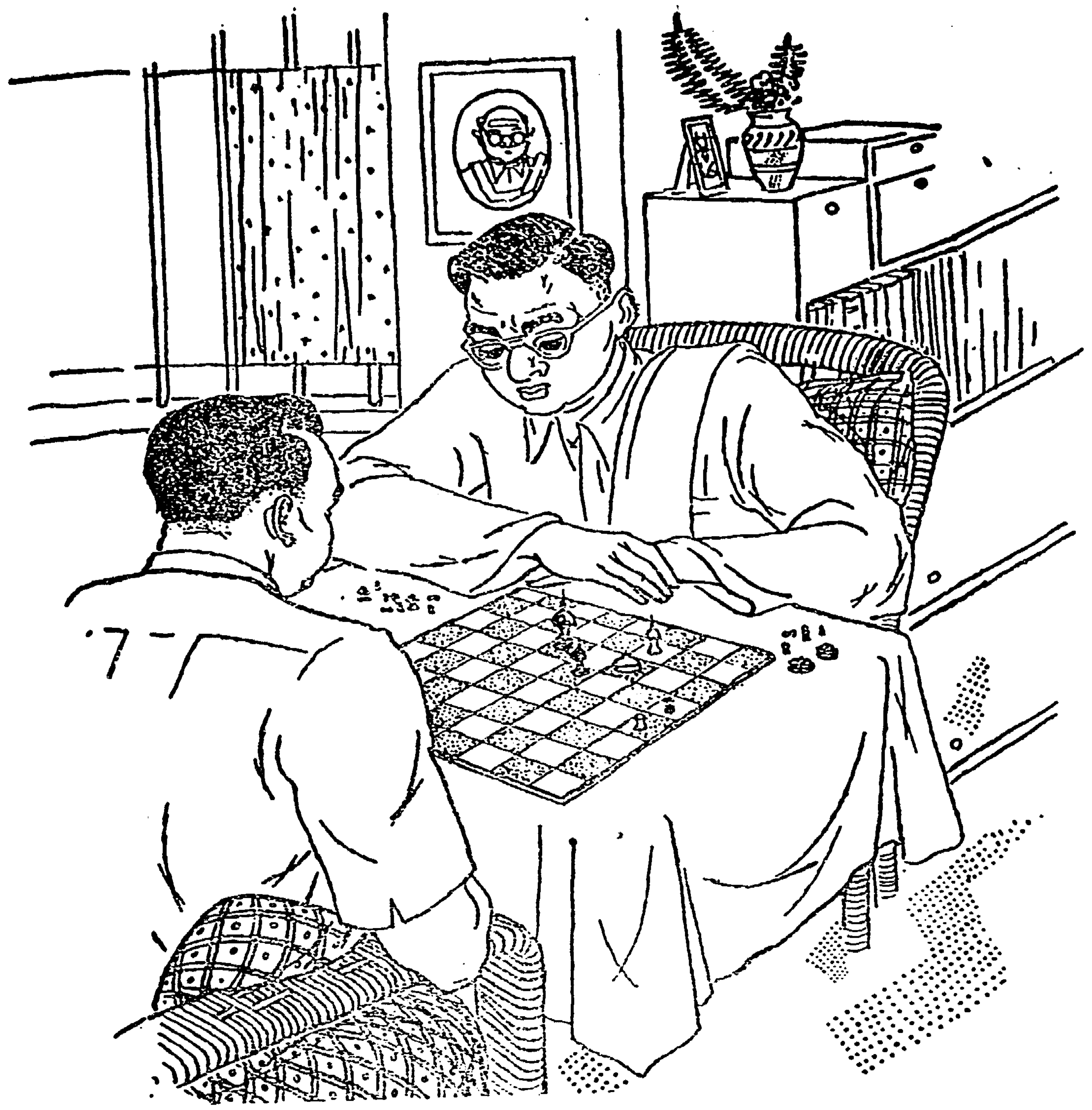

ঠিক এ রকম

অবস্থায়···

দাবা খেলাটা তখনই বেশ জমে ওঠে যখন "রাজা" কিস্তির মুখে পড়ে। এ সময় হয় কিস্তি ঢাকতে হবে, নয় কায়দা করে তাকে সরিয়ে নিতে হবে মারের মুখ থেকে,—একটু বে-চাল হলেই খেলা মাৎ।

দাবা খেলায় পাকা হতে হলে আগে চাই একান্ত মনোযোগ। মাথা ঠাণ্ডা রেখে, বেশ ভেবে-চিন্তে চাল দিতে না পারলে এ খেলায় জয়ের আশা নেই। আর শুধু দাবা খেলাতেই নয়, সমস্ত কাজে মনের এই একাগ্রতা এনে দিতে এক পেয়ালা চায়ের জুড়ি নেই।

চা

মন-মেজাজ
ভালো রাখে

টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

PSTB 123

পূর্ব্বাশা

ভাদ্র—১৩৬১

শ্রীযুক্ত রথীন মৈত্র অঙ্কিত 'তন্বীশ্যামা'

পূর্ব্বাশা
ভাদ্র—১৩৬১

সমসাময়িক কাল ও মানবেন্দ্রনাথ রায়

বটকৃষ্ণ দাস

মাঝে মাঝে আমাদের ইতিহাসে এমন-এক একটি দুর্য্যোগের ঘনঘটা ঘনিয়ে আসে যখন মনে হয়,—ভূত এবং ভবিষ্যত থেকে আমাদের বর্ত্তমান যেন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প'ড়েছে। মনে হয়,—সামনে-পেছনে এক অন্ধকার মহাসমুদ্রের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গ-গর্জনে আমাদের ভগ্নবুক অস্তিত্বের প্রেতায়িত দ্বীপপুঞ্জ বুঝি তলিয়ে যাবে! হৃতশ্রী মানচিত্রের ধূলি-ধূসর দিগন্তরেখাটিও আর থাকবেনা। এ যেন সেই আসন্ন ধ্বংসের ভয়াবহ উপক্রমণিকা! এক অনিবার্য পরিসমাপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের নিঃশেষিত অন্তরাত্মার অবসন্ন মর্মপীড়া, আমাদের দুর্মর কাল-চেতনার দুঃসহ দংশনে ক্ষত-বিক্ষত জীবনের ভগ্নাংশ, সংশয়-সঙ্কুল অন্ধকারে দ্বিধা-দ্বিখণ্ডিত হৃদয়ের দুরারোগ্য হাহাকার,—সবই যেন এক বীভৎস বিশৃঙ্খলায় বিলুপ্ত হ'তে চ'লেছে। এই নিয়তি-নির্দিষ্ট বিলুপ্তির করাল রাহুগ্রাস থেকে যেন আর আমাদের মুক্তি নেই!

দুটি বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ায় ভূলুণ্ঠিত রেনেসাঁস সভ্যতার উত্তরকালে এই ভয়াবহ নরকেরই প্রতিচ্ছবি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভায়, পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাণময় বৈচিত্র্যে, দুর্জয় আত্মবিশ্বাসের অটল সঙ্কল্পে, সত্য এবং সুন্দরের বাস্তবানুভূতির প্রবল বন্যায় বিগত চারশো বছরে ইওরোপের পলিমাটিতে রেনেসাঁস সভ্যতা যে বহু-বিচিত্র ফসল ফলিয়েছে,—আমাদের বিশ-শতকের ভাণ্ডারে তার আর কোনো অস্তিত্ব নেই। যুক্তির সঙ্গে মুক্তির সমন্বয়-সাধনে, মানব-জীবনের একাধিপত্যের উজ্জ্বল অঙ্গীকারে,—দেকার্ত, ক্যাণ্ডিল্যাক, লিওনার্দো, কোপারনিকাস্ গ্যয়টের অবদানে—ফরাসী এনসাইক্লোপিডিষ্ট এবং হিউম্যানিষ্টদের আন্দোলনে ইওরোপীয় নব-জাগৃতির প্রাণ-সমৃদ্ধ সভ্যতার কাহিনী আজ আমাদের কাছে প্রাক্তন স্বপ্নমাত্র। সে-ঐতিহ্যের কোনো কিছু পরিশিষ্ট নেই আমাদের জীবনে। বিশ-শতকের প্রারম্ভে, বিশেষ ক'রে প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকেই সে-সভ্যতার শ্মশান-যাত্রা সুরু হ'য়ে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তার শেষ স্মৃতিটুকুও বিলুপ্ত হ'লো। এই দুটি বিশ্ব-সংগ্রামের অন্তর্বর্তীকালে বয়ঃপ্রাপ্তির দুর্ভাগ্য যাদের ঘটেছে,—তাদের কাছে

পৃথিবীটা অনেকটা সেই রিপ-ভ্যান্ উইংকল্-এর দীর্ঘ নিদ্রাভঙ্গের উত্তরকালীন অস্বস্তিতে ভরা। সবই যেন অপরিচিত। কোনো জানাশোনা নেই। চারদিক যেন কী-এক অস্পষ্ট কুয়াশায় ঢাকা।

একটি বিরাট সভ্যতা ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেছে। অথচ, অন্য কোনো নোতুন সভ্যতার পূর্বলেখ নেই দিগন্তে। কর্দমাক্ত জীবনের পাদপীঠ। বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার অন্ধকারে, রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের শোচনীয় অধঃপতনে, নৈতিক আদর্শের অনির্দিষ্ট অভিধায়, শক্তিলিপ্সু রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মদমত্ত আস্ফালনে, সদসদজ্ঞানের সামগ্রিক মূল্যহীনতায় বিবেকী ব্যক্তি-মানসের ক্রম-বর্ধিষ্ণু দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতে আর্তি এবং গ্লানি, নৈরাশ্য এবং বেদনাই আজ যুগসত্য। শিল্পে-সাহিত্যে, চিন্তায়-মননে সমাজে-রাষ্ট্রে সর্বত্রই এই যুগসত্যের দুর্নিবার প্রভাব পরিস্ফুট। পুরাতন রীতি-নীতির বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তি, জৈবিক নিয়ম-কানুনের নির্বিকার দাসত্ব, অপহৃত ধ্যান-ধারণার নিষ্ফল আর্তি এবং ভারগ্রস্ত জীবনের কঠিন আত্ম-নিপীড়নই আমাদের সাম্প্রতিক কালের সম্বল।

অবিশ্যি আমাদের শতাব্দীতে রেনেসাঁসি সভ্যতার এই সার্বিক পরিসমাপ্তি কোনোক্রমেই আকস্মিক নয়। ইওরোপীয় ঐতিহ্যের এই অবক্ষয়ী আকৃতি অষ্টাদশ শতাব্দীতেই গ্যয়েটের চেতনায় প্রতিফলিত হয়েছিলো। যুক্তিবাদী এবং সৃষ্টিধর্মী জীবনের স্থমিত প্রজ্ঞায় এই মানবধর্মী মহাকবির অনুভূতিও রেনেসাঁসি সংস্কৃতির কালক্রমিক অসুস্থতায় দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হ'য়েছে। তাঁর সামগ্রিক জীবন-ভঙ্গিমার প্রজ্ঞা-প্রসূত প্রত্যয়বোধে সন্দেহ-সংশয়ের হাওয়া লেগেছে মাঝে মাঝে। আমাদের আধুনিক কালের সর্বগ্রাসী অনিশ্চয়তার পূর্বাভাস তিনি পেয়েছিলেন। উনিশ শতকে ব্যদলেয়রের "Fleurs du Mal" এবং "Journax Intimes"-এ সেই পূর্বাভাসই আত্মপ্রকাশ ক'রলো নগ্ন-নিষ্ঠুর ভয়াবহতায়। পশ্চিম ইওরোপীয় সভ্যতার দ্রুত অধঃপতন, সমাজ-জীবনের শোচনীয় অনিশ্চয়তা ব্যদলেয়রের নিঃসঙ্গ এবং শতধাবিদীর্ণ শিল্পী-মানসে পরিচ্ছন্নরূপে প্রতিভাত হ'য়ে উঠলো। যুক্তির সঙ্গে মানসিক কামনা-বাসনার আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে, নির্দিষ্ট নৈতিক মূল্যবোধের ঐকান্তিক অভাবে, বিশ্লেষণী-মননের করুণ আত্মব্যবচ্ছেদে, বৈচিত্র্যহীন অস্তিত্বের ব্যবহারিক দারিদ্র্যে এবং সংশয়ের অন্তহীন যন্ত্রণায় বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি-জীবন তখন আধুনিক অস্তিত্ববাদীদের (Existentialist) মতোই নিঃসঙ্গ এবং দুর্বিষহ। স্বাধীনতা আনন্দস্বরূপ নয়, তার ভার মৃত্যুর মতো যন্ত্রণাদায়ক। উনিশ শতকে রেনেসাঁস-উত্তর সভ্যতার এই সর্বব্যাপী মর্মপীড়ার সর্বাপেক্ষা পরিচিত কবি ব্যদলেয়র। তিনিই আমাদের বিশ শতকের হতাশা-বেদনার, ধিক্কার-হুক্কারের প্রথম এবং প্রধানতম ভুক্তভোগী।

পরবর্তীকালে বুদ্ধিজীবী জীবনের এই সর্বনাশা নরক-পরিক্রমা আমাদের সকলের ভাগ্যেই। দান্তে যে-নরক একবার মাত্র পরিদর্শন ক'রেছিলেন,—সেই বিভীষিকাময় নরকের চিরকাল অধিবাসী আমরা। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-শিল্পে এই নরক-যন্ত্রণাই নানা রূপে, নানা ভঙ্গিমায় প্রকট হ'য়ে উঠেছে। সামগ্রিক মানবতাবাদের অখণ্ড প্রত্যয়বোধে নির্বিকল্প কবিমনের অধিকারী রবীন্দ্রনাথও এই আবহাওয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সব সময় মুক্ত রাখতে সক্ষম হননি। এই যুগ-চেতনার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলায় কখনো-কখনো তাঁকেও আন্দোলিত হ'তে হ'য়েছে। যদিচ তাঁর স্থমিত প্রজ্ঞার সৌর-চেতনা এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কুয়াশায় পথভ্রষ্ট হ'তে দেয়নি তাঁকে। তাঁর প্রজ্ঞার গভীরে তাঁর প্রত্যয় প্রতিদিন স্বাস্থ্যলাভ করেছে। সর্বকালের সর্বমানবের নমস্য কবি তিনি। জীবনশিল্পে তাঁর অসাধারণ

প্রত্যয়বোধই আমাদের আর্তি এবং গ্লানির বহু উর্ধ্বে এক নিশ্চিন্ত স্বর্গলোকে তাঁকে অধিষ্ঠিত ক'রেছে। আমাদের কাল-পীড়নের লৌহবাহু যন্ত্রণার হাত থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন।

অথচ, আমাদের অবস্থা আজো সেই দিনেমারের অসহায় রাজকুমারের মতো। "To be or not to be,"—এই আত্মজিজ্ঞাসায় ক্ষত-বিক্ষত আমরা। মার্কসীয় আস্তিক্যের শুভ-চেতনাও আমাদের রক্ষা করতে পারলোনা এই যুগ-সঙ্কট থেকে। বরং রুশ-বিপ্লবের উত্তরকালীন অভিজ্ঞতা এ-সঙ্কটকে সর্বজনীন এবং সার্বভৌমিক ক'রে তুললো। আমাদের হতাশা-বেদনা হ'য়ে উঠলো আরও ব্যাপক এবং গভীর। ক্রম-বিলীয়মান গণতান্ত্রিক সমাজ পদ্ধতির পাশাপাশি মার্কসীয় সমাজ-বিজ্ঞানের যে স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের অভ্যুদয় হ'লো, সেই বিকল্প ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি আমাদের সর্বশেষ আশাভঙ্গের রূঢ়তায় ভয়ঙ্কর রূপপরিগ্রহ ক'রে হাজির হ'লো আমাদের চোখের সামনে।

এই দিগন্তব্যাপী নিঃস্বতার বিয়োগান্ত উত্তরাধিকার থেকে মানবসমাজকে মুক্তি দেবার জন্যে সমস্ত পৃথিবীর চিন্তাশীল সম্প্রদায় পথানুসন্ধান ক'রেছেন। দার্শনিক জোড ব'লেছেন,—এটা "actuel decadence"-এর যুগ। তাঁর মতে, এই 'decadence' হচ্ছে : ......is a sign of man's tendency to misread his position in the universe, to take a view of his status and prospects more exalted than the facts warrant and to conduct his societies and to plan his future on the basis of this misreading. The misreading consists in a failure to acknowledge the non-human elements of value and deity to which the human is subjected." এই উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায় যে জোড স্বীকার করেন না,—মানুষ স্বাবলম্বী এবং সর্বশক্তিমান। মানুষ তার নিজের চিত্রকল্পেই পৃথিবীকে রূপ দিতে চেয়েছে,—এই ঐতিহাসিক সত্যে জোডের দার্শনিক মন বিশ্বাসী নয়। তাই 'সুন্দর', 'সত্য' 'শুভবোধ' প্রভৃতি মানবিক মূল্যগুলি তাঁর মতে লৌকিক অথবা মানুষের যুক্তিবাদ এবং নীতিধর্মের ওপর নির্ভরশীল নয়। তাঁর ধারণা,—বাস্তবতার দুটি পৃথক স্তর আছে। একটি 'natural', অপরটি 'non-natural'. মানুষ প্রথমটির অধিবাসী। দ্বিতীয়টি (জোডের মতে যেটি বাস্তবতার আরও উচ্চ এবং উৎকৃষ্ট স্তর) সত্য-সুন্দর এবং মঙ্গলবোধের বাসভূমি। "Value, therefore, does not, except derivatively, belong to the human."

মন্তব্যগুলি অনেকটা দার্শনিক কাণ্টের "Thing-in-itself"-এর সঙ্গে একাত্ম। আসলে, মানবসমাজের পুনরুজ্জীবনের জন্যে জোড ধর্মের পুনরুজ্জীবন চান। জড়বাদী দর্শনের ভিত্তিতেই মানবসমাজের প্রগতির বীজমন্ত্র নিহিত,—এ-সম্পর্কে তাঁর আত্যন্তিক অনীহাই তার প্রমাণ। রাসেলের "Logical Atomism"-ও জড়বাদবিমুখী। লেবনিজ-এর "monad"-এর মতো মানুষও আজ অনেক দার্শনিকের কাছে এমন একটি ভাববস্তু, যা বিশ্লেষণাধীন নয়। ম্যারিটেন সাহেবের "Neo-Scholasticism"-কে সমাজ-গঠনে ফিরিয়ে আনবার প্রচেষ্টা আজ চারদিকে। সেই পুরাতন খ্রীষ্টধর্মের পুনরুজ্জীবন-প্রচেষ্টায় অধুনিক পৃথিবীর সমস্ত প্রখ্যাত দার্শনিক-বৈজ্ঞানিরাই কৃতসঙ্কল্প। সাহিত্যে তাই প্যাস্কালের উত্তরসূরী এলিয়ট-মরিয়াক ক্যাথলিক ধর্মের গুণগানে মুখরিত। দর্শনে হোয়াইটহেড-ওয়াকার-ইংজ-রাধাকৃষ্ণণের প্রভাব ক্রমপ্রসারী।

মনুষ্যজাতির এই নৈতিক দুর্দিনে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিস্রুত অবদানে বর্তমানে বিশ্বে

যে-কজন চিন্তানায়ক মানব-প্রগতির রুদ্ধদ্বার কারাগারে আঘাত হেনেছেন,—মানবেন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। সমগ্র মানবসমাজের অভিজ্ঞতা আত্মস্থ ক'রে, তিনি উপলব্ধি ক'রেছিলেন,—নৈতিক দাসত্বই মানুষের স্বাধীনতার সবচেয়ে প্রধান অন্তরায়। এই আধ্যাত্মিক শৃঙ্খল থেকে মানুষের মুক্তি না হ'লে, তার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও অর্থহীন হ'য়ে দাঁড়ায়। অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, পরনির্ভরতা এবং আত্মসচেতনতার অভাবই মানুষের এই নৈতিক দাসত্বের জন্মভূমি। এই দাসত্বকে দূর ক'রতে হ'লে মানুষের জীবনে চিন্তার বিপ্লব প্রয়োজন। দার্শনিক বিপ্লবই সমাজ-বিপ্লবের পূর্বসর্ত। বিশ্বাসকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে। এই যুক্তিবাদ মানুষের অন্তর্নিহিত ধর্ম এবং বিবর্তনবাদেরই ক্রম-পরিণতি। মানুষই এই অভিব্যক্তিবাদের সবচেয়ে উজ্জ্বল ফসল এবং এই নিয়ম-শৃঙ্খলাধীন বিশ্বপ্রকৃতির একটি অংশ। তাই নিয়ম-শৃঙ্খলা মানুষের জীবনের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের স্বাধীনতা-সংগ্রামও মনুষ্যেতর জীব জগতের অস্তিত্ব-রক্ষার সংগ্রামেরই উন্নততর সংস্করণ। সে সংগ্রাম বুদ্ধি এবং আবেগের জগতে। মানুষের ইতিহাস,—প্রকৃতির বিরুদ্ধে অন্তহীন সংগ্রামের ইতিহাস। তার সমাজ,—নবনব স্বাধীনতা-সংগ্রামের আয়ুধ। মানুষই সমস্ত সামাজিক শক্তির মূল উৎস; সমস্ত মূল্যের পরিমাপ। তার ওপরে কোনো অতিলৌকিক অথবা অজ্ঞাত শক্তির প্রতিপত্তি নেই, যে-শক্তি তাকে চালিত কিম্বা নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারে। এবং সেইজন্যই মানবেন্দ্রনাথের মতে: "Man as the creator of society and maker of history can be the only reliable point of departure for a faithful approach to all the problems resulting from the present cultural crisis. Unless the sovereignty and freedom of the individual man and woman of flesh and blood are recognised as the greatest and highest values to inspire all human endeavour, there does not seem to be any way out of the present crisis of modern Civilisation."

এই ব্যক্তি-দর্শনকে কেন্দ্র ক'রেই বিজ্ঞান-সম্মতভাবে মানবেন্দ্রনাথের সমাজ-দর্শনে "নয়া মানবতাবাদ" গ'ড়ে উঠেছে। রাজনীতি এবং সমাজ-দর্শনে মানবতাবাদের প্রবর্তন নোতুন নয়। এ-ঐতিহ্য প্রায় পাঁচশো বছরের পুরাতন। কিন্তু এতাবৎকাল এই মানবতাবাদের বৈজ্ঞানিক সূত্রটি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। ফলে মানুষ একটি বিশ্লেষণাতীত ভাববস্তুতে রূপায়িত হ'য়ে এসেছে। ফয়েরবাক্ যদিও মানুষকে পৃথিবীর কেন্দ্রে স্থাপিত ক'রতে চেয়েছিলেন, তবু মানুষ সম্পর্কে তাঁর সংজ্ঞা ছিলো বায়বীয় কল্পনামাত্র। খৃষ্টধর্মের অভ্যুত্থানের পটভূমিকা থেকেই আসলে ফয়েরবাক্ মানুষকে এবং তাঁর মানবতাবাদকে আবিষ্কার ক'রে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ক'তে চেয়েছিলেন। বিজ্ঞানের সঙ্গে মানবতাবাদের এই অন্তর্নিহিত বিরোধটি মার্ক্স অনুধাবন ক'রতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। মার্ক্সের সময় আধুনিক শরীর-বিজ্ঞান এবং জীবতত্ত্বের যথেষ্ট বিকাশ হ'য়েছিলো। তবু মার্ক্সের সমালোচক-মন বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফয়েরবাকের আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের মূল ত্রুটিকে উৎপাটিত না করেই মানবতাবাদকে একটি অবাস্তব ভাববস্তু হিসেবে বর্জন ক'রে ব'সলো। মানুষকে নিয়ম-শৃঙ্খলা শাসিত বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিকায় আবিষ্কার ক'রে বহির্জগতের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করাই ছিলো তাঁর কর্তব্য। মানুষের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং মানবতাবাদের বিজ্ঞান-সিদ্ধ দর্শন তাহলেই সম্ভব হ'তো। কিন্তু,

মার্ক্সীয় দর্শন, মানবতাবাদের ঐতিহ্যে লালিত এবং অনুপ্রাণিত হ'য়েও, পরিশেষে তার পরিপন্থী হ'য়ে দাঁড়ালো। ফয়েরবাকের মানুষ ছিলো অমৃতের পুত্র; কিন্তু, মার্ক্সের মানুষ সমষ্টির প্রয়োজনে হ'লো নির্বাসিত। ব্যক্তি-মানুষের আর কোনো মূল্যই রইলোনা সেখানে। মার্ক্সের সমষ্টিবাদ" "the monster of Massenmensch"-এ রূপান্তরিত হ'লো।

মানুষের এই প্রকৃত মূল্যায়নাভাবই বর্তমান বিশ্বে সর্বপ্রকার সমাজ-দর্শনের ব্যর্থতার মূল কারণ। ভিকো ব'লেছিলেন,—মানুষই সমগ্র মানবসমাজের মূল। অথচ, এই সর্বশক্তির আধার এবং সর্বপ্রকার মূল্যের মানদণ্ডকে সমাজের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। সমাজের এবং রাষ্ট্রের সমস্ত সমস্যার প্রধান উৎস এই অক্ষমতা-প্রসূত। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র এবং শ্রেণীরাষ্ট্র দুই-ই মানবতা-বিরোধী। সমষ্টির স্বার্থে, জাতি বা শ্রেণীর অলীক মহিমায় ব্যক্তি-মানুষ এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা উভয়বিধ সমাজ-ব্যবস্থাতেই প্রতিনিয়ত অদৃশ্য হ'য়ে চ'লেছে। আসলে, জাতীয় সমস্যা অথবা শ্রেণী-সমস্যা সমস্তই কাল্পনিক। মানুষই সমাজ, জাতি এবং শ্রেণীর পরিপূরক। সুতরাং মানুষই মৌল সমস্যা। মানুষের মুক্তিকে বাদ দিয়ে জাতীয় মুক্তি বা শ্রেণী-মুক্তি একান্তই হাস্যকর। মানুষের সর্বপ্রকার উন্নয়নই সমাজোন্নয়ন এবং "Freedom has no meaning unless it is conceived as a human value. It can be enjoyed and thus become a reality, only by men and women as individuals. Freedom, therefore, in the last analysis, is a spiritual state."

সুতরাং, মানবেন্দ্রনাথের মতে,—সমাজ তথা রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনের এই দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্ব একমাত্র ব্যক্তিবাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠার দ্বারাই দূরীভূত হ'তে পারে। "নয়া মানবতাবাদ" এই ব্যক্তিবিশ্বাস এবং ব্যক্তিমূল্যেরই সমাজ-দর্শন। গণতন্ত্রের অন্তঃসারহীনতা ও স্বৈরাচারী সাম্যবাদী রাষ্ট্রের ক্রম-বর্ধিষ্ণু বীভৎসতা থেকে মুক্তি পেতে হ'লে, ব্যক্তি-জীবনের এই আসল স্বরূপটিকে উপলব্ধি ক'রতে হবে। রেনেসাঁস আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনেই বর্তমান মানব-সম্প্রদায়ের এই ঘোরতর দুর্দিনের অন্ধকার উৎক্রান্তির পথ খুঁজে পাবে। আত্মবিলাস এবং আত্মসচেতনতাই সুন্দর সমাজ-প্রস্তুতির ভিত্তিভূমি। মানুষের মধ্যে সেই বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে না পারলে গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা বন্ধ্যা হ'তে বাধ্য। মানব-প্রগতির রুদ্ধগতি স্রোতস্বিনীকে নিত্যনব মুক্তির সমুদ্র-মোহনায় প্রবাহিত ক'রতে হ'লে মানুষের মূল্যায়নই আত্যন্তিক প্রয়োজন। এ ছাড়া অন্য পথ নেই।

এই স্থির সত্যে উপনীত হ'তে পেরেছিলেন বলেই মানবেন্দ্রনাথ রাজনীতিতেও মানবতাবাদের পুনঃপ্রবর্ত্তন চেয়েছিলেন। ক্ষমতা লিপ্সার প্রাবল্যে এবং প্রকৃত মানব-কল্যাণের ঐকান্তিক অভাবে সাম্প্রতিক কালে রাজনীতি নীতি-বর্হিভূত নগ্নতায় আত্মপ্রকাশ ক'রেছে। মানবেন্দ্রনাথ জানতেন,—নৈতিক আদর্শহীনতা দিয়ে কোনো বড়ো আদর্শকে লাভ করা যায় না। নীতিবান মানুষই যে কোনোরকম বৈপ্লবিক সাফল্যের পূর্বসর্ত। রাজনীতিকে তাই তিনি দুর্নীতির কবল থেকে মুক্ত করে নীতি এবং সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রতে চেয়েছিলেন। এই সংযোগ-সাধন একমাত্র সেই রাজনীতিতেই সম্ভব,—মানুষ যেখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্যতম যন্ত্রমাত্রই নয়,—রাজনীতির সর্বশেষ লক্ষ্য। এই লক্ষ্যস্থলে পৌছোতে গেলে,— "......political practice must respect human values." মানবিক মূল্যবোধে এই শ্রদ্ধা জাগ্রত হ'লেই আমরা বুঝতে পারবো,—"...that

man is essentially rationl, and therefore politics need not be a scramble for power, motivated by base emotions such as hatred, jealousy, distrust."

স্বীয় সম্পাদকীয় স্তম্ভে মানবেন্দ্রনাথের মৃত্যু-প্রসঙ্গে 'পূর্ব্বাশা' সম্পাদক একজায়গায় ব'লেছেন: "...সম্ভবত এ-যুগের বুদ্ধিজীবীদের মনে সবচাইতে বেশি আশার সঞ্চায় ক'রতে পেরেছিলেন প্রবাস-প্রত্যাগত মানবেন্দ্রনাথ রায়ই...।" এ-মন্তব্যে তিনি এ-কালের বুদ্ধিজীবি-মানসের একটি গভীর সত্যকেই প্রকাশ ক'রেছেন। আমাদের শতকের বিগত তৃতীয়-চতুর্থ দশকে মানবেন্দ্রনাথই সম্ভবত একমাত্র ভারতীয় চিন্তানায়ক যিনি জাতীয়তাবাদ এবং সাম্যবাদের ক্রম-বর্ধিষ্ণু প্রতিক্রিয়াশীলতাকে পর্যবেক্ষণ ক'রে তাঁর বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতা এবং অসাধারণ মনন-শক্তির সমন্বয়ে একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর সমাজদর্শনের চিত্র আমাদের সামনে উপস্থাপিত ক'রেছেন। ফলে, সংঘবদ্ধ দক্ষিণপন্থীরা তাঁর ওপর বিমুখ হ'য়েছেন। সংহত বামপন্থীরা পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছেন কুকথায়। কিন্তু, মানবেন্দ্রনাথ নিরাশ হননি। কোনো আক্রমণ এবং কুৎসাই অঙ্গস্পর্শ ক'রতে পারেনি তাঁর। প্রায় নিঃসঙ্গ হ'য়েও তাঁর অসীম তেজস্বিতা এবং সত্য-প্রকাশের স্পর্ধা ছিলো অবিচলিত এবং এই অবিচলিত ও আপোষহীন মনোভাব নিয়েই তিনি তাঁর সমৃদ্ধ চিন্তা-সম্পদের অংশীদার ক'রে গেলেন আমাদের।

"মানুষের মধ্যে যে-সব মহাজাতি কুলত্যাগিনী, তারাই এগোচ্ছে,—
ভয়ের ভিতর থেকে অভয়ে, বিপদের ভিতর দিয়ে সম্পদে।"—রবীন্দ্রনাথ

কবিতা-গুচ্ছ

বাড়ি ফিরে

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

সময় আবার যেন পাক খুলে যায় ;
সেদিনের সেই নীল সুদূর আকাশ
কাছের এ-একঝাঁক বড় বড় হাঁস
রঙ, রেখা, কথামালা কেবল ছড়ায়!

এবারও ভরাট জলে দেখেছি তেমন
শরবন আগাছা ও শামুকের খোসা,
মুখ গুঁজে আজো শোয় কী জানি কেমন
ঘরোয়া নানান জীব বহুদিন পোষা ;

দুপুর গড়িয়ে হয় শান্ত সমুদ্দুর
বালুচরে ঠিকরায় হাজার প্রহর—
উঁচু থেকে চিল এক বাড়ি-ফেরা সুর
ঢেলে দেয়, ভরে যায় পাশাপাশি ঘর ;
ঠিক তারপরে যেই সন্ধ্যা নামে ধীরে
হারানো মেয়ের মুখ আসে ঘরে ফিরে!

রজনী-গন্ধা কন্যা

বটকৃষ্ণ দে

"Is she kind as she is fair?
For beauty leaves with kindness..."

[এক]

চৌরঙ্গীর পথ ধ'রে ডবল-ডেকরে ক'রে তুমি
চ'লে গেলে ; সোনা-সন্ধ্যা দীপ জ্বেলে তোমাকে বরণ
ক'রে নিলো। তুমি জানো, তোমার বাসর-রঙ্গভূমি

তোমারই প্রতীক্ষা করে। এদিকে আঁধার-উত্তরণ
আমার সন্ধ্যার স্বর্গ ম্লান করে। তুমি কালিঘাট
পেরিয়ে তখন দূরে, লেক রোডে। খোলা, ফাঁকা, মাঠ
তোমাকে সান্নিধ্যে পায়,—আর আমার আশার আকাশ
শান্তি ঘোষ ষ্ট্রীটে এসে সীমায়িত। স্বরের সুবাস
সারা রাত গায়ে মাখো। তোমার লনের লাল ফুল
রাত ভ'রে, গন্ধে ভ'রে, ঝ'রে গেলে সূর্য্যের মুকুল
ফের সাজি ভ'রে দেয়। আমার অশান্ত রাত নিয়ে
আকাশ তোমার চোখে শান্তিজল দিয়েছে ছিটিয়ে।
ঘুমাও, ঘুমাও তুমি শিশিরের অঝোর আওয়াজ
ছড়া কাটে, ছন্দে নীল শান্তি তার,—এ তোমারি আজ!

[দুই]

ঘুমাও, ঘুমাও রজনী-গন্ধা-কন্যা!
দক্ষিণী হাওয়া তোমার চুলের ঘ্রাণ
নিয়ে খেলা করে। খোঁপার রাত্রি বন্যা
গাঢ় ঘুম আনে, ঘুম-পাড়ানিয়া গান।
সূর্যমুখীরা ঘুমালো তোমার লনে
টিয়া-পাখি-কথা চুপ-চুপ; সুগোপনে
রাতের বাতাসে ঘুম-ঘুম ছড়া ফোটে
সে-ছন্দ-সুর কোমল-কলির ঠোঁটে
মৃদু চুমা আঁকে। ঘুমালে কী, দক্ষিণী?—
আমার আকাশে যে-তারা, তাকে তো চিনি,—
চোখে তার জ্বলে জাগর-বহ্নি-বাণ—
চন্দ্রে তোমার তন্দ্রাবুড়ির গান।
আমাকে দেবে না এতোটুকু সুখ তার?
আহা, থাক, থাক,....তুমিই হও আমার॥

নীল দ্বীপ

বংশীধারী দাস

হাঁসের মতন মনে উড়ে যেতে চেয়েছি যেখানে
সোনালী ভোরের আলো লুটোপুটি খায় ঢেউয়ে মিশে
যেখানে গভীর জলে লবণাক্ত হৃদয়ের ঘ্রাণে
অনেক শঙ্খিনী মেয়ে আপনার মৌতাতে বুঁদ
কামনার বাহুগুলো ঢেউ তোলে, ছড়ায় বুদ্‌বুদ
ঢেউয়ে জলে হৃদয়ের তটপ্রান্তে, মন শুধু কিসে
আপন আশ্রয় পাবে সেই খোঁজে গেছে বহু দূর
সমুদ্র পাখীর মত কোনো নীল দ্বীপের আহ্বানে।

কোনো নীল দ্বীপ বুঝি ঢের দূরে আছে কোনোখানে
সেখানে রোদের রং, সবুজ সবুজ দিনগুলি,
লিনেটের ঠোঁটে-ঝরা সাদা সুরে জীবনের মানে
সেখানে নোতুন হয়, সেখানে পৃথিবী সরে আসে
হৃদয়ের কাছাকাছি প্রেম হয়ে, দেহের সুবাসে
গোধূলি মদির করে, মেঘে মেঘে আরক্ত অঙ্গুলি
হৃদয়ে ছড়ায় রং, ফসলের ঘ্রাণ আনে স্বাদ
সুপ্রসন্ন আঝাশের মত ঢের দাক্ষিণ্যের দানে।

সেই নীল দ্বীপ বুঝি কোনো দূর সোনালী সময়
প্রবল উদ্যমে ডানা ঝাপটায় আমার হৃদয়।

বর্ষাদিনে : স্বগত

শান্তিকুমার ঘোষ

এই তো তোমার ছবি দুএকটা—
বর্ষা কোমল রূপ জল-সাদা মেঘে,
এ প্রাণ-গুহার মত—ঝর ঝর গান।

অথচ দেখছ এক স্তিমিত আভা—
ঝড়ের আগের নদী প্রতীক্ষ্যমান ঃ
ধরেছে অথই বুকে মেঘের ছায়া।

অথবা অপর রূপ চাঁদনী রাতের—
সোনালি খড়ের এক নৌকা ভাসে,
ওপারে বিজলী-বাতি ঘুম-নগরের।

এই তো সেদিন কবে যাওনি ভুলে
লঞ্চে ওপার যেতে জানলা দিয়ে
বাঁ হাত বাড়িয়ে জল তুমিও ছুঁলে।

ঘূর্ণীতে জ্বলে আলো টলটলে পারা ;
দুপুর গড়িয়ে ফের এসেছ বিকেল,—
সরস্বতীর মত স্বচ্ছ ধারা।

জলাভূমি মাঠ ছেড়ে বৃষ্টি আবার
নামলো কখন বেগে উষর মনে ঃ
আবার এসেছে কাল গীতিকবিতার।

সব-ই কি দিয়েছে মুছে নীল যবনিকা—
ছায়া-ছায়া ঘরবাড়ী সরে যায় ক্রমে ;
আজকে পৃথিবী যেন জলবিভাজিকা।

এক রাশ সাদা তুলো রাজহাঁসগুলি
ডুবিয়ে কমলা ঠোঁট উপর-জলে
হঠাৎ ফোটায় যেন পদ্মফুল-ই।

বৃষ্টির ধোঁয়া, ঢেউ, আলপনা জলে,
সাঁকোর ওপরে ট্রেন ঝনঝন রব,
পেয়ালার নীল কাচে পৃথিবীই দোলে।

সূর্যাস্তের পরে

(বাণীর জন্যে)

গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য

রিক্ত ভাণ্ড হৃত শস্যকণা
তোমারে কী দেবো বলো আর কিছু দেবার ছিল না।
অনেক আবেগ আর বন্ধনের অঙ্কুশ আঘাতে
ম্লানমুখী নক্ষত্রের রাতে
মুমূর্ষু স্বপ্নের মতো কত কী যে ভাঙা-গড়া হোলো
তবুও ফুরোলো
সে দিন ;—দিনের শেষে আগন্তুক বিবর্ণ বিকেল
তাই ত থেমেই গেলো জীবনের অবসন্ন মেল।
এর পরে কিছুকাল সুপ্রচুর অবসর ঘিরে
মানস-গঙ্গার তীরে—
এখানে সেখানে শুধু মধুলুব্ধ নৃত্যছন্দ দেখা
আর ছিল দিনলিপি লেখা।
তখন ভাবিনি
এ সব মুহূর্ত নিয়ে তোমাকেই করা হোলো ঋণী।

এখন মেঘে মেঘে সময়-বলাকার
আশার আল্পনা উধাও হোলো নাকি
এখন বাঁকে বাঁকে গোধূলি একাকার
আলোর এষণায় ভাবনা তুলে রাখি।
আরো যে আশা ছিল তোমারে বলিনি
এ রাত শেষ হোলে কবে যে দেখা হবে
সে ধারা ঝরো-ঝরো শ্রাবণে অবিরত
তোমারে খুঁজে পাব তোমারি অনুভবে।

স্বাতীর চোখ কাঁপে গভীর অনুরাগে ঃ
তোমারে ভালো লাগে॥

কুমারসম্ভব থেকে

অনুবাদ—দিলীপ দত্ত

স্বর্ণভূষণ ফেলে দিয়ে
গিরিনন্দিনী সাজলেন পুষ্পসাজে
ফেলে দিলেন পদ্মরাগ মণি
খুললেন মুক্তার হার, কানের দুল
পরলেন কুসুমের মালা।

নবঅরুণোদয়ের মত
তাঁর বসনের রং
যৌবনভারে দেহলতা অবনত
পার্ব্বতী যেন পুষ্পভরে নম্র
পল্লবিনী লতা।

চকিত চাহনিতে মধু ঝরছে
ভ্রমরগণ আকুল হয় মধুর নিঃশ্বাসে,
পদ্ম সঞ্চালন করে
অতি কষ্টে নিবারণ করছেন
চঞ্চল লীলা।

গিরিনন্দিনী প্রণাম করলেন
শিবের পায়ে
অঙ্গ থেকে খসে পড়ল
একটি ফুল।

জনান্তিকে

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার অনেক মৃত্যু হ'য়ে গেছে যুগে আর যুগে
তবু আজো বেঁচে থাকা, দায় সারা, প্রত্যহের যূপে
অগত্যা গলানো গলা
মন চল্‌ছে না তবু জোর ক'রে চলা
টেনে টেনে হাসা আর মেপে কথা বলা
সকলের সাথে সায় দিয়ে যাওয়া হাজার হুজুগে,
ব্যাধি থেকে সেরে ওঠা দীর্ঘকাল ভুগে—
পলে পলে এত ক্লান্তি কোথা থেকে আসে
ভাব্‌তে অবাক লাগে ; দিনে দিনে ব্যর্থ বারো মাসে
জমে ওঠে জীবনের যতো সব অহেতুক গ্লানি
আয়ুর উৎসের থেকে এদের কি নিত্য ব'য়ে আনি ?
তবুও শরীরে মনে অনুভব করি আজো দিব্যি বেঁচে আছি
—একান্ত প্রাণান্তকর, এ ঘটনা মৃত্যুরই যেন কাছাকাছি !

"মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যদি এতই প্রলয়
প্রণয়ের স্মৃতি কেন গভীর স্মরণে ?"
—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জলৌকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

[এক]

প্রথম বঙ্গাব্দের অর্দ্ধশতক সমাপ্ত। সমতট-রাজ দেবখড়্গ চতুর্দ্দশ শারদ-কাল বাংলার সিংহাসন অলঙ্কৃত করে ক্লান্ত। যুবরাজ রাজভট মগধেশ্বর আদিত্যসেনের নিকট দূতক হিসেবে এই সংবাদ বহন করে এনেছেন। আজ বাংলাদেশ আপন রাজ্যগৌরবে আপন সনাঙ্ক প্রচলিত করতে চলল। হর্ষাব্দ-প্রচলক কুমার-আমাত্য লোকনাথ আর ইহলোকে নেই।

আদিত্যসেন রাজভটকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর এই ব্রাহ্মণ যুবরাজের পদস্পর্শ করতে চাইলেন। রাজভট দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বল্লেন: "সম্রাটের হাত দেবতার স্পর্শময়। আমার অকল্যাণ, বাংলার অশুভ আহ্বান করবেন না, সম্রাট!"

আদিত্যসেন ভক্তিগদ্‌গদ হয়ে চোখ বুঁজে রইলেন খানিকক্ষণ। সিংহাসনে ফিরে গেলেন। রাজসভা নিস্পন্দ। একটি পাবকশিখার মতো রাজভটের দিব্যজ্যোতি সভাসদনের দিবালোক উজ্জ্বলতর করে দিচ্ছিল। তাঁর কথার ভঙ্গীতে সভাসদরা বিমূঢ়।

সিংহাসন আরোহণ করে সম্রাট আদিত্যসেন বল্লেন: "আমার সৈন্যবল বাংলা-আসামকে কুরুসেনার কবল থেকে মুক্ত করতে পারেনি। মহারাজ দেবখড়্গ সে অসাধ্য-সাধন করে আজ 'কর্ম্মান্ত-নগরে' বিশ্রাম প্রার্থী। দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসরের অক্লান্ত শ্রমে তিনি চৈনিক দস্যু 'বঙ্গ হূণ ৎসে'র পদলেহীদের নিশ্চিহ্ন করেছেন। আপনারা কেউ-কেউ নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারেন সেই কুখ্যাত দস্যুর অত্যাচার। দস্যু হূণ ৎসের নাগা সৈন্যদল ভারতের শত-শত নগর লুণ্ঠন করেছে, যেহেতু তাঁদের প্রাণপ্রিয় হর্ষবর্দ্ধন নিহত। শকহূণের কৃপাভাজন ভাস্করবর্ম্মণ আর লোকনাথ আজ জীবন থেকে অপসারিত। আজ ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতার নিঃশ্বাস গ্রহণ করছে।"

সম্রাট ক্লান্ত হলেন। বহু কথা দানপত্রে লেখা হয়, মুখে বলা হয় না। তিনি রাজপ্রশস্তি মুখে বলতে গিয়ে এখন যেন হৃদপিণ্ডে শ্বাস নিতে পারছিলেন না। চক্ষু মুদ্রিত করলেন আদিত্য সেন।

কুশদ্বীপী ব্রাহ্মণ রাজভট মৃদু হেসে মধুর কণ্ঠে বল্লেন: "ব্রাহ্মণ দান প্রার্থী, সম্রাট!"

সভাজনের চোখ বিস্ফারিত হল। দূর প্রান্তের দু'টি সেনানী মুচকি হেসে এ-ওর গায়ে চিমটি কাটলেন। চিম্‌টি-খাওয়া সেনানী চিম্‌টি-দেওয়া সেনানীকে ভ্রূ-আস্ফালন

দেখিয়ে জানতে চাইলেন, আঙ্গিক অস্ত্রাঘাতের মূল তাৎপর্য্য কি। মন্তব্য হল: বামুনরা রাজতক্তে বসলেও ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়বেনা।

হয়ত রাজভটও এ-কথা শুনলেন। কিন্তু বিচলিত না হয়ে ওষ্ঠপ্রান্ত তিনি প্রশান্ততর হাসিতে নম্র রেখাঙ্কিত করে তুললেন।

আদিত্যসেন শীতের সূর্য্যের মতো রক্তিম চোখ মেলে বল্লেন: "আমার কী সাধ্য যে মহিমময় ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করি? দিতে পারি উপাধি আর ভূমি! তুমি আজ বাংলার সার্ব্বভৌম অধীশ্বর—তোমাকে 'রাজরাজ' উপাধি ছাড়া আর কিছু দেয় নেই। আর ভূমি? বৌদ্ধ আশ্রম আম্রবপুরী আমি তোমাকে দান করলাম। মহামাত্য, দানপত্র লিখবার নির্দ্দেশ দিন।"

কন্যার প্রস্তাবে রাজভট মাথা নত করে ফেলেছিলেন। তাঁর শ্রুতিপথও যেন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর সম্রাট যা বল্লেন তার এক অক্ষরও তাঁর কানে স্পষ্ট হলনা—শুধু খানিকটা ভ্রমর-গুঞ্জন শুনলেন তিনি। নৌ-আরোহণে শতশত ক্রোশ-পথ অতিক্রম করার ফলেই কি শ্রুতিপথ এমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল?

আদিত্যসেনেরও যেন বাক্‌যন্ত্র ক্রমে রুদ্ধ হয়ে পড়ছিল। তিনি অসুস্থতা বোধ করছিলেন। ফলে রাজসভা সেদিনকার মতো ভঙ্গ হল।

[দুই]

যুবরাজের আগমনে দক্ষিণ রাঢ়ের নগরী 'মহানাদ' পত্রপুষ্পে তোরণে রাজপথ সজ্জিত করছিল। রাজভট যে মহানাদেরই সুসন্তান। কিন্তু বৌদ্ধ দল যুবরাজের আগমন উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসব বর্জন করবার পক্ষপাতী ছিলেন। তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ আজ পঞ্চগৌড়ের একচ্ছত্র নৃপতি! এর চাইতে অগৌরবের অধ্যায় আর কি হতে পারে? কিন্তু এ-দ্বন্দ্বের নিরসন হয়ে গেল দু'দিনের মধ্যেই। নগর-প্রমুখ সংবাদ রাষ্ট্র করলেন যে যুবরাজ রাজ-রাজ রাজভট নালন্দা-বিহারে সম্রাট আদিত্যসেনের আতিথেয়তা ভুঞ্জন করবেন, মহানাদে পদার্পণ করবেন না। রাজপথে পৌর বৃদ্ধরা বিতর্ক তুললেন খড়্গবংশ নিয়ে। কেউ-কেউ এ-মন্তব্য করলেন যে মূলত ওঁরা গুপ্ত কিম্বা নাগ বংশ, আদৌ ব্রাহ্মণ নন। গৌড়-ব্রাহ্মণ। যেম্নি সেনরা-ও ব্রাহ্মণ! বাংলার ব্রাহ্মণের ঠিক-ঠিকানা আছে না কি!

মহানাদ শান্ত হল। কিন্তু অশান্তি দেখা গেল মগধের রাজধানীতে। সম্রাট আদিত্য সেন বাস্তবপক্ষে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

অবশ্য তার দরুন যে মগধে বিশেষ ক্ষোভ ছিল তা নয়। মধ্যভারতে হর্ষবর্দ্ধনের রক্ত তখনও শৈলবংশের গৃহদীপে সল্‌তে হয়ে আছে। সেন আর গুপ্ত চাতুরী শক্তিহীন হলেই পঞ্চগৌড়ে আবার বর্দ্ধনের বিজয়-নিশান উড়বে। ভারতের আদিশূর কে তার পরীক্ষা ত চল্‌ছেই। সেন, গুপ্ত, বর্ম্মণ মিশে যে বর্দ্ধন হল তা কে না জানে! গৃহযুদ্ধ চলুক—আসুক চীন, আসুক শক হূণ—মগধ যে তিমিরে সে তিমিরে।

কিন্তু সম্রাট-পরিবার তিমির-মুক্তি চাইছিলেন। রাজভটের আবির্ভাবে তাঁরা ঘনায়মান অন্ধকার দেখতে পেলেন না, দেখলেন সূর্য্যালোক। সূর্য্য-নারায়ণ যেন এই বাকাটক পরিবারে সশরীরে আবির্ভূত হলেন। রাজ-পুরন্ধ্রীরা তা-ই ভেবে নিয়েছিলেন। বৃদ্ধ সম্রাটও যে মোহবশে তা ভাবেন নি এমন নয়। ত্রিপুরার তন্ত্রশাস্ত্রের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন মগধেশ্বর আদিত্যসেন।

যুবরাজ রাজভট তান্ত্রিক নন। তবে তাঁর জননী প্রভাবতী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের কন্যা। তন্ত্রাচার তাঁর পরিবারে পালিত হয়। চণ্ডী দেবীর দ্বারে রাজপুত লোকনাথকে বলি দেওয়া হয়েছে, এ-সংবাদ শুনতে না চাইলেও তার শ্রুতিতে এসেছে। কৈশোরে প্রভাবতী কুমারীপূজা পেয়ে পেয়ে দেবী-পদে উন্নীতা। রাজভট দেবী বলতে এই পট্টমহাদেবীর মূর্ত্তিকেই চেনেন। তিনি অনুভব করেন, তাঁর মায়ের দৈব শক্তি কোনদিনই তাঁর হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেনা।

রাজভট মগধের সম্রাট-পরিবারেও দেবীকায়াদের দেখতে পেলেন। মেঘবরণী রাজকন্যা চন্দা তাঁর মনে নদী মেঘ্নার মূর্ত্তি হয়ে ঢেউ তুলতে লাগল। রাজভট অনুভব করল, এই চন্দার মুখ বুঝি লক্ষ-লক্ষ জন্মজন্মান্তরে তাঁর চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজভট মুগ্ধ হলেন। কিন্তু মোহ ব্যক্ত করবার উপায় নেই। দেবীর দ্বার বন্ধ করে দিয়েছে আদিত্যসেনের একটি কথা।

নালন্দা ভ্রমণ শেষ করে রাজরাজ দিবসত্রয় অতিবাহিত করলেন সম্রাটের অন্তঃপুরে। আদিত্যসেন শয্যাশায়ী। নাড়ীর রক্তস্রোত ঊর্দ্ধমুখী হয়েছে। হয়ত দুশ্চিন্তায়। পূর্ব্বগগনে নবারুণ উদয়ে তিনি হয়ত মনে মনে স্বস্তি অনুভব করছিলেন না। বাংলার দশা বা অন্তর্দ্দশা নিয়ে তাঁর ভাবনা নেই। ভারতের ভাগ্য নিয়ে তাঁর দুর্ভাবনা। রাজভট গুপ্ত-ব্রাহ্মণ কি আবার গাত্রোত্থান করল? তান্ত্রিক! কথাটা উচ্চারণ করেই সর্ব্বশরীরে শিউরে উঠলেন আদিত্যসেন। কামাখ্যার ব্রাহ্মণ। ভীত হলেন সম্রাট। পিতামহ সম্রাট মহাসেন গুপ্ত কামাখ্যা-নাথ সুস্থিতবর্ম্মণকে পরাজিত করেছিলেন। এ-ব্রাহ্মণ সন্তান কি পরাভবের প্রতিশোধ নিতে তাঁর গৃহে আগত হলেন? আদিত্যসেন দুশ্চিন্তার রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হতে পারছিলেন না।

কিন্তু সম্রাট-পত্নী যশোমতী রাষ্ট্রের কূট-নীতিকে সুপেয় করে তোলেন নি কোনোদিন। তাঁর পৃথুল দেহের মতোই ছিল বিশাল মন। রাজভটকে তিনি সন্তানের আদরে ঘরে তুলে নিয়েছিলেন। প্রথমদর্শনেই বলেছিলেন: "এ চন্দ্রকণা আমার ঘরে কোথায় রাখি? কোন্ মল্লিনে ঢাক্‌ব এ তনু?"

আপন সৌন্দর্য্যে লজ্জিত হয়েছিলেন রাজভট। মল্লিনের উত্তরীয় তাঁর গাত্রবেষ্টন করে আর বুঝি থাকতে চাইছিল না। তনু-লাবণ্য উপছে পড়ে যেন যুবরাজকে আরো বেশি নিরাভরণ করে তুলছিল।

[তিন]

কিন্তু চন্দার মন অদ্ভুত। কেমন যেন ভয় আর লুব্ধতা মেশানো। রাজভটকে আড়াল থেকে অপলক দৃষ্টিতে দেখতে বাধা নেই কিন্তু সামনাসামনি হলেই চোখ বুঁজে আসে তার। রাজভটের জন্যে স্বর্ণ-থালিকায় কর্পূর-গুৰাক বহন করে নিতে হবে শুনে যশোমতীর মুখেও একদিন সে ভীতি-বিহ্বল চোখে তাকিয়ে বলেছিল: "কেন? আমি নিয়ে যাব কেন?"

অন্তঃপুরের সম্রাজ্ঞী যশোমতী বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন: "রাজরাজ-ও রাজার ছেলে, নিয়ে যাবেনা কেন?"

তাম্বুল-করঙ্কবাহিনীর মতো বিষণ্নমুখে থালিকাটি নিয়ে রাজভটের প্রকোষ্ঠে যেতে হয়েছিল চন্দাকে। আনত হতে হয়েছিল যুবরাজের হাতের উপর, যে দৃশ্য প্রণয়াকাঙ্ক্ষা বোঝায়। প্রণয়-অপ্রণয় হৃদয়ের স্পন্দনে বুঝতে শিখেনি চন্দা, শিখেছে রীতিনীতিতে। পুরবৃদ্ধারা কতো গল্পছলে প্রণয়-ভঙ্গী বোঝাতে চেয়েছেন তাকে, কিন্তু তার মনে হত সবই অসম্ভব।

রাজভট থালিকা গ্রহণ না করে চন্দার চম্পকাঙ্গুলী স্পর্শ করলেন। সপ্রতিভ হয়ে বললেন: "চম্পার মেয়েদের আঙ্গুল কি সত্যি চাঁপাফুলের মতো মুদ্রিত?"

ভয়ে কাঁপতে লাগল চন্দা। বিম্বাধরের শোণিমা অন্তর্হিত হল। মনে হল, বিদ্যুৎ-গতিতে দেহের সমস্ত রক্ত স্পৃষ্ট অঙ্গুলীর গাত্রে ছুটে চলেছে।

খানিকটা কর্পূর-গুবাক মুখে পুরে রাজভট বল্‌লেন: "শুধু রাজকন্যাকে আমি দেখতে পাইনে!" রাজভট আপনমনে হাসলেন: "কতো স্নাতকা দেখে এলাম নালন্দায়, রাজকন্যা ত নেই!"

ভিক্ষুর দৃষ্টিতে উদাস হয়ে রইলেন রাজভট।

এক পলক তাকাতে ইচ্ছে করল চন্দার রাজভটের মুখে। এমন সুন্দর কথা

বলেন যিনি তার সুন্দর মুখ কতোটুকু সুন্দর তা না দেখে গৃহত্যাগ করতে চাইলনা তার কায়মন।

রাজভট যেন জীমূতদেবীকায়া মূর্ত্তি ধ্যান করছিলেন। নবদ্বীপের একটি মন্দিরে কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত যে মূর্ত্তি তিনি দেখে এসেছেন। একই রকম সালঙ্কারা। মুখমণ্ডলে একই রকম বিষণ্ণ শ্রী। চন্দাকে দেখেই কি কোনো কলিত-শিল্পী নবদ্বীপকে মাতাল করে দিয়েছে ওই শিল্প-শ্রীতে? আর—আর—হাস্যকর হলেও একটা কথাকে রাজভট নির্য্যাতিত করতে পারলেন না মনে—মন থেকে গ্রীবায় কতগুলো অব্যক্ত ধ্বনি উঠে এলো: "জীমূতকায়া দেবীকে আমি পত্নীরূপে প্রার্থনা করেছি।"

দেবী চোখ তুলে তাকালেন। চন্দা তাকাল রাজভটের মুখে। দু'টি তারা দূর থেকে এসে তারামৈত্রীতে যেমন এক হয়ে যায়, চন্দার চোখের তারাগুলো তা-ই হতে চাইল। তাদের ইচ্ছে করল রাজভটের চোখের তারা দু'টোতে মিশে যেতে।

বহু যুদ্ধজয়ের আনন্দ সেই একটি মুহূর্ত্তে ঘনীভূত হয়ে রাজভটকে সমাধিস্থ করে ফেলতে চাইল। প্রাণপণে জাগ্রত থেকে রাজভট আনন্দের তরঙ্গগুলো উপভোগ করতে প্রয়াসী হলেন। শিহরণে রোমাঞ্চিত হল তাঁর শরীর—অশরীরী হয়ে যেতে সুরু করল সত্তা। গলদশ্রু হল চক্ষু। তবু সেই বর্ষা-ধূসরতায় দৃষ্টি প্রেরণ করলেন তিনি চন্দা-মূর্ত্তিতে। এ কী!

ইয়েষ সা কর্তু মবন্ধ্যরূপতাম্
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ।

কোথায় চন্দার রূপ! তপতীর রূপ কোথায়! শুধু জ্যোতির্ম্ময়তা!

চন্দার কান্না পেলো। বলতে পারবেনা, কেন! বিদ্যুল্লতার চমকানো গতিতে কক্ষ ত্যাগ করল রাজকন্যা।

[চার]

তিনদিন কক্ষবদ্ধ হয়ে আছেন রাজভট। রাজধানীতে রাষ্ট্র যে সম্রাট আদিত্যসেনের ইষ্ট কামনায় সমতটের ব্রহ্মণ তান্ত্রিক-যাগ করছেন। সম্রাট সুস্থ হলে হয়ত এই তান্ত্রিকের হাতেই রাজ্যভার অর্পণ করবেন। নানা অসুস্থ জল্পনায় পাটলিপুত্র ক্রুদ্ধ ও অসুস্থ হয়ে উঠ্‌তে লাগল! কৌটিল্যের রাষ্ট্রনীতি বহু কষ্টে দূর করা গেছে। হর্ষের পর আবারও চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব বহু নাগরিকের দুঃস্বপ্নের বস্তু হয়ে উঠল।

যশোমতীও ভাবছিলেন, এই ব্রাহ্মণ-কুমার অসামান্য ঈশ্বরভাবময়। যেন সাক্ষাৎ দৈবকীপুত্র। পরীক্ষিৎকে বাঁচিয়েছিলেন তিনি যে দৈবশক্তিতে, সম্রাটকেও যেন রাজরাজ

তেম্নি বাঁচিয়ে দিতে পারেন। দেবতার অংশ নিয়ে না জন্মালে কি এতো রূপ কারো হয়? রাজরাজ রুদ্ধদ্বার গৃহে নিশ্চয়ই দেবতাহ্বান করেছেন রাজপুরীর মঙ্গল-কামনায়।

ভাবনাতেও স্বস্তি পাচ্ছিলেন না যশোমতী। তিনি তৃতীয়দিবসের দ্বিপ্রহরে রাজভট-দর্শনে এলেন।

দেবী-জননীর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি পান করে রাজভট উন্মন চিত্তে বল্‌লে: "সম্রাট কি আজ বেশি কাতর হয়েছেন?"

"হাঁ!" যশোমতী ভূতলে বসে পড়লেন: "তুমি কি করে জানলে, বাবা?"

রাজভট গাত্রোত্থান করে বল্‌লেন: "আপনাকে দেখে!"

"না।"

"না?" ম্লান হাসলেন রাজভট।

"সম্রাটের প্রাণরক্ষা করা তোমার হাতে! বৈদ্য-ভিষক কেউ তা পারবেনা, আমি জানি!" বিশ্বাসের ব্যাকুলতায় সম্রাজ্ঞী ভিক্ষুণীর দৃষ্টিতে তাকালেন।

"সর্ব্বদেবময়ীর কাছে আমি প্রার্থনা জানাব, সম্রাজ্ঞী, সম্রাটের কল্যাণ কামনায়।" রাজভট মায়ের মূর্ত্তি চোখের সামনে ধরে বল্‌লেন: "সেই শক্তি নিশ্চয়ই সম্রাটের নীরোগ দেহে পুলকিত হন!"

"সম্রাটের রোগশয্যার পাশে তুমি একটুক্ষণের জন্যে যাবে, বাবা?"

"আমি? আমি গেলে কি হবে?" প্রশান্ত হাসিতে উজ্জ্বলতর দেখাল রাজভটের মুখ।

অনুনয়ে দেবতা টলেন না, যশোমতী জানেন। তিনি ক্ষুব্ধও হতে পারলেন না। পাছে দেবতা অসন্তুষ্ট হন। সামান্য আশা নিয়ে তাঁকে বিদায় হতে হল।

কিন্তু সত্যি কি নর-নারায়ণকে যশোমতী টলাতে জানেন না? অনুরোধে কি মানুষী মনে সুবাতাসের দোলা লাগেনা?

রাত্রির প্রথম যামে চন্দা রাজভটের গৃহে এলো। সালঙ্কারা কন্যা নয়। দীনতার মূর্ত্তি। তপস্বিনী। তপস্বিনী কোনো পুরুষ প্রাণের জন্যে। সে-পুরুষ কি রাজভট? তেমন সুকৃতি কি তাঁর আছে? আদিত্যসেনের বিশাল গৌরবের জ্যোতি পার হয়ে কি রাজভট এমন কোনো স্থানে আসতে পেরেছে, যেস্থান চন্দার চোখে পরম রমণীয়?

রাজভট তবু সাগ্রহে চন্দার গৃহীতকর হয়ে দাঁড়ালেন। চন্দা স্বেদ-শিহরণ অনুভব করলনা। সমর্পণের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে বল্‌লে: "তুমি—তুমি কি বাবাকে বাঁচাতে পারো না?"

রাজভট এ-প্রশ্নের উত্তর জানেননা। তাই তিনি জানতে চাইলেন, দেবীকায়া আলিঙ্গনে নিজদেহে কতোটুকু প্রাণশক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। বেণীবন্ধে দুর্ব্বাদলের মাঝে-

মাঝে মধুকফুল গোঁজা—তার গন্ধ দুর্ব্বার মত্ততার ভূমিকা তৈরী করতে উৎসুক। রাজভট চন্দার করমুক্ত হয়ে দ্বার-প্রান্তে গেলেন। দ্বারের বাইরে ঘুমন্ত পুরী। তিনি দ্বার রুদ্ধ করলেন।

[পাঁচ]

প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করে রাজভট সম্রাটের রোগশয্যার পাশে যাবেন স্থির করলেন। কোমরবন্ধে একটি শাণিত ছুরিকা। যার স্পর্শমাত্র প্রবীণ হস্তীর ত্বক দ্বিধা হয়ে যায় তেম্নি এই ক্ষুদ্রাস্ত্র। বহু সমরের সঙ্গী এ-ছুরিকা তাঁর। আত্মনাশের উপকরণ।

প্রত্যূষের ধূসরতা ভেঙে শাণিত দৃষ্টি চালিয়ে রাজভট অলিন্দের পর অলিন্দ অতিক্রম করলেন। শান্ত্রীরা ভূমি-স্পর্শ করে তাঁকে প্রণাম জানালো। এ-যেন তাঁদেরও সূর্য্য-নারায়ণ দর্শন।

রাজগৃহ বিনিদ্র। সেবক-সেবিকা, চিকিৎসক পরিবৃত সম্রাট আদিত্যসেন বিনিদ্র। নিদ্রা-তাড়নে ক্লান্ত বিবর্ণ সম্রাজ্ঞী যশোমতীর মুখ। চন্দা নেই।

চন্দা নেই! যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললেন রাজভট।

যশোমতী প্রত্যুত্থান করে উজ্জ্বল হাস্যে বললেন: "এসেছ?"

আদিত্যসেনের অবসন্ন কণ্ঠ ম্লান প্রতিধ্বনি তুলল: "কে?"

"রাজরাজ।" উৎফুল্ল হয়ে উঠল যশোমতীর কণ্ঠস্বর।

অস্ফূট কাতরোক্তি করে আদিত্যসেন চক্ষু মুদ্রিত করলেন।

রাজভট যন্ত্রচালিতের মতো সম্রাটের শয্যা-পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভিষক-চিকিৎসকরা সন্ত্রস্ত, ভয়-তটস্থ। রাজভট তাঁদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন: "আপনারা বুঝি শুধু জলৌষধি ব্যবস্থা করেছেন?"

বৃদ্ধ চিকিৎসক মুখ খুলতে চাইলেন: "ব্রাহ্মীশাক··"

কিন্তু তিনি অধিক বাক্যব্যয় করতে পারলেন না। রাজভট ভিষকের চোখে চোখ রেখে বল্লেন: "জলৌকা-চিকিৎসা করেছেন?"

ভিষক যেন ধ্বংস-লীলার সম্মুখীন হয়েছেন, এম্নি ভীত স্বরে বল্লেন: "রাজদেহ থেকে রক্তমোক্ষণ?"

"হাঁ।" রাজভট কঠিন কণ্ঠে বল্লেন এবং তারপর দ্বিরুক্তি না করে হাতে ছুরিকা আকর্ষণ করে বল্লেন: "দেখুন।"

কারো কিছু দেখবার মতো দৃশ্য তা নয়। সবাই চক্ষু মুদ্রিত করলেন সে-মুহূর্ত্তে।

আদিত্যসেনের বাম কপোল-কপালের সন্ধিস্থান বেয়ে রক্তধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। রাজভট স্বীয় ধৌত-প্রাবরণে ক্ষতস্থান ঢেকে রাখলেন পলত্রয় কাল। অতঃপর অঙ্গুলী নিষ্পেষণে ক্ষতমুখ রুদ্ধ করে বসন-খণ্ডে সম্রাটের মস্তক বন্ধন করলেন।

পরম স্বস্তিতে যখন আদিত্যসেন অস্ফূট "আঃ"ধ্বনিতে চোখ মেলে তাকালেন, তখন তাঁর চোখের লোহিতাভা অস্ত যাচ্ছে।

কম্পিতকলেবর গৃহস্থ মানুষগুলোও তখন চোখ মেলে তাকাবার সাহস সঞ্চয় করেছে দেখা গেল।

রক্তাক্ত প্রাবরণ একটি সেবিকার হাতে অর্পণ করে রাজভট বল্লেন: "সম্রাট কি সুস্থ বোধ করছেন না?"

আদিত্যসেনের কণ্ঠ শুনল বিমূঢ় জনতা: "তুমি জীবনদাতা।"

[ছয়]

কিন্তু পাটলিপুত্রের জনতা সম্রাটের এই বাক্য শুনতে চাইলে না। তারা ক্ষিপ্ত। রাজগৃহে তান্ত্রিকের স্থান হতে পারে না। যদি হয়, রাজপ্রাসাদকেও তারা অমান্য করবে—হয়ত অমান্য করবে সম্রাট আদিত্যসেনকেও।

মহাসন্ধিবিগ্রহিক সংবাদটি রাজ-অন্তঃপুরে নিবেদন করতে এলেন। রাজভটের প্রশ্নে তিনি পুনঃপুনঃ লজ্জিত হচ্ছিলেন কিন্তু সত্য-সংবাদ-দানে কুণ্ঠিত হলেন না। রাজভট বক্র হাস্যে মুখ বিকৃত করলেন না। সংযত, উদার কণ্ঠে বল্লেন: "আমি অতিথি। এক-তিথির অধিক কাল বাস করা আমারই অন্যায়, মহামাত্য!"

সন্ধিবিগ্রহিক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন; "আমাদের ন্যায়-অন্যায় বোধ যদি সবার থাকত!"

সংবাদটি সম্রাটকে জানানো হলনা। তিনি জানলেন, আজই রাজরাজ সমতটে ফিরে যাচ্ছেন। গঙ্গার ঘাটে তাঁর রণতরী সুসজ্জিত হয়েছে।

রাজভট স্বদেশ-প্রত্যাগত হচ্ছেন। দীনতার পরিচ্ছদে নিজকে ভূষিত করে নিলেন। কর্ণ থেকে মুক্তার কুণ্ডল অপসারিত হল। মশ্লিনের উত্তরীয় সাধারণ অগ্নিপট্টের স্থান করে দিল। পাদুকা-ও পরিহার করলেন তিনি।

যশোমতী ভাবছিলেন, এ-যেন রামের বন-গমন দৃশ্য দেখতে থাকা। সপ্তদিবসেই যে ছেলে হৃদয়ে সন্তানের অধিক স্থান লাভ করেছে—তাকে বিদায় দেবার ব্যথা তিনি বুঝি সহ্য করতে পারবেন না! এ তো প্রতিমা বিসর্জ্জন নয়—এ যেন আত্মজকে চির-জীবনের মতো জলে ভাসিয়ে দেওয়া! আর সে আত্মজ কে? পালক বিষ্ণুশক্তি!

কিন্তু বিদায়ের সময় আগত হ'ল। যশোমতী আদিত্যসেনের প্রকোষ্ঠে পলায়ন করলেন। সম্রাটের সাহচর্য্যে যদি তাঁর হৃদয় খানিকটা কঠোর হয়, এই আশায়।

রাজভট চন্দাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতেই শুনলেন, চন্দা ত্বরিত-গ্রীবা-ভঙ্গীতে বল্‌লে : "না।" রাজভট তাকে স্মৃতিতে তুলে নিতে চাইলেন পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। রাজকন্যা পালিয়ে গেল।

যুবরাজ সম্রাট-প্রকোষ্ঠে গেলেন। মাতা, কন্যা আর পিতা। আর জনপ্রাণী নেই। সম্রাট স্বর্ণ-খচিত উপাধানে গাত্র বিন্যাস করে নিরাময়তা উপভোগ করছেন। যশোমতী পাদদেশে দণ্ডায়মানা—কন্যা শিয়র-ভাগে।

রাজভটের ম্লান মুখে এক পলক তাকিয়ে যশোমতী ধৈর্য্যহারা হয়ে গেলেন। নাড়ী-ছেঁড়ার যন্ত্রণা সর্ব্বশরীরে। বুঝতে পারলেন না, কেন এমন হল, কেন এমন হয়, কেন এমন হবে। বুঝতে পারলেন না, কার উপদেশে তাঁর পদযুগল চঞ্চল হয়ে উঠছে। কিছুতেই সম্রাটের সমীপে থাকৃতে দিচ্ছেনা। বেতস-পত্রের একটা শির্‌-শির্‌ ধ্বনিও তিনি যেন অনুভব করছেন শ্রুতিতে।

যশোমতী ছুটে এলেন। প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলেন রাজভটকে। বহু কষ্টে বল্‌লেন : "বিদায় চেয়ো না!"

রাজভট ধীরে-ধীরে আত্মমোচন করে সম্রাটকে অভিবাদন জানালেন দূতক-ভঙ্গীতে। বললেন : "আমার পরম-আরাধ্য পিতা গৌড়েশ্বরকে আপনার কোনো নির্দ্দেশ প্রেরণ করবার আছে কি, সম্রাট?"

বিপন্নের ভঙ্গীতে দু'পাশে মস্তক সঞ্চালন করলেন আদিত্যসেন।

রাজভট প্রস্থানোদ্যোগ দেখালেন।

আর ঠিক সে-মুহূর্ত্তে চন্দা এগিয়ে এসে বল্‌লে ; "আমাকে নিয়ে যাবেনা ?"

যশোমতী যেন দৈববাণী শুনতে পেলেন।

রাজভট বিমূঢ়ের মতো বললেন : "তোমাকে—"

"হাঁ, আমাকে!" অনুরোধ নয়, আদেশ নয়—প্রস্তর-পাত্রে সুপানীয়ের মতো লোভনীয় একটু ধ্বনি।

প্রাণধ্বনি শুনছিলেন যশোমতী হৃদ্‌স্পন্দনে।

আদিত্যসেন বুঝতে পারলেন না কিসের গুপ্ত-ষড়যন্ত্র চলছে।

চন্দা তার মায়ের মতই পায়ে চঞ্চলতা অনুভব করল।

রাজভটের পা জড়িয়ে যাচ্ছে মাটির সঙ্গে। গৃহভিত্তির প্রবাল-আস্তরণের মসৃণতায় মুখ দেখতে লাগলেন ব্রাহ্মণ-কুমার।

গড় শ্রীখণ্ড

অমিয়ভূষণ মজুমদার

[পূর্ব্বানুস্মৃতি]

সাপ্তাহিক খোঁজ-খবর নেবার দিনে চৈতন্য সাহার এজাহারটা আবার কনক দারোগার নজরে পড়িল। এর আগে পড়ে সে ছোট দারোগা ছলিমুল্লার সাথে একমত হ'য়েছিল। এজাহারটাই উল্টোপাল্টা কথায় তৈরী। যে মারব বলে লাঠি নিয়ে যায়, সে আবার ধর্মকথা শুনিয়ে বলে খবরদার ধান কাটবে না। আর এই মূল আসামীর সাথে আর একদল যোগ রাখছে গানের সূত্রে। ছলিমুল্লা বলেছিল,—গানের বিরুদ্ধে এজাহার, থানার দারোগা কি করবে? জমিদারও নাকি রামচন্দ্রর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। প্রমাণ কি? জমিদার বাকি খাজনার জন্য মামলা করবে বলেছে। জমিদারের খাজনা আদায় যে ধারার অপরাধ সে ধারা পিনালকোডে নেই। কনক হেসে কিছু মন্তব্য ক'রে ডায়েরি রেখে দিয়েছিল।

আজ দ্বিতীয়বার পড়তে গিয়ে কনক চুরুট ধরাল। এজাহারে অন্তত একটি বিষয় আছে, মহাজনের বিরুদ্ধে চাষীদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিকূলতা। আপাতদৃষ্টিতে খাজনার জন্য মহাজনের উপরে চাপ দেয়া জমিদারের পক্ষে স্বাভাবিক, সেটির সাথে চাষীদের প্রতিকূলতার কোন যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু এক্ষেত্রে কনক যোগাযোগের সূত্রটি কল্পনা ক'রে নিল—সান্যাল মশাইএর সে ছেলেটি তবে গ্রামে ফিরেছে।

দশ মিনিটের মধ্যে কনক ঘোড়ায় চড়ে রওনা হ'ল চিকন্দির দিকে। চিকন্দির গাছ-গাছরা ঢাকা পথে তখনও রোদ কড়া হ'য়ে উঠে নি, কিন্তু এতখানি পথ জোরে ছুটে এসে দুপুরের রোদে-পোড়া ঘর্মাক্ত একজন দারোগার মতো দেখাচ্ছে তাকে। এরকম চেহারা নিয়ে সান্যালবাড়ী যাওয়া চলে না। ঘোড়া থামিয়ে কনক তার প্রকাণ্ড রুমালখানি বার করে ঘাম মুছল, সিগারেট ধরাল, খানিকটা সময় স্থির হ'য়ে রইল ; তার ও তার ঘোড়ার নিশ্বাসে সমতা এলে আবার সে চলতে আরম্ভ করল।

আর খানিকটা যাবার পর কনক দেখতে পেল, একজন স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষ আসছে। স্ত্রীলোকটির পরনের শাড়ীটি দামী নয়, কিন্তু পরিচ্ছন্ন এবং উজ্জ্বল রঙের। এদের চলার ঢঙ্‌ কিশোর বয়সের ভাই বোনের পক্ষে স্বাভাবিক হ'ত। এবয়সে এরকম চলা প্রথম-প্রণয়ী সাঁওতালদের পক্ষে হয়তো সম্ভব। এই ভাবল কনক, এবং জিজ্ঞাসা করল,

—দেখো, তোমরা এই গ্রামে থাক?

—হাঁ? পুরুষটির চাইতে স্ত্রীলোকটি সপ্রতিভ ; সেই এগিয়ে দাঁড়াল।

—তোমরা বলতে পার, এগ্রামের লোকেদের সাথে চৈতন্য সাহার বিবাদ লাগল কেন?

—বিবাদ লাগে নি, লাগলে ভালো ছিল, স্ত্রীলোকটি বলল।

—তুমি তো এদেশের লোক নও, বাপু, তোমার কথাগুলি তার প্রমাণ।

—গোলমাল একটু আছে আমার কথায়।

—তুমি বলতে পার, রামচন্দ্র কেন চৈতন্য সাহাকে মারল ?

—কখন মারল ? এই শুনলাম সব মিটে গেছে, কখনও মারল রে, মুঙলা ?

—তা তো জানিনে, মুঙ্‌লা বলল।

—যখন দরকার তখন পালয়ে থাকল, আর এখন মারল ?

—তোমার যেন খুব ভাল লাগল সংবাদটা, কনক বলল, রামচন্দ্র চৈতন্যসাকে মারপিট করলে তুমি খুসি হও, কেমন ?

—এখন আর তার দরকার নেই। বৈশাখ গেছে, আউসের চাষ হয় নাই; জষ্টি যায় কি একটা করতি হবি। এখন তো সকলকেই খাটতে হবে। পদ্ম বৈষ্ণবী হাসল।

—তা হ'লে মারপিট হ'লে তুমি খুসী হ'তে ?

—শুধু আমি কেন, ভগোমানও হ'ত।

কনক স্থির করল এ গ্রামে যদি কোন দিন কোন গোলমাল হয়, এই মেয়েটিকে আগে খুঁজে বার করতে হবে। কনক ঘোড়া ছেড়ে দিল, কিন্তু আবার তাকে থামতে হ'ল। সহরের কোন মেয়ে নয় তো, পুলিসের চোখ আড়াল ক'রে বেড়াচ্ছে।

—আই, শোন্।

—আজ্ঞে।

বৈষ্ণব কাছে এলে কনক এবার পুলিশি দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করল। সহরের পলাতকা যে কয়টি মেয়ের ছবি তার কাগজপত্রে আছে, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে মনে-মনে তুলনা করল। বৈষ্ণবী ঈষৎ সঙ্কুচিত হ'য়ে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। আচ্ছা যাও। কনক চিন্তা করতে করতে লাগাম আলগা ক'রে দিল।

কনক চলে গেলে মুঙলা বলল—শ্বশুরেক ধরতে আইছে, কেন পদ্মমনি ?

বৈষ্ণবী বলল,—তুই বাড়ী যা।

—কি করব ?

—সাহস দিবা, আমি একটু সান্নাল বাড়ী যাব। ছোটবাবুকে খুঁজে বার করব।

—কোন দিন সে বাড়ী গিছ ? সারাদিন ধ'রে খুঁজলেও তাকে খুঁজে পাবা না। আর পালেও কি কবা ?

—তোকে যা কলাম কর।

মুঙলা চলে গেল। তারা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সেটা সান্ন্যালদের বাগিচার সীমা। সেখান থেকে ঘোড়ার পথে সদর দরজা অন্তত দশবারো মিনিট কিন্তু বাগিচার আড়াআড়ি আমগাছগুলির তলা দিয়ে ছুটতে পারলে খিড়কির পুকুরের জঙ্গলকে অগ্রাহ্য করতে পারলে পাঁচ সাত মিনিটে অন্দরে পৌছান যাবে। নিচু হ'য়ে কাঁটাতারের বেড়া গ'লে বৈষ্ণবী সান্ন্যাল বাড়ীর দিকে ছুটল।

কনক সান্ন্যালদের কাছারীর ঘরে ঢুকে দেখল, দশ বারোজন চাষী বসেছে মেঝেতে গোল হ'য়ে।

একজন জরাজীর্ণ প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। ফরাসের উপরে বৃদ্ধ নায়েব, তার চারিপাশে গুটি কয়েক আম্‌লা। তারা খাতাপত্র ,কাগজ কলম নিয়ে ব্যস্ত।

—নমস্কার, নায়েব মশাই।

—নমস্কার, আসুন, বসুন।

—পঞ্চায়েৎ নাকি, কনক হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল।

—তা একরকম। চৈতন্য কৃষকদের সঙ্গে একটা আপোষ করে ফেলছেন। ইনি চৈতন্যসাহা, চেনেন বোধ হয় ?

—ইনি-ই ?

কনকের পুলিশি দৃষ্টি ও নায়েব মশাইএর তার পদোপযুক্ত হাসির সম্মুখে চৈতন্যসাহা বিলুপ্ত হ'য়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

—এখানে রামচন্দ্রও আছে নাকি ? কনক জিজ্ঞাসা করল।

কৃষকদের মধ্যে স্থূলকায় একজন নড়েচড়ে ব'সে গোঁফে হাত দিল।

—বেশ, কিন্তু ব্যাপার কি ? রামচন্দ্র চৈতন্যসাকে হত্যার চেষ্টা করল কেন ?

রামচন্দ্র ও চৈতন্য সাহার মুখের অবস্থা দেখে মনে হ'ল কনক মাষ্টার তাদের দু'জনের মাথা ঠুকে দিয়েছে লেখাপড়ায় অবহেলার জন্য।

নায়েবমশাইএর অনুসন্ধানী দৃষ্টি পর্য্যায়ক্রমে রামচন্দ্রও চৈতন্যসাহার মুখের উপরে পড়তে লাগল।

—না, না। তা করবি কেন্। রামচন্দ্র আমার বন্ধু। ছোট কালে আমরা পাঠশালায় পড়ছি এক সাথে। কেন্, রামচন্দ্র, পড়ি নাই ? চৈতন্য প্রাণপণ ক'রে বলল।

—কিন্তু থানায় মিথ্যা এজাহার দিলে কি হয়, তা বুঝি আপনি জানেন না। কনক চোখ পাকিয়ে বলল।

—রামচন্দ্র ভাই, তুমি গাঁয়ের সকলের হ'য়ে কথা কতিছ, আমার হ'য়ে দারোগা হুজুরেক কও। চৈতন্য সাহা করুণ ক'রে বলল।

কথাটার আকস্মিকতায়, সম্ভাব্য হত্যাকারীর কাছে চৈতন্য সাহার এই আশ্রয়ভিক্ষার ভঙ্গিটিতে কনক ও নায়েবমশাই প্রথমে, এবং পরে সকলে হেসে উঠল।

পদ্ম বৈষ্ণবী কনকের আগে সন্ন্যালবাড়ীতে পৌচেছিল, এবং ছোটবাবুকে খুঁজে বার করেছিল। ছোটবাবু খাজনার জন্য চাপ দিয়েছেন এ খবর শুনে বিপদের সময়ে তাঁর কথা মনে পড়লেও, ছোটবাবুর সামনা-সামনি কোন কথা বলা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হ'য়েছিল। এমন সময়ে সেখানে সুমিতি এসেছিল। সুমিতি তার ঘরের জানলা দিয়ে কনক দারোগাকে দেখে চিনতে পেরেছিল, এবং সে স্থির করেছিল দারোগাকে তার ভদ্রব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ দেয়া উচিত। রূপের হাতে কাজ ছিল না। দেয়ালের টাঙানো একটা ছবির নকল তোলার চাইতে বৌদির সঙ্গে এ-কথা সে-কথা ব'লে সময় কাটানো ভালো। পদ্ম অনুভব করল ছোটবাবুকে বলা না গেলেও এ বৌটিকে বলা যায়। কিছু কিছু আলাপ হ'লেও তখন সবকথা আলাপ করার সময় ছিল না। এই রকম যোগাযোগ হওয়ায় কনক যখন রামচন্দ্রর লাঠালাঠির ব্যাপার শেষ ক'রে হাসিমুখে কিন্তু সুকৌশলে বাকি খাজনা

আদায়ের জন্য জমিদার ঠিক এই সময়ে কেন চাপ দিলেন এই তথ্যটি জেনে নেয়ার চেষ্টা করছে নায়েব-মশাইকে জেরা ক'রে, একজন ভৃত্য এসে বলল,—আপনাকে বাবু মশাইরা ডাকতেছেন।

নায়েব বলল,—যান পরে আলাপ হবে, অবশ্য আলাপ করার আগেও আপনাকে ব'লে রাখা যায় বাকি খাজনা আদায়ের পুর্ণ অধিকার জমিদারের আছে।

কনক ভৃত্যটির পেছনে কিছুদূর চলে কাছারীর একটি ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। দরজায় দামি পর্দা দুলছে। কাছারীর ঘরে ঢুকতে গিয়ে যে কলগুঞ্জনের শব্দ কানে এসেছিল, এদিকে তেমন নেই। কি একটা অজ্ঞাত ফুলের গন্ধ আসছে যেন। সদরের পুলিশ আফিসের গুঞ্জনের পাশে অথচ একেবারে নিস্তব্ধ পুলিশ সাহেবের খাস কামরার কথা মনে হ'ল কনকের।

ঘরে ঢুকে কনক দেখল, একটি গোল টেবিলের পাশে তিনজন বসে আছে, একজন প্রৌঢ়, একজন মহিলা এবং একটি কিশোর। কনক সান্ন্যালমশাইকে চেনে, প্রৌঢ়টি সান্ন্যালমশাই নয়। কিশোরটিকে চেনা চেনা মনে হ'ল মুখের আদরায় কিন্তু আসলে সেও অপরিচিত। মহিলাটির দিকে চোরা চোখে চেয়ে কনক চিনতে পারল, দিঘার স্টেশনে এঁকে সে দেখেছিল।

মহিলাটি স্থমিতি। সে বলল,—আমাদের একটু দরকার আছে, কিন্তু তার চাইতেও বড় দরকার আপনাকে ধন্যবাদ জানান। সেদিন আপনি সাহায্য না করলে এতটা পথ আমাকে পায়ে হেঁটে আসতে হ'ত।

—না, না। সে আর কি।

প্রৌঢ়টি সদানন্দ, সে বলল,—অনেক সেটা, আপনি যা ক'রেছিলেন, ইংরেজ্‌রা যদি অধিকাংশ পুলিশ কর্মচারীকে তেমনটি করার সাহস দিত, তাদের রাজত্ব তা হ'লে এত শীঘ্র টলটলায়মান হ'ত না।

— তা নয়, সে কিছু নয়। কনক বলল, এখনই টলটলায়মান বলাটা কষ্টকল্পনা।

—অতি অবশ্য। কারণ রাজত্ব তো আর চোখের জল নয়। তবে ভাষায় ওটা চলে যাচ্ছে।

—আমি সে অর্থে বলি নি।

—তাও বুঝি, তাও বুঝি।

স্থমিতি বলল,—মাষ্টারমশাই, আপনার আর যে কত ছাত্র চাই তা বুঝে উঠতে পারছি না। স্থমিতির কথায় কনকের কানের পাশে লাল হ'য়ে উঠল। কিন্তু স্থমিতির ঝরঝরে হাসির মধ্যে রাগ করাও কঠিন।

স্থমিতি তখন তখনই বলল,—আপনার সঙ্গে একটি মেয়ে কথা বলতে চায়।

—আমার সঙ্গে ?

—তাকে ডাকি ?

—ডাকুন।

ভেতরদিকের পর্দার কাছে গিয়ে স্থমিতি ডাকল, পদ্ম, এদিকে এস। বৈষ্ণবী ঘরে ঢুকে মুখ নীচু ক'রে দাঁড়াল।

—কি বলবে, বলো।

পদ্মমণি বৈষ্ণবী বলল,—আপনে রামচন্দ্রকে কয়েদ করতে চান, তা ভালো নয়।

—ভালো নয় কেন, বলো তো।

—অন্যায় সে করে নাই, চৈতন্যসার পিছনে লাগছিলাম আমরা। গান বাঁধার জন্যি আমি ছিদাম মুণ্ডলাকে খোঁচাতাম।

—গান বাঁধা অন্যায় নয়।

—তা ছাড়া আমরা আর কিছু করি নাই।

—রামচন্দ্র চৈতন্যসাকে মারতে গিয়েছিল।

—চৈতন্যসা রামচন্দ্রের দু'শো হাতের মধ্যেও ছিল না।

—কিন্তু রামচন্দ্র তোমার কে, সেটা আমার জানা দরকার ; এবং সেটার উপরেই নির্ভর করছে রামচন্দ্র সম্বন্ধে তোমার মতামতের মুল্য দেয়া বা না-দেয়া।

পদ্ম মুখ নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখে ব্রীড়ার চিহ্ন ফুটিফুটি করছিল, কিন্তু চোখের জল নেমে মুখের আর সব ভাব-চিহ্নকে ঢেকে দিল।

সান্ন্যাল বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে কনক দারোগা থানার পথ ধরল। পদ্ম কথা বলতে না পেরে চলে গিয়েছিল, তখন খানিকটা সময় একথা ওকথা নিয়ে আলাপ হ'য়েছিল এদের সাথে কনকের। সোপকরণ চা এসেছিল, এবং প্রাথমিক সঙ্কোচের পর কনককে আহার্য্যে চামচ দিতে হ'য়েছিল। স্থমিতি এক সময়ে হেসে বলেছিল,—দারোগা বাবু, এর সঙ্গে যখন আমাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন যোগই নেই, আশা করি রামচন্দ্রকে এরেষ্ট করা দরকার হবে না।

—না, তা নেই।

—ধন্যবাদ।

কনক দারোগার মুখোসও এঁটেছিল মুখে, সে বক্রোক্তির সাহায্যে এ ব্যাপারে সান্যাল মশাইএর বড় ছেলের যোগাযোগের ইঙ্গিত করেছিল। স্থমিতি রিন্‌রিন্ ক'রে হেসে বলেছিল : এ ব্যাপারে সান্যালদের যোগ হ'চ্ছে খাজনা আদায় করার চেষ্টা আদালতের মারফৎ। কিন্তু সে প্ল্যানও আমার এই ছোট ভাইটির, সেটা যদি এর দাদার ব'লে চালাতে চেষ্টা করেন তবে এর প্রতি অন্যায় করা হবে।

কিন্তু সদানন্দ মাষ্টার বলেছিল,—এটাকে বিপ্লব বললে অন্যায় বলা হয় না। চাষীদের শক্তি আছে কিন্তু সব সময়ে চোখে পড়ে না। এটা সমস্যা বটে। আপনি পদ্মার তীর দিয়ে এলেন ? ওকে দেখে কি মনে হয়েছে, ইচ্ছা মাত্র আপনার থানা, আমাদের এই পাথরের বাড়ী, লোহার ব্রিজ এ সবই মুছে দিতে পারে ? মনে হওয়ার কথা নয়, কিন্তু ও সেটা পারে। শুধু প্লাবন দিয়ে নয়, অসহযোগ করে, মুখ ফিরিয়ে নিয়েও, যেমন অনেক জনপদকে করছে। যা কোন কোন সময়ে ক'রে এবং সব সময়েই পারে, প্রয়োজন হ'লেই করে না কেন—এটা সমস্যা বটে। অবশ্য বিজ্ঞান সম্মত কারণ আছে, কিন্তু এখন তা আমার মাথায় আসছে না।

থানা মুখো ফিরতে ফিরতে কনকের চোখের সম্মুখে এদের ছবিই ভাসতে লাগল।

মাথাভরা টাক, লাল মুখ, পরনে গরদের আগুল্‌ফ জামা, সদানন্দ মাষ্টার ; স্থখ-লালিত রূপু ; আর স্থসজ্জিতা স্থমিতি। স্থমিতির হাতের হীরক বলয় দুটির আনুমানিক মূল্য তার পক্ষে আন্দাজ করাও

কঠিন। অথচ রূপ? একথা কনক চিৎকাব ক'রে ক'রে বলতে পারে তার স্ত্রী শিপ্রার যা ছিল এবং যা থাকতে পারত, তার কিছুই নেই সুমিতির। সুমিতির হীরক বলয় আছে, এই বাড়ী আছে। কথা বলল যেন অনুগ্রহ ক'রে। যদি নিজেরা দয়া ক'রে ডেকে না পাঠাত কথা বলাও সম্ভব হ'তনা, কারণ ওয়ারেণ্ট ছিল না, কিন্তু ওয়ারেণ্ট থাক না থাক অনুরূপ অবস্থায় যে কোন দারোগা এসে শিপ্রাকে জেরা করতে পারত।

আর কি অপচয় অর্থের এবং মানুষের শ্রমের। সদানন্দ মাষ্টারের অমন মহামূল্য জামা সব সময়ে পরে থাকার কি যুক্তি? সুমিতির পরনে যে শাড়ী ছিল সেটা তার আটপৌরে কিন্তু শিপ্রার পোষাকী একমাত্রটির চাইতেও দামী, কে দেখছে বলো, এই গ্রামে?

আর ঐ ঘরখানি। আসবাবে গালিচার সদরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবদের খাস কামরাও এমন নয়। কিন্তু গালিচায় ধূলা নাই থাক, ঘরের কোণে কোণে মাকড়সার জাল ছিল। দু'বছরেও এ ঘরখানি একবার ব্যবহৃত হয় কিনা কে জানে। তবু এতগুলি টাকার কি অনর্থক ব্যবহার। এমন কত সুসজ্জিত অব্যবহৃত ঘর এ বাড়ীতে আছে কে বলবে!

পথের পরিসরটা এত কম যে পাশের একটা কুড়ের নিচু চালা কনকের গায়ে লাগল। পচা খড়ের কয়েকটি কুচি তার ঝকঝকে খাকির হাতায় লেগে গেল। বাড়ীটার উঠোনে একটা আট-দশ বছরের উলঙ্গ মেয়ে গোবর নিয়ে ঘুঁটে দিচ্ছে। এদের চোখে লাগেনা, কিন্তু কনকের চোখে বিবস্ত্রা ব'লে মনে হ'ল। কি অশিক্ষা, তার চাইতে কত বেশী এই দারিদ্র্য।

বড় রাস্তা পেয়ে কনকের ঘোড়া দুলকী চালে চলতে লাগল।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়; এর প্রতিকার চাষীরাই করতে পারে। কেন সহ্য করবে তারা, তাদেরই হাতের তৈরী ঐ রাজপ্রসাদ। সদানন্দ মাষ্টারের পদ্মার উপমাটি মনে পড়লে কনকের। আভিজাত্য? ছাই-ছাই!

চিন্তাগুলি একটু থিতুলে কনক ভাবল,—বাহারে! বিপ্লবী ধরতে এসে নিজেই বিপ্লবী হ'লাম।

লোকের মুখে কনক অসন্তোষের কথা এর আগেও শুনেছে, তার সেই সব বন্দী বাবুরা তাকে এরকম ব্যাপাটাই বুঝিয়েছে, কিন্তু কনক সবটুকু বিশ্বাস করে নি। বন্দুকের কুঁদোর কাঠে যে ঘুণ ধরেছে এটা যেন নিজেকে দিয়েই সে অকস্মাৎ বুঝতে পারল। সে ভাবল হয়তো একদিন পুলিশ কনষ্টেবলরা ধর্মঘট ক'রে বসবে।

একটা বাতাস উঠেছে। কনক ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিল। আর বেশী বাতাস উঠলে বুধেডাঙার বেলে মাটির পথে চলতে কষ্ট হবে। সান্দারদের পাড়ায় ধূলার ঝড় উঠবে।

কিন্তু হঠাৎ তার ঘোড়াটা থেমে গেল, কান দু'টো খাড়া ক'রে দিল।

—চল্।

ঘোড়াটা ধীরে ধীরে চলতে লাগল।

শুয়োরটুয়োর নাকি। যে রকম জঙ্গল পথের ধারে, আশ্চর্য্য হবার কিছু নয়। রিভলবারটা হাতে নিল কনক। ডানদিকের ঝোপটা দু'লে উঠল। প্রাণীটা ওর ভেতরেই আছে। কি সর্বনাশ মানুষ।

কিন্তু এতবড় সাহস কার এই গ্রামে যে পুলিশের সশস্ত্র দারোগাকে আক্রমণ করার জন্য গুঁড়িমেরে বসে থাকবে। সান্ন্যাল মশাইএর ছেলে? না—তাই বা কি ক'রে হবে। বিপ্লবীরা দারোগা খুন করে বটে, কিন্তু শুধুমাত্র খোঁজখবর নেয়া ছাড়া সে তো বিপ্লবপন্থী সান্ন্যাল ছেলের কিছুই ক্ষতি করে নি। কনকের বুকের ভেতরটা হিম হ'য়ে গেল। রিভলবার উদ্যত রেখে ঘোড়াকে ধীরে ধীরে চালিয়ে কনক অগ্রসর হ'ল।

মাথার উপরে হাত তুলে যে ঝোপের মধ্যে উঠে দাঁড়াল সে চৈতন্য সাহা। ঘোড়ার পায়ের শব্দে পেছন ফিরে দূর থেকে কনক দারোগাকে দেখে তার চোখের আড়ালে থাকবার জন্য সে পথের পাশের এই ঝোপটাকে আশ্রয় করেছিল। কিন্তু তার এমন পরিণতি হবে বুঝতে পারে নি।

কনক হো হো ক'রে হেসে উঠল।

—ভাগ্, চিতিসাপ্।

চৈতন্য সাহা ঝোপঝাড় ভেঙ্গে চুরে, খানাখন্দ ডিঙিয়ে টপকিয়ে ছুট দিল। কনক অমন হাসি অনেক দিন হাসে নি। তার হাসির অস্বাভাবিক শব্দে ঘোড়াটা ভয় পেয়ে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল।

কিন্তু দেরী করার সময় ছিল না। দু'একবার গাছপালা নেড়ে উঠল, কয়েকটি বড় বড় ফোঁটায় জলও পড়ল। আকাশে যুধ্যমান হাওয়াই জাহাজের মতো দ্রুতগতিতে মেঘ চলেছে। কনক ঘোড়ার গতি দ্রুততর ক'রে নিল। যদি ভালো ক'রে বর্ষা নামে বুধেডাঙার কাদায় ঘোড়া অচল হ'য়ে পড়বে।

কনকের পেছনের দিকে তখন বর্ষা নামল চিকন্দিতে। চৈতন্য সাহা ভিজল, বাড়ী ফিরতে ফিরতে রামচন্দ্ররাও। বৈশাখের এত সব বাতাস কোথায় আকাশের কোন দ'য়ে আটকে ছিল, রামচন্দ্রের হাসির মতো শব্দ ক'রে বজ্র, বাজ, ঠাটা পড়ে সে দ'য়ের বাঁধে চিড় খেয়ে খেয়ে গেল, বাতাস হু হু ক'রে বেরিয়ে এল। সান্ন্যালবাড়ীর কাছারীর জানালা দিয়ে, লাইমশাখার গন্ধ ধুয়ে নিয়ে তাদের বসবার ঘরে জলের ছাঁট ঢুকল।

ঝোঁপ ঝাড়, খানাখন্দ, উচুনিচু, তেফলন আর হাজা শুখা জমি একসঙ্গে ভিজতে লাগল।

(ক্রমশঃ)

"কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসংগতরূপে স্ফীতকায়।"—রবীন্দ্রনাথ।

ভারত-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ

ইন্দ্রজিত্

পূর্ব্বানুস্মৃতি

চিত্র শিল্প, স্থাপত্য শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, আচার, ব্যবহার, পোষাক, পরিচ্ছদ, সমস্ত সংস্কৃতিরই সৃষ্টি হোয়েছে মন রঞ্জন করবার উদ্দেশ্যে। সে মনোরঞ্জন কখনও বা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক কখনও বা সমষ্টি-কেন্দ্রিক। সমষ্টিগত মানুষ যা সৃষ্টি করেছে সেটা ব্যক্তি বিশেষের মন হরণ করতে পেরেছে আবার অনেক সময় ব্যক্তির সৃষ্টি সমষ্টিকে দিয়েছে আনন্দ। একথা আমার বানানো নয়, এটা সত্যি ইতিহাসের সত্যি কথা।

এ যাবৎ সংস্কৃতি-মূলক আমরা যা কিছু পাই না কেন, যা কিছু সংস্কৃতি-মূলক যে কেউ সৃষ্টি করুক না কেন, তার মূলে আছে দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টা। সে দুঃখ কখনও দৈহিক কখনও মানসিক। তাই একদিক থেকে সৃষ্টি বা সংস্কৃতির মূল উদ্দেশ্য দুঃখ নিবৃত্তি।

আঠারো শতকের শেষ ভাগে আমরা যে ইংরেজ জাতিকে পেলাম তাদের দেখছি বহু বছর আগে মুসলমান সম্রাট সাজাহানের সময়। আজ তারা সময় বুঝে জাহাজে চড়ে চলে এল এদেশে। নাদীর শা নিয়ে গেলেন ভারতের মণি মুক্তাখচিত ময়ুর সিংহাসন, নিয়ে কিন্তু কৃতকার্য্য হতে পারলেন না নাদীর শা। ভারতবর্ষের রাজ সভায় থেকে গেল শূন্য সিংহাসন আর সেই শূন্যতার ধ্বনি পূর্ণ করার জন্যে হঠাৎ ভারত ভূমির ওপরে বিলিতি যুদ্ধ-নিনাদ বেজে উঠল। এরপর ধীর পদক্ষেপে ইংরাজ রাজের পদধ্বনি শুনতে পেলো সারা ভারতবর্ষের লোক। দেখল সাত সমুদ্দুর পার থেকে সাঁতার কেটে ডাঙ্গায় উঠলো বিদেশী। সেই আবার পরিচিত হোল শাসক রূপে। ভারত ভূমির যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে তখনও শক্তির অপব্যবহার আর সৎ ব্যবহারের পরিচয় বর্ত্তমান।

শাসকের দয়ার ওপর খেয়ালের ওপর নির্ভর করে জমিদারী পাওয়া যায়, পাওয়া যায় নবাবী। কিন্তু সে নবাবী যখন বেয়াড়াপনায় ওঠে, যার ফলে দেশের মান রক্ষা করা তো দূরের কথা লোকে ভাবে ঘরের মানও বুঝি যায় এইবার। সেই রকম ব্যবহারের সঙ্গে মুসলমান শাসকের শাসনে আমরা পরিচিত হোয়েছিলাম। দেশে যখন অরাজকতা হওয়ার কোন কারণ নেই, যখন কোন দারিদ্র্যের মুখ দেখবার কথা নয় কোন দরিদ্রের, সেই রকম সময় সেই সমস্ত শাসকদের ভোগ পিপাসা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। সভা হোল বড় করে কিন্তু সেটা বিচারের সভা নয়, সেটা মস্‌গুল করবার আসরে পরিণতি নিল। দেশের দশের ভেতরের সম্পদ কেড়ে নিয়ে বাহিরের সম্পদ তৈরী করা হচ্ছে, নাচ্‌ছে বাঈজী রাজপুতানার রাজ সভায় আর সেই মুসলমান শাসকদের রাজ সভায়। তাদের দ্রুত কম্পিত নূপুর নিক্কণ সঙ্কেত জানালো ওমরখৈয়ামের ভাষায়, সময় যে আর নাই। যুগ পরিণত হোল যুগান্তে। হিন্দু প্রজা আকাশের দিকে তাকিয়ে যুক্ত হস্তে প্রতিকার চাইল তাদের দুর্ভাগ্যের, মুসলমান শাসিত নামাজের আসনে বসে ঠিক তার পরে ডাকলো 'আল্লা হো আকবর' বলে। যুগান্তের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, দেশ জুড়ে নর্ত্তকী নাচ্‌ছে আর ঢেউ উঠছে ফেনা উঠছে সুরাপাত্রে। যুগান্তের সঙ্কেত পেয়েছে রাজসভার অনেকে তাই

আসর হচ্ছে ফাঁকা। নবাব হাঁকৃচে শূন্য সুরাপাত্র পূর্ণ করবার জন্যে, আদেশ দিচ্ছে বাঈজীকে নাচের মাঝে যেতে উঠতে। হিন্দু মুসলমান এবার একসঙ্গে এক আসনে প্রায় বসে ডাকৃলো সেই ভারতের ভাগ্য বিধাতাকে যে বিধাতা তাদের ঘরে দেবেন ধান, পরণে দেবেন কাপড়, হিন্দু আর মুসলমান সবাইকে পান্তা ভাত দেবেন ঘি দিয়ে খেতে আর তাদের ছেলেদের চিরকালের জন্যে খেতে দেবেন দুধ আর ভাত। নিপীড়িত হিন্দু মুসলমান উভয়েরই এক বিশ্বাস।

গোপন চক্রান্ত চল্‌ল স্বদেশী প্রতিনিধি আর বিদেশী শাসকদের ভেতরে। লোভ দেখার মাত্রা বাড়লো লোভীর শাসকের প্রলোভনের লোভে। জুটলেন হিন্দু ধনী জমিদার, ধনী অর্থবান আর মুসলমান যোদ্ধার দল যাঁরা ভাবলেন প্রাদেশিক সিংহাসন তাদের কোলে করবে বলে বসে আছে। পলাশীর যুদ্ধের মাঠের আগুন ঠিক পলাশ ফুলের মতন আগুনের মতন হঠাৎ দেখা গেল আর যখন নিভ্‌লো আগুন তখন দেখা গেল বিচূর্ণ আর চূর্ণের স্তূপ। যে ফাটল অনেক দিন আগে দেখা গিয়েছিল সে ফাটল আজ হুড়মুড় করে ফেটে পড়লো। তার ফলে চাপা পড়লো হিন্দু আর মুসলমান সবাই, আর সেই ধ্বংসের স্তূপের ওপর উনিশ শতকে ইংরাজ-ভারতের সূর্য্যোদয় দেখ্‌ল সমস্ত ভারতবাসী।

মুসলমান শাসন এতদুর প্রাদেশিকতা- আর সঙ্কীর্ণতায় পরিণত হয়েছিল যার জন্যে মুসলমান শাসকের অবসানে এমন কেহ সাধারণ বা জনসাধারণ ছিলেন না যাঁরা যুগ বিদায়ের গান গেয়েছিলেন বা রচনা করেছিলেন যুগসন্ধির কোন অত্যাচারের সাহিত্য। আর নতুন শাসক ইংরাজকে আমন্ত্রণ করবার ভাষাও তাদের অগোচর ছিল। সব হোল যেন কেমন কোরে। ভারত সংস্কৃতির বহুদিনকার প্রবর্ত্তিত পদ্য ছন্দ পরিণত হোল গদ্যে, যেমন হোয়েছিল বৌদ্ধ যুগে। ছন্দ হারালো ভারতের ছন্দ-ভারতী।

ভারতবর্ষে ইংরাজ প্রবেশ ও ভারত ভূমি অধিকার করবার পূর্ব্বেও ভারতবাসী বিলিতীদের সংস্পর্শে এসেছিল। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে পর্টুগীজ অভিযাত্রী ভাস্কোডাগামা ভারত ভূমির ওপর পদার্পণ করে মালাবারের রাজার দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। মালাবারের রাজার এই বিশেষ সম্বর্দ্ধনায় পর্টুগীজরা ভারত ভূমিকে মনে করল নিজেদের অধীনস্থ দেশ বলে। বুঝে গেলেন ভাস্কোডাগামা, ভারত ভূমি মণি মাণিক্যের খনি। সঙ্কেত পেলেন সোনার। পর্টুগাল দেশ থেকে তারা যুদ্ধের জাহাজ ভরে এল খৃষ্টধর্ম ছড়াবার জন্যে ভারত ভূমির ওপরে আর প্রয়োজন হোলে যুদ্ধ করতে।

এর পর ষোল সতের শতকে ডাচ জাতের আক্রমণে ভারত থেকে পর্টুগাল প্রভাব এক রকম দূর হোল। পরে ইংরেজ আর ফরাসী যুক্তভাবে বাণিজ্যাভিযান করলো ভারতবর্ষে আর ডাচদের প্রভাব লুপ্ত হ'ল। এ সমস্ত ব্যাপার এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে সে কথা বর্ণনাতীত বলে মনে হয়।

সংস্কৃতির কথা আলোচনা করতে হোলে এই বিশেষ ঘটনাগুলো বাদ দিলে আমার বক্তব্যের অঙ্গহানি হবে, সেই কারণে পাঠকের কাছে এই ঘটনা না বল্‌লে, সংস্কৃতির ঐতিহাসিক কাঠামো নষ্ট হবে বলে মনে করি।

ইংরেজ ভারতবর্ষে আসবার পর থেকে সভ্যতার যে নতুন রকম অধ্যায় আরম্ভ হোল, সে কথা নতুন করে বলবার কোন দরকার নেই ; কারণ সে বিশেষ ইতিহাস আজ অনেকের কাছে জানা আছে। তবে পাঠকদের জানান দরকার যে, আমাদের নতুন শাসকরা আমাদের ঠিক কি রকম চোখে দেখতেন প্রথম থেকে।

ইংরেজ ভারতবর্ষকে অর্থাৎ প্রায় গোটা দেশটাকে ভাবল একটা প্রকাণ্ড কৃষিক্ষেত্র, আর সেই কারণে অর্থাৎ তাদের সেই এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে আমরা তাদের চোখে কৃষক বলেই পরিচিত হোলাম।

পূর্ব্বেই প্রসঙ্গত অন্যভাবে বলেছি যে, পলাশীর যুদ্ধেই ইংরেজ ভারতসাম্রাজ্যে জয় পতাকা ওড়ায়। সেই পলাশীর মাঠ এই বাংলাদেশ, সুতরাং ইংরেজ আসে আগে কিন্তু বাংলা জয় করবার পর তারা যুদ্ধ থামাল, কারণ সে সময় সকলেই বুঝে নিল অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষ প্রায় বুঝে নিল যে সমাধান এল এইরূপে, সুতরাং একে স্বীকার করে নেওয়ার ভেতরে কোন আস্থা হয়তো না থাকতে পারে কিন্তু না স্বীকার করে নিলেও কোন উপায় নেই।

বাংলা দেশে উনিশ শতকে ইংরেজ শুন্‌লো, ধানের ক্ষেতে আর পথে ঘরে চোখের জলের ফোঁটাগুলো গান গাইছে আপন মনে :

মন তুমি কৃষি কাজ জাননা
এমন মানব জনম রৈল পতিত
আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা

মনের কোন গভীর দুঃখের অবস্থা থেকে এ গান আসে সে কথা এক তারাই বোঝে যারা গায়, কিন্তু যারা শুন্‌লো তারা বুঝলো না এ গানের মর্ম। বুঝল না এ গান রচনা আর গাওয়ার ভেতরে কত বড় একটা বিরাট ঘটনা লুকোন আছে যার তৎকালীন বা তৎপরবর্ত্তী বহিঃপ্রকাশই হোল সেই গানগুলো।

উক্ত গানের লেখক রামপ্রসাদ সেই রচনার ভেতরে প্রকাশ করেছেন :

কালী নামে দাওরে বেড়া
ফসলে কেউ হাত দেবে না
ও যে মুক্ত কেশীর শক্ত বেড়া
তার কাছে তো যম ঘেঁষে না

কালী নামে যদি ক্ষেতের বেড়া দিতো লোকে তাহলে ফসলে কেউ হাত দিতো কি না বল্‌তে পারিনা, কিন্তু সেই ভুলের জন্যেই বোধ হয় ক্ষেত ভরা ধান লুঠ হোলো আর ধানের ক্ষেত পরিণত নীলের ক্ষেতে, যে ক্ষেতের মালিক হোল এক রকম ইংরেজ আর তার নায়েব হোল স্বদেশী লোক আর ক্ষেতের বলদ হোল চাষার দল। চাষারা জমির জন্যে খাটলো না, জোর করে তাদের চাবুক মেরে খাটাতে লাগল নীলের ক্ষেতে ইংরেজ শাসকরা। ঘরের স্ত্রীলোকের ঘাটে স্নান করতে যাওয়া দায় হোয়ে উঠলো কারণ ইংরেজের সগোত্রীয়রা ঘুরছে চারিদিকে ভ্রমরের মতন। ঘাট থেকে ওঠবার সময় মেয়েরা দুদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নেয় কেউ কোথাও লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কি না যারা মিষ্টি কথায় ফাঁদ পাতবার চেষ্টা করবে অপচেষ্টা করবার অভিপ্রায়ে। বাঙ্গালী স্ত্রীলোক ইংরেজের কথা বুঝতে পারবে না কিন্তু যে কোনো দেশের যে কোনো স্ত্রীলোক যেটা বোধ হয় সহজে বুঝতে পারে বা ধরতে পারে সেটা ধরে ফেলবে অর্থাৎ পুরুষের মন বাসনা।

ইংরেজ আসার পর সে অত্যাচার কাহিনী ইংরেজ নিজে তেমন সোজা ভাবে বলে যায়নি বা সে ইতিহাস লিখিত হয়নি কোনদিন ইংরেজের দ্বারা। কারণ, নিজের কলঙ্কের ওপর নতুন কোরে আরও কালি দিতে তারা চায়নি, তারা চায়নি সে কলঙ্কের ওপর কলমের আঁচড় কেটে উনিশ শতকের ভারত ইংরেজ আগমনের সত্যি ইতিহাসকে লোকের সামনে তুলে ধরুক।

ছায়া মুখ

মনোজ রায়

মানুষের পরিচয় কি ?

সুব্রতর চিঠি পেয়ে নিজেকে এ প্রশ্নই করেছিলাম—রূপ, যৌবন, ঐশ্বর্য ? কিংবা অন্য কিছু ? চিঠির পাতায় আরেকবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। লিখেছে :

এখানে সে আগন্তুক। অ-তিথি, নয়তো দম্‌কা হাওয়া—তাও বলা যায়, যদি এই ছোট্ট শহরের চাঞ্চল্য ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনা হয়। সবাই, সে আসার পরেই, ছেলেবুড়ো সবাই যেন কেমন ক'রে বুঝতে পেরেছে—রাস্তার বিড়ির দোকানগুলোর আয়না রাখা অত্যন্ত উচিত, আর সব সময়ে রুমাল ব্যবহার করা এমন কিছু দুষণীয় নয়। এগুলো খবর নয়, এর মধ্যে শোচনীয়তম হচ্ছে—এদের ভেতর ছিলাম আমিও।

ছিলাম ! প্রেজেণ্ট টেন্‌স্ নয়। কারণ—সেটা বলার জন্যেই তোকে এই চিঠি লিখছি।

এখানকার মেয়ে স্কুলে সে পড়ায়, নীচু ক্লাশে। একেবারে উর্ব্বশী নয়, তবে নির্লিপ্ত—উদাসীন। তাই বোধ হয় কেমন জেদ চাপলো। পরিচিত হলাম তার সাথে, বুঝতেই পারছিস—কত দ্বিধা, কত সংকোচের বাধা পেরিয়ে এই পরিচয়। তারপর থেকে রোজ দেখা হোত, প্রাণান্ত চেষ্টা করতাম মুখোমুখি হবার, সকালে বাজারে, আর বিকেলে নদীর ধারে। কোনদিন সাথে শাশুড়ী থাকতো, তার কোলে ফুটফুটে একটা ছেলে। কোনদিন বা একা।

এমনি একদিন, যেদিন সে একা ছিল নদীর পারে আর তাই আমি হয়তো একটু এলোমেলো হবার চেষ্টায় ছিলাম, সেদিন—সে বলেছিল, আমারই কোন কথার জবাবে বোধ হয়, হঠাৎ—

: আমি বিধবা, জানেন তো ?

চমকালাম। যা' জানতাম না, জানলাম—যা' স্বপ্নেও ভাবিনি, তার কালো-পেড়ে শাড়ী, এমন কি সিঁদুরহীন সিঁথি দেখেও।

: জানি অনেকেই হতাশ হবে—হাওয়ার মতো হালকাভাবে সে হেসেছিল : কিন্তু আমার পেছনে ঘোরা কি বৃথা নয় ?

আমি নিরুত্তর। এ প্রশ্নের মানে খুঁজছিলাম। লক্ষ্য আমি, না উপলক্ষ্য। তার মুখে এর উত্তর ছিল না।

উত্তর পেলাম, সত্যি পেয়েছি বলতে পারি না, সম্ভবত সে প্রশ্নেরই উত্তর, আরো কিছুদিন পরে।

সেদিন ছিল রোববার। স্কুল ছুটির দিন। সকালে উঠেই কেমন বেপরোয়া মনে হচ্ছিল নিজেকে। তার বাড়ী গেলাম, যা আগে কোনদিন যাই নি, সেই প্রথম (অথবা শেষ)। দুরু দুরু বুকে কড়া নাড়তেই সে বেরিয়ে এসেছিল। আমায় দেখে অবাক হয়েছিল কিনা বুঝলাম না, সে ক্ষমতা ছিল না। বলেছিলাম,

: একি ! এত শুকনো লাগছে কেন ? রাত্রে ঘুমোন নি ? এখন বুঝি কথাটা একটু বোকার মতোই হয়েছিল, বিশেষত স্বরের আন্তরিক আবেদনটা। সে কিন্তু অতি স্বাভাবিক ভাবেই বলেছিল,

: এ বাড়ীতে কেউ আসুক আমি চাই না।

এত স্পষ্ট ? বোঝাতে পারবো না, সাহিত্যিক নই, তখন আমার কি অবস্থা। শুধু মনে আছে শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়েছিলাম কয়েকবার। তারপর সে বলেছিল, আশ্চর্য নরম স্বরে, সবচেয়ে কঠিন কথা—

: যান।

সাথে সাথে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম ! আবার ফিরলাম, তার ডাক শুনে : শুনুন।

দরজা ছেড়ে একটু এগিয়ে এসে বলেছিল, যদিও তখন আমি কিছুটা দূরে, তার স্বর মৃদু ছিল তবুও।

: জীবনে অনেক আঘাত পেয়েছি, তাই এখন একমাত্র কাম্য শান্তি। যখন সে শান্তি নষ্ট হ'তে দেখি—তখন রূঢ় হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। আমার কথা হয়তো বুঝবেন না, তবে দোহাই আপনার—ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিল সে। একটু হেসে, তারপর : যে নিন্দাই আমায় নিয়ে করুন, আপনাকে ঘরে ডাকলাম না—এ কথাটা যেন কাউকে বলবেন না।

সেই আমার শেষ দেখা তার সাথে। এখনকার প্রাণপণ চেষ্টা না দেখা করার। হয়তো তুই হাসছিস ·····

না, হাসলাম না। হাসি পেল না। শুধু প্রশ্ন করলাম নিজেকে—জীবনের রূপ কি ? মুখ আর আর মুখোস—কোনটা সত্য ? খাতা টেনে সুব্রতর উত্তরে লিখলাম :

তোমার চিঠি পেলাম।

উত্তরে আমিও এক কাহিনী শোনাব তোমায়। সে এক আজব কাহিনী। এর না আছে মাথা, না আছে মুণ্ড। কিছুই নেই, শুধু ঘরে-বাইরের অন্ধকারটুকু ছাড়া।

ধর, যদি কোনদিন তুমি সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে, কোন রকমে,—কি ক'রে আমি জানি না, যে গলির আনাচে-কানাচে আঁধার, বাড়ীর ভেতরেও, শুনতে পেতে হয়তো দুটি—ব্যাংগমা-ব্যাংগমী নয়—ছেলে আর মেয়ের কণ্ঠস্বর। তাদের দেখতে পেতে না, শুনতে ছেলেটি বলছে,

: না, না আপত্তি ক'রো না। একবার গিয়ে দেখই না কি হয়।

: কিন্তু আমি কি পারবো ? মেয়েটির মৃদুস্বরে শুনতে পেতে—কি আছে আমার ? ম্যাট্রিকও তো পাশ নই। কোনও গুণ নেই, আর—রূপ ?

তার ম্লান হাসি দেখতে পেতে না, অনুমানে বুঝতে হোত। তোমায় শিউরে দিয়ে বীভৎস কাশির শব্দ আসতো ঘর থেকে। কিছুক্ষণ চুপ। তারপর টেনে টেনে ছেলেটি বলতো,

: এ রোগও তো সারে আজকাল। কত'ই তো ওষুধ বেরিয়েছে, তাই না ?

কেউ তাকে আশ্বাস দিল কি না, দেখতে পেতে না, প্রশ্নের সমর্থন সে পেলো কি না। শুনতে,

: এ সুযোগ ছাড়া উচিত হবে না। তুমি যাও তার কাছে—কালই।

: বেশ, যাবো'খন। আঁধারের মতো নরম স্বরে উত্তর দিত মেয়েটি : চুপ করো, লক্ষ্মিটি। আর কথা ক'য়ো না—

কথা শেষ হবার আগেই কর্কশ, বিকৃত চীৎকারে তোমায় চমকে উঠতে হোত।

: অ মুখপড়া, গেলি কোথা ? যা' পাস তাই তো লুকিয়ে লুকিয়ে সোয়ামীকে খাইয়ে রাখিস—আমি রাতে খাবো কি ? বলি, শুনছিস ?

: যাই মা। মেয়েটি উঠে যেত।

তুমি বুঝতে না, তাই এখানে ব'লে রাখি, বৃদ্ধা মেয়েটির শাশুড়ী, ছেলেটির মা।

: একটু চুপ করুন মা। কিছু ছিল না, তাই—শাশুড়ীর চীৎকারে তার কথা ডুবে যেত ?

: তাই বলে যে দুধটুকু রেখেছিলাম, তাও খেতে দিবি না ? আমি মরলে বুঝি তোদের সুবিধা, হয় ? আমি কি কেউ নই ?

কান্নার ভারে বৃদ্ধার স্বর নুয়ে পড়তো, বুঁজে আসতে চাইতো, বিকৃত ভাষায় নিজের অসুস্থ ছেলেকেই অভিশাপ দিত, তার ক্ষুদ্রতায় তুমি বিস্মিত হ'য়ে শুনতে—

আচ্ছা, এ ঘটনা থাক। এ কাহিনী নয়। তার চেয়ে শোন তোমার অন্য গল্প, আরেক জীবনের গল্প বলি—যেখানে জীবন নিওন আলোয় মেশানো, যেখানে হাসি রক্তিম ঠোঁটে আর উপ্‌চে-পড়া গ্লাসের কানায় কানায় ভরা।

হয়তো তুমি যেতে সেখানেই। কিছুদিন পর।

নীল আলোর দ্বীপ, মৃদু কন্‌সার্ট, গুঞ্জন—তোমার পরিচিত ক্লাব-হল। লেকের হাওয়ায় বন্ধু বন্ধুনীর উল্লসিত স্বর : ওয়েল কাম !

একটু হেসে, নিটোল তৃপ্তিতে, তুমি মাথা নোয়াতে।

তাদের সাথে কথা বলতে বলতে তুমি একটি নতুন মুখ আবিষ্কার করতে। মেয়েটি এমন কিছু আহা-মরি নয়, কিন্তু তবু, তোমার কৌতুহল অদম্য হোত। ক্লাবের সবাই তাকেই ঘিরে ব্যস্ত। তাই হয়তো কোন বান্ধবীকে জিজ্ঞাসা করতে চুপিচুপি,

: মেয়েটি কে ?

: জানো না ? বান্ধবী আঁকা ভ্রূজোড়া তুলে বলতো : তুমি হাসালে। একে নিয়ে বলে ক্লাবে ডুয়েল লড়ার জেগাড় হয়েছে, আর তুমি বলছো কে ?

: তাই নাকি ? গম্ভীর হাসি হাসতে : তা হ'লে তো ভীষণ মেয়ে !

: একেবারে ক্লিওপেট্রা ! বান্ধবী তোমার কৃত্রিম হতাশায় ভেংগে পড়তো : আমরাই উলুখড়। মিস্ চ্যাটার্জী তো লেকে ডোববার প্ল্যান আঁটছেন।

: কেন ?

মিঃ বোস মেয়েটিকে নেকলেশ প্রেজেণ্ট করেছে ব'লে। তোমাদের তো কৃতজ্ঞতা বোধ নেই, তাই খেলায় বারে বারে পার্টনার বদলাও।

: জুটলো কি ক'রে ?

: সোমের নিউ ফাইণ্ড। বোধ হয় নেকৃষ্ট বইয়ের হিরোইন।

তুমি ছোট্ট ক'রে বলতে : বুঝলাম। আর মেয়েটিকে ঘিরে থাকা ভীড় কখন পাতলা হয় তারই সুযোগ খুঁজতে।

এবং দু'য়েকদিনের মধ্যেই তার সাথে পরিচয় ক'রে নিতে। তার নাম, তোমাদের সেই শিক্ষয়িত্রীর যে নাম তুমি লেখনি, আমি আমার নায়িকার সে নাম দিচ্ছি। ধরো, তারও নাম মীনাক্ষী।

তার ব্যবহারে তুমি আশ্চর্য্য হ'তে। সবার মতো তোমারও কৌতুহল হোত তার সম্পর্কে। হওয়াই স্বাভাবিক। তাই একদিন, যখন সে বাড়ী ফিরতো একা, তুমিও বেরিয়ে আসতে তার পিছুপিছু। তাকে অনুসরণ করতে। অবশ্য তার অজান্তে!

খানিক বাদে সে কালিঘাটের কোন বস্তির গলিতে হঠাৎ অদৃশ্য হ'য়ে যেত। একটু ইতস্তত ক'রে তুমি ঢুকতে। চারধারে নীচু চালার খ'ড়ো ঘর। আঁকাবাঁকা পথ ধরে একটু এগিয়ে থমকে দাঁড়াতে। সামনে ইঁট বের করা একটা একতলা বাড়ী। অন্ধকার। শুধু জানালার ফাকে কুপীর হলদে আলোর একফালি আভাস। ভেতরে কথার মৃদু শব্দ—কোন ক্লান্ত পুরুষের স্বর,

: আজ এত তাড়াতাড়ি যে?

: বেশীক্ষণ থাকা যায় ওখানে? মেয়ে গলায় চাপা তীক্ষ্ণ উত্তর: একেবারে দম বন্ধ হয়ে আসে।

হালকা হাসির শব্দে বুঝতে—ছেলেটি একটু হাসলো: এ ঘরে নিশ্বাস নেবার প্রচুর জায়গা, না?

কিছুক্ষণ সব চুপ। সেই ফাঁকে তুমি ভাবতে: অসম্ভব! মীনাক্ষীদেবী এদিকে আসতেই পারেন না, তোমারই পথ ভুল। তবু দাঁড়িয়ে থাকতে ওখানে। শুনতে,

: বাঁচবো না সেতো জানিই, তবে এতো খরচ ক'রে কি লাভ?

: ছিঃ, ওকথা বলতে নেই। মোমের মতো ব্যথা গ'লে পড়া স্বরে বলতো মেয়েটি: চুপ করো।

: না। তবে দুঃখ কি জানো? আমারই জন্যে মা পাগল হয়ে গেল, আর—

: কি? চকিত, মৃদু প্রশ্ন হোত।

: তোমার শান্তি নষ্ট ক'রে দিলাম একেবারে!

: তুমি এমন কেন? আমি কিন্তু তোমার মতো নিরাশ হইনা। আজ কাল তো ডাক্তার, ওষুধ পত্র সবই হচ্ছে তোমার। নিশ্চয়ই ভাল হবে তুমি। যে আসছে, অন্তত তার জন্যে—

: মিথ্যে আশ্বাস দিও না মীনু।

কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। ঝিঁঝিঁর ঝিঁঝিঁট স্পষ্ট হ'য়ে উঠতো। মশার কামড় আর ড্রেনের গন্ধ উগ্রতর। আবার ছেলেটির ভাংগা স্বর শুনতে পেতে,

: তোমার কি অপরাধ, আমি নিজেই তোমায়—

: কি আজে বাজে বকছো? ইস্পাত-কঠিনস্বর মেয়েটির। বুঝতে পারতে না কে কথা কইছে—ক্লাবের মীনাক্ষীদেবী, না এ বাড়ীর মীনু। কিংবা অন্য কেউ? বাষ্পহীন শুকনো স্বর শুনতে: যারা বোকা, তাদের বোকামির সুযোগ কেন নেব না বলো?

: কিন্তু অতি চালাকির—। কথাটা অসমাপ্ত রেখেই আশ্চর্য্য নিস্পৃহভাবে বলতো ছেলেটি: যার আশায় আমাদের এই জীবন, তোমার সেই সন্তান কি তার বাপকে ক্ষমা করবে? তার মাকে সতী বলবে?

অবসাদে তোমার পা ভারী হ'য়ে আসতো। ফেরার পথে শুনতে তোমাদের ক্লিওপেট্রা, মিঃ সোমের নেকৃষ্ট্ হিরোইন, ক্লাবের মীনাক্ষীদেবীর তীক্ষ্ণ, বিস্মিত স্বর,

: আমায় তুমি সন্দেহ করো?

এরপরেও দেখা হোত তার সাথে। কথা কইতে গিয়ে থেমে যেতে। মাঝে মাঝে, কি যেন মনে হোত, ভাবতে চাইতে। কিন্তু তার সপ্রতিভ চঞ্চলতা, হাসিভরা কটাক্ষ তোমার চিন্তা এলোমেলো ক'রে দিত।

অবশেষে একদিন তৈরী হ'য়েই ক্লাবে যেতে।

হলে সবাই যেন একটু উত্তেজিত সেদিন। মীনাক্ষীর আশেপাশে কেমন যেন ব্যস্ততা। দূর থেকে বুঝতে চাইতে ব্যাপারটা কি। টুকরো টুকরো কথা শুনতে।

: রিয়েলি, অদ্ভুত চয়েস!

: সুছন্দার এমন কি পার্টস্ আছে, যার জন্য—

ব্রীচ অব কন্ট্রাক্ট!

: নিশ্চয়ই। মীনাক্ষী দেবীর কেস করা উচিত।

: এও এক রকমের—

কিছুই বুঝতে পারতে না। মীনাক্ষীর কাছে যাবার আগে অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করতে,

: হয়েছে কি?

মিঃ সোম একটা স্কাউণ্ডেল! উত্তপ্ত উত্তর পেতে: মীনাক্ষীকে বাদ দিয়ে ইডিয়ট্টা সুছন্দাকে হিরোইন করেছে।

আশ্চর্য! তুমিও বিস্মিত হ'তে স্বাভাবিক নিয়মেই: ভারী অন্যায় তো। মীনাক্ষীর কাছে গিয়ে বলতে: কিছু ভাববেন না। সোমকে কি ক'রে শায়েস্তা করতে হয় আমি জানি। দেখবেন—

: আমার হ'য়ে আপনারা মিথ্যে কেন রাগছেন? মীনাক্ষী মিষ্টি ক'রে হাসতো: হয়তো সত্যি আমার প্রতিভা নেই—

: না, না আপনি তাকে চেনেন না—। তুমি আরো কি বলতে যেতে, বাধা দিত মীনাক্ষী, খুব মিনতি করে বলতো,

: এ বিষয় থাক। জানবেন, আমার নিজের কোন ক্ষোভ নেই।

তার কথায় সবাই অবাক হোত, তুমি হ'তে না। তবে একটু অন্যমনা হ'তে। আর একটু ক্ষুব্ধ। বৃথাই পকেটের চিঠিটা, যা' তাকে দেবে বলে লিখেছিলে—কি লিখতে আমি জানি না, থেকে থেকে তোমার খোঁচা দিত। যথাস্থানে পৌছত না। তাই সবার আগোচরে রেগে উঠতে। নিজের ওপর, নিজের এই অক্ষমতার জন্য।

: সোমের নিউ ফাইণ্ড। বোধ হয় নেক্স্ট বইয়ের হিরোইন।

তুমি ছোট্ট ক'রে বলতে: বুঝলাম। আর মেয়েটিকে ঘিরে থাকা ভীড় কখন পাতলা হয় তারই সুযোগ খুঁজতে।

এবং দু'য়েকদিনের মধ্যেই তার সাথে পরিচয় ক'রে নিতে। তার নাম, তোমাদের সেই শিক্ষয়িত্রীর যে নাম তুমি লেখনি, আমি আমার নায়িকার সে নাম দিচ্ছি। ধরো, তারও নাম মীনাক্ষী।

তার ব্যবহারে তুমি আশ্চর্য্য হ'তে। সবার মতো তোমারও কৌতুহল হোত তার সম্পর্কে। হওয়াই স্বাভাবিক। তাই একদিন, যখন সে বাড়ী ফিরতো একা, তুমিও বেরিয়ে আসতে তার পিছুপিছু। তাকে অনুসরণ করতে। অবশ্য তার অজান্তে!

খানিক বাদে সে কালিঘাটের কোন বস্তির গলিতে হঠাৎ অদৃশ্য হ'য়ে যেত। একটু ইতস্তত ক'রে তুমি ঢুকতে। চারধারে নীচু চালার খ'ড়ো ঘর। আঁকাবাঁকা পথ ধরে একটু এগিয়ে থমকে দাঁড়াতে। সামনে ইট বের করা একটা একতলা বাড়ী। অন্ধকার। শুধু জানালার ফাকে কুপীর হলদে আলোর একফালি আভাস। ভেতরে কথার মৃদু শব্দ—কোন ক্লান্ত পুরুষের স্বর,

: আজ এত তাড়াতাড়ি যে?

: বেশীক্ষণ থাকা যায় ওখানে? মেয়ে গলায় চাপা তীক্ষ্ণ উত্তর: একেবারে দম বন্ধ হয়ে আসে।

হালকা হাসির শব্দে বুঝতে—ছেলেটি একটু হাসলো: এ ঘরে নিশ্বাস নেবার প্রচুর জায়গা, না?

কিছুক্ষণ সব চুপ। সেই ফাঁকে তুমি ভাবতে: অসম্ভব! মীনাক্ষীদেবী এদিকে আসতেই পারেন না, তোমারই পথ ভুল। তবু দাঁড়িয়ে থাকতে ওখানে। শুনতে,

: বাঁচবো না সেতো জানিই, তবে এতো খরচ ক'রে কি লাভ?

: ছিঃ, ওকথা বলতে নেই। মোমের মতো ব্যথা গ'লে পড়া স্বরে বলতো মেয়েটি: চুপ করো।

: না। তবে দুঃখ কি জানো? আমারই জন্যে মা পাগল হয়ে গেল, আর—

: কি? চকিত, মৃদু প্রশ্ন হোত।

: তোমার শান্তি নষ্ট ক'রে দিলাম একেবারে।

: তুমি এমন কেন? আমি কিন্তু তোমার মতো নিরাশ হইনা। আজ কাল তো ডাক্তার, ওষুধ পত্র সবই হচ্ছে তোমার। নিশ্চয়ই ভাল হবে তুমি। যে আসছে, অন্তত তার জন্যে—

: মিথ্যে আশ্বাস দিও না মীনু।

কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। ঝিঁঝিঁর ঝিঁঝিঁট স্পষ্ট হ'য়ে উঠতো। মশার কামড় আর ড্রেনের গন্ধ উগ্রতর। আবার ছেলেটির ভাংগা স্বর শুনতে পেতে,

: তোমার কি অপরাধ, আমি নিজেই তোমায়—

: কি আজে বাজে বকছো? ইস্পাত-কঠিনস্বর মেয়েটির। বুঝতে পারতে না কে কথা কইছে—ক্লাবের মীনাক্ষীদেবী, না এ বাড়ীর মীনু। কিংবা অন্য কেউ? বাষ্পহীন শুকনো স্বর শুনতে: যারা বোকা, তাদের বোকামির সুযোগ কেন নেব না বলো?

: কিন্তু অতি চালাকির—। কথাটা অসমাপ্ত রেখেই আশ্চর্য্য নিস্পৃহভাবে বলতো ছেলেটি: যার আশায় আমাদের এই জীবন, তোমার সেই সন্তান কি তার বাপকে ক্ষমা করবে? তার মাকে সতী বলবে?

অবসাদে তোমার পা ভারী হ'য়ে আসতো। ফেরার পথে শুনতে তোমাদের ক্লিওপেট্রা, মিঃ সোমের নেক্স্ট হিরোইন, ক্লাবের মীনাক্ষীদেবীর তীক্ষ্ণ, বিস্মিত স্বর,

: আমায় তুমি সন্দেহ করো?

এরপরেও দেখা হোত তার সাথে। কথা কইতে গিয়ে থেমে যেতে। মাঝে মাঝে, কি যেন মনে হোত, ভাবতে চাইতে। কিন্তু তার সপ্রতিভ চঞ্চলতা, হাসিভরা কটাক্ষ তোমার চিন্তা এলোমেলো ক'রে দিত।

অবশেষে একদিন তৈরী হ'য়েই ক্লাবে যেতে।

হলে সবাই যেন একটু উত্তেজিত সেদিন। মীনাক্ষীর আশেপাশে কেমন যেন ব্যস্ততা। দূর থেকে বুঝতে চাইতে ব্যাপারটা কি। টুকরো টুকরো কথা শুনতে।

: রিয়েলি, অদ্ভুত চয়েস!

: সুছন্দার এমন কি পার্টস্ আছে, যার জন্য—

ব্রীচ অব কন্ট্রাক্ট!

: নিশ্চয়ই। মীনাক্ষী দেবীর কেস করা উচিত।

: এও এক রকমের—

কিছুই বুঝতে পারতে না। মীনাক্ষীর কাছে যাবার আগে অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করতে,

: হয়েছে কি?

মিঃ সোম একটা স্কাউণ্ড্রেল! উত্তপ্ত উত্তর পেতে: মীনাক্ষীকে বাদ দিয়ে ইডিয়টটা সুছন্দাকে হিরোইন করেছে।

আশ্চর্য! তুমিও বিস্মিত হ'তে স্বাভাবিক নিয়মেই: ভারী অন্যায় তো। মীনাক্ষীর কাছে গিয়ে বলতে: কিছু ভাববেন না। সোমকে কি ক'রে শায়েস্তা করতে হয় আমি জানি। দেখবেন—

: আমার হ'য়ে আপনারা মিথ্যে কেন রাগছেন? মীনাক্ষী মিষ্টি ক'রে হাসতো: হয়তো সত্যি আমার প্রতিভা নেই—

: না, না আপনি তাকে চেনেন না—। তুমি আরো কি বলতে যেতে, বাধা দিত মীনাক্ষী, খুব মিনতি করে বলতো,

: এ বিষয় থাক। জানবেন, আমার নিজের কোন ক্ষোভ নেই।

তার কথায় সবাই অবাক হোত, তুমি হ'তে না। তবে একটু অন্যমনা হ'তে। আর একটু দুঃখ। বৃথাই পকেটের চিঠিটা, যা' তাকে দেবে বলে লিখেছিলে—কি লিখতে আমি জানি না, থেকে থেকে তোমার খোঁচা দিত। যথাস্থানে পৌছত না। তাই সবার আগোচরে রেগে উঠতে। নিজের ওপর, নিজের এই অক্ষমতার জন্য।

আমার গল্প প্রায় শেষের মুখে। তাই আট ন' মাস বাদ যাক। তুমি ব্যস্ত থাকতে তোমার ব্যবসার কাজে। মাঝে মাঝে ক্লাবে যেতে, তার দেখা পেতে না। প্রশ্নের উত্তরে জানতে সে আর আজ কাল আসে না।

তাই একদিন বিকেলে, তোমার ব্যস্ততার ফাঁকে, প্রাণপণে সংকোচ কাটিয়ে মীনাক্ষীর বাড়ীর রাস্তায় পা দিতে।

মীনাক্ষীর স্বামী, সেখানে গিয়ে জানতে—যে ক'রেই হোক খবর পেতে—রাত্রির মতো রিক্ত সেই ছেলেটি মারা গেছে। সেদিনই সকালের আলোয়। চমকে উঠতে না তুমি।

কিছুক্ষণ দাঁড়াতে। (অবশ্য যেমন বস্তীতে সেই বাড়ী, সেখানে রাস্তায় দাঁড়ান সম্ভব নয়। তবু তোমায় দাঁড়াতেই হোত, নইলে আমার কাহিনী দাঁড়ায় না।) ম্লান আলোয় কয়েকটি ছেলে ফিরে আসতো। পায়ে পায়ে, ক্লান্ত। একটি বৃদ্ধা, ছেলেটির মা, বিলাপ করতে করতে শ্মশান-যাত্রীদের হাতে লোহা আগুন স্পর্শ করাতো। দৃষ্টি তোমার অন্য কারোর উপস্থিতি খুঁজতো, পেতো না।

তারা ভিতরে যাওয়ার পর তুমি একটু ইতস্ততঃ করতে। তারপর দরজা পেরিয়ে ধীরে ধীরে বারান্দায় যেতে। কোথাও কেউ নেই, কিংবা কোন শব্দ। শুধু বৃদ্ধার বিকৃত স্বর ছাড়া, উদ্দেশ্য ছেলে ক'টি,

: তোরা কি এমন মা কোথাও দেখেছিস? ছেলেটা মরে গেল—তবু নিজের খোকাকে ধরতে অবধি পেলে না!

কেউ হয়তো কিছু বলতো। তাকে ছাপিয়ে উঠতো মীনাক্ষীর শাশুরী,

: বউ খোকাকে কোনও দিন এঘরে আনে নি—যদি রোগে ধরে। আহা, ছেলেটা কত দুঃখ করতো, কত দেখতে চাইতো খোকাকে, কিন্তু বউ তবু—

ধরো, তুমি কল্পনা করতে—খোকা হবার পর হয়তো মীনাক্ষীর স্বামী বলতো, কোন একদিন মিনতি ক'রে,

: একবার কি খোকাকে দেখতেও পাবো না?

মীনাক্ষী তার মাথায় হাত দিয়ে বলতো, চুপি চুপি,

: তুমি ভাল হ'য়ে উঠো, তারপর। নইলে—

: আমি ভালো হবো কি? দীর্ঘশ্বাস চেপে ছেলেটি বলতো: দেখিই না একটু।

মীনাক্ষী উঠে যেত। কিছুক্ষণ। হাত পা' ধুয়ে, কাঁথায় মোড়া বাচ্চাটাকে নিয়ে দোর গোড়ায় দাঁড়াত। বলতো,

: কী সুন্দর হয়েছে, না?

: হ্যাঁ! ছেলেটির মুখে ম্লান হাসি: একেবারে ওর মায়ের মতো।

: এ ছেলে বড় হলে আর কোন দুঃখই থাকবে না, কি বলো! মীনাক্ষীর স্বরে রাত্রিশেষের অরুণিমা ঘুমন্ত ছেলের গালে গাল রাখতো, তার উষ্ণতা জড়িয়ে নিত দেহে, মনে।

: কাছে আনবে না? ছেলেটি যেন ভিখারী—অনুনয়: একটু আদর করবো।

: না। স্পষ্ট মীনাক্ষীর উত্তর, কঠিন: অবুঝ হয়ো না। এ ছেলেকে তো আমাদের বাঁচাতেই হবে!

স্বামীকে দুঃখিত হবার সুযোগ দিয়ে মীনাক্ষী বেরিয়ে যেতো।

তোমার মনের কুয়াশার জাল ছিঁড়তো বৃদ্ধার কথায়,

: কিন্তু, যে এত দুঃখ নিয়ে গেল, তার দীর্ঘ নিশ্বাস খোকার গায়ে লাগবে না? বাপের আশীর্বাদ যে ছেলে পেলো না, তার কি ভাল হয়? বৃদ্ধার বিলাপ বিরামহীন: ও মাগী ডাইনি, ও কি বুঝবে বলো, তোমারই বলো?

শ্রোতারা নিরুত্তর। তুমিও। এ প্রশ্নের উত্তর জান না। তাই ধীরে ধীরে ফিরতে সেখান থেকে বাঁদিকের ছোট্ট ঘরটার প্রতি নজর পড়তো। জানলা দিয়ে দেখতে—বুকের কাছে ছেলে জড়িয়ে কে যেন গভীর ঘুমে অচেতন।

আধো-আলোয় দেখবার চেষ্টা করতে—চোখে তার জল ছিল কিনা। আঁধারে দেখা যেতনা, তার ছায়া ভরা মুখের রেখায় রেখায় লেখা ছিল কী প্রশান্তি—কী আশ্বাস।

"সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়"—রবীন্দ্রনাথ।

নেশা

অনিল ভট্টাচার্য্য

প্রায়ই নেশা করে ফেরে হারান। পচাই মিঠে মিঠে গন্ধ। আজে-বাজে বুকনি।

অসহ্য লাগে সদুর। মিন্‌সে মরেও না। আপদ!

ঝাঁটা নেয় একটা। তারপর দরজার পাশে বসে থাকে। ঘুমে ঢুলে পড়ে। আর জ্বলে।

আজ বিষ ঝাড়বে।

হঠাৎ কানে আসে, সদু।

খাড়া হয়ে ওঠে সদু। হাতে ঝাঁটা। শক্ত মুঠো।

তবু থেমে যায়। মনে হয় স্বামী। দেবতা। পটের শিব।

টেনে ঘরে আনে সদু ওকে।

ঝাঁপ টানে।

বলে, আবার নেশা করছো?

—তোর পয়সায়?

দাঁতে দাঁত কাটে সদু। জবাব দেয়না। ইচ্ছে জিভ টেনে আনে। কিন্তু...

—ভাত খাবে?

—সদু। মাইরী কাছে আয়।

বাধা দেয় সদু।

মাতাল। পাড় মাতাল। লম্পট। চোর। বদমায়েস।—না। স্বামী।

কাছে আয়।

বসে। কাছে বসে। খুব কাছে। যেখানে বসে বুকের বাজনা শোনা যায়।

হারানের রোগা পেশী। সরু লোহা।

অস্ফুট কণ্ঠে ডাকে, সদু।

সুরুৎ করে সরে সদু।

বলে—আর নেশা করবে?

—না।

—মা কালীর দিব্যি?

—হ্যাঁ।

—আমার দিব্যি?

—শালী···

চীৎকার দিয়ে ওঠে আকাশের তারাগুলো। কাঁপে ভয়ে।

ভোর-ভোর তখন। সাবালক সকাল হয়নি।

সদু উঠেছে।

উনুনে আঁচ দিলো।

জল তুলবে। কলে গেল।

আচ্‌মকা ঘুম ভাংগে হারানের।

এ যে সদুর গলা!

—আমি আগে এলাম। আমি আগে নেবো।

—ইস্।

—ভালো হবেনা বলছি!

ভীষণ কলহ। হৈ-হল্লা। কল একটা ঘর ত্রিশটা।

লাফিয়ে ওঠে হারান।

—কে?

—অ! তুমিও হাজির। তা হ্যাঁগো, ভালো মানুষের বাচ্চা এতো সকালকে!

—চুপ্ কর্। জল নিতে দে।

—না। আমার হোক আগে।

রাগে কাঁপে হারান। লাগাবে নাকি!

মেয়েটা হঠাৎ গলা ছেড়ে চেঁচায়।

—মেরে ফেলল গো! মেরে ফেললে!

ত্রিশ ঘর। সব জমে।

এক মত সবাই।

তেল হয়েছে চাঁদের। মজা দেখাতে হবে।

হারানও ভয় পায়। সরে আসে।

কাঁদে সদু।

এমন অপমান-হেনস্ত করলে!

এ বস্তী ছাড়ো।

যেখানে হয় চলো, গাছতলে। মাঠে। ময়দানে। যেখানে খুশী!

হারান চুপ। হাসে মনে মনে।

নোতুন বউ।

মান আছে। অভিমান আছে। মানভঞ্জনের মানে তো জানে না!

তাছাড়া গাঁয়ের মেয়ে।

এখানে পুকুর কোথায়? বিঘৎখানেক মাটি কোথায়? কষ্ট তো হবেই।

চোখের জল মোছে সদু।

ভাত চড়ায়।

সকালের রোদ। কখন টাটিয়ে আসে। বাদলা রোদ। কড়া-ভেজা।

বাজে তখন সাতটা।

হারান খেয়ে নিলো। তৈরী হলো।

সতু শুধায় ফিরবে কখন ?

—ছুটি হলেই।

—রাত হবে ?

হাসে হারান। না ঃ, পকেট গড়ের মাঠ। শূন্য।

বনমালী দাস হাজির। ঠিক বেলা দশটায়।

ভাড়া বাকী, তাছাড়া। তাছাড়া। সত্যি লজ্জা হচ্ছে।

বনমালীর সতুকে বড় পছন্দ।

বনমালী বলে না। না আকারে। না ইংগিতে।

বেশ ভালো-ভোলা মেয়ে। কথাটি কয় যেন ময়নাটি হাসে।

হ্যাঁ। তাকাতে জানে বটে বনমালী।

বেশ সোজা। প্রথম চোখে মনে হবে স্নেহজ। তারপর মনে হবে প্রেমজ। তারপর—অন্যরকম।

সতুও বুঝতো স্নেহ। বুঝতো প্রেম।

এখন সব গুলিয়ে গেছে। সব থেকে ভেসে উঠছে একজোড়া চোখ। তপস্বী বেড়াল।

দেখা হলে কথা বলতে চায়না সতু।

তবু মানুষ তো। এটা বলে। সেটা বলে। হুঁ-হ্যাঁ বলতেই হয়।

দরজার কাছে এসে বনমালী হাঁকে—হারাণ আছিস্ ?

দোর আড়াল করে জবাব দেয় সতু—নেই।

—কাজে গেছে বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—ফিরবে কখন ?

—সন্ধ্যায়।

—ও।

বেশী কথা বলে না বনমালী আজ।

আস্তে সরে যায়।

বেড়ায় ফাঁক দিয়ে দেখে সতু।

গলায় বড় বড় তুলসীর মালা রোদ্দুরে কেমন চক্ চক্ করছে।

সহজ কথা। সহজ দৃষ্টি। কিন্তু দুটোই বাঁকা।

খোলার ঘরের বাসিন্দা। জীবনে রং নেই। কিন্তু রস আছে। আদি রস।

কানে কানে কানাই-বাঁশী বাজে। চোখে চোখে চাউনী।

কি করতে আসে বনমালী ?

জানে ঘরে মানুষ নেই! সোমত্ত জোয়ান মেয়ে, তবু আসে!

আর মেয়েও বলিহারি।

ক্যাম্‌লা খ্যাংড়া জোটে না! মুয়ে থুতু দিলি নে!

তা দেবে কেন ?

বিনি পয়সায় মাস কাটায়। হোকনা অন্য কেউ। বনমালী দাস দুর্ দুর্' করে তাড়াবে।

জানিনে আবার!

ফিস্ ফিস্। গুজুর গুজুর।

কখনো জলের লাইনে। কখনো উকুন বাছতে।

হারানের সামনেই বলে বেলাজাগুলো।

—ইস্ এতো দেমাক কিসের! বৌ তো এদিকে·····

ঘুরে দাঁড়ায় হারান।

তাকায়।

কথা বন্ধ।

এগোয় হারান। আবার কানে আসে। এবার থামেনা হারান।

দরজা হাট করে বসে আছে সতু।

বৌ রাণী তেল মেখেছে। লাল সাবান লাগিয়েছে। কপালে তারার মতো টিপ।

হাসে সতু।

জ্বলে হারান।

—বনমালী এসেছলো বুঝি ?

মুখ কালো সতুর।

আস্তে জবাব দেয়, হ্যাঁ।

—রোজ রোজ এই হচ্ছে তাহলে!

দুটো চোখ। দু দুটো বিস্ময়। সতু চেয়ে থাকে।

রাম হয়তো বলবে। শ্যাম হয়তো বিশ্বাসও করবে। তাই বলে হারান···তাহলে

পাথরে—মাটিতে বে-মিল কই। তাহলে ধান-ও যা ঘাসও তা!

ফুঁসে ওঠে হারান।

—জবাব দে!

সদু যেন দেখলো একটা দৈত্য এগিয়ে আসছে। বিরাট। কুৎসিৎ। পেটে অসহ্য আঘাত লাগলো। মাথা ছিঁড়ে পড়ে গেল। না: আর মনে নেই।

চুপ্ করে দাঁড়িয়েছিলো কাবলীওয়ালা।
বেটা অনেক দিন ধরে হাঁটছে।
না সুদ। না আসল। তবে চল্লিশ ইঞ্চি ছাতি। কাবুলের রক্ত। আর লাঠিই সম্বল।
—এই!
থম্‌কে দাঁড়ায় হারান।
ছাতির নীচে চুপ করে দাঁড়ায়।
হুংকার দেয় কাব্‌লী।
—রূপিয়া!
—কটা রোজ মেহের বাণী করো। সোমবার।
অনেক অনুনয়। অনেক বিনয়।
শোনে না কাবলী।
ভয় কি! আসল তো চাইনে। সুদ। সুদ। চৌদ্দ আনা!
চৌদ্দ আনা! চৌদ্দ পয়সাও নেই।
চড় খেয়ে ছিট্‌কে পড়ে হারান।
হৈ-হৈ করে বস্তীর মরদগুলো জমে। মেয়েরা উঁকি মারে।
ওরা দাঁড়ায়। হাসে। মজা দেখে।
কেউ ভাবে—আহা।
কিন্তু কথাটি নেই। সেলাই করা মুখগুলো। ধারের বেলায় তো এই মিঞাই হাজির।
দেনদারও অনেক এখানে।
অকথ্য গালি দেয় লোকটা। লাথি মারে।
হঠাৎ শিউরে ওঠে সবাই।
পেছন থেকে কাবলীর কাঁধে লাঠি-মেরেছে সদু।

কাবলীওয়ালা চলে গেছে।
নরহরি বলে—গেছে মানে? শালা দল আনবে।
মালাকর দাদাও হাসলো খুব।
আর হাসলো সেই মেয়ে। ঝগড়াটে মেয়ে। নয়ান।
বলে—বেশ হয়েছে। আর ঝগড়া করবি না?

নালাটা ডিঙিয়ে আসে নয়ান।
উঁকি দেয়।
দুজনে মুখোমুখি বসে। নয়ান। সদু।
ফিক্ করে হাসলো নয়ান।
বলে—দরকার হলে বলিস ভাই। আমার মিনসেকে ডেকে দেবো।

কাবলীওয়ালা এলোনা সেদিন।
না তার পরের দিন।
তিন তিনটে দিন গেল পেরিয়ে।
একদিন সন্ধ্যা হলো।
রাত হলো।
তারায় ছেয়ে গেল।
হারান এলো না।
ব্যস্ত সদু। দুশ্চিন্তা। ভাবনা।
এমন সময় হারান এলো।
টল্‌ছে। বে-সামাল কথা। লুব্ধ দৃষ্টি।
—আবার টেনে এসেছো?
—সদু মাইরী বল্‌ছি খেতে চাইনি। ওরা জোর করে…
ঘেন্না। বিশ্রী একটা ঘেন্না। মিঠে মিঠে গন্ধ। গা গুলোয়।
—এই কোথায় যাস্ বা'রে। বনমালী…
—চুপ।
কাঠের পুতুল যেন। না নড়ে না চড়ে।
কথা নেই একটাও।
হারান এগিয়ে আনে। বুকের কাছে আসে।
হাসে। তারপর মজা করে হাসে।
আর এক চোখ জলে বুক ভাসায় সদু। সৌদামিনী।

দেহ নয় ছিবড়ে। তা-ও যেন কিসের টানে বয়ে চলেছিলো হারান।
সূর্য্য ডুবলো। কলের চিমনী রইলো।
সামনে গোছা গোছা ফুল। না ফুল মনি।
আরো জোরে পা চালায় ও।

রেলের লাইন পেরিয়ে বস্তী।

খোলার চালা। নালা পাশে। মশা-মাছি-কীট বোঝাই। এদিকে খাটাল।

দরজার কাছে এসে চমকে ওঠে হারান।

বন্ধ যে!

ছুঁড়ীর পাখা গজালো?

শালা বনমালী। বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো।

দরজা যে ভেতর থেকে বন্ধ।

তবে কি···

মাথায় আগুন জলে হারানের।

পাশের ঘরের লখিয়ার মা। মালাকর দাদা। নরহরির মা। সবাই আসে।

—কি হলো?

—কি জানি।

জোরে লাথি মারে হারান।

কেরোসিন কাঠের দরজা। ভেংগে পড়ে।

হারান ঢোকে।

একি! শুয়ে কেন সদু?

চুল এলো মেলো। চোখ লাল। মুখ থেকে ফ্যানা বেরুচ্ছে।

আফিং খেলো নাকি!

নয়ান এগিয়ে এলো।

বুকে কান পাতলো।

না। চল্‌ছে এখনো। দামী ঘড়ির মতো। নিঃশব্দে প্রায়।

মালাকর দাদার পায়ে বাত।

তবু এসেছে।

শুধায়—কি হলো হারান।

সদুর পানে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে হারান।

তারপর বলে—কিছু নয় মালাকরদা। বউ নোতুন নেশা ধরেছে।

সাংস্কৃতিকী

সংস্কৃতির যাত্রা

সংস্কৃতির পেছনে শুভবোধ সক্রিয় থাকে। শুভবোধকে ধর্ম্মরাজ্যে টেনে নিলে সংস্কৃতির ভিত্তিরচনায় ধর্ম্ম-প্রবণতা সক্রিয় হয়। শুভবোধ ধর্ম্মরাজ্যেই বিচরণ করবে আর কোনো ক্ষেত্রে তার ঠাঁই নেই এমন যুক্তি অসার। একটি মানুষ পরিবারের শুভবোধে একটি জীবন অনায়াসে অতিবাহিত করে দিতে পারে। অনেক মানুষ সমাজ বা দেশের শুভবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে আজীবন সংস্কৃতির কাজ করে যান। অতএব বলা যেতে পারে যে ধর্ম্মবোধ, সমাজবোধ, দেশাত্মবোধ, সংসারবোধ সবই শুভবোধের শাখা। সংস্কৃতি নামক একটি ব্যাপারে মাত্রাভেদে এ সকল বোধ থাকতে পারে; কোনো একটি বিশেষ বোধের ঘাটতি বা অভাব থাকলেও সংস্কৃতির বিকাশ হতে পারে। ধর্ম্মহীনের সংস্কৃতি নেই বা অসামাজিক মানুষ সংস্কৃতির ধার ধারে না—এসব মন্তব্যে কোনো সত্য নেই। অসামাজিক মানুষ তাঁর সাংসারিক সংস্কৃতিতে বা শৈল্পিক সংস্কৃতিতে উন্নত হতে পারেন। দেশাত্মবোধে যে-মানুষ কায়মনপ্রাণ ডুবিয়ে দিয়েছেন তিনি অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কৃতিতে উঁচু স্থান লাভ করতে পারেন। সংস্কৃতিকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে যেমন ধরা যায়, প্রসারিত ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে দেখা যায়।

মানুষের শিল্পজ্ঞানে সৌন্দর্য্যানুভূতি সংসারযাত্রার পথ থেকে আহৃত। যাঁরা মনে করেন ধর্ম্মের সঙ্গে শিল্পচর্চ্চার বৃত্তিটি জাগ্রত হয়েছিল তাঁরা মানুষের সভ্যতার আদ্ধেক পথ মুছে দিয়ে অপরার্দ্ধে তাকিয়ে এ-ধরণের মন্তব্য করেন। আদিম মানুষের সভ্যতার পথে যে-সব বীভৎসকায় মূর্ত্তি ধর্ম্মবোধের সঙ্গী হয়েছিল তা প্রাগৈতিহাসিক মানুষের তৈরী দেবতামূর্ত্তিগুলোর দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারি। শুধু বা প্রাগৈতিহাসিক মানুষ কেন, মিশরের নামজাদা ইতিহাসেও বিরাট ঠোঁট-ওয়ালা সারস-মুখী 'ঠোট'-দেবতা পুজিত হয়েছেন। রাঢ়াঞ্চলে কোকমুখী শিবা-দেবী পুজিতা হতেন। কোকমুখী উলঙ্গা মূর্ত্তি স্পেনের প্রাক্-ইতিহাসের গুহাগাত্রে অঙ্কিত এবং ফরাসীতে প্রস্তরে নির্ম্মিত দেখা যায়। কামাখ্যা পাহাড়ের ধ্বংসাবশেষে যে রথারূঢ়া কোকমুখী মূর্ত্তি পাওয়া গেছে তাতে সভ্যতার স্পর্শ বেশি—অর্থাৎ মূর্ত্তিটি উলঙ্গা নয়। সিন্ধু সভ্যতার উলঙ্গা নারী মূর্ত্তি মানবীর চেহারা নিয়েও কুৎসিত—তিনি তখনকার সৌন্দর্য্যাদর্শ, কি দেবী, বোঝা মুস্কিল। তবে সৌন্দর্য্যের সূত্র আবিষ্কারের প্রতি বা বা সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রতি প্রাগৈতিহাসিক মানবরা অন্ধ ছিলেন না। ব্যবহার্য্য আসবাব, নৌকোর গলুই, পানপাত্র, ঘট-কলস, পুঁতির বা শিলার হার প্রভৃতির নক্সা-নমুনা তাঁরা লোহিত-ভারত-অঞ্চলে, ভারতে, আফ্রিকায় যা রেখে গেছেন, তাতে মনে হয় সৌন্দর্য্যমূলক শিল্পচর্চ্চা তাঁরা সাংসারিক জীবনকে প্রসাধিত করবার জন্যেই করতেন। সে-জীবন ধর্ম্মবহির্ভূত দৈনন্দিন জীবন। অবশ্য ধর্ম্মের সঙ্গে নগ্ন দেহ-সৌন্দর্য্যের যোগাযোগ কোনো-কোনো সভ্যযুগেও হয়েছে।

সৌন্দর্য্য-বোধকে যদি আমরা সভ্যতার একটি মাপকাঠি বলে গ্রহণ করতে পারি তাহলে বল্‌ব যে মানুষের সভ্যতা ঐহিক জীবন-বোধের পথে দ্রুত পায়ে যাত্রা সুরু করেছে। মানুষ ঐহিক জীবনকে

ভালোবেসে, তাকে রূপমণ্ডিত করে অধিকতর সভ্য হয়েছে। ধর্ম্মকে সমীহ করে করে মানুষের সভ্যতার গোড়ার দিকটা বিভীষিকায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সুতরাং আমরা বলতে পারি, মানুষের আদিম শুভ-সংস্কৃতি সংসার-যাত্রা, ধর্ম্ম নয়। ধর্ম্মে শুভবোধোদয় ভারতীয় ঋক্‌বেদী সভ্যতার আগে এসেছে বলে মনে হয় না। মিশরে তা এসেছে আরো পরে, ঐহিকতার সঙ্গে সুচারু মিশ্রণে। শুভবোধে রঞ্জিত হয়ে ধর্ম-প্রবণতা মানুষের জীবনকে প্রাচ্য দেশে যেমন আকর্ষণ করতে পেরেছে তেমন আর কোথাও নয়। সেসব দিনেই ভরতবর্ষ সংস্কৃতির প্রসারিত রূপ-দর্শনে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্মাদর্শ যেদিন নির্ব্বাণোন্মুখ অর্থাৎ বেদান্ত যুগে উপস্থিত হল, সেদিন সংস্কৃতি বাধ্য হয়েই ধর্ম্মের স্পর্শ থেকে মুক্তি নেবার উপক্রম দেখিয়েছে। নির্ব্বাণ লক্ষ্য রেখে সংস্কৃতির বা কোনো সভ্যতার সুস্থ মনে যাত্রা চল্‌তে পারে না। বিদেহ পুড়ে গেল জনকের গায়ে ফোস্কা না পড়তে পারে এবং তিনি তা সদম্ভে ঘোষণাও করে যেতে পারেন, কিন্তু একটা সংস্কৃতির কেন্দ্র তাঁর ধার্ম্মিক দাম্ভিকতায় নষ্ট হয়ে যায়।

ধর্ম্ম-প্রবণতা মানুষের মনকে এমন একটি উচ্চতায় পৌছিয়ে দেয়, যেখান থেকে সাংসারিক বা জাগতিক ব্যাপারগুলো তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে হয়। সভ্যতা একপেশে হয়ে তখন সংস্কৃতির সঙ্কট ডেকে আনে। তাই অনাথপিণ্ডিক 'উঢ়সংস্থানকেতা' (বিবাহ বা বৈশ্য-পদ্ধতি) এনে শিল্পকলার চর্চ্চা শেখাতেন জেতবনে। বৌদ্ধ যুগের ভারসাম্য রক্ষা করেছিল শ্রেষ্ঠী-সভ্যতা। যদিও ঐহিকতার সমস্ত অপরাধই শ্রেষ্ঠী বা বৈশ্য সংস্কৃতিতে ছিল তবু আমরা বলতে বাধ্য যে শূন্যবাদী শ্রেষ্ঠ দর্শনের ফল প্রাপ্তির চাইতে শ্রেষ্ঠী ও সিদ্ধার্থের কালটিই ভারতবর্ষের পক্ষে সৃষ্টিশীলতায় রমণীয় ছিল। ঠিক তেম্নি গুপ্ত-যুগ, যে-যুগ পার্থিবতা বর্জ্জন না করে ভারতকে শিল্প-সমৃদ্ধ করে দিয়ে গেছে। মনোধর্ম্ম তখনই প্রশস্ত, যখন তা জাগতিক জীবনের শুভবোধে জাগ্রত। সে-মনোধর্ম্মই শিল্প-সংস্কৃতির চলচ্ছক্তি।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

'তানসেন সংগীত সংঘ'

ধ্রুপদী সঙ্গীতের ধ্রুপদী পদক্ষেপ। মানুষের হৃদপদ্মে ভ্রমরগুঞ্জনের মত ভারতীয় সঙ্গীতের বিচ্ছুরণ। ওম্‌-কার ধ্বনির বহুধা বিভক্ত ঝঙ্কার। আলো ও আঁধারের স্পর্শে শব্দসাগরে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তাই ছেনে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর রূপ। বহু রাগ রাগিণীর উদ্ভব। বহু সুপ্ত সুর শ্রুতিপথে এসে সাড়া দেয়।

গানাৎ পরতরং নহি। জীবনের সুন্দর অভিব্যক্তি গানে এবং ধ্রুপদী সঙ্গীত চর্চ্চায় অবিচ্ছিন্ন জীবনধারাকেই স্পর্শ করে যাওয়া। কারণ শব্দব্রহ্মই সৃষ্টি রহস্য আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাই যাঁরাই সঙ্গীত সাধনায় উন্নীত হয়েছেন তাঁরাই সহজে আনন্দে প্রবেশ করতে পারেন এবং শ্রোতারাও জীবনের হীনতা মুক্ত হন।

কিন্তু অর্ধশিক্ষিত সাধনা বা আন্তরিকতা বর্জিত শ্রোতা ধ্রুপদী সঙ্গীতের সামগ্রিকরূপ পরিকল্পনা করতে পারে না—ফলে, আনন্দের ব্যাঘাত জন্মে। কারণ সঙ্গীত চর্চ্চায় চিত্তবৃত্তিগুলি উচ্চগ্রামে বাঁধা না থাকলে, সাধনার দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্যক অবহিত না থাকলে এবং উপলব্ধির ক্ষমতা না থাকলে সুর-

তরঙ্গের সঙ্গে মনসংযোজন সম্ভব হয় না। গোষ্পদে আকাশ দেখার মত, কণ্ঠে বা যন্ত্রে সঙ্গীতের সামগ্রিক রূপ প্রতিধ্বনিত হওয়া প্রয়োজন। এবং এজন্যেই সঙ্গীত সাধনায় যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেন তাঁদের ঋষিকল্প বলা হয়।

বর্ত্তমানে ধ্রুপদী সঙ্গীত ঘরানা মুক্ত হয়ে সকলের সুযোগে এসেছে—কিন্তু গুরুগৃহে কঠোর নিয়মের ভিতর শিষ্যদের যেতে হতো, এখন নিয়ম স্ব-ইচ্ছাধীন। তাই সত্যিকার সঙ্গীত সাধকদের দায়িত্বও অধিক।

তানসেন সঙ্গীত সংঘের বার্ষিক অধিবেশনে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কুশলতা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে বাংলায় ধ্রুপদী সঙ্গীত চর্চ্চায় আস্থাশীল হয়েছি। বাংলা গীতিকাব্যের দেশ, একসময় বাউল ভাটিয়ালী ভাওয়াইয়ার সঙ্গে নিয়মিত ধ্রুপদ চর্চ্চা হতো। ধ্রুপদ ছিল বৈঠকী গান, অন্যগুলি ছিল মাঠের, পথের, নদীর। আজকাল ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী সম্বন্ধে জনসাধারণ উদগ্রীব। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে প্রচণ্ড রস না সৃষ্টি করতে পারলে তারা বুঝবে না। তাই তানসেন সঙ্গীত সংঘ প্রভৃতির দায়িত্ব গুরুতর। পরম উপলব্ধির দ্বারাই কাঠিন্যের আবরণ খসে পড়ে। সুরের ব্যবধান দূরীভূত হয়।

নৃত্যশিল্পী শান্তি বর্দ্ধন

নৃত্যশিল্পী শান্তি বর্দ্ধনের অকাল মৃত্যু-সংবাদ শিল্পচক্রকে স্তম্ভিত করবে। অতি তরুণ বয়সেই তিনি বৃহত্তর ভারতে খ্যাতি অর্জন করেন। মনি বর্দ্ধন ও উদয় শঙ্করের কাছে নৃত্যশাস্ত্র সম্পর্কে পাঠ নিয়ে তিনি অচিরেই নিজস্ব ধারা খুঁজে পান ও সমাদৃত হন। নৃত্য তাঁর কাছে ছিল—সংগ্রামের উদ্দীপন, কর্মের প্রেরণা, জনশিক্ষার দিগদর্শন এবং ভারতীয় মানবতা বোধের প্রতীক। নৃত্য তাঁর কাছে জীবনব্যাপী সাধনা—সৃষ্টি-রহস্যের অনন্ত জিজ্ঞাসা।

ত্রিপুরার যে ক'টি মহাপ্রাণ মহাভারতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, যে ক'টি বাঙালী শিল্পী খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত-কে একসূত্রে গাঁথবার চেষ্টা করেছেন মধুভাষী মরমী কলাবিদ শান্তি বর্দ্ধন তাঁদের অন্যতম।

কিছুদিন যাবত তিনি ভারতীয় লোকনৃত্যগুলি পুনরুজ্জীবিত করে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ধ্রুপদী-মণিপুরী-লোকনৃত্যের সংমিশ্রণে তিনি পণ্ডিত জওয়াহর লাল নেহরুর 'ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়া' নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করেন। এমন অসম্ভব সম্ভাবনায় মুগ্ধ দর্শকমাত্রই বিস্ময় বোধ করেছিলেন এবং পণ্ডিত নেহরুর মত বিদগ্ধজন শান্তি বর্দ্ধনের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। সম্প্রতি তিনি পৃথিবীর ইতিহাসধারা নৃত্যে প্রকাশ করতে সচেষ্ট ছিলেন—তা ছাড়া লোকশিক্ষার অনেক পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। আজ তাঁর 'লিটল ব্যালে গ্রুপ' কাণ্ডারী-বিহীন, তাঁর সাধনা অর্ধসমাপ্ত।

অমল দত্ত

'ভারতের চিন্তাশক্তি' ঃ শ্রীঅরবিন্দ

বাঙ্গালী জাতির মন অনুসরণ করলে দেখা যাবে বাঙ্গালী এক এক সময় এক এক দিকে ঝুঁকে পড়ে—কিছুকাল অনুশীলন করার পর এক সময়ে তার থেকে ক্রমে সরে অন্য কিছুর অনুশীলনের জন্য ব্যস্ত হয়েছে ; আর পরবর্ত্তীকালে ভারতের অন্যান্য জাতি বাঙ্গালীর ছেড়ে দেওয়া বিষয় নিয়ে অনুশীলনে উৎসাহী হয়েছে। আঠার শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রথমে বাঙ্গালী ব্যবসা জগতে যখন কৃতী হয়ে উঠেছিল, যখন একমাত্র রামদুলাল সরকারেরই চারটি জাহাজ শুধু আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসা করতে নিযুক্ত ছিল, সে সময়ে ভারতের অন্যান্য জাতি ব্যবসাক্ষেত্রে সেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় তো দেয়নি। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি হতে বাঙ্গালী ক্রমে ব্যবসা হতে তার মন সরিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে মেতে গেল, আর তখন হতে ভারতের অন্যান্য জাতিদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যবসা প্রসারে চেষ্টা আরম্ভ করতে লাগল। ভারতে অন্যান্য জাতি যখন পাকাভাবে ব্যবসাতে লিপ্ত, তখন বাঙ্গালী রাজনৈতিক আন্দোলন করে ইংরেজকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। যে সময়ে বাঙ্গালী রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত ভারতের অন্যান্য জাতি সে সময়ে এ ব্যাপারে ঘুমন্ত। এই বাংলাতে সারাভারতীয় বিপ্লবীদলের জন্ম, সারাভারতীয় অসহযোগ আন্দোলনের গোড়া পত্তন। রাজনীতি যখন ভারতের অন্যান্যদিকেও ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে বাঙ্গালীর মনও ক্রমে রাজনীতি ছেড়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প-কলা, সঙ্গীত, নাটক নৃত্য নিয়ে মেতে উঠেছে। বাঙ্গালীর ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা নেই, রাজনীতি ক্ষেত্রেও তেমন কৃতিত্ব আর নেই বলে বাঙ্গালীর অধঃপতন হচ্ছে মনে করে অনেকে দুঃখিত। অনেক অবাঙ্গালী খুসী। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায়, যে বাঙ্গালীর মধ্যে এক সময়ে এত বড় বড় ব্যবসায়ী হয়ে গিয়েছে, রাজনীতিতেও এত সব বাঙ্গালী দিকপালদের দান রয়েছে, তাছাড়া, কি সাহিত্যে কি বিজ্ঞানে, কি শিল্পকলায়, এমন কি নৃত্যে, ম্যাজিকেও এই সেই দিন পর্য্যন্ত সারা বিশ্ব জয় করে এসেছে যাঁরা তাঁরা বাঙ্গালী, এত সত্বর বাঙ্গালার শক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়নি ; অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে মাত্র। আসলে বাঙ্গালা আগে আগে চলেছে, পেছনে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ আসছে। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন "আগত যুগ, ভারতের ভার স্কন্ধে লইয়া বঙ্গজননী উঠিতেছেন।" কিন্তু বাঙ্গালী যে চলেছে একটার পর একটা অনুশীলন করে সে সম্বন্ধে সে অচেতন ; আর ভারতের অন্যান্য জাতিও যে বাঙ্গালীকে তাদের অজ্ঞাতসারেই অনুসরণ করে চলেছে। কিন্তু সবকিছু ছেড়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে একদিকে ঝুঁকে পড়ার মত বাঙ্গালীর মারাত্মক সব ত্রুটি রয়েছে। কাজেই সে সব ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নিজেদের তৈরী করে নিতে হবে, পূর্ণভাবে সবকিছু নিয়ে সচেতন থেকে এগিয়ে যেতে হবে।

বাঙ্গালী জাতির ভাগ্য বিধাতার ইচ্ছায় গত একশত বৎসরের মধ্যে যে এতগুলি মণীষী এই বাংলায় জন্ম নিল, যা কোন জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না, সে-সৃষ্টির উদ্দেশ্য, এখন এই অল্প সময়ের মধ্যেই তো শেষ হয়ে যায়নি। বাঙ্গালীকে কি কাজের উপযোগী করে তৈরী করে নিয়ে চলেছেন এই জাতির ভাগ্যবিধাতা, তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এতগুলি মণীষীকে এনে ব্যবসা, রাজনীতি ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নানাধরণের অনুশীলন করিয়ে বাঙ্গালী জাতিকে আরও বৃহত্তর আরও মহত্তর কর্ত্তব্য অনুশীলনের জন্য যে প্রস্তুত করে তোলা হচ্ছে একটু চিন্তা করলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙ্গালীর এই যে প্রস্তুতি চলেছে, যার সম্বন্ধে বাঙ্গালী এখনও অচেতন, এই প্রস্তুতির সময়ে, কিভাবে আমাদের চলা উচিত, প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে এবং বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির কি কি পরিবর্ত্তন ও পরিশোধন করলে প্রস্তুতির কাজ সহজ ও সুষ্ঠু হয়ে সত্বর সাফল্য আসবে তারই আভাস সংক্ষিপ্ত ভাবে শ্রীঅরবিন্দ দেশবাসীকে এই পুস্তিকার মাধ্যমে দিয়ে গিয়েছেন। যে কাজ বাঙ্গালীকেই প্রথম করতে হবে আর যাতে সব বাঙ্গালীরই সহায়ক হয় সেজন্য এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, পুস্তিকাটি বাংলায় অনুবাদ করে বাঙ্গালীর পরম উপকার করা হয়েছে।

মণিলাল সেন

আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পুর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি—যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পুর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায়—'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পুর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস
দুটাকা

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
গান্ধী-পরিকল্পনা
(অর্থনীতি বিষয়ক)
দু'টাকা

গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা
দু'টাকা

ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম
বারো আনা

শিক্ষার বাহন
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
রুশো

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
কার্ল মার্ক্স

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ডারুইন

সুবোধ ঘোষের
সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
বৌদ্ধধর্ম্ম
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
ধর্ম্মবিজয়ী অশোক
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা :

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ভারতীয় নারী ও সমাজ

গোপাল ভৌমিকের
সমাজ ও সাহিত্য

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
সমাজ ও বিজ্ঞান

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
ধর্ম্ম ও নীতি

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
সমাজ ও সংস্কৃতি

নারায়ণ চৌধুরীর
সঙ্গীত ও সমাজ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ

লুই ফিশারের
মহাজিজ্ঞাসা
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা

মিনু মাসানির
নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
মোসলেম রাজনীতি
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি
বার আনা

মিনু মাসানির
খাদ্য
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
বোম্বে পরিকল্পনা
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

'ভারতের চিন্তাশক্তি' ঃ শ্রীঅরবিন্দ

বাঙ্গালী জাতির মন অনুসরণ করলে দেখা যাবে বাঙ্গালী এক এক সময় এক এক দিকে ঝুঁকে পড়ে—কিছুকাল অনুশীলন করার পর এক সময়ে তার থেকে ক্রমে সরে অন্য কিছুর অনুশীলনের জন্য ব্যস্ত হয়েছে ; আর পরবর্ত্তীকালে ভারতের অন্যান্য জাতি বাঙ্গালীর ছেড়ে দেওয়া বিষয় নিয়ে অনুশীলনে উৎসাহী হয়েছে। আঠার শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রথমে বাঙ্গালী ব্যবসা জগতে যখন কৃতী হয়ে উঠেছিল, যখন একমাত্র রামদুলাল সরকারেরই চারটি জাহাজ শুধু আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসা করতে নিযুক্ত ছিল, সে সময়ে ভারতের অন্যান্য জাতি ব্যবসাক্ষেত্রে সেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় তো দেয়নি। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি হতে বাঙ্গালী ক্রমে ব্যবসা হতে তার মন সরিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে মেতে গেল, আর তখন হতে ভারতের অন্যান্য জাতিদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যবসা প্রসারে চেষ্টা আরম্ভ করতে লাগল। ভারতে অন্যান্য জাতি যখন পাকাভাবে ব্যবসাতে লিপ্ত, তখন বাঙ্গালী রাজনীতিক আন্দোলন করে ইংরেজকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। যে সময়ে বাঙ্গালী রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত ভারতের অন্যান্য জাতি সে সময়ে এ ব্যাপারে ঘুমন্ত। এই বাংলাতে সারাভারতীয় বিপ্লবীদলের জন্ম, সারাভারতীয় অসহযোগ আন্দোলনের গোড়া পত্তন। রাজনীতি যখন ভারতের অন্যান্যদিকেও ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে বাঙ্গালীর মনও ক্রমে রাজনীতি ছেড়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প-কলা, সঙ্গীত, নাটক নৃত্য নিয়ে মেতে উঠেছে। বাঙ্গালীর ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা নেই, রাজনীতি ক্ষেত্রেও তেমন কৃতিত্ব আর নেই বলে বাঙ্গালীর অধঃপতন হচ্ছে মনে করে অনেকে দুঃখিত। অনেক অবাঙ্গালী খুসী। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায়, যে বাঙ্গালীর মধ্যে এক সময়ে এত বড় বড় ব্যবসায়ী হয়ে গিয়েছে, রাজনীতিতেও এত সব বাঙ্গালী দিকপালদের দান রয়েছে, তাছাড়া, কি সাহিত্যে কি বিজ্ঞানে, কি শিল্পকলায়, এমন কি নৃত্যে, ম্যাজিকেও এই সেই দিন পর্য্যন্ত সারা বিশ্ব জয় করে এসেছে যাঁরা তাঁরা বাঙ্গালী, এত সত্বর বাঙ্গালার শক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়নি ; অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে মাত্র। আসলে বাঙ্গালা আগে আগে চলেছে, পেছনে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ আসছে। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন "আগত যুগ, ভারতের ভার স্কন্ধে লইয়া বঙ্গজননী উঠিতেছেন।" কিন্তু বাঙ্গালী যে চলেছে একটার পর একটা অনুশীলন করে সে সম্বন্ধে সে অচেতন ; আর ভারতের অন্যান্য জাতিও যে বাঙ্গালীকে তাদের অজ্ঞাতসারেই অনুসরণ করে চলেছে। কিন্তু সবকিছু ছেড়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে একদিকে ঝুঁকে পড়ার মত বাঙ্গালীর মারাত্মক সব ত্রুটি রয়েছে। কাজেই সে সব ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নিজেদের তৈরী করে নিতে হবে, পূর্ণভাবে সবকিছু নিয়ে সচেতন থেকে এগিয়ে যেতে হবে।

বাঙ্গালী জাতির ভাগ্য বিধাতার ইচ্ছায় গত একশত বৎসরের মধ্যে যে এতগুলি মণীষী এই বাংলায় জন্ম নিল, যা কোন জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না, সে-সৃষ্টির উদ্দেশ্য, এখন এই অল্প সময়ের মধ্যেই তো শেষ হয়ে যায়নি। বাঙ্গালীকে কি কাজের উপযোগী করে তৈরী করে নিয়ে চলেছেন এই জাতির ভাগ্যবিধাতা, তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এতগুলি মণীষীকে এনে ব্যবসা, রাজনীতি ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নানাধরণের অনুশীলন করিয়ে বাঙ্গালী জাতিকে আরও বৃহত্তর আরও মহত্তর কর্ত্তব্য অনুশীলনের জন্য যে প্রস্তুত করে তোলা হচ্ছে একটু চিন্তা করলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙ্গালীর এই যে প্রস্তুতি চলেছে, যার সম্বন্ধে বাঙ্গালী এখনও অচেতন, এই প্রস্তুতির সময়ে, কিভাবে আমাদের চলা উচিত, প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে এবং বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির কি কি পরিবর্ত্তন ও পরিশোধন করলে প্রস্তুতির কাজ সহজ ও সুষ্ঠু হয়ে সত্বর সাফল্য আসবে তারই আভাস সংক্ষিপ্ত ভাবে শ্রীঅরবিন্দ দেশবাসীকে এই পুস্তিকার মাধ্যমে দিয়ে গিয়েছেন। যে কাজ বাঙ্গালীকেই প্রথম করতে হবে আর যাতে সব বাঙ্গালীরই সহায়ক হয় সেজন্য এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, পুস্তিকাটি বাংলায় অনুবাদ করে বাঙ্গালীর পরম উপকার করা হয়েছে।

মণিলাল সেন

আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পুর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি—যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পুর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায়—'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পুর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস
দুটাকা

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
গান্ধী-পরিকল্পনা
(অর্থনীতি বিষয়ক)
দু'টাকা

গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা
দু'টাকা

ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম
বারো আনা

শিক্ষার বাহন
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
রুশো

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
কার্ল মার্ক্স

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ডারুইন

সুবোধ ঘোষের
সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
বৌদ্ধধর্ম্ম
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
ধর্ম্মবিজয়ী অশোক
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা :

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ভারতীয় নারী ও সমাজ

গোপাল ভৌমিকের
সমাজ ও সাহিত্য

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
সমাজ ও বিজ্ঞান

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
ধর্ম্ম ও নীতি

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
সমাজ ও সংস্কৃতি

নারায়ণ চৌধুরীর
সঙ্গীত ও সমাজ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ

লুই ফিশারের
মহাজিজ্ঞাসা
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা

মিনু মাসানির
নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
মোসলেম রাজনীতি
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি
বার আনা

মিনু মাসানির
খাদ্য
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
বোম্বে পরিকল্পনা
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

PURVASA : REGD. NO. 1512 : BHADRA—1361 B. S.

ভারতীয় ও বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতির সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

মহাজিজ্ঞাসা

লুই ফিশার

প্রথম খণ্ড—৪৲, দ্বিতীয় খণ্ড—৪৲

প্রকাশকঃ পূর্ব্বাশা লিমিটেড, কলিকাতা

পূর্ব্বাশা

শারদীয়া
১৩৬১

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

পূজা-পার্বণ

কাগজের মলাট ॥ তিন টাকা

বোর্ড বাঁধাই ॥ চার টাকা

প্রাচীন পট ও মূর্তি-চিত্রে সমৃদ্ধ

শারদোৎসবের শুভদিবস সমাগতপ্রায়। কিন্তু গ্রাম নিরানন্দ, দেশ অবসন্ন। শূন্যোদরে, ছিন্নবসনে, উৎকণ্ঠিত চিত্তে উৎসব হয় না। তবু দেশময় উৎসবের আয়োজন হইবে। দুর্গোৎসব করি সত্য, কিন্তু ইহার উৎপত্তি ও স্বরূপ অনুধাবন করি না। এই পূজার সহিত বহু প্রাচীন স্মৃতি জড়িত। মনীষী গ্রন্থকার সেই স্মৃতি, উৎসবের উৎপত্তি ও স্বরূপ এই গ্রন্থে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথমাংশে দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, সরস্বতীপূজা ও 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

হিউএনচাঙ

কাগজের মলাট ॥ আড়াই টাকা

বোর্ড বাঁধাই ॥ তিন টাকা

বহু চিত্রে শোভিত

তথাগত বুদ্ধের জন্মভূমি দর্শনের বাসনায়, বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুসন্ধানে, চীনের বৌদ্ধ ভিক্ষু হিউএনচাঙ ৬২৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসিয়া ষোলো বৎসরকাল ভারত-পরিক্রমার পর যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে ভারতবর্ষের সমসাময়িক ইতিহাস বিবৃত হইয়া আছে। বর্তমান গ্রন্থে লেখক, সাধারণের পাঠোপযোগী করিয়া, হিউএনচাঙের ভ্রমণকাহিনী ও তাঁহার দৃষ্ট দেশগুলির রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

হিন্দুসমাজের গড়ন

আড়াই টাকা

বহু চিত্রে সমৃদ্ধ

"লেখক অশেষ পরিশ্রম-সহকারে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় এই বইখানি রচনা করে আমাদের মত সাধারণ শ্রেণীর পাঠকদের অশেষ উপকার করেছেন। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে লেখকের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের ছাপ অতি দৃঢ়ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার অন্যান্য পুস্তকগুলির মত এইখানিও জ্ঞানবিকাশের যথেষ্ট সহায়ক হবে।"

—সত্যযুগ

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভারতদর্শনসার

তিন টাকা চার আনা

"ভারতীয় দর্শনের আস্তিক ও নাস্তিক এই দুই শ্রেণীবিভাগ ও তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ। নাস্তিক দর্শনের মধ্যে চার্বাকবাদ, জৈনমত ও বৌদ্ধমতের উদ্‌ভব স্থিতি ও গূঢ় তত্ত্বগুলি সহজ ভাষায় আলোচিত হইয়াছে।…প্রাঞ্জল ভাষায় দর্শন শাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করিয়া দর্শনশাস্ত্রানভিজ্ঞ পাঠকের কাছে দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান লাভের পথ খুলিয়া দিয়াছেন।"

—যুগান্তর

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাস

দুই টাকা

"বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা সম্ভব। আলোচনা সংক্ষিপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে লেখক প্রত্যেকটি বাক্যকে অর্থ-গর্ভ ও ইঙ্গিতপূর্ণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইহার ফলে পাঠকের জিজ্ঞাসাকে সচেতন করিয়া তোলে। বইখানা সাধারণ পাঠকের অভাব মোচন করিয়া লোকশিক্ষা প্রসারে সাহায্য করিবে।"

—দেশ

বিশ্বভারতী • ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭

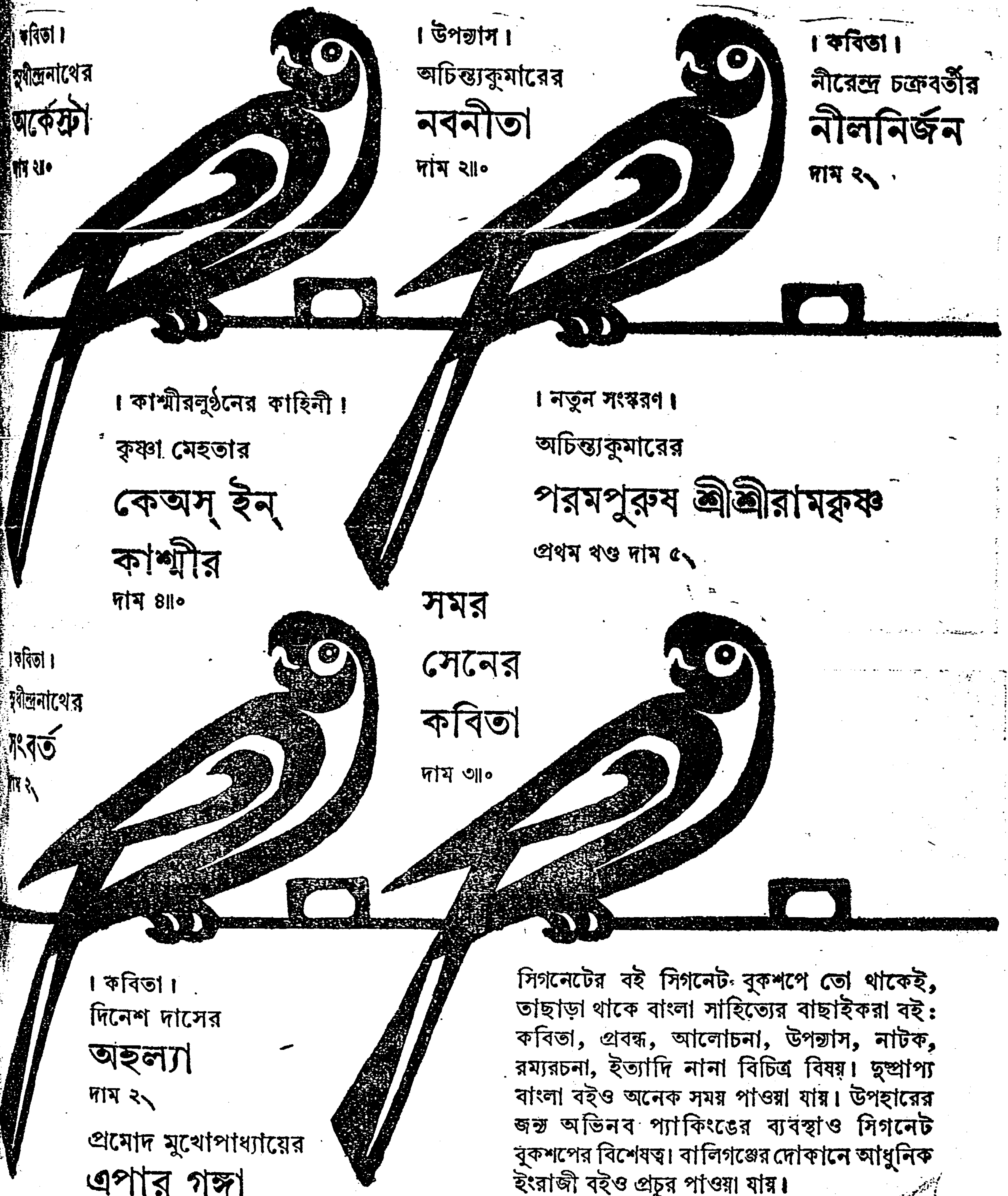

।কবিতা।
সুধীন্দ্রনাথের
অর্কেস্ট্রা
দাম ২॥০

। উপন্যাস।
অচিন্ত্যকুমারের
নবনীতা
দাম ২॥০

। কবিতা।
নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর
নীলনির্জন
দাম ২৲

। কাশ্মীরলুণ্ঠনের কাহিনী।
কৃষ্ণা মেহতার
কেঅস্ ইন্ কাশ্মীর
দাম ৪॥০

। নতুন সংস্করণ।
অচিন্ত্যকুমারের
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
প্রথম খণ্ড দাম ৫৲

সমর সেনের কবিতা
দাম ৩॥০

।কবিতা।
সুধীন্দ্রনাথের
সংবর্ত
দাম ২৲

। কবিতা।
দিনেশ দাসের
অহল্যা
দাম ২৲

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়ের
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা
দাম ২৲

সিগনেটের বই সিগনেট বুকশপে তো থাকেই, তাছাড়া থাকে বাংলা সাহিত্যের বাছাইকরা বই: কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা, উপন্যাস, নাটক, রম্যরচনা, ইত্যাদি নানা বিচিত্র বিষয়। দুষ্প্রাপ্য বাংলা বইও অনেক সময় পাওয়া যায়। উপহারের জন্য অভিনব প্যাকিংয়ের ব্যবস্থাও সিগনেট বুকশপের বিশেষত্ব। বালিগঞ্জের দোকানে আধুনিক ইংরাজী বইও প্রচুর পাওয়া যায়।

কলেজ স্কোয়ারে: ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
বালিগঞ্জে: ১৪২/১ রাসবিহারী এভিনিউ

ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া বিল্ডিংস্
৬৪নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা-১৩

১৯৫২ ইং পর্য্যন্ত প্রথম ১৬½ বৎসরে পাঁচটি সার্থক ভ্যালুয়েশান।
প্রতি ভ্যালুয়েশানে পলিসি-হোল্ডারদের বোনাস্ এবং শেয়ার-হোল্ডারদের ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।
ভারতীয় বীমাজগতে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

এন্, সি, দত্ত
চেয়ারম্যান।

দীপক চৌধুরীর
নবতন উপন্যাস

শঙ্খবিষ

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাস

কালিনীর চমৎকারিত্বে, চরিত্র সৃষ্টির নৈপুণ্যে, চিন্তার খরধার দ্যুতিতে, বক্তব্য বিষয়ের উপাদেয়তায় বাংলা কথা-সাহিত্যে নতুন মূল্যবান স্বাক্ষর রাখে। আধুনিক বাংলার উপন্যাস সাহিত্যে সৃষ্টি প্রতিভার স্বাক্ষর বিস্ময়কর নতুন সংযোজন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০০ মূল্য—সাড়ে পাঁচ

পরশুরাম
কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প ২॥০
সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত
কথাগুচ্ছ ৭৲
বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত
আধুনিক বাংলা কবিতা ৫৲
অন্নদাশঙ্কর রায়ের
কামিনীকাঞ্চন ৩৲
অসমাপিকা ৩৲
পথে-প্রবাসে ৩॥০
নতুন করে বাঁচা ১৸০
সুলেখা সরকারের
রান্নার বই ৩॥০

দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সংকলিত
বিজ্ঞান ভারতী ৪৸০
বাংলা ভাষায় একমাত্র বৈজ্ঞানিক অভিধান
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
এই মর্ত্তভূমি ৩॥০
শিবরাম চক্রবর্ত্তীর
আপনি কি হারাইতেছেন
আপনি জানেন না ৩৲
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের
কাব্য সঞ্চয়ন ৫৲
হসন্তিকা ১॥০
● অনুবাদ গ্রন্থ ●
জর্জ ডুয়ামেলের
জীবনযাত্রী ৩৸০

শরৎচন্দ্রের
পথের দাবী
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
অসবর্ণা
প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর
দুই রাত্রি
সুবোধ ঘোষের
ফসিল
গঙ্গোত্রী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
প্রাগৈতিহাসিক
চিত্রিতা দেবীর
উপনিষদ

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

রেডিও মাস - অক্টোবর ১৯৫৪

উৎসবের দিনে

ফিলিপস্ এর রেডিও

আপনার ঘর আনন্দে মুখরিত করে তুলবে

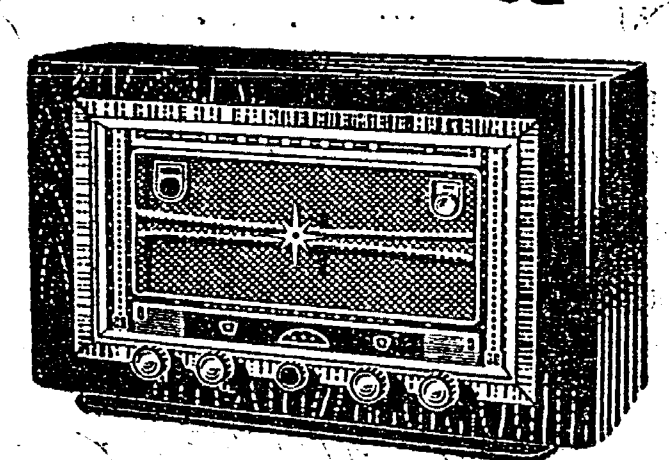

বি এক্স্ ৭৩৫ এ, এসি
১০ ভালব্, ৬ ওয়েব-
রেঞ্জ ব্যাপক ব্যাণ্ড্‌স্প্রেড্
৮৯৫৲ টাকা

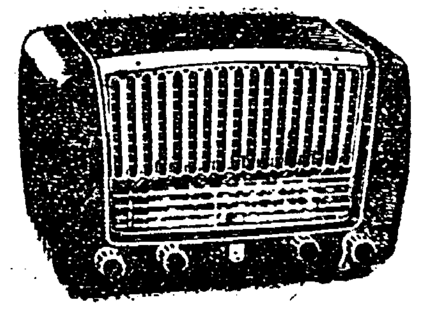

বিসি এ ৪১৬ এ/ইউ-
এসি কিংবা এসি/ডিসি
৩৬৫৲ টাকা

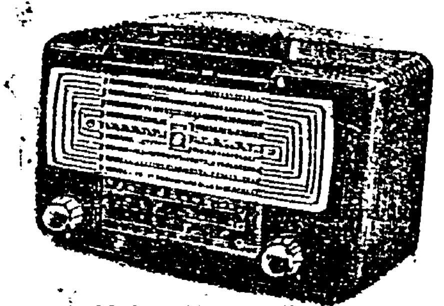

বিসি এ ৩২৬ বি, ড্রাই
ব্যাটারী ২৬৫৲ টাকা

মেম্বারস্ অব দি রেডিও ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া

PSPH 80

শারদীয়া পূর্ব্বাশা

আশ্বিন—১৩৬১

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষয়		পৃষ্ঠা
কবিতা :			**কবিতা গুচ্ছ :**		
অবিনশ্বর—জীবনানন্দ দাশ	...	২৯৩	চতুর্দ্দশপদী—কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	...	৩৩৮
হাইনের জার্ম্মান অবলম্বনে—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত		২৯৫	নাচঘর—বটকৃষ্ণ দাস	...	৩৩৮
দূরে সরে যাওয়া—অন্নদাশঙ্কর রায়	...	২৯৬	নীলকণ্ঠ—গোপাল ভৌমিক	...	৩৩৯
আত্মজীবনী :			শেষ কথা—বাণী রায়	...	৩৩৯
পুরোনো দৈনিক লিপির ছ্'পাতা—			ছায়া—অরবিন্দ গুহ	...	৩৪০
ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	...	২৯৭	রুপোলি জল—সুনীলকুমার নন্দী	...	৩৪১
গল্প :			মুখ—বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত	...	৩৪২
আরামবনের উপকথা—সুশীল রায়	...	২৯৯	জ্বর—অরুণ ভট্টাচার্য	...	৩৪২
একটি ছোট উপাখ্যান—প্রতিভা বসু	...	৩০৮	নিরালোক—ভূমেন্দ্র গুহ	...	৩৪৪
দৃষ্টান্তর—অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়	...	৩১৭	**গল্প :**		
কবিতাগুচ্ছ :			বিবেকের গণ্ডি—সতীনাথ ভাদুড়ী	...	৩৪৫
বিরহান্তর—নীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	৩৩৫	গল্প কণ্ডুয়ন—তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়	...	৩৪৯
লোকজ্ঞ স্মরণে—বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৩৩৫	জীবাণু—অমল দত্ত	...	৩৫৬
আবার ছুটি চোখ—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	৩৩৬	হারজিতের ইতিহাস—রজত সেন	...	৩৬৬

সেরা গাইয়েদের মতে

"Meloday র হারমোনিয়াম সত্যই Medoday পূর্ণ।"

৭।৩।৩৯ — স্বাঃ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়।

"মেলোডি কোম্পানীর গড়া হারমোনিয়াম ও অর্গান কণ্ঠসঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি করে, এ কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি।"

৯।৬।৪০ — শ্রীশচীন্দ্রকুমার দেববর্ম্মা।

"মেলোডি কোম্পানীর তৈরী হারমোনিয়াম গানের আনুষঙ্গিকযন্ত্ররূপে আমি ব্যবহার করে দেখেছি যে এর স্বর বেসুরের নামান্তর নয়, এবং মাধুর্য্যও প্রসংশনীয়। এঁদের "অর্গান" বাদ্যযন্ত্রও সাধারণের প্রশংসা পাবার উপযুক্ত।"

৮।৬।৪০ — স্বাঃ শ্রীপঙ্কজ মল্লিক।

THE MELODAY

82A & 86A, Rash Behari Avenue, Calcutta-26

Phone : South 2474

এঁরা মাথা খাটান

তাই মাথায় মাখেন

জবাকুসুম

মাথা ঠাণ্ডা রাখে—চুলের শ্রী বৃদ্ধি করে

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ,

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

—ঃ জীবন বীমায় ঃ—

বোম্বে মিউচুয়াল

লাইফ

এসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

ভারতের

—প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান—

স্থাপিত ১৮৭১

—আঞ্চলিক অফিস—

'বোম্বে মিউচুয়াল বিল্ডিং'

৯, ব্রেবোর্ণ রোড,

কলিকাতা।

ঠিক এ রকম
অবস্থায়...

ফাতনা নড়ছে দেখেই বোঝা গেল মাছ টোপ গিলছে। ছিপ একটু ভারী লাগছে, টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিকারী মারলে টান। তারপর শুরু হলো বুদ্ধির খেল—খেলিয়ে-খেলিয়ে মাছকে ডাঙায় তোলার কৌশল।

ছিপে মাছধরা বেশ মজা। কিন্তু তার জন্তে সবার আগে চাই ধৈর্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফাতনার দিকে তাকিয়ে বসে থাকার ধৈর্য আয়ত্ত করতে না পারলে ছিপে মাছধরা পণ্ডশ্রম মাত্র। মনের এই স্থিরতা অর্জনে এক পেয়ালা চায়ের মতো পানীয় বুঝি আর নেই।

চা
মন-মেজাজ
ভালো রাখে

টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত
PSTB 121

যমুনা
শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—অঙ্কিত

শ্রীঅলকেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও
বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

COLOUR ILUSTRATION

পূর্ব্বাশা

শারদীয়া

আশ্বিন : ১৩৬১

অবিনশ্বর

জীবনানন্দ দাশ

তার সাথে আজ সাত আট বছর পরে—অঘ্রাণে
কলকাতার এই টিউব আলো নীয়নদীপের রাতে
দু' চার মিনিট দেখা হ'ল—কথা বলা হ'ল :
ঘরে ফেরার আগে কিছু সময় কাটাতে।

স্বচ্ছ ধ্রুব সহজ স্বভাব কথা
বলা হ'লে ভাবছি ভালো হ'ত ;
কথা আরো গভীরভাবে চেতন হ'ত যদি ;
শব্দ কথা ভাষা—সবই সেই নারীকে লক্ষ্য ক'রে ব'লে
সফল হওয়া সহজ—তবু প্রতীক্ষা চাই মৃত্যু অবধি।

আজকে রাতে তোমায় আমার কাছে পেলে কথা
বলা যেত ; চারিদিকে হিজল শিরীষ নক্ষত্র কাশ হাওয়ার প্রান্তর।
কিন্তু যেই নিট নিয়মে ভাবনা আবেগ ভাব
বিশুদ্ধ হয় বিষয় ও তার যুক্তির ভিতর ;

আমিও সেই ফলাফলের ভিতরে থেকে গিয়ে
দেখেছি ভারত লণ্ডন রোম নিউইয়র্ক চীন
আজকে রাতের ইতিহাস ও মৃত ম্যামথ সব
অটুট নিয়মাধীন।

কোথায় তুমি রয়েছ কোন্ পাশার দান হাতে :
কি কাজ খুঁজে ;—সকল অনুশীলন ভালো নয় ;
গভীরভাবে জেনেছি যে সব মনীষী ভাঁড় প্রেমিক পাপীদের—
তারই ভিতর প্রবীণ গল্প নিহিত হ'য়ে রয়।

ক্রমেই বয়স বাড়ে—সবই ছড়িয়ে পড়ে নশ্বরতার দেশে।
বৃষ্টি বাতাস হলুদপাতা ছাতকুড়ো ঘুন মাকড়সাজাল এসে
বলছে : 'আরো কঠিন আঁধার নেমে পড়ার আগে
আমরা এলাম ; কোথাও কিছুই নেই ;
একটি শুধু মূর্খ আছে মানবইতিহাসে
চঙ্গে চ'ড়ে চেয়েছে নীল আকাশ ধরবেই ;
সারাটা দিন শিমূলতুলোর মতন শত সূর্যে উড়ে তুমি
একটি বীজ-চিহ্ন নিয়ে মাটিরই ক্রীড়াভূমি।'

বল্লাম আমি : 'শিশির আলো নক্ষত্র জল মনের উদ্দীপন
অন্ধকারের দিকে টানে ইতিহাস ও দার্শনিকের মন,
দেখেছি আমি ; তবুও স্বাদ অনেকরকম—দেখেছি মানুষ অসীম রগড়ে
উত্তেজিত হ'য়ে অশেষ গোলকধাঁধাঁয় ঘোরে।
তবুও মহাজিজ্ঞাসা ও অপার আশার কালো
অকূল সীমা আলোর মতো ;—হয়তো সত্য আলো।'

হাইনের জার্মান অবলম্বনে

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

প্রায়শ্চিত্ত

ভাবিসনে তোর সয়তানি সই, আমি
আকাট বোকা ব'লে ;
ভাবিসনে দেবদূত ভূভারে নামি,
ক্ষমায় গ'লে গ'লে॥

নষ্টামি তোর স্পষ্ট বুঝেও, তোকে
দেখাই বদান্যতা ;
অন্যে হলে, হঠাৎ খুনের ঝোঁকে
ফুরত তোর কথা॥

কিন্তু আমার পাতকও নয় সোজা,
শক্ত সাজা তাই ;
অগত্যা তোর ভালোবাসার বোঝা
বইছি, বিরাম নাই॥

একত্রে তুই নরক ও কৈবল্য :
তোর অশুচি হাতে
দৈব দয়ার অচিন্ত্য সাফল্য
মিলবে কি শেষ রাতে ?

মায়ার খেলা

বিদ্যুতের পক্ষপাতী যেহেতু আমি, তাই
ভাবো কি নই কুলিশে কৃতবিদ্য ?
ভ্রান্ত ব'লে বোঝো না লীলা দেখাই, না দেখাই,
স্বভাবতই আমি অশনিসিদ্ধ॥

শুনতে পাবে পরীক্ষার ভয়ঙ্কর দিনে
আমার রূঢ় কণ্ঠ মেঘমন্দ্রে,
ত্রাহিস্বর বাত্যাহত বৃক্ষে তথা তৃণে,
প্রতিধ্বনি রন্ধ্র থেকে রন্ধ্রে ॥

সে দুর্যোগে বজ্র মেতে উঠবে তাণ্ডবে,
লাগবে যত প্রাসাদে ভূমিকম্প,
দৈবতের গর্ব হবে খর্ব খাণ্ডবে,
অবাধ শত শিখার উল্লম্ফ ॥

দূরে সরে যাওয়া

অন্নদাশঙ্কর রায়

দূরে সরে যাওয়া দূরে চলে যাওয়া নয়।
চলব না আমি কাননে বা কান্তারে
চলব না গিরিশিরে বা সাগরপারে
যদিও কখনো কখনো তা মনে হয়।
দূরে সরে যাওয়া ঘুরে মরে যাওয়া নয়।

দূরে সরে যাওয়া দূরত্বটুকু রাখা।
মিলছি মিশছি কথাও বলছি মেলা
সামাজিকতায় নেই কোনো অবহেলা
তবু আমি রই আকাশের মতো ফাঁকা।
দূরে সরে যাওয়া আপনাকে নিয়ে থাকা।

দূরে সরে যাওয়া কবে কোন ফল দেবে?
কত ফুল ফোটে কত ফুল যায় ঝরে
ফল যে ফলবে বলব কেমন করে?
ফুল মরে নাকো ফলের ভাবনা ভেবে।
দূরে সরে যাওয়া হয়তো বা ফল দেবে।

পুরনো দৈনিক লিপির দু'পাতা

শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী

দার্জ্জিলিং
১১।১০।২৫

আবার ঠাণ্ডা, আবার পাহাড়ী দৃশ্য, আবার হোটেলী জীবন। সবই নিচে থেকে যথেষ্ট তফাৎ, এবং এই বদলের জন্যই এত খরচ করে' আসা। তবে কর্ম্মেই আমাদের অধিকার, ফলের কথা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। একটু সর্দ্দিকাশি নিয়েই এসেছিলুম, সেটুকু না বাড়লেই যথালাভ। সাবধানে থাকলে, পরিষ্কার হাওয়ায় সেরে যাবারই সম্ভাবনা। আমি স্বভাবতঃ সাবধানী না হলেও, আমার সঙ্গের উত্তর-সাধকটি মা ভৈঃ-এর উল্ট মন্ত্র (যথেষ্ট সংস্কৃত জানলে রটে' দিতুম) সর্ব্বদাই কানের কাছে জপে জপে সে অভাব যথা-সাধ্য পূর্ণ করেন বলা বাহুল্য। * * *

সামনেই একটি ইংরেজ মেম থাকে,—বেশ দেখতে,—ওদের মামুলী জাতীয় আদর্শের মত, যা, প্রত্যেক বিজ্ঞাপনের ছবিতেই দেখা যায়। কিন্তু ছবিতে যা আমরা ফিরেও দেখিনে, রক্তমাংসে তাই এত দুর্লভ যে দেখলে যথেষ্ট তারিফ করি।—তার একটি ছোট ছেলে অত্যন্ত অসুস্থ, নানা রোগের আধার, প্রায়ই কাঁদে। কিন্তু তার উপরের ক'টি ছেলে কাল এসেছিল, একবারে টুকটুকে আপেলের মত গাল, আর দেখতে ভাল। এতগুলি ছেলেপিলের মা, আর উপরি উপরি হয়েছে, কিন্তু দেখলে কে বলবে। দিব্যি পাতলা ছিপছিপে ফ্যাসানার গড়ন,—আবার বিয়ে দেওয়া যায়। এদের এই শারীরিক যত্নটি আমাদের একটি শেখবার জিনিষ,—শুধু স্বাস্থ্যের দিক থেকে নয়, সৌন্দর্য্য হিসেবেও;—আর দুটোর ত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আমাদের 'কুড়িতে বুড়ি' প্রবচন ত বেদবাক্য নয় যে, তার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্যে দুই এক ছেলের মা হতে-না-হতে সমস্ত সংযম ও বেশবিন্যাস পরিত্যাগ করে শরীরটাকে এলিয়ে ছিৎরে যাচ্ছেতাই হয়ে যেতে দিতে হবে? শুধু বিয়ের আগেই কি যত সৌন্দর্য্য দরকার * * শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?

আজ সকালে উঠে জানলা থেকে নিচে তাকিয়ে প্রথম যে দৃশ্য দেখলুম,—জমাদার শুখলোপাত ঝাঁট দিচ্ছে, এবং খানসামা ফুল সাজাবার জন্যে ফুল কেটে নিচ্ছে—তা'তে একটা কথা মনে পড়ল।—সভ্যতার প্রথম কথা পরিচ্ছন্নতা;—শেষ কথাটা কি তা' এখনো সকলে খুঁজছে। অসভ্য আদিম মানুষ ঠিক কি রকম ছিল জানিনে, তবে এটুকু অনুমান করা যায় যে, শুখনো পাতা যেখানে পড়ছে সেখানেই পড়ে' থাকলে তাদের কোন

আপত্তির কারণ ছিল না। আপত্তি তখনই হয়, যখন বন ছেড়ে লোকালয়ে আসি, এবং ক্রমশঃ নিজের একটি আলাদা ঘর বাঁধি ও বাগান বানাই।—এইখানে আর একটি কথা জড়িতে মেলানো যায়,—পরিচ্ছিন্নতা; অর্থাৎ কি না, নিজেকে দল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া। এখনো ব্যাক্তিত্বের বিকাশ চলেছে, ও ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিকত্বের দ্বন্দ্ব এখনো মেটেনি। যা হোক, ঝুমঝুমি পেলে যেমন ছোট ছেলে ভোলে, আমিও তেমনি সকালবেলা উঠে পরিচ্ছন্নতা ও পরিচ্ছিন্নতা রূপ কথার ঝুমঝুমি বাজিয়ে সন্তুষ্ট হলুম।

১৩।১০।২৫

ব্যক্তিত্ব ও সামাজিকত্বঘটিত ইংরেজ-বাঙ্গালীর প্রভেদেরও এই মেমটি একটি দৃষ্টান্ত। ছেলেকে যে সে খুবই ভালবাসে এবং যথেষ্ট সেবাযত্ন করে, তা' যতটুকু দেখছি শুনছি তা'তে প্রমাণ হয়। কথায় কথায় একদিন বল্লে যে, প্রথমে যে ডাক্তার দেখছিল, সে আরোগ্যের অভয় দিলেও মা ছেলের বিছানার কাছ-ছাড়া এক দণ্ডও হত না, সেইখানেই বসে' খেত, রাত জেগে বসে' থাকত ইত্যাদি। গৃহকর্ত্রীও বলেন যে মেমটি যথার্থ সেবিকার মত ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা করতে জানে, ও ঘরদোর পরিষ্কার রাখে। অথচ নিজে সর্ব্বদাই ফিটফাট থাকে, "যে রাঁধে সে চুল বাঁধে না"-র ধাত ওদের মোটেই নয়। স্বামী যখন হপ্তাশেষে এসেছিল, তার সঙ্গে প্রায়ই বেড়াতে যেত, বায়স্কোপ থিয়েটারেও যেত। একলা থাকলে ও ক্লাবে যায়, নাচে, বন্ধু-বান্ধবে খাওয়াতে নিয়ে যায়, কারণ এখানকার খাবার ওর মুখে রোচেনা। বাঙ্গালী মা এ অবস্থায় হয়ত দীনহীন বালিকার সাজে ঘরেই বন্ধ থাকত, নিজের স্বাস্থ্যের খাতিরে বেরনোও অন্যায় মনে করত,—আমোদপ্রমোদে ত প্রবৃত্তিই হত না। এদের যে হয়, সেটা কিসের প্রমাণ?—বলবত্তর জীবনীশক্তির? নিজের প্রতি কর্তব্য জ্ঞানের?—আমরা সমাজের কাছে ব্যক্তিকে যে রকম বলি দিই, ওরা তা পারেনা,—এই তফাৎ। ওকে হঠাৎ নাচতে দেখলে আমাদের সাধারণ মেয়ে তৎক্ষণাৎ নাক সিঁটকে, ওদের জাতকে জাত হৃদয়হীন, স্বার্থপর ও বিলাসী বলে' ঠুকে দেবে। এদিকে মট্রীর কাছে ত শুনি যে, ছেলের জন্যে ওর কাছে বসে কাঁদে। অনেকদিন হল সারছে না, ভারি রোগে ধরেছে, চিকিৎসার জন্যে টাকা ধার করতে হচ্ছে * * * ঠাণ্ডায় ছেলের শরীর খারাপ হবে বলে' কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে চায়, অথচ সেখানে ঘরভাড়া করে' থাকবার মত আয় নেই। অন্য ছেলেদের ছুটি আগত, তাদেরই বা কে দেখে, কোথায় রাখে, এইসব নানা সমস্যা আছে। অথচ সিগারেট খাচ্ছে, হাসছে, খেলছে, বাইরের থেকে হঠাৎ কিছু বোঝবার জো নেই। আমার ত মনে হয় ব্যক্তিত্ব ও সামাজিকতার এই সমন্বয়সাধন উচ্চতর সভ্যতার পরিচায়ক।

আরামবনের উপকথা

সুশীল রায়

নিস্তব্ধ পল্লীর উপর অন্ধকারের যবনিকা নেমে এল।

কাঁকড়াপুঞ্জিতে এমনি যবনিকা নেমেছে আরো অনেকবার, সকালের প্রথম পাখির ডাকের সঙ্গে পুব দিক আলো ক'রে সে যবনিকা উঠে গেছে আবার।

এ এক নতুন জীবন। কিন্তু সমস্ত পুরাতনকে বিসর্জন দিয়ে কেন এই নতুন জীবন সাধ ক'রে গ্রহণ করা হল, কেন স্বেচ্ছায় এই নির্বাসন বরণ করে নেওয়া হল পিনাকীভূষণ তা খুলে বলেন নি। তাঁর কাছ থেকে এর কারণটা জানার জন্যে ব্যাগ্রতা কেবল তাঁর দুই মেয়েরই নয়, এ ব্যাগ্রতা আছে হেরম্ব আর ক্ষিতীশেরও। পিনাকীর ফার্মে তারা দুজন সামান্য চাকর্যে মাত্র, তারাও পিনাকীর কথায় কি রকম মন্ত্রমুগ্ধের মত যেন হয়ে গেল। কেন কিংবা কোথায়—কোন প্রশ্নই তারা করতে পারল না। কারবার গুটিয়ে দরজায় তালা ঝুলিয়ে আচমকা পিনাকীভূষণ যাত্রা করলেন এই অজ্ঞাতবাসের উদ্দেশে, হেরম্বরাও অনুগত অনুচরের মত তাঁর পশ্চাদনুসরণ ক'রে চলে এল। এখানে এসে কি তাদের কাজ, এখানে তাদের টেনে আনার হেতু কি, কিছুই তারা বুঝল না।

এই খোলা মাঠের মধ্যে খোলা মনে তারা সহজভাবে চলে-ফিরে বেড়াবে, সে পথও তাদের বন্ধ। কেমন একটা জড়তা আঁট হয়ে লেগে থাকে সারাদিন সারা গায়ের সঙ্গে।

টুকটুকে ফুটফুটে দুটি মেয়ের সামনে তারা স্বাভাবিকভাবে হেঁটে বেড়ায় কী ক'রে। আর, শুধু মেয়ে ব'লে মেয়ে নয়। শহরের সমস্ত রকম বিলাসের নির্যাস দিয়ে তারা সুবাসিত। তাদের চাল চলনে যে রকম শৌখিন দাম্ভিকতা, তার সামনে শক্ত মানুষকেও কাবু হয়ে যেতে হয়। হেরম্বরা তো নরম মেরুদণ্ডের দু-জন কর্মচারী মাত্র।

নারিকেল-কুঞ্জ কথাটা বড় কটমট, নন্দনকানন কথাটার মত সহজ আর সরল নয়, পিনাকীভূষণ ক'দিন থেকেই তাই ভাবছেন—তাঁর এই নতুন আবাসের কি নাম রাখা যায়। কিন্তু কিছুতেই কোনো নাম মনে আসছে না। যদি বা একটা কিছু মনে হচ্ছে, কিন্তু সেটা পছন্দ হচ্ছে না কিছুতে।

—চন্দনবনটা কেমন? পিনাকী হঠাৎ মাধবীকে জিজ্ঞেস করলেন।

দিন কয়েক ধ'রে তারা ঘুরে বেরিয়েছে আশে পাশের গ্রামে, ধান ক্ষেত ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পেরিয়ে গেছে প্রকাণ্ড প্রান্তর। কোথায় পপান আর কোথায় বাঁশদাপলাশি—সব কটা গ্রাম ঘুরে এসেছে তারা। দেখেছে নিবিড় আমের বাগান, বাবলার অরণ্য, কিন্তু চন্দনবনের কথা তো মনে পড়ছে না।

মাধবী মনে মনে একবার খুঁজে নিল চারধার, মনে করতে পারল না, বলল, সেটা আবার কোথায় দেখলাম?

পিনাকী হাসলেন, বললেন, হঠাৎ অমন চটে যাস কেন? এইটে রে, এইটে। আমাদের এই বাড়িটা। এটার নাম চন্দনবন রাখলে কেমন হয়?

—হঠাৎ ও-নাম কেন? চন্দন-গাছ তো দেখছিনে।

পিনাকী বললেন, নন্দনকাননের সঙ্গে মিল রেখে ঐ নামটা মনে এল।

মাধবীর বড় রাগ ধরল, বলল, ওর চেয়ে পদ্মলোচন রাখ না। কানা ছেলেদের নাকি ওই নামই লোকে রাখে।

—ভীষণ চটেছিস তুই। পিনাকী হেসে উঠে বললেন, তাহলে ভেবে একটা নাম বল্।

মাধবী ভাবল না, বলল, ভেবে আর লাভ কি। যা হবার তা তো হয়েছে। এর নাম রাখো ক্রন্দন-উদ্যান।

—সে কি রে?

—হ্যাঁ। ওই নামটাই এর রাখা দরকার।

মেয়ের মনের ভাব একটু ভালো ক'রেই যেন বুঝতে পারলেন পিনাকীভূষণ। বললেন, ঠিক আছে। তোর জন্যে অন্য ব্যবস্থা করছি।

মধুমালা ঘরে ছিল, সব কথা শোনে নি। কিন্তু বাবার শেষ কথাটা কানে যেতেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, সেটা আবার কি?

—কোন্‌টা?

—ব্যবস্থাটা?

পিনাকী উত্তর দিলেন না। তিনি যে সত্যিই রেগেছেন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সহজেই তা বোঝা গেল। মধুমালা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে বাবার মুখের ভাব পরীক্ষা করতে লাগল।

জাঁদরেল কনট্র্যাক্টর পি, ভি, বকশি—কেবল কলকাতার মত বিরাট শহরের চৌহদ্দির মধ্যেই তাঁর পরিচয় সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর খ্যাতি তার বাইরেও ছড়ানো; এদিকে মাৎলা-ক্যানিং, ওদিকে হুগ্‌লি পেরিয়ে বজবজ অবধি। সেই কর্মবীর ও ধনকুবের কনট্র্যাক্টর বকশি আজ কাঁকড়াপুঞ্জির নারিকেল-কুঞ্জের নিভৃতে আশ্রয় নিয়েছেন। যে মেয়েরা তাঁর নন্দনকাননের প্রাসাদতুল্য বাড়িতে তাঁর মুখের সামনে এসে দাঁড়াতে ভরসা করে নি, আজ তাদেরই মধ্যের একজন তাঁর মুখের উপর দাপট দেখিয়ে কথা বলতে সাহস করে—এটা অবিশ্বাস্য হলেও পিনাকীভূষণকে তা বিশ্বাস করতে হল।

বাবার মুখের ভাব দেখে মধুমালা একটু ভীত হল। হঠাৎ একটা ইচ্ছাকে রূপ দিতে গিয়ে যিনি সব প্রতাপ-প্রতিপত্তি তুচ্ছ ক'রে দিয়ে আসতে পারেন, তিনি না পারেন হেন কাজ নিশ্চয় নেই।

কখন যে বাবা একটা ভয়ংকর ব্যবস্থা ক'রে বসেন তার কোনো ঠিক নেই। আতঙ্কে আর দুর্ভাবনায় মধুমালার মুখ শুকিয়ে থাকে। মাধবী তার দিদির মুখের দিকে তাকায়, আর মনে মনে আরো ক্ষিপ্ত হতে থাকে।

—তুই বড় বিশ্রী। বাবাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে তোর লাভ হল কি?

—কিছু না।

—বাড়ির নাম যদি চন্দনবনই হয়, তাতে ক্ষতি কি?

—কিছু না।

হঠাৎ মাধবী বসে পড়ল, খুঁটিতে হেলান দিয়ে ব'সে সে ফুঁপিয়ে উঠল। বলল, হয়ে যাক হয়ে যাক হয়ে যাক। যা ব্যবস্থা করতে চান, করে ফেলুন।

—সে কি রে? কাঁদছিস কেন? মধুমালা মাধবীর পাশে ঘন হয়ে বসল।

চোখের জলে গালের রুজ ভিজে যাবার ভয় আগে ছিল, কিন্তু এখন সে ভয় গেছে। এখন গালে আর রুজ নেই, ঠোঁটেও নেই লিপষ্টিকের দাগ।

মাধবী ব'সে ব'সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধ'রে কান্না দমন করার চেষ্টা করতে লগল। বলল, শাসন শাসন শাসন। স্নেহ নাই, মায়া নাই, মমতা নাই, কেবল শাসন। কিছু পাই নি যার কাছ থেকে, তার এত দাবী কিসের? আমি চলে যাব।

—কোথায় যাবি?

—যেখানে ইচ্ছে।

এখানে একটা-কিছু অশান্তির কারণ যে ঘটেছে, এটা আঁচ করেছে হেরম্বরা। কিন্তু বড় বড় ব্যাপারে মাথা না গলানোই ভাল। তাই তারা তফাতে তফাতে থাকে। দূরে থাকলে কি হবে, তাদের মন কেমন-যেন উড়ু-উড়ু করতে থাকে সর্বদা। তাদের ভাবতে কেমন-যেন ভালো লাগে—পিনাকীভূষণ তার দুই কন্যার সঙ্গে তাদেরও যে এখানে টেনে নিয়ে এলেন, এর পিছনে নিশ্চয় পিনাকীভূষণের গভীর একটা প্ল্যান আছে। এতদিন তাঁর দপ্তরে তারা কাজ করে এল একদিনও তারা পিনাকীভূষণকে বিনা-কারণে কোনো কাজ করতে দেখেনি।

সেবার চুনার কোয়েরি থেকে পাথর কিনতে পাঠালেন অভিলাষকে। অভিলাষ নাচতে নাচতে রওনা হল, ফিস ফিস ক'রে ব'লে গেল এবার সে বরাত ফিরিয়ে নেবে। চুনারে পৌঁছেই অভিলাষ পিনাকীভূষণের টেলিগ্রাম পেল—ফিরে এস জলদি। অভিলাষ ফিরে এসে বলল, তাহলে পাথরকুঠি তৈরির কন্‌ট্র্যাক্ট ক্যান্‌সেল হয়ে গেল? কেউ কোনো জবাব দিতে পারে না। দু দিন বাদে পিনাকী চুনারে গেলেন স্বয়ং। ফিরে এসে অভিলাষকে কাজ থেকে ইস্তফা দিয়ে দিলেন, বললেন, ডিজনেস্ট লোক তাঁর দরকার নেই।

এ ধরনের অরো অনেক নজির আছে, কিন্তু সে সব কথা ভেবে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে করে না ক্ষিতীশ আর হেরম্বর। তাদের কেবল ভাবতে ভালো লাগে—নিশ্চয় কোনো একটা রোমাঞ্চকর প্ল্যান আছে পিনাকীভূষণের। তাঁর সেই প্ল্যানের ব্লু-প্রিণ্টটা দেখার জন্যে হেরম্বরা বড় উতলা হয়ে উঠেছে।

একই চালের নীচে আছে তারা, একই বেড়া দিয়ে ঘেরা বাতাস থেকে নিশ্বাস টানছে—এতেই যেন কত আনন্দ, কত রোমাঞ্চ। কলকাতার সেই নন্দন-কাননে তারা দেখেছে যাদের দূর থেকে, তারাই এখন থাকে বাঁশের পাতার বেড়ার ঠিক ওপারে। এক-একদিন গভীর রাত্রে ওদের নিশ্বাসপাতের শব্দ পর্যন্ত শুনতে পায় হেরম্বরা। সেই নিশ্বাসের প্রতিধ্বনি বেজে ওঠে এদের বুকের মধ্যে গভীর ভাবে। রাত্রে ঘুম আর আসতে চায় না।

চোখের সামনে কি রকম সব বদল হয়ে যায়। পিনাকীভূষণের এই পরিবর্তনের কথা নয়, তারা ভাবে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তনের কথাই বেশি করে। তারা ছিল অতি নগণ্য কর্মচারী, এখন তারাই হয়ে গেছে একই পরিবারভুক্ত। কিন্তু সেটেই বড় কথা নয়। যাদের তারা ভেবেছিল আকাশকুসুম

বলে, সেই দুই বোনই এখন যেন হেরম্বদের বাড়ির দাওয়ার কোল ঘেঁষে ফুটে উঠেছে গোলাপি রঙের দোপাটি ফুলের মত।

হেরম্ব আর ক্ষিতীশ একই কথা নিয়ে মনে-মনে জল্পনা করে, কিন্তু দু-জনের কেউ অন্যের কাছে নিজের মনের দুর্বলতার কথা প্রকাশ করতে চায় না। একই ঘরে দুই শয্যায় দু-জন গভীর রাত্রে জেগে জেগে এপাশ-ওপাশ করে, অথচ কেউ জানতে চায় না কেউ জেগে আছে কি না।

কিন্তু সেই ব্যবস্থাটা? যে ব্যবস্থার কথা ব'লে সেদিন পিনাকী মনের তাপ প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, তার কি হল? একট-কিছু হয়ে গেলে হয়। এই অশান্তি ও অনিশ্চয়তা ভালো লাগে না মধুমালার।

বাবাকে ভয় করতে হয়, ভক্তি করতে হয়, শ্রদ্ধা করতে হয়—এ সব নিয়মই তাদের জানা। আয়ার হাতে মানুষ, আয়ার মুখে শুনেছে এ কথা। দিদিমণিরা পড়াতে আসতেন তাঁরাও বলেছেন এই নিয়মের কথা। ব্যস, এই মাত্র। সে নিয়ম মানতে রাজি আছে হয়তো দুই বোনই। কিন্তু তারা তার প্রতিদানে কিছু চায়।

—স্নেহ মায়া মমতার কথা বলছ? পিনাকীভূষণ বললেন, ওসব যেমন দেওয়ার জিনিস, ওসব তেমনি গ্রহণ করারও। নিতে জানা চাই। নিতে না জানলে অনেক সময় বঞ্চিত হতে হয়।

মধুমালা বলল, না না, সে কথা নয়। বঞ্চিত তুমি কর নি। কিন্তু তুমি মাধবীকে ডেকে কথা বল। ও বড় ঘা খেয়েছে মনে। ও যে কেঁদেছে, তা জান?

পিনাকী ভূষণ বললেন, ঠিকই করেছে। এ বাড়ির নাম ও কি রাখতে চেয়েছিল?—ক্রন্দন উদ্যান।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমরা দুজনেই বড় ছেলেমানুষ। মধুমালা বাবার হাত চেপে ধরে বলল, এ বাড়ির নাম আমি রাখব। মনে মনে ঠিকও করে ফেলেছি।

পিনাকীভূষণ বললেন, কি নাম? আকাশকুসুম?

—উঁহুঁ। হলনা। এ বাড়ির নাম হল, বল, আজ থেকে এ বাড়ির নাম হল—আরামবন।

মাথা নীচু ক'রে বসলেন পিনাকীভূষণ, সাত্যিই যেন আরাম পেলেন তিনি, সত্যিই তাঁর আনন্দ হল। মাথা তুলে বললেন, মাধবী কোথায়? ওকে ডাক।

মধুমালা ছুটে গিয়ে ঘর থেকে মাধবীকে টেনে নিয়ে এল। বলল, এই নাও।

পিনাকী মাধবীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, রাগটা বড় বেশি। আমারই মত।

মধুমালা এগিয়ে এসে বলল, রাগবে না কেন, বল। ঠিক ক'রেছে ও। মেয়েরা স্বভাবতই বাবার আদুরে হয়, তার উপর ছোট মেয়ের কথা তো আলাদা। তার আব্দার হয় সবচেয়ে বেশি।

—কোত্থেকে জানলি?

গম্ভীর হয়ে গেল মধুমালা, নিশ্বাস ফেলল চুপ ক'রে, বলল, কোত্থেকে আর জানব? বই প'ড়ে।

তা বটে। পিনাকী ভূষণ হয়তো নিজের কথাই ভাবলেন কিছুক্ষণ। পাছে লোকে কিছু বলে—এই ভয়েই তিনি ছিলেন জড়োসড়ো। আয়া চাকরানি শিক্ষয়িত্রী অধুষিত তাঁর সেই বৃহৎ অট্টালিকা একটা প্রমীলার রাজ্যবিশেষ হয়ে উঠেছিল। বিপত্নীক তিনি। যদি নিজের সেই বাড়িটার সঙ্গে তিনি

নিজেকে একেবারে মাখামাখি ক'রে ফেলেন তাহলে কুৎসা রটতে কতক্ষণ? এই ভয়ে তিনি নিজের ঘরেই পরবাসীর মত জীবন কাটালেন। নিজের কন্যার দিকেও দৃষ্টি দিতে পারলেন না। কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও সুরাহা তো বিশেষ কিছু হল না। অবিনাশ পাকড়াশিরা তাঁর বাড়ির নাম দিল নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী।

পিনাকী গা-ঝাড়া দিয়ে বসলেন, গলা ছেড়ে ডেকে উঠলেন, হেরম্ব, ক্ষিতীশ।

দুজনে ছুটে এল ব্যস্ত হয়ে। ছুটে এসেই তারা কেমন জড়োসড়ো হয়ে গেল। বরাবর পিনাকীর ডাক শোনা মাত্র তারা এসে পাশে দাঁড়িয়েছে, কোনো সংকোচ বা জড়তা তখন ছিল না। কিন্তু আজ এভাবে ছুটে এসে পাশে দাঁড়ানোয় নিজেদের বড় তুচ্ছ ব'লে বোধ হল তাদের। আড়চোখে তারা মধুবালা ও মাধবীর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

পিনাকী বললেন, কাজ আছে।

অনেকদিন বাদে যেন মনিবের গলার স্বর শুনতে পেল হেরম্ব আর ক্ষিতীশ। পি, ভি, বকশি অ্যাণ্ড কোম্পানি, কন্ট্রাক্টরস্ অ্যাণ্ড বিলিণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার্স-এর মালিক যেন আজ তাঁর স্টেনোগ্রাফার ও করেসপণ্ডেন্স ক্লার্কের সঙ্গে কথা বলছেন, এই ভাবে পিনাকী বললেন, কাজ আছে। হাউরের হাটে যেতে হবে। অনেক জিনিস কিনতে হবে।

হেরম্ব বলল, কাগজ পেন্সিল এনে লিখে নিই।

ক্ষিতীশ বলল, তাই ভালো।

পিনাকী বললেন, টুকে নিতে হবে না। কেবল বুদ্ধি কমনসেন্স আর টাকা নিয়ে চলে যাও দুজন। আজ ফিস্ট হবে, সেই অনুসারে বাছাই ক'রে জিনিসপত্র কিনে আন।

মধুমালা বলল, মুরগীও হয়তো ওঠে হাটে?

হেরম্ব বলল, নিয়ে আসব?

—পেলে তো আনাই ভালো। মধুমালা বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল।

পিনাকী বললেন, নিশ্চয়।

মধুমালা বলল, আর কি কি আনা হবে তার দু-একটা জিনিসের নাম অন্তত বলে দেওয়া ভালো। অন্যের রুচি হাজার ভালো হোক, তার সঙ্গে তোমার রুচির মিল তো নাও হ'তে পারে।

পিনাকী বললেন, সেদিন কিসের কথা যেন বলছিলাম? শুক্তো আর মোচার ঘণ্টো। হ্যাঁ আর একটার নাম মনে পড়েছে আজ—চাপড়ঘণ্টো।

মধুমালা বুঝি হাল ছেড়ে দিল, বলল, তোমার সঙ্গে পারব না আমি। চাপড়ঘণ্টোই হোক আর যে-ঘণ্টোই হোক, বাজারে তা কিনতে পাওয়া যায় না। কি কি তরিতরকারি আনতে হবে, বলে দিলেই তো মিটে যায়।

ক্ষিতীশ আর হেরম্ব মরে যাচ্ছে মরমে। পিনাকীর ফার্মে তারা অনেকদিন কাজ করেছে। অনেক ফাইফরমাশ খাটতে হয়েছে তাদের। এমন কি, বেয়ারা হাতের কাছে না থাকায় পিনাকীকে সিগারেট কিনে এনেও দিয়েছে। কিন্তু আজকের এই অবস্থাটা একেবারে ভিন্ন জাতের।

হাউরের হাটে যাচ্ছে তারা উৎসাহ করেই। কিন্তু সে-উৎসাহ কেমন-যেন থিতিয়ে এল। তাদের

অভিরুচির উপর ছেড়ে দিলেই তো মিটে যায়, ছোট চাকরি করলে বুদ্ধিটাও যে খাটো হবে—এমন কোনো নিয়ম নেই।

পিনাকী বললেন, ওরা তো মেনুটা শুনে নিল, এখন ওরা বিবেচনা ক'রে যা দরকার নিয়ে আসবে। ওদের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

—তা ভালো। মধুমালা বলল, কিন্তু, অভিরুচি আর রুচি এক জিনিস নয়, এ খেয়াল যেন তোমার থাকে।

ক্ষিতীশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল, এবার সে ক্ষিপ্ত হল, কিন্তু নিজেকে সংযত ক'রে বলল, কথাটা খাঁটি। তাই আপনারা কেউ সঙ্গে গেলে বেশ হয়।

ক্ষিতীশের এ প্রস্তাব শুনে হেরম্ব আশ্চর্য হয়ে গেল। এমনভাবে পিনাকীকে হাটে যেতে বলার ভরসা ক্ষিতীশের আছে দেখে সে স্তম্ভিতই হল। আড়চোখে একবার সে তাকাল ক্ষিতীশের দিকে।

কিন্তু ওদিকে চেয়ে রক্ত যেন হিম হয়ে গেল হেরম্বের। মধুমালা একটা কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। ক্ষিতীশের এই স্পর্ধিত প্রস্তাবটা যেন বরদাস্ত করতে পারছে না সে।

হেরম্ব আস্তে ডাকল, ক্ষিতীশ, এস।

বাধা দিল মধুমালা, বলল, না, কাউকে যেতে হবে না। যদি হাটে যাওয়ার একান্তই দরকার হয় তাহলে তার জন্যে যা ব্যবস্থা করার তা করা যাবে।

পিনাকী বললেন, সে কি ?

—কিছু না। মধুমালা তরতর ক'রে দুটো সিঁড়ি ভেঙে দাওয়ায় উঠে গেল, এবং মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্ধান করল ঘরের মধ্যে।

একটা সেকেণ্ডও নয়, তার মধ্যেই যেন একটা খণ্ডপ্রলয় হয়ে গেল। সামান্য একটি লহমার ভ্রান্তিতে যেন ভেস্তে গেল সমস্ত স্বপ্নের মায়াকাননটা। হতভম্ব হয়ে গেল হেরম্ব, স্তম্ভিত হয়ে গেল ক্ষিতীশ।

পিনাকী বললেন, কি, করেছ কি। কি ব'লেছ ওকে ?

ভয়ার্ত চোখে তাকাল ক্ষিতীশ, বলল, কিছু বুঝতে পারছি নে আমি।

পিনাকী একটু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন, বললেন, অমন ঠাণ্ডা মেয়ে, এমন বুঝদার মেয়ে, তার মেজাজটা হঠাৎ—

মধুমালা ঘর থেকে বেরিয়ে এল, সঙ্গে মাধবীও, সিঁড়ি দুটো ভেঙে উঠোনে এসে দাঁড়ালো পিনাকীর মুখোমুখী, বলল, কদ্দুরে হাট ?

পিনাকী জানেন না। কিন্তু সে কথা স্বীকার করতে তাঁর কথা আটকে গেল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে তিনি যেন উত্তর খুঁজলেন। কড়া মেজাজের একজন দাপটদার মানুষ পিনাকীভূষণ। কিন্তু সেই কেউটে কেমন যেন কেঁচো হয়ে গেছেন। ক্ষিতীশদের চোখেই এটা কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে।

পিনাকী বললেন, তাহলে আলোককে একবার খবর দিতে হয়।

—দরকার নেই। মাধবী, আয়।

মধুমালা তার বোনকে ডেকে নিয়ে রওনা হল দেখে পিনাকী বললেন, যাও, তোমরা সঙ্গে যাও অমন বেকুবের মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন।

পরনে চোখ-ঝলসানো জর্জেট, পায়ে হালফ্যাশনী চপ্পল, কাঁধে ঝুলন্ত ব্যাগ। চোখে সুর্মা নেই, গালে রং নেই, ঠোঁটে লাল নেই। তবু এমন অস্বাভাবিক সুন্দর লাগে কেন ওদের ? মনে হয় যেন, প্রকাশ্য দিবালোকে নারিকেলকুঞ্জ উদ্ভাসিত করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে দুইটি আলেয়ার আলো।

হেরম্ব বলল, যাব'? কিন্তু ওঁরা রাগ করবেন না তো ?

পিনাকী এদের কথার উত্তর দিলেন না। রোদের মধ্যে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর মাথা ঝিমঝিম ক'রে উঠেছে। রোদে দাঁড়ানোর অভ্যেস তাঁর আছে, কনট্রাক্টরের বা ইঞ্জিনিয়রের জীবন তো আরাম-কেদারার জীবন নয়। কিন্তু কাজের সময় রোদে যখন দাঁড়াতেন তখন মাথায় থাকত শোলার হ্যাট। এখন খালি মাথায় সোজাসুজি রোদ পড়ায় চাঁদিটা তেতে উঠেছে। তা ছাড়া, মাথা গরম হয়েছে তাঁর অন্য কারণেও।

পিনাকী বারান্দায় গিয়ে বসলেন। ক্ষিতীশ আর হেরম্ব তাঁর নির্দেশের জন্যে তাঁর মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু কোনো নির্দেশই পিনাকীভূষণ দিলেন না দেখে তারা হাঁটতে আরম্ভ করল। কেন যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে—সেসব চিন্তা না ক'রেই।

ততক্ষণে মধুমালারা নারকেল-গাছের আল পার হয়ে ওপারে গিয়ে পৌছেছে।

পিনাকী ডাকলেন, ক্ষিতীশ, হেরম্ব।

ডাক শুনেই ফিরে দাঁড়াল তারা। ধীরে ধীরে তারা এসে দাঁড়াল পিনাকীর সম্মুখে।

—বোসো। পিনাকীর নির্দেশে ওরা দুজন বসল তাঁর সামনে।

—কোথায় যাচ্ছিলে ?

—হাটে।

—হাট কতদূরে ?

—জানি নে ঠিক। কাউকে জিজ্ঞেস করলেই জেনে নেওয়া যেত।

পিনাকী বললেন, থাক্। যেতে হবে না। ওরা দুজনেই পারবে।

এই কথা বলে চুপ করলেন পিনাকী। কী-যেন ভাবতে লাগলেন বসে বসে। অনেকক্ষণ বাদে তিনি বললেন, তোমরা বড় ভীতু। অল্পেই ঘাবড়ে যাও কেন যেন।

ক্ষিতীশ আর হেরম্ব মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করল দুজনের। পিনাকীভূষণের কথার মানে ঠিক ধরতে পারল না।

—অশ্রদ্ধা না ক'রে, অবজ্ঞা না ক'রে প্রতিবাদ জানানো যায়, জানো ?

হেরম্ব বলল, হ্যাঁ। তা যায়।

পিনাকী বললেন, তবে জানাও না কেন ?

—কা'কে ?

—রাম শ্যাম যদু মধু হরি—সবাইকে। আর, আমাকেও।

ক্ষিতীশ বলল, তেমন দরকার তো কখনো হয়নি।

পিনাকী হেসে উঠলেন শব্দ ক'রে, বললেন, এখনো আমাকে মনিব বলে খাতির করা হচ্ছে, তাই

না। কিন্তু তার আর দরকার কি। কারবার তো নেই। তোমাদের চাকরিও তো খতম হয়ে গেছে। ওকি, চমকে ওঠার মত করলে কেন। একদিন আমার দাপট দেখেছ, এখনো তার কথা বুঝি ভুলতে পারছ না ?

এর কোনো উত্তর হয় না। ক্ষিতীশ আর হেরম্ব মাথা নীচু ক'রে বসে রইল। পিনাকী এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন এদের দিকে। নিজেকে সম্ভবত বড় অপরাধী বলে মনে হল তাঁর। বড় কাজের ছেলে এরা দুজন ; খুব বিনয়ী নম্র ভদ্র আর ওবিডিয়েণ্ট গোছের ছিল। তাই তাঁর এই অভিনব সন্ন্যাসের সঙ্গী ক'রে নেবার ইচ্ছে হল এদের। শহরের মানুষ নাগরিক মুখোশ খুলে ফেলে একটা অকৃত্রিম আবরণ দিয়ে নিজেকে ঢাকবার জন্য ব্যগ্র হয়েছে, সেই অনাবিলতার সহচর করার লোভ হল এদের দু-জনকে। কিন্তু এক ডাকেই এরা সাড়া দেবে, নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভাববেও না—এতটা মনে করেন নি পিনাকীভূষণ। তাঁর দুই মেয়ের ক্ষোভ আছে তাঁর উপর, তাপও আছে। একথা পিনাকীভূষণ জানেন। কিন্তু এ জন্যে তাঁর কোনো ক্ষোভ-তাপ নেই। মায়ের স্নেহ পায় নি যে মেয়েরা, যারা অতি শৈশবেই তাদের মাকে হারিয়েছে, তারা বাবার কাছে থেকেই ডবল স্নেহ প্রত্যাশা করেছিল নিশ্চয়। কিন্তু পিনাকী তাদের সে প্রত্যাশা পুরণ করতে পারলেন না। তিনি হলেন পলাতক। ভাড়া-করা স্নেহ-ও মমতাময়ীদের হাতে সমর্পণ করলেন তাঁর মেয়েদের। মেয়েরা এখন বড় হয়েছে, এখন বুঝতে শিখেছে তারা, এখন যে তারা বাবার উপর বিক্ষুব্ধ হবে—এটা স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের সেই ক্ষোভের তাপ যদি অন্য কারও উপর গিয়ে পড়ে তাহলে পিনাকীভূষণের পক্ষে ক্ষুণ্ণ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য লাগে তাঁর, এই ছেলে-দুটি সেই তাপ হজম করে কেন।

ক্ষিতীশ বলল, হজম ঠিক নয়। তবে, ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারি নি। এখন বুঝতে পেরেছি। রুচি আর অভিরুচি নিয়ে তাঁর কথা শুনে একটু চাপা রাগ দেখিয়েছিলাম ব'লে উনি চটেছেন।

হেরম্ব বলল, আর আমাদের ভবিষ্যৎ। সেটা তো আপনার উপরেই ছেড়ে দেওয়া আছে অনেক দিন থেকে।

—কবে থেকে ?

—যেদিন আপনার দপ্তরে কাজে ঢুকেছি। প্রাইভেট কোনো আপিসে চাকরির তো এই দস্তুর। তার মালিকের ভবিষ্যতের সঙ্গে তার কর্ম্মচারীর ভবিষ্যত তো বাঁধা।

পিনাকী হেসে উঠে বললেন, কেবল তার মালিকের উত্থান-পতনের সঙ্গেই নয়, তার মেজাজের সঙ্গেও, কি বল ?

হেরম্বরা মাথা নীচু করে হাসল, কোনো উত্তর দিল না।

মাধবী আর মধুমালা এতক্ষণে অনেক দূর এগিয়ে গেছে হয় তো। হেরম্ব আর ক্ষিতীশ এখানে ব'সে পিনাকীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপে ব্যস্ত বটে, কিন্তু তাদের দু-জনেরই মন একটু চঞ্চল। আলেয়ার আলো দুটির কথা তাদের মনে পড়ে। তারা পিনাকীর নির্দেশ পেলেই ওদের খোঁজে যেতে রাজি। কিন্তু তিনি অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। পিনাকীর মনের কথা ধরা বড় মুশকিল। অভিলাষের দুর্গতির কথা তাদের মনে পড়ে।

হেরম্ব বলল, আমরা এগিয়ে দেখব নাকি ওঁরা আসতে রাস্তা হারালেন কি না।

পিনাকীর হাসি পেল। বললেন, রাস্তা হারাবার মেয়ে ওরা নয়। তোমরাই এই নতুন জায়গায় পথ ভুল করতে পার। তার-চে থাক্ না, একটু অপেক্ষা ক'রে দেখা যাক—ফেরে কি না।

পিনাকীর কথাটা বুকে যেন ঘা মারল দু-জনের। সে কি, ফিরতে না-ও পারে এমন সম্ভাবনা আছে নাকি ?

—আছে। ওরা শহরের মেয়ে। যাকে বলে রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্ম, ভাই। এখন ওদের চোখে সোনার স্বপ্ন মাখা।

সোনার স্বপ্ন ? হেরম্ব আর ক্ষিতীশ দু-জনে একসঙ্গেই পিনাকীর মুখের দিকে তাকাল। তারা তাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবে নি, কিন্তু ঠিক ওই ধরনের একটা স্বপ্ন তাদের চোখেও যে লেগে আছে—সেই গোপন কথাটা ধরে ফেললেন নাকি পিনাকীভূষণ ?

পিনাকীভূষণ অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, তোমরাও যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, তোমাদের বাধা দেব না।

ক্ষিতীশ উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু লজ্জা পেয়ে গেল। বসে পড়ল, বলল, ভাবছিলাম অচেনা জায়গায় এভাবে ওঁদের ছেড়ে দেওয়া ঠিক হল না। আমরা যাই।

পিনাকীভূষণ মাথা নাড়লেন। সেটা নিষেধের, না, সম্মতির তা বোঝার চেষ্টা করল না ওরা। যে পথে দুটি আলেয়ার আলোকে যেতে দেখছে, সেই পথে যাত্রা করল তারা। নারকেলগাছের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পিনাকী নিজের মনেই বলে উঠলেন, আহাম্মক।

একটি ছোটো উপাখ্যান

প্রতিভা বসু

বিয়ে হ'লো, কিন্তু আলাপ হ'লো না মানুষটির সঙ্গে। প্রথম রাত্রিতে কিছু মনে হয়নি। দ্বিতীয় রাত্রি তো কালরাত্রিই, ফুলশয্যার দিনই একটু অদ্ভুত লাগলো অপর্ণার। অবিশ্যি রাত্রিগুলোই যে একমাত্র কথাবার্ত্তা বলবার উৎকৃষ্ট সময় এবং সুযোগ তা নয়, এ বাড়িতে অর্থাৎ অপর্ণাদের বাড়িতে সব সময়ই সময়। ইচ্ছে করলে অতীন অনেকবার অনেক সময়েই দেখা করতে পারতো তার সঙ্গে। দু' চারবার যে মুখোমুখি না পড়ে গেছে এমন নয়, কিন্তু অতীন সরে গেছে ব্যস্ত পায়ে। প্রথমে মনে হয়েছিলো লোকটি তো আচ্ছা লাজুক। এখন মনে হলো ঠিক তা নয়, এর মধ্যে অন্য আরো কিছু লুকোনো আছে যা অপর্ণা জানে না।

অপর্ণার বাবা থাকেন ময়মনসিংয়ে। সামান্য স্কুলমাস্টারি করেন। এই মা-মরা মেয়ে নিয়েই তাঁর সংসার। অপর্ণা বৃত্তি-পাওয়া ছাত্রী, আধুনিক হালচাল না জানলেও লেখাপড়া শিখেছে মনোযোগ দিয়ে। তাদের বাপ-বেটির নির্ঝঞ্ঝাট সংসারে আসলে বইয়েরই প্রাধান্য বেশি। বাপের সঙ্গে আর বইয়ের সঙ্গে খুব সুখেই ছিলো সে, বিয়েটা হলো একেবারে হঠাৎ।

কোথা থেকে এক কর্নেল মুখার্জি এসে একেবারে তোলপাড় করলেন ময়মনসিং শহর। চিকিৎসা শাস্ত্রের ঈশ্বর বলে মানতে লাগলো লোকেরা।

বৃদ্ধ জমিদারের মরণাপন্ন অসুখ সারিয়ে দিয়ে যাবার সময় পুত্রবধূ নির্বাচন করে গেলেন অপর্ণাকে। অর্থাৎ ইনি এই ময়মনসিংয়েরই ছেলে, প্রিয়নাথের মানে অপর্ণার বাবার এক কালের প্রাণের বন্ধু। বিদ্যায় বুদ্ধিতে বরাবরই বন্ধুর চেয়ে খাটো ছিলেন, কিন্তু ডাক্তারি পড়তে এসে দেখা গেল সমস্ত প্রতিভা তাঁর সেইটুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিলো। বিলেত থেকে লম্বা-লম্বা পাশ দিয়ে, লম্বা-লম্বা ডিগ্রি নিয়ে এলেন অনায়াসে। কলকাতা শহরে তাঁর বাড়ি গাড়ি নাম ডাক সবই উল্লেখযোগ্য হ'য়ে উঠলো চট করে। বহুকাল প্রবাসী, সেই ছাত্র জীবনের পরে এই প্রথম আগমন। প্রিয়নাথকে দেখেই জড়িয়ে ধরলেন, আর প্রিয়নাথের মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হলেন।

লাজুক আর শান্ত প্রিয়নাথের ততোধিক সলজ্জ শান্ত মেয়ে মধুর হেসে অনেক রান্না করে খাওয়ালো তাঁকে। তাদের ছিমছাম একতলা বাড়ির বইঠাসা ছোটো বসবার ঘরের আড্ডাটা বেশ জমলো কদিন। কাকাবাবুর পাকা চুল তোলা বাবদ একটাকা রোজগার হ'লো, প্রিয় লেখক নিয়ে ঝগড়া হ'লো খেতে বসে, সাহিত্যের খবরে আনাড়ি পিতৃবন্ধুকে অনেক শিক্ষিত করলো অপর্ণা। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার স্বীকার করলেন যে যৌবনে তিনি কয়েকটা প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন বটে, কিন্তু প্রিয়নাথ বলেছে—সব কটাই রাবিশ। সেই দুঃখেই আর এ রাজত্বের খবর তিনি রাখেন নি।

যাবার সময় এই কাণ্ডটি করে গেলেন। প্রিয়নাথের হাত ধরে মেয়েটিকে প্রার্থনা করলেন পুত্রের

জন্য। অতীন অযোগ্য নয়, বি, এস.-সি পাশ ক'রে এনজিনিয়ার হয়ে এসেছে বিলেত থেকে। বিদেশের ডিগ্রি তার জোরালো। বয়স কম হ'লে হবে কী। উপার্জনে পিতাকে সে ঠিক ধরে ফেলবে।

প্রিয়নাথ আর কী বলবেন? ভগবানে বিশ্বাস করা ছাড়া আর কিছু ভেবে পেলেন না। মেয়ে তার যোগ্য ঠিকই, তাই বলে অনায়াসে এমন ভাগ্য দরজায় এসে মুঠো ভরে দেবে তা তিনি আশা করেননি।

শ্বশুরবাড়ি এসে অর্থাৎ ডাক্তার কাকার বাড়ি এসে তাঁদের হালচালের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে কষ্ট হলো অপর্ণার, কিন্তু লোক ওঁরা সবাই ভালো তাই খুব একটা কিছু খারাপ লাগলো না। শাশুড়ি যেমন রূপসী, তেমনি বিদুষী। বয়স হয়েছে, এখনো রঙিন শাড়ি ঘুরিয়ে পড়েন, সারাদিন হিলতোলা চটিতে ঠুক্‌ঠুক্ করে চলেন। তা মন্দ কী! যাঁর যেমন অভ্যাস। কিন্তু রং মাখাটাই ভালো লাগে না। ভারি কুরুচি মনে হয়। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তাঁরা এঁদের চেয়েও আধুনিক। পেটখোলা কাঁচুলিতে, পাৎলা শাড়িতে হোয়াইটেকসের সাদায়, কিউটেকসের লালে, লিপস্টিকের পাকা পটলে, কার্ল করানো বাবড়ি চুল নিয়ে মাঝে মাঝেই বেড়াতে আসে সে। হয়তো একটু অবহেলা করে ভ্রাতৃবধূকে কিন্তু তবু ভালো। হাসিখুসি, মন খোলা, প্রাণখোলা, অনেকটা যেন কাকাবাবুর মতো। সাজ-সজ্জাতে কী এসে যায়, মানুষটাই আসল। কাকাবাবু বললেন এ বাড়ি কেমন লাগছে মা-মণির? অপর্ণা মিষ্টি হেসে শ্বশুরের দিকে তাকায়, কথা বলে না। বই চাই না? দাঁড়াও আজই তোমাকে নিয়ে আমি বেরুবো, দোকান উজোড় করে এনে দেব। আচ্ছা, কোন লেখক তোমার সবচেয়ে প্রিয় বল।

'নাম বললেই যেন কেউ বুঝতে পারবে!' ঠাট্টা করে অপর্ণা 'যদি বলি ভরদ্বাজ পত্রনবীশ একজন মস্ত লিখিয়ে তা হ'লেও যা, আর এদিকে—

'আর এদিকে নিশীথ সেন সুপ্রিয়া বসু চঞ্চল মিত্র সুশান্ত মুখোপাধ্যায় অসিত ঘোষ তারাও তাই—না?'

পুত্রবধূর উপরে খুব এক হাত নিলেন তিনি সব কটা অধুনিক লেখকের নাম গড়গড়িয়ে বলে। তারপর দু'জনেই হেসে উঠলো এক সঙ্গে।

শাশুড়িও অবিশ্যি একদিন জিজ্ঞেস করলেন এখানে তার কোনো কষ্ট হচ্ছে কিনা। মুখ নিচু করে অপর্ণা বললো 'না, কষ্ট কেন হবে?'

'তোমাকে নিয়ে একটু বেরুবো। কয়েকটা শাড়ি আর কয়েক জোড়া জুতো কেনা দরকার তোমার।'

'আমার?'

'হ্যাঁ। আর কসমেটিক্সও কিছু কিনতে হবে সেই সঙ্গে।'

'আমার জন্য?'

'হ্যাঁ। বাড়িতে লোকজন আসে, তোমাকে দেখতে চায়।' খুব ভদ্র এই ভদ্রমহিলা, বরং একটু বেশি। এর চেয়ে বেশী বলা তাঁর অভ্যেস নেই, বুদ্ধিমান মেয়ে অপর্ণারও অবিশ্যি তার চেয়ে বেশি শোনার দরকার নেই।

রাত্রিবেলা শুতে এসে অতীন জিজ্ঞেস করে, 'আমি যদি একটু আলোটা জ্বালিয়ে পড়ি, কিছু কি

অসুবিধে হবে ?' সমস্ত দিনান্তে এই তার নতুন স্ত্রীর সঙ্গে প্রাত্যহিক আলাপ। ধবধবে বিছানায় প্রায় নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে অপর্ণা বলে 'না।'

গম্ভীর মুখে অসহ্য সুন্দর চেহারা নিয়ে টেবল ল্যাম্পের তলায় সে বই পড়ে, কাগজের উপর পেনসিল দিয়ে কী যেন আঁকে। হঠাৎ একবার এদিকে তাকিয়ে একটা বই দিয়ে আড়াল করে দেয় আলোটা। অনেক পরে চেয়ার ঠেলে উঠে ড্রেসিং গাউনটা খুলে ব্রাকেটে রেখে দেয়, বলিষ্ঠ শরীরে গেঞ্জিটা আঁটো হয়ে বসে থাকে, আর সেই ঘরোয়া চেহারাটুকু মুহূর্ত্তের জন্য দেখতে-দেখতে অপর্ণার বুকের মধ্যে ঢেউ বয়ে যায়। ভীষণ ইচ্ছে করে—কী ইচ্ছে করে জানে না, একটা অদম্য কোনো আশা উদ্‌ভ্রান্ত করে তাকে। অতীন টিপ করে আলো নিবিয়ে ঘর অন্ধকার ক'রে শুয়ে পড়ে নিজের খাটে।

দিনের বেলা সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত বাড়ি থাকে সে। এদিকের অংশটা সবটাই অপর্ণার, ওদিকটা—শাশুড়ির, বাইরের মহলটা শ্বশুরের। বাবার ওখানে সকাল থেকে কত কাজ থাকতো তার। ঘর গুছোনো, পান সাজা, বাজার দেয়া, ময়লা কাপড় কাচা, রান্নার তদারক—তারপর বাপে মেয়ে একসঙ্গে খেয়ে বেরিয়ে যাওয়া। ফেরাটাও প্রায় তাই হ'তো। এসেই সে লেগে যেতো চায়ের জোগাড়ে, নিত্যি নতুন জল খাবারের ব্যবস্থা ক'রে তাক লাগিয়ে দিত বাবাকে, তারপর বই।

এখানে আর কী কাজ। সারাবাড়িতে তারা সবশুদ্দু চারটি মানুষ, অথচ বাবুর্চি, বেয়ারা, মালি, দাসী কত তার ইয়ত্তা নেই। শাশুড়ির কাছে সমস্তক্ষণ বসে আছে নেপালি মেয়েটা—অতীন যতক্ষণ ঘরে আছে ঘুর ঘুর করছে বেয়ারা, গাড়ি ধোবার লোকটা কেবল দুটো গাড়িকেই আয়না করছে—সারা-দিন। তারই মধ্যে টুক্‌টাক অতীনের কাজগুলো আস্তে আস্তে হাতে তুলে নিল সে। প্যান্টে বকলস পরানো, সার্টের বোতাম লাগানো, নিত্যি নতুন রুমাল বার ক'রে দেয়া, কোন্ কোন্ বইগুলো সঙ্গে যাবে (এটা সে বুঝে ফেলেছে কয়েকদিনের মধ্যেই) সে সব ঠিক করা টেবিল গুছিয়ে দেয়া, মানুষটি অমনোযোগী, চশমাটা কতবার হারায় ঐটুকু সময়ে তার ঠিক নেই, হাতের ঘড়িটা কোথায় ফেলে রাখে মুহুর্মুহু দরকারী কাগজ হারায়—সেদিকে নজর রাখা—বেয়ারাটা বসে থাকে দরজার বাইরে, ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে অপর্ণা এই সব করে। অতীন ততক্ষণে বাথরুমে সন্টের জলে, একঘণ্টা স্নান সেরে সারা গায়ে বাথ পাউডারের গন্ধ ছিটিয়ে হাতের কাছে সমস্ত প্রস্তুতপায়।

এতখানি সময়ের মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে সে একটা কথাও বলে কিনা সন্দেহ। শুধু যাবার সময় বিদায় নেয় একটু ফিরে তাকিয়ে। ভদ্রতা আছে তো ?

ক্রমে এটা বুঝতে পারলো অপর্ণা শ্বশুরের কাছে তার যা মূল্যই থাক এ বাড়িতে শাশুড়ি বা তার ছেলের কাছে সে নিতান্ত সামান্য। তুচ্ছ। এদের দু'জনের মন প্রাণ একতারে বাঁধা। অপর্ণার মতো শান্ত ধীর, আটপৌরে মেয়েতে তাদের মন ভরানো শক্ত। শাশুড়ি অবিশ্যি হাল চাল শেখবার জন্য গভর্ণেস রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু একটা অর্ধশিক্ষিত এ্যাংলো মেয়ের কাছে রং মাখা শিখতে আর চলাফেরায় চাপল্য আনতে রাজী হয়নি সে।

শাশুড়ি গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, 'এ বাড়ির যা নিয়ম তাইতো করতে হবে তোমাকে ?'

অপর্ণাও গম্ভীর মুখে বলেছিলো 'যে নিয়ম ভালো নয় সেটার আয়ু বাড়িয়ে লাভ কী ?'

অবাক হ'য়ে একটু মুখ খুলেছিলেন শাশুড়ি, 'অতীনের মতামতটা তুমি বোধহয় জানো ?'

'তিনি আমাকে কিছু বলেননি।'

'বলবার আগেই তোমাকে তার যোগ্য হ'য়ে নিতে হবে।'

'পোষাকটাই কি বড় যোগ্যতা ?'

'সমাজে চলতে ফিরতে হ'লে তাকেও মূল্য দিতে হবে বৈকি। নিজেকে সাজানো কিছু দোষের নয়।'

'অপর্ণা আর জবাব দেয়নি।

তারপরেই একদিন শ্বশুর তাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে।

'বোসো।'

অপর্ণা বসলো।

'তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।'

'বলুন।'

'এ বাড়ি তোমার যোগ্য নয়, তুমিও তাদের যোগ্য নও। আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্তই তোমাকে করতে হচ্ছে।'

'এসব কেন বলছেন ?'

'সত্যি ক'রে বলতো মা, তুমি কি সুখী হ'য়েছ ?'

অপর্না চুপ ক'রে রইলো।

'আমার মনে হচ্ছে তুমি এখান থেকে বরং প্রিয়নাথের কাছেই চলে যাও। আবার পড়াশুনো কর, তোমাকে আমি বিলেত পাঠাবো।'

অপর্ণা চুপ।

'আমার স্ত্রীর একান্ত অমত ছিলো এই বিয়েতে। তাঁর সমাজ আর তোমাদের সমাজ দুই জগত। কিন্তু আমার মনে দেশের জন্য কোথায় একটা হাহাকার ছিলো, তোমার মধ্যে আমি আমার সব তৃপ্তি দেখেছিলাম, মনে হ'য়েছিলো এ বাড়িতে তুমি এলে আমার বুক ভ'রে যাবে, আমার হারানো ছেলেবেলা আমি ফিরে পাবো আবার। এদের কথা ভাবিনি, কথা দিয়ে এসেছিলাম প্রিয়নাথকে। তারপর—'

'আমি বুঝেছি, কাকাবাবু—'

'সবটাই শোনো, অতীন যে মনে মনে আর একটি মেয়েকে পছন্দ করেছে আমি জানতুম না সে কথা। তাছাড়া সেই মেয়ে পছন্দের যোগ্যও ছিলোনা। এরা পুতুলের মতো শুধু সাজেনা, নিষ্প্রাণও ঠিক পুতুলের মতই। আমার সঙ্গে কোথাও মিল নেই, তবু এদের নিয়েই আমার জীবনযাপন। সে-ও একটা ভুল হ'য়েছিলো বৈকি। মোট কথা—এ সংসারে, আমার সবই আছে, নেই শুধু প্রাণ। সেই প্রাণই আমি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম তোমাকে দিয়ে। জীবনে আমি এঁদের কথাতেই উঠেছি বসেছি মাত্র এই একবার আমি জ্বলেছিলাম। অতীনকে বলেছিলাম আমার ঋণ তোমাকে শোধ করতে হবে কড়ায় ক্রান্তিতে, যতক্ষণ তা না পার ততক্ষণ তুমি আমার অধীন, পুত্রবধু আমি নির্বাচন করবো

তুমি নয়, আমার বাড়িতে আমার হুকুমই একমাত্র, তোমাদের নয়। আমার চ্যাচামেচিতে ওরা মা আর ছেলে চুপ ক'রে গেল, ওরা ভদ্রলোক। ওরা সম্ভ্রান্ত। ওরা চ্যাঁচায় না কিন্তু ওরা নিঃশব্দে—রক্ত শুষে নেয় শরীরের। আমি বুঝেছি সেই প্রতিশোধই ওরা নিচ্ছে তোমার উপর।'

অপর্ণা চুপ।

সেইরাত্রে একটুও ঘুম হলোনা তার। কত কিছু যে ভাবলো মাথামুণ্ডু তার ঠিক নেই। আরো একথা ভেবেই আত্মধিক্কারে জর্জরিত হ'লো সে শ্বশুরকে বলতে হ'লো কেন? সে কি নিজে বোঝেনি এঁদের অবহেলা? এদের অপছন্দ? স্ত্রীর কোনো মর্যাদাই অতীন তাকে দেয়নি। তার কোনো অস্তিত্বই সে স্বীকার করে না। কোথাও সে নিয়ে যায় না তাকে, কেউ এলে ডাকে না, সেই অবিবাহিত জীবনই সে যাপন করছে। মিসেস মুখার্জিও তো তাকে বধূর পদ দেননি। তিনি পার্টিতে যান, বন্ধুবান্ধব এলে ড্রইংরুমে বসেন, সাহেব সুবোকে ডিনার খাওয়ান কখনোতো তাকে পরিচয় করিয়ে দেন না কারো সঙ্গে। সে থাকে অন্তরালে, অন্তঃপুরে,। অথচ এ বাড়িতে তার আসনও তো কিছু কম নয়।

ছি ছি। তবু সে এদের সঙ্গেই জড়িয়ে রেখেছে নিজেকে? ভোর না হ'তে অতীনের সুখ সুবিধের ব্যবস্থাতেই ঢেলে দেয় ম , ঘুমিয়ে না পড়া পর্য্যন্ত তাই ভাবে। শাশুড়ির প্রয়োজন বুঝে তাই নিয়ে গিয়ে তাঁর ঘরে দাঁড়ায়। বাবুর্চিখানায় গিয়ে তদারক করে রান্না বান্নার। এ সংসারে শৃঙ্খলা নেই, শ্বশুর উপার্জ্জন করেন দু'হাতে, শাশুড়ি খরচ করেন দশহাতে। তাই কিছুতেই হয় না। বাড়ি পরিষ্কার করবার লোক আছে দুটি, তবু কার্পেটের তলায় পৃথিবীর নোংরা। দামী দামী আসবাব যত্নের অভাবে মলিন। অমন সুন্দর লনটা—বাগানের কী হাল। অথচ মালী বাস করে সপরিবারে। শ্বশুর বুড়ো হয়েছেন, এখন তার শৈশবের মতোই স্নেহ মমতা সেবা যত্নের দরকার, সেই ভৃত্যদের হাতেই পড়ে আছেন। মিসেস মুখার্জি—নিজের সুখ-সুবিধের দিকে নজর রেখে আর কোনদিকে তাকাতে পারেন না। ভালো-বাসেন না ঘেঁষাঘেঁসি, বাড়াবাড়ি। সন্তান দুটিকেও তিনি এই রকম ছাড়া ছাড়া ভাবেই মানুষ করেছেন। নিজের ঘরে নিজের সাজসজ্জা, আর বাইরে বড় বড় পার্টি, এই নিয়েই তাঁর জীবন। ছেলেবেলায় অতীন থেকেছে দারজিলিং পাবলিক স্কুলের বোর্ডিংয়ে, মেয়ে মুসৌরী। বড় হয়ে ছেলে বিলেতে গেল আর মেয়ের বিয়ে হ'লো। দেখা হলো কখন যার সঙ্গে? পরস্পরের উষ্ণতায় হৃদয়বান হলো কখন? আর কর্ণেল মুখার্জি। তার পদমর্যাদা তো অপর্ণারই মতো। তিনি স্যুট পরলে কী হবে? কথা বলেন জোরে জোরে, হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করেও মেলামেশার ক্ষেত্র তার অতিবিস্তৃত। সমকক্ষতার ধার ধারেন না, ভালো লাগলেই হলো—সে-ই তাঁর বন্ধু। কোনো কোনো দিন মনের আনন্দে যদি সহসা হেসে ওঠেন হা হা করে মিসেস মুখার্জি তার কাজলমাখা হরিণ চোখ তুলে একবার মাত্র তাকাবেন স্বামীর দিকে, কর্ণেল মুখার্জি চুপ। তার যেমন বাঘের মত গর্জন গলা, মিসেস মুখার্জির তেমন সিল্কের মতো নরম। হাতের কাছে কলিং বেল থাকা সত্বেও যখন চেঁচিয়ে ডাকবেন 'ওরে রামা, হরে, নিবারণ—' মিসেস মুখার্জি নিঃশব্দে উঠে যাবেন সেখান থেকে। তাঁর মাথা ধরে যাবে সেদিন। তিনি ডাকবেন, অয়য়া' গোল করে মিষ্টি ক'রে। ডাকবেন 'ব্যেরা' ডাকবেন 'বোয়' তবে কোনদিক দিয়ে মিলবেন তাঁরা? অথচ বিয়ে করেছিলেন প্রেম করে। কী করে সম্ভব হ'য়েছিলো?

তবে অতীনের সঙ্গে তারইবা মিলবে কোন দিক দিয়ে? অতীনতো তার মায়েরই ছায়া। আর তাছাড়া—তাছাড়া—এখানে এসে অপর্ণার সব ভাবনা গুলিয়ে যায়। একথা ভাবতে ভীষণ—কষ্ট হয় তার যে অতীন অন্য কোনো মেয়েকে ভালোবাসে। তাকে না বাসুক এটা সহ্য হয়, কিন্তু অন্যকে বাসবে এটা ভা'তে বুক ভেঙ্গে যায়। এই তিনমাসের অবহেলার বিনিময়ে অপর্ণা কি তবে অতীনকে ভালোবেসেছে? হঠাৎ অন্ধকার ঘরে চারদিক তাকিয়ে উঠে বসলো সে, নিজের একক শয্যা থেকে নেমে দাঁড়ালো গালিচার নরমে। বিরাট ঘর, দুই প্রান্তে দুই খাট—দুই জানালা ঘেঁসে। মাঝখানে কারপেটের উপর শ্বেত পাথরের গোল টেবিল। কাশ্মিরী ফুলদানিতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা।

অতীনের মাথার কাছে তার কাজের টেবিল, পায়ের কাছে বেডসাইড টেবিলে রূপোর গ্লাশে জলঢাকা। অপর্ণাই রেখে দেয় রোজ। শোবার আগে প্রথম প্রথম রোজই বেয়ারাকে ডাকাডাকি করতে শুনতো জলের জন্য। অপর্ণা উঠে এসে জল ভরে দিত। ব্যস্ত হ'য়ে অতীন বলতো 'না, না, ওঠবার কী দরকার ছিলো বেয়ারাতো আছে।' অপর্ণা জবাব দিত না, গম্ভীর মুখে জলটা হাতে তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। এরকম হাজারো কাজের ডাকাডাকি ওঁদের সারাদিন। কিছুই ঠিক থাকে না ঠিক পায়না। ডজন ডজন রুমাল কোথায় হারিয়ে যায়, দামীদামী টাই কাল যেটা পরেছে আজ সেটা খুঁজে পায় না, মাসে মাসে জুতো কিনতে হয়, মূল্যবান স্যুটগুলো যে হঠাৎ হঠাৎ কোথায় উধাও হয় তার পাত্তা থাকে না, আপিসে যাবার সময় রোজ হুলুস্থুল। এত কাণ্ডের মধ্যে মা নেই কোনোখানে, মাকে ওরা ভাবেও না। লোকজন রেখে দিয়েছেন তবে আর তাঁকে দিয়ে কী প্রয়োজন? রোজ আসছে জিনিস রোজই টান পড়ছে দরকারের সময়।

কী শ্বশুরের কী অতীনের, এই অবস্থা দুটি পুরুষের। সব ভার অপর্ণা তুলে নিয়েছে—নিজের মাথায়। কেউ তাকে বলেনি, কেউ তাকে অধিকারও দেয়নি তবু যেচে সেধে কখন যে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে কে জানে।

কিন্তু কেন? কেন এটুকু আত্মসম্মান সে বজায় রাখলো না নিজের জন্য? ঐ প্রান্তর থেকে এই প্রান্তরে হেঁটে এলো সে একেবারে অতীনের বিছানার কাছে। গেঞ্জি গায়ে পাশ ফিরে শুয়ে আছে, জানালা দিয়ে আকাশের আলোয় ধোয়া মুখের আধখানা চাঁদের মত সুন্দর। সহসা নিচু হয়ে খাটের কাছে মেঝেতে হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো অপর্ণা, যা ভাবেনি যা ভাবতে পারেনি তারপর তাই করলো সে। অতীনের এলিয়ে থাকা ঘুমন্ত হাতের উপর মুখ ঘষে ঘষে আকুল আবেগে কাঁদতে লাগলো।

অবাধ্য হৃদয়ের কোনো অসতর্ক মুহূর্তের এই অসংযম একটু পরেই সে সংযত করলো, ভয়ে, লজ্জায়, দুঃখে, ক্ষোভে আধখানা হয়ে দ্রুতপায়ে সরে এলো নিজের বিছানার কাছে। বালিশে মুখ ঢেকে বললো, 'ঈশ্বর এ লজ্জা থেকে আমাকে বাঁচাও। বাঁচাও এই কাঙ্গালিপনা থেকে।'

তারপরের দিন অতীনের ঘুম ভাঙার আগেই অদৃশ্য হলো ঘর থেকে। আপিস থেকে ফেরার আগেই রওনা হ'য়ে গেল মৈমনসিং।

কর্ণেল মুখার্জি বলেছিলেন 'আজই যাবে?' মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় সে বললো 'আজই কাকাবাবু। আর সঙ্গে আপনিই যাবেন।'

কর্ণেল মুখার্জি অবিশ্যি যেতে পারলেন না, কিন্তু পুত্রবধুকে তিনি তুলে দিয়ে এলেন ফার্ষ্টক্লাশ কামরায়। সঙ্গে তার এ্যাসিসটেণ্ট পৌছে দিতে গেল। ষ্টেশনে, শ্বশুরকে প্রণাম ক'রে চোখভরা জল নিয়ে অপর্ণা বললো 'ভালোমত থাকবেন, আমি সব ঠিক করে রেখে গেলাম। রাত্রিবেলা ঘুমের আগে ওরা ওভালটিন করে দেবে খেতে যেন ভুল না হয়। পিঠে ব্যথাটার জন্য তারপিনের মালিশই ভালো—'

'দেখো কাণ্ড' এ্যাসিসটেণ্টের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার হাসলেন 'তোমরাতো আমাকে একটা মস্ত কিছু ভাব, আমার মা যে, আমার চাইতেও দিগ্বিজয়ী ডাক্তার সে কথাটি বুঝেছ কী?' তারপর পকেট থেকে মস্ত রুমাল বার করে ঘন ঘন মুখ মুছতে লাগলেন।

বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল। কেন হলো কে জানে। হাঁক ডাক কোলাহল কিছুইতো তার ছিলোনা তবু বাড়ির প্রত্যেকটি লোক অনুভব করলো সে নেই। মিসেস মুখার্জিও একবার ঘর থেকে বেরিয়ে এঘর ওঘর করলেন, কেমন বিমনা কাটলো সারাটা দিন। চালচলন নাই বা জানলো মেয়েটা কিন্তু ভালো ছিলো, একথা তিনি অনেকবার বললেন মনে মনে। আর এদিকে অতীন প্রথমদিন জানতেই পারলোনা তার তিন মাসের নিঃসঙ্গ নিঃশব্দ সঙ্গিনীটিকে কেন সে আজ একবারো দেখতে পেলোনা। কথাবার্ত্তা নাই-বা হলো সে যে আছে এটা অনুভব না করেতো উপায় ছিলো না? টুকটাক এটা করছে ওটা করছে হাতের কাছে যোগান দিচ্ছে সব, সকালে দাঁড়ি কামাবার গরম জলটি থেকে রাত্তিরে ঘুমোবার পোষাকটিতে পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে তার অস্তিত্ব। রাত্রিবেলা কাজ করতে বসে অভ্যাস মতো আলোটা আড়াল করতে গিয়ে থম্‌কালো। অপর্ণার শয্যার দিকে তাকিয়ে দেখলো জানালা দিয়ে কখন এক ফালি চাঁদ এসে ছড়িয়ে আছে তার শূন্য বিছানায় বালিশে। চুপ করে তাকিয়েই রইলো, তারপর কালকে রাত্তিরের কথা, সে কথা তাকে সারাদিন উতলা করে রেখেছে, সেকথাটা আবার মনে পড়ে গেল তার। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে কাল এই চাঁদের আলোতেই মেয়েটির আনত মাথার কালো চুলের রাশির দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গিয়েছিলো। এমনকি হাতের উপর তার কান্না ভেজা নরম মুখের স্পর্শটা অনুভব করে নড়াচড়ার ক্ষমতা পর্যন্ত ছিলো না। একটি মেয়ে মনের এই উত্তাপ এই বানডাকা নিঃশব্দ ভালোবাসার গোপন প্রকাশ, কতক্ষণের জন্য তাকে যেন অভিভূত করে রেখেছিলো। বাকী রাত আর ঘুম হলোনা। আবেগহীন মায়ের কাছে সে এই অনুভূতি নিয়ে বড়ো হয়নি, বরং মায়ের চেয়ে যে বাবাকে সে অনেক স্থূল, অনেক অযোগ্য ভেবেছে তাঁর কাছ থেকেই এরকম দু একটি ধূধূ স্মৃতির বিন্দু ঝাপসা ঝাপসা মনে করতে পাড়লো। পাঁচবছর বয়সে দারজিলিং বেড়াতে গিয়ে মা যখন তাকে রেখে এলেন বোডিংয়ে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলো আঁচল ধরে। হঠাৎ বাবা ব্যাকুল হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিলেন তাকে, তার পুরুষ চোখ ভিজে উঠলো জলে। আজকে এতকাল পরে সেই স্পর্শের স্মৃতিটাই মথিত হয়ে উঠে এলো চেতনায়। অতীন কাজ করতে পারলোনা, আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লো।

পরের দিনও সে নেই, তারপরের দিনও না। পৃথিবীতো তেমনিই চলছে, তেমনি সূর্য উঠছে, অস্ত যাচ্ছে, রাত হচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়ছে প্রাণীকুল, আবার সকালে উঠে কিচির মিচির। একদিন আরেক

দিনেরই পুনরাবৃত্তি। মাঝখান থেকে এই এক ফোঁটা ব্যতিক্রম, অতীনের ঘরে অপর্ণা নেই। কী এসে যায়? সে যখন ছিলো, তখন কে লক্ষ্য করেছে তাকে? কে তাকিয়েছে সেই রং না মাখা কচি পাতার মত—ঈশ্বরসৃষ্ট কোমল ত্বক মুখের দিকে? সরোবর সজল, কাজল হীন চোখের সমুদ্রে ঢেউ তোলা মেঘের মত ঘন সুগন্ধি চুলের অরণ্যে? চুপচাপ বিমর্ষ মুখে আকাশে চোখ পাঠিয়ে সে যখন দাঁড়িয়ে থেকেছে জানালায়, কে খোঁজ নিয়েছে তার মনের কথার? কিন্তু আজ অতীন অস্থির হয়ে উঠলো। তারপর সব সঙ্কোচ ঝেড়ে সকালে উঠেই মার দরজায় গিয়ে টোকা দিল আস্তে।

মিসেস মুখার্জি মুখহাত ধুয়ে সবে আয়নার কাছে বসেছেন প্রাতঃকালীন প্রসাধনে। তার প্রলেপহীন রুক্ষ চামড়া, রং হীন বিবর্ণ ঠোঁট—আঁটো কাঁচুলি হীন ঢিলে ব্লাউস, সব মিলিয়ে তাকে যেন একেবারে অন্য মানুষ মনে হলো অতীনের। হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা হিম বিকর্ষণে মনটা ধাক্কা খেল জোরে। সভ্য সমাজে যেমন বসন হীন মানুষ নেই, তাদের সমাজেও তেমনি প্রলেপহীন মেয়ে নেই। কিন্তু প্রলেপের তলায় যে এই মৃত হাড়ের বরফ স্তূপ তাতো অতীন জানতো না? কিছুই জিজ্ঞেস করলো না কিছুই বললোনা, যেমন এসেছিলো তেমনি ফিরে গেল আবার।

সেদিন তার ঘরে মন লাগলোনা, আপিসে মন লাগলোনা, বান্ধবীদের কাছে আনন্দ করতে গিয়ে আরো তিক্ত হ'য়ে ফিরে এলো। তার চব্বিশবছরের সুকুমার চিত্তে একবিন্দু সুখ রইলোনা কোথাও। অবশেষে সন্ধ্যাবেলা পায়ে পায়ে বাবার ঘরের দরজাতেই দাঁড়ালো এসে। নিচু হ'য়ে মনোযোগ দিয়ে কাকে চিঠি লিখছিলেন তিনি, সাড়া পেয়ে পেছন ফিরে তাকালেন তারপর ছেলেকে দেখে একটু অবাক হ'লেন বোধহয়। চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে নিয়ে বললেন "এসো।"

'তুমি কাজ করছিলে?'

পরিষ্কার বাংলায় বাপের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা বড় হয়ে অতীনের এই বোধহয় প্রথম। কর্ণেল মুখার্জি ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। 'কিছু বলবে? ও, ভালো কথা, এ চিঠিটা তুমি পড়তো।' একখানা ধূসর রংয়ের সৌখিন খাম তিনি এগিয়ে দিলেন ছেলের দিকে। অপর্ণা লিখেছে। বুকটা ধ্বক ধ্বক করলো অতীনের। কর্ণেল মুখার্জি ফস্ করে চিঠিটা নিজেই খুললেন, মনে মনে খানিকটা পড়ে নিয়ে বললেন, 'এই যে এই জায়গাটা পড়।'

—ওঁর ঘরের পুবদিকের জানালার কাছে ছোট সেলফ থেকে ক্যাথরিন ম্যানসফিলডের দু'খানা গল্পের বই, একখানা মোঁপাসা, গীতবিতান প্রথমখণ্ড আর নিশীথ সেনের 'মনে ছিলো আশা' ও 'নীল আকাশ' বইকখানা অবকাশ মতো আমাকে পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়। আমার শাড়িটারিগুলো থাকার দরুণ—ওঘরটা ব্যবহারে কারো যদি অসুবিধে হয় বা অপরিচ্ছন্ন লাগে তা হ'লে সে সব আপনি আপনার ঘরে এনে রেখে দেবেন। আমি আর ফিরে যাবোনা বলেই মনস্থির করেছি। আমাকে নির্বাচন করে আপনি আপনার পুত্রের যে মনোকষ্টের কারণ হয়েছেন তা থেকে অব্যাহতি দেবার জন্য যদি আমার আরো কিছু করণীয় থাকে তা হলে তার জন্যেও আমি প্রস্তুত আছি জানবেন। তাঁকেও জানাবেন।

আপনার জন্য মন কেমন করে। ওখানকার সকলের জন্য, সব কিছুর জন্যই আমার মন কেমন করে। কেন?—

চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে অতীন নিজের ঘরে ফিরে এসে অন্ধকারে বসে রইলো চুপচাপ। তারপর আলো জ্বেলে হঠাৎ কাগজ কলম নিয়ে এই কটা লাইন লিখলো—'দেবী! জানতে চেয়েছেন এখানকার সকলের জন্য আপনার মন কেমন করে কেন? তবে দয়া করে শুনুণ এখানকার মানুষরাও এমন কিছু পাষণ্ড নয় যে তাদেরও কারো জন্যে মন কেমন করেনা।' লিখেই ধা করে ছিঁড়ে ফেললো কাগজটা। ভীষণ লজ্জা করলো একা ঘরে। গুম হয়ে বসে থাকলো খানিক তারপর আবার লিখলো, '[illegible] পুত্রের মনোবেদনার জন্য আপনাকে কিছু ভাবতে হবেনা দয়াবতী মহিলা। আপনি নিজেতো কারো কথা না ভেবে পিত্রালয়ে গিয়ে খুব সুখে আছেন তাহলেই হলো।' কুটি কুটি ক'রে সে পাতাটিও ছিঁড়ে ফেললো সে। সহসা চকিত হয়ে উঠে গিয়ে ঠাস করে বন্ধ করে দিয়ে এলো দরজাটা তারপর আবার লিখলো, 'তুমি যদি এক্ষুনি চলে না এসো তা হলে সত্যি সত্যি তোমার সব জিনিষপত্র আমি এঘর থেকে ফেলে দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিজেও অন্য কোথাও চলে যাবো।'

সেদিন খুব ভোরেই একখানা ট্যাক্সি থামলো দরজায়। কর্ণেল মুখার্জি সবে উঠে এসেছেন বাগানে, পায়চারি করছেন লনে। সকালের শিশিরে খালিপায়ে বেড়ানো তাঁর অভ্যেস। গাড়ির শব্দে চকিত হ'য়ে তাকিয়েই অবাক হয়ে গেলেন 'একি। তুমি। আরে, প্রিয়নাথও যে? কী খবর?

'আপনি ভালো আছেন? তবে-তবে-যে উদ্বেগে মুখ চোখ শুকিয়ে গেছে অপর্ণার? কাছে এসে সে প্রণাম করলো। প্রিয়নাথবাবু বললেন 'কী কাণ্ড বলো দেখি? আমরাতো তোমার অসুখের খবর পেয়েই ছুটে এলুম। মেয়েতো কাল থেকে কেঁদে কেটে খুন।'

'আমার অসুখের খবর? কে বললো? নাতো?'

'ত্যাখোনা' পকেট থেকে একখানা আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম বার করলেন প্রিয়নাথবাবু।

'বাবার ভীষণ অসুখ। এখুনি চলে এসো।' অতীন।

কর্ণেল মুখার্জি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন টেলিগ্রামটীর দিকে তারপর মুখ তুলে মৃদু হেসে বললেন 'তাহলে যাও মা, যার অসুখ তাকেই দেখে এসো তাড়াতাড়ি।'

সকালের সূর্য লাল ছায়া ফেললো অপর্ণার নতমুখে।

দৃশ্যান্তর

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

খবরের কাগজটা জানালার ফাঁক দিয়ে আস্তে আস্তে গলিয়ে এসে মেঝেয় আছড়ে পড়লো। বাইরে সাইকেলের ঘন্টি বেজে উঠলো সুরেলা, মিষ্টি তালে। তারপর বাজতে বাজতে, সকালের ভিজে ভিজে হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে শব্দটা দূরে সরে গেল—গলির রাস্তায় মিলিয়ে গেল দূরে।

তন্দ্রা দেখলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে দ্রুত বিলীয়মান ঘণ্টির আওয়াজ শুনলো। কিন্তু খবরের কাগজটা তখুনি তুললো না। ওটা যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে থাকলো—তির্য্যক হয়ে, একটা ত্রিভুজের আকার নিয়ে।

হকার খবরের কাগজ দিয়ে যাবার অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠেছে তন্দ্রা। গলির রাস্তায় যখন হোস্ পাইপের জল ছড়িয়ে পড়ছে হিস্ হিস্ শব্দে, গঙ্গা-স্নানার্থী কোন্ এক হিন্দুস্থানী রোজকার মতোই রাম নাম জপতে জপতে চলেছে, তখুনি ঘুম ভেঙ্গেছে ওর। খুব ভোরেই ও ঘুম থেকে উঠেছে।

এখনো সমর উঠেনি। বিন্তি-তান্তুও ঘুমুচ্ছে অসাড় হয়ে। এখনো ওদের উঠবার সময় হয়নি।

রাত্তিরে নির্বিঘ্ন গাঢ় ঘুম হলে সকালে উঠা যায়। আর উঠে দেহমনও সজীব ঠেকে। কিন্তু রাত্তিরটা ঘুম ঘুম চোখে কাটালেও ঠিক ঘুমুতে পারেনি তন্দ্রা। একটা অস্থির আগ্রহ আর উৎকণ্ঠায় রাতটা কেটেছে ওর। মনের আনাচে কানাচে, মস্তিষ্কের স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা অবাক শিহরণ থেকে থেকে দোলা দিয়ে উঠেছে। এ-পাশ ও-পাশ করেছে বার বার, হাত-পাখা নিয়ে হাওয়া করেছে বিন্তি-তান্তুকে, উঠে কুঁজো থেকে গড়িয়ে জল খেয়েছে দু'বার। কিছুক্ষণ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থেকেছে বাইরের অন্ধকারের দিকে। তারপর আবার ফিরে এসেছে বিছানায়। সমরের ঘেমে-উঠা কপালে খানিকক্ষণ হাত বুলিয়ে শুয়ে পড়েছে আবার। এ-ভাবেই কতকগুলো অস্থির মুহূর্তের ভেতর দিয়ে রাতটা যে কি করে পার হয়ে গেল, টেরই পেল না ও।

তবু অতো ভোরে উঠেও রাত-জাগার কোন ক্লান্তি লাগছে না তন্দ্রার—না শরীরে, না মনে। বরং একটা অব্যক্ত খুশিতে ওর মন ভরে উঠছে। ভোরের এক চিল্‌তে হলদেটে রোদ জানালায় কপাটে লেপটে পড়লো, গলির রাস্তা আরেকটু জন মুখর হলো, ঝি এসে এঁটো বাসনগুলো নিয়ে গিয়ে বসলো কলতলায়। আর এ-ঘর থেকে ও ঘরে, ও ঘর থেকে বারান্দায় আবার বারান্দা থেকে এ-ঘরে অকারণ ব্যস্ততায় ঘুর ঘুর করলো তন্দ্রা। গুন গুন করে গানের কলিও আওড়ে ফেললো।

তারপর দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাতেই একটি তারিখের বিন্দুতে ওর চোখ দুটো আটকে রইলো। ২রা জুন আজ। এই তারিখটি জীবনে স্মরণীয় হয়েই থাকবে। আর কয়েকটি ঘণ্টা পেরোলেই আজ একটা সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতার আস্বাদ নেবে ও। এই প্রথম চাকরি—একটা নতুন জীবনই বুঝি।

ঘরের মেঝেয় রোদ এসে লুটিয়ে পড়েছে। সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে নিশ্চয়। অথচ সমর এখনো উঠলো না।

সরে এসে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে সমরের গায়ে কয়েকটা টোকা দিল তন্দ্রা। বললে, 'বাবা! কুম্ভকর্ণকেও হার মানাবে। এই, উঠো না!'

উঠে বসলো সমর। ঘুমের আমেজ তখনো ওর দু'চোখে লেগে রয়েছে। আরেকটু গড়িয়ে নিতে পারলে যেন ভালো হতো। একটা হাই তুলে বললে, 'ছাড়পোকা আর গরমের জন্যে রাত্তিরে ঘুমুতে পারলে তো!'

'সারা রাত জেগে বসেছিলে নাকি?'

'শুয়েই ছিলাম। শোয়া মানেই তো ঘুমুনো নয়। একদিকে ছাড়পোকা, আরেকদিকে গরম। কার বাপের সাধ্যি যে চোখ বুঁজবে।'

'কই, আমি তো টের পাইনি', একটা দম্‌কা হাসি চেপে ফেললো তন্দ্রা। বললে, 'তোষকটা তো রোজই রোদ্দুরে দিই, বিছানাপত্র রোজই ঝাড়ামোছা হয়। অতো ছাড়পোকা যে তবু কোত্থেকে আসে!'

'তক্তপোষ থেকে আসে, দেয়ালগুলো থেকেও আসতে পারে। কোন্ মান্ধাতা আমলের বাড়ি এটা।' আড়মোড়া ভেঙ্গে তক্তপোষ থেকে নামলো সমর। বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বললে, 'কদ্দিন থেকে ভাবছি, একটা ভাড়া-পাখা আনিয়ে নেব। হয়ে আর উঠছে কই? সেই কবে থেকে ঘরটা একটু চুনকাম করাবো করাবো করছি, তা-ও পেরে উঠলাম না। ও কাজটা তো আর বাড়িওয়ালা করবে না।'

তন্দ্রা বললে, 'হবে, একে একে ও-গুলো করে ফেলা যাবে এবার।'

কোন উত্তর না দিয়ে টুথ্‌ব্রাসে খানিকটা পেষ্ট্ মাখিয়ে নিয়ে বাথ্‌রুমের দিকে চলে গেল সমর। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে বললে, 'কই, একটু চা করো তাড়াতাড়ি। বাজারে বেরোতে হবে না? আজ থেকে তো তোমার আবার ইয়ে—' কথাটা অসমাপ্ত রেখে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো সমর।

তন্দ্রাও মুখ টিপে হাসলো। বললে, 'ইয়ে মানে? অমন হাসছো কেন?'

'খুশি হলে লোকে হাসে।'

'না, ওটা তোমার ঠাট্টার হাসি।'

'উহুঁ,' সমর সজোরে মাথা নাড়লো, 'এ্যাদ্দিন লোকে জানতো এ-বাড়ির কর্তা একজন। আজ থেকে জানবে দু'জন কর্তা। মানে, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই রোজগেরে।'

'ওতে হাসির কি আছে?' মুখ লাল হলো তন্দ্রার।

'বাঃ, হাসবো না? টাকা পয়সার স্বাচ্ছন্দ হবে—এতে ফুর্তি হয় না?'

কথা বললো না তন্দ্রা। উনুনে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে এলো।

আবার সমর বললে, 'কাগজটা কই? কাগজ দিয়ে যায়নি এখনো?'

মেঝের কোণে কাগজটা তখনো পড়েছিল। ওটা তুলে নিয়ে তন্দ্রা বললে, 'দিয়েছে, এই যে।'

কাগজটা হাতে নিয়ে সমর বললে, 'খুলেও ছাখোনি বুঝি।' একটু থেমে আবার বললে, 'ও, আজ থেকে তো তোমার এ্যাড্‌ভারটাইজ্‌মেন্ট্ কলম দেখার পর্বও শেষ।'

তন্দ্রাও খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'আমার চাকরি করা এখনো বাধছে তোমার। ঠিক কিনা, বলো।'

'সব স্বামীরই বাধে!' চশমাটা নাকের ওপর চেপে দিয়ে কাগজের দিকে স্থিরচোখে তাকালো সমর।

ওই একটি কথার কাঁচে তন্দ্রা পর পর অনেকগুলো ছবি, কথা আর দৃশ্যের প্রতিফলন দেখলো এই মুহূর্তে। গত বছর যখন প্রাইভেট্ বি-এ পাশ করলো, সমরই পড়িয়ে পাশ করালো, তখন তন্দ্রা বলেছিল—সংসারটার অভাব ঘুচাতে এবার সেও অংশীদার হবে। সমরের পাশাপাশি সে ও নেমে দাঁড়াবে জীবিকার ক্ষেত্রে। কিন্তু ও-কথায় মুখ গম্ভীর করে ফেলেছিল সমর। বলেছিল, মাষ্টারী কিংবা কেরাণীগিরির ঘানিটানা ছেলেদেরই পোষায়, মেয়েদের জীবনে ওটা ট্র্যাজিডি—জীবনটা একটা গন্ধহীন পাঁপড়ি-খসা ফুলের মতো হয়ে পড়ে আস্তে আস্তে। তাছাড়া, বিন্তি-তান্ত রয়েছে। এ-বয়সে ওরা স্বাভাবিক ম্যাটারনেল্ এ্যাফেক্‌শন্ না পেলে সুষ্ঠু মনোভাব নিয়ে কি করে গড়ে উঠবে?

আবেগের সঙ্গে যুক্তি মিশিয়ে যে-ভাবে কথা বলেছিল সমর, তার সামনে স্পষ্ট করে কথা বলবার সাহসও যেন ছিল না তন্দ্রার। তবু বলেছিল, 'কতো মেয়েই তো চাকরি করছে আজকাল।'

সমর উত্তর দিয়েছিল, 'হয় তাদের জীবনের ভূমিকা আলাদা, না হয় জীবনে তাদের কোথাও একটা মস্ত ফাঁক থেকে গেছে।'

'তার মানে, মেয়েরা অভাবের তাড়নায়, কিংবা দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে চাকরিতে আসেনা বলতে চাও?' তন্দ্রা যুক্তি দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছিল।

'তা-ও আসে, শতকরা পাঁচজন হবে হয়তো', একটু থেমে সমর বলেছিল, 'তাদের অবস্থা হয় সব চাইতে করুণ।'

'আমাকে তুমি নিরুৎসাহ করছো।'

'বাস্তবকে অস্বীকার করে উৎসাহ দেয়া যায় না।'

'অতো কষ্ট করে আমাকে বি-এ পাশ করালে—সেটা যদি কোন কাজেই না আসবে—'

'নিজের অধ্যবসায়ে পাশ করেছো,' কথার মাঝখানেই সমর বলে উঠেছিল, 'বি-এ পাশ করলেই চাকরি করতে হবে, এর কোন মানে নেই। লেখাপড়া নিজের তৃপ্তির জন্যে, মনের প্রসারতার জন্যে—মেয়েদের বেলায় আমি তা-ই মনে করি।'

'সংসারটা কেমন টানাটানির ভেতর দিয়ে চলছে, তুমি একা অতো পরিশ্রম করছো—'

'সুতরাং তোমার চাকরি নেয়া দরকার!'

'সেটা কি অন্যায়?'

'ন্যায়-অন্যায়ের কথা নয়, ওটা তোমার ইচ্ছে বলো।'

'তোমার ইচ্ছে বাদ দিয়ে আমার কোন ইচ্ছে আছে?' সমরের দিকে তাকিয়ে কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠেছিল তন্দ্রার, 'তোমার ইচ্ছে, আর আমার ইচ্ছে কি আলাদা?'

নিরুত্তর থেকেছিল সমর।

'বিন্তি-তান্ত ছাড়া, তুমি ছাড়া, আমার কোন অস্তিত্ব নেই', রুদ্ধ আবেগের ঢল নেমেছিল তন্দ্রার

কণ্ঠে. 'আমার চোখের সামনে তুমি খাটতে খাটতে শরীরের রক্ত জল করছো, আর আমার সেখানে কিছু করবার থাকলেও করতে পারবো না। একটু ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্যে চাকরি, আর কোন খেয়াল মেটানোর জন্যে চাকরি কি এক? তুমি জানো সব, বোঝ সব,—তবু আমাকে আঘাত দিয়ে কথা বলা স্বভাব তোমার।'

একেবারে নিঃশব্দ, নিঃশ্বাসও বোধহয় পড়ছিল না—এমনিভাবে বসেছিল সমর, তন্দ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে। একটু নড়েচড়ে, চেপে চেপে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলেছিল, 'আমি থাকতে তোমাকে চাকরি নিতে হবে, এ কোনদিন ভাবতে পারিনি তন্দ্রা।

কাছে সরে এসেছিল তন্দ্রা। সমরের পাশে বসে ওর একখানা হাত নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে ত্ব'মিনিট নির্বাক থেকেছিল। তারপর বলেছিল, 'তুমি না চাইলে আমি চাকরি করবো না।'

তন্দ্রাকে আরেকটু কাছে টেনে সমর বলেছিল, 'আমাদের আয় আরো বাড়ানো দরকার। সে জন্যে তুমি চাকরি নেবে এতে আমার নৈতিক সমর্থনই থাকা উচিত, আর তা আছেও। তবু, কষ্টের মুখে তোমাকে ছেড়ে দিতে মন চায় না, তন্দ্রা।'

'কষ্ট কিসের? ও-রকমভাবে তুমি কথা বলো না, লক্ষ্মীটি!'

সমরের বলিষ্ঠ বুকের তলায় তন্দ্রা নিবিড় হয়ে আসছিল। ওদের কারো মুখেই আর কথা ছিল না।

পরোক্ষ সম্মতি পেয়েই গিয়েছিল তন্দ্রা। তারপর একদিন এম্‌প্লয়মেণ্ট্ একচেঞ্জে গিয়ে নিজের নাম রেজস্ট্রী করিয়ে এসেছিল। ব্যাপারটা সমরের কাছে গোপন রেখেছিল ক'দিন। তারপর অবশ্য বলতেই হয়েছে, এম্‌প্লয়মেণ্ট একচেঞ্জ থেকে যখন পর পর ত্ব'খানা ইণ্টারভিউ লেটার এলো। আর আপত্তি জানায়নি সমর, কোন ক্ষোভও প্রকাশ করেনি, শুধু বলেছিল, 'ভালো অফার না পেলে একসেপ্ট করো না।'

চা তৈরী করতে করতে ওই পুরনো কথাগুলো পর পর মনের ছকে সাজালো তন্দ্রা। না, কোন তফাত নেই, খানিক আগে যে কথাটি বললে সমর, তা ওই পুরনো কথায় একটি নতুন সংযোগমাত্র। তার চাকরির ব্যাপারে আজো ঠিক তেমনি অনিচ্ছুক সমর। নইলে সে চাকরিতে জয়েন করতে যাবার এই পুর্ব মুহূর্তেও কি করে ও অমন একটি বলতে পারলো? 'সব স্বামীরই বাধে।' কথাটা বার বার যেন সূচের মতো হৃদয়ে বিঁধলো তন্দ্রার।

কিন্তু ও-প্রসঙ্গটা এই মুহূর্তে আর টেনে নিতে ইচ্ছে হলো না। ওতে পুরনো কথারই জের টানা হবে শুধু—আবার সেই থমথমে একটা আবহাওয়াই তৈরী হবে।

টি-পটে চা ভিজানো, পেয়ালায় চা-ঢালা সবকিছুই নিঃশব্দে সারলো তন্দ্রা। তারপর পেয়ালাটা সমরের সামনে এনে ধরলো।

চা-য়ে গোটাকয় চুমুক দিয়ে পেয়ালাটা রেখে দিল সমর। খবরের কাগজের দিকে চোখ রেখেই বললে, 'মনি-পিসি আগ্‌লে রাখতে পারবে ওদের? যা ত্বরন্ত ওরা!'

'না পারলেই বা উপায় কি?' সঙ্গে সঙ্গেই বলতে ইচ্ছে হলো তন্দ্রার। কিন্তু চেপে গেল। বললে, 'আমার চাইতে ওরা মনি-পিসিরই বেশী আব্দেরে হয়ে উঠেছে। এখন যদি আমি মরেও যাই, তবু বোধহয় ওদের কোন কষ্ট হবে না।'

খবরের কাগজখানা একদিকে সরিয়ে রেখে হেসে উঠলো সমর। বললে, 'সত্যি? মনি-পিসি যাত্ন জানে বলো!'

একটু হয়তো বাড়িয়ে বলেছে তন্দ্রা। নইলে কথাটা যে খাঁটি, মানতেই হয়। মাত্র দিনকতক হলো এখানে এসেছেন মনি-পিসি। অথচ এরি মধ্যে বিন্তি-তান্তু ওর অনুরক্ত হয়ে পড়েছে অস্বাভাবিক-রকম। ওদের খাওয়ানো, চান করানো, ত্বপুরে ঘুম পাড়ানো, এ-সমস্ত ব্যাপারে মনি-পিসি না হলেই যেন নয়। চাকরিটার জন্যে যেদিন ইণ্টারভিউ দিয়ে এলো তন্দ্রা সেদিন থেকেই ভাবনা স্থরু হয়েছিল সমরের। বিন্তি-তান্তুকে দেখাশোনা করতে পারে, ঠেকা-বেঠেকায় রান্নার কাজও চালিয়ে নিতে পারে এমন একজন লোক কোথায় পাওয়া যায়? শেষে তন্দ্রাই ওই মনি-পিসির কথা পেড়েছিল। ওঁর তো তিনকূলে কেউ নেই, কোন এক মাস্‌তুতো না কি-রকম এক ভাইয়ের কাঁধে অবাঞ্ছিত বোঝা হয়ে পড়ে আছেন। ওঁকে নিয়ে এলে কেমন হয়? কথাটা খুবই মনে ধরেছিল সমরের। তাই এখানে মনি-পিসির আগমন।

সমরের হাসিমুখ দেখে তন্দ্রার বুকের ওপর থেকে একটা পাথর সরে গেল। বললে, 'শুধু ত্বপুরটা তো। ত্বপুরে ওদের ঘুমুনো অভ্যাস হয়ে গেছে। বিকেল নাগাদ তো আমি এসেই পড়বো।'

'ভাগ্যিস্ মনি-পিসিকে পেয়েছিলাম,' উঠে জামা গায়ে চড়িয়ে সমর বললে, 'কই, বাজারের থলেটা দাও।'

দেখতে দেখতে যেন বয়ে গেল সময়গুলো। এই তো সবে ঘুম থেকে উঠলো। হকারের কাগজ দিয়ে যাওয়া, সমরের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলা, আর বিন্তি-তান্তুকে সকালবেলার জলখাবার খাওয়ানো—এরিমধ্যে কিনা এতোটা বেলা হয়ে গেল। দেওয়াল-আলমারির কোণে টাইম-পিস্‌টায় ঠিক সাড়ে আটটা। সময় নেই আর—দেরী করা চলে না আর। কতো কাজ বাকী এখনো—কতো কাজ যে সেরে নিতে হবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। বুকের ভেতরটা কি একটু ঢিপ ঢিপ করে উঠলো? বিন্তি-তান্তুকে চান করাতে করাতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো তন্দ্রা। কিন্তু পরক্ষণেই হাত চললো তার, একটা আশ্চর্য ক্ষিপ্রবেগ নেমে এলো হাত আর পায়ে।

রান্নাটা আজ মনি-পিসিই করছে। একসময় রান্নাঘরে একটু উঁকি দিয়ে এদিকের ঘরে এসে ঢুকেই সমর দাঁড়িয়ে পড়লো। একখানা ধপ্‌ধপে তোয়ালে দিয়ে বিন্তি-তান্তুর গা মুছিয়ে দিচ্ছে তন্দ্রা। গা মুছিয়ে ইস্ত্রিকরা জামা-প্যাণ্ট পরালো ওদের। তারপর মাথার চুলে চিরুনি চালিয়ে চুলগুলো বিন্যস্ত করলো, মুখে মাখানো পাউডার। ফিটফাট চেহারা করে ফেললো ওদের।

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলো সমর। তারপর বললে, 'তুমি চান করলে না?'

ঘাড় ফিরিয়ে তন্দ্রা বললে, 'এই করছি।'

চান, খাওয়া, তারপর সেজেগুজে তৈরী হওয়া। বেশী সময় নেই আর হাতে। তন্দ্রা ক্ষিপ্রতর হলো।

পাশাপাশি বসে একই সময়ে আজ খেয়ে নিল ওরা ত্ব'জনে। বিন্তি-তান্তুকে তন্দ্রা সঙ্গে করে বসিয়ে খাইয়ে দিল। পরিবেশন করলেন মনি-পিসি। তারপর ত্ব'জনের তৈরী হয়ে নিতে আরো কয়েকমিনিট। ঘড়ির কাঁটায় তখন ন'টা।

এবার বেরিয়ে পড়তে হয়। চাকরিতে জয়েনিং ডেট্ আজ তন্দ্রার। অফিস-এ্যাটেনডেন্স নিয়ম-মাফিক দশটায় হলেও আজ একটু আগে গিয়েই ওর পৌছনো উচিত, সমর ভাবলো। ওকে অফিসে পৌছে দিয়ে ওখান থেকেই সে স্কুলের দিকে রওনা হবে। তার তো স্কুল-মাষ্টারী, এগারোটায় পৌছলেও চলবে।

কিন্তু সমর তাড়া দেবার আগেই তন্দ্রা এসে দাঁড়ালো সামনে হাসিতে উজ্জ্বল ওর মুখ। পাউডারের মিহি প্রলেপ মুখে মাখালেও বেমানান মনে হয় না, বরং একটা স্নিগ্ধ দীপ্তি ফুটে উঠেছে চোখে-মুখে। পরণে একখনা ছাপা-শাড়ী, দু'হাতে সরু চুড়ি দু'গাছা। বিমুগ্ধের মতোই ওর দিকে তাকিয়ে রইলো সমর। সাত বছর আগেকার একটি ছবি—ঠিক সেই তন্দ্রা, ফুল-শয্যার রাতে যার মুখখানা আলতো ভাবে কাছে টেনে সমর বলেছিল—'তুমি ত্ব ভিঞ্চির-মডেল'—সেই মুখ, সেই তন্দ্রা!

'কি দেখছো অমন করে?' তন্দ্রা হেসে ফেললো, 'রাক্ষসের মতো তাকানো হচ্ছে।'

'এতোক্ষণে হলো তোমার?' সমর পাঞ্জাবীর বোতাম আঁটতে তৎপর হলো।

'আমার তো কখনই হয়েছে, তুমিই তৈরী হওনি।'

সে-কথার উত্তর না দিয়ে সমর জিজ্ঞেস করলো, কাগজপত্র সব নিয়েছো তো?'

'নিয়েছি।'

'মেডিকেল ফিটনেস্ সার্টিফিকেট?'

'হুঁ।'

বেরোবার আগে মনি-পিসিকে আবার একবার দুপুরের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিল তন্দ্রা। বিন্তি-তাস্তু যেন ঘরের বার না হয় কিছুতেই। সাত-কথা বলে ঘুম পাড়ানো চাই ওদের, খিদে পেলে দুধ-পাউরুটি দিতে হবে। আর না ঘুমুলে গল্পসল্প করে, খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে হবে। ওরা যেন তার অনুপস্থিতি বুঝে কান্নাকাটি না করে। এসব উপদেশ-নির্দেশ হয়তো বাহুল্যমাত্র। কেননা, ওদের সবরকম ঝক্কি-ঝামেলাই তো এরিমধ্যে, মনি-পিসির ওপর বর্তে গেছে। তবু কেমন খুঁতখুঁত ঠেকে তন্দ্রার—তার অনুপস্থিতিতে ওদের সামলে রাখা সম্ভবপর হবে কি মনি-পিসির?

বেরোবার মুখেই ছ'বছরের বিন্তি দাবীপেশ করলো, 'আমি যাবো মা।'

দেখাদেখি চার-বছরের তান্তুও পথ আগলে দাঁড়ালো, 'আমি যাবো।'

ওদের মুখে চুমো খেয়ে তন্দ্রা বললে, 'যাবে বৈকি! এইতো একটু বাদেই আমি আসছি। আমি এসে তোমাদের নিয়ে বেড়াতে বেরোবো। তোমরা ততক্ষণে মনি-পিসির সঙ্গে খেলা করো। দুষ্টমি করো না কিন্তু।'

মনি-পিসি পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তান্তুকে কোলে নিয়ে বিন্তির হাত ধরলেন তিনি। বললেন, 'এসো, ভারী মজার গল্প বলবো একটা।'

সমর বললে, 'এই এ্যাত্তো, এ্যাত্তো চকোলেট লজেন্স নিয়ে আসবো, যদি চুপটি করে মনি-পিসির গল্প শোনো।'

আর ঝামেলা বাধালো না বিন্তি-তান্তু। ওদের আশ্বস্ত করা গেল।

দু'পা আগে সমর। আর পেছনে পেছনে তন্দ্রা। বাড়ির সামনেকার ছোট্ট চত্বরটা

পেরিয়ে এলো ওরা। তারপর গলির রাস্তায় পড়ে হাঁটতে লাগলো পাশাপাশি। কিন্তু দু'জনেই নির্বাক। কপালে বার কয়েক রুমাল চাপলো তন্দ্রা, ঘাম, বড্ড বেশী ঘাম বেরুচ্ছে। এইটুকু হেঁটেই বুকটা ধুক ধুক করছে কেমন। অথচ রোদের তাপ তো ততোটা কড়া নয়। আর সমর হাঁটছে মাথা নিচু করে, কোনদিকে না তাকিয়ে, রাস্তার দোকান-পাট, লোকজন কোন কিছুরই যেন অস্তিত্ব নেই ওর কাছে দু'চোখের সীমানায় আটকে-থাকা হাঁটবার রাস্তাটুকু ছাড়া। ওর দিকে কয়েকবারই তাকালো তন্দ্রা, কিছু বলবে বলে ঠোঁটও নাড়লো। কিন্তু বলতে পারলো কিছুই।

বাস ষ্টপ্। একটা বৃত্তাকার ভিড় জমে উঠেছে—অফিসযাত্রীর ভিড়। সমরের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে অপাঙ্গে একবার সবার দিকে তাকিয়ে নিল তন্দ্রা। এরা বোধহয় এ-পাড়ারই সবাই। আর ওই যে দু'টি মেয়ে, ওদের তো চেনা-চেনাই ঠেক্ছে—এদিকেই কোথায় থাকে যেন। ওরা দু'জনে কি এক অফিসেই কাজ করে? না, না, তা হতে যাবে কেন। কি জানি হতেও পারে।

'এই যে এইটেতে উঠো, এই বাঁধো!'

সমরের কথায় যেন চমকে উঠলো তন্দ্রা। আর সঙ্গে সঙ্গেই ওর পেছনে এগিয়ে গিয়ে বাসের হ্যাণ্ডেল্ ধরলো। যা ভিড়, গা বাঁচিয়ে আর কি করে উঠা যায়? অফিস টাইমের ট্রাম-বাসে গা ছোঁয়াছুঁয়ি হয়েই থাকে। কিন্তু ভিড়ের চাপে মুখটা যেভাবে ঘেমে উঠলো তাতে হয়তো পাউডার গলে গিয়ে কি বিশ্রী দেখাচ্ছে। বিন্যস্ত শাড়ীটার ভাঁজগুলোও হয়তো অক্ষুন্ন নেই।

তবু রক্ষে, বাসটা আর বেশী ষ্টপ্ ধরলো না। প্রশস্ত সেণ্ট্রাল এভিনিউ, বৌবাজারের মোড়, লালবাজার—তারপরেই ড্যাল্হৌসী।

লোক আর লোক, দশটার ড্যাল্হৌসী লোকারণ্য। প্রতিটি ট্রাম-বাস থেকে স্রোতের মতো লোক বেরিয়ে আসছে। বাস থেকে নেমে ডানদিকের ফুটপাথে এসে উঠলো সমর আর তন্দ্রা। একটু এগিয়েই নির্জন-নিঃশব্দ গির্জাটা চোখে পড়লো। তন্দ্রার মনে হলো, আফিস-কাছারীর ড্যাল্হৌসীতে এই গির্জাটা একেবারে ব্যতিক্রম, স্বতন্ত্র।

হাঁটতে হাঁটতে সমর বললে, 'অফিস থেকে একা ফিরতে পারবে তো?'

তন্দ্রা বললে, 'কেন পারবো না।'

একটু চুপ করে থেকে সমর বললে, 'তুমি বরং অফিস ছুটির পর ওই লিম্প্টনের দোকানটার কাছে এসে অপেক্ষা করো। আমি স্কুল থেকে বেরিয়েই চলে আসবো।'

'নিশ্চিন্ত হতে পারছো না বুঝি।' তন্দ্রা হাসলো।

'কি করে পারবো, এই ভিড়ে যদি হারিয়ে যাও।'

'ইচ্ছে করে, অন্য কারো সঙ্গে যদি হারিয়ে যাই?'

'সে-ভয়ও কম নয়।' চাপা হাসিতে তন্দ্রার দিকে কটাক্ষ করলো সমর।

সাত-আট মিনিট হেঁটেই অফিসের সামনে গিয়ে পৌছলো ওরা। বাদামী রঙের তে-তলা দালান। একজন দু'জন করে লোক ঢুকছে অফিসে। আর, তন্দ্রার ঠিক পাশ কাটিয়েই একটি মেয়ে এগিয়ে গেল। সেই মেয়েটি না, যার সঙ্গে ইণ্টারভিউর দিন দেখা হয়েছিল? ওর মুখ স্পষ্ট দেখা গেল না, তবু তন্দ্রার মনে হলো সেই মেয়েটি না হয়েই যায় না। ও-ও বোধহয় এ্যাপয়েন্টমেণ্ট্ পেয়ে গেছে।

গেট পেরিয়ে লিফটের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আবার সমর বললে, 'ওপরেই তো অফিস তোমাদের।'

তন্দ্রা বললে, 'হুঁ, তে-তলায়।'

'আমি এখন চলি তা'হলে।'

'আচ্ছা।'

লিফ্‌টে গিয়ে উঠলো তন্দ্রা। তিনজন পুরুষের মাঝে দাঁড়িয়ে তুমুল অস্বাচ্ছন্দ বোধ করলো। কপালে ঘাম, ঠোঁটে-চিবুকেও ঘামের ঝরনা নামলো আবার। রুমাল দিয়ে ঘাম মুছে নেবে তারও উপায় নেই। লিফট নড়ে উঠলো। আরেকবার বাইরে তাকাতে চেষ্টা করলো তন্দ্রা। না, সমরকে দেখা যায় না আর।

অফিসে প্রথম দিন। তেতলার কড়িডোর বেকে হেড্‌কোয়াটার্স রুম। সেখানে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট্ লেটার দাখিল করে জয়েনিঙ্ রিপোর্ট পেশ করতে হলো। তারপর অফিস স্থপারিণ্টেডেণ্ট্ ওর সঙ্গে একজন পিয়ন দিয়ে কি যেন নির্দেশ দিলেন। পিয়নের সঙ্গে সঙ্গে আবার দোতলা। দোতলার কোণে একটি অফিস-ঘরে পিয়ন নিয়ে এলো ওকে। এই-ই ওর অফিস ঘর—এখানেই পোষ্টেড ও।

চার চারটে ব্র্যাঞ্চ নিয়ে এই বিভাগীয় সাব অফিস। সমস্ত মেঝেটা যেন চারটি অক্ষরেখার সীমানায় নির্দিষ্ট। ডানদিকে একাউণ্টস্, বাঁ দিকে এষ্টাব্লিশমেণ্ট্, আর মুখোমুখি মাঝে কয়েক হাত ব্যবধান রেখে একদিকে জেনারেল আরেকদিকে এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটিভ্ ব্র্যাঞ্চ। স্থবিন্যস্ত টেবিল চেয়ার আর অনুচ্চ রেক-ভর্তি ফাইলের স্তূপে প্রত্যেকটি ব্র্যাঞ্চের চেহারা একই-রকম। মাথার উপর ঘূর্ণমান ফ্যান্, আর ডিস্‌টেম্পার্ড নিয়ন লাইটের ফিকে-নীল দীপ্তি।

একাউণ্টস্ ব্র্যাঞ্চেই নিযুক্ত হলো তন্দ্রা। হেড্ ক্লার্ক তা-ই নির্দেশ দিলেন। কলিং বেল টেপার সঙ্গে সঙ্গে ডাকলেন, 'মিঃ চৌধুরী !'

একাউণ্ট্‌সের ইন্-চার্জ মিঃ চৌধুরী এসে দাঁড়ালেন।

'ইনি আপনাদের ব্র্যাঞ্চে কাজ করবেন। আপনাদের না একটি হ্যাণ্ড সর্ট ছিল ?'

'আস্থন আমার সঙ্গে।' মিঃ চৌধুরী তন্দ্রার দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ, এঁর সঙ্গে যান। উনিই সব কাজ-কর্ম দেখিয়ে দেবেন আপনাকে।' ফাইলের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হেড্-ক্লার্ক বললেন।

মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে গিয়ে টেবিলের পেছন দিককার একটি চেয়ারে বসলো তন্দ্রা।

'ওখানেই বসবেন আপনি', মিঃ চৌধুরী সস্মিত মুখে বললেন', ওটাই আপনার সীট।'

তন্দ্রা ঘাড় নাড়লো শুধু।

'ছু'একটা ফাইল দিচ্ছি,' উঠে দাঁড়িয়ে রেক থেকে কয়েকটা ফাইল বেছে নিলেন মিঃ চৌধুরী। ফাইলগুলো তন্দ্রার টেবিলে রেখে বললেল, 'এগুলো দেখুন, কাজের স্পেসিমেন্ আর কি !'

আলতোভাবে একটা ফাইল কাছে টেনে নিল তন্দ্রা।

'মানে, একটু নাড়াচাড়া করবেন আর কি। কয়েকদিন পুরনো ফাইল ষ্টাডি করা দরকার।'

মিঃ চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে এবার একটু অপ্রতিভ হসি হাসলো তন্দ্রা।

কিন্তু ফাইলের দিকে চোখ ছুটো নিবদ্ধ রেখেও মাঝে মাঝে চারিদিকে তাকাতে লাগলো তন্দ্রা, লুকিয়ে তাকানোর মতো। মাথার উপরে ফ্যান, যেন ঝড়ো হাওয়ার ঝাপ্‌টা। তবু ঘাম চিকিয়ে উঠেছে কপালে, চিবুকে। রুমালটা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বার করবে নাকি ? কিন্তু দৃষ্টিকটু ঠেকবে যে তা'হলে, অশোভন মনে হবে হয়তো। অফিসে ঢুকে একঘর পুরুষ চোখে পড়তেই একটা জড়োসড়োভাব যেন জাপটে ধরেছে ওকে। আর এখন, টেবিলের কোণে এই চেয়ারে বসে যখন ও ফাইল দেখছে, তখনো কমপক্ষে এক ডজন পুরুষের চোখ কি ওর দিকে তাকিয়ে নেই ? নিশ্চয় আছে। ছু' একটি চাপা মন্তব্য ইতিমধ্যেই কানে এসেছে। মন্তব্যের উপলক্ষ ও ছাড়া আর কে হতে পারে ? ডানদিকের ব্রাঞ্চে ওই যে ছু'জন পরস্পর কথা বলছে, আর হাসির ঢেকুর তুলছে, তার মানে কি ?

এতোক্ষণ লক্ষ্য করেনি, ঘাড় বাঁকিয়ে পুব দিকে তাকাতেই দেখা গেল একটি মেয়েও রয়েছে এ-অফিসে, জেনারেল ব্র্যাঞ্চে। আশ্চর্য, ওকে এতোক্ষণ নজরে পড়েনি। কিন্তু অফিস গেটের সামনে দেখা সেই মেয়েটি তো নয়। অন্য আরেকটি মেয়ে। দোহারা চেহারা, বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু অবাক লাগলো তন্দ্রার, ও একবারটিও তার দিকে তাকালো না, এসে একটু আলাপ পর্যন্ত না। একঘর পুরুষের মাঝে ও দিব্যি কাজ করতে পারছে—জড়তা নেই, আড়ষ্টতা নেই। খুব বেশী কাজ বাকি ওর ? কাজের চাপ থাকলেও একবার সময় করে কি তন্দ্রার কাছে আসতে পারতো না ? অফিসে নতুন একটি মেয়ে এলো, শুধু সহকর্মি নয় সহমর্মিও, আর তার সঙ্গে এসে কথা বলবার সৌজন্যতাটুকুও ও দেখালো না। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে একটু ক্ষুব্ধ হলো তন্দ্রা।

একটা ছেড়ে আরেকটা ফাইল অন্যমনস্কভাবে নাড়াচড়া করতে লাগলো। দেয়াল ঘড়িতে বারোটা। পাঁচটার অনেক অ-নে-ক, দেরী এখনো। বিন্তি-তান্ত কি করছে এখন। ছু'জনায় মিলে কান্না জুড়েছে নাকি ? একসঙ্গে এতোটা সময় ওরা মাকে ছেড়ে থাকেনি তো। কিন্তু মনি পিশি আছেন, তা-ই যা একটু ভরসা। সমর কি ভাবছে এখন ? রোজকার মতো ও আজ ছাত্রদের পড়াতে পারছে ? লিফ্‌টে তুলে দেবার সময় ওর মুখখানা যেন অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল, এক ফালি মেঘ নেমে এসেছিল মুখে। তন্দ্রার তা-ই মনে হয়েছে। কি ভাবতে ভাবতে ও চলে গেল স্কুলের দিকে ? বোঝা যায় না, ওকে বোঝা যায় না সবসময়। ওর মনের গভীরে কি আছে না আছে তা আজো, এই সাত বছর পাশাপাশি থেকেও ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না তন্দ্রা গাম্ভীর্যের ভান পাওয়া যায়, মানে করা যায়, কিন্তু গভীরতার তল কোথায় ?

'আপনি একাউণ্ট্‌সে এলেন ?'

ঘাড় ফিরিয়ে তন্দ্রা দেখলো, জেনারেল ব্র্যাঞ্চের সেই মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে।

কিছু বলবার আগেই মেয়েটি চেয়ার টেনে বসে পড়লো। বললে. 'এই নতুন ব্যাচের রিক্রুট্ বুঝি আপনি।'

আড়ষ্টতা ঘুচাতে চেষ্টা করলো তন্দ্রা। বললে, 'হ্যাঁ, আজই জয়েন করলাম।'

মেয়েটি বললে, 'চারজন মেয়ে এই নতুন ব্যাচে রিক্রুট্ হয়েছে, আমি খবর নিয়েছি। আর তিনজন বোধহয় হেড-কোয়াটার্স অফিসে কিংবা সার্কেল অফিসে পোষ্টেড্।'

চুপ করে থেকে ওর কথাগুলো শুনলো তন্দ্রা।

'এই প্রথম চাকরি আপনার ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি এখানে আজ পাঁচ বছর চাকরী করছি,' মাথা দুলিয়ে কেমন একটা ক্লান্ত হাসি মুখে আনলো মেয়েটি, 'ওর আগে কাজ করতাম একটা মার্চেন্ট অফিসে—ষ্টেনো টাইপিষ্ট্। বছরখানেক ছিলাম ওখানে।'

'ও-কাজটা কেন ছাড়লেন ?' শিশু-সুলভ প্রশ্ন করলো তন্দ্রা।

'ছাড়িনি, ছাড়িয়ে দিলে—ছাটাইয়ের কবলে পড়েছিলাম।'

স্তব্ধ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো তন্দ্রা।

'আপনার নাম কিন্তু জানা হলো না ভাই,' মেয়েটি হাসলো আবার। ওর চোয়াল জেগে ওঠা বিশীর্ণ মুখে হাসিটা যেন পাণ্ডুর চাঁদের একছিটে ছোঁয়াচ্। একটু থেমে বললে, 'নাম জানাজানিটা সেরে নিই আগে, নইলে আলাপ জমে না। কি বলুন ?'

তন্দ্রা সলজ্জ হাসি হাসলো। খুলে যাওয়া ফাইল বাইণ্ডার স্থানস্থ করলো।

টেবিলে কনুইয়ের ভর রেখে মেয়েটি বললে, 'আমার নাম যূথিকা বর্ধন। আপনার ?'

'তন্দ্রা বোস।'

'গ্রাজুয়েট নিশ্চয়।'

'হুঁ।'

'গ্রাজুয়েট ছাড়া তো এখন আর এই ব্রাঞ্চে রিক্রুট করে না। অথচ রুল অনুসারে ম্যাট্রিকুলেটই এই কেরানীগিরিতে নেবার কথা।'

'আপনি—'

'আমি ভাই ম্যাট্রিকুলেট্,' তন্দ্রার কথা যেন ছোঁ মেরে কেড়ে নিল যূথিকা। ভাঙ্গাগালে সেই করুণ হাসির গোটা কয় রেখা তুলে বললে, 'পাঁচ বছর আগে ঢুকেছি কিনা তখন ম্যাট্রিকুলেটই নিত। শান্তিনিকেতন থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেই চাকরির পেছনে ধাওয়া করেছি।'

'আপনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন ?'

'হ্যাঁ, সেই ছেলেবেলা থেকেই আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্রী।' যূথিকার কথায় গর্ব্বের ঝাঁজ।

টাইপ ব্র্যাঞ্চে অবিরাম খটাখট্ শব্দ। দুটি ছেলে অক্লান্তভাবে টাইপ রাইটারে আঙুল চালিয়ে যাচ্ছে। টাপ-ব্র্যাঞ্চের পেছনে খানিকটা দূরে স্থইং-ডোর লাগানো অফিসারের কামরা, একদিকে কাঠ-বোর্ডে অফিসারের পদবী, আরেকদিকে ইলেকৃট্রিক কলিং বেল। যতোবার বেল বাজলো, ততোবার একটি পিয়ন ছুটে এলো এদিকে—ক্লার্ক কনসার্ণড্‌কে সাহেব সেলাম দিয়েছেন। চাপা-গুঞ্জন, কখনো কখনো হেড-ক্লার্কের উচ্চ গম্ভীর কণ্ঠস্বর, কারো শ্লেষাত্মক উক্তিতে চাপা বিক্ষোভ বিতৃষ্ণা। টেবিলে ফাইল, রেক-ভর্তি ফাইল। আর একেকটি টেবিলে ফাইল-নিরত একেকজন ক্লার্ক। অফিসের প্রাণস্রোত বয়ে চলেছে—কাজের পুরো মরশুম অফিসে।

ঘড়ির কাঁটায় বারোটা চল্লিশ। দাঁড়িয়ে উঠে যূথিকা বললে, 'টিফিন আওয়ারে উপরে নিয়ে যাবো আপনাকে। ক্লাবে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দোব।'

দেড়টা থেকে দুটো, আধ-ঘণ্টা টিফিন পিরিয়ড। দেড়টা বাজতেই যূথিকা এসে দাঁড়ালো আবার। বললে, 'চলুন।'

আজই অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে গিয়ে আলাপ করতে বাধ বাধ ঠেকছিল তন্দ্রার। আস্তে আস্তে আলাপ-পরিচয় হবে, সেটাই তো ভাল। যূথিকার প্রস্তাবে তাই ও স্পষ্ট সম্মতি জানায়নি, আবার অসম্মতিও জানাতে পারেনি।

ওর ইতস্তত ভাব দেখে যূথিকা বললে, 'উঠুন ভাই উঠুন। এসেই একেবারে পাকা কেরানী বনে গেলেন ?'

তারপর আর এক সেকেণ্ড ও বসে থাকা অভদ্রতা।

ক্লাব-ঘর তেতলায়। একদিকে ছেলেদের ক্লাব, আরেকদিকে মেয়েদের। মাঝে মাথা সমান উঁচু একটা কাঠের পার্টিশন শুধু ব্যবধানের নিশানা। ছেলেদের কলহাস্য, চীৎকার, পার্টিশন উপচে পড়া কারো কারো উৎসুক দৃষ্টি অবাধে এদিকে আসে, আর মেয়েদের কথার কাকলি কিংবা হাসির টুং টাং ওদিকে পৌছায়। মেয়েদেরটা শুধু নামেই ক্লাব। কেননা, চার হাত পরিধির এই খুপরিতে না আছে খবরের কাগজ, জর্ণালস্, না পিং পং কিংবা বই-পত্রের আলমারি। ওগুলো সব ছেলেদের ওখানে—ওসব দেখতে হলে ওখানে গিয়েই দেখতে হয়। এখানে থাকবার মধ্যে আছে শুধু একসেট ক্যারাম, এক প্যাকেট তাস, আর লম্বা একটা টেবিলের চারদিকে খানকতক চেয়ার। একটু স্বতন্ত্র জায়গা, যেখানে মেয়েরা একসঙ্গে বসতে পারে, ক্যান্টিন্ থেকে খাবার আনিয়ে খেতে পারে, তারই ব্যাবস্থা শুধু।

যূথিকার সঙ্গে পা টিপে টিপে ক্লাব-ঘরে ঢুকলো তন্দ্রা।

একদল মেয়ে নয়, সব মিলিয়ে কয়েকজন মাত্র। সার্কেল অফিস আর হেড্ কোয়াটার্স অফিসের কয়েটি মেয়ে। তন্দ্রা তাকালো। এখানেও সেই মেয়েটি নেই—অফিস গেটের সামনে দেখা সেই মেয়েটি।

ওদের সঙ্গে যূথিকাই তন্দ্রার আলাপ করিয়ে দিল। গতানুগতিক দু'চারটি কথার পরিধিতেই আলাপটা নিষ্পন্ন হতে চলেছিল। কিন্তু করবী ঘোষ, স্মার্ট গার্ল বলে যে পরিচিতি পেয়েছে এ-অফিসে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে, নীরস কথার রসের সঞ্চার করলো কয়েক মুহূর্তে।

ক্যান্টিন বয়কে চা-ওমলেটের অর্ডার দিয়ে তন্দ্রার পাশটিতে এসে বসলো করবী। লালচে ঠোঁটের ফাঁকে একসার বরফ-সাদা দাঁতের ঝিলিক তুলে বললে, 'আমি ভাই আপনি টাপনি বলতে পারবো না কিন্তু। তুমিই বলবো, কেমন ?'

স্প্রিং-এর পুতুলের মতো তন্দ্রা ঘার নাড়লো। অর্থহীন হাসি জীইয়ে রাখলো মুখে।

আবার করবী, 'কেননা, মেয়েদের মধ্যে আমিই সব চাইতে বড়—বয়সে, চাকরির অভিজ্ঞতায়—'

ভ্রূ-কুঁচকে শ্বেতা বলে উঠলো, 'এবং আরো একটি দিকে দিয়ে।'

'মানে ?' আরেকটি মেয়ের মন্তব্য।

'রূপে !' খিল খিল করে হেসে উঠলো শ্বেতা।

হাসি, হাসি, এক পশলা হাসির বৃষ্টি ঝরলো সারা ঘরটিতে।

করবী প্রতিবাদ করে উঠলো, 'এই, কি সব ফাজলামো হচ্ছে !'

'ফাজ্‌লামো কিসের ?' চোখ টান করলো শ্বেতা। তারপর তন্দ্রাকেই সাক্ষী মেনে বসলো, 'আচ্ছা, উনিই বলুন, উনি তো একেবারে নতুন।'

এবার যুথিকা বললে, 'আহা, তুমি চটছো কেন করবী ? তোমার রূপ আছে বলেই না শ্বেতা একটু জেলাস্।'

'রূপ, রূপ না ছাই।' পিরামিড ডিজাইন ভ্যানিটি-ব্যাগে নখের আঁচড় কাটলো করবী। মাথা দোলাতে দোলাতে বললে, 'কলম পিষে আর চেহারা থাকে ?'

শ্বেতা বললে, 'সেইটেই তো অবাক লাগে আমোদের। দিন দিন কেমন শ্রীময়ী হয়ে উঠছো।'

'হুঁ উঠছি' করবী প্রত্যুত্তর দিল, 'শ্রী-র আগে একটি বি উপসর্গ নিয়ে, মানে বিশ্রী।'

আবার হাসি। হাসির তুফান এবার। কথাটায় তন্দ্রাও না হেসে পারলো না।

এরপর তন্দ্রার দিকেই দৃষ্টিক্ষেপ করলো করবী। বললে, 'ম্যারেড লাইফে চাকরি করতে আসা একটা দুঃসাহসের ব্যাপার।'

'কেন ?' তন্দ্রার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।

'ঘরের নানান ঝামেলা তো আছেই, কাচ্চা-বাচ্চা থাক্‌লে আরো বিপদ। আপনার চিলড্রেন্ নেই ?'

'আছে।'

'কটি ?'

'এক ছেলে, এক মেয়ে।'

একটু চুপ করে থেকে আবার দাঁতের ঝিলিক তুললো করবী, 'আপনার হাজ্‌ব্যাণ্ড্ ভাই, বেশ প্রোগ্রেসিভ্ বলতে হবে !'

উত্তর দেবে কি, ওর দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলো তন্দ্রা, লুকিয়ে কোন ছেলের দিকে তাকানোর মতো। সুশ্রীই বটে করবী। লম্বাটে আঁটসাট গড়ন, ত্রিপট ফর্সা। চেহারায় কথায় একটা ধারালো দীপ্তি রয়েছে। বয়সের ছাপ ঢাকা পড়ে গেছে স্বাস্থ্যের প্রখরতায়। তাই বয়স ঠিক আন্দাজ করা যায় না। তবে ত্রিশ না পেরোলেও, ত্রিশের কাছাকাছি। কেমন একটা পুরুষ পুরুষ ভাব কথায়, যা তার কাছে নিতান্ত শ্রুতিকটু ঠেকলো।

তাই ক্লাব-ঘর ছেড়ে যখন আবার অফিসের সীটে এসে বসলো তন্দ্রা তখনও করবী ঘোষ ওর মন দখল করে রইলো। করবী ঘোষ আর শ্বেতা সেন—কেমন যেন মুখর আর প্রগল্‌ভ ওরা। যুথিকাও কি খানিকটা তা-ই ?

ফাইলের একেকটা পুরনো চিঠি পড়ি কি পড়ি না করেই উল্টে যেতে লাগলো তন্দ্রা। আর ওকে ফাঁকি দিয়ে দেয়ালের পেণ্ডুলাম-ঘড়ি সময়ের দাগ কাটতে লাগলো।

চারটে চল্লিশ। যুথিকা চেয়ার ছেড়ে উঠলো। উঠে একগোছা চাবি হাতে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো একটা আলমারির সামনে। আলমারি খুলে এক তাকে রাখলো কতকগুলো পিন-কুশন, নিবের বাক্স, আর পেন হোল্ডার। আরেক তাকে কতকগুলো ড্রাফ্‌ট-প্যাড, ব্লটিং পেপার। একটু ঝুঁকে নিচের তাকে একের পর এক সাজালো কতকগুলো খাতা-রেজিষ্টার। আফিসের ষ্টেশনারী জিনিস এগুলো—

একমাসের বরাদ্দ। জিনিসগুলো সযত্ন-সতর্কতায় গুছিয়ে রাখলো যুথিকা, ঘরের জিনিস গুছিয়ে রাখার মতো। আলমারির কপাট এঁটে টেনে টেনে দেখলো একটু, চাবিটা কি লেগেছে কিনা। তারপর তন্দ্রার কাছে এসে দাঁড়ালো।

'আপনি সত্যি, এফিসিয়েণ্ট ক্লার্ক হতে পারবেন।'

ফাইল থেকে চোখ তুললো তন্দ্রা।

'চলুন, পাঁচটা বাজে যে।

এতোক্ষণ, সেই দশটা থেকে যে বোবা বিস্ময় নিয়ে অফিসের কার্যকলাপ দেখছিল তন্দ্রা তা যেন যুথিকার ওই কথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল। কিন্তু যুথিকার সঙ্গেই ও বেরোবে কি করে ? পাঁচটা বাজতে এখনো আট মিনিট বাকী। লিম্পটনের তলায় সমর এসে পৌঁছে গেছে কি ? যুথিকাকে এড়াতে চাইলো ও। বললে, 'আমি একটু পরে বেরুচ্ছি।'

৪

চাকরির প্রথম দিন শুধু বিস্ময়ই দিয়েছিল, আর চাকরির প্রথম মাসের মাইনে এনে দিল অফুরান্ খুশি।

মাইনে পেয়ে বাড়ি ফেরার পথে ষ্টেশনারী দোকানে গিয়ে ঢুকলো তন্দ্রা। কতো জিনিস কেনা দরকার—নিত্য-ব্যবহার্য কতো জিনিসেরই যে অভাব। ইচ্ছে হলো, এক থোকা টাকা খরচ করে একসঙ্গে এক রাজ্যের জিনিস নিয়ে ঘরে ফেরে। কিন্তু কুলির মাথায় মাল চাপিয়েই বাড়ি ফিরতে হয় তা হলে। তা তো আর পারা যায় না। তাই ইচ্ছেটাকে তখনকার মতো দমিয়ে রাখতে হলো। সমরের জন্যে দু'টো গেঞ্জী, কিছু টফি-লজেন্স, গোটা কয় খেলনা, ট্যাল্‌কম্ পাউডার এক কৌটো। কেনার মধ্যে শুধু এই—আর এতেই হ্যাণ্ড-ব্যাগটা ভরে গেল।

পরদিন রোববারের বিকেল। সমরের নিত্যকার অভ্যাস রোববারটা একেবারে পুরো হোম-রেষ্ট নেওয়া, বিছানায় গড়িয়ে গড়িয়ে কোন বইপত্র হাতে নিয়ে সমস্ত দিনটা অলস অবকাশ উপভোগ করা। এমন কি বিকেলও। কিন্তু ওতে আজ বাদ সাধলো তন্দ্রা। দু' দু'বার ওকে বললো উঠে জামা-কাপড় পড়ে তৈরী হয়ে নিতে। তাতেও যখন ওর আলস্য-মোচন হ'লো না তখন অভিমান-ভরা কয়েকটি মন্তব্য শুধু তন্দ্রার।

ওতেই কাজ হলো। উঠে সুবোধ-বালকের মতো জামা-কাপড় পরে তৈরী হয়ে নিল সমর। বললে, 'ব্যাপারখানা কি তা-ই বলো না। যেন ট্রেন ধরতে হবে, এমনি তাড়াহুড়ো স্বরু করেছো।'

তন্দ্রা বললেন, 'শুয়ে শুয়ে কুড়েমির বাদশা হয়েছো কিনা, তাই একটু তাড়াতাড়ির ব্যাপার হলেই তোমার মেজাজ বিগড়ে যায়।'

সমর চুপ করে গেল !

বিন্তি-তান্তুকে নিয়ে এসে আবার তন্দ্রা বললে, 'কই, চলো।'

সমর বললে, 'একেবারে সদলবলে ?'

হেসে তন্দ্রা বললে, 'হ্যাঁ, দলপতি তো তুমিই।'

বাড়ির সামনেকার ছোট্ট চত্বরটায় পা দিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগটা খুললো তন্দ্রা। চারখানা দশ টাকার নোট তুলে আনলো ব্যাগ থেকে। বললে, 'এই নাও।'

একটু বিস্মিত চোখে তাকিয়ে সমর বললে, 'কি হবে এ দিয়ে?'

'বাঃ, যেন জানো না আর কি?'

'না বললে কি করে বুঝবো।'

'কি করে বুঝবো?' হঠাৎ রাগ হলো তন্দ্রার, 'প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে একসঙ্গে মার্কেটিঙে বেরোবো, কথা ছিল না?'

একটা ভুলে যাওয়া কথা অকস্মাৎ মনে পড়েছে, এমনিভাবে তাকালো সমর। বললে, 'তা বটে, কথা ছিল বটে।'

আবার তন্দ্রা বললে, 'নাও, টাকা ক'টা তোমার কাছে রাখো।'

সমর বললে, 'তোমার কাছেই থাক। আমার কাছে রাখলে হারিয়ে যেতে পারে, ট্রাম-বাসের ভিড়ে পিক-পকেট হওয়া আশ্চর্যের নয়।'

মুখ ভার নিশ্চুপ রইলো তন্দ্রা। সমরের এ-জাতীয় প্রত্যাখানেও প্রস্তুত ছিল না মোটেই।

একটি কাপড়ের দোকানে এসে ঢুকলো ওরা। এতোক্ষণ রাস্তায় আর কোন কথা হয়নি। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় একটা উচ্ছল আনন্দই বোধ করছিল তন্দ্রা। কিন্তু সমরের ওই একটি কথা ওর উৎসাহের অনেকটাই মুছে দিয়েছিল, কথা বলবার প্রবৃত্তিও দাবিয়ে দিয়েছিল যেন। তবু দোকানে ঢুকে কথা বলতে হলো আবার। স্বামী সঙ্গে থাকতে স্ত্রী দর-দস্তুর করবে সেল্‌সম্যানের সঙ্গে, টাকাটা স্ত্রীর হাত দিয়ে বেরোবে, এটা কি ভালো দেখায়? দেখেশুনে পছন্দ-অপছন্দ না হয় ও-ই করলো। কিন্তু দামটা তো সমরেরই দেওয়া উচিত। অথচ আশ্চর্য নির্বিকার-নিরাসক্ত সমর, এক কোণে একটি চেয়ারে চুপচাপ বসে রইলো। যা-কিছু কিনবার তা তন্দ্রাকেই কিনতে হলো, দামও মিটাতে হলো ওকেই। সার্ট-প্যান্ট-ফ্রক, একজোড়া ধুতি, পাঞ্জাবীর কাপড় দু'গজ, লিনেনের ব্লাউস একটি। ক্যাশমেমো তন্দ্রার হাতেই গুঁজে দিল সেল্‌সম্যান। আর প্যাকিং-কাগজে মোড়া কাপড়-চোপড়ের বাণ্ডিলটা সমর নিজেই তুলে নিল।

বাইরে এসে তন্দ্রা আর থাকতে পারলো না। বললে, 'দোকানে অতো লোকের সামনে আমাকে অপদস্থ করলে কেন?'

সমর অবাক হলো, 'আমি আবার কি বললাম?'

'কিছু না বলেও অপমান করা যায়, তুমি তাতে বরাবরই নিপুণ।'

একটুকাল চুপ করে থেকে সমর বললে, 'হঠাৎ অমন অপমান-অপদস্থ কথাগুলো ব্যবহার করছো কেন? চাকরির শিক্ষা নাকি?'

'তা-ই!' কণ্ঠস্বর তিক্ত হয়ে উঠলো তন্দ্রার, 'আর এও শিক্ষা, টাকাটা আমার রোজগার বলেই তুমি ও-রকম ব্যবহার করলে। আমার চাকরি নেয়া তোমার বেধেছিল, আমার টাকা ছুঁতেও তোমার বাধছে।'

'টাকার অপচয় দেখলে আমার বাধে।'

'এটা অপচয়? এটা বাজে খরচ?'

'বাড়ি গিয়ে যা বলবার বলো। রাস্তায় ভিড় জমিয়ো না।' অত্যন্ত শান্ত-কণ্ঠ আশ্চর্য দৃঢ় উচ্চারণ সমরের।

কথা থামলো। কিন্তু সমরের কথায় যে ব্যথা পেল তন্দ্রা তার যন্ত্রণা থামলো না। সেদিন তো নয়ই, তারপরেও নয়। অভিমান যেখানে দুঃখের উৎস, আত্ম-পীড়নের পোড়ামাটি সেখানে তৈরী হবেই। কিছু বলা যায় না—বলতে ইচ্ছে করে না। একটা আগুনের কুণ্ড শুধু বুকের তলায় ধিকিয়ে ধিকিয়ে জ্বলতে থাকে। কিন্তু মনের ভেতরটা তো আর বাইরে দেখা যায় না, আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও না। তন্দ্রার পক্ষে ওটুকুই যা সান্ত্বনা। তাই আফিসে যাবার মতো মনের অবস্থাটুকু ও বাঁচিয়ে রাখতে পারলো। সাড়ে আটটায় বাথরুম, নটায় বিন্তি-তাপ্তকে নিয়ে খেতে বসা, সাড়ে-নটায় বাস ষ্টপে গিয়ে দাঁড়ানো—ঘড়ির কাঁটার ছকে ছকে আবদ্ধ সময়গুলো ও মেনে চলতে পারলো। একদিন দু'দিন—মাসটা যখন শেষ হবার মুখে তখনো।

অথচ, আশ্চর্য, সমরের যেন একটুও ভাবান্তর নেই। ওর মনে সেদিনকার কথাগুলো একগাছা খড়কুটোর স্বীকৃতিও যেন পায়নি। সকালে উঠে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে তন্দ্রাকে চায়ের তাগিদ দেওয়া, সাড়ে সাতটায় তন্দ্রার কাছ থেকে চেয়ে বাজারের টাকা নেওয়া, ঠিক আগের মতোই চললো ওর।

দুজনের বেরোবার সময়টা একটু আগে পরে—তন্দ্রার সাড়ে নটায়, সমরের দশটায়। ফেরার সময়টা কিন্তু প্রায় একই লগ্নে গিয়ে দাঁড়ায়—ছ'টার কাছাকাছি। বিকেল থেকে সারাটা রাত, তারপর সকাল, সকালের পরেও আরো কয়েক ঘণ্টা। একেবারে পাশাপাশি, মুখোমুখিই কাটাতে হয়, যেমন হতো তেমনি। কিন্তু ও-টুকুই শুধু। হেসে কথা বলা বন্ধ করলো তন্দ্রা। মনস্থির করলো, সংসারের কাজে না হলেই নয় এমন দু'একটি কথা ছাড়া আর কিছুই ও বলবে না। তা-ও বলবে মনি-পিসির মধ্যস্থতায়, সমরের সঙ্গে নয়। সমর যদি একটা মেকি দম্ভের মিনারে উঠে থাকতে চায়, থাকুক। ওতেই যদি ও শান্তি খুঁজে পায় তন্দ্রা তাতে বাদ সাধবার কে? কিন্তু চাকরি সম্বন্ধে ওর বাঁকা কথায় ফোঁড়ন আর সহ্য করবে না তন্দ্রা। এতোটা রক্ষণশীল আর সংকীর্ণমনাই যদি ও হয়ে থাকে, তবে তা আগে প্রকাশ করলো না কেন? চাকরি নেবার আগে কি খোলাখুলি সব আলাপ হয়নি? আর এখন কিনা ওর এই ব্যবহার। হবে না কেন? রোজগারের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকার পুরুষরা তো মেনে নিতে পারে না। সমর যে সেই সনাতন পুরুষদেরই একজন। মার্কেটিং-এর ব্যাপারটার সূত্র ধরে এ-সব কথা যতোই ভাবলো তন্দ্রা, ততোই ওর অভিমানের সঙ্গে মিশলো একটা ঘৃণার ভাব। নিজেকে দগ্ধ করবার সঙ্গে সঙ্গে দাহন করবার প্রবৃত্তি। আঘাত দেবার একচেটিয়া স্বত্ব শুধু সমরেরই নয়, ওরও আছে। সমর যদি সেদিনকার ব্যাপারটার জন্যে অনুতপ্ত হয়, ভুল স্বীকার করে তাকে কাছে টেনে নেয়, তবেই ওর সঙ্গে কথা বলবে তন্দ্রা, আগেকার মতো সহজ সম্বন্ধ হবে। এর আগে নয়। ওর মিথ্যে ধারণার চোরাবালি এবার ভাঙ্গতেই হবে।

বাড়িতে সমরের সঙ্গে কথা-না-বলা চেষ্টা করেই অভ্যাস করতে লাগলো তন্দ্রা, প্রথম অভিনয় শেখার মতো। অফিসেও হয়তো মুখ ভার করেই সময় কাটাতে হতো যদি যুথিকা না থাকতো।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে ও এসে গল্পসল্প করে যায়। টিফিন পিরিয়ডে তো ওর সঙ্গে ক্লাবে যেতেই হবে। ক্লাবে মেয়েদের আড্ডাটা সত্যি মন্দ নয়। আধ ঘণ্টার বৈঠকে প্রাণ-খোলা, মন-ঢালা চলে। হাসি আর ঠাট্টা, পরিহাস আর কৌতুক—অফিসের সব ক'টি মেয়েই উপস্থিত। ক্লাবের পরিবেশটা ভালোই লাগলো তন্দ্রার। মেয়েদের সঙ্গে ও সহজেই ঘনিষ্ঠ হতে পারলো, নিজেকে ওদের একজন করে তুলতেও দেরী হলো না। অবশ্য এর প্রাথমিক কৃতিত্ব যুথিকার, এই আড়ষ্টতা ঘোচানোর ব্যাপারে ওকে পথিকৃৎই ভাবলো তন্দ্রা।

কিন্তু শ্বেতা সেন আর করবী ঘোষ এখনো যেন অসহ্য।

পরিহাসের হাসি হাসতে হাসতে হয়তো তন্দ্রার গায়েই ঢলে পড়লো শ্বেতা। লোভীর মতো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কি লাভ্‌লি এ্যাপিয়ারেন্স্ তোমার ভাই, ইচ্ছে হয় প্রেমে পড়ে যাই।'

মুখ লাল করে শুধু নির্বাক থাকতে হয় তন্দ্রাকে। শ্বেতার কথাগুলো একটা বিশ্রী-বিকার বলেই মনে হয়। কাউকে বিয়ে করে ফেললেই তো পারে ও। ওর সম্বন্ধে যুথিকা কিন্তু একটু সমবেদনাই দেখায়। বলে, একটা গোটা পরিবার ওর কাঁধে ভর করে আছে। ও বিয়ে করুক, ওর বাবা-মা কেউ চায় না। ওর দুঃখটা কি কম? যুথিকার যুক্তি শুনলো বটে তন্দ্রা। কিন্তু শ্বেতা-সম্বন্ধে মনোভাব পাল্টালো না।

আর করবী ঘোষ। ওর সঙ্গে একদিন অফিস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গভর্ণর হাউস পর্যন্ত গিয়েছিল তন্দ্রা। ওই সময়টুকুর মধ্যেই ও ওর জীবন-বৈচিত্র্য না শুনিয়ে ছাড়েনি। একটা কন্‌সার্ভেটিভ পরিবারে নাকি ওর বিয়ে হয়েছিল। স্বামীর সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত, শেষে ছাড়াছাড়িই একমাত্র পথ। মানে, ও-ই স্বামীর ঘর ছাড়লো, সিঁদুরের দাগ মুছলো। তারপর চাকরি, আর হোষ্টেল লাইফ।

'সেই থেকে জীবন সম্বন্ধে আমি একটা কুইয়ার্ ধারণা চেরিশ করি।' কথার শেষে মন্তব্য করে সশব্দে হেসে উঠেছিল করবী।

'ঠিক বুঝলাম না।' বোকা বোকা চোখে তন্দ্রা তাকিয়েছিল।

'মেয়েদের ম্যারেড্ লাইফ লীড করা শ্লেভারি ছাড়া আর কিছুই নয়।'

করবীর চোখের দিকে তাকিয়ে শ্বাপদের একজোড়া চোখই যেন দেখেছিল তন্দ্রা। ক্ষুধার্ত হিংস্র একটা পিপাসা।

শুধু ওদের দু'জনকে ছাড়া আর সব মেয়েদের ভালো লাগলো তন্দ্রার। মায়া সেন, সুমিতা রক্ষিত, আরতি রায়—সব ক'টি মেয়েকেই।

যুথিকার সঙ্গে তো বন্ধুত্বই হয়ে গেছে। ও-ই শুধু একমাত্র মেয়ে যার কাছে নিজের পারিবারিক জীবনের কথা, সুখদুঃখের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাহিনী মন খুলে বলেছে তন্দ্রা। অবশ্য সমরের সঙ্গে ইদানীংকার কথা না বলার পর্বটুকু বাদ দিয়ে। কিন্তু যুথিকা তো ওর ব্যক্তিগত জীবনের কোন কথা একদিনও বললে না। ও-প্রসঙ্গটা ও কৌশলে বারবারই এড়িয়ে যায় কেন?

সোজাসুজিই একদিন কথাটি পাড়লে তন্দ্রা, 'তোমার ওঁর কথা, বাচ্চাদের কথা, কিছুই বললে না, আমাকে।'

'ও আর বলবার কি আছে?' যুথিকা হাসলো একটু।

'আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি বলবে না কেন?'

'অফিসে বাইরের জীবনটা টেনে আনতে ইচ্ছে হয় না।'

এড়িয়ে যাবার চেষ্টা ওর। কিন্তু তন্দ্রাও নাছোড়বান্দা। যুথিকার ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কথা শুনে তবে ও ছাড়লো।

একটি আশ্চর্য জীবন যুথিকার। সংসারের হাটে অনেক কঠোর-কঠিন অভিজ্ঞতা কুড়িয়েছে, যাকে বলে পোড়-খাওয়া মানুস ঠিক তা-ই। স্বামী পঙ্গু, বাস-এ্যাক্‌সিডেণ্টে স্পাইনাল কর্ড ভেঙ্গে চিরদিনের জন্যে কর্মক্ষমহীন। একটিমাত্র সন্তান, এগারো বারো বছরের মেয়ে একটি। আজ দশ বছর যাবৎ সংসারটার ঝুঁকি একা ওকেই সামলাতে হচ্ছে। যুদ্ধের দিনে 'উইমেন্‌স অক্‌জিলিয়ারি কোর', যার পত্রচলিত নাম 'ওয়াকাই', ওর জীবিকার ক্ষেত্র ছিল, 'এ-আর-পি'তেও কাটিয়েছে কিছুকাল। তারপর ষ্টেনো টাইপিষ্টের ভূমিকা—এখন মেয়ে কেরানী।

নিথর নিষ্কম্প হৃদপিণ্ড নিয়ে ওর কথাগুলো শুধু শুনে গেল তন্দ্রা। আর অফিসে বসে বসে সারাটি দিন ওর কথাই ভাবলো। এতোদিন পরে, সমরকে বলবার মতো একটি কথা যেন ও পেয়ে গেল। চাকরি করা মেয়েদের বিলাস নয়, নিছক কোন খেয়াল নয়, এই এবার সমরকে ও বোঝাতে পারবে। সংসারের প্রয়োজনে, ছেলেদের মতো সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে নিয়েই যে মেয়েরা চাকরিতে আসে যুথিকার চাইতে শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত তার আর কি হতে পারে? ওর স্বামীর উদাহরণও তো কম নয়। স্ত্রীর উপার্জ্জন স্বীকার করবার মতো মহত্ব আছে ওর স্বামীর—সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে স্ত্রীর ওপর।

ভেবেছিল সমরের সঙ্গে যেচে আর কথা বলবেনা তন্দ্রা। সে সংকল্প পাল্টাতে হলো।

দু'দিন পরেই দ্বিতীয় মাসের মাইনে। মাইনে নিয়ে একেবারে বাড়ি চলে এলো তন্দ্রা। সমর তখনো ফেরেনি।

অনেকদিন পরে যেন আজ আবার ঘরের আবহাওয়া বড় তৃপ্তিকর ঠেকলো তন্দ্রার। মুখ-হাত ধুয়ে এসে গাঢ় বাদামী শাড়ীটা পরলো, যে-শাড়ীখানা চাকরিতে ঢোকার কয়েকদিন আগে কিনে দিয়েছিল সমর। ঝেড়ে মুছে বেড-কভার পাল্টে বিছানা পাট করলো আগে। একটা সুদৃশ্য টেবিল-কভারে ঢাকলো তে-পায়া টেবিলটা। সমরের বুক সেল্‌ফে কতো যে ধুলো জমেছে এ-কয়দিনেই। ধুলো ঝেড়ে বুক-সেলফটা টেনে এনে আরেকদিকে রাখলো তন্দ্রা, যেখানে ওটা মানাবে বলে মনে হলো। তারপর বিন্তি তাস্তুকে দুধ-খাওয়ানো, তা-ও নিজের হাতেই। দুধের বাটি নিয়ে মেঝেয় লেপটে বসলো। অন্য দিন এ-গুলো মনি-পিসির কাজ, আজ তন্দ্রার।

একটু বাদেই সমর ফিরলো। ঘরে ঢুকে জামা-কাপড় পাল্টালো ও। মুখ-হাত ধুয়ে এসে বসলো বিছানায়। তারপর আধশোয়া হয়ে একটা বিদেশী পত্রিকায় চোখ বুলোতে লাগলো। ঘরের পট পরিবর্ত্তন যেন ওর নজরেই পড়লো না।

চা আজ মনি পিসির হাতে নয়। তন্দ্রা নিজেই চা করে পেয়ালাটা সমরের সামনে এনে ধরলো। একটু ইতস্তত করে বললে, 'কিছু খাবারও দিই, কেমন? শুধু চা খাওয়া ভালো নয়।'

ওরে দিক একপলক তাকিয়ে সমর বললে, 'খাবার, তা দাও।'

একটা প্লেটে দু'স্লাইস্ মাখন-মাখানো রুটি নিয়ে এলো তন্দ্রা। খুশি খুশি মুখ। প্লেটটা সমরের হাতে দিয়ে বললে, 'খেয়ে নাও।'

সমর বললে, 'তুমি খাবে না, অফিস থেকে এসে খাওনা কিছু?'

'খাবো না কেন। তুমি না খেতে খাওয়া যায় নাকি?' তন্দ্রা মুখ টিপে হাসলো।

'পতি পরম গুরু!' সমরও হেসে উঠলো।

কথা বলতে বলতে তাকের ওপর-রাখা ব্যাগ থেকে খামে আঁটা মাইনের টাকাটা তুলে আনলো তন্দ্রা। টাকাটা সমরের সামনে রেখে বললে, 'এ-মাসের মাইনেটা তোমার হাতে খরচ করবে। কথা দাও, তোমার ইচ্ছে মতো।'

চোখ স্থির করে তাকিয়ে রইলো সমর।

'দেখছো কি?' সমরের গা ঘেঁষে বসলো তন্দ্রা। কথার গতি সহসা অন্যদিকে ফেরালো, 'জানো, একটি মেয়ে আছে আমাদের অফিসে। কি অদ্ভুত জীবন ওর!'

এক অক্ষরও সমর শুনলো কিনা কে জানে। চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। 'টাকাটা তোমার কাছেই রাখো।'

'কেন?' তন্দ্রার সমস্ত শরীর প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠলো যেন।

'ভাবছি, ও-টাকাটা তোলা থাক', তন্দ্রার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে সমর বললে, 'একটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স করা দরকার তোমার, উইথ্ প্রফিট—বিপ্তি-তান্তুর কথা ভাবতে হবে তো। আর, এ-মাসে ওদের কিন্ডার-গার্ডেন-জাতীয় কোন স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া যাক, কি বলো? বাড়িতে আট্‌কা পড়ে থাকলে ওরা মানুষ হতে পারবে না।'

অস্ফুটস্বরে তন্দ্রা বললে, 'আচ্ছা।'

আবার সমর বললে, 'এবার ধীরে সুস্থে ডিপার্টমেণ্টাল্ এগ্‌জামিনটা দিয়ে ফ্যালো। চাকরির পার্‌মানেন্সি চাই তো।'

'দোব।'

অনেক কষ্টে কথাটা উচ্চারণ করে এদিকের ঘরে চলে এলো তন্দ্রা। অনেক কষ্টে, নির্জীব দেহভার নিয়ে প্রায় টলতে টলতে।

ও জানতো না, মাত্র ক'মাস আগেকার একটি মন এতো শীঘ্রই হারিয়ে যাবে—যে-মন বলতে পেরেছিল, 'সব স্বামীরই বাধে।' জানতো না, ওর অজান্তেই সমর যে ওকে প্রয়োজনের নিক্তিতে তুলে নেবে।

কবিতা-গুচ্ছ

বিরহান্তর

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আমাকে আসক্তি দাও, আকাঙ্ক্ষার পবিত্র আগুনে
দগ্ধ করো, দাও সেই অসংশয় ইচ্ছার পিপাসা
তৃপ্তি যার মৃত্যু, যেন অতৃপ্ত মুহূর্ত গুনে গুনে
তবুও অটল থাকি, দাও সেই তীব্র ভালবাসা।

প্রেম নেই, নেই তীক্ষ্ণ ঘৃণা,
সংশয়ে চলেছি পায়ে-পায়,
এত ভাল কাউকেই বাসি না
যাকে খুব দুঃখ দেওয়া যায়।

অনেক দিয়েছ তুমি মূর্খ সুখ, দাও এইবারে
দুঃখের আস্বাদ, দাও দুরন্ত দুর্মর সেই আশা
যে আমাকে মৃত্যু দিয়ে অমৃত আনন্দ দিতে পারে,—
ভালবেসে দুঃখ দাও, দুঃখ দিয়ে দাও ভালবাসা।

লোকজ্ঞ স্মরণে

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

সব নাম ভেঙে ভেঙে যে-মুহূর্তে এক নাম হয়
একটি আশ্চর্য ডাক সেই নাম ধ'রে বেঁচে রয়
জীবন এপার আর জীবন ওপার
নিশিদিন লক্ষ্য করে সব পারাপার
কী সে মন, কার মন, কে গো মনোময়?

সব আলো ভেঙে ভেঙে যে-মুহূর্তে এক আলো হয়
একটি আশ্চর্য দেখা সেই আলো ঘিরে জেগে রয়—

এপার আলোক আর ওপার আলোক
সে-আলোকে জুড়ে আছে যার মনোলোক
কী সে আলো, কার আলো, কে গো আলোময় ?

সব পথ ভেঙে ভেঙে যে-মুহূর্তে এক পথ হয়
একটি আশ্চর্য হাতছানির বিস্ময়, মৌন হ'য়ে রয়।
এপারের সেতু-পথ, ওপারের সেতু
যতো কার্য কারণের শৃঙ্খলের হেতু
একান্তে উদয় আর পরান্তে বিলয়
জেনে-শুনে হ'য়েছো কে তথা-তন্ময় ?

তোমার মুদিতা মায়া ছায়া ফেলে গেলো আজ
কতো কতো শতাব্দীর শবের উপর
তোমার সমস্ত চক্ষু পরম উপেক্ষাভরে
লক্ষ্য ক'রে গেলো সব আর্ত চরাচর।
আজ বুদ্ধ-পূর্ণিমার শান্ত লগ্নে
দূরশ্রব ধীরোদাত্ত কী যেন সুস্বর
কানে আসে; সংঘবাণী করি প্রতিধ্বনি
গেয়ে উঠি ত্রি-শরণ গান—
শোনে কোনো অশরীরী প্রতিসন্ধি মুমুক্ষু মহান।
সে বোধি-পালঙ্ক আজ প্রেমঘন কার আবির্ভাবে
কেঁপে ওঠে মধুমন্দ্রে ছন্দিত আরাবে ?
জগতের আলো তুমি, তোমাকে প্রণাম করি প্রাচ্যের সবিতা
অন্য কিছু কিছু নয়, তুমি শুধু, তাই তো কবিতা!

আবার দু'টি চোখ
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আবার সেই পাগলকরা চোখ
আবার সেই সারাশরীরে ভীষণ হাহাকার
শিরায় আর রক্তে করতালি ;

বিস্মৃতির ভ্রান্তি আনে মদ্যপের জ্বালা
ভোলায়, কবে সময় গেছে চ'লে।

কবে যে গেছে সময় আমি শান্তি পেতে পারি
নিজের মুখ দেখতে পেলে কখনো পাকা চুলে
হৃদয় যদি থামাতে পারি, আহা!
সামনে তুমি, তোমার চোখে নিশীথিনীর ডাক
রক্তমাখা হৃদয় হাঁটে পথ।

তোমার নেই করুণা আজ তুষারে সমাহিত
বয়েস ব'সে স্থবির দিন গোনে ;
নিয়েছে তবু ক্লান্তি নিলে চেতনা মাঝরাতে
কোথাও নেই দ্বিপ্রহর…অসম্ভব প্রলাপজ্বরে
শরীরে জ্বালো আগুন, জ্বালো শান্তি, জ্বালো আমার প্রত্যহ।

শিরায় আর রক্তে জ্বলে অতীত গানগুলি
বিগত যত চুমুর মুখ অগ্নিঝরা বিস্ফোরণে টলে
আহত পশু হৃদয়ে গর্জায়,
আবার আমি বেরুতে চাই চিড়িয়াখানার শান্ত ঘুম ছিঁড়ে
তোমরে নেই করুণা, চোখ অবাক, স্মিত হাসে।

তোমার নেই করুণা, যেন প্রতিমা, আছো ব'সে
শিল্পী যেন সকলি এঁকে গেছে ;
অথচ চোখে পলক পড়ে, অমানিশার আলেয়া দেয়
সবাক হাতছানি।
যন্ত্রণায় দুচোখে দিই হাত,—
অন্ধকারে যায়না দেখা রক্তে, নাকি চোখের জলে
ভাগ্যরেখা ভাসে॥

চতুর্দ্দশপদী

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

এখনো চীৎকার ক'রে তোমাকেই ডাকে ফিরে-ফিরে
মেঘময় সিক্ত দিন ; থরোথরো স্বপ্নদুঃস্থ রাত
পৃথিবীর কালো চুলে বুলোয় আঙ্গুল ধীরে-ধীরে,
তিমিরচ্ছুরিত লোকে খোঁজে শান্তি উত্তোলিত হাত।
বনস্থলী অন্ধকার ; আলোড়ন স্তব্ধ গাছে-গাছে
ক্লান্তির প্রহর ঘিরে,—রাত ক্রমে হ'লো চন্দ্রাবলী
কম্পিত বুকের স্পন্দে, কোথায় মূর্চ্ছিত হ'য়ে আছে
দ্বিধাকম্প কৃষ্ণচূড়া, ভাষা নয় স্পন্দন কেবলি

উন্মত্ত তোমাকে খোঁজে, সারা মাঠ থৈ-থৈ জলে,
স্যাঁতসেতে স্নিগ্ধতায় কোথায় সুরের ঢেউ জাগে
নির্জন হাওয়ার বেগে, তোমাকেই যেন ঘুরে-ফিরে
নিদ্রাহীন মধ্যরাতে অবশিষ্ট আয়ুর বদলে
প্রৌঢ়ের যৌবন ডাকে ; ছোঁয়া লেগে তীব্র অনুরাগে
সন্নত শরীর কাঁপে, খোঁজে লগ্ন কল্লান্ত-তিমিরে ॥

নাচঘর

বটকৃষ্ণ দাস

অবসন্ন নাচঘর। বাতিঝাড়ে স্তিমিত দীপের
ম্লানশিখা। আলোছায়া জানালার রঙিন পর্দায়,
দরজার ঝালরে, কোণে। গোলাকার, স্বচ্ছ আয়নায়
স্তব্ধ দেয়ালের মুখ। বাঁকা শিঙ মৃত হরিণের।
মেঝেয় কার্পেট। শূন্য সুরাপাত্র। বিদেশী বোতল।
পোড়া সিগারেট, ছাই। পরিত্যক্ত কাঁচুলি, মেঘলা,
নূপুর, অঙ্গের বাস। বিক্ষিপ্ত পাণ্ডুর চন্দ্রকলা ;
সারঙ, সুরবাহার। ছিন্ন লীলাকমলের দল।

দেবতা, মানুষ, পশু চ'লে গেছে। এখন শয্যায়
নগ্নকান্তি নটি তার উজ্জ্বল মৃত্যুকে কাছে নিয়ে
শুয়ে আছে। তীক্ষ্নখ তর্জনীর মুদ্রিত মায়ার
চকিত বিদ্যুতে, সমে, স্থিরচিত্রে, স্তব্ধ-ব্যঞ্জনায়
সে আজ পেয়েছে তাকে সান্দ্র-শিল্পকর্মের তূরীয়ে,—
যার প্রতি অঙ্গ লাগি কেঁদেছিলো প্রতি অঙ্গ তার।

নীলকণ্ঠ

গোপাল ভৌমিক

বহুবেদনায় কেনা স্বর্গে আমার
তারার দ্যুতির মত ঝলমল করে
তুমি থাকো তাইতো চেয়েছি ; বারবার
তবু যেন দূর থেকে দূরে যাও সরে।

একি মরণান্ত খেলা খেলো অকারণে
ঢেউ তুলে জীবনের প্রশান্তি-সাগরে ?
মৃতছায়া সীমান্তের তটভূমি-বনে
সূর্যসন্ধ নাবিকেও প্রতারিত করে।

জরাগ্রস্ত জনপদ, পৃথুল নগরী
বহুদূরে রেখে এই স্বর্গের শিখরে
বসে ভাবি, ইথার-সমুদ্রে তুমি তরী,
ধ্রুবতারা সীমাহীন মুক্ত নীলাম্বরে।
মৃত নক্ষত্রের দেশে আমি ভুল করে
বিষপাত্র মুখে খুঁজি অমৃতের বরে।

শেষকথা

শ্রীমতী বাণী রায়

আমার আত্মার স্রোতে খরনদী বয়—
সমস্ত আকাশ ঢাকে,
সমস্ত পাতাল

এক করে হিমবর্ণ সুশীতল নদী,
আত্মার উত্তাপ শৈত্যে করে দিল ক্ষয়।
প্রখর সাহারা আমি তীব্র প্রতীক্ষায়—
সে প্রখরে উর্দ্ধ থেকে বন্যার বিহ্বল
ঢেকে দিল—ভেঙে নিল ;
হে কান্ত শ্যামল,
তোমার আত্মার স্রোত প্রবাহ-ধারায়।
আমার অস্তিত্ব যা—যা ছিল আমার
সে প্রবাহে ডুবে গেল—বিলুপ্তি এবার।

দিলাম সম্পূর্ণ লুপ্তি, ফিরিয়ে নেবনা,
তোমাকে দিলাম সুখ, দিলাম বেদনা।

ছায়া

অরবিন্দ গুহ

তুমি তোমার ছায়াটি রেখেছিলে
ক্ষণস্থায়ী ধুলোয়। কাকে দিলে
এক পলকে চিরকালের ছবি
জানলে না তো। যখন ভৈরবী
ছড়িয়ে গেলো ব্যথায় ভীরু ভোরে,
আকাশজোড়া লক্ষ পাখা ওড়ে,
পাখা কিসের, ও-গান কেন বাজে—
এখন কি আর সেসব কথা সাজে।

তোমার ছায়া, ছায়ার ধুলো থেকে
পেয়েছি মেঘ ; তখনি হাওয়া ঢেকে
দিয়েছে পথ, পথের ধুলো-বালি ;
বহুজনের বিপুল করতালি

পাইনি আমি, পায়নি গান, পাখি ;
তোমার ছায়া ছায়ায় ঢেকে রাখি
একলা ঘরে, একলা কথা বলি—
আমি ছায়ার ভালোবাসায় জ্বলি।

ক্ষণস্থায়ী ধুলোয় তিলে-তিলে
কেন তোমার ছায়াটি এঁকেছিলে।

রুপোলি জল

সুনীলকুমার নন্দী

নীলান্ত রাত্রির শুভ্র-ম্লান জ্যোছ্‌নায় মাখা নির্জন শিয়রে
মুঠো মুঠো বৃষ্টি ঝরে—
বৃষ্টির সুরে সুরে মায়াবী সময়
পাথরে বাঁধানো তীর ভেঙে ভেঙে বয়ে চলে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে কল্লোলিনী হয়।
দিনের বিমর্ষ ক্লান্তি মুছে ফেলে খুসিয়ালী গান গেয়ে আকাঙ্ক্ষার তরী
পাল তোলে। যোজন যোজন ছাওয়া সবুজ কাশের বন, ধানের মঞ্জরী
আনমনে ছুঁয়ে ছুঁয়ে হঠাৎ কখন
হয়তো ছুঁতেও পারি মমতার মতো স্নিগ্ধ দূর পাড়াগাঁয় এক স্মৃতি-ভেজা মন,—
যে-মন উজ্জ্বল করে, যে-মন পবিত্র করে বিষণ্ণ দুপুর
স্বপ্নের কোরক-গন্ধে। বিমুগ্ধ কলাপী ওই বৃষ্টির নূপুর
সমস্ত রাত্রির কানে অবিরাম একই নাম ঘুরে ঘুরে বলে।
তবু এত আয়োজন
সব বুঝি ব্যর্থ হ'লো। বৃষ্টি শেষ। রাত্রি ভোর। কোথায় সে-মন!

ধীরে ধীরে সূর্য জ্বলে। সমুদ্রের রোল ওঠে গলির কোনায়—
গ্রাম-ছায়া, মন-মায়া ভুলে গিয়ে নদীর রুপোলি রেখা সমুদ্রে মিলায় ঃ
তারপর রূঢ় রৌদ্রে ব্যস্ত কোলাহল।
চোখ ছেপে নামে একি ?—চুপ্‌ চুপ্‌, কিছু নয়, দুই ফোঁটা জল!

মুখ

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

কখন আকাশ দেখি এসে ভিড় করে
আমার এ-মুক্ত জানালায়।
সবুজ শাড়িতে যেন জেগে-থাকা চাঁদ—
নক্ষত্র কি ডাকছে আমায় ?
হৃদয় দোদুল দ্যোতনায়।
তবু যেন জেগে উঠি আকাশের স্বরে।
একমুঠো জ্যোৎস্না কাঁপে ফ্রেমে আর কাঠে—
মুক্তপাখি জানালার 'পরে।

এমন আশ্চর্য রং কখনো দেখিনি—
অপরূপ সবুজ আকাশ।
নক্ষত্র জমানো ফেনা নীল প্লেটে যেন
—ছবিতুলি আনে কি আভাস ?
চেয়ে থাকি এ-এক বিলাস।
তবু যেন মনে হয় এ-আকাশ চিনি
—মাকড়সা-জাল শেষে ;—জানালা-কপাটে
দোল খায় জ্যোৎস্না প্রতিদিনই।

আকাশ যে ভিড় করে মুক্ত জানালায়—
জ্যোৎস্না নয়, মুখ এক মনে পড়ে যায়।

জ্বর

অরুণ ভট্টাচার্য

জ্বর নিয়ে সারাদিন শুয়ে আছি।
নোংরা চাদরে এই শরীরকে ঢেকে
বর্ষণশেষের মৃদু আকাশকে দেখে
জ্বর গায়ে সারাদিন কাটে।

মরুময় পৃথিবীর বুকে ফুল ফোটে
নিত্য তার আভরণ, অঙ্গসজ্জা কুমারীর দুঃসহ যৌবনে
বেদনায় সারাদেহ কণ্টকিত যার ভারে
আমি এই শতাব্দীর জরা নিয়ে গায়ে
একা বিছানায় শুয়ে আছি।

কাটে দিন, কেমন কেটেছে মৃত
নক্ষত্রের কত কত আলোকবর্ষের দ্যুতি,
কাটে রাত্রি, এই ভিজে বর্ষার বিলম্বিত লয়ে
অন্ধকার দেয়ালের কোনে তার মুখ ভাসে,
বিগতজন্মের কোন অন্যায়ের স্মৃতি,
রেখাচিত্র যেন, এই জ্বরের প্রলাপে
দীর্ঘ দিন, আরো এক দীর্ঘ রাত্রি কাটে।

সারাদিন ঝরঝর, রাত্রিতে অবাধ্য হাওয়া
অন্ধকার অন্ধকার মন, সারাদিনমান
যত কিছু পূর্বস্মৃতি হৃদয়ের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরে।

ঘর ভরা
পুরাতন চিঠি, কবিতার ইতস্ততঃ খসড়ায়,
খানকয় বই, বাসি রজনীগন্ধার মালা,
ছড়ানো ছিটোনো মেঝে। এই পৃথিবীর
আলোহীন ঘরে দূর থেকে দূরতর
নক্ষত্রও চোখে পড়ে। দেখা যায়

দূর দ্বীপে নিরানন্দ ঘরে
আমারই সতীর্থ কেউ জ্বর গায়ে শুয়ে,
মলিন চাদর তার, অসুস্থ শরীরে।

নিরালোক

ভূমেন্দ্র গুহ

নেভাও এবার অতো কাঁচা সোনা আলোর ধারার
অবিরল চপল প্লাবন,
সইতে পারে না আর অপরাধী মন :
কোনোদিন চায়নি যা, যা কিছু পাওনা নয়, তার
সোনালি শস্যের দান পেতে তার এক কণা সাধ
নেই আর, তুলে নাও ছায়াচারী আলোর প্রসাদ।

সোনালি রোদের রেখা অগণন চুলের তোমার
দেহের সীমায় ভাঙে খরধার হীরকের ধার—
এই সব তুমি দাও যতো উগ্র সোনার ফসল—
হাওয়াতে চটুল ঠোঁটে তীব্র হলাহল—
তবু কি তোমার ছিলো এই সব স্বর্ণ-জ্বালা দেয়,
না-চেয়ে যা পাওয়া যাবে, তার দানে সময় অমেয়
হবে না তো আমার কখন
প্রতি অপরাহ্নে হবে অপরাধী মন।

তার চেয়ে একবার নেভাও তোমার অতো কাঁচা সোনা রোদ
করুণ আঙুলে মোছো সোনালি আলোর প্রসাধন
মেলে দাও সেই দেয় সন্ধ্যার প্রবোধ!
একবার ক্লান্ত হও আর্দ্র মৃদু রাতের মায়ায়
অবাধ অপার দূর প্রান্তরের আকাশের গায়—
সে-মাঠে পতঙ্গ হয়ে ঘুমে-সিক্ত নীলান্তীন হাওয়ার চূড়ায়
সবুজ মৃত্যুর স্বপ্নে কীর্ণ হয়ে হোক মনোভোর—
যা তোমার অমৃতের চিরন্তন রাত্রিময় মন
তার স্নেহে রিক্ত হোক শিয়রের শান্ত প্রীত ভোর!

হিরণ্ময় পাত্র ভেঙে তুলে নাও আড়াল আলোর
অনাবৃত রাত্রি হও অবার অঝোর—
অপরাহ্নে পেতে দাও যা তোমার দেয় ছিলো, যা ছিলো পাবার
তোমার আঁধার রূপে অন্ধকার সময় আমার!

বিবেকের গণ্ডি

সতীনাথ ভাদুড়ী

গ্রামের ছেলে। পয়সার জোর নেই ; খুঁটির জোর নেই, তবু শহরে ওকালতি করতে এলাম। একমাত্র সম্বল পাড়াগেঁয়ে একগুঁয়েমিটুকু। আর দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল মনের যে, যেমন করে হ'ক নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কোন জায়গার উকিল হয়ে বসতে গেলে সেখানকার গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে প্রথমে দেখা করতে হয়। সবচেয়ে আগে মনে পড়ল বৃদ্ধ মহেশবাবুর নাম। তাঁর দানধ্যানের খ্যাতি এ জেলার কোণায় কোণায়। বহু গরীব দুঃস্থ ছেলে তাঁর বাড়ীতে থেকে স্কুল-কলেজে পড়ে। গ্রামের যে প্রাইমারী স্কুলে আমি ছেলে বেলায় পড়তাম, সেখানে এঁর ফটো টাঙানো ছিল ; তিনি যখন জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান তখন ওই স্কুল স্থাপিত হয়। আজকাল বয়স হওয়ায় কাজকর্ম থেকে অবসর নিয়েছেন। ভজন পূজন নিয়েই থাকেন। বাড়ীতে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন।

যখন দেখা করতে গেলাম, তখন তিনি মন্দিরের বারান্দায় বসে গীতা পড়ছেন। কোঁচার খুঁট গায়ে। মিষ্টি কথায় ও ব্যবহারের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে গেলাম, প্রথম আলাপেই।

"নতুন এসেছেন ; কোন রকম কিছুর দরকার টরকার হ'লে বলবেন। লজ্জা করবেন না যেন! উঠেছেন কোথায়? বাসা পেয়েছেন? না হ'লে আমাদের এখানেও থাকতে পারেন।"

গল্প শুনেছিলাম যে মহেশবাবুর নাকি কোন পাওনাদার নেই ; আর কেউ নাকি তাঁর ওখান থেকে খালি হাতে ফিরে আসে না। এখন দেখলাম যে কারও উপকার করতে পারলে তিনি সত্যিই কৃতার্থ হয়ে যান। ···মনে মনে তাঁর প্রস্তাবটি ভেবে দেখলাম।···

···বই আলমারি, চেয়ার, টেবিল, দিয়ে ঘর সাজিয়ে না বসলে মক্কেল আসবে কেন? ···এঁর অতিথিশালায় দশজনের মধ্যে থেকে ওকালতি করা সম্ভব নয়। ···হ'ত বটে কিছু পয়সা সাশ্রয়, কিন্তু সে কথা ভেবে লাভ নেই।···

কাজেই বলতে হ'ল "আমি বাসা ঠিক করে ফেলেছি আগেই।"

"বাড়ীর অবস্থা তাহ'লে বেশ ভাল বলুন?"

"না না। মোটেই না! সামান্য কিছু জমি-জমা আছে। আমার মাকে নিয়ে আসতে হবে কিনা তাই আগেই বাসা ঠিক করেছিলাম।"

"একটু হাল-চাল না দেখে নিয়ে প্রথমেই মাকে আনা কি ঠিক হবে?"

"সে উপায় থাকলে কি আর কথা ছিল!"

"ওকালতির রোজগার দিয়ে প্রথম থেকে সংসার চালানো কি সোজা কথা!"

"সে তো জানিই। রাত্রে ছেলে পড়াব, ঠিক করেছি।"

"এই সব ছোট শহরে টুইশানি জোটানোও শক্ত। যাদের আছে সে পয়সা, তারা স্কুলের মাস্টারদেরই প্রাইভেট টিউটর রাখতে চায়। তাতে একটু পাশটাশের সুবিধা হয়—বুঝলেন না?"

এ কথার আর কি জবাব দেবো। একটু দমে গেলাম। বৃদ্ধ বোধ হয় বুঝলেন আমার মনের ভাব। তাঁর সৌম্য মুখে ফুটে উঠল করুণার রেখা।

"আচ্ছা আমার নাতি নাতনীটিকে একটু পড়াশোনা দেখিয়ে দিতে পারেন ? ইংরাজী পড়াবার জন্য অনেকদিন থেকে আর একজন মাষ্টার মশাই খুঁজছি। পণ্ডিতমশাই তাদের পড়ান সকালে ; আপনি রাত্রে যদি পারেন তো দেখুন ! ঠিক সময়ে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছে। সবই লক্ষ্মীনারায়ণের কৃপা !…"

তিনি মন্দিরের বিগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন চোখ বুঁজে। স্পষ্ট বুঝি যে নাতিনাতনীকে পড়ানর উপলক্ষ করে তিনি আমায় অর্থ সাহায্য করতে চান।…

তবু আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। জানি যে সব গরীব ছাত্র তাঁর বাড়ীতে থেকে এখানকার কলেজে পড়ে, তাদের কাউকে বললে এখনই সে বিনা পয়সায় পড়াতে রাজী হয়ে যাবে। কিন্তু এও জানা কথা যে তিনি কখনও সে অনুরোধ করবেন না তাদের কাউকে।…এমন সদাশয় ধর্মভীরু লোকের সম্পর্কে আসতে পারাও ভাগ্যের কথা !

একটু আমতা আমতা করে তাঁর প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম।

সে বয়সের আশাবাদী মন, সব জিনিসে শুভের ইঙ্গিত খুঁজে পায়। ওকালতিতে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই খুব পশার হবে, এই কথা ভেবে মন হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠে। সেই সন্ধ্যা থেকেই মহেশবাবুর নাতি-নাতনীদের পড়ানো আরম্ভ করে দিই।

ওকালতি আরম্ভ করে, প্রথম কয়েকদিন চিরাচরিত প্রথানুযায়ী পুরনো উকিলদের বাড়ী আলাপ পরিচয় করতে যাই। 'এসেছেন—বেশ ! বেশ !"—এমনি ভাব প্রত্যেকের। যাঁরা করে খাচ্ছেন তাঁরা বললেন—"ওকালতি এমন একটা লাইন, যেখানে মনীষা থাকলে তার স্বীকৃতি হবেই হবে।" যাঁদের পশার কম, তাঁরা বললেন "সে দিনকাল আর নেই। এ পেশা এখন একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পশার জমাতে হ'লে শুধু খোশামোদ করতে হবে দালালদের আর হাকিমদের। আইন জানাবারও দরকার নেই, বই পড়বারও দরকার নেই।"·· বুড়ো সরকারী উকিল নিষেধ করলেন নেক্-টাই ব্যবহার করতে ; উকিলে গলাবন্ধ কোট পরলেই নাকি জজ ম্যাজিষ্ট্রেটরা খুশী থাকেন।

এরপর বার-লাইব্রেরীতে গিয়েও নিস্তার নেই। অজস্র অযাচিত উপদেশ নীরবে গিলতে হয় প্রত্যহ। কিন্তু নিজের মক্কেলের কাছ থেকে একদিনের জন্যও একটা দুটো টাকা পাইয়ে দেবেন এই নবাগত উকিলকে, সে লক্ষণ দেখা গেল না কারও।

অন্য উকিলদের গতিবিধির উপর নজর রাখা প্রত্যেক উকিলের ডিউটির মধ্যে পড়ে। তিন দিনের মধ্যে দেখি, যে আমার প্রাইভেট টুইশানি করবার কথা বারলাইব্রেরীর প্রত্যেকে জেনে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল অযাচিত উপদেশের নূতন স্রোতের ধারা।…প্রাইভেট টুইশনি করে জানতে পারলে, মক্কেলরা নাকি মরে গেলেও সে উকিলের কাছে যায় না।…"ছেলে পড়িয়ে ওকালতি পেশা আরম্ভ করলে, শেষ পর্যন্ত ওই ছেলেই পড়াতে হবে পেট চালানর জন্য।·· আপনার ভালর জন্যই বললাম কথাটা।…যা ভাল বিবেচনা করেন করবেন।"…

দিনে কয়েক কারও কথায় কান দিইনি। তারপর একদিন বুড়ো সরকারী উকিল আমার কাঁধে হাত দিয়ে ডেকে নিয়ে গেলেন একান্তে। কোটের গলার বোতাম আমি খুলে রাখি কেন এই প্রশ্নটি করবার পরই তুললেন আমার প্রাইভেট টুইশানির কথাটা। ও সম্বন্ধে বারলাইব্রেরীতে শোনা উপদেশের পুনরাবৃত্তি করলেন তিনিও। এরপর আর উপদেশটিকে নেহাত ফেলনা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।…

সত্যিই তো ! তাঁর মত বুড়ো মানুষের আমার প্রতি সদিচ্ছা ছাড়া আর কি স্বার্থ থাকতে পারে !…

ঠিক করে ফেললাম যে মহেশবাবুর নাতিনাতনীকে পড়ানো ছেড়ে দেবো। আর যাবনা।…বুঝি যে সেই সদাশিব বৃদ্ধ দুঃখিত হবেন। কিন্তু উপায় কি ?

টুইশানি ছেড়ে দেবার কথা মুখে নিয়ে তাঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা করে। তার চেয়ে চিঠিতে সব কথা গুছিয়ে লেখা অনেক সহজ। তাই করলাম শেষ পর্যন্ত।

হট্ করে লোকের কথায় একটা রোজগারের রাস্তা বন্ধ করে ফেলে, খুব অসুবিধায় পড়তে হবে ভেবেছিলাম, কিন্তু আমার বরাৎ ভাল। সেদিন কোর্ট কম্পাউণ্ডের মধ্যেই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল কলেজের সহপাঠী হরিশ সরকারের সঙ্গে। সেও অবাক, আমিও অবাক। সে এখানে ইনকামট্যাক্স অফিসার হয়ে এসেছে, এ খবর আমার জানা ছিল না। সে ছিল ক্লাসের বেশ ভাল ছেলে ; আর আমি ছিলাম পিছনের বেঞ্চের দলে। সেইজন্য কলেজে তার সঙ্গে সে রকম বন্ধুত্ব ছিল না। কিন্তু বিদেশে হঠাৎ দেখা হওয়ায় সে আন্তরিক আনন্দিত হল। আমায় ধরে নিয়ে গেল অফিসে তার বসবার ঘরে। চা এল। বহুক্ষণ ধরে গল্পগুজব হ'ল।

পরের দিনই দেখলাম রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে চারিদিকে, যে ইনকামট্যাক্স অফিসার আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। দু'জন অপরিচিত রাজস্থানী ব্যবসাদার, আমাকে অযথা নমস্কারও করল রাস্তায়।

এক সপ্তাহের মধ্যেই দেখি একটি দুটি করে মক্কেল জুটতে আরম্ভ করেছে, আমাকে দিয়ে তাদের ইনকামট্যাক্স রিটার্ণ লেখাবার জন্য। ব্যাপার দেখে শুনে ইনকামট্যাক্স আইনের বইয়ের জন্য অর্ডার দিলাম—ওকালতিতে ঐ লাইনেই বিশেষজ্ঞ হব ঠিক করে।

এদিকে মহেশবাবুর বাড়ীর টুইশানির জের তখনও মেটেনি। প্রথম দিন মহেশবাবুর বাড়ীর চাকর, আমার নামে একখানা চিঠি নিয়ে হাজির। খুলে দেখি তার মধ্যে তিনখানি পাঁচ টাকার নোট আর একখানি এক টাকার নোট। যে ক'দিন কাজ করেছিলাম তার মাইনে। ষোল দিনের ষোল টাকা।

টাকাটা নিতে আমার বিবেকে বাধলো। আমাকে সাহায্য করবার জন্য তিনি চাকরিটি দিয়েছিলেন। আমি দিন কয়েকের মধ্যে স্বেচ্ছায় যে কাজ ছেড়ে দিয়েছি। ও টাকা কখনও নেওয়া যায় ?…

সেই চাকরের হাতেই টাকা কয়টি ফেরত দিলাম। এক টুকরো কাগজে লিখেও দিলাম "টাকা কয়টি দিয়ে অযথা আমায় লজ্জা দিচ্ছেন কেন ?"

ভাবলাম ব্যাপারটা মিটল ; কিন্তু মহেশবাবু নিশ্চিন্ত হতে দিলেন না। দিন তিন চার পরেই মনিঅর্ডার এল একখানা আমার নামে। প্রেরক মহেশবাবু। কুপনে লেখা—"মনিঅর্ডার কমিশন বাদ দিয়া পনর টাকা বারো আনা পাঠাইলাম।"

মহা ফাঁপরে পড়লাম।…এক পাড়ার মধ্যে এখান থেকে এখানে মনিঅর্ডার ! ডাকপিয়নের চোখের দিকে লজ্জায় তাকাতে পারিনা, মনিঅর্ডার ফেরত দেবার সময়।

ফেরত দিয়েও নিস্তার নেই। দিন কয়েক পর আবার টাকা এল। এবার পনর টাকা আট আনার। পিয়নের চোখেমুখে কৌতুকের হাসি। এবার মনিঅর্ডার ফেরত দেবার সময় সে বুঝে গেল যে, আমার আর মহেশবাবুর মধ্যে এ একরকম খেলার মত দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এ খেলায় আনন্দ নেই। প্রতিযোগিতায় খেলবার সময়ের মত একটা জেদাজেদির ভাব এসে পড়েছে আমার মনে। প্রতিবার টাকা ফেরত দেবার মুহূর্ত থেকে প্রতীক্ষা করতে হয় পরের মনিঅর্ডারের জন্য। এ ধৈর্যের পরীক্ষায় যে কি মানসিক অস্বস্তি, তা বলে বুঝোবার নয়। একমাত্র ভরসা যে ক্রমেই কমে আসছে টাকাটা।

এইভাবে চলতে চলতে যেদিন টাকাটা শেষ হ'ল সেদিন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তখনও কয়েক আনা পয়সা বাকি ; পোষ্টঅফিসের নিয়ম অনুযায়ী সে কয়েক আনা মনিঅর্ডারে পাঠানো যায় না।

সেদিন সন্ধ্যায় বৈঠকখানায়—বসে আছি। বালাপোশ গায়ে, খড়ম পায়ে মহেশবাবু এসে ঢুকলেন। বাড়ীতে তাঁদের দুখান গাড়ী, তবু এই শীতের রাত্রে বৃদ্ধ হেঁটে এসেছেন! বনেদী পরিবারের লোক—অযথা বাড়ীর বাইরে বার হওয়া চিরকালই কম; আজকাল চব্বিশ ঘণ্টা ধর্মকর্ম নিয়ে থাকায় নিজের কম্পাউণ্ডের বাইরে আসা তাঁর আর ঘটে ওঠে না কখনও। এহেন মহেশবাবু এই গরীবের কুটিরে পায়ের ধূলো দিয়েছেন! প্রণাম করে তাঁকে বসবার চেয়ার এগিয়ে দিই। মাইনের টাকার কথাটা বোধহয় আবার তুলবেন ভেবে মনে মনে অস্বস্তি বোধ করি।

"একটা কাজে এলাম তোমার কাছে। তোমাকে আর কিন্তু আপনি বলতে পারব না—এখানকার বাসিন্দেই যখন হয়ে গেলে।..."

"হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি আপনার নাতির বয়সী ; আমাকে তুমি বলবেন না তো কি বলবেন।"

"অনেকদিন আগেই আসতাম। কিন্তু তোমার পাওনাটা চুকিয়ে দেবার আগেতো তোমার কাছ থেকে কোন কাজ নিতে পারি না—জানাইতো আমায়। বিবেকে বাধে। শুচি-বাইএর মত এও একরকম রোগ কিনা, জানি না। তবে কারও পাওনা মিটিয়ে না দেওয়া পর্য্যন্ত নিজেকে কেমন যেন দোষী দোষী মনে হয়। জেনেশুনে তো কোন লোককে ফাঁকি দিইনি আজ পর্যন্ত ; অজানতে আবার কারও পাওনা ফাঁকি দিয়ে ফেলি, সেই ভয়ই আমার অষ্টপ্রহর। তাহলে যে সেখানে গিয়ে ফাঁকিতে পড়ব নিজেই। তিনি যে উপর থেকে সবই দেখছেন!...এই নাও। ধরো। এই কাগজগুলো দেখে রেখো! আমার ইনকামট্যাক্সের। তোমার সঙ্গেতো শুনি ইন্‌কামট্যাক্স অফিসারের খুব আলাপ। আমার রিটার্ণটা তোমাকে দিয়েই দাখিল করাব ঠিক করেছি। বসাকদের গোলা থেকে পাওয়া সুদের টাকাটা দিও না রিটার্ণে। অফিসার পরে যদি গোলমাল টোলমাল করে, তখন তুমিতো আছই। সরকারী-পাওনার ব্যাপার।—সব বেশ গুছিয়ে বাঁচিয়ে লিখো। এখনকার মত এই যোল টাকা রাখ; পরে আরো দেবো।—আচ্ছা আজ তাহ'লে উঠি। নারায়ণ! নারায়ণ!"

বৃদ্ধ চলে গেলেন।

তাঁর কাছ থেকে এ যোল টাকা নিতে আর আমার কোন বিবেকের বাধা ছিলনা। এ যে আমার ওকালতির ন্যায্য ফী! দমকা রোজগারের তৃপ্তি নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসি, বৃদ্ধের কাগজপত্রগুলো একবার নাড়াচাড়া করবার জন্য। হঠাৎ নজরে পড়ল। টেবিলের উপর দেখি রাখা রয়েছে কয়েক আনা পয়সা। গণে দেখলাম ঠিক সেই বাকি ক'আনা।

গল্প কণ্ডুয়ন

তারাপদ গংগোপাধ্যায়

—তুনএকসপ্রেস। বোনকে নিয়ে যাচ্ছি, কাশী থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করলো আর সেখানেই ইণ্টারমিডিয়েট পড়বে।

বল্লে সুবিমল, বেশ খোসমেজাজে, ট্রাউজারের একটা কোণ পার পাতার নীচে গোড়ালীর ওপর ঝুলে রয়েছে, ঘি রংএর সার্ট, স্বাস্থ্য উজ্জ্বল চেহারা—সেই সার্টএর নীচে মনোরম লোভনীয় দেহ।

—এবং আমার ওপর ভার পড়লো ওকে বেনারসে পৌছে দিতে। সুবিমল আবার বল্লে, সিগারেটের টিনটা টিপয়এর এদিক থেকে ওদিকে সরিয়ে রেখে আর ম্যাচটা হাতের মুঠোর ভিতর চেপে।

ওর মুখোমুখি আর দুই শালী, যাদের ঝলমলে শাড়ী, মসৃণ গাল ঘাড়, উন্মুক্ত হাতের সব। ওর বড় শালা, মানে সুবিমলের কলেজ জীবনের বন্ধু তারপর এই নতুন সম্পর্ক—তার মুখে পাইপ জ্বলছে, আর তার পাশে শালাজায়া যে উৎসুক ঠোঁটে তুলতুল ক'রে হাসির চাপ চিবুকের নীচ অবাধে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে। সুবিমলের বিয়ে হোয়ে যাবার পর দল বেঁধে, কলকাতা থেকে এই ডিহিরি-অন-শোনে, সুবিমল কিভাবে আছে এবং কি হোয়েছে, এই দেখতে এয়েছে। এবং বিকেলে নদীর ওপার থেকে ঘুরে আসার পর এই সন্ধ্যা, এই মসনদী জল্পনা।

—তারপর বলুন। শালাজায়া মানে সুবিমলের ক্ষণাবৌদি বল্লো—চুপ করলেন যে।

—বলে নাও। মেয়েরা একবার প্রেমের গন্ধ পেলে সে গন্ধ একেবারে পেট চিরে যতক্ষণ না বের করতে পারছে, ওদের খুসী আসবে না।

সুবিমলের দুইশালী, ইলা আর পিংগলা রাংগিয়ে উঠলো।

—তুমি চুপ করো তো! ক্ষণাবৌদি স্বামীর দিকে চোখ রাংগালো।

—বৌদির কি সত্যিই সবুর সয় না। সুবিমল হাসলো।

যার দিকে তাকিয়ে ক্ষণাবৌদির এই মেজাজ, সে যেন নির্বিকার, পাইপ দাঁতের ফাঁকে চেপে নিয়ে আর এক মৌতাতী রসে মসগুল।

সুবিমলের দুই শালী, সেই ইলা আর পিংগলা, একটু নড়েচড়ে বসলো। আর শাড়ীর খসমস শব্দ পেয়ে সুবিমল ওদের দিকে তাকালো।

—সত্যিই কি তোমরা শুনতে চাও ?

পিংগলা বৌদির দিকে তাকিয়ে একটু হেসে উঠলো। ইলা চুপচাপ হাসলেও যেন গলে পড়লো। যেন মনের ভিতর কিসের চাপা অনুভূতি কুলকুল ক'রে গলার কাছে এসে আটকে গেলো।

—সৌম্যেন, তোমার কি মনে হয়, বলবো! সুবিমল কৌতুকে টানটান।

—ডোণ্ট বি স্ল্যাংগ প্লিজ! তোমার-তো আবার গুরুলঘু ভেদ নেই। সৌম্যেন পাইপ আবার দাঁতে চাপলো।

—তুমি চুপ ক'রো তো। ক্ষণাবৌদি স্বামীর দিকে তাকিয়ে চোখ ঠারলেন।

—না আপনি বলুন। বড় শালী ইলা মৌমাছির মত গুণগুণ ক'রে উঠলো।

শুধু পিংগলা চুপচাপ হাসলো, যেন আয়নার ভিতর নিজের মুখ স্বয়ম্ভু ক'রে দেখবার মত।

—তোমার কি মত? ইলার দিকে তাকালো সুবিমল।

—ও আবার কি বলবে? ওর কি বুঝবার মত বয়স হোয়েছে? ক্ষণাবৌদি ঝিকিয়ে উঠলেন। যেন এক গাঁদা আবিরের ভিতর কুঁকড়ে ওঠে ইলা, গালের ধার থেকে ঘাড় অবধি আপেলী লাল।

আর এই সময়, ইরু মানে ইরাবতী, পিংগলা আর ইলার দিদি, সৌম্যেনের ছোট আর সুবিমলের একমাত্র বাস্তব শ্রীমতী—সেই ইরা ট্রে হাতে নিয়ে ঢুকলো। ঢোকার সময় যে চূর্ণ অলোক ফুরফুর ক'রে গালের কাছে উড়ছে।

—খুব গুল দিচ্ছো? সুবিমলের দিকে তাকালো ইরা।

—তোমরা শুনলে কি বিশ্বাস করবে। এক জায়গায় শুধু আমি অবিশ্বাসের পাত্র। যেন সিনেমার ঢংএ বিনিয়ে বিনিয়ে, ন্যাকা ন্যাকা সুরে বল্লে সুবিমল, নিজের বৌএর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। দুই শালী খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো।

—যে লোক পথেঘাটে এমনি মেয়ে দেখলেই ঘুরঘুর ক'রে, তাকে বিশ্বাস করাও অন্যায়। ক্ষণা বৌদি আলতো হাসিতে টইটুম্বুর হন।

—তোমার কি মত? ইলাদির! ইলার দিকে তাকালো সুবিমল।

আর ইলা পেছনে সরে গিয়ে একটু হাসলো। যেন কোন মাগুরের বাচ্চা এইমাত্র গর্তে লুকাচ্ছে।

—আশ্চর্য! তুমিও ওদের দলে? বুঝেছি, তোমারও গিন্নী হ'বার মত বয়স হয়েছে যেন। সিগারেটে টান দিয়ে সুবিমল গলগলিয়ে ধুঁয়ো ছাড়তে লাগলো। যেন ইঞ্জিনের ষ্টিম ছেড়ে দেওয়ার মত।

—দ্যাখো, কথা যদি একবার বেড়িয়ে যায়, তা কিন্তু আর ফেরানো যায় না। হঠাৎ ইরা যেন নরমসরম ধুনে আশ্চর্য ঝাঁজ টানলে। একথা যেন নখদর্পণে—সুবিমলের কথা এখন কোনখানে পৌছুবে এবং পৌছুচ্ছে। কথায় বার্তায় যে সুবিমল 'লেহাজহীন, বেহায়া।'

—যেন এই মাত্র মনে হোলো পলাশবনে আগুন লাগলো। সুবিমলের হাসি চৌগুণ হোয়ে ফেটে পড়ে বল্লো।

—আমি মনে করেছিলাম হরিতকী বনে খেঁকশিয়াল এলো। সংগে সংগে ক্ষণাবৌদি বলে উঠলেন।

এমন কি সৌম্যেনও কথাটায় হাসলো।

—তুমি কি তোমার বৌএর কৃতিত্বে হাসলে।

সৌম্যেন এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে তেমনি দাঁতের ফাঁকে আবার পাইপ টানলো।

—ব্যঙ্গপনা রেখে আরম্ভ করুন। ক্ষণা বৌদি আবার হাসলেন, যেন রাংতা মোড়া খাপের মত তার দাঁতগুলো চিকচিক ক'রে উঠলো।

—আমি তাহ'লে উঠি। ইরার চোখ কুহক টানা, যেন শেন পাখীর দৃষ্টির মত চোখে সামান্য ঝিলিক উঠেই সে চোখ হাসির ছটায় আবার দুল্লো।

—তোমার আবার কি হ'লো। ক্ষণাবৌদি তাড়াতাড়ি আঁচল টেনে ধরলো, যেন সত্যিই ইরু, মানে ইরাবতী উঠবে, যেন সুবিমলের ওপর রাগরাগ চোখ নিয়েই।

—যা তা বলতে আরম্ভ করবে তাই বসে বসে শুনবো?

সুবিমল চুপচাপ, টেনে আনা গাম্ভীর্যেও হাসি প্রতীয়মান।

একটু চুপচাপ হ'লো সত্যিই। ট্রের ওপর কাপ ডিস এদিক ওদিক সরাবার শব্দটুকু শুধু। মেয়েদের চোখ নিজেদের ভিতর দেওয়া নেওয়া হোলো কয়েকবার।

—নাও আরম্ভ করো। সৌম্যেন পাইপটা হাতের আংগুলের ভিতর টেনে আনলে—আবার চুষতে চুষতে ছোবা পর্যন্ত বের ক'রে ছাড়বে।

যেন কাকে বলা হোলো তা সবাই বুঝলে, এবং সে ছাড়া কৌতুকে সবাই একটু আবার ধোওয়া-মোছা পায়রার মত ফুরফুরে হোয়ে উঠলো।

—দ্যাখো, সবখানে পাইপ টানাটাই একমাত্র কৃতিত্ব না। ক্ষণা বৌদির চোখ এবার সত্যিই উজ্জ্বল, বেখাপ্পা।

—তুমি কি মেয়েদের মেজাজ জানো? সৌম্যেন তেমনি নির্বিকার, পাইপ দাঁতের ফাঁকে তেমনি চাপা—এবং যদি জানো, সুবিমল তুমি তোমার কাহিনী আরম্ভ করো, না হয় শেষে এ ঘটনা নিয়েই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

—আমার কি শেষে এই বিশ্বাস করতে হ'বে! সুবিমলও এই খুনসুটি নিয়ে ক্ষণাবৌদির দিকে রসে টইটুম্বুর।—সত্যিই বলবো?

—আমরা তোমার গল্প শুনবার জন্যেই তৈরী। সৌম্যেন তেমনি নিবিকারভাবেই বল্লে, তেমনি নিজের ধর্মজায়ার দিকে, নির্মোক উপভোগের আনন্দের জাল টেনে টেনে।

সন্ধ্যা নেমে আসছে, ছোট্ট আংগিনার ওপর। দূরে রাঁচী হাজারীবাগ রেঞ্জের দিগবলয়, শোনের ওপর হাল্কা সন্ধ্যা, ব্রীজের নিচে বিজলী বাতি। নদীর জল শুখিয়ে এখন ধূ ধূ করা বালির ওপর ধূসর সন্ধ্যার বেলোয়ারী অন্ধকার।

—সত্যিই বলবো? ক্ষণাবৌদির দিকে তাকিয়ে সুবিমল হাসলো—যে সবচেয়ে একমাত্র রসে রসিক সেই যদি চুপচাপ থাকে ধূপের ধোঁয়া আসবে কোত্থেকে।

এবার ক্ষণা বৌদি সত্যিই হাসলো, ইলা পিংগলাও।

সুবিমল মৌতাতী মেজাজে ভাসলো।

—ঘটনাটি খুব স্বাভাবিক।

সুবিমল বলতে যেতেই ইলা পিংগলার নীল শাড়ী খসখসিয়ে উঠলো, ক্ষণাবৌদির সাদা মার্বেল পাথরের মত আংগুল দিয়ে ঘাড়ের ওপর শাড়ীর আঁচল টানটান করে দিলো।

—ঘটনাটা প্রায় অবান্তরের মত, এমন কি অনুজ্জলও বোধহয়। অন্তত আজ তাদের কাছে।

ক্ষণাবৌদির দিকে তাকাতে তাকাতে বললে স্থবিমল—এবং এ কাহিনীটা ইরার কাছেও বলেছি। ওর মন্তব্য-রটন। হিংসায় কিম্বা অন্যকিছুতে কিনা জানি না, তার এই মন্তব্যও জানিয়েছে।

—আগে থাকতেই যা-তা আরম্ভ কোরো না। ইরু তেঁতে উঠলো।

—আগেই উতলা হোস কেন? ক্ষণাবৌদি হাসতে হাসতে ইরুর হাতে চাপ দিলো। ইলা পিংগলা আমেজ পেয়ে একটু নড়ে চড়ে উঠলো।

আর সৌম্যেন রান্নাঘর থেকে রান্নার চমৎকার একটা সৌরভ আসতেই সেইদিকে তাকালো।

—কি রান্না হ'চ্ছে বলোতো! সৌম্যেন ঘাড় সিধে ক'রে কিচেনের দিকে চোখ ফেরালো।

—কেন? তোমার মুখ বুঝি চুলবুল করছে। স্থবিমল সৌম্যেনের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

—তুমি যাওতো? পেটুক মানুষের কেবল খাবার চিন্তা? ক্ষণাবৌদির বিতৃষ্ণা আন্তরিক, স্বামীর দিকে তাকিয়ে সত্যিই এবার তাঁর চোখ গোল।

সৌম্যেন কথা গায় না মেখে পাইপ দাঁতে চাপলো।

—অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে। সৌম্যেন দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ আংগুলের মাঝে আনলো—সত্যি তোমার রুচি আছে। পারহ্যাপস্ চিকন রোষ্ট! আমি যদি তোমাদের এখান থেকে উঠি?

—সত্যিই তুমি কি রান্নাঘরে যাচ্ছো? ক্ষণাবৌদির চোখ সত্যিই কপালে উঠে, গোল আলুর মত গোল, বিস্ময়ে বিভ্রান্ত—ষ্ট্রেঞ্জ! সিলি! বললেন তিনি।

—তোমার গিন্নীর লজ্জা লাগছে। স্থবিমল ফুরফুর করে হেসে উঠলো।

সত্যিই ক্ষণাবৌদি চুপচাপ হোয়ে ওঠেন, নিজের স্বামীর এই ঘটনায় লজ্জা কেন যন্ত্রনায় তাঁর মুখে-চোখে তুরতুর করে নড়ে।

চারদিকে আরো অন্ধকার জমা হোয়েছে, দূর ঝাপসা এখন। ফুরফুরে হাওয়া।

বোধহয় এই হাওয়ায় ক্ষণাবৌদি আবার নাড়াচাড়া দিয়ে ওঠেন—ওসব ট্র্যাস ছেড়ে আবার আরম্ভ করুন। যে ডিস্টার্বিং, তার যাওয়াও মংগল।

—যেখানে নিজের মুখেরও লাগাম নেই। সেখানে দাদার যাওয়া ভালই হোয়েছে। ইরু, মানে স্থবিমলের বৌ, স্থবিমলের দিকে তাকালো।

—তোমাদের অভিমত? স্থবিমল ইলা পিংগলার দিকে তাকালো।

—কি যাচ্ছেতা! পিংগলা ঝিলমিল দিয়ে রোদ আসার মত ঠোঁট দু'খানা হাসি দিয়ে ঢাকলো।

আরো একছিটে বাতাস এলো, সিরসির করে তেঁতুল পাতা নড়ার মত। ইলা গার ওপর আঁচল টেনে দিয়ে আরো একটু ঝুঁকলো।

—ইলা শুনবার জন্য তৈরী হোয়েছে। স্থবিমল দেখে হাসলো।

—আমি কি তাই বলেছি? ইলা লজ্জায় লাল।

—সত্যি আপনি বাজে কথা বলতে পারেন, এবং অতি বাজে কথা। ক্ষণাবৌদি এবার সত্যিই অসন্তোষে নড়েচড়ে ওঠেন—একটা কাহিনী শুনতে এত তেলনূন মাখতে হয়! পরক্ষণেই কৌতুকে হাসতে গিয়ে তাঁর কানের কাছে দুলজোড়া তিরতির করে ঝিলিক মারলো।

একটুকরো হাল্কা মেঘের মত স্থবিমলের ঠোঁটে হাসি, যেন পাক খেয়ে খেয়ে একটা কবুতর নামার মত।

—তোমার দাদা জানিয়েছে আমি স্ল্যাংগ এবং তোমার বৌদি জানালো আমি বাজে কথা বলি। বলেই ইরুর দিকে তাকিয়ে স্থবিমল আর একবার হাসলো—অবশ্য এবার আমার কাহিনী আরম্ভ করতে হয়। উচিত। বলে আবার নিজে দুই শালীর দিকে তাকালো। ইলা পিংগলা, যাদের ঠোঁটের ওপর এই কথা বলার পর পাতলা হাসি ফুরফুরে তুলোর মত ফুলে কেঁপে উঠলো।

—মাস শ্রাবণ। এবার স্থবিমল সত্যি আরম্ভ করলো। ক্ষণাবৌদি মধুর হাসি হেসে আশ্চর্যভাবে সামনে একটু ঝুঁকে এলেন। দুই শালীর হাতে চুড়ির রিনঝিন শব্দ উঠলো। এবার সত্যিই স্থবিমল আরম্ভ করেছে।

—তুনএকসপ্রেসে ভীড় নাই। ইন্টার ক্লাসে! ছোট কামরা ছিলো। আমরা একটা বেঞ্চ দখল করেছি। আমি আর আমার বোন। মাঝখানের বেঞ্চে সস্ত্রীক এক মাড়োয়ারী যুবক। জানালার পাশাপাশি কয়েকটি বাংগালী ছেলে—আসাম মেলে নামতে পারে কিম্বা গোমোতেও। ওদের হাতের সিগারেটের ধুঁয়ো সমস্ত কামরাময় ঘুরঘুর করে নাচছে।

ঠিক এমনি সময়ে আমার কাহিনীর মালিক এসে উপস্থিত হ'লো। অবশ্য নায়িকাও বলতে পারেন।

(ক্ষণাবৌদি কথাটা শুনে 'আশ্চর্য' শব্দটা উচ্চারণ করলেন।)

—একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। স্থবিমল ক্ষণাবৌদির হাসিটুকু দেখে দুই শালীর দিকে তাকাল, যাদের ঠোঁটে পর্যন্ত মৌতাতী হাসি—ছেলেটির চেহারা যেমনি কালো তেমনি চৌকোস আর মেয়েটির চেহারা যেমনি ফরসা তেমনি আগুন। ইরা জানে আমি ঘুম কাতুরে, (এই কথা বলে ইরুর দিকে তাকিয়ে স্থবিমল একটা সিগারেটের তুল্লো, যেন এই তোলাটার ইরাই উপলক্ষ্য)।

—আপনি যে ঘুমকাতুরে এটা স্বীকার করেই নিলুম। ক্ষণবৌদি ইরার দিকে তাকাতে দেখেই বলে উঠলেন।

—আচ্ছা খুসী হ'লুম। স্থবিমলও সংগে সংগে বল্লো।

—কম্পার্টমেণ্টে যে যায়গা ছিলো, তাতে অন্য কেউ এলে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হোতে পারে। স্থবিমল আবার আরম্ভ করলে—ওদের আসা দেখে আমি বোনের দিকে তাকালুম, বোন আমার দিকে। আমি দিব্যি ঘুম দেবার জন্যে হোল্ডঅল বিছিয়ে নিয়েছি, মাঝখানের বেঞ্চে সেই মাড়োয়ারী তরুণ দম্পতি, ওদিকের বেঞ্চে সেই বাংগালী তরুণদল।

—একটু যায়গা যদি দ্যান। ছেলেটি বল্লে। মেয়েটির চোখে—'যায়গা পেলে খুসী' একথা স্পষ্ট উচ্চারিত। আমি জানালুম—গাড়ী প্রায় খালি, যদি অন্য কোথাও যায়গা না পান নিশ্চয় দেবো।

এইটুকু শুনেই সবাই গুটিসুটি মেরে বসলো। এমন কি ইরু মানে ইরাবতী পর্যন্ত; যেন ঘটনার এটুকু ইরার কাছে পর্যন্ত নতুন, তার চোখের দৃষ্টি আকর্ষণ বিস্তৃত, স্থবিমলের দিকে কিসের সন্দেহে টানটান।

—ছেলেটির পরনে ছিলো সাদা সার্ট,—স্থবিমল সিগারেটটা আবার কৌটোর ভিতর রাখলো—

ঘিয়ে রংএর ট্রাউজার। মেয়েটির গায়ে বকের পালকের মত সাদা ব্লাউজ আর রক্তের মত লাল শাড়ী। যেন চৈত্রের পোড়া মাটীর ওপর রাংগা পলাশের ঝিলিক। ওরা চলে যেতেই আমি বোনের দিকে তাকালুম বোন আমার দিকে, যেন উভয়েই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে পেরেছি। আরামের পুর্ণ মেজাজ।

—সত্যিই কি স্বস্তির নিঃশ্বাস? ক্ষণাবৌদি যেন চোখের তারায় ঝিলিক মারলেন।

—আপনার কি মনে হয়। স্থবিমলের চোখ হঠাৎ কথাটা না বুঝে একটু বিভোল।

—আচ্ছা থাক, আপনি আরম্ভ করুন। ক্ষণাবৌদি আবার নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। এবার স্থবিমল হেসে উঠলো, ফুরফুর করে শুকনো পাতা গড়িয়ে পড়ার মত।

—কিন্তু মিনিট পরেই দেখি ওরা আবার আমাদের গাড়ীর দরজায়। স্থবিমল যেন আসল প্রসংগটা মৌতাত করবার জন্যে এখানে রংগীন করে থামলো। ক্ষণাবৌদি 'আচ্ছা' শব্দটা সংগে সংগে ফুস কোরে ঠোঁট থেকে আল্গা ক'রে দিলেন।

—আর কোথাও ঠিক যায়গা হোলো না। ছেলেটি ঢুকেই বল্লে। বোনকে বল্লাম—তুই ও কোণা নে। আমি সরে বসতে না-বসতেই যেন বিদ্যুতের গতির মত আমার হাতের ওপর বসে পড়লো। বসে পড়েই একটা 'স্যার' উচ্চারিত হোলো। পরক্ষণেই 'ফিল্‌দি গরম'। আর আমি বোকা বনে গ্যাছি-কি-না-গ্যাছি এই ভাবতে যেতেই একটা শব্দ পেলুম, বোধ হয় মেয়েটির চুলের কিম্বা দেহের। বোন ততক্ষণে তার সাথে আলাপ জামিয়েছে, মেয়েটি কাশী যাবে—বোন সংগী পেয়ে সত্যিই আনন্দে মশগুল। আমি শুঁকছি সেই গন্ধ, যে গন্ধ ওর চুলের কিম্বা দেহের—লাল শাড়ীর আঁচলের নীচে নগ্ন কনুই। ঘাড়, চিবুক।

—হাউ সিলি! মেয়েদের দিকে তাকাতে এভাবে আপনার লজ্জা করলো না? ক্ষণাবৌদি আশ্চর্য কুহকে উজ্জ্বল।

—তোমার কি মত? স্থবিমল নিজের বৌএর দিকে তাকালো।

—ওর মতামত পরে, আপনার কথা আগে শুনি। ক্ষণাবৌদি ঔৎস্থক্যে আরো গোল।

স্থবিমলের দুই শালী, ইলা আর পিংগলা, বোকা বোকা চোখ নিয়ে স্থির।

—তারপর! পিংগলা স্থবিমলকে একটু চুপচাপ দেখে বলেই ফেল্লে।

—একটা মেয়ের শরীর কতখানি নরম হোতে পারে, স্থবিমল যেন রংগীন রসে টইটম্বুর হোয়ে যেন চোখ বুজেবুজে বলছে, এভাবে বলতে লাগলো—একটি মেয়ের হাসি, ঠোঁট, ভ্রূভংগী?

স্থবিমল বলতে বলতে যেন এক বেলোয়ারী চুড়ির ঠুনঠুন আওয়াজ তুল্লে।

ক্ষণাবৌদির কাঁধের আঁচল নীচে খসে গ্যাছে।

—সত্যিই তোমার ঠাকুর ভাল রান্না করে হে। এমনি সময়ে যেন ভগ্নদূতের মত, যেন আচমকা সৌম্যেন বলে উঠলো। আর এই সময়ে কেউ ক্ষেপে উঠতে পারে, আর উচিত।

—তুমি কি সময় অসময়ও বোঝো না। কেবল খাওয়াটাই চিনেছো? ক্ষণাবৌদি ঝাঁজিয়ে উঠলেন।

—তোমার গল্প বোধ হয় ক্লাইম্যাক্সএ পৌচেছে। সৌম্যেন যেন সত্যিই লজ্জা পেয়েছে! নিজের

বৌএর দিকে না তাকিয়ে স্থবিমলের দিকে তাকালো—তাহলে তুমি শেষ ক'রে ফ্যালো। না হয় শেষে আমার ভুগতে হ'বে। মেয়েদের ইনকুইজিটিভনেস বড় সাংঘাতিক।

—ঘ্যাখো বাজে কথা বোলোনা। ক্ষণাবৌদি চিড়মিড়িয়ে উঠলেন।

—তুমি চুপ করলেই তো পারো! ইরু ক্ষণাবৌদির পক্ষ নিয়ে এই কথা বলতেই আরো যেন সবকিছু বেফাঁস হোয়ে পড়লো।

—তুমি অন্যায় কথা উচ্চারণ করেছো। মেয়েদের সম্বন্ধে মেয়েরাই বলতে পারে।

যেন তারপরে কেমন তালগোল পাকিয়ে উঠলো।

—আমার আসাটাই বোধ হয় ভুল হোয়ে গ্যাছে। সৌম্যেন স্যুপটা শেষ করে ডিসটা নীচে নামালো।

—ঘ্যাখো, যাতা বোলো না। ক্ষণাবৌদি আরো উত্তাল।

—বৌদি যদি আপনার আপত্তি না থাকে—ক্ষণাবৌদি যেন হাতটাই ধরলো না মনটাও—আমি প্রসংগটা যদি চাপা না রাখি কিম্বা কোন নিরিবিলি সময়ে আপনার কাছে বলি।

যেন ক্ষণাবৌদির মুখ ঝুলে উঠলো। যেন কিছু বুঝতে আর অনুধাবনে।

কথার ভংগীমায় পিংগলা ইলা হেসে উঠলো, এমনকি ইরু পর্যন্ত।

—তাই বোলো, বরঞ্চ গল্পটা ওদের কাছে আর একদিন গুছিয়ে গাছিয়ে বোলো। সৌম্যেন মাংসের স্যুপের কথা মনে ক'রে ক'রে বল্লো, তারপর পাইপ বের করে দাঁতের ফাঁকে চেপে নিয়ে।

জীবাণু

অমল দত্ত

পঞ্চমবার সন্তান কোলে নিয়ে বৌ সেবাসদন থেকে ফিরে এল। ছোট ভাই রিকশওয়ালার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বললে,—বৌদি, একাই ঢুকে পড়ো। তোমাকে কেউ অভ্যর্থনা করতে আসবে না। আমার অফিসের বেলা হয়ে গেছে, চল্লুম।

বোনেদের প্রথমটি কড়াতে হাতাটা ঘ্যাটাং করে নেড়ে বললে,—এসেছে !

দ্বিতীয়া নিচের ছোট্ট উঠোনে এক বালতি জলে সাবানে তোয়ালেতে মুখের ছাল ছাড়াতে ছাড়াতে বললে,—এসেছেন ?

ছোট বারান্দায় রান্নার সামনে বসে চেখে চেখে শর্টহ্যাণ্ড অনুশীলন করছিল। বললে, বারে অমন করছো কেন ? বাড়ির একটা জন বাড়লো—বাঃ কী ফুটফুটে হয়েছে মেয়েটা। এসো, বৌদি এসো।

প্রথমা ফোঁস করে উঠলো : এ বাড়ির মেয়ে হয়ে এসেছে। কপালে অনেক দুঃখু। তবু যদি ছেলে হতো।—তারপরেই চেঁচিয়ে ডাকতে আরম্ভ করলে, ওরে ও সাবি পোড়ারমুখি, ও মণ্টু—কাহ তোদের মা এসেছে রে !

দ্বিতীয়া আরো তিনটা সাবানের পোচ দিয়ে চোখে জ্বালা নিয়ে বললে, থাক দিদি, আর ওদেরে ডেকে কীর্তি দেখিয়ো না। দশ বচোরে অনেক দেখালে ভাই বৌদি ! ভাগ্যে আমরা ছিলুম—তাই, পার পেয়ে গেলে।

বৌ ঠাঁয় দাঁড়িয়েছিল। বড় ননদকে রাঁধতে দেখে তার বেশ মজা লাগছিল।

বিধবা পিসী পাশের ষ্টোররুমে ঝুলানো ঠাকুরের ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে মালা টপকাছিলেন। চেঁচিয়ে বললেন,—কোঠায় ঢুকোনা বৌমা, আমি আসচি। ওলো ও বিদ্যাধরী, উনুনে একটা ইট চাপিয়ে দেনা।

প্রথমা ও দ্বিতীয়ার চোখে চোখে হাসি খেলে গেল। ইস্কুলের গণ্ডী ছাড়িয়ে কলেজে কিছুদিন পড়ে ছোট বিদ্যাধরী খেতাব পেয়েছিল পিসীর কাছে—ফরমাইশে রাগ না করে ছোটও খুক খুক করে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

ততক্ষণে মেয়ে ও ছেলেরা মায়ের কাছে ছুটতে ছুটতে এসে জুটে গেছে। পিসীও বাইরে এলেন।

গরম ইটের'পর চেপে বসে বৌ অগ্নিশুদ্ধি হয়ে শোবার ঘরে ঢুকলো, আগে ভাগে নাতনী কোলে পিসী। পিসী দুঃখ করলেন তাঁর বৌঠানের জন্যে। কার সংসার কে আগলাচ্ছে। কার নাতনী কে কোলে নেয়। সন্তান ক'টিও অনেকদিন পর মাকে পেয়ে শোরগোল শুরু করলে। ছোট ছেলেটা মায়ের কোলে বসে শক্ত করে গলা জড়িয়ে ধরলে। বৌ শুধু চুপি চুপি পিসীকে একটা কথা বললে। পিসী বিগলিত হয়ে বললেন, আচ্ছা মা, আমার উনুনটা ধরিয়ে নি। আমিও তো চা খাব।

পিসির মনটাও আজ ভালো। নাতীন মুখ দেখে নয়। বৌ দশদিন পর ঘরে ফিরে এসেছে, ওঁর নিরিমিশ ব্যবস্থটা ভালোই হবে। ক'টা দিন আধপেটা কেটেছে।

বারান্দা থেকে প্রথম হাঁক দিল,—ও পিসী, তোমার বৌ কি চা খাবে তো বলো।

—কেন লা, ওকথা জিজ্ঞেস করচিস লা ?

—আমরা চা খাব কী না—আর কি, আমার তো এই বেলায় শেষ, এবার যার সংসার ও বুঝে নিক।

—কেন লা, তোরা কি সংসারের কেউ নোস !

—তা বই কি। ভায়ের সংসারের দাসী বাঁদী। বিনি পয়সায় আমাদের মত লোক আর পাবে কোথায়।

বৌ চুপে চুপে বললে,—থাক পিসিমা, আর কিছু বলো না। বিয়ে দিচ্ছে না বলে বড়দির এমনি মন খারাপ।

—তাতো হবেই বাছা, আমার পেটের শত্তুরটা বেঁচে থাকলে ওর বয়েসি হতো—আমি বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে এনে নাত-নাতনীর মুখ দেখতে পারতুম। কপালের লিখন নরকবাস, বেঁচেও যা মরেও তাই।

কোলের ছেলেটা ডুকরে কেঁদে বললে, মা, বাবা মেলেছে।

কোনো মাড়োয়ারি আমদানি-রপ্তানি কোম্পানীর ছোট হিসাব-বাবু একটু রাতেই বাড়ি ফিরে এল। হাতে মিঠে পান। বৌ খেতে ভালোবাসে। অনেক পারিবারিক ঝগড়াঝাটি মিঠে পানে মিটে গেছে।

প্রথমা বললে,—তোমার মাগ ফিরে এসেছে দাদা।

—তাতো আসবেই।

দ্বিতীয়া মুখ ফুলিয়ে বললে,—ওয়াণ্ডারফুল। দাদার মুখে হাসি দেখা দিয়েছে।

—তাতো দেবেই।

প্রথমা আবার বললে,—যাও, তোমার জন্যে মুখ ফুলিয়ে বসে আছে।

—যাঃ, ইয়ার্কী মারিস নি মাইরী।

পিসী আবার মালা টপকাচ্ছিলেন। ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন,—ছেলেটা খেটে-খুটে এসেছে, একটু জিরোতে দে। ওলো ও বিদ্যাধরী—

—বিদ্যাধরী এখানে নেই গো। ওর বন্ধুর বাড়ি গেছে পাঠ নিতে। আমরা ভায়ের সংসারের দুই গুণধরী এখানে—

বলে দু'বোন হেসে গড়াগড়ি খেল।

বৌ বিছানার উপর আড় হয়ে বসে পলতে দিয়ে কাঁচা মেয়েটাকে দুধ খাওয়াচ্ছিল।

স্বামীকে দেখে তার শীর্ণ মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

—খুব যাহোক। একদিনও সেবাসদনে গেলে না।

—আগে মিঠে পানটা ধরো ত, তোমার জবাব দিচ্ছি।

—তোমার ভালোবাসা ত মিঠে পান, তাও মাঝে মাঝে চুন বেশি থাকে।—বৌ পানটী মুখে পুরে একটু ঘরোয়া হবার চেষ্টা করলে।

—কী করে যাব বলো, একদিনও সময় করতে পারলুম না। হ্যাঁ ঐ রোববার শনিবার অবিশ্যি—তা বন্ধুবান্ধবরা জেনে ফেলেছে তুমি ঘরে নেই, তা একটু আধটু ইয়ে, আড্ডা ইয়ার্কী হলো। আর এই তোমার ছেলেপিলেদের কে সামলায়—

—দমাদম মেরেছো ত' ?

—কী করবো ? বড়কি ছুটকি আন্না—কেউ ওদের একটু ধরবে না ! আর আমার কাছে এসে কী না টেঁ টেঁ শুরু করে !

বড়কি ছুটকি আন্না পর পর তিন বোনের নাম।

তারপরেই সে একটু গলা খাটো করে বলে,—জানো সেই মেনাহাতিটা রোজ রোজ এসে বড়কির সাথে ফিসিরফিসির, ওসব ছোট জাতের লোক ঠিকেদারি করে টাকা বানাচ্ছে—কিন্তু—

—চুপ করো, বড়ো আবার শুনতে পেলে কেলেঙ্কারি করবে।

—চুপ করেই, ত ছিলুম। নইলে ও কি আর রেঁধে বেড়ে খাওয়াত। শুনেছি মাঝে মাঝে সন্দেশ টন্দেশও এসেছে। মেনাহাতিটা খরচান্ত হয়েছে। কিন্তু বিয়ে টিয়ে বাবা আমি দিতে পারব না।

—যদি পালিয়ে যায় ?

—আমার দেউড়ির দরজা বন্ধ হবে। নিখরচায় বেঁচে যাব।

বৌ কথার মোড় ফিরিয়ে বললে,—দেখেছো, কেমন তোমার মুখের আদল পেয়েছে ? এ মেয়েটা লক্ষ্মীমন্ত হবে।

সে খুশী হয়ে ডান হাতখানা মুখের উপর বুলিয়ে নিয়ে বললে,—তা হবে। তবে এটাকে মণিই লালন পালন করবে। জানো ত এবার তোমার খরচাটা মণির থেকে আদায় করেছি। ছেলেছোকরা একটু সংসারধম্মো শিখুক !

তারপর তার হাসির বেগ আরো বেড়ে গেল। মণি মানে ছোটভাই।

মণি ব্যাঙ্কে চাকরি করে। অফিস ফেরৎ চা মুখে দিয়ে আর দাঁড়ায় না। পাড়াপড়শিদের আশু বিপদমুক্ত করতেই বহু রাত অবধি ব্যস্ত থাকে। বাড়িতে তার কোনো কথার দাম নেই, থাকেও না কোনো কথায়। সকালের বাজার করাটি তার নিত্য কর্তব্য, তাই রোজই অনুযোগ শুনতে হয়।

আন্না শর্টহ্যাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত। এমন বিদ্যে নাকি সহজে আয়ত্ত করা যায় না। বিকেলে ক্লাশ তারপর সঙ্গের মেয়েদের কারোর বাড়িতে বসে আবার ক্লাশ। তাইতেই ফিরতে যথেষ্ট রাত হয়। পিসী কিছু বললে সেকেলে বলে ক্ষমা করে।

তাই মেনাহাতির আড্ডা জমে বড়কি আর ছুটকির সাথে। অন্য হাতিদের বেলায়ও তাই। সন্ধ্যের পর এ বাড়িটা হাতিশালা হয়ে পড়ে। বাড়িতে বলতে গেলে দু'খানা কামরা—একটী যদি ওভাবে আটকে থাকে, আরেকটায় জমিন নিয়ে বাচ্চারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে পিসীর পক্ষে

বারান্দায় গুড়ি মেরে বসে থাকা ছাড়া আর উপায় থাকে না। পিসী ফোঁস ফোঁস করেন, হিসাব-বাবু ঘরে থাকলে বিড়বিড় করে বকতেও থাকেন।

হয়তো দুটো মেয়েই সাজপোশাক করে বারান্দায় পিসীকে উপেক্ষা করে বৌকে লক্ষ্য করে বলে যায়,—বৌদি, আমরা সিনেমায় গেলাম, দাদাকে বলো।

এমনও হয়ে যায় হিসাব-বাবু বাড়িতেই আছে,—লাফ দিয়ে বারান্দায় এসে পড়ে বলে, তোমাকে বলে যাবার অর্থ ? তুমি কে ? তোমার শাসনে আমি আছি নাকি ?

পিসী ফুঁসে ওঠেন,—অন্যসময় বৌকে হেনস্তা করে রাখে না, ওটা বৌকে জব্দ করা ছাড়া আর কিছু নয়।

বড়কি তখন আবার ফিরে এসেছে। মেনাহাতির মণিব্যাগটা ও যে লুকিয়েছিল—ওটা লুকোনো অবস্থায়ই আছে। ব্যাগটা নিয়ে ফিরে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে বললে, দাদা, আমরা সিনেমায় যাচ্ছি, মণিকে বলো আমাদের যেন নিয়ে আসে।

—কোত্থেকে নিয়ে আসবে ?

ও কথা আর বড়কির কানে গেল না, অনেকদূর চলে গেছে। বৌ উভয়ের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলো। কাঁচা শিশুটা ককিয়ে উঠেছে মনে করে ঘরের ভেতরে চলে গেল।

—না পিসী, ও সব চলবে না !

—ওরে অবনী, বিহিত কর ! আমার দাদাবৌঠানের নাম ডুবাস নে !

বিহিত করলে বড়কি নিজেই। কয়েকদিন পর। সেদিনও মেনাহাতি এসেছে, গল্পগুজব হচ্ছে। বৌ বড়কির আদেশে কেৎলি চাপিয়েছে—চা হবে। পিসী সামনে বসে কুটনো কুটতে কুটতে মেনাহাতির বাপান্ত করছেন। হঠাৎ বড়কির জোরগলায় হৈ হৈ শোনা গেল—মেনাহাতিও গলা চড়িয়েছে, অন্যান্যরাও চেঁচিয়ে চেঁচানো বন্ধ করতে চাচ্ছে। পিসী দা থেকে হাত সরালেন, বৌ উদগ্রীব হলো। কিন্তু চটকরে ভেতরে গিয়ে দেখবার অজুহাত খুঁজে পেল না।

তাড়াতাড়ি কেৎলিতে বেশী করে চা ফেলে দিয়ে দুধ-চিনি মিশিয়ে কাপে চা ঢেলে ট্রে সাজিয়ে বৌ অকুস্থানে ছুটে গেল। গোলমাল বেসামাল হতে চলেছে। কিন্তু একরকম ঝাপটা খেয়েই বৌ বারান্দার দেয়ালে হড়কে এসে থামল। ট্রের উপর কাপগুলি ছিটকে পড়ে গরম চা কিছু তার কাপড়ে চোপড়েও পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বড়কি বেরিয়ে এসে বৌকে ধমক দিলে,—তোমাকে কে বলেছে পরপুরুষের সামনে যেতে ? ও বদমাশটাকে এক্ষুনি বাড়ির বার করে দিচ্ছি !

—বড়ো, ছি ছি চুপ করো। পাড়ার লোকে কী ভাবে !

—পাড়ার লোকে জানুক এ বাড়ির মেয়েরা সস্তা নয়।

মেনাহাতিও বেরিয়ে এল। বললে,—আপনিই বিচার করুন বৌদি, একই জায়গার লোকজন আমরা। আমার মায়ের পক্ষে কি বড়কির বয়েসটা জানা কঠিন ? তা আমি ঠাট্টা করে বলছিলুম, মা বলেছেন তুমি আমার চেয়ে কিছু বড় হবে। তাই শুনে বড়কি—

—বৌদি, তুমি এখান থেকে গেলে ? ও বদমাশটা তোমার সঙ্গে কথা বলতে কেন সাহস পায় ?

পিসী পিঠের দাড়া চিতিয়ে সাপের ফণা তুলে বললেন,—বৌমা, ভেতরে যাও !—তারপর

মেনাহাতির উদ্দেশ্যে গলা চড়িয়ে দিলেন,—ত্যাখো বাবা বিষ্টু, তোমার বাবা তেলকল করে কিছু টাকা করেছে বলে আমাদের জাত মারা যায় নি। দেশের বাড়িতে তোমরা আমাদের রায়ত বলেই লোকে জানে। মজুমদার বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে রয়ে সয়ে বলো!

বিষ্টুপদ তার মোটা দেহটা কোনোরকমে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল। বাইরের দরজা দড়াম করে ভেজিয়ে দিয়ে বড়কি হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করলে, সে রাত্তিরের জন্মে কেউ আর থামাতে পারলে না।

পরের দিনও না। অবনী মনে মনে ভাবলে, মেনাহাতিটা ছিল, ভালোই ছিল, যোগিনী ওর দিকেই হেলে ছিল—এখন কান্নার বন্যায় কারা ভাসবে ঠিক কি!

পিসী থামাতে গিয়ে ঝামটা খেলেন।

বৌ শুনলেন,—তোমরা আমার শত্তুর!

মণি দিদিদের সঙ্গে কথা বলাই ছেড়ে দিয়েছে—আন্নার সঙ্গে তার আঁতাঁত। ছুটকিও কাছে ঘেঁষলে না। রঙচঙ মেখে কয়েকবার বাইরে ঘুরে এল।

পরের দিনও বড়কি নিঃসাড়ে শুয়ে কাটালে। বৌ একটা মতলব ঠাউরে ফেললে: ছোট ছেলেটা মায়ের কোলে ওঠবার জন্মে কাঁদছিল, বৌ তাকে টেনে নিয়ে গেল বড়কির কাছে—একদম তার কোলে ফেলে দিলে। বললে, বড়ো দেখছো ছোটন তোমার জন্মে কাঁদছে, আজ থেকে ওর ভার তুমি নাও না ভাই, আমাকে রেহাই দাও।

—যাও যাও, ক'দিন পরে বলবে—ও মেয়েটা আমার ছেলেকে পর করে দিচ্ছে! আমরা ত কাকের জন্ম নিয়ে এসেছি!

ছেলেটাও তখন বড়কির কোলে বসে 'পিচি' 'পিচি' করে ডাকছিল।

বৌ হেসে বললে,—তোমার কথার জবাব ছেলের কাছ থেকেই নাও না!

সহসা বড়কি এক ঝটকায় ছোটনকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে তার মুখে প্রগাঢ় স্নেহে চুমু খেল এবং বাইরে বেরোতে বেরোতে বললে,—এসো আমার মানিক, তোমায় লজেন কিনে দেবো।

অবনীও ঠাট্টা করে, বড়কি তোর ছেলে নিয়েই ব্যস্ত আছিস—আমাদের দিকেও একটু তাকা।

পিসী তাড়াতাড়ি বলেন, ও পেয়েছে পিসীর স্বভাব। আমি কি তোদের কখনো কোল থেকে নাবিয়েচি। নইলে বৌঠানের কি একার কম্মো ছিল তোদের মানুষ করা।

ঝক্কি পোয়াতে হয় মণিকেই: রোজ অফিস ফেরৎ লজেন্স নিয়ে আসতে হবে—নয় এটা ওটা সেটা। শঙ্কিত থাকে বৌ। দুধটা গরমজলটা বলামাত্র উনুন থেকে নামিয়ে দিতে হবে। ডাল-ভাত-ঝোল আধাসেদ্ধ থাক ক্ষতি নেই, অফিসের সময় হয়ে গেলেও নয়। কাগজে কলমে খাওয়াদাওয়া শোওয়া খেলা বেড়ানোর চার্ট হয়ে গেছে—ছোটনের সঙ্গে সঙ্গে বাকী ক'টি ছেলেমেয়েরাও বড়কির কেয়ারে প্রবল শাসনে আছে। স্নানের জায়গায় কমপক্ষে দু'ঘণ্টা যায়। অবনী ও মণি কাকস্নান সেরে পালিয়ে বাঁচে। আন্না বিকেলে স্নান করেই ইস্কুলে যায়। শুধু ছুটকির মেজাজ বিগড়ে গেছে—শরীরের পরতে পরতে ময়লা জমে যাচ্ছে। তাছাড়া—

ছুটকির বেয়াড়াপনার প্রত্যুত্তর একদিন বোমার মত ফেটে পড়লো।

স্নানের কোঠায়। ছোটনের গরমজল উপলক্ষ্য।

ছুটকি গরমজলে এলবুমিন আর কাঁচা দুধ ফেটিয়ে রূপচর্চ্চার কাথ তৈরী করছিল, পটাস করে একটা চাপড় নাকে মুখে এসে পড়লো। তারপরেই বড়কির হ্রেষারব: খুব সাহস দেখাচ্ছিস না? নাক মুখ থেঁৎলে দেবো না!

—তোমারই বা এত সাহস হবে কেন শুনি! ছুটকি ফোঁস করে উঠলে।

—কেন জানিস নে? এত বেহুঁস হয়ে পড়েছিস যে বাচ্চাদের সঙ্গেও পাল্লা চালাচ্ছিস। অমন বেলেল্লাপনা চলবে না!

—বেলেল্লাপনা! বললেই হলো। নিজের চরিত্তর দিয়ে বিচার করো না।

—মুখ সামলে কথা বলিস! জানিনে বুঝি রোজ রোজ কোথায় অভিসারে চলিস!

—বড়দি, যা তা বলো বলো না বলছি!

পিসী হাঁ হাঁ করে ছুটে বারান্দায় এলেন। পেছনে পেছনে বৌ।

বড়কি চ্যাঁচালে, পিসী এখান থেকে সরে যাও, নোংরা কথায় থেকো না।—তুই বিষ্টুর সাথে গোপনে দেখা করছিস কী না বল। বাপের বেটি হলে—

—মিছে কথা, মিছে কথা। তুমি মিথ্যুক।

—তোর কাছে যে বিষ্টু গোপনে চিঠি লিখেছে সে ত আমার হাতেই এসে পড়েছে। কত আর বজ্জাতি করবি!

—আমার চিঠি, তুমি, কে—

কথা আর শেষ হলো না। ছুটকি থাবা বাগিয়ে বড়কির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে।

বৌ বারান্দা থেকে নিচে নেমে এল। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে অতিকষ্টে দুজনকে ছড়িয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে,—বড়ো, যথেষ্ট হয়েছে ভাই, এবার ক্ষেমা দে। দোহাই তোদের।

রক্তাক্ত মুখে বড়কি বললে,—আমাদের বোনেদের ব্যাপার, তুমি মাথা গলিও না। যাও!

বড়কি বৌকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিলে। বৌ ছুটকির উপরে এসে পড়লো। ছুটকি রাগে ফুলছিল, বৌকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে বললে,—দাইমা থাকতে আমার সঙ্গে আদিখ্যেতা কেন!—

বৌ সামলাতে পারলো না। সমানে জল পড়ে এমনি জায়গাটি পিছল, বড়কিকে ধরবার বৃথা চেষ্টা করে, হুমড়ি খেয়ে পড়লো। করুণ আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে গেল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে দেখে বড়কি চেঁচিয়ে উঠলে, ছুটকি ভয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলে।

ছোট পিসীর কপাল করাঘাতে পাড়ার লোক ছুটে এল।

কিন্তু বৌকে বাঁচানো গেল না। আর জ্ঞানও হলো না। হাসপাতালের ডাক্তাররা বললে, দুর্বল-দেহে···তিন-মাসের পোয়াতি···এত-ব্লাড-ডিসচার্জ হয়েছে···নো-হেল্প—

—আমায় কোন জঙ্গলে ফেলে গেলে গো! অবনী হাউমাউ করে উঠলো। ছুটি নার্স মুখে রুমালচাপা দিয়ে কালো পর্দা ঝুলিয়ে দিল।

ছুটকি নিয়েছে রান্নার ভার। অনুশোচনায় তার মন সর্ব্বদাই ভারাক্রান্ত, দুঃস্বপ্নও নাকি দেখে। বিমর্ষ মনে ঘরের বার হয় না, পাপ কাটাবার জন্যে ধর্মগ্রন্থ খুঁজে পেতে পড়ে। অবনী অনেকবার তাকে ঠেলেঠুলে সিনেমায় পাঠাবার চেষ্টা করেছে, লাভ হয়নি।

সাংসারের অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারে বড়কি। ছেলেপিলেদের তদারকেও। শুধু কাঁচা শিশুটা পিসীর হেফাজতে।

পিসী মাঝে মাঝে খেদ করেন,—অমন সোনার ছেলে আমার, অমন লক্ষ্মী বৌ, অমন সোনার সংসার! এ কী হলো গো! অবনীর বৌ-অন্ত প্রাণ, জীবনটা তার ঐ করেই যাবে!

বড়কি চাপাগলায় ধমক দেয়, পিসী অত বৌদির কথা বলো না। ছুটকি কষ্ট পাবে।

অবনী আজকাল বাইরে বাইরে থাকে বেশী। পুরণো বন্ধুদের সঙ্গে নাকি তাসের আড্ডাটা খুব জমে উঠেছে। একদিন একটু নেশাগ্রস্থ অবস্থায় বাড়িতে এসে বমি করে চোখের জল ছেড়ে দিলে, পিসী, আমার কি আছে বলো ত, কী নিয়ে থাকবো!

পিসীরও চোখে জল: তা কি আর বুঝিনে বাবা। আহা অমন সতীসাধ্বী ছেলে কি হয়! হায় ভগবানের কী বিচার।—

বোনেরা তিন জনে মিলে অবনীকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে।

হাতিদের দল বিদেয় করে আন্নার বন্ধুরাই আসর জমাল। ইস্কুলের পরের ক্লাশটা প্রায়ই আন্নার ওখানে বসে। ছুটকি চা নিয়ে যায়, বড়কি অভ্যর্থনা জানায়, এমন কি মণিও মাঝে মাঝে ক্লাব কামাই করে। বোনেদের হাত খরচের টাকাটা ও-ই বরাবর দিয়ে আসচে, এখন আরেকটা খরচ বেড়েচে—আসর খরচ।

একদিন আন্না একটা প্রস্তাব দিলে: এভাবে আর চলতে পারে না, বড়দি ছোড়দির স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে, সংসার লক্ষ্মীছাড়া—ছোড়দার বিয়ে দিয়ে দাও, দাদারও সেবা যত্ন করবে বড়দিরও সাহায্য হবে। দরকার পড়লে রোজগার করেও খাওয়াতে পারবে এমন একটি পাত্রী আছে।

বড়কি বললে,—খুব ভালো কথা। মণির বিয়ে দিয়ে দাও। আমাদের জন্য কেন ও বেচারা কষ্ট পাবে।

ছুটকি বললে,—তাই দাও। মণির বিয়ে দিলে অন্তত এক হতভাগী ত ঘোমটা দিয়ে বাঁচবে। পিসী, দাদার কাছে কথাটা তোলো।

পিসী একটু কিন্তু ভাব দেখালেন, এই সেদিন বৌমা মরেছে, এরমধ্যে বিয়ের ঘটা করলে বড্ড বেমানান হবে। অবনী না আঘাত পায়।

কথাটা অবনীর কাণে পৌছোনো হলো। পিসী কুটনা কুটতে কুটতে বলে ফেললেন। বললেন সজল চোখে দুঃখের পাঁচালি বলে হঠাৎ। অবনী একটা মুলোর ঘাড় মটকে দীর্ঘশ্বাস ফেললে,—পিসী

তুমি ত বোঝ,—যে রত্ন হারিয়েচি আমার পক্ষে আর অন্য চিন্তা বড়ই যন্ত্রনার। আমি ওর স্মৃতি নিয়েই কাটিয়ে দেবো বাকী ক'টা দিন। আর জীবনেরই কী বিশ্বাস: এই আছি এই নেই!

পিসী কুটনা ছেড়ে দু'চোখ মুছলেন।

—তবে তোমরা মণির বিয়ে দাও, বোনেদের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে পারে এমন মেয়েই বেছে নিও। বোনরা আমার বড্ড অভিমানী।

পিসী আবার চোখে ঝাপসা দেখলেন।

—আন্না কি কোনো মেয়ের নাম বলেচে?

বড়কি ডাকলে,—আন্না!

ছুটকি ডাকলে,—আন্না!

আন্না ছুটে এল।

—মেয়ে পছন্দ হয়েচে কাউকে?

—হ্যাঁ, আমার বন্ধু স্বপ্না—ম্যাট্রিক পাশ করে শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং শেখে।

পিসী বললেন, তা বাছা, একদিন আমাদের এনে দেখা না!

—ও তো প্রায়ই আসে। কালও এসেছিল।

—তোদের ভিড়ে কী করে জানব কোনটা কে। অবনীরও ত দেখা চাই।

বড়কি ছুটকি সমস্বরে বললে, একদিন রাত্তিরে খাবার নেমন্তন কর।

অবনী হঠাৎ বিগলিত হয়ে পিসীকে বললে,—পিসী, তুমি যে কী খাও, কেমন আছ একটু খোঁজ নেবার সময়ও পাইনে। তুমি কিন্তু বাপু কারোর বার চেয়ে বসে থেকো না—তুমি ছাড়া আমাদের দেখবার আর কে আছে!

পিসী হাসি-অশ্রুতে দুলতে লাগলেন।

স্বপ্না এল। রাত্তিরে খাবে থাকবে। সন্ধ্যেবেলায় মণি স্বপ্না আর আন্নাকে নিয়ে সিনেমায় গেল। এজন্যে মণি নতুন একটা সিল্কের জামা কিনে ফেলেছে। সেণ্ট-স্নো'র পাট ছিল না—তা-ও কিনেছে।

মণির পাশে চলতে চলতে স্বপ্নার খুশী ছলকে ছলকে উপছে পড়ছে।

আন্নাও খুশী।

সিনেমা হলের সামনে একটি লোক টিকিট নিয়ে অপেক্ষা করছিল,—সে স্বপ্নার দাদা।

সামনে ছবি চলছে পেছনে তারা কুটকুট করে কথা বললে, তারপর ছবি শেষ হবার আগে একটি রেস্তোরাঁয় ঢুকে আরো কিছুক্ষণ কথা বললে, তারপর রাস্তায় দাঁড়িয়ে আরো কিছুক্ষণ কথা বললে। তারপর বাড়ির সামনে এসেও অনেকক্ষণ বিদায় জানিয়েও কথা শেষ হলো না। কথা মুলতবী রেখে স্বপ্নার দাদাকে বিদায় দিতে হলো। কারণ বড়কি জানালা দিয়ে দেখতে পেয়ে ডাকাডাকি করছিল।

খেতে বসে অবনী মেয়েটিকে দেখলে। বেশ ভালোই ত। মণি লজ্জায় আর দাদার সামনে

এগুলে না। আন্নার গর্বিত চাহনি। বড়কি ছুটকির খুশী খুশী ভাব। পিসীর মুখেও রসের কথা। অনেকদিন পর বাড়িতে একটা চটুল আবহাওয়া খেলে গেল।

অবনী বললে,—পিসী, ওকে আজ দেখচি, মনে হচ্ছে যেন কতদিনের পরিচিত!

পিসী বললেন,—তাতো হবেই বাবা। এ যে পূর্বজন্মের নিগড়। মজুমদার পরিবারে ছিল, তাইতো আসতে হচ্ছে।

আহা কতবড় জীবনদর্শন!—অবনী ভাব গদগদ চিত্তে মুখ ধুয়ে ঘরে গেল।

মেয়েরা বহুরাত অবধি তারা থেকে উদারায় কথাবার্তা চালিয়ে গেল। এই প্রথম রাত ছুটকির চোখে দুঃস্বপ্নের ছোঁয়া লাগে নি।

ওরা মাত্র ঘুমের উদ্‌যোগ করছিল।—

পিসী অবনীর ঘরেই কাঁচা শিশুটিকে নিয়ে ঘুমোন। তার আকুপাকু আওয়াজে মেয়েরা চকিত হয়ে উঠলো।—অবনী, কী হয়েছে বাবা অবনী! ওরে ও বড়কি, ছুটকি! ওলো পোড়ারমুখীরা!

মেয়েরা সবাই অবনীর কামরায় ছুটে গেল। স্বপ্নাও।

অবনীকে বুকে চেপে বসে আছেন পিসী, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। অবনী সবার দিকে তাকিয়ে থেকে কিছুক্ষণ পরে বললে, জল!

জল এল। অবনী জল পান করলে। পিসী শুধালেন, কী হয়েছে বাবা, বল, অমন করছিস কেন?

অবনী ডাইনে বায়ে চোখ বুলিয়ে এনে ধীরে ধীরে বললে,—পিসী, তোমাদের বউ এসেছিল। বললে, আজ থেকে তোমার জন্যে নিশ্চিন্ত হলুম,—এতদিন বড় উৎকণ্ঠা ছিল। এই নাও—গ্রহণ করো—বলে যেন সে স্বপ্নার মত চেহারার একটি মেয়েকে আমার পাশে বসিয়ে দিল। আমি কেঁদে উঠলুম—তুমি আমায় কী পরীক্ষায় ফেললে! সে বললে, আমায় আর ডেকো না, বড় শান্তি পেলুম। তবু আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—এ কী পরীক্ষায় ফেললে!

পিসী অবনীর চোখ মুছিয়ে দিলেন।

আন্না বললে,—না না দাদা, তুমি দুঃস্বপ্ন দেখেচ—এ হতে পারে না!

বড়কি বললে,—চুপ!

ছুটকি বললে,—চুপ!

পিসী ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে স্বপ্নাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন,—সংসারে কী পরীক্ষের শেষ আছে। মা, তোমাকে দেখে অবধি বৌমার চেহারাটা চোখে ভাসছে।—

পিসী স্বপ্নার কপালে চুমু খেয়ে আশীর্বাদ করলেন।

কখন পিসীকে প্রণাম করতে সে মাথা নুইয়ে দিয়েছে এবং কেন, সে বোধ স্বপ্নার অজ্ঞাত।

হারজিতের ইতিহাস

রজত সেন

দেহে যৌবন নেই, কিন্তু, চোখের কোণায় বিদ্যুৎ ছিল, ভংগিতে ছিল মায়ার একটা আভাষ, এ-চেতনা স্নেহলতার ছিল এই সেদিন পর্য্যন্ত সে উপলব্ধি করত। করুণাময়ী হাই স্কুলের অংকের মাষ্টার একদিন বলে ফেলেছিল, ‘বৌদি আপনাকে ভালো লাগে বললে আপনি রাগ করেন? স্নেহলতা একটু বিস্মিত হয়েছিলে, খুব বেশী আশ্চর্য হয়নি, সে জানতো—কিছু একটা উত্তর দিলেও কিছু এমন এসে যেতনা। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও বুঝি বা একটু সাড়া লেগেছিল মনে। কিন্তু উত্তর সে দেয়নি; ম্লান নয়, মৃদু হেসেছিল। অংকের মাষ্টার নেহাৎ ছোকরা নয়, কথাটা ভেবে চিন্তেই বলেছিল সে কিন্তু স্নেহলতার সময় ছিল না, ছুটির দিনেও সময় নেই তার, কমলেশ এসে ভাতের জন্য হাঁক দেবে, স্নানটা সেরে নেবার পর্যন্ত তার আর সময় নেই, এক মিনিট অপেক্ষা করবে না সে, সবসময়েই তার তাড়া, সব সময়েই অসম্ভব এক ব্যস্ততা, এক মুহূর্ত তার ফুরসৎ নেই, এতটুকু অবকাশ নেই।

স্নেহলতা আবার পাশ ফিরল, খোলা জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে আলো এসে পড়েছে। কুসুমের কি হল আজ? এখনও দরজার কড়া নড়ছেনা, ব্যাপার কি? অপর্ণা কি দরজা খুলে দিয়েছে? বাসন মাজার শব্দ কৈ? কুসুম আসবে, মাঝে মাঝে সে এমন দেরী করে, না এলে কত যে অসুবিধে সেটা তার জানা আছে, বাসন মাজা, উনুন ধরানো, কয়লা ভাঙ্গা, দোকানে যাওয়া—আরও যে কত অন্তহীন কাজ তার আর ইয়ত্বা নেই। কাজ পড়ে থাকেনা, মেয়ে অপর্ণা চুলে একটা পাক দিয়ে নেয়, কোমরে জড়িয়ে নেয় আঁচলটা, তারপর চলতে থাকে চঞ্চল, ক্ষিপ্র দুটি হাত। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। নটা বাজবার আগেই সে স্নানের ঘরে ঢোকে, হাঁক দিয়ে যায় ভাত বাড়বার জন্যে, বারান্দায় ভিজে কাপড় জামা মেলে গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, পুরোপুরি চুল ভেজাতে পারেনা, শুকোবার সময় নেই, সুবিধে নেই, অসম্পূর্ণ প্রসাধনে সে রান্নাঘরে আসে, জল গড়ায়, আসন পাতে, তাড়াতাড়ি খেতে তার রীতিমত অসুবিধে হয়, কিন্তু উপায় নেই, অফিসের দেরী হয়ে যাবে, তিন দিন দেরী হলে একদিন ছুটি বাতিল।

স্নেহলতা বলে, ‘একটু তাড়াতাড়ি খেতে আসতে পারনা।’

অপর্ণা উত্তর দেয়, ‘পারি কৈ!’

‘কি এমন কাজ?’

‘বিকেলে অফিস থেকে এসে বলব, এখন সময় নেই, তরকারী করনি?’

‘তরকারী কোথায়? মাসের আজ ক’তারিখ খেয়াল আছে? পয়সা কোথায়?’

‘পয়সা তোমাদের কোন দিন থাকে না’, বলল অপর্ণা, ‘আর একটু ডাল দাও। প্রত্যেক মাসে এতগুলো টাকা দিই, যায় কোথায়?’

'খরচ হয়, কেউ জমাচ্ছেনা।' ডাল দেবার সময় অপর্ণার শাড়ীতে ছিটে লাগে।

'কি করলে, কি? দেখ ত!' ঝট করে খাওয়া বন্ধ করে দেয় অপর্ণা। 'এ-কাপড় পরে আমার অফিস যেতে হবে।'

'ধুয়ে নিবি, কি এমন হয়েছে?' হাতটা প্রায় ছুঁড়ে মারে স্নেহলতা।

'না, হবে আর কি, এখন অফিস যাবার সময় আমি আবার কাপড় ধুতে বসি! তোমার আর কি দিনরাত রান্না করা আর খাওয়া!'

'মুখ সামলে কথা বলবি, বুঝলি?'

'না, বলবনা, যাও!' মাথা-ভাতে জল ঢেলে উঠে পড়ল অপর্ণা।

স্নেহলতা চোখ বুজে আছে, ঘুমের জড়িমা কেটে গেছে অনেক্ষণ, দেখাই যাক না একটু চুপচাপ শুয়ে থেকে, সংসারের দায়িত্ব শুধু তার একলার নয়, সংসার তার একার নয়, এতগুলো অচৈতন্য মনে সাড়া জাগাবার ভার সে একলাই বা বইবে কেন? পাশের বিছানার দিকে হঠাৎ চোখখুলে তাকালো সে, গালের তলায় হাত গুঁজে পরমেশ ঘুমাচ্ছে, রেখাসংকুল প্রশস্ত কপালের ওপর কাঁচা-পাকা অবিন্যস্ত চুলের রাশি, নাকটা যেন একটু বেশী বড়, গাল ঢুকে গেছে ভেতরে, শিয়রে পাথরের বাটিতে জলে চোবান নকল দাঁতের পাটি। স্নেহলতার মনে পড়ল তার নিজেরও কয়েকটি দাঁত নড়েছে, মনে মনে দাঁত বাঁধিয়ে ফেলবার একটা গোপন ইচ্ছে তার যে নেই তা নয়, কিন্তু অতগুলো টাকা সংগ্রহ করবার কারুর গরজ হবেনা এটা তার জানা আছে। এটাও তার বিশ্বাস এ-সংসারের আর কোনো উন্নতি হবে না, ঘটবেনা কোনো রকম ফের, এমন একটা দিন কাটবেনা যেদিন অভাব-অনটনের অন্ততঃ একটি দুটি কথা সে নিজে উচ্চারণ করবেনা অথবা কানে এসে পৌছাবেনা, সে জানে এ-ই চলবে, এ-পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি নেই; মৃদু অনুযোগ, অতুচ্ছ আলোচনা, খানিকটা শৌখিন আর্থিক বিশ্লেষণ, একটু বা উষ্ণ কথা কাটাকাটি, ব্যস্ তারপর সবাই নীরব, প্রায় নিষ্ক্রিয়, যে-নিয়মে জীবন চললে তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম নেই, হাবভাব দেখে মনে হয় ঘটনাচক্রে যে যে-অবস্থায় এসে পড়েছে—তাকে অতিক্রম করার কথা কেউ চিন্তার মধ্যে আনাই প্রয়োজন বোধ করে না; যেখানে এসে পৌছেছে—সেটাই গন্তব্যস্থান, যা আজ পর্যন্ত ঘটে এসেছে—তা ঘটতই, এই খুঁটি, এই শেষ, ওপারে কিছু নেই; জীবনের আর প্রান্ত নেই, কোনো বিস্তৃতি নেই।

উনত্রিশ বছর আগে পরমেশ ঘোষালের সংগে তার বিয়ে হয়েছিল, সেদিন পরমেশের কোনো আর্থিক সংগতি ছিলনা, কিন্তু বিদ্যে ছিল আর রূপ ছিল; আজ যৌবন নেই, বিদ্যের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে! সেই যে বিয়ের আগে শিক্ষকতা নিয়েছিল—আজও পরমেশের তাই পেশা, অনেক বড় ছোট স্কুল থেকে ঘুরপাক খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত করুণাময়ী হাই স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষকে থেমেছে সে; একদিন ইতিহাস ছিল তার প্রাণ, সেখানে কতই না ছিল সম্ভাবনা! আজ আর পৃথিবীতে শুধু প্রাণ-ধারণের কাহিনী ছাড়া আর কোনো ইতিহাস নেই। আজকাল পরমেশ বাজার করে, একটা পোকায়-ধরা বেগুন ফেরৎ দেবার জনে সে তিন-পোয়া পথ অনায়াসে হেঁটে যায়, এবং শেষ পর্যন্ত বদলেও নিয়ে আসে, আর তার গল্প করে আধ ঘণ্টা! অথচ এই পরমেশ ঘোষাল এম-এ একদিন বিয়ের বাজারে

কি গোলমালই বাধিয়ে দিয়েছিল; স্নেহলতার বাবা বলেছিল—দেখিস্ ও একদিন মস্ত বড় লোক হবে।

মস্ত বড় লোকটা গালের তলায় হাত গুঁজে ঘুমোচ্ছে! আজ রবিবার, স্কুলে যাবার তাড়া নেই, যতক্ষণ না এক পেয়ালা চা হাতে স্নেহলতা তার ঘুম ভাঙ্গাচ্ছে—লোকটা ততক্ষণ ঘুমোবে, তারপর ছুটির দিনে ভালো বাজার করবার জন্যে হাংগামা বাধিয়ে দেবে, হাতে কেনই বা টাকা থাকবে না—তার কৈফিয়ৎ দিতে নিতে প্রাণান্ত! তার নিজের জীবনে রবিবার নেই, ছুটির দিন নেই, কোনো নিভৃতি নেই, অবসর নেই; তার কাজ এদের জন্যে আহার প্রস্তুত করা; দিনে, রাত্রে, এদের খাইয়ে তাজা রাখা, কর্মক্ষম রাখা, জীবিত রাখা। এই তার কাজ, যতদিন বাঁচবে ততদিন। এমন কি ছুটিছাঁটার দিনে পর্যন্ত একদিন মেয়েটা রান্নাঘরে পা দেয়না, ওর বক্তব্য—ও সারা সপ্তা অফিসে খাটবে—একটা দিন কেন ছুটি পাবেনা, একটা দিন কেন রন্নাঘরে হাঁড়ি ঠেলবে? স্নেহলতা অফিসে চাকরী করেনা—অতএব ওর ছুটির দরকার কি? কমলেশ একদিন বলেছিল, মা তুমিই সব চাইতে সুখী—তোমাকে অফিস করতে হয়না, দুপুরে খেয়ে দেয়ে দিব্যি ঘুম; আহা! যদি একদিন অফিস কামাই করে ঘুমোতে পারতাম!

স্নেহলতা ভাবে—আহা! যদি একদিন হাঁড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরুতে পারতাম! চীৎ হয়ে শুল সে—পা দুটো টান করে দিয়ে, হাত দুটো মাথার ওপর ছড়িয়ে, আঁচলটা কাঁধ পর্যন্ত টেনে দিয়ে। বাঁ হাঁটুর ব্যথাটা টন টন করে উঠল, এ-ব্যথাটা তাকে মাঝে মাঝে কাবু করে দেয়, পাঁচ মিনিট হাঁটু বাঁকিয়ে বসবার উপায় নেই, ঐ ব্যথাটা বুকের বাঁ-দিক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, হৃদ্‌পিণ্ড পর্যন্ত কাঁপতে থাকে যন্ত্রণায়, বিছানায় শোবার জন্যে সারা মনটা চীৎকার করে ওঠে; কিন্তু উপার নেই, শোয়া ত দূরের কথা, দু'দণ্ড পা ঝুলিয়ে বসে থাকবার পর্যন্ত! তাহলে সংসার এক নিমেষে অচল হয়ে যাবে, চারিদিকে বেনিয়ম আর বিশৃঙ্খলা, স্বামী, ছেলে, মেয়ে সব ক'টা বেরিয়ে পড়বে অভুক্ত! এমন ঘটেছে মাঝে মাঝে একদিন হাঁটুর ব্যথায়—বিশ্রামের অভাবে সে খোলা বঁটির ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল; মাথাটা পড়েছিল বঁটির ফলার ওপর, মাথায় ঘন চুল, গলাটা পড়লে কি হত বলা যায়না! এমন দুর্ঘটনার জন্যে তাকে বকুনি খেতে হয়েছিল প্রত্যেকের কাছ থেকে, সে-সব কটু মন্তব্য তার মনে আছে,-থাকবে।

পরমেশ বলেছিল, 'দেখ দেখি, কি বিপদে তুমি আজ ফেলছিল?'

স্নেহলতা, 'তোমাদের আবার বিপদ কি? মরতাম ত আমি!'

পরেমেশ, 'মরতে ত পরে, কে জানে আমাদের হয়ত খুনের দায়ে পড়তে হত, শেষকালে হাসপাতাল থেকে মড়া চালান যেত লাস-কাটা ঘরে, ওঃ কি কাণ্ডটাই যে হত!'

স্নেহলতা বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, 'কিন্তু যে-ভাবেই মরি সেটা ত খুনই হবে!'

পরমেশ স্নেহলতার মুখের দিকে তাকিয়েছিল, 'খুন?' তার মুখ থেকে বেরিয়েছিল।

দুই

চোখ বুঁজে পরমেশ অনেকক্ষণ চায়ের জন্যে অপেক্ষা করল, কিন্তু কোথায়? কারুরই কোনো সাড়াশব্দ নেই, ব্যাপারটা কি আজ? ছুটির দিনে বাজার করতে সময় লাগে তার, সে-জন্যে চা-টা খেয়েই গায়ে ফতুয়া চাপিয়ে টাকার তাগিদ লাগাবে ছেলেমেয়ের কাছে। এমন কি তাগিদের চোটে

স্নেহলতা অস্থির হয়ে পড়ে, তার নিজের কাছে টাকা কোনো দিন থাকে না—কি মাসের প্রথম আর শেষ।

বিরক্ত হয়ে মাথার ওপর হাত দুটি টান করে দিল সে, পা ছুঁড়ল কয়েকবার, চোখ বন্ধ; কি এমন কাজ—সময় মত এক পেয়ালা চা পর্য্যন্ত তৈরী করে দিতে পারেনা! আশ্চর্য, দিন দিন যেন স্নেহলতা কুঁড়ে হয়ে যাচ্ছে! দুবেলা দুটো রান্না করা এ-ই যদি ঠিক মত করতে না পার তবে আর জীবন-ধারণ কেন? আসলে—পরমেশ মনে মনে মন্তব্য করল—মেয়ে জাতটাই কুঁড়ে, নড়তে চড়তেই ওদের সময় লাগে। কতবার বলেছি খাটলে খুটলে গতর ভালো হয়, শরীরের রক্তচলাচল বাড়ে, অম্বল হয় না, বাত ছেড়ে যায়, ক্ষিধে পায়, কিছুতেই কথা শুনবে না। বাস্তবিক! স্নেহলতার কিই যে এমন কাজ পরমেশ ভেবে পায় না; তার ওপর দশটাকা মাইনে দিয়ে একটা ঝি পর্য্যন্ত রাখা হয়েছে, কয়লা ভাঙ্গা, উনুন ধরানো, মসলা বাটা, জল তোলা, বাসন মাজা, কত কাজই না ও করে! স্নেহলতা অবশ্য আপত্তি করেছিল ঝি রাখার প্রস্তাবে, পরমেশ জানে ওটা লোক-দেখানো আপত্তি মাত্র! একদিন ত স্নেহলতা বলেইছিল—তোমরা সবাই রোজগার কর একটা মাইনে-করা লোকও ত রাখতে পার; আমাকে কি তোমরা মেরে ফেলতে চাও? মেয়েমানুষ অত সহজে মরে না! বলেছিল পরমেশ, ঠিকই বলেছিল সে, কাজ করে কখনও মরে কেউ? কাজ না করেই নানা রকম রোগ জন্মায় এবং মরে। আর মেয়েরা চিরকালই তিলকে তাল করে, আসলে ওরা একটু প্রশংসার কাঙ্গাল, কিছু স্তুতি, কিছু তোষামোদ আর তার সংগে মিশিয়ে দাও একটু সহানুভূতি—দেখবে ওরা তোমার জন্যে কিই না করবে, ঈষৎ একটু হাসির তরঙ্গ খেলে গেল পরমেশের তোবড়ানো গালে।

চায়ের জন্যে কপাল কুঁচকালো সে, কি রকম কাণ্ড কারখানা দেখ একবার, দেখা যাক, ডাক পড়ে কিনা; তবু চোখ খুললনা সে; কিন্তু সাড়াশব্দও ত তার কানে আসা উচিৎ, কিন্তু না, কেউ যেন রান্না-ঘরে কাজ করছে! স্নেহলতার পায়ের শব্দের অপেক্ষায় কান পেতে রইল সে; চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়েই ছুঁড়ে মারবে বারান্দার দিকে। সেই-শব্দে ছুটে আসবে অপর্ণা আর কমলেশ, কুসুমও; পরমেশ চোখ রাঙ্গিয়ে বলবে, যা; তোরা সব এখান থেকে, দূর হয়ে যা, আমি যা রোজগার করি আমার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে, তোরা কি মনে করছিস আমি তোদের রোজগারের অপেক্ষায় আছি? বুড়োমানুষকে—না, বুড়োমানুষকে বললে আরও পেয়ে বসবে।

কিন্তু না, পরমেশ জানে চায়ের পেয়ালাও কোনো দিন ছুঁড়ে মারবেনা, মারতে পারেনা; রাগের চোটে চোখ দিয়ে যদি ধোঁয়া বেরোয় তাহলেও নয়। জীবনে অজস্র রাগারাগি সে করেছে কিন্তু কোনো দিন কিছু ছুঁড়ে মারেনি সে, স্কুলে কোনো দিন একটি বই কিংবা খাতা পর্যন্ত নয়, কেননা সব সময়েই তার মনে হয়েছে, কিছু রাগ করে ছুঁড়ে মারার পর রাগের সেই রুদ্র-মূর্তিটা সে ঠিক মত বজায় রাখতে পাববে না।

আসলে—পরমেশ জানে—একটা চিরকালের অনুযোগ স্নেহলতা পুষে রেখেছে মনে মনে। ওর সাজপোষাকেরও ওপর প্রবল অনুরাগ পরমেশ যৌবনকাল থেকে লক্ষ্য করেছিল, কিন্তু সে নিজে কোনো মনোযোগই দেয়নি—উৎসাহ দেয়া ত দূরের কথা একমাত্র ইতিহাস ছাড়া আর কোনো কিছুরই মূল্য ছিলনা তার কাছে, তখন সবে মাত্র তার থিসিস-এর প্রথম পরিচ্ছেদ; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আর কোনো দিন লেখা হয়নি, অথচ সংসারও যে দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছিল তাও নয়; জীবন এগিয়ে গেছে ঘড়ির কাঁটার মত, কতগুলো বছর! আজ মনে পড়ে ইতিহাসের কত অব্যক্ত সূক্ষ্ম কত গভীর তত্ত্ব রাত্রির ঘুম আর দিনের কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে, একটা জ্বরাতপ্ত উত্তেজনায় দেহমন ভরাট হয়ে থাকত!

এই ত সেদিনের ব্যাপার। মজার কথা—সেটাও মাসকাবারের একটা দিন, অনেক হল্লার পর ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে এক টাকা দশ আনা সংগ্রহ করে থলি বগলে বাজারে ঢুকছিল পরমেশ, পেছনে মোটর থামবার শব্দ হল, আর কেউ ডাকল, মাষ্টার মশাই, মাষ্টার মশাই! এমন কিছুই নয়, বাজার করতে যাচ্ছিল সে, হাজার হাজার লোক প্রত্যহ বাজার করে; অথচ পেছনে তাকিয়ে পরমেশ যেন ধরা পরে গেল, গাড়ীতে তার পুরাণো ছাত্র নীরেন, নিজেই গাড়ী চালাচ্ছিল, পাশে একটি সুন্দরী মেয়ে, হ্যাঁ, সুন্দরই ত, পরমেশ না তাকিয়ে পারল না, নীরেনের স্ত্রী নিশ্চয়ই। ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে পরমেশ একদিন ভালোবেসে নীরেনকে বলে ফেলেছিল, মনোনোযোগ দিয়ে পড়াশুনো কোরো, ইতিহাসে তুমি প্রথম হবে; আর সত্যি সত্যিই নীরেন যেদিন প্রথম হল সেদিন পরমেশ কম আশ্চর্য হয়নি, প্রথম হবার মত মেধা ওর ছিল কি? কে জানে। খবরটা পেয়ে নীরেন ছুটতে ছুটতে পরমেশের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলেছিল, মাষ্টার মশাই, আপনার কথাই সত্যি হল! তারপর নীরেন এম-এ পর্যন্ত সব সময়েই প্রথম হয়ে এসেছে, এখন সে একজন ক্ষমতাবান সরকারি কর্মচারী, এ-সব খবর পরমেশ জানে।

নীরেনের কাছে তার আর সংকোচ কিসের? তবু বাজারের থলিটা বগল থেকে হাতে নিল পরমেশ, অত্যন্ত ছেঁড়া চটিটার ওপর একটা চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, তিন চার দিনের দাড়িতে হাত বুলাল।

'কি মাষ্টারমশাই, চিনতে পারছেন না?' গাড়ি থেকে নেমে ফুটপাতে উঠে সে জিজ্ঞেস করল, হাত তুলে নমস্কার করল।

পরমেশ মনে মনে ভাবল—না, না, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যাবে কেন? ওটা আজকাল চলে না কি?

'তোমায় চিনতে পারবনা, বল কি নীরেন? কেমন আছ? গাড়িতে কে?'

'আমার স্ত্রী, এই যে! শোন, নাম ত একবার!'

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দরজা খুলল, একখানি পা যতখানি বাড়ানো উচিত—ততখানি বাড়িয়ে নামল, আঁচলটা খোঁপায় ঠেকিয়ে একেবারে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল নম্র অথচ নিঃসংকোচ ভংগিতে। নীরেন বলল, 'মাষ্টারমশাই।'

একটু নিচু হয়ে পরমেশের পা স্পর্শ করল নীরেনের স্ত্রী, করল কি? পরমেশ বুঝতে পারলনা, তবু পা বাড়িয়ে বলল, 'দীর্ঘজীবি হও।'

নীরেন বলল, 'বাজার করতে বেরিয়েছেন বুঝি? এখন ত তরকারি খুব সস্তা, আহা! সেই ছেলেবেলায় যখন পড়তে যেতাম আপনার কাছে, একদিন খেয়েছিলাম আপনাদের ওখানে স্বাদটা আজও লেগে আছে মুখে, আলুপোস্ত আর ডাঁটা চচ্চরী, কেউ আর খাওয়ায়না, বুঝলেন!'

'আমি খাওয়াব', হঠাৎ বলে বসল পরমেশ, 'আসবে আমার বাড়ি? এসো আজ, তোমাদের নিমন্ত্রণ রইল, দু'জনেই এসো। খুব—'

'না, না, আজ নয়', বলল নীরেন, 'আর একদিন হবে, ব্যস্ত হবার কি আছে?'

'আর একদিন কেন? আজই হোক, কখন আসবে বল, এবেলা না রাত্রে—আসতেই হবে।'

'আবার আপনাকে অসুবিধেয় ফেললাম।' বলল নীরেন। ব্যাপারটা যে এরকম দাঁড়াবে আন্দাজ করতে পারেনি সে।

'কিছু অসুবিধে নয়, সে-রকম খাওয়াতে পারব আমার সামর্থ কোথায়? আলুপোস্তই তোমাদের খাওয়াব, কখন আসবে বল?'

'রাত্রি আটটায়।'

'ঠিক ত! আমরা কিন্তু বসে থাকব।'

'নিশ্চয় আসব মাষ্টারমশাই, আমি শুধু ভাবছি কত হাংগামাতেই না আপনাদের ফেললাম।

'না, না, কিছুই হাংমা নয়, সত্যি খুসি হব।'

নীরেন আর তার স্ত্রী গাড়িতে গিয়ে উঠল, পরমেশ তাকিয়ে রইল। থলিটা আবার বগল থেকে হাতে নিল, দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ অনেকক্ষণ, মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল আস্তে, চিবুকের দু'পাশে গালের মাংস আবার ঝুলে পড়ল।

বাজারে ঢুকলনা পরমেশ, বাড়ি ফিরে এল। স্নেহলতা কলতলায় কাপড়ে সাবান ডলছিল, তাকাল, বলল, 'ফিরে এলে যে, বাজার?'

'শোন, কথা আছে।' পরমেশ ডাকল।

আঁচলে ভিজে হাত মুছে স্নেহলতা উঠে এল বারান্দায়।

পরমেশ বলল, 'পথে আমার এক পুরোণো ছাত্রের সংগে দেখা হয়ে গেল, মস্ত বড় লোক, পরীক্ষায় কখনও সেকেণ্ড হয়নি, জান! আর—" এক মুহূর্ত থেমে, অন্য দিকে তাকিয়ে—'আমারই হাতে-গড়া ছাত্র!' ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'তা হয়েছে কি?' সকাল বেলা কাজের ভিড়ে সাতসতেরো কথা শোনবার সময় নেই স্নেহলতার, 'বাজার না নিয়ে ফিরে এলে কেন?'

'এক টাকা দশ আনায় কি হবে?' অসহায় চোখে তাকাল পরমেশ, 'ওরা যে খাবে বলল, নিজেরা যখন বলল তখন আমি আর কি করি?'

'ওরা কে কে?' স্নেহলতা শক্ত হয়ে গেল।

'আমার ছাত্র নীরেন আর তার স্ত্রী, গাড়ি থামিয়ে—'

হাতের এক ভংগিতে স্নেহলতা পরমেশকে বাতিল করে দিল, 'খাওয়াবে ত খাওয়াও।'

'কি করে হবে? অন্ততঃ কিছু ভাল মাছ ও আনতে হয়, আর ঘরে পোস্ত নিশ্চয়ই আছে, একটু যত্ন করে রাঁধতে পারবে ত?'

'রান্নায় আবার যত্ন অযত্ন কি? খাওয়া ত কারুর কম দেখিনা।'

'না, সে কথা বলছিনা, অনেকদিন আগে তোমারই রান্না খেয়ে ভাল লেগেছিল, এতদিন পরে আজও তার মনে আছে।'

স্নেহলতার গলার স্বরে এতটুকু কোমলতা শোনা গেলনা, 'ওসব বাজে কথা, তোমাকে খুশি করবার জন্যে বলেছে।'

'আমাকে খুশি করে নীরেনের লাভ কি? সে একটা মস্ত বড় চাকরী করে।'

'বড়লোকরা অমন কৌতুক করতে ভালবাসে।'

'না, নীরেন অমন ছেলেই নয়, আমার চাইতে তুমি ওকে বেশী চেনোনা।'

'বেশ, চিনিনা, কিন্তু পোস্ত নেই, আলুও নেই।'

'নিয়ে আসব; মাছের কি হবে? তুমি দাওনা দুটো টাকা, আমি আবার দিয়ে দেবো তোমায়।'

'আমার কাছে টাকা নেই।'

'দেখনা একটু!' পরমেশ অনুনয় করল।

'দেখবো কি! নেই আমার কাছে।'

'আধসের মাছ কিনতেই দেড় টাকা লেগে যাবে, তারপর পোস্ত, আলু, কিছু শাক—'

'তোমার ফিরিস্তি শোনবার আমার সময় নেই, অনেক কাজ।' স্নেহলতা কলতলায় গিয়ে বসল।

পরমেশের ইচ্ছে হল বাজারের থলিটা ছুঁড়ে মারে স্নেহলতার গায়ের ওপর, কিন্তু সামলে নিল।

দরজার বাইরে এত কথা কাটাকাটি, কিন্তু অপর্ণা ঘরের মধ্যে পাটিতে শুয়ে শুয়ে উপন্যাস পড়ছে; ছুটির দিন হৈ চৈ করতে তার মন যায়না; কাজকর্ম, গল্পগুজব সব তার অফিসে, সেখানে জীবন আরো মুখর, ব্যস্ত, চঞ্চল; এখানে নীরব, শান্ত, বুঝি বা ম্লান; বাইরে ব্যাপ্তি আছে, ইশারা আছে, সম্ভাবনা আছে; এখানে ঘরে জীবন তার সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ, সমাপ্ত। সে বাইশে পড়েছে, ভালো হজম হয়, ভালো ঘুম হয়; শরীরের সমস্ত গ্রন্থী নির্দোষ, পেশী সবল, দাঁতগুলো শক্ত আর সাদা, মাথা আঁচড়াবার সময় চিরুনীতে চুল ওঠে না, পায়ের গোড়ালিতে কালো দাগ পড়েনি।

পরমেশ ঘরে ঢুকল, জিজ্ঞাস করল, 'কমল কি বেরিয়ে গেছে?'

বইটা মুড়ে অপর্ণা তাকাল, বলল, 'হুঁ, কেন বাবা?'

'দুটো টাকা আছে, দিবি?'

অপর্ণা উঠে বসল, খোলা চুলে পাক দিতে দিতে বলল, 'আমার পাঁচটা টাকাই আছে, এ-কটা দিনের খরচ লাগবে।'

'দে না, দুটো টাকা তোকে আবার দিয়ে দেবো।'

'কত বার তোমায় টাকা দিয়েছি বাবা, একবারও তুমি ফেরৎ দাওনি! পঞ্চাশ টাকা সংসার খরচ দিই, তার ওপর প্রতি মাসে তোমাদের জন্যে আমার পাঁচ দশ টাকা বেরিয়ে যায়, এত টাকা আমি পাব কোথায়? কত মাইনে পাই তা ত তোমরা জানই।'

'তুই দে না দুটো টাকা, তোকে দিয়ে দিলেই ত হল।'

'না, তুমি দিতে পারবেনা, গত মাসে দশটা টাকা দিয়ে কি মুস্কিলে পড়েছিলাম জান? শেষকালে অফিসের এক ভদ্রলোকের কাছে আমাকে টাকা ধার করতে হয়েছিল।'

'সে টাকা কি আমি খরচ করেছি ?'

'তোমাদের সংসারের জন্যে ত খরচ হয়েছে।'

'আমাদের সংসার কি তোর সংসার নয় ?' পরমেশ বাজারের থলিটা পাকিয়ে আবার বগলে নিল।

'সেটা আলাদা কথা, কিন্তু আমার প্রয়োজনে কারুর কাছেই পাওয়া যায়না, শেষ পর্যন্ত আমাকে বাইরের লোকের কাছে হাত পাততে হয়।'

পরমেশ চীৎকার করে উঠল, 'যা, অত কথা বলতে হবে না তোকে, চাইনা তোর টাকা।' ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল সে—

অপর্ণা ডাকল, 'বাবা।'

পরমেশ তাকালনা পেছন দিকে, ছেঁড়া চটির শব্দ করতে করতে একেবারে রাস্তায় এসে পড়ল।

রাত্রি নটা, পরমেশ বাইরে রাস্তায় অপেক্ষা করছে; এতদিন পরে নীরেনের বাড়ির ঠিকানা মনে না থাকতেও পারে। আসবে নিশ্চয়, কথা দিয়েছে যখন, এই ত খানিক আগে রান্না শেষ হল, রান্নার তালিকাটা মনে মনে পরমেশ আবার বিচার করে দেখল, মোটেই খারাপ হয়নি, চাটনী আর দইটাও করা গেছে, নীরেন আর তার বৌ-কে স্নেহলতার রান্নার তারিফ করতেই হবে। আহা! বেচারা! আজ সারাদিন রান্নায় থেকে বাইরে আসবার ফুরসুৎ পায়নি। এবারে মাইনে পেয়ে একখানা শাড়ী ওকে কিনে দিতে হবেই।

অপর্ণাদের ঘরটা মোটামুটি গুছোনো; ও-ঘরেই খেতে দেওয়া হবে ওদের, তক্তপোষটা দেয়ালের কাছে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, বিছানা আর দৃষ্টিকটু জিনিষপত্র হটিয়ে দেয়া হয়েছে পাশের ঘরে; আরও নানা রকম অদল-বদল করে ঘরটাকে যথাসম্ভব শোভন করা হয়েছে, পাশের বাড়ি থেকে দু'খানি ভালো আসন আর কিছু বাসনপত্র ধার করে আনা হয়েছে। অপর্ণা বলেছিল, 'আমার লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে বাবা!' এই সামান্য জিনিষ ধার করা, যা আমাদের আছে তাতেই চলে যেত।'

'তা হয়ত যেতো। মস্ত বড় সম্মানী লোক ওরা, উপযুক্ত সমাদর করা দরকার, বুঝলিনা?'

'না, বুঝলাম না বাবা, পরের কাছে ধার করে ছোট হওয়ার মধ্যে আমি কোনো গৌরব দেখিনা।'

'গৌরবের প্রশ্ন এটা নয়, প্রয়েজনে যদি প্রতিবেশির সাহায্য না পাই তা হলে আর মানুষের সমাজে বাস করা কেন।'

পরমেশ আজকাল ছেলেমেয়েদের বুঝতে পারেনা, ওরা কেন যে হঠাৎ এত রাগারাগি করে তার কোনোই হদিস পায়না সে। আর একবার ভেতরে এল সে, সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেছে, এমন কি হাত ধোবার জলটা পর্য্যন্ত যথাস্থানে প্রস্তুত।

রাত্রি দশটার সময় কমলেশ ফিরল, দেখল, বাবা দাঁড়িয়ে আছে বাইরে দরজার কাছে, 'এখানে দাঁড়িয়ে আছেন ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ওরা ত এলোনা এখনও! সমস্ত খাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!'

একটু সময়; কমলেশ তাকাল, ছোট একটু হাসল, 'চলুন, ভেতরে যাই, ওরা আসবেনা।'

আসবেনা; কেউ যেন পরমেশের কথাটাই প্রতিধ্বনি করল।

'আসবেনা ?' পরমেশ যেন নিজেকেই প্রশ্নটা করল, অবিশ্বাস্য কোনো প্রশ্ন যেন।

বাড়ির ভেতরে ঢুকল ওরা। পরমেশ তার ঘরে টুলটার ওপর বসে পড়ল।

কমলেশ প্রফুল্ল গলায় প্রায় চেঁচিয়েই বলল, 'মা, আমরা খেতে আসছি!

অপর্ণা ঘুমিয়ে পড়েছিল প্রায় বিরক্ত হয়েই, কিংবা ঘুমের ভান করেছিল, দাদার গলার শব্দে সে উঠে বসল বাবাকে টুলের ওপর বসে থাকতে দেখে সে বিস্মিত হল, ভংগিটা তার পরিচিত। কমলেশ ঘরে ঢুকল, বলল, 'চল্ অপর্ণা, আমরা খেতে যাই, বাবা চলুন, আজ ভালো আসনে বড় থালায় মাছের কালিয়া খাওয়া যাবে, আ! কতদিন যে সুখাদ্য পেটে পড়েনি!'

পরমেশ উঠল, বলল, 'তোরা খেয়ে নে, আমি আর একটু অপেক্ষা করি, হয়ত ওরা বেড়াতে গেছে কোথাও, কোনো কাজও থাকতে পারে, যে-কোনো মুহূর্তেই গাড়ি এসে পড়তে পারে।'

কমলেশ হাসতে হাসতে বলল, 'কোনো মুহূর্তেই আজ আর ওরা এসে পড়তে পারেনা বাবা, ওরা এখন ওদের বাড়িতে ঘুমোবার ব্যবস্থা করছে আর হাসছে প্রাণ খুলে, মাষ্টারমশাইর সংগে কি মজাটাই না করা গেল।'

'না, মজা করার মত লোক নীরেন নয়, ওকে আমি চিনি; নিশ্চয় কোনো জরুরি কাজ পড়ে গেছে।'

'যারা গাড়ি চড়ে, খাবার সময় তাদের এমন কোনো জরুরি কাজ পড়েনা—যার জন্যে তাদের খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়; আমি আমার এক মাসের মাইনে বাজি রাখতে পারি, ওরা আসবেনা।'

পরমেশ ভাবছিল, আহা! ওরা যদি এখনও এসে পড়ত, মুখ থাকত তার!

অপর্ণা আর কমলেশ খেতে বসল।

পরমেশ বলল, 'তোমরা আরম্ভ করে দাও, আমি হাতমুখ ধুয়ে আসছি।'

নিঃশব্দে সে আবার বাইরে এসে পড়ল একেবারে বড় রাস্তায়।

চলন্ত মোটারগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ পরমেশের সন্দেহ হল নীরেন কি তাদের এ-বাড়িতে এসেছে কোনদিন ? এসেছে ? কিন্তু তা নিয়ে বেশী মাথা ঘামালনা পরমেশ, কেমন যেন তার ক্লান্তি আসছে, অন্ততঃ চার পাঁচশ' ছাত্র তার বাড়ি চেনে, স্কুলের দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলে ঠিকানা জানা যেত! পানের দোকানের ঘড়িটায় পৌনে এগারোটা; তাহলে ঠিকই, ওরা আসবেনা, কমল ওর এক মাসের মাইনে বাজি রাখতে চায়, মাইনে! কোন্ অফিসে যে চাকরী করে তাই এখন পর্যন্ত পরমেশ জানেনা! বলে সংসারে অনেক দেয়, কাকে দেয় ? কিসে দেয় ? ঐ গাড়িটা নয় ত ? নাঃ, নীরেনের স্ত্রী—বেশ সুন্দরী দেখতে! স্নেহলতা ছেলেবেলায় ওর চাইতে সুন্দরী ছিল। ফেরা যাক! একটু শীত শীত লাগছে! পরমেশ ঘরে ফিরে চলল, স্নেহলতার জন্যে একটা পান কেনা যাক, দোকানের পান খেতে ও ভালবাসে, পকেটে হাত ঢোকাল সে, পয়সা নেই; কাল স্কুলে যাবার ট্রাম ভাড়াটা আবার যোগাড় করতে হবে।

আর গাড়ির দিকে তাকিয়ে লাভটা কি ?

সে আজও বুঝতে পারলনা ওরা এলনা কেন ?

হেরে যাওয়া, কার কাছে হারল সে ?

কে লিখবে এর ইতিহাস ?

[তিন]

পায়ের পাতা জড়িয়ে অপর্ণা, ঘুমুচ্ছে। এমন সুন্দর পায়ের পাতা আর চোখে পড়েনি কমলেশের, হয়ত ভেরা জোরিনার মত ওর পা কিংবা পীয়ের এঞ্জেলী, কিন্তু সব সময়ে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার স্বভাবটা কমলেশ কোনদিনও বরদাস্ত করতে পারে না, সংসার তোমায় প্রতিপালন করেছে, বিশেষ কোনো সংসারের সঙ্গে রক্তের আর কর্তব্যের বাঁধন রয়েছে তোমার—সে-কথা ভুললে তোমাকে বলা হবে অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর, সমান অধিকার চাও তোমরা; বেশ কথা, দায়িত্বটাও বাপু সমান, বুঝলে? মাস কাবারে গোটা কয়েক নোট মা-র হাতে গুঁজে দিয়েই তুমি পেছন ফিরলে, একটা শাড়িও ত একদিন কিনে আনতে পার মা-র জন্যে, কিংবা বাবার জন্যে এক জোড়া ধুতি! চব্বিশ বছরের মেয়েকে এ-সব আবার শিখিয়ে দিতে হবে নাকি? ছুটির পর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে মা-কে একটু সাহায্য করতে পার ত! লোকটা যে খেটে খেটে মরে যাচ্ছে সেদিকে কারুর হুঁস নেই; চা-টা বাড়ি এসে খেলেই হয়, তা না রেস্তরাঁয় বসে বসে সস্তা গল্প আর সময় নষ্ট! দু'দিন দেখা হয়েছে অপর্ণার সংগে রেস্তেরাঁয় আড্ডা দিচ্ছে; কমলেশ বলেছিল, 'কিরে! এদিকে ত এক পয়সা বার করতে হাত ওঠেনা, রোজ রেস্তরাঁয় খেতে খরচ হয়না?

অপর্ণা হাসছিল, 'তুমি যে তোমার মেয়ে বন্ধুদের নিয়ে চা খাও পয়সাটা কে দেয়? তুমি না ওরা?'

'পয়সা আমরা ভাগাভাগি করে দিই,' কমলেশ বলেছিল, 'আমাদের একটা নিয়ম আছে কেউ কারুর ওপর চাপ দেবে না; পয়সার ভাগ, পরিশ্রমের ভাগ; আমাদের সব কাজের মধ্যে একটা নিয়ম আছে, একটা শৃংখলা আছে।'

কথাবার্তাগুলো কমলেশের মনে আছে:

'তোমরা কারা?' অপর্ণাকে অল্প কথায় খুসি করা যাবে না, মেনে নেয়াটা ওর স্বভাব নয়।

'আমরা সমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট লোক, আমাদের একটা দল আছে, তার বিশেষ দায়িত্ব আছে, সমাজকে দোষমুক্ত করে নূতন করে গঠন করবার দায়িত্ব আমাদের।'

'তোমরা মোড়ল, মন-গড়া দায়িত্ব নিয়ে আত্মবৈশিষ্ট্যে ফুলছ।'

অপর্ণার দিকে তাকিয়ে কমলেশের হঠাৎ মনে হল হাজার হাজার বছর ধরে মানুষও অনেক লড়াই করেছে, আজ যদি এ-লড়াই থেকে পালাতে চায় তাকে বোধ হয় খুব বেশী দোষ দেয়া যায় না।

কিন্তু চা কৈ? সকালের চা-টাই সত্যিকারের আরামদায়ক, ছুটি দিনে ন'দশটার সময় আর এক পেয়ালা চলতে পারে, তারপর দিন গড়িয়ে যায়, আর ভালো লাগেনা। চা-কোম্পানীর বিজ্ঞাপনগুলোয় চাতুরী আছে, চা বাদ দিয়ে সামাজিকতা চলতে পারে না, চা-কে কেন্দ্র করে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে!

তক্তপোষ থেকে নামল কমলেশ, হাত দুটো মাথার ওপর তুলে পেশীবহুল বলিষ্ঠ শরীরটাকে মোচড় দিয়ে গেঞ্জির ফুটোগুলোকে লক্ষ্য করল মনোযোগ দিয়ে, দরজা খুলে বাইরে এল, বারান্দার ওপাশে রান্নাঘর, দরজায় শিকল লাগানো, কমলেশ বিস্মিত হল, মা কৈ? কুসুম কি কাজে আসেনি আজ? তাই ত দেখা যাচ্ছে; মা কৈ? ওদের ঘরের দরজা বন্ধ! ব্যাপারটা কি? কমলেশ এগিয়ে এসে দরজাটা ঠেলল, বন্ধ; ও চিন্তিত হল বুঝি বা ভয় পেল একটু, স্বামী-স্ত্রীর সংগে আত্মহত্যা করার কাহিনী মাঝে মাঝে কাগজে বোরায়, পিঠের বাঁ দিকে তার কেমন যেন একটু সির সির করে

উঠল, ঘরে এসে উঠল, ঘরে এসে অপর্ণার কাঁধে একটা ঠেলা দিয়ে তাক জাগিয়ে তুলল কমলেশ, 'কি রে! আর কত ঘুমোবি?'

আঁচলটা গায়ে জড়াতে অপর্ণা বলল, 'কেন? কি হয়েছে?'

'মা বাবার ঘরের দরজা এখনও বন্ধ!'

'বন্ধ? মা ওঠেনি?'

'তাই ত দেখছি।'

'কড়াটা একটু নাড়তে পারলেনা? কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়।' অপর্ণা দরজার দিকে গেল।

'দাঁড়া, শোন্, কাল কি ওরা ঝগড়াঝাঁটি কিছু করেছিল? কিছু শুনেছিলি?'

অপর্ণা ভাবল—এ-প্রশ্ন কেন? শক্ত হয়ে গেল সে, বলল, 'ঝগড়ার কি শেষ আছে না কি? সংসারের আর যখন কিছু নেই তখন ঝগড়া থাকতে বাধ্য; তা ছাড়া ত এক তরফা, বাবা ত শুনেই যায়, কিন্তু তার সংগে দরজা বন্ধ রাখবার সম্বন্ধ কি? তোমার যত অসম্ভব কল্পনা দাদা, সর দেখি!'

দরজার কাছে পরমেশের মুখ দেখা গেল, 'তোর মার শরীরটা বোধ হয় ভালো নেই, তুই চা-টা করে ফেল্ তাড়াতাড়ি!'

'এই ত! দিচ্ছি বাবা চা করে, এখুনি!' অপর্ণা তাড়াতাড়ি বাইরে গেল, উনুনটা একবারেই ধরাতে হবে; রান্নাঘরে স্তূপীকৃত গত রাত্রির এঁটো বাসনগুলোর ওপর চোখ পড়ল তার, বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকালো সে, কুসুমকে মনে মনে গালাগাল দিতে গেল, যথেষ্ট কঠিন কথাগুলো মনে এলনা তার; যত্ন করে উনুন ধরাল, কলতলায় গিয়ে মুখটা ধুয়ে নিল, মা-র আবার হল কি হঠাৎ, নিশ্চয় একটা শক্ত কিছু হয়েছে, আজ আর হয়ত উঠতেই পারবেনা, বসে বসে এককাঁড়ি বাসন মাজ! রাঁধতে হবে হয়ত, হবেই ত, কে আর রাঁধবে? একা হলে সে হোটেলে খেয়ে নিত, বিরিয়ানী আর কালিয়া, কালিয়াটা ওরা সত্যিই ভালো রাঁধে; সহজে সারবে, ঝোল আর ভাত, মাসের শেষ, মাছ কি আসবে? না এলেই বাঁচা যায়, আবার সতেরো হাংগামায় পড়তে হবে, তার চাইতে আলুর দম আর ভাত করবে, গরম মশলা আর পেঁয়াজ দিলেই আলুর দমের আস্বাদ হয়, ভাতের ফ্যানটা সাবধানে গালতে হবে, না হয় হাত পুড়ে যাবে, মা নিশ্চয় বার্লি খাবে, বার্লির টিনটা সে যেন কোথায় দেখেছিল।

উনুনে কেটলী চাপিয়ে দিল অপর্ণা, বাসনগুলো গুছিয়ে নিয়ে এল কলতলায়, জলটা গরম হতে হতে বাসন কটা ও মেজেও দিতে পারে সে, ছাই দিয়ে মাজতে পারবেনা সে, ন্যাকড়ায় সাবান লাগিয়ে পরিষ্কার করে নেবে, সেটা অনেক সোজা। কে জানে হয়ত বাজার হবেনা, মার যদি অসুখটা বাড়ে তাহলে বাবা যাবে ডাক্তারের বাড়ি, ছুটির দিনে দাদা যে সেই বেরিয়ে যাবে সকালবেলা, কখন ফিরবে তার ঠিক নেই, হয়ত খেতেই আসবে না, তাকেই রান্না শেষ করে বসে থাকতে হবে মা-র কাছে, বাবা ত ভাত খেয়ে ঘুমোবে; দু'টার শো-তে তার ছবি দেখতে যাবার কথা আজ, যাবে সে নিশ্চর যা-হোক করে, রাত্রির রান্নাটার কোনো রকম একটা ব্যবস্থা করতে হবে; এমন করে মা-কে ফেলে চলে যাওয়া নিতান্তই অন্যায়, এ-পৃথিবীতে মা-ই ত সব, মা-র একবার টাইফয়েড হয়েছিল, অনেক কষ্টে বেঁচেছেন, হয়ত আবার টাইফয়েডেই দাঁড়াবে, কিন্তু টাইফয়েডে আজকাল ত আর কেউই মরেনা, আজকাল ত ওষুধ বেরিয়ে গেছে, কিন্তু রাত জাগতে ত হবে পালা করে, যতই ঘুম পাক সামলাতে হবে ত কোনো

রকমে, নিজে আবার সে বড্ড ঘুম-কাতুরে, ঘুমের ব্যাঘাত কিছুতেই সে বরদাস্ত করতে পারে না।

জল নামিয়ে তাড়াতাড়ি চা করে ফেলল অপর্ণা। কমলেশ হাতে দুটো ঠোঙ্গা নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল, 'আলুর চপ আর মুড়ি।'

'তেলে-ভাজাটা আবার আনলে দাদা?'

'তেলে ভাজা-ই জীবন, বুঝলি?' কমলেশ হাসল, 'কিন্তু একবার খেতে আরম্ভ করলে তুই ও আর থামিস না!'

দু'পেয়ালা চা হাতে করে অপর্ণা দাঁড়াল, 'চা-টা দিয়ে আসি।'

ঠোঙ্গা দুটো নামিয়ে রেখে কমলেশ বলল, 'চল, মা-কে একবার দেখি।'

স্নেহলতার ঘুমন্ত মুখের ওপর এক টুকরো নরম রোদ এসে পড়েছে, হাওয়ায় উড়ছে দু'একগাছি শুকনো বিবর্ণ চুল; ক্লান্ত, অসহায় এক ভংগি! অপর্ণার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিয়ে পরমেশ একটু প্রফুল্ল হবার ভান করল; অন্য পেয়ালাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে অপর্ণা বসল মায়ের শিয়রে, কপালে থেকে চুলের গোছা সরিয়ে ডাকল, 'মা!'

স্নেহলতা তাকাল, মুখের কাছে অপর্ণা, পায়ের কাছে কমলেশ দাঁড়িয়ে, পাশে টুলের ওপর পরমেশ, হাতে চায়ের পেয়ালা, ঘরের মধ্যে এক রাশি রোদ; ওদের মুখ দেখে কিছু বোঝা গেলনা, দৃষ্টিতে উৎকণ্ঠা! ব্যাপারটা কি! এখনও সে শুয়ে আছে কেন?

'আমায় জাগিয়ে দিস্‌নি তোরা?' স্নেহলতা উঠে বসল।

'আজ আর তোমার উঠতে হবেনা মা', বলল অপর্ণা, 'তুমি আজ শুয়ে থাক, বিশ্রাম নাও, আজ তোমার ছুটি!'

ছুটি! স্নেহলতা শংকিত হয়ে উঠল এক মুহূর্তে, বুকটা খালি লাগল তার; 'ছুটি? কিসের ছুটি রে?' কেউ যেন তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছে কিছু, অতি প্রিয় কোনো বস্তু!

কমলেশ বলল, 'দেখতে পাচ্ছি মা তোমার অসুখ করেছে, কি হয়েছে বল, খুব খারাপ লাগছে কি? রতিকান্তকে একবার ডেকে নিয়ে আসি, ভিজিটও লাগবেনা, ওষুধের দামটাও পরে দিলে চলবে।'

পরমেশ তখনও চায়ের পেয়ালাতে চুমুক দেয়নি, তার আগে সে একটু নিশ্চিন্ত হতে চায়, জরুরি, কিছু করনীয় আছে কিনা সেটা আগে জানতে পারলে চা-টা জমিয়ে পান করা যায়, অপর্ণাকে সে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল চায়ের সংগে খাবার কিছু আছে না কি, বললনা কিছু, বরং কমলেশের কথার পিঠে যোগ করে দিল, 'শুয়ে থাকলেই হয় শরীর যখন খারাপ, শরীরটাও যন্ত্র নয়, খারাপ হতেই পারে, সংসার চলবেই কোনো না কোনো নিয়মে, কিছু ত আর আটকে থাকছে না, বরং—'

'কি সব তোমরা বলছ পাগলের মত?' স্নেহলতা এবারে বলল, 'কে বলেছে আমার অসুখ করেছে? কুসুম কড়া নাড়লেই দরজা খুলতে উঠব—এই ভাবতে ভাবতে ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম; কুসুম আসেনি বুঝি?' বলতে বলতে সে দাঁড়িয়ে পড়ল, সবাইর দিকে তাকাল চোখ ফিরিয়ে, ভাবল, কেন সে খুনের কথা বলেছিল পরমেশকে? কেমন করে উচ্চারণ করেছিল এমন কথা?

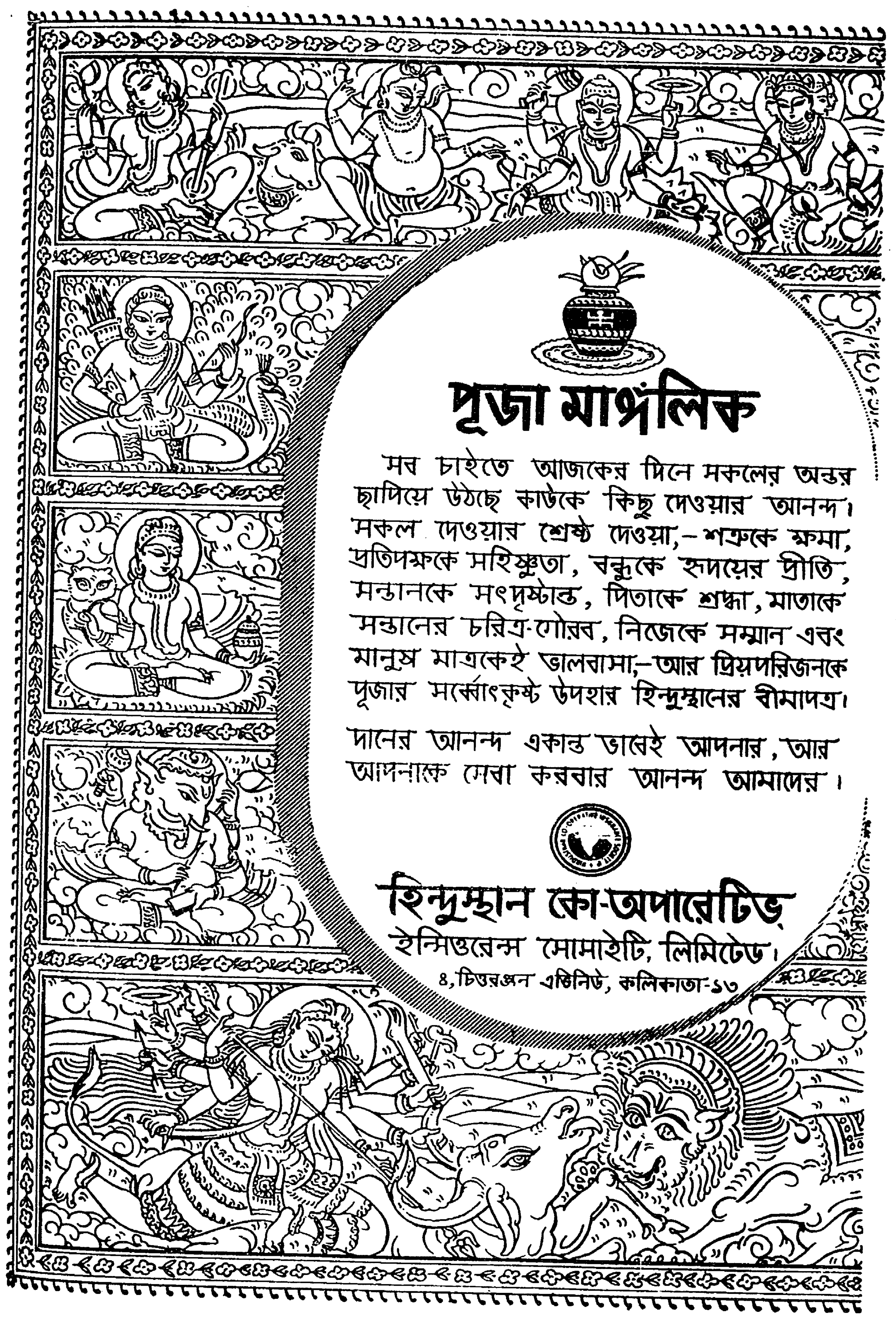

…RVASA … ASVIN—1361 REGD. NO. 1512. 10 ANNAS.

পূজার প্রীতি সম্ভাষণ

নব পরিচ্ছদ ও মিষ্টান্ন উপঢৌকন দিয়ে জানানো হয়ে থাকে। তবে উৎসব উপযোগী সুশোভন পরিচ্ছদের সঙ্গে মিষ্টান্নও চাই অনুরূপ নয়নাভিরাম সজ্জায় সজ্জিত।

কেবলমাত্র কে, সি, দাশের নানাবিধ সন্দেশ, মনোহর চিত্রিত রাংতার আবরণীতে ও রঙ্গীন এলুমিনিয়ম আধারে পরিবেশিত হয়ে উৎসবের আনন্দবর্দ্ধন করে।

প্রবাসী প্রিয়জনকে প্রীতিসম্ভাষণ জানাতে **কে, সি, দাশের** ভ্যাকুয়াম টিনের রসগোল্লাই প্রশস্ত, যেহেতু টিনে সংরক্ষিত রসগোল্লা বহুদিন সুস্বাদু ও টাট্‌কা অবস্থায় থাকে।

কে. সি. দাশ লিঃ
আবিষ্কারক রসোমালাই
কলিকাতা

COLOUR ILUSTRATION

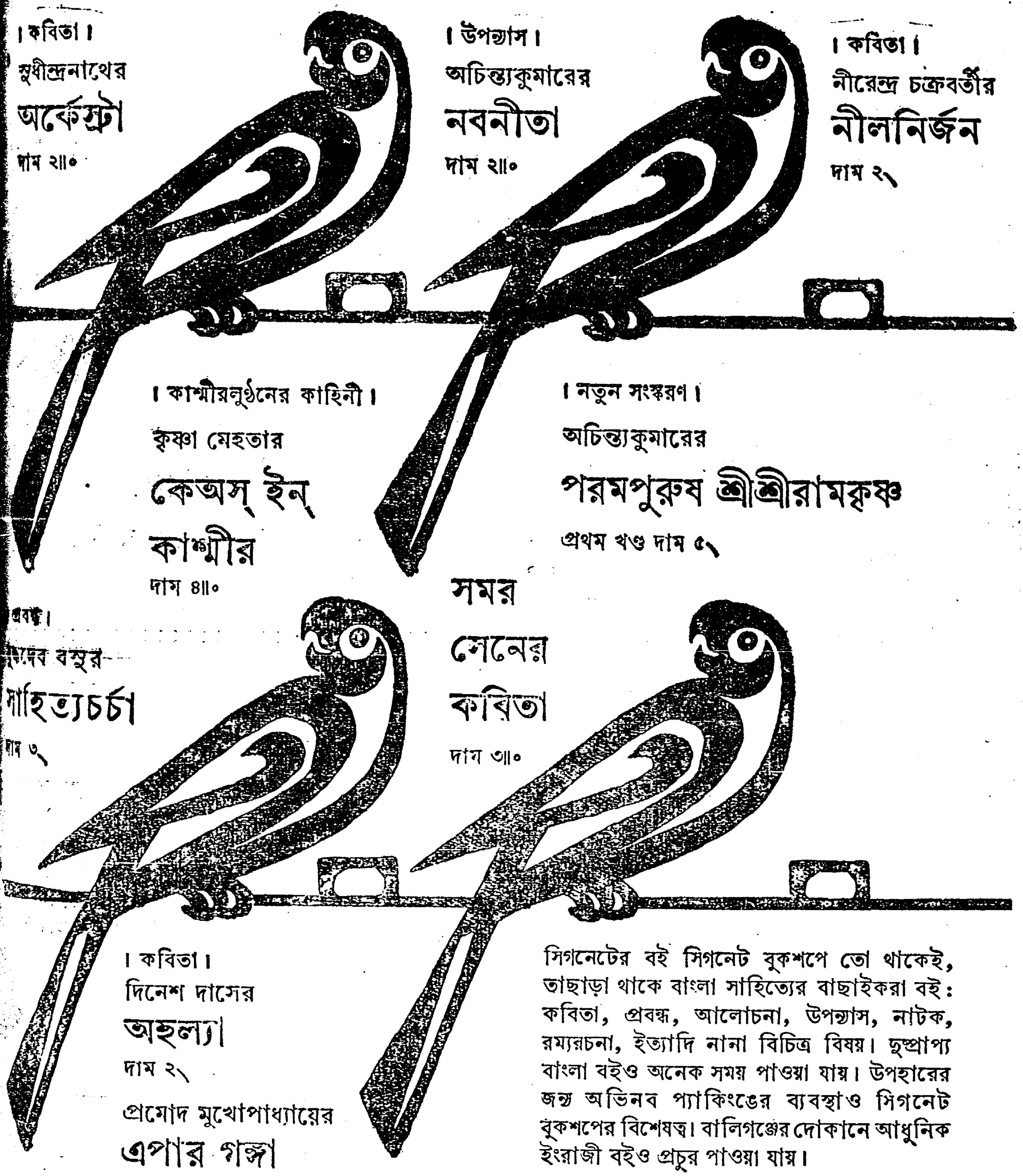

[illegible]

[illegible] পুর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ [illegible] । [illegible] আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেশনের ভার নিয়েছি [illegible] সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায় —'বৌদ্ধধর্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পুর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস
[illegible]

শ্রীনারায়ণ অগ্রওয়ালের
গান্ধী-পরিকল্পনা
(অর্থনীতি বিষয়ক)
দু'টাকা

গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা
দু'টাকা

ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম
বারো আনা

শিক্ষার বাহন
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
রুশো

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
কার্ল মার্ক্স

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ডারুইন

সুবোধ ঘোষের
সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

[illegible] শাস্ত্রীর
বৌদ্ধধর্ম্ম
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
ধর্ম্মবিজয়ী অশোক
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা:

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ভারতীয় নারী ও সমাজ

গোপাল ভৌমিকের
সমাজ ও সাহিত্য

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
সমাজ ও বিজ্ঞান

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
ধর্ম্ম ও নীতি

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
সমাজ ও সংস্কৃতি

নারায়ণ চৌধুরীর
সঙ্গীত ও সমাজ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ

লুই ফিশারের
মহাজিজ্ঞাসা
প্রথম পর্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব—চার টাকা

মিনু মাসানির
নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
মোসলেম রাজনীতি
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি
বার আনা

মিনু মাসানির
খাদ্য
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
বোম্বে পরিকল্পনা
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

।কবিতা।
সুধীন্দ্রনাথের
অর্কেস্ট্রা
দাম ২॥০

।উপন্যাস।
অচিন্ত্যকুমারের
নবনীতা
দাম ২॥০

।কবিতা।
নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর
নীলনির্জন
দাম ২৲

।কাশ্মীরলুণ্ঠনের কাহিনী।
কৃষ্ণা মেহতার
কেঅস্ ইন্ কাশ্মীর
দাম ৪॥০

।নতুন সংস্করণ।
অচিন্ত্যকুমারের
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
প্রথম খণ্ড দাম ৫৲

।প্রবন্ধ।
[বুদ্ধ]দেব বসুর
সাহিত্যচর্চা
দাম ৩৲

সমর সেনের কবিতা
দাম ৩॥০

।কবিতা।
দিনেশ দাসের
অহল্যা
দাম ২৲

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়ের
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা
দাম—১॥০

সিগনেটের বই সিগনেট বুকশপে তো থাকেই, তাছাড়া থাকে বাংলা সাহিত্যের বাছাইকরা বই: কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা, উপন্যাস, নাটক, রম্যরচনা, ইত্যাদি নানা বিচিত্র বিষয়। দুষ্প্রাপ্য বাংলা বইও অনেক সময় পাওয়া যায়। উপহারের জন্য অভিনব প্যাকিংয়ের ব্যবস্থাও সিগনেট বুকশপের বিশেষত্ব। বালিগঞ্জের দোকানে আধুনিক ইংরাজী বইও প্রচুর পাওয়া যায়।

কলেজ স্কোয়ারে: ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
বালিগঞ্জে: ১৪২/১ রাসবিহারী এভিনিউ

COLOUR ILUSTRATION

পূর্ব্বাশা

প্রতিসংখ্যা—আট আনা

কার্ত্তিক—১৩৬১

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
শিল্পশ্রী : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ...	৩৭৭
কবিতাগুচ্ছ :	
প্রথম কবি (জীবনানন্দ দাশ-কে) : অমল দত্ত	৩৮৮
দীপালী ১৩৬১ (জীবনানন্দ স্মরণে) : বিনায়ক ভট্টাচার্য্য	৩৮৯
জীবনানন্দ-কে : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ...	৩৮৯
জীবন অনুভবের যন্ত্রণা (জীবনানন্দ দাশের প্রয়াণে) : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৯০
জীবনানন্দ দাশকে : ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় ...	৩৯২
পঞ্চশ্রীগুচ্ছ : অমরভূষণ মজুমদার ...	৩৯৩
একটি কবিতার মত গল্প : সুজিতকুমার নাগ ...	৪০৫
মুষল : অবধূত ...	৪১২
অতস : তপন দাশ ...	৪১৮
কবি : প্রেমেন্দ্র মিত্র ...	৪২২
সাংস্কৃতিকী : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ...	৪২৬
নূতন কবিতা ...	৪২৯
সংবাদ ...	৪৩২

প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

মনোলীনা— ২॥০

সেতু বন্ধ— ২॥০

সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲

বিচিত্র হৃদয়— ২৲

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯

খাদ্যপ্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

সুপার-নিও-কড়

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ

কলিকাতা-১৩

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের

নুতন বোনাস

১৯৫৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রৈবার্ষিক ভ্যালুয়েশনে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরে প্রতি হাজার টাকার বীমায় সম্প্রতি বোনাস ঘোষণা করিয়াছে :

বোনাস আজীবন বীমায় ১৭৷৷০ মেয়াদী বীমায় ১৫৲

সুদের হার শতকরা মাত্র ২৷৷০ ধরিয়া এই হিসাব করা হইয়াছে।

১৯৫৩ সালে নূতন বীমা সংগ্রহের ক্ষেত্রে অন্যান্য কোম্পানীর তুলনায় হিন্দুস্থান পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার অধিক কাজ করিয়া সর্ব্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। ত্রৈবার্ষিক ভ্যালুয়েশনেও ইহার অসামান্য সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সুদৃঢ় ও নিরাপদ ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থান বীমাকারিগণের আর্থিক দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়া আজ জাতির শ্রেষ্ঠ আর্থিক প্রতিষ্ঠানরূপে সমাদৃত হইতেছে।

HINDUSTHAN CO-OPERATIVE INSURANCE SOCIETY LD.

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হেড অফিস : হিন্দুস্থান বিল্ডিংস কলিকাতা-১৩

শাখা : ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরে।

ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ

ইন্সিওরে অব ইণ্ডিয়া বিল্ডিংস্

৬৪নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা-১৩

১৯৫২ ইং পর্য্যন্ত প্রথম ১৬½ বৎসরে পাঁচটি সার্থক ভ্যালুয়েশান।

প্রতি ভ্যালুয়েশানে পলিসি-হোল্ডারদের বোনাস্ এবং শেয়ার-হোল্ডারদের ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় বীমাজগতে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

এন্. সি, দত্ত

চেয়ারম্যান।

আমি যখন ছোট ছিলাম
আমার মা বরাবর
পিউরিটি বার্লি
খাওয়াতেন
সেরা শস্য থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরি তো বটেই, তা ছাড়া ১৫১-বছরব্যাপী পেষাই-এর অভিজ্ঞতার দরুন পিউরিটি বার্লি চমৎকার অথচ দামে সস্তা।
অ্যাটলাণ্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড পোস্ট বক্স ৬৬৪, কলিকাতা-১
APBX 12 BEN
THAT ONLY IS GENUINE WHICH BEARS THE WORD "PURITY"
FOR INFANTS AND INVALIDS
PURITY
INDIAN BARLEY
PURITY
INDIAN BARLEY
Made at the Purity Barley Mills 20/1, CHETLA ROAD, CALCUTTA.

জীবনানন্দ দাশ

পূর্ব্বাশা
কার্ত্তিক—১৩৫১

শিল্পশ্রী

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

[এক]

ইংরেজি পদ্যের দু'টি পংক্তি আছে ঃ

> *"Reason, in itself confounded,*
> *Saw division grow together."*

যুক্তির বিফলতা তার ভেতরেই বসবাস করে। যুক্তির দর্শন দ্বৈতবাদী। দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদে পৌছুতে চেষ্টা করে প্রাণপণে কিন্তু তা হয়ে ওঠেনা। অথচ যুক্তি দু'রাস্তায় বসবাস করতে চায়না—দু'রাস্তার মোড়েও থাকতে চায়না—দেখাতে চায় একটি পথ। যুক্তি এ-ব্যাপারে যখন অকৃতকার্য্য হল তখন উরোপে দ্বান্দ্বিকতার আবির্ভাব। দ্বান্দ্বিকতা মন আর বস্তুকে আলাদা ধরে নিয়েও মানবকে তৃতীয় একটি সম্পূর্ণ-সত্তায় দর্শন করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু মনটি কি বস্তু, তা নিয়ে হল আসল প্রশ্ন। ডারুইন বিজ্ঞানী মন নিয়ে পশু থেকে মানবের পরিণতির উপপত্তি তৈরী করে এই বিপত্তি ঘটালেন যে পাশুপত ন্যায়ের প্রভাবে উরোপ পাশবিক মনের ত্রাণ পেলো। শ্রীচৈতন্যের আমলে বাংলাদেশের সে-অবস্থা একবার হয়েছিল—আবারও তার আভাস-ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। সব দেশে ন্যায়-অন্যায়ের গতি একই রকম দেহে প্রকাশ পায়। দু'টো সত্তা, যাদের চেহারা বিপরীত, এক স্থানে-কালে বাস করতে থাকে—তারপর তৃতীয় একটি রূপ ক্ষণকালের জন্যে প্রকাশিত হয়। এবং রাজত্ব ভোগ করে খানিকটা সময় নির্ব্বিবাদে কাটায়।

আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রবহমান গতির প্রতি দৃষ্টি দিতে পারলে এই দ্বৈতবাদের ক্রিয়াকলাপ স্পষ্টত দেখা যাবে, বিশেষভাবে রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক জীবনে। সমন্বয় ক্ষণজীবী। কালের যাত্রাপথে যতিস্থান। বিচিত্রের সমন্বয় চেষ্টা বারবার ভারত-ইতিহাসে হয়েছে ; বারবার চেষ্টা হওয়ার মানে বারবার ভেঙে যাওয়া।

সুকার্য্যের যদি শাশ্বত একটি রূপ থাকত এবং তার বিপরীত কুৎসিত কার্য্যের পেছনে যদি যুক্তি না থাকত, তাহলে হয়ত প্রার্থিত স্বর্গরাজ্য বা ধর্ম্মরাজ্যের জন্যে এতো হাহাকার থাকত না। মৌর্য্য অশোক ত বিরাট এক ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করেছিলেন—ইক্ষ্বাকু রামচন্দ্রের উপাখ্যানগত রাজ্যের সামিল

সে ঐতিহাসিক রাজ্য। কিন্তু তা ভাঙল, যেমন ভাঙল কোশলের ইক্ষ্বাকুর কালে অযোধ্যা-ইক্ষ্বাকুর রাজ্য। মৌর্য্য সিংহবাহনদের পর নাগবাহন শুঙ্গরা আবির্ভূত হলেন ভরত-ইক্ষ্বাকুর স্মৃতি বক্ষে নিয়ে, উৎক্রান্তা ভগবতী বুদ্ধজননীর স্মৃতি স্মরণ করে। প্রাচীন চেদীরা আবির্ভূত হলেন যুদ্ধ আর জয়যাত্রা আর ভরতনাট্য নিয়ে। আর্ষ্টিষেন-গোষ্ঠীর মালব-সেনরা আর্টিষ্টিক প্রেমের পথে যুদ্ধের বিঘ্ন সৃষ্টি করলেন। গুপ্তরা রাষ্ট্রপালের কূটচক্রের কাজে বহাল। চিত্রটি সমন্বয়ের চিত্র নয় বলেই আইঅনিয়ন-আক্রমণ হল পঞ্চম উপসর্গ হিসেবে।

ইতিহাসের একটি মাত্র ভারতীয় অধ্যায়ের চিত্র এখানে দেওয়া হল, যে-চিত্র মৌর্য্য-সমন্বয় প্রচেষ্টার পরেকার। এই রাষ্ট্রিক অধ্যায় ছাড়াও ধর্ম্মের অধ্যায় থেকে অনুরূপ চিত্র দেখানো চলে। ধর্ম্ম মানে দর্শনযুক্ত ধর্ম্ম বা ধর্ম্মমত। একটি ধর্ম্মমত নানা-শাখা বিস্তার করে নানা আঁকাবাঁকা রেখা নির্ম্মাণ করেছে। পাতার মতো মানুষগুলো দেখতে একই রকম। সেই দেখায় বৃক্ষসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওয়া যায় কিন্তু পাতারা জানে একশাখার উপর অন্যশাখার জবরদস্তি। শকরা জানতেন অশোকমৌর্য্যের জবরদস্তির খবর। আইঅনিয়নরা, মগরা, কম্বোজী, কলিঙ্গরাষ্ট্রিরা ত জেনেইছেন।

মানবিক কীর্ত্তিজড়িত নানা মতবাদের ভেতর ভারতীয় সদ্দৃষ্টি যদি কারো থেকে থাকে তাহলে তা যোগশাস্ত্রীদের—বসিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস প্রভৃতি দ্রষ্টাবৃন্দের। তাঁদের মনোভাবে: জীবন-নদীর দুই তীরে কু-সু বিরাজিত—কর্দ্দম ঘাঁটতে হয় ত ঘাঁটো, কুসুম কুড়োতে হয় ত কুড়োও। এ-ধরনের একটা মনোভঙ্গী থেকে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর ঈশোপনিষদে 'ক্রতোস্মর' মন্ত্রটি বলেছিলেন যার প্রতিধ্বনি বৌদ্ধ-পথে গ্রীসের অ্যারিষ্টোটল্ 'ক্যাথারসিস'-শব্দে করে গেছেন। গ্রীক্ দার্শনিক প্ল্যাটোর যোগী-দৃষ্টি ছিল। তিনি বলেছিলেন: In all of us, even in good men, there is such a latent wild beast nature, which peers out in sleep."। অবচেতন মনের কারখানার খবর উরোপে তিনিই প্রথম পেয়েছেন, যার উপর ফ্রয়েড সাহেবের ইমারত তৈরী। আর এই ফ্রয়েডিআনার দৌলতে সাহিত্যে-শিল্পে যতো পল্লবিত বাহাদুরী। সত্যি তা বাহাদুরী। মনের সত্যাসত্য সাহিত্যে-শিল্পে অত্যন্ত পরিষ্কার হতে পেরেছে ফ্রয়েডের পথে গিয়ে। কিন্তু তবু বলতে হয়, এ যেন শুধু কর্দ্দম খোঁজা। মনকে আগে-ভাগেই পঙ্কিল ভেবে নেওয়ার বৃত্তি-ও এ-পথে বিচরণ করার ফলেই জন্ম নেয়।

তাহলে নিস্তার লাভের উপায় কি? মনকে অমৃত ফল ভেবে নেওয়া? শিল্পীদের নিকট সমস্যাটি প্রখর। সমাজতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁরা সমাজের সাধারণ মঙ্গলের কতগুলো সূত্র নিয়ে বসে থাকেন—বিশেষে তাঁদের সবিবেক দৃষ্টি নেই। মানে, তাঁরা নিজেরা বিশিষ্ট হয়ে বসেন কিন্তু মনে সাধারণ সূত্র জপেন—নিজেকে চিনতে ও চেনাতে চাননা। শিল্পীর দলে যে এমন মানুষের ভীড় জমেনি এবং আমাদের দুর্ভাগাদেশেও যে তেমন শিল্পীর কম প্রাদুর্ভাব হয়েছে তা নয়। কিন্তু অধুনা বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্র তেমন মোহ থেকে ক্রমশ মুক্ত হচ্ছে।

[দুই]

যুক্তির দেশদর্শী মোহ থেকে মুক্তি না নিতে পারলে আর যে দর্শনই পাওয়া যাক্, অন্তত শিল্পসৃষ্টির চোখ পাওয়া যায়না। আদিম কালের শিল্প থেকে সুরু করে আজকের দিনের শিল্প-মাহাত্ম্য পর্য্যন্ত যে

শিল্পগুণ নাগপাশের মতো স্রষ্টার ও ভোক্তা-দ্রষ্টার মনে জাগ্রত তা অপর এক মোহ। সে-মোহ যুক্তির বেড়ায় আটকে থাকেনা। তার স্থান-কাল-পাত্র আলাদা। রস-পরিবেষণের ভৃঙ্গার অন্য পাত্রপাত্রীর মনে। তার সন্ধানে অতীতের মাটি খুঁড়তে হয়।

'পাত্রম্'*-একটি কথা যা আমাদের দেশে আদি রসস্রষ্টারা উপাধি হিসেবে পেয়ে এসেছেন। সংস্কৃত নাটকে 'পাত্রম্' প্রবেশ করতেন অভিনয় বা নাট্যাংশ দেখাবার আগে। তবে সেই নটী আর নৃত্যনাট্যের নর্ত্তনাধার পাত্রম্ নর্ত্তকী একাঙ্গা নন। পাত্রম্-এর বর্ণনা পাওয়া যায় গাঙ্গেয় রাজদুহিতা যাদব-হৈহয়-রাজবধূ 'চন্দ্রিকা'-নাম্নী নর্ত্তকীর বিশেষণে। ভুবনেশ্বরে বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠাত্রী তিনি। সুবিখ্যাত গাঙ্গেয় চোড়গঙ্গের পৌত্রী 'চন্দ্রিকা'র প্রশস্তিলিপিতে আছে:

"গীতজ্ঞা-লয়-তাল-নর্ত্তন-কলা-কৌশল্য-লীল্-আলয়া।"

তিনি গান-তাল-লয়-নাচের আলয়া বা আধার—পাত্রম্। 'সঙ্গীতরত্নাকর' গ্রন্থ 'পাত্রম্' বোঝাতে এমন কলাবতী ও কৌশল্য-লীল্ পাত্রাকে নিয়েই আলোচনা করেছে। 'কৌশল্য' শুধু কুশলতা নয়, কোশল-জাতিত্বেরও ব্যঞ্জনা আনে। 'লীল্' শুধু লীলা-জ্ঞাপক নয়, হংসপদিকা নাম্নী দুষ্যন্তের গীতজ্ঞা মহিষীর গানের চরণের 'লোলুবাংতৃমং'-ও বটে। তিনটি কলা এক অঙ্গে প্রকাশিত হয়ে যে লোলুপতা প্রকাশিত করত তাই কোশল-লীল্। কোশলে তেমন পাত্রী-পাত্রা-পাত্রমের খবর কি আছে? আমরা জানি কোশলের শেষ-ইক্ষ্বাকু প্রসেনজিতের একটি শিল্পশালা ছিল। গৌতম-বুদ্ধের সমসাময়িক এই 'কোশল প্রসেনজিত' প্রস্তর ফলকে রূপায়িত আছেন। তেম্নি তাঁর মুখাবয়বের ভঙ্গীতে ও তাঁর উষ্ণীষের অনুরূপ শিরোভূষণে একদল নর্ত্তকীর চিত্রও পাষাণ-ফলকে দেখা যায়। সেনা-জেতা প্রসেনজিতের আমলের রমণীরা দুই দলে বিভক্তা—নর্ত্তকীর একটি দল অর্দ্ধবৃত্তাকারে এবং তাঁদের একপ্রান্তে স্থির-ভঙ্গীতে গীতজ্ঞা। যন্ত্রলয়-সংযোগ করবার জন্যে যাঁরা নিয়োজিত তাঁরা অপরার্দ্ধবৃত্তাকারে উপবিষ্ট। তাঁদের হাতে যবন-যন্ত্র 'লায়ার'। বীণা বা সারঙ্গী বা তম্বুরা নয়, পরিচ্ছন্ন গ্রীক লায়ার। তাঁদের মুখাবয়বের পার্শ্বচিত্র পাষাণে ফলিত—উন্নতনাসা আর্য্য কিন্তু প্রায় বিবস্ত্র। সন্ন্যাসী নন, কেননা কটিতে অলঙ্কার-হার আছে। এই সম্ভাবিত ভারত-নাট্যবৃন্দার নাম দেয়া আছে, পাছে আমরা তাঁদের

* 'পাত্রম্' কথাটি ডিসাইফার করতে হলে পাৎ+রম্ বলে রমণীয় পদের ধ্বনিই আমরা শুনব, তা রোমান পদই হোক আর ওঙ্কারধামের অষ্ট্রিক-নৃত্যদেবতা 'কম্রতাং তেন ক্রোম্'-ই হোক। অবশ্য নৃত্য-প্রসঙ্গে এই অর্থ ও অঙ্গচ্ছেদ হয়ত অস্বীকৃত হবে না। চোড়গঙ্গ-পৌত্রী ও হৈহয় (অবন্তীরাজ) বধূর নৃত্য-প্রসঙ্গে রোমান কথাটিও অস্বীকৃত না হতে পারে। 'পাত্র' মানে 'ঘট'-ও হয়। তখন আমরা ভিক্টোরিয়া-মিউজিয়মে রক্ষিত 'স্তম্মাচোর' নামক পাত্রীর (বাইজেনটাইন-হস্তিদন্ত-শিল্পের নিদর্শন) দিকে চাইব, যাঁর হাতে ঘট, পদপাতভঙ্গী কম্র, অশোক-বৃক্ষতলে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন। চোড়-গঙ্গের সঙ্গে স্তম্মাচোর কোন্ ভীমের 'বেঙ্গী'তে মিলবে তা ইন্দো-উরোপা-সংস্কৃতি-বিচারক ধ্বনিতাত্ত্বিকরা দেখুন। তবে এটুকু তাঁদের লক্ষ্য করবার আছে যে আইঅনিয়ান আমলের তক্ষশিলায় বাইজেনটিনাম-শিল্প-চর্চ্চা বুদ্ধমূর্ত্তি-গঠনে হয়েছে। খ্রীঃ-পূঃ ৮০০ অব্দে গ্রীকদের নগর-রাষ্ট্রকে বলা হত বাইজেণ্টিনাম। 'বাইজি', যার নাম এখন 'ব্যালে' (মৌর্য্য আমলে 'রূপজীবা'), বাইজেণ্টিনাম থেকে রূপ ও নাম নিয়ে হয়ত এসেছিলেন। আমাদের 'পাত্রম্'-প্রসঙ্গে প্যারিসে-রক্ষিত বাইজেণ্টিনাম গজদন্ত-শিল্পের 'রোমনোস'-রাজার 'রম্' ধ্বনি-টুকু গ্রাহ্য হলেই চলে, 'ওম্' প্রসঙ্গ আরো রোমাণ্টিক, এখানে তোলা থাক।

ভরত-নারদ-রম্ভা-তুম্বুরু-হুহু নামক ব্রহ্মার সঙ্গীতের পঞ্চ-শিষ্যশিষ্যাণী ভেবে বসি। নাম হচ্ছে: 'সাড়িকসামর্ড'। আমোদী সারী-সম্প্রদায়। কোশল যে এম্নি রত্যামোদ ভুঞ্জন করত তা গৌতম-বুদ্ধের 'ধম্মপদে' ব্যক্ত আছে। সারিকা বা সারী (নর্ত্তকী-গীতজ্ঞা) যে কোশলের কৌশল্যাবৃন্দা তা বোঝা যায় কিন্তু 'কসামর্ড' কারা? সম্ভবত এই 'শুক'-বৃন্দ বা লায়ারযন্ত্রধারী নাবিক-সেনা-জাতীয়রা কোসোম বা উদয়নের কোসাম্বীর মানব। 'উদয়ন'-নাম বৌদ্ধগ্রন্থেই নয় শুধু, সংস্কৃত কাব্যে (মেঘদূত) এবং নাটকে (স্বপ্নবাসবদত্তা ও রত্নাবলী) সোচ্চার। ভারতবংশী উদয়ন বাসবদত্তাকে বাগ্‌দত্তা করেন সঙ্গীত-শিক্ষক হিসেবে বাসবদত্তার সাহচর্য্যে এসে। 'কসামর্ড'-বৃন্দ উদয়ন-সংস্কৃতির 'কোসোম'-পুরীর যন্ত্রীদল। এঁরা 'লায়ার' পেলেন কোথায় তা এখানে আলোচিত হবে। তাই কোসাম্বীর খানিকটা প্রাচীন কুসুম-গন্ধ নেওয়া যাক্।

সঙ্গীতের জন্মদাতা মহাদেব বা প্রজাপতি ব্রহ্মা। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ব্রহ্মদেশের প্রজাপতি কিন্তু 'শক্র' যিনি 'মহাগীত মেদিনীগান' নামক নৃত্যনাট্যশাস্ত্রের প্রাণদান করেন। 'শক্র' হলেন বিবুধ ইন্দ্র। বৌদ্ধ ইতিহাস-গ্রন্থ 'দীঘনিকায়ে' শক্র-সম্পর্কিত একটি অধ্যায় আছে। সম্বুদ্ধের সঙ্গে শক্রের পরিচয় ইন্দশাল-পর্ব্বতে পঞ্চশিখের একটি 'গীতি'-মারফৎ হয়েছিল। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় দেখা যায়, তিনি 'সমড শক্র গথা' নাম বা উপাধি নিয়েছেন। সমদ শক্রের মতো ছিলেন লিচ্ছবী-দৌহিত্র এই আর্য্য গুপ্ত সম্রাট। 'গথা' মানে নারদ-প্রোক্ত 'গাথিক' স্বর-বিন্যাস হতে পারে।

এখানে আমরা প্রাচ্য প্রজাপতি, নৃত্যনাট্য প্রণেতা 'সমড' ইন্দ্রকে পাচ্ছি এবং 'সাড়িকসামর্ড' ফলকের ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা শব্দটির একটি অংশ সূত্রান্বিত করতে সমর্থ হচ্ছি। মহাভারতীয় বা বৃহৎ ভারতের আর্য্য দেবতা ইন্দ্র, যিনি অপ্রমাদ-ভাবে আসক্ত ছিলেন না, নৃত্যনাট্য প্রণেতা এবং কোশল-কোসমের 'সাড়িকসামর্ড'-বৃন্দের নৃত্যনাট্যদলের প্রাণপুরুষ তিনিই। সমুদ্রগুপ্ত 'গীতার'-বাদ্যযন্ত্রের মতো যে তন্ত্রীটি হাতে নিয়ে পালঙ্কে বসে তাঁর মুদ্রাস্থিত মূর্ত্তি দান করে গেছেন, তা দেখতে লাউ-এর মতো, লায়ারের মতো নয়। ব্রহ্মাশিষ্য নারদের 'বীণা' বা তুম্বুরুর 'তম্বুরা' বা 'গীতার'-যন্ত্র 'সমড'-সেবকদের ছিল বলে এখন অনুমান করা সম্ভবপর। তাছাড়া এমন অনুমানও সম্ভব যে পাশ্চাত্যের 'গীটার' বা গীতার 'মহাগীতমেদিনীগানে'র সংস্কৃতি-সম্ভব। দান্তে ইউলিসিসের প্রণয়িণী সার্সির নিকট গীতা স্থাপন করেছেন। সার্সি-প্রকৃতির রমণী হয়ত 'লিচ্ছবী' বা 'লায়াবা যক্ষিণী'। ভারতের প্রাচীনতম ভাস্কর্য্যের শ্রী-মূর্ত্তি এই 'লায়াবা'-শ্রী বা সার্সি। সার্সি 'বাইজেন্টিনাম'-গ্রীকরমণী। তাঁদের ভারতীয় সংস্করণ যজুর্ব্বেদোক্ত 'শ্রী' কি না বিবেচ্য। তবে গ্রীক 'লায়ার' 'লায়াবা'-দলের (লভ্যা রমণী) 'সাড়িকসামর্ড' অবাধে ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে বৈজয়ন্তী-সংস্কৃতি (মহাসূদসূদনের) আর বাইজেন্টিনামের বৃজি-বাইজি-সংস্কৃতি একাত্মক ছিল। তাঁদের আমরা ব্রজ-'আভীর' নামে চিনতাম।

ভারতবিজয়ী আলেকজান্দারের দল পাতাল নগরে (মোহেঞ্জোদারো) স্পার্টান সংস্কৃতির মূষিকদের পেয়েছিলেন, যাঁরা ভারত-ব্রাহ্মণের শিষ্য। মোহেঞ্জোদারোর মূষিক-ব্রাহ্মীলিপির ছিল কুসুম-মালাকারে পংক্তি। আর সে-লিপির প্রথম বর্ণ 'ঞ' এবং দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ বর্ণ হ'ল 'কোসোমোয়োধ' শব্দ। কুসুম-আয়ুধ কামদেবের জন্মভূমি কোসমের অধোদেশে বা পাতালে মূষিকরা 'তমস'-রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এই স্পার্টান (পাঠান ও পৈঠানী) যেমন 'পাটলিগ্রাম' স্থাপয়িতা মল্ল হতে পারেন

তেম্নি 'বাইজেন্টিনাম' সংস্কৃতির মারক-বাহক 'মূষিক' হতে পারেন। তবে ব্রহ্মার প্রাজাপত্য লীলা ব্যঞ্জিত করে' একটি সীলমোহর মোহেঞ্জোদারোতে হয়ত টিরেটোবার্শ্মাণ আমলে উৎকীর্ণ হয়েছিল।

ব্রহ্মার দুষ্কৃতি বর্জ্জন করে সুকৃতি-রূপ সঙ্গীতশাস্ত্র ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছে। ব্রহ্মাশিষ্যের নৃত্য, নাট্য, গীত 'ভরতনাট্য' নামে বিদিত। শিল্পীর বা শিল্পস্রষ্টার বাস্তব জীবনের কলুষ-স্পর্শ তাঁর সন্ততিতে থাকলেও শিষ্যসম্প্রদায়ে হয়ত আসে না। শিষ্যরা তাঁর শিল্পেরই সেবক। অবশ্য শিল্পী যদি তাঁর বিকৃত মনের লীলাই শুধু রূপায়িত করে যান, তাহলে তাঁর সুকৃতির শূন্য ফলে শিষ্যরা পাতালে ডোবেন। ব্রহ্মা সম্পূর্ণ জাতির দু'টি রাগ (শ্রী ও নট) প্রথম প্রণয়ন করেন। অবশ্য 'শ্রী'র উপর বামদেবের ও পার্ব্বতীপুত্র গণেশের দাবীও স্বীকৃত। শুঙ্গ-যুগে (ভারদ্বাজ) 'পুতনাগরাজা' যখন ধৈবত-সুরে বিদিশায় গর্জন করেছেন, তখন হয়ত শ্রীর উপর বাঙ্গালী শৈব-জাতির 'শোক' জন্মে।

মল্লকৌশিক জাতির (বিশ্বামিত্রের বেদে ও মল্ল সংস্কৃতিজাত) 'মালকোশ' নামক অসম্পূর্ণ জাতির রাগের উপর আবার তেম্নি ব্রহ্মা দাবী জানিয়েছেন। মিত্রদেব-ও তার উপর দাবী জানিয়ে অন্ধ্র সাতবাহন 'গাথা' তৈরী করতে পারেন। কৌশিক বিশ্বামিত্রের-ও একটি শিল্পশালা ছিল এবং বেদে, মন্ত্র, সর্প-পোষণ, বাঁশী-বাজনা প্রভৃতি সম্ভবত সে-প্রতিষ্ঠান-জাত। অবশ্য কৌশিক বিশ্বামিত্র কান্যকুব্জেশ্বর কিন্তু তাঁর পঞ্চাশ-পুত্র পুণ্ড্র-অন্ধ্র-শবর প্রভৃতির সঙ্গে মিশ্রিত ছিলেন। বঙ্গের দুর্গা সর্পপোষিকা। ঋক্‌বেদের আমলে 'কুশিকাসঃ' বা বিশ্বামিত্র-সংস্কৃতির মানবরা পঞ্চাল-সিন্ধু অঞ্চলে ইন্দ্রের ও 'ভরতাঃ'-র সন্ধান করছেন দেখা যায়। সে-অঞ্চলে নাগ-জাতির 'বাজনা' যোন-'বাইজেণ্টাইন' হয়ে গিয়েছিল হয়ত ততোদিনে। অন্তত 'কুশান'-শুঙ্গ-মিত্র আমলে তা ত হয়েইছে। ফলে শেষ পর্য্যন্ত মিত্রের 'কোসামোয়োধ' কুশানরাই অধিকার করে' ছিলেন। ভারত-সংস্কৃতি ইন্দ্রের হোক আর মহাদেব বা ব্রহ্মারই হোক, তার চরিত্রে যবন ও অনার্য্যের স্মৃতি-শ্রুতি-শিল্প-রুচি ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। সুকৃতি ও দুষ্কৃতি সব দিকেই ছিল। সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্প-বিচারে উৎক্রমণই বিবেচ্য এবং ত্বরান্বিত উৎক্রমণই জাতির ও ব্যক্তির নমস্য মানসিক সুক্রিয়া। 'ব্যালে' কথাটি ব্যাল-গ্রাহী বা গাঁধি-কৌশিক বেদের 'গাথা' থেকে আগত। মণিপুরী লিচ্ছবী-ব্যালে নৃত্য দেখলে বোঝা যায় সর্পবশকারী বংশীধারী যাদব শ্রীকৃষ্ণের গীতা-যোগে বেদে-নাচ কেমন মঙ্গলশ্রীময় হয়েছে।

নৃত্যে নাটক আর নাটকে নৃত্য আলাদা ব্যাপার। যন্ত্রজ্ঞ পাত্র উদয়ন একটি সংস্কৃত নাটকের পাত্র হয়েছেন নাটকের রচয়িতার দৃষ্টিতে পড়ে। নায়ক হিসেবে সংস্কৃত-নাটকের উদয়ন রতি ও রুদ্র ভাবের চরিত্র, তাঁর বাস্তব চরিত্র যা-ই হোক। ব্রহ্মার স্বরসপ্তকের শ্রী ও নট রাগরস-সমন্বিত 'ভারত'-নট, শৃঙ্গার ও বীর-রস তাঁর চরিত্র থেকে সমুত্থিত। কিন্তু উক্ত নাটকের ক্যাথারসিস আমাদের বোধে আজ নায়িকা বাসবদত্তার উৎকৃষ্ট জীবনের করুণরস, উদয়নের স্বাপ্নিক হাহাকার নয়। নাট্যের নটের ভাব-নৃত্য বিষাদ-পূর্ণ নয় বলেই এ-নাটক গ্রাহ্য হয়েছে প্রাচীন ভারতে—আভীর অবন্তীর বাসবদত্তা বিষণ্ণা হোক বা না-হোক। নাটকে নাট্যাভিনয় দেখাবে নায়ক-চরিত্র, পাত্রম্ পুরুষ। নারীর জন্যে ছিল নৃত্যের জগৎ। নৃত্য-নাট্যে পাত্রম্ নর্ত্তকী নায়িকা। তিনি নাটকের চরিত্র-হিসেবে এলেও (যেমন 'মৃচ্ছকটিকে' এসেছেন) যে মিলনান্ত ভোগরস দিতে পারতেন, তা নয়। তেমন স্বাধীনতা ছিল

তাঁর নৃত্য-নাট্যের 'পাত্রম্' হিসেবে। সেখানে ধ্বনি-রস ও অঙ্গ-রস নিবেদিত হত—বাক্য ব্যবহার ছিলনা। আপন-চরিত্রানুযায়ী রতি-রস নিবেদনের ভারতীয় কলস ছিল বিভিন্ন।

[৩]

ধর্ম্মসাম্রাজ্যবাদী অশোক 'কলসী-সমাজ' বা নাট্যশালা-রঙ্গশালা স্তব্ধ করে দেন। কিন্তু তাঁর সাঞ্চীস্তূপে করভোরু নর্ত্তকী বাঁক-খাড়ু পায়ে বিদ্যমানা। পাত্রান্তরিতা মহিষী 'কারুবাকি' ইনি কিনা কে বলবে? সমিধ-সমন্বিত ও সমদ গুপ্ত-আমলের নাট্যকার ও কবি কালিদাস নাটকের নটীর গান শ্লীলতা মুড়িয়ে রচনা করেন নি। "ইসীসিচুমিদাইং" পদাংশটির বাচ্যাতীত রস আবিষ্কার করতে গেলে কালিদাসকে অশ্লীল-অভিজ্ঞতাপূর্ণ ব্যক্তি বলতে হয়। কিন্তু ন্যায়-বিচারে কি নাট্যকারকে নট-নটীর সঙ্গে রসের ক্ষেত্রে একাত্মক ভাবা যায়? বিচার এমনই বস্তু যা বিপরীত দিক দেখাবে—'হাঁ' আর 'না' জড়াজড়ি করে আসবে মানুষের বাস্তবিক ও মানসিক কর্ম্মকৃতির মর্য্যাদা-মূল্য বা অভিজ্ঞতা-তত্ত্ব বোঝাতে গেলে।

শিল্পরসভাণ্ডে ভাঙন দেখা দিলে শিল্পীরা, সব কুল বাঁচিয়ে, আশ্চর্য্যরসে মনোনিবেশ করেছেন যার উৎস হল বিস্ময়-ভাব। ইংরেজিতে একেই হয়ত রোমান্টিক মনোভাব বলা যায় কিন্তু পিউরিটান দেশের রোমান্টিক মনোবৃত্তির গতিবিধির সঙ্গে আমাদের ভারতীয় আশ্চর্য্য-রসের খানিকটা ফারাক আছে। তাছাড়া আশ্চর্য্য-রস মহাকাব্যের অন্তরঙ্গ ঐকান্তিক রস নয়, চম্পূকাব্যেই এই রস-নিবেদিত হত যাকে গীতিকবিতা বলা যায়। সেখানকার পদগুলোর বাচ্যভঙ্গীও দুটি অর্থ পরিবেষণ করতে সমর্থ ছিল। একটি অর্থ প্রায়ই রতিভাব-ব্যঞ্জক। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের আলঙ্কারিক অভিনবগুপ্ত বলেছিলেন:

"...প্রাঙনিবিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগসুকুমার-স্বসংবিদানন্দাচর্ব্বণব্যাপার-রসনীয়-রূপো রসঃ।"

'প্রাঙ্‌নিবিষ্ট' কথাটি অত্যন্ত মূল্যবান। তা সংস্কার, প্রারব্ধ, শৈশব-বাল্য-কৈশোর-যৌবন সবই বোঝাতে পারে। এবং ভাববাসনার অনুরঞ্জন প্রৌঢ়ত্বে, বার্দ্ধক্যে, স্বপ্নে, সৃষ্টিতে এসে উদিত হতে পারে কোসাম্বীবৎসরাজ উদয়নের স্বপ্নাশ্রিত বাসবদত্তার মতো।

রতি-ভাবকে আদি রসে পরিণত করে থাকে মানুষের প্রাক্-নিবিষ্ট রতিভাব। কৌটিল্য-বর্ণিত রাজনটী বা 'রূপজীবা'-সম্প্রদায়ের অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকার পক্ষে প্রাক্‌নিবিষ্ট-রতিভাব যে সুলভ ছিল তা হয়দ্রবাদের 'পালমপেত' মন্দির-গাত্রের নগ্নপ্রায়া নর্ত্তকী-ফলকগুলো দৃষ্টে অনুমিত হয়। সেখানে দুঃশাসন বস্ত্রহরণ করছেনা—নর্ত্তকীর বস্ত্রাঞ্চল সরিয়ে ফেলছে ক্ষুদ্রকায় বালক। 'বামন' না বলে 'বালক' বলছি 'সাড়িকসামডঁ'-বৃন্দে একটি উলঙ্গ বালককে নর্ত্তকীদের সঙ্গে নৃত্য করতে দেখে। কিন্তু 'সমড'-বংশের বা সমুদ্র-গুপ্ত বংশের বালকরা বস্ত্র-পরিহিত, অশ্বের সঙ্গে সমরে প্রবৃত্ত দেখা যায়। সম্ভবত অশ্বকরাজ্যের সঙ্গে এরা যুক্ত; দ্রাবিড় 'পালমপেতে' একটি ঘোটকী-নর্ত্তকীও (একটি পা ঘোড়ার মতো) আছে। বালকের রতিভাবভুঞ্জন অন্ধ্র সাতবাহন-'গাহা'য় কৌশলে পরিবেশিত। কিন্তু যোন-তক্ষশিলায় আইঅন-রাধার অর্দ্ধনগ্ন যুগল-মূর্ত্তির পার্শ্বে রাধার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করছে, এমন একটি বালকৃষ্ণ মূর্ত্তিও

স্থাপিত হয়েছিল সীলমোহরে।* চোর বা চোড়গঙ্গরা করমণ্ডল উপকূলের প্রস্তরে কামশাস্ত্র প্রণেতা। মোটের উপর বৌদ্ধ মতবাদ 'মার'-দমন করতে পারেনি ভারতীয় সমাজ-মানসে। গুপ্তের আর্য্য সামরিক বৃত্তি-ও এই আদিভাব দক্ষিণাপথ থেকে উৎখাত করতে পারেনি। কৌটিল্যের আইনও শুধু রাজপ্রাসাদে বা ধনীর বৃত্তে নটীদের আটক রাখতে পারেনি। নাটকে কালিদাসের আমলেই তারা সর্ব্বসাধারণকে রতিরস দান করতে সুরু করেছে। কারণ ভারত-সভ্যতায় বহুযুগের ঐতিহ্য এই রস। কখনো তা নাগবংশী সাতবাহনের 'গাহা'র (গাথা) মতো বা কালিদাসের নটীর গীতির রসের মতো অন্তঃসলিল, কখনো বা মন্দির-শিল্পের স্থূলতার মতো সোচ্চার। সম্ভবত 'বঙ্গ' ও-রসে বঞ্চিত থেকে গীতিকবিতার পথে পরিত্রাণ লাভ করেছে। 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল'-এর ছন্দ নিয়ে 'বেঙ্গী'-সংস্কৃতির 'গাহা সত্তসঈ'-এর সখ্য থেকে মুক্ত হয়েছে ক্রমে। বঙ্গীয় প্রাকৃত কাব্য-চিত্রে উৎক্রমণ-কৌশল সুস্পষ্ট।

গীতি বা প্রাকৃত গাথা-সাহিত্যে মনও সংযত হতে পেরেছে ক্রমে। এ কাজে বৌদ্ধ থেরী গাথা হয়ত খানিকটা পথ সুগম করে দিয়েছিল। কিন্তু রতি থেকে শান্তরসের লম্ফ সে গাথায় অতিবেশি চিকিৎসা-বৃত্তি ব্যক্ত করেছিল বলে তেমন হৃদয়গ্রাহী বা মর্ম্মস্পর্শী হয়নি। 'দীঘনিকায়ে' পঞ্চশিখের গাথা লিরিকের ধর্ম্মে অগ্রসর। ভাবের মিলন বা মিশ্রণ করতেই হয় গীতিতে কিন্তু তা শান্ত রসের প্রান্তে আশ্চর্য্য বা অদ্ভুত রসে গিয়ে থামবে—বিস্ময়াপ্লুত করে দিতে হবে ভোক্তাকে, তবে তা হবে কাব্য-ধর্ম্মী। ধর্ম্ম-কাব্য কাব্য-ধর্ম্ম লঙ্ঘন করে থাকে। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির জন্যে ধর্ম্ম-কাব্য, কাব্য-প্রাণ-ব্যক্তি কাব্য-ধর্ম্ম-সন্ধানী। কাব্যধর্ম্মে 'রতি' প্রেমে উত্তীর্ণ।

কাব্যে আশ্চর্য্য-রস বিস্ময়ভাব থেকে আসে। এ-বিস্ময়-ভাব ঋক্‌বেদের অর্দ্ধবোধ্য ঋক্‌গুলোতে যেমন ব্যক্ত, তেম্নি 'চর্য্যাপদের' অভিনবত্বেও অভিব্যক্ত। বিস্ময় ভাব যে বিস্ময়-স্রষ্টাকে আপ্লুত করে তা হয়ত নয়, তবে আপ্লুত করে ভোক্তাকে। অনেক সময় এ-সৃষ্টি ভোক্তাকে অলৌকিকতার রাজ্যেও টেনে নিয়ে যায়। স্রষ্টাকে শুধু নানা-বিষয়ের একটি সমন্বয় করতে হয় এই ধরনের রচনায়। এ-যেন নৃত্যে-রসের প্রতিদ্বন্দ্বী বাক্য-রস রচনা। মোড় ফিরলে উভয়পক্ষেরই চেহারা অন্যরকম। বিচিত্রতার ক্ষণিক সমন্বয় সাধন হয় এতে। দীর্ঘপদী মহাকাব্য ত তা নয়—ছন্দের ক্লান্তির প্রশ্ন তা-ই উপস্থিতই হতে পারেনা। 'Magical power' বলে যদি কিছু শিল্পের অঙ্গীভূত পদার্থ থাকে তা হলে তা আছে বিচিত্রভাবসম্পন্ন নৃত্যে, চিত্রে ও লিরিকে। 'পাত্রম্'-কে প্রতিদ্বন্দ্বিনী ভাবেন লিরিক কবি। নাটকে, গল্পে, মহাকাব্যে, উপন্যাসে আছে সুদীর্ঘ ঘটনা-পঞ্জী ও অভিনয় রস যা বাস্তব-গাত্র-ঘেঁষা। Action বলতে যা-কিছু তা এসবের অঙ্গেরই অলঙ্কার। লিরিক খালি-হাতে মুদ্রা, স্থিতাবস্থার চিত্র, বাক্যের যাদু। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত লিরিক-সিদ্ধা প্রাকৃতভাষার কবি। তারপর মহাকাব্য, বিজয় কাব্য, মঙ্গলকাব্য, চরিতকাব্য, শিবায়ন প্রভৃতি এসেছে স্বাদ বদলাবার রুচিতে। লিরিকের একাঙ্গ শাখা

* 'ছরি-শামাদারে'র যে চিত্র পাঠান পদ্ধতিতে মীর কালান খাঁ এঁকেছিলেন তাতে একটি শৈব কৌপীন-পরা ক্ষুদ্রকায় বালককে নৃত্য-পাত্র হিসেবে দেখা যায়। 'সাড়িকসামডঁ' পাঠান-আমলে 'ছরিশামাদার'। 'শ্রী'-ধ্বনি ছড়িয়ে ছিল 'সিরি,' 'সাড়ি,' 'ছরি', সার্সি, সারী প্রভৃতি সৌন্দর্য্যের সিঁড়ির ধাপে ধাপে। শাড়ির বালাই কখনো ছিল, কখনো ছিলনা।

বৈষ্ণবপদাবলী। যখন আমরা ইতিহাসে জাগ্রতচিত্ত হতে চেয়েছি তখনই লৌকিক ভাবে উদ্বুদ্ধ উক্ত কাব্যগুলোতে মনোনিবেশ করেছি। আর যখন আত্মসংস্কৃতিজাত শ্রী-রূপ ধ্যান করতে পেরেছি তখনই জেগেছে গহীন মনের 'গাহা' বা অস্পষ্টতা-কুয়াশা-ময় কাতরোক্তি :

"সো মহ কন্তা
দূর দিগন্তা।
পাউস আ এ
ঢেউ চলায়ে॥"—(প্রাকৃত পৈঙ্গল)

সাধারণ ভাষায়, মনে হবে, সাধারণ বিরহ ব্যঞ্জিত এ পংক্তিগুলোতে। কিন্তু যখন জানতে চাই কে 'মহ', আমি না মহদ্দেবতা?—তখন সব বাচ্যার্থ গুলিয়ে যাবে। তখন 'পাউস' একবার 'পউ' হয়ে 'পুষণ'কে ভাববে, একবার 'প্রাবৃষ' হয়ে বৃষ-মূর্ত্তি দেখবে। কার যে ঢেউ, কে যে কান্তা, তা মন বুঝতে পারবেনা। শুধু ভাববে, কস্মৈ দেবায়?—কে সে কান্ত কমনীয় যাকে প্রাণের হবি ঢেলে দেব?

নৃত্য, নাট্য, সঙ্গীত থেকে পৃথক হয়ে যে লিরিকের জন্ম হ'ল বাঙালীর প্রাকৃত-ভাষায়, তা বেঙ্গীর 'সাতবাহন গাহা' থেকে পৃথক। পার্থক্য স্পষ্ট হল পশ্চাতের রসকে সম্মুখে টেনে এনে, 'অন্ধ্র গাহা'য় এ-অতীত ছিলনা। উৎক্রমণ বা যাত্রা, মনের হোক বা মানস-পাত্রপাত্রীর হোক, প্রত্ন মাটির রসায়ন সংগ্রহ করে সুরু হয়। 'সেরিক' বা কুশদ্বীপের কুশান 'লিকেরণ' সে-স্বর্গের প্রহরী।

[৪]

লিরিক কাব্যের স্রষ্টা সর্পভঙ্গীতে পদের অন্তর্গত শব্দধ্বনির যে শ্রুতি-রূপ অনুভব করেন, শ্রোতা বা পাঠক তা পেতে পারেন স্রষ্টার মনের অতিশয় সমীপবর্ত্তী হতে পারলে। প্রত্যেক শব্দেরই আছে বিচিত্র 'চরিত্র'। একটি পদে শব্দদল সমবেত হয়ে কী কী ধ্বনি-রূপ জাগিয়ে তুলছে স্রষ্টার মনে—একটি, না দু'টি, তা বিদগ্ধ শ্রোতা ছাড়া আর কেউ উপলব্ধি করেন না। রূপক-নাট্যে এ-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়ে থাকে। রূপক-নাট্যের উপভোগ দ্বিধা-বিভক্ত। লৌকিক রসের অন্তরালে বিস্মিত হবার মতো কিছু থাকে যা অব্যক্ত ঐতিহাসিক বা সামাজিক বিষয়ানুগ। বিদগ্ধজন উভয়বিধ রস পান করেন কিন্তু সাধারণ সমাজ বাইরের মাংসটুকুর স্বাদ নিয়ে যান। এই যে 'যান'-শব্দটি আমি ব্যবহার করলাম—তা উচ্চারণ করলে বৌদ্ধ-শ্রুতিতে নানা-যানীদের মতবাদ এনে দেবে, হিন্দু শ্রুতিতে পিতৃযান-দেবযান প্রভৃতির কথাচিত্র দিতে চেষ্টা করে যযাতির ও কচের 'দেবযানী'-রূপ স্মরণ করাবে—যান-বাহনের কথাও কেউ চিন্তা করবেন কিন্তু আমি বিরক্ত হয়ে বল্‌তে পারি : যান, মশাইরা কিচ্ছু বোঝেন না। শব্দের বাছাই-এর উপর ঝোঁক দিয়ে, শব্দের মূল্যবোধে শব্দ-ব্যবহার লিরিকধর্ম্মী কবির কর্ম্ম। অবশ্য মাধুর্য্যের কথা তাঁর শ্রুতিতে সর্ব্বাগ্রগণ্যতা পায়। লিরিক মানুষের মনের মাধুর্য্য যাচাই করে।

সম্প্রতি শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্তের অর্কেষ্ট্রা-কবিতার আলোচনায় হয়ত বাগঙ্গ-কাব্যের এই উপপত্তিটির উপর ঝোঁক দিয়ে বলেছেন যে সুধীন্দ্রনাথের প্রত্যয় হ'ল : "Poetry is made of words."। যদি তা-ই হয়, তাহলে বল্‌ব, সুধীন্দ্রনাথ একটি শব্দে একটি মাত্র চিত্র ধরে

দেখান। রীতিটি পরিচ্ছন্ন ব্যাকরণ-গত। যদি ধূর্জ্জটিপ্রসাদ ব্যাকরণ-গত বাচ্যার্থ মনে রেখে 'Word'-কথাটি ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে এ-প্রত্যয়ের কথা বলা-না-বলা সমান কথা। ব্যাকরণের বাইরে প্রয়োগ-শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ না করে ইংরেজি 'Word'-শব্দ ব্যবহারে সব-কিছু বলা, বা না-বলা আলোচনার অঙ্গ কিনা সন্দেহ।

তেম্নি ধূর্জ্জটিপ্রসাদ 'ব্যালে'-কথাটি অর্কেস্ট্রা-প্রসঙ্গে উত্থাপিত করেছেন। নিশ্চয়ই তা পশ্চিমী 'ব্যালে'-র ধরে নিলাম যে সুর-সপ্তকের আরোহী গ্রামিক মূর্চ্ছনা বা স্বর কী-কী ভাব-ব্যঞ্জনা দেয় তা ধূর্জ্জটিপ্রসাদ জানেন, যেমন সুধীন্দ্রনাথ তা জানেন। কিন্তু অর্কেস্ট্রার সাতটি অধ্যায়ে যেমন সুচারু বিন্যাস তাদের হয়েছে, শ্রান্তি, প্রদর্শন, করুণ, উদ্দীপন, ভয়ানক, শান্ত, বীর ভাব ও রসের চিত্র দেখিয়ে এবং তা অনুভব করে ফলত কবিচিত্তে যে 'হাহাকার' উঠ্‌ছে বিরহ-বোধে, সমালোচনায় তার উল্লেখ উচিত ছিল বলে আমরা মনে করি। অবশ্য আমরা জানিনে পশ্চিমী ব্যালে-তে ভারতীয় সুরসপ্তকের ভাব-সমূহ এখনও নিবেদিত হয় কি না। আমাদের মনে হয়, অর্কেস্ট্রা-কবিতা কবি-মনের দ্বারা রচিত একটি অপ্রাকৃত প্রেক্ষালয়ের ঐক্যতান।

তৃতীয়ত, ধূর্জ্জটিপ্রসাদ সুধীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়-প্রত্যয়ের উল্লেখে বলছেন : "poetry is the drama of two souls is one breast." কথাটি নিভুর্ল। যেম্নি কবিতা সম্পর্কে, তেম্নি সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে। সুধীন্দ্রনাথে 'Two souls'-এর যে-রূপ ধূর্জ্জটিপ্রসাদ দেখছেন—প্রাচীন ও নবীন দু'টো সত্তাকারে, তা-ও সত্য। কিন্তু সত্য নয় তাঁর এ প্রতিপাদ্য যে সুধীন্দ্রনাথ প্রাচীন সত্তা থেকে মুক্তি চাচ্ছেন। সুধীন্দ্রনাথের পূর্ব্বোক্ত ভাবের রসাস্বাদে অবশ্য ব্যতিক্রম হবে, কিন্তু সে-সঙ্গে আমরা এ-কথাও মনে রাখব যে তাঁর সৃষ্টির অনেক নিকটে না গেলে উপভোগ্য রস-চর্ব্বণ ব্যর্থ হয়ে যায়।

সুধীন্দ্রনাথের অর্কেস্ট্রার নৃত্যনাট্যরস হয়ত অতীত-ভারতের কোনো ভরতনাট্যসম্প্রদায়ে পাওয়া যেতো, এ-কথাই আমি ব্যক্তিগতভাবে ভাবতে পারি—কিম্বা কোনো কোসাম্বীর 'সাড়িকসামর্ডে'র আমোদী-সম্প্রদায় প্রেক্ষককে এ-ধরণের বিচিত্র-ভাবরসে আন্দোলিত করতেন মনে করতে পারি। যেহেতু আমি উত্তরাপথের অতীতের ও বিদেশী 'ব্যালে'র 'ছবি' ভিন্ন আর কিছু জানিনে, তার দরুন কোশল ও কোসাম্বীর নৃত্য-ছায়া ছাড়িয়ে আরো অনেক বিচিত্র ছবি অর্কেস্ট্রা-কবিতার শব্দের শ্রুতিচিত্র হিসেবে আমার কল্পনায় ভীড় করবে। আমি শেষটায় বিস্মিত হয়ে যাব। আর বল্‌ব, এ-হচ্ছে আশ্চর্য্য-রসের কবিতা যাতে সঙ্গীত-ধর্ম্ম প্রবহমান।

জীবনানন্দ দাশ যেভাবে বিস্মিত করেন, অবশ্য অর্কেস্ট্রা সে-ভাবে বিস্মিত করেনা। শ্রাবস্তী-বিদিশায় নির্ভর করে আমরা একটি ভারতীয় মনের সঙ্গে সমগ্র সভ্যতার ইতিহাসে ঘুরে আসতে পারি জীবনানন্দের কাব্য-পাঠে। সে-ইতিহাস অসমাপ্ত তা-ও জানতে পারি নারীর সান্নিধ্যের সামান্য সমাপ্তিবোধে। তবে জীবনানন্দ আমাদের রোধির অতীত-বর্ত্তমানকে নিয়ে যে যাদুবিদ্যা দেখিয়েছেন, যে আলো-ছায়ার নৃত্যনাট্য, তাতে একেক সময় ধাঁধাঁয় পড়ে যেতে হয়। এ-রহস্যকুয়াশা সুধীন্দ্রনাথে নেই। নেই এ-জন্যে যে বাক্যের অন্তর্গত অর্থের সংলগ্নতা-বোধে সুধীন্দ্রনাথ সচেতন। অর্কেস্ট্রার ৬ষ্ঠ-অধ্যায়ে 'উর্বশী'-কে 'অভয়'-মুদ্রা-সহ তিনি আবির্ভূত করছেন ঋক্‌বেদ-সম্মত করে; তাঁর সঙ্গে আধুনিক সুরবালিকার মিশ্রণ ঘটাতে কবি যে মিলন-সূত্র ধরে দেখিয়েছেন, যুক্তির বিচারে তাকে ছিন্ন করা

যাবেনা। কিন্তু জীবনানন্দ বৈদিক বিদিশা, শ্রাবস্তীর কারুকার্য্য, এবং দারুচিনি-দ্বীপের বৃত্তাংশে নাটোরে যে-বনলতা সেনকে উপস্থিত করেছেন বৈদিশিক নাটক 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র সাহায্য নিয়েও তাঁর প্রতিষ্ঠা যুক্তি-বিচার সমন্বিত মনে সহজে আসবে না। আসবে তাঁদের ধ্বনি-সিদ্ধ ব্যঙ্গ্য-কাব্যে যাঁদের চিত্ত-ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। 'রস' এখানে প্রেমাত্মক পাঠক-চিত্তে অধিবাসিত নানাবিধ ভাব থেকে সঞ্চিত। সে চিত্তের উপর কতকগুলো অতীত চিত্রের ছবি তুলে আনছেন কবি; যা সূত্র-সংলগ্ন না করলেও চলে। শুধু সন্ধানের ভাবটি, হারানোর ভয়টা এবং ক্ষণিক মোহের আলপনা এঁকে দিয়েই কবি ব্যঙ্গ্য-সৃষ্টিতে এ-ক্ষেত্রে সমর্থ। সুধীন্দ্রনাথ রস-সন্ধানী, জীবনানন্দ ধ্বনিসন্ধানী। দু'জনই অবশ্য ইতিহাস-চেতন।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার যদি কোন বিশেষত্ব থাকে, তাহলে তা ধ্বনি-চিত্র। 'Poetry made of words'। তবে 'ওয়ার্ড' কথাটি নিয়েই যতো গোলমাল। শব্দ-ধ্বনির ব্যবহার কেমন হবে, ছন্দে চলবে, না ছন্দ ভেঙে শ্লথ গতিতে বাচ্যার্থ নিয়ে চলবে তা-ই আসল প্রশ্ন। 'ভুজঙ্গ-প্রয়াত'-ছন্দে সব কাব্য পদ তৈরী হবে তেমন বাধ্যতা যেমন নেই, তেম্নি এধরনের অবাধ্যতাও চলেনা যে খুশীমাফিক ছন্দে ভর দিয়ে দৌড়ন চলবে। সর্প-গতির নানা অবস্থা ছন্দে আনতে হলে এক একটি সম্পূর্ণ পদে তা আনা দরকার। কোনো একটি শব্দ-বিশেষেও তা আনা যায় কৌলেরিজীয় আইন স্মরণ করে। কিন্তু মোটের উপর ভঙ্গীটিকে একটি বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে চেনা চাই। বাংলা কবিতার রবীন্দ্রোত্তর 'পদ' তিনটি ছন্দের জাতিতে বিভক্ত। শঙ্কর ছন্দের প্রতিও অনেকে আসক্ত হয়েছেন, গদ্য-ভঙ্গীতেও আসক্তি কম নয়। এই পঞ্চজাতিতে অনাসক্ত হয়ে ষষ্ঠের নূতনত্বে বাংলাছন্দকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস-ও যে নেই, তা বলবনা। 'Poetry made of words'—কথাটি বলতে গেলে ছন্দের কারুকৃতির আলোচনাও অনিবার্য্য। ধূর্জ্জটিপ্রসাদ সে আলোচনা থেকেও বিরত রয়েছেন। তবে আমরা তাঁর পক্ষ থেকে কি পেলাম? নাট্যের রূপ-বিচার নয়, শিল্পের রূপ বিচার নয়, ধ্বনি ও রসের মর্ম্মবিচার নয়। যুক্তিবিচার পেলাম কি? তা-ও বা কোথায়? 'Reason' তার নিজস্ব ভঙ্গীতে যে মোহভাব প্রদর্শন করে—যে যাদুবিদ্যা অবলোকন করে, তা-ও দেখতে বা দেখাতে তিনি নারাজ। অথচ বাংলা কবিতার হৃদিস্থিত শ্রী যাদুবিদ্যা। সুধীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব, অজিত দত্ত প্রভৃতি বাংলা কবিতার উল্লেখ্য অক্লান্ত যাত্রীবৃন্দ এই যাদুবিদ্যা থেকে নিজেদের সরিয়ে আন্‌তে রাজি কি না এখনও তা বলা যায়না। জীবনানন্দের ইন্দ্রজাল ত অবিস্মরণীয় হয়েই রইল।

জীবনানন্দ বলেছিলেন : "কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু একধরণের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস—শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়।" বুদ্ধির যদি একান্ত কোনো রস থেকে থাকে, তাহলে তা বৌদ্ধ শূন্যতা। যাঁরা কবিচিত্ত অতীতে বহন করেছেন এবং এখনও বহন করছেন তাঁরা শূন্যতায় প্রস্থান করেননি। আর কল্পনা ত বিশুদ্ধ হতেই পারেনা। কোনো-না-কোনো পার্থিব কীর্ত্তি আশ্রয় করে তা বিসর্পিত বা বর্দ্ধিত। আদিম মানুষের কল্পনা যদি আমরা সন্ধান করি, সেখানে সৃষ্টিতত্ত্ব কোন্ চেতনায় শায়িত তা যদি লক্ষ্য করি, তাহলে তাঁদের অভিজ্ঞতার ভগ্নপাত্র হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। সেখানে চিত্তের পাত্র দ্বিধা বিভক্ত। তখন 'দীঘনিকায়ে'র বুদ্ধের মতো অভিমতে সম্যক্-বিচার নিয়ে শিল্পী কুশল ও অকুশল বলবেন না। বলবেন, তমসা আর জ্যোতি জড়াজড়ি করে আদিম চিত্ত দ্বৈধীভাবসম্পন্ন করেছে। তা যখন সমন্বিত হবার অবকাশ পেয়েছে ক্ষণিকের জন্য—তখনই

চেতনার ধূসরতায় অদ্বৈত রঙের জন্ম। সেই ধূসরতাকে সূর্য্যকরোজ্জল ও শ্রীমণ্ডিত করা শিল্পীকর্ম্ম। শিল্পই শিল্পীর চরিত্র। সাংখ্যের সৃষ্টি।

সুধীন্দ্রনাথ মনে করেন : "ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর কাব্যগত অভিজ্ঞা এক নয়, প্রথম যেখানে সারা, সেখানেই দ্বিতীয়ের সুরু…"। সে সুরুর শেষ হয়ে যায় অবশ্য কবির রচনার শেষ দিনে। একটি রচনায় কবিকে যে খণ্ডিত ভাবে পাওয়া যায় তা তাঁর অভিজ্ঞার খানিকটা ছবি মাত্র। অভিজ্ঞতার বিবৃতি মোটেই নয়। অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে চেতনার ক্রিয়াকলাপে বা 'ক্যাথারসিসে' উৎক্রমণ ক্রিয়া সুরু হয়। সে-উৎক্রমণের চিত্রাবলী কবি-চিত্তের পদাবলী। 'পাত্রম্' যে পদরেখা দেখাতেন, সে-রেখা বা তাঁদের কণ্ঠের কম্বুরেখা-অনুযায়ী স্বরের ওঠানামা বহুদিন হল ভোক্তার বা পাঠকের বা শ্রোতার অন্তঃকরণের সম্পত্তি হয়ে গেছে—কবির হাতে আর তা নেই। তাই নূতনের সন্ধানী কবি, তিনি নূতনের শিল্পী, প্রাচীনতম হলেও নূতনতম তাঁর মন, যিনি প্রাচীন শিল্পীবৃন্দের শৈশবতার ভিত্তির উপর নটরাজ। সেই বৃহৎপটের চিত্তে শ্রী-র আকাঙ্ক্ষা বিসর্পিত। কবি চিরদিনের 'কসমড' উদয়ন। সারী গানে শ্রেণীবদ্ধ অতীত শিল্পধ্বনি তাঁর স্বপ্নে আনাগোনা করছে।* তিনি তা উপভোগ করছেন রত্যাদি নবরসে। তিনি তা ধ্বনিত করছেন বাগঙ্গে। তাঁর অভিজ্ঞা অযৌক্তিক পথেও শ্রীঅন্বিতা হবার জন্যে তৎপরা। তাই কবিমন সর্ব্বাধিক নির্জ্জন ও অভিজ্ঞ।

আজ যদি বাংলাদেশের কাব্যশ্রীকে নিয়ে অব্যাহত উৎক্রমণের পথে আমরা শোভাযাত্রা করতে ইচ্ছুক হই, তাহলে আমাদের জানতে হবে প্রাকৃত ধ্বনি কোন্ বিন্দুতে এসে রসের সিন্ধুতে আত্মলোপ করে। সে তৈল-বিন্দুর পাত্রাপাত্র-প্রশ্ন নিরবধি কালসিন্ধুর নর্ত্তকী প্রকৃতির খর্পরে।

* গ্রীক্-রোমান রক্তোদ্ভব 'সিরিকো' ১৯২৪-এ পারিস-চিত্র-আন্দোলনে 'সুর-রিয়্যালিজ্‌ম্' বা সৎ-বাস্তবতার জন্ম দান করেন। সে-সময়ে বাংলা-সাহিত্যেও সুর-রিয়্যালিজমের হাওয়া বইতে থাকে যা থেকে কল্লোল-যুগের জন্ম। 'ত্রয়ে'র হাওয়া থেকে গ্রীক 'ত্রাজেদি'র জন্ম অজ বা ছাগ-নৃত্য নিয়ে। 'ছাগল'-নামক শিল্পী সুর-রিয়্যালিষ্ট 'সিরিকো'-র অগ্রজ এবং 'সার্কাস'-ভঙ্গীতে সমাজকে চিত্রিত করেছেন। সার্কাস-এর জন্ম 'মিনিঅন' (ক্রীট্) সভ্যতায়। মার্শ্যাল বলেন এ-সভ্যতার দোসর মোহেঞ্জোদারোতে ছিল। অর্থাৎ স্পার্টান, দোরিয়ান, আইঅনিয়ানদ্বারা পরিবেষ্টিত ভারতীয় সঙ্গীত-মূর্চ্ছনায় বা পঞ্জাবের শাকল্য-ঋক্‌বেদীযুগের, বা বাইজেন্টিনাম নাগরিকতার অন্তিম-দশা তখন। তাঁদের শেষ-বীর 'পুরু'; ঐল-বৃজি এ-জাতি (পর্ব্বতক) সম্পর্কে অ্যারিষ্টটল 'ইলিরিয়ন'-নাম ব্যবহার করেছেন। ত্রয়ের অপর নাম ছিল 'ইলিয়ন'। কল্লোলযুগ ইতিহাস-চেতনায় এ-ধরণের একটি মহাভারতীয় কল্পলোক তৈরী করেছে।

জীবনানন্দ স্মরণে

প্রথম কবি

[জীবনানন্দ দাশ-কে]

অমল দত্ত

এই সব ভাঁড়েদের দেশ-কাল মধু নিয়ে রসিকতা করে
মদের তৃষ্ণায় কৃষ্ণা রাতে তালগাছে সরু গলা পেতে থাকে
যত লোক—মনের জারক রস তাড়ি হয়ে ওঠে।
সেই ভালো মধু ভাণ্ড থাকনা জঙ্গলে, ফুলে, মৌমাছির ঘরে
বন্য ভালুকীর শুধু গন্ধ লাগে নাকে
দূর থেকে কবিচিত্তে নীলপদ্ম ফোটে।

জানি এ কবির চিত্ত পাথরকুটেও আজ পাবেনা, না, দানা
ফসলের স্বপ্ন নিয়ে একটু সীমানা
হয়তো হারিয়ে গিয়ে এশফাল্ট-বনে মরা চাঁদ সূর্য্য দেখে
ভাঁড়েদের মত্ত ব্যবহারে
অতিকায় যন্ত্র যন্ত্রণায় দূর শতাব্দীর ডাইনোসরের ভাবনায়
কোথাও কফিন পেতে আপনারে দেবে শুধু ঢেকে
ক্বচিৎ আলোর পথে দুই অন্ধকারে
শেষ করে জীবন-মৃত্যুর অন্তরায়।

তবু যেন দূরান্তের বেতারের স্রোতে শ্রুত বজ্রগর্ভ নাদ
নতুন সূর্যের পরসাদ
সে কফিন নিরন্তর সঙ্গীতের ঢেউ
চিনিবারে পায় যারা—যদি চিনে কেউ—
এই সব ভাঁড়েদের দেশে—যারা স্ফূর্তি নিয়ে রসিকতা করে
মনের মধুর রস যদি দেশকালপাত্রে ঝরে!

দীপালী, ১৩৬১

[জীবনানন্দ দাশ স্মরণে]

বিনায়ক ভট্টাচার্য্য

দীপালীর শেষ দীপ—আলোকের আয়ু—
কখন যে নিভে গেল, হেমন্ত-উদ্বায়ু
সে-খবর করেছে বিলোপ।
হঠাৎ তাকিয়ে দেখি নীলচে জোনাকী-হাসি
কেরোসিনে হাসে যত ঝোপ,
তারপর অন্ধকার...স্তূপ অন্ধকার...অন্ধকার...
জমাট হিমেল স্পর্শে তার
বন্ধ চোখ ধ্যান করে কোথা যেন আলো;
নিবাত নিষ্কম্প শিখা উষ্ণতায় হয়তো জ্বালালো
অপেক্ষিত নীড়ে প্রাণ নীরব উৎসবে,
সেই অনুভবে
চোখে অন্ধকার যেন বলয়িত আলোর পাথার॥

জীবনানন্দ-কে

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

তুমি ঘুমে কেঁদে ওঠো বলে আমি অপরাধে জাগি
কোনো অন্ধকার ভ্রূণে নারীর অথবা পৃথিবীর।
সেখানে হয়ত অনুরাগী
সব আলো অপরার্দ্ধে, কালোর শিবির
ক্রিমি-নীল জেনেও যেখানে।
আলোর দোকানে আলো পায়না দেখার কোনো মানে
মৃত্যুর বিমর্ষ অমাবস্যা-অপরাধ ছেড়ে এলে।
যা-যা দেখে কেঁদে ওঠো সব শিশু-চোখে অন্ধকার
অপরাধ-চিহ্নময় খানিক অঙ্গার,
জীবন্ত নিভানো মায়ালিপি-ঝলমল লেখা জ্বেলে;
সান্ত্বনার ভঙ্গী চীনাংশুক
পুরাতন রৌদ্রে মেলা বেনিশানা মনের অসুখ॥

জীবন অনুভবের যন্ত্রণা

[জীবনানন্দ দাশের প্রয়াণে]

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

॥ এক ॥

তোমাকে দেখতে যাবোনা হাসপাতালে
সেখানে আকাশ বড় বেশী নির্জন
সেখানে বাতাস ভয়ানক অসহায়
দেয়ালে দেয়ালে ছড়ায় অন্ধকার
ব্যাণ্ডেজ বাঁধা তোমার মুখের মতো।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা তোমার মুখের কাছে
কি কথা আবার কেনই বা মুখ নামানো
ধিকিধিকি বুকে চিতার দহন জাগানো?
তোমাকে দেখতে যাবো না কিছুতে যাবো না
যদিও তোমার হৃদয় করেছে যাত্রা!

মৃত্যুর সাথে বিবাহের তবে লগ্ন
এসে গেছে, আমি সাজাবো না বরমাল্যে
তোমার হৃদয় তোমাকে দেবোনা বিদায়
কথা বলবো না, হৃদয়ের চপলতা :
'শুভদৃষ্টির পরে বলবে তো কেমন তোমার কনে?'

কে তোমার কনে কেমন তাহার চেহারা
আমার কি কাজ এসব প্রশ্ন শুধিয়ে?
তোমাকে দেখতে যাবোনা আমি তো যাবো না,
নির্জনতায় তোমাকে পাওয়ার সাধ
মিটেছে আমার অন্ধকারের সান্নিধ্যের আর্তি।

তোমাকে দেখতে তোমার পেছনে যাবো না॥

॥ দুই ॥

তোমাকে দেখতে গেলাম হাসপাতালে
না গিয়ে কি পারা যায়?

বিবাহ বাসরে সতীনের মুখ অপরূপ সিন্দুরে
ঈর্ষা জাগায়, না-যাওয়া অসম্ভব।
নিঃশ্বাসে কেড়ে নেওয়া দেয়ালের হো-হো হাসি কানে আসে,
ব্যাণ্ডেজ বাঁধা তোমার ললাটে কনের সিঁথির চুমা।

সতীন আমার মৃত্যু আমার সতীন
কাছে আসে মৃদু হেসে হাত ধরে তুহীন শীতল স্পর্শে
বলেঃ 'ভাল আছো? ভাল আছো? ভাল আছো?'
লজ্জায় মরি বোবা কান্নায় কেঁপে উঠি থরোথরো
কেন যে এলাম সিঁদুরের দাগ আছে সারা গায়ে দেখ্‌তে!

হঠাৎ বাতাস ফুঁপিয়ে উঠ্‌লো, এ আরেক বোকা মেয়ে
বিয়ের রাত্রে উৎসব নেই এক কোনে বসে কাঁদে
তোমার প্রথম পক্ষের মেয়ে বুঝি?
নির্বোধ চোখে আকাশ তাকায় কোন ভাষা নেই, তবে
এই কি তোমার অবাক রুক্ষ ছেলে?
কাছে গিয়ে ছেলে-মেয়ের ললাটে সাগ্রহে খাই চুমা॥

॥ তিন ॥

রাত হ'লো ভোর বিয়ের বাসর ভাঙ্‌লো! শ্মশানে
একা নিলো কনে বরকে বক্ষে, নেইকো লজ্জা পাত্‌লো
শয্যা। অন্তরীক্ষে ধূ ধূ লেলিহান অগ্নিসাক্ষ্য
মিলালো, মেলালো তাদের। সোহাগে মরণ কন্যা
দেহ বন্যায় উচ্ছল হ'লো দ্বিপ্রহরেও। চোরের মতন
দেখলাম সেই অরূপরতন অদৃশ্য হ'লো কন্যার
দেহে।

লজ্জায় আমি কাঁপলাম আমি মুছলাম তার
অঙ্গুরী থেকে আমাদের নাম তার দেওয়া নাম
রক্তের দাগে। আকাশ পুড়্‌ছে তখন দাহনে
বুঝি তারো মনে জেগেছে প্রলয়, কোনো লোকালয়
সারাবেনা মন। বাতাস স্তব্ধ। কী জানি কেমন

তাদের হৃদয়, এখন এখানে যারা লুকিয়েও
এসেছিলো সব চোরের মতন সন্তর্পনে ?

বাড়ি ফিরলাম। দরজায় তালা। দুয়ারে দাঁড়িয়ে
রইলাম, কেউ আসবে হয়তো এখন অবেলা
ভুলে গিয়ে ; কেউ এলো না ; এঘর যার
ছিলো সে-তো আর এক জনের সঙ্গে এখন
খেলায় মেতেছে, সেজেছে অরূপ মৃত্যুর
বর !

মিছেই আমার হৃদয়ের ঝড় !!

জীবনানন্দ দাশকে

ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়

সে চোখ তোমারো আছে, শুধু চেয়ে থাকা।
কোনোদিন জীবনের যে রোদ অলস কোরে দেয়—
তার কথা তার ছবি তার চেয়ে কিছু বেশী নিয়ে
এমন দাঁড়িয়ে থাকা কি যে কল্পনা !
সে কথাই গানে গানে যে গানের সুর আজো নেই,
নেই তবু এ মনের মন দিয়ে যারে যায় শোনা ॥

কিছু যেন না বোঝার ; বাকি কিছু বাঁকহীন
পথের মতন। বহুদূর দেখা যায়,
তবু যার আরো দূর নামহীন দেশের মতন ॥

তুই হাতে নিই যদি সাগরের নীল রঙজল,
তু'হাত-ই রইবে সাদা যদি মুছে ফেলি—
তবু যেন কিছু তার মনে রাখবার,
হাতে যেন লেগে আছে সে রঙের নীল !

মুখর তন্ত্রী আছে হৃদয়ে তোমার
তারাদের মত অন্য মনের মিছিল ॥

গড় শ্রীখণ্ড

অমিয়ভূষণ মজুমদার

[পূর্ব্বানুস্থতি]

মাধাই অবশেষে এই নোতুন মালবাবুটিকে আশ্রয় করেছে। মালবাবুর নাম গোবিন্দ, তার বয়স মাধাইএর চাইতেও কম। পৈতৃক সুবাদে রেলকোম্পানিতে চাকরি। পিতা রেলকোম্পানিতে বড় রকমের একটা হেড ক্লার্ক ছিলেন। কলেজ ছাড়ার পর গোবিন্দ বলেছিল, সে কলেজের অধ্যাপক হবে। পিতা বললেন,—অহো কি দুর্মতি। তিনি চাকরি থেকে বিদায় নেবার পর নবদ্বীপ এবং পরে বৃন্দাবনে দীক্ষা নিয়েছেন। চেহারাই নয়, ভাষা পর্য্যন্ত বদলে গেছে তাঁর। আমিষ ত্যাগ ক'রেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাতদের বিরুদ্ধে প্রচার করছেন। ঘৃত মানেই আমিষ এই প্রমাণ ক'রে অধুনা উদ্ভিজ্জ ঘৃতের কারখানা খুলেছেন। তিনি চাকরি ক'রে দিলেন ছেলের, এই ষ্টেশনটি মনঃপুত হওয়ায় এখানেই বসিয়ে দেয়ার ব্যবস্থাও করলেন।

কিন্তু গোবিন্দ মালবাবু হ'য়ে মালবাবুর পক্ষে অনুচিত কাজকর্ম করতে সুরু করল। এখন হ'য়েছে কি : রেলকোম্পানির একখানি আইনের পুঁথি আছে মাল চলাচল সম্বন্ধে। গোবিন্দ যখন সেটার খোঁজ খবর নিয়ে এক সপ্তাহের চেষ্টায় আবিষ্কার করল তখনও কেউ জানত না একটি পুঁথির এমন বিরাট শক্তি থাকতে পারে। মাটিতে পাতা তু'খানা লোহার উপর দিয়ে প্রকাণ্ড প্রচণ্ড স্পেশ্যালগুলি যেমন গড়িয়ে যায়, তেমনি চলল গোবিন্দর অফিস পুঁথির লাইনে লাইনে।

সরষে তেলের ম্যানেজার এসেছিল,—আজ চাই গাড়ী।

—চাইলেই কি পাওয়া যায় ?

ম্যানেজার হেসে বলল,—আপনি আমাকে চেনেননা, আমার নাম রামরিঝ তু'কানিয়া। আমি—

বাধা দিয়ে গোবিন্দ বলল,—তু'টি কানই আপনার এখনও আছে, শুনতে পাচ্ছেন না, এই আশ্চর্য্য। গাড়ী পাবেন না। যে কখানা আছে আজ আম চালান যাবে।

—আম ! ছোটলোকেরা যা চালান দেয় ?

—আজ্ঞে হাঁ, খেতে যা সংষের তেলের চাইতে ভালো।

এদিক-ওদিকের লোকগুলি হেসে উঠল। তু'কানিয়া বাংলা বলতে পারে বটে, বাংলার মারপ্যাচ বোঝে না। সে অপমানিত বোধ ক'রে ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরে ডাক পড়ল গোবিন্দর।

—গোবিন্দ বাবু, তু'কানিয়া আমাদের বন্ধু লোক।

গোবিন্দ হো হো করে হেসে উঠল।

ষ্টেশন মাষ্টার তার ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হ'ল, কিন্তু গোবিন্দর পিতার প্রতাপ সম্বন্ধে তার একটা ধারনা ছিল।

গোবিন্দ বলল,—ঢুকানিয়া আমার বন্ধু নয়। নাম শুনেই বুঝতে পারছেন, ওর বংশগৌরবের চূড়ান্ততা হ'চ্ছে একখানা দোকান। আপনি বুঝবেন না, কারণ আপনি নিজেই কোলম্যান। এরা সাহেব বললেও আমি জানি আপনার পিতাঠাকুর কয়লা কাটতেন কিম্বা ফিরি করতেন। সাহেব গর্জে উঠলেন,—কি বলতে চাও, ছোকরা। তুমি আমাকে ফিরি-ওয়ালার ছেলে বলেছ। তোমাকে আমি নরক দেব।

—সাহেব আমার পিতাঠাকুর মৃত নন। এষ্টাব্লিশমেণ্ট, ষ্টাফ ও অ্যাপিল তিনটি হেডক্লার্কই আমার পিতাঠাকুরের আইনতুত ভাই। তুমি যে বংশগৌরবে কিছু-নার চাইতেও কম তার প্রমান এপর্য্যন্ত ইলিয়ট সাহেব তোমার ছোঁয়া চা স্পর্শ করেনি।

এটা কোলম্যান সাহেবের কোমল প্রাণের একটি দুর্বলতা। গোবিন্দ তার পায়ের কড়ার উপরে দাঁড়িয়েছে এমন মুখভঙ্গি ক'রে কোলম্যান আশ্রাব্য শপথ গ্রহণ ক'রে বলল—তোমার ইলিয়ট নরকে যাক।

—তা যাবে, গোবিন্দ উঠে দাঁড়াল, আপনি তার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করলেন তাও তাকে জানিয়ে দেব।

ঢুকানিয়া অবাক হ'লেও তার বুদ্ধি লোপ পায়নি, সে বলল,—বাবু সাহেব আমরা কিছু ব্যবসা ক'রে থাকি।

গোবিন্দ আবার হাসল,—যা শিখিয়েছ সেটা শিখতে বাঙালি দেরী করবে না। তুমি শুনলে অবাক হবে ইতিমধ্যে আমার পিতাঠাকুর সিনথেটিক ঘিএর কারবার খুলে দিয়েছেন, আট দশ লাখ রূপেয়া খাটছে। আর সেই ঘিও যাচ্ছে স্রেফ জয়পুর আর বিকানীরে চালান। তুমি আমাকে কি দেবে? আমার নিজের যা আছে তার ইন্‌কামট্যাক্সই ওঠে না আমার মাইনেয়।

ঢুকানিয়া এবার হতবাক।

কিন্তু আমের ব্যবসায়ীরা করল মুস্কিল। তারা এসে বলল, বাবু সাহেব, কাল থেকে আমাদের গাড়ী লাগবে না।

—কেন, আমার বাপের ঠাকুররা?

—ঢুকানিয়া আমাদের সব আম কিনে নিচ্ছে।

—উত্তম কথা।

সন্ধ্যারপর পর কোলম্যান সাহেব ষ্টেশন-পরিক্রমার অজুহাতে এসে বললেন,—দেখো' দেবনাথ, তুমি বড় ছেলেমানুষ।

—আদৌ নয়। লেখাপড়া তোমার চাইতে কম জানিনা, আইনগত ভাবেও আমি সাবালক। তুমি কি টেনিসন ব্রাউনিংএর নামও শুনেছ? তুমি বোধ হয় জানই না, ইংরেজি সাহিত্য শুধু সেক্সপীয়র ব্লেক নয়। সাহেব, তোমাকে আর কি বলব, তোমাকে শুধু ইংরেজ পণ্ডিতদের নামের সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে পারি। তুমি কি ইটন কিম্বা হ্যারো কাকে বলে জান? আমরি, অমন মুখ হ'ল কেন? এখন আর তোমার পক্ষে ইটনে যাওয়া সম্ভব নয়, বাড়ীতেই একটু ইংরেজি গ্রামারটা উল্টেপাল্টে দেখো, ইলিয়ট সাহেবের সাথে কথা বলতে সুবিধা হবে।

বলা বাহুল্য এই কথাগুলি বলছিল গোবিন্দ কাব্যময় ইংরাজীতে এখানে ওখানে স্মিতহাসি বসিয়ে।

কোলম্যান সরে পড়ল, গোবিন্দ তার পিঠের উপর একরাশ উচ্চ হাসি ছুঁড়ে দিল। মাধাই সেই ঘরের এক দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে ইংরেজি না বুঝলেও কোলম্যানের মুখ ও গোবিন্দর হাসি দেখে বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা কোলম্যানের পক্ষে খুব সুবিধা হচ্ছে না। পরে আর এক মালবাবুর মুখে শুনে তার শ্রদ্ধা হ'ল গোবিন্দর উপরে।

কয়েকদিন পরে গোবিন্দ নিজে থেকেই প্রশ্ন করল: হ্যাঁরে, মাধাই, তুই অমন মুখ ক'রে থাকিস কেন রে? তোর কি কোন অসুখ আছে?

—না। মাধাই ইতিউতি সরে পড়ার চেষ্টা করল।

—তা হ'লে তোর মনে কষ্ট আছে, আমি তোকে কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি।

মাধাই দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাতে লাগল। যে কথা শুনে জয়হরিরাও হাসি তামাসা করে, এমন শিক্ষিত লোকের সামনে কি ক'রে সে কথা বলা যাবে।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার পর গোবিন্দ যখন তার বাসায় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, মাধাই ভয়ে ভয়ে কথাটা উত্থাপন করল।

—আচ্ছা বাবু, ষ্টেশনের সব লোকে খাকি পরে এক আপনি ছাড়া।

—হ্যাঁ, তা পরে। খাকি আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি।

—কেন, বাবু?

গোবিন্দ হাসতে হাসতে বলল,—যে রঙের কদর ময়লা ধরা যায় না ব'লে সে রঙ ভদ্রলোকের পরা উচিত নয়।

—না, বাবু। ঝকঝকে কাচা খাকিইতো সাহেববাবুরা পরে।

গোবিন্দ একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বলল,—যুদ্ধটাকে আমি মানুষের কাজ ব'লে মনে করি না।

—যুদ্ধ যদি খারাপই হবে, তবে বাবু, ষ্টেশনের সবলোক এমন মন-মরা কেন, তাদের সকলের মুখ ফ্যাকাসে দেখায় কেন, যুদ্ধের জেল্লা কমায়।

মাধাই কথাটা বলে ফেলেই মনে মনে জিভ কাটল। এতক্ষণে তার বিদ্যাবুদ্ধির হাঁড়ি ভেঙে গেল। কিন্তু অবাক করল গোবিন্দবাবু, উৎসাহে তার চোখ দুটি ঝক্‌ঝক্ ক'রে উঠল।

—তুই লক্ষ্য করেছিস, মাধাই, এত অনুভব করেছিস?

মাধাই মাটির দিকে চোখ রেখে রেখে কথা কুড়িয়ে কুড়িয়ে বলল,—সব যেন জল জল লাগে, ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এ যেন কেমন, এ যেন বাঁচা না। যুদ্ধ থামে সব যেন আড়ায়ে গেল।

গোবিন্দ বলল,—তোর দেখায় খুব ভুল নেই; এখন বাসায় যাচ্ছি, পরে তোর সাথে কথা বলব।

একদিন গোবিন্দ মাধাইকে ডেকে ষ্টেশনের বাইরের আর একটি বাবুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। সে লোকটি স্থানীয় স্কুলের মাষ্টার।

গোবিন্দ বলল,—মাষ্টারমশাই, আমার কথায় তুমি বিশ্বাস করতে পারনি, কিন্তু মাধাইকে জিজ্ঞাসা

কর, সেও দেখতে পাচ্ছে, নেশা ছুটে যাওয়া মাতালের মতো হ'য়েছে ষ্টেশনের লোকগুলির অবস্থা, সমস্ত দেশটাতেই এখন অনেক দেখতে পাবে।

মাষ্টারমশাই বলল,—মাধাই কোনটা চাচ্ছে,—নেশা-ছাড়া অবস্থাটা, না, আবার নেশা ক'রে বুঁদ হ'তে?

—কোনটা চাচ্ছে তা নিজেই একসময়ে ঠিক করবে, আপাতত যুদ্ধটাকেই ওর ভালো লাগছে নেশার জন্য। ও বুঝতে পারছে ঘোরটা কাটার মতো হ'য়েছে, নীচে দেখাচ্ছে সবার মুখ। সময়টা অশ্বস্তিকর।

সে নিজেই এত সব কথা বলতে পেরেছে নাকি কোন সময়ে, এই ভেবে বিস্মিত হ'ল মাধাই। কথাগুলি তার মনের কথা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু মাধাই একটা কাজ পেল। যুদ্ধের নেশা ছুটছে, আর এক নেশা ধরিয়ে দিল গোবিন্দ এবং মাষ্টারমশাই। যেন সে নিজের অনুভূতির কথা প্রকাশ করে, এই নোতুনতর নেশার জন্য দরবার ক'রেছিল। গোবিন্দ ও মাষ্টারমশাই হয়তো তার অনুভূতি থেকেই তাকে এই কাজের পক্ষে উপযুক্ত মনে করেছিল, আর মাধাই নিজের ঐকান্তিক আগ্রহ দিয়ে এটাকে নেশায় পরিণত করল।

মাধাই প্রথমে নিজের সমশ্রেণীর মধ্যে কথাটা ব'লে বেড়াতে লাগল, শেষে সাহস পেয়ে বাবুদের মধ্যে। সময় পাখা মেলে উড়ে যায়। এমন নেশা লাগল মাধাইএর, রান্না ক'রে খাওয়ার সময়টুকুকেও অপব্যয় ব'লে মনে হ'য়, কোন কোন দিন সে হোটেলেই খেয়ে নেয়। প্রথম প্রথম সে মাষ্টারমশাই আর গোবিন্দর কাছে কথা বলা শিখেছিল, এক সময়ে তারও আর দরকার হয় নি।

মাধাই বলে,—টাকার নেশায় তোমাদের পাগল ক'রে দিছিল, এবার টাকা গুটায়ে নিবে, নেশাও টুটবি।

—জিনিসপত্তরতো আগুন, টাকা না থাকলি তো খাওয়া পরা বন্ধ।

—তোমরা ঠিক পাওনি, কিন্তু এদেশের বারো আনা লোক এক বছর সে সব বন্ধ ক'রে আছে। কোন্‌কার কোন দুই রাজা করল যুদ্ধ আর আমরা হলাম বোকা।

জয়হরি যদি বলে,—তুই কি বলিস, যদি তাড়ায়ে দেয়?

—দিবি? তা দিউক। রাতারাতি লোক আসে কাজ চালাবোর পারবি? তা পারুক। সারা ভারতের সকলেই যদি কয়, থাকল কাজ কাম। তাইলে?

—তাইলে হয়, কিন্তু সকলেই কি শুনবি? মনিরুদ্দিন পোর্টার হাসতে হাসতে যোগ দেয়।

মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলি দুলিয়ে মাধাই বলে,—প্রথমে এই ষ্টেশনে কয়জন রাজি হইছিল? এখন কয়জন হইছে?

—তা হইছে।

কিছুদিন যেতে না যেতে ষ্টেশনের কর্মচারীরা মিলে রীতিমত সংঘ স্থাপন করল। সদর থেকে কয়েকজন বক্তা এল, সংঘমন্ত্রী, সভাপতি ইত্যাদি নির্বাচন হ'ল। গোবিন্দ বা মাষ্টারমশাইএর নামও কেউ করল না। শেষ সারিতে সকলের পেছনে যেখানে তারা তিনজন দাঁড়িয়েছিল মাধাই সেখান থেকে অগ্রসর হ'তে যাচ্ছিল, গোবিন্দ ইশারা ক'রে তাকে নিষেধ করল।

সেই মালবাবু চলে গেছে। বদলী নয়, চাকরি ছেড়ে দিয়ে। মাধাই আরও জানতে পেরেছে যাবার আগে কিছু নগদ টাকা তাদের সংঘকে দিয়ে গেছে গোবিন্দ, আর বলে গেছে মাষ্টারমশায়কে, যদি সংঘের কাজ করতে গিয়ে মাধাই কখনো চাকরি খোয়ায়, সে যেন তার কাছে চলে যায়। ঠিকানা রেখে গেছে।

বস্তত গোবিন্দকে মাধাই চিনতে পারে নি। ষ্টেশনের আর কেউ পেরেছে কিনা সে খবর মাধাই রাখে না। কিন্তু লোকটির ব্যক্তিত্ব যতই দুরধিগম্য হ'ক, মিথ্যা নয়। একটি রাত্রির কথা মাধাইএর মনে পড়ে গোবিন্দর বাসায় নিমন্ত্রণ ছিল মাধাই ও মাষ্টার মশাইএর। এ সম্বন্ধে প্রথমেই মাধাইএর যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে;—আচ্ছা, বলো, কি দরকার ছিল এমন ক'রে মাধাইএর সাথে একত্র ব'সে খাওয়ার তার সাথে বন্ধুর মতো ব্যবহার করার? সেই আহারের আসরে সংঘের কথাও উঠেছিল।

গোবিন্দর একটা কথায় মাষ্টারমশাই হেসে বলল,—গোবিন্দ, তুমি কোলম্যানকে কি বলবে তারই কি মহলা দিচ্ছ? দ্বিধাহীন প্রচেষ্টা ছাড়া এমন হয় না।

—তোমাকে তো বলেছি সংঘগঠন করা কত সহজ দেখলাম। সব মানুষের প্রাণের ভেতরে সুখী হওয়ার ইচ্ছা আছে, তার সব চেষ্টায় থাকে নিজের সুখ আহরণের উদ্দেশ্য; এর আর একটি রূপ অন্যকে সুখী হ'তে দেখলে অসূয়া, ক্রোধ ইত্যাদি। উপর স্তরের বলো বা বিদগ্ধস্তরের বলো তারা সুখের প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রকাশ্যে ঘৃণা করেনা।

শ্রমিকরা বিদগ্ধ নয়, তাদের অসূয়া ও ক্রোধকে অতিসহজে খুঁচিয়ে তোলা যায়।

—আচ্ছা, গোবিন্দ, তোমাকে কি এতদিনের পরে আমাকে নোতুন ক'রে চিনতে হবে? অসৎ ব'লে তুমি মাধাইর মন কেন ভেঙে দিচ্ছ।

—মাধাই শ্রমিকের জাত নয়। তুমি কি লক্ষ্য করেছ, অন্য কোন শ্রমিক তার জীবনটাকে শূন্য বোধ করছে, সেই কথা ব'লে বেড়াচ্ছে।

—তুমি কি বলতে চাও, বলো তো? মাষ্টারমশাই একটা জলন্ত প্রশ্ন গোবিন্দর মুখের সামনে বসিয়ে দিল।

—দেখো, মাষ্টারমশাই, তোমার বহু-অভ্যাসে অর্জিত তর্কশক্তি আমার নেই। কথাটা ঠিক গুছিয়ে বলা আমার পক্ষে সম্ভবও নয়। একটা ঘটনা শোন। একদিন এক টেলিফোন অফিসে রাত কাটিয়েছিলাম আমি; পিতাঠাকুরের প্রযত্নে চাকরি হ'য়েছিল। আমি সারারাত চিন্তাকুল হ'য়ে থাকলাম—ঘুমের মতো বিষয়কে বিদায় দিতে হ'ল কার অভিশাপে। নানা যুক্তিতর্ক এল মনে, অবশেষে স্থির করলাম, ব্যবসাদারের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নেই, সারারাত পাট, তোষাপাট, বেল্ ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। পরদিন চাকরি ছাড়লাম, রাত জেগে থাকাটা অপমানের ব'লে বোধ হ'ল। তুমি কি বলতে চাও টাকা, আরও বেশী টাকা পেলেই রাতজেগে থাকার কষ্ট যায়? তোমার কথা মতো তখনও বাইরে থেকে দলগড়ার চেষ্টা করেছিলাম। পরে দেখলাম এরা কেউ রাতজাগা বন্ধ করার পক্ষে নয়। গুহায় যখন মিসেস পিল্টডাউনকে নিয়ে ঘুমুতাম, তখনও খড়্গদাঁত বাঘের উৎপাতে ঘুম হ'ত না, এখন দেখছি তেমনি আছে।

—এই তোমার স্বরূপ? তোমাকে আমি চিনি গোবিন্দ।

—এটা তোমার গর্ব, আমি নিজেকেই চিনি না। কখন ইউলিসিজ, কখন রামচন্দ্র কখন অশোকের কোন সেনাপতি হ'য়ে দাঁড়াচ্ছি এ আমি নিজেই বুঝতে পারি না। আমার মন তোমার কোন ইকুয়েশনে ধরা পড়ে না।

আহার হ'য়ে গিয়েছিল। গোবিন্দ তোয়ালেতে হাত মুছে এক গোছা চাবি নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার ভৃত্যটি বোধ হয় তার উঠে দাঁড়ানোর প্রতীক্ষাতে ছিল, আহার্য্যের পাত্রগুলি তুলে নিয়ে গেল, তারপর টেবিলে নোতুন কাপড় বিছিয়ে কতগুলি ঝকঝকে গ্লাস রেখে গেল। এরকম ছোট-ছোট অদ্ভুত চেহারার গ্লাস দিয়ে কি হয় মাধাইএর জানা ছিল না।

গোবিন্দ একটি মদের বোতল নিয়ে ফিরে এল। সেই ঠাণ্ডা মধুর মদ মাষ্টারমশাই ও গোবিন্দ অবিমিশ্র চালাতে লাগল।

মাষ্টারমশাই বলল,—অতঃপর তুমি কি করছ, গোবিন্দ?

—চাকরি ছেড়ে বিদায় নিচ্ছি।

—যদি শুনতে পাই মানস-সরোবরের পথে হাঁটতে সুরু করেছ, তা হ'লে বোধ হয় আমার আশ্চর্য্য হওয়া উচিত হবে না।

—তা হয় না, গোবিন্দ হাসল, আপাতত একটা সখ চেপেছে মাথায়। ছোট একটা ষ্টীমার চাই; পিতাজী রাজী হ'য়েছেন। বলেছি ডাঙার কোল ঘেঁসে ঘেঁসে হংকংটা ঘুরে আসি। অবশ্য তাঁকে তাঁর উদ্ভিজ্জ ঘিয়ের ব্যবসায়ের কথা বলেছি, খুব প্রচার ক'রে আসব, যুদ্ধের পর শান্তির অভিযান।

—সঙ্গে কেউ যাচ্ছেন?

—শুনতেই চাও? সুধন্যাকে মনে আছে? গোবিন্দ নির্লজ্জের মতো হাসল।

—তার কি এখনও পঞ্চাশ পার হয় নি?

—ওটা তোমার বাড়িয়ে বলা। ত্রিশ পেরিয়েছে বটে। গোবিন্দ উদ্দীপ্ত হ'ল,—তোমার মনে আছে মাষ্টারমশাই আমার কিশোর দৃষ্টির সম্মুখে সুধন্যার যৌবনধন্য রূপের পদচারণ? হাঁ ক'রে চেয়ে থাকার জন্য কতইনা তিরস্কৃত হ'য়েছি। সেই অগ্নিময়ী এখন আর সে নয়—আর সে জন্যই মনটা কেমন করে তার জন্যে। আচ্ছা, মাষ্টারমশাই, রমণীর অনন্য রূপ আর অসাধারণ কণ্ঠ কি একটি মাত্র পরিবারের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাক। উচিত, না তার জন্যে ট্রয়ের যুদ্ধ হওয়াই বাঞ্ছনীয়? আমার তো মনে হয় মহাকবিরা কিছুতেই সহ্য করতে পারেন নি হেলেনের মতো মানসকন্যে একটিমাত্র রাজার রাণী হ'য়ে ধীরে ধীরে জরা ও মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হবে।

—নারী জাতিকে অবশ্য তুমি সম্পত্তি ব'লে চিন্তা করছ, গোবিন্দ; তাদের মধ্যে কোহিনুর যারা তাদের জন্যে নাদিরের লোভকেই তুমি তাদের মূল্যের স্বীকৃতি ব'লে প্রমান করতে চাচ্ছ?

—না, ঠিক তা নয়। ঐ রূপ এবং ঐ রুচির মূল্য কি ক'রে দেয়া যায় তাই ভাবছি।

মাষ্টারমশাই কথা বলল না. তার মুখখানা থমথম্ করছে।

—উত্তর দিলে না? গোবিন্দ বলল।

—তা হ'লে সুধন্যা যাচ্ছেন? বিয়ে করবে তো?

—আদৌ না, গোবিন্দ হেসে উঠল। আমি শুধু জানতে চাই তিনি কেমন অনুভব করবেন

জীবনটিকে। দশ বছরের অধ্যাপিকার জীবনে কি কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তাই শুধু বুঝবার চেষ্টা করব: ঘটনা নয়, রটনা নয়, শুধু মাত্র তাঁর মন কোথায় কোন পরিস্থিতিতে কি ভাবে প্রতিঘাত করেছে। দীর্ঘদিন এবং দীর্ঘসন্ধ্যাগুলি পাশাপাশি ডেক চেয়ারে বসে এমন কিছু নাটক নভেল পড়া যায় না নিঃশব্দে। তখন কথা হবে। তোমাকে অবাক করার জন্য বলছি না, সুধন্যাকেও এসব বলেছি।

ওভারব্রিজের সিড়ির মুখে দেখা হ'ল মাষ্টার মশাইএর সঙ্গে, মাধাই বাজার করা ভুলে কথা বলতে বলতে তার বাড়ী পর্য্যন্ত এসেছে।

—ওতো তোমার মতো খেটে খাওয়ার লোক নয়. ওর কথা আলাদা। ধরো পদ্মা'য় ঝড় উঠেছে, নৌকো টল্‌ছে, তখন অন্য সকলে মাটির দিকে ছুটবে; আর দু'একজন হয়তো ছুটে যাবে জলের দিকে, ঝড়ের আঘাতে বড় বড় ঢেউগুলি যেখানে সাদা ফেণা হ'য়ে যাচ্ছে সে জায়গাটাই তার লক্ষ্য। এমনি এক জাত গোবিন্দর।

—আচ্ছা বাবু, আমাকে তিনি খুব ভালোবাসেনা, না? কিন্তুক আমার কি গুণ আছে?

—ভালোবাসার কারণ বলা যায় না। তুমি খুব বেশী ক'রে বাঁচতে চাও, গভীর ক'রে বাঁচাতে চাও সেই জন্যে বোধ হয়। তোমাদের স্বভাবে খানিকটা মিল রয়েছে।

'গভীর ক'রে বাঁচা' কথাটা শিখল মাধাই। তার মনের অব্যক্ত আবেশটি ভাষায় রূপ পেল।

মানুষের চরিত্র কি ক'রে সৃষ্টি হয় এ বলার চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা। মাধাইএর জীবনের ঠিক এই জায়গাটায় কিছুদিন ধ'রে গোবিন্দর সাথে তার যে আলাপ এটা তার চরিত্রের আত্মপ্রকাশের সহায়তা করেছে। গোবিন্দর সঙ্গে তার যে আলাপ তার জীবনের একটি ঘটনা যার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া হয়তো যায়ই না! কেউ হয়তো বা এর পেছনে ইলেক্‌টিভ এফিনিটি খুঁজতে প্রলুব্ধ হচ্ছেন। কিন্তু এরকমটা প্রায়ই হচ্ছে। চারিদিকের চাপে চরিত্রগুলি পরিবর্ত্তিত হ'চ্ছে; অস্ফুট কথাগুলি, মনের গভীরে গিয়ে হয়তো বা চিন্তার ভিত্তিভূমি রচনা করছে। গোবিন্দও ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র গোবিন্দ হয় নি। বহুজীবনের ছাপ রয়েছে তার চরিত্রে, যে হেতু সে শিক্ষিত হয়তো বা বহু পুস্তকের ছাপও আছে। পরে একদিন সুধন্যার অধ্যাপিকার জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিও তার চরিত্রকে অন্তত আংশিকভাবে পরিবর্ত্তিত করবে।

সংঘের কাজকর্মের সাথে যাতে মাধাইএর প্রত্যক্ষ যোগ না থাকে সে ব্যবস্থাই ক'রে গেছে গোবিন্দ। আবার সময় কাটানো কঠিন হ'ল তার। একথা ঠিক নয় তার যথেষ্ট সময়, চাকর ছাড়াও নিজের আহার প্রস্তুতের কাজ রয়েছে, নিজের বেশভূষার ব্যবস্থা করতেও তার খানিকটা সময় যায়। আসলে সে অনুভব করে একটা নেশা ধরেছিল আর একটা নেশা ছাড়ার সময়, সে নেশাটাও ফিকে হ'য়ে আসছে। কোন একটি বিষয়ে মেতে উঠতে না পারলে যেন শান্তি নেই।

মাষ্টারমশাই একদিন তার ঘরখানার সম্মুখে এসে উপস্থিত।

—মাধাই আছে?

—আজ্ঞে? মাধাই ধন্তর চাইতে ধন্য হ'ল। একটা অতবড় বিদ্বান প্রধানশিক্ষক তার দরজায় দাঁড়িয়ে।

—তুমি তো আজকাল সংঘটার দিকে লক্ষ্য রাখছ, বাপু।

—বাবু, —মাধাই লজ্জিত হ'ল।

—নিজের হাতে তৈরী জিনিস তোমার। তুমি একা যা করেছ ওরা পাঁচজনে মিলে তা পারছে না। তেমন বুক দিয়ে পড়ে কাজটা তুলে দিতে কারুকে দেখছিনে। এটা ভালো লাগছে না, বাপু।

—আচ্ছা বাবু. আমি যাব। যদি সংঘের বাবুরা রাগ না করেন, আমি কথা বলব।

কিন্তু মাষ্টারমশাই চলে যেতে যেতে মাধাই ভাবল,—দূর করো। এ আর ভালো লাগে না। নিজের কি হ'ল দেখার সময় নেই, কথা বলতে বলতে গা. গরম হ'য়ে ওঠে, গলা শুকিয়ে যায়।

ষ্টেশনে গিয়ে শুনল সংঘের গোলমাল আর কিছু নয়, কোলকাতা নামে এক সহর থেকে কয়েকজন লোক এসে গোপনে গোপনে কাজ করছে, তার ফলে লোকো সেডের শ্রমিকরা একটা আলাদা সংঘ তৈরী করেছে, দলাদলি সুরু হয়েছে। তাদের কেউ পুরানো সংঘের বাবুদের দোষ দিচ্ছে, বাবুদের কেউ কেউ তাদের দোষ দিচ্ছে। মাধাইএর অজ্ঞাত অনেক রাজনৈতিক গালি এদল ওদলকে বর্ষণ করছে। মাধাই ষ্টেশনের চায়ের দোকানের একটা টিনের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলল,—কি হিংসে, কি হিংসে।

তবু মাষ্টারমশাইএর সম্মান রাখার জন্য সন্ধ্যার পর মাধাই জয়হরিকে সঙ্গে নিয়ে পথে ঘুরতে বার হ'ল।

কোথায় যাবা?

—চল, লুকোসেডের পাড়ায়।

ষ্টেশনের পশ্চিমে লোকোসেড, আর লোকোসেডের পশ্চিমে ক্লিনার-ফিটার, সাণ্টার প্রভৃতির কর্মচারীর বাস।

জয়হরি বলল,—এমন হাইহুই ক'রে বেড়াতে তোমার কি ভালো লাগে বুঝি না, মাধা।

—তুমি বুঝবা কেন, ষ্টেশনের গাড়ী থেকে মাছ চুার করবা, ধনে লঙ্কা সরাবা। কিন্তক চুপ ক'রে বসে থাকে কি লাভ? জীবন ফুরায়ে যায়।

—ছুটাছুটি করলেও ফুরাবি।

—জংধরা এঞ্জিন হ'য়ে লাভ কি?

—সরাব পিও, বেরাদার, জয়হরি বলল।

—ওরে আমার হিন্দুস্থানীরে, মাধাই হাসল। একটু পরে বলল,—আজ লুকোসেডের লোকদের ক'য়ে আসতে হবি তারা বাঁচে আছে, না মরে আছে।

—বাঁচে সকলেই, তোমার মতো কেউ জীয়ন্তে মরা না। সুখ আছে, আহ্লাদ আছে, মদ আছে, মিয়েমানুষ আছে। হৈ হৈ কর, সোডাপানির মতো ছিটেফটে ওঠ, তা না। কেবল দুঃখ কষ্ট ঘোলায়ে তোল।

—আমি কি দুঃখ কষ্ট ঘোলায়ে তুলি?

—হয় কষ্ট ভুলে থাকবের দেওনা, চিল্লাচিল্লি কর। একদিন কেউ তোমাকে ঐ জন্যি মার দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিবি।

কথাটা আর এগোল না। লোকোসেডের খালাসিদের মধ্যে মাতব্বর স্থানীয় আব্দুলগনি ফরাজি আসছিল সেই পথ দিয়ে। সেলাম বিনিময়ের পর আব্দুলগনি জিজ্ঞাসা করল,—রাত ক'রে কেন?

—আপনাদের পাড়ায়।

—কি কারণ?

মাধাই বলল,—এই একটুক্ সুখদুঃখের কথাবার্ত্তা।

আবদুলগনি এতবয়সেও এমন অদ্ভুত কথা শোনেনি, দোলদুর্গোৎসব, মহরম নয়। লোক চলেছে এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় সুখদুঃখের কথা বলতে। বৃদ্ধ আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠল, মাধাইয়ের হাত ধ'রে বলল,—চল, ভাই চল।

নিজে সে কোন কাজের ধান্দায় কোথায় যাচ্ছিল তাও ভুলে গেল।

অল্প কিছু দূরে গিয়ে একটা চায়ের দোকানের সম্মুখে থামল আবদুলগনি। ভেতরে যারা কোলাহল করছিল, তাদের কয়েকজনকে আহ্বান করে আবদুলগনি বলল,—ইউনুস, মেহের, ফটিক, দেখ দেখ কারা আসেছে। ইষ্টিশনের নোক।

আসলে দোকানটায় দেশি মদও বিক্রী হয়। মুড়ি মুড়কি থেকে চপ্ কাটলেট নামক এক প্রকার পদার্থ পর্য্যন্ত।

লম্বা ময়লা দু'চারখানি বেঞ্চ ইতস্তত ছড়ান। কেরাসিনের লাল আলোয় ইউনুস প্রভৃতি খাওয়া-দাওয়া করছিল। আবদুলগনির ডাক শুনে দোকানের দরজার কাছে উঠে এসে এদের অভ্যর্থনা করল।

সকলে আসন গ্রহণ করলে আবদুলগনি বলল,—এমন খুসির দিন আর হয় না, একটুক্ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কর, রজনি।

দোকানের মালিক রজনী বলল,—কি ব্যবস্থা, চা, না বড়-চা?

—বড় চা, বড় চা। তিন চারজন সমস্বরে বলল।

স্কুলের হাইবেঞ্চের অনুরূপ একটা লম্বা টেবিলের দু'পাশে এরা মুখোমুখি বসেছিল। রজনী এদের সাত আটজনের মাঝখানে দু'তিনটি দেশি মদের বোতল ও প্রয়োজন মতো মাটির খুড়ি রেখে গেল। কিছু ভোজ্যও এল।

জয়হরি বলল,—আনন্দ দিলেন খুব।

—পাতেছিও অনেক, এ পক্ষের থেকে একজন বলল।

মাধাই বলল,— আপনাদের কাছে আমি আসেছিলাম এসসিওসনের কথা বলতে।

—বেশ, ভালো, কন।

—আপনাদের মধ্যে এখনও অনেকে মেম্বর হন নাই।

—তাইলে তো লজ্জার কথা। মায়নার দিন আপনে একবার আসবেন। তা দেখেন দোষও দেয়া যায় না। সারাদিন খাটনির পর বাসায় আসে খাওয়া শোওয়া ছাড়া আর কিছু মনে থাকে না।

মাধাই সংঘের গুণপনা বর্ণনা ক'রে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছিল, কারো মুখের দিকে চেয়েই সে উৎসাহ পেল না। মাধাই বুঝল সংঘের সভ্য এরা হবে, একদলে থেকে দলে ভারি হওয়ার সুবিধা সম্বন্ধে এরা হুঁশিয়ার কিন্তু সংঘ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল আলাপ করতে ভালো লাগবে এমন লোক এরা নয়। ততক্ষণে জয়হরি ও ইউনুস কি একটা কথা নিয়ে চাপা হাসিতে উচ্ছল হ'য়ে উঠেছে।

আবদুলগনি বলল,—হাসতিছ, কেন তোমরা—

—না, তেমন হাসি কই। আমাদের মিস্ত্রী সাহেব ফটিকের কথা একটু কতিছি।

—কি কথা ভাই, কি কথা? দু'তিনজনে প্রায় সমস্বরে বলল।

ফটিক মিস্ত্রী, ইউনুস সাণ্টারের কোয়ার্টার্স পাশাপাশি। ইউনুস মাঝে মাঝে ফটিকের ঘরের কথা বাইরে টেনে আনে; হাসাহাসি হয়। ফটিক নিঃসন্তান এবং স্ত্রীর উপরে তার মমতা সাধারণের চাইতে বেশী।

ইউনুস বলল,—না, তেমন কি। ফটিকের কপালে কালি লাগে আছে। তা জয়হরি কয়, কাজল কিসের।

ফটিক বলল,—কি কও তোমরা, কাজল কই? এঞ্জিনের কালি।

—আমুও তো তাই বলি। জয়হরি কয় পাশের বাসায় থাকি ব'লে দোষ ঢাকতিছি। কেন, দোষ ঢাকার কি আছে? বউ যদি কারুকে কাজল পরায়, দোষ কি?

ফটিক তাড়াতাড়ি কাপড়ের খোঁট তুলে কপাল ঘসতে ঘসতে বলল,—আরে এঞ্জিনের কালি চেন না; দাঁড়াও তোমাদের দেখাই, মবিলের গন্ধও পাবা।

কপাল ঘসে লাল ক'রে কাপড়ের খোঁটটা চোখের সম্মুখে মেলে দেখল ফটিক, এতটুকু কালির দাগ কাপড়ে ওঠেনি। এরা কিন্তু ফটিকের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। ফটিক ভাবল কালিটা বোধ হয় গালে লেগে আছে। আবার কাপড়ের খোঁট তুলে দুটি গালই ঘসতে লাগল। এবার সকলেই হো হো ক'রে হেসে উঠল। ফটিক বুঝতে পারল কালি কাজল কিছুই তার মুখে নেই।

আব্দুলগনি বলল,—কেন ভাই, তোমার মন এমন দুর্বল কেন্। ওরা ঠাট্টা করল আর তুমি অমনি ক'রে মুখ ঘসলা।

ফটিক হাসতে হাসতে বলল,—কওয়া যায় না, শালীর অমন সব আছে তুক্‌তাক। কালি লাগালে দিলিও অবাক নাই। দেয় মাঝে মাঝে।

হাসি থামলে মাধাই আর একবার চেষ্টা করল, তার বক্তব্যটা উত্থাপন করতে কিন্তু ততক্ষণে স্ত্রীদের নিয়ে কথা অত্যন্ত জমে উঠেছে।

জয়হরি পরম জ্ঞানীর মতো বলল,—তা যাই বলো ভাই ছেলেপুলে না থাকলে শুধু কাজলে সোয়ামীকে বউরা আটকাবের পারে না সব সময়।

মেহের বলল,—ঠিক, ঠিক।

আব্দুল গনি বলল,—বেকুল ঠিক।

মেহের বলল,—চাচা মিঞা, তোমার সেই কেচ্ছাটা কও।

আব্দুল গনি বলল,—কেচ্ছা আর কি, সামান্যই এক কথা।

—না, না, কও।

আব্দুল গনি বলল,—তখন আমার যৌবনকাল। পনর ষোল বছরে বিয়ে সাদি দিয়ে বাপ মনে করছিল উড়ু উড়ু ছাওয়াল চাষবাসে মন দিবে। দূর ব'লে চলে আসলাম। আট বছরের বউ, কালা কিট্টি কিটা, জ্বরে ভোগা, ভাতের জন্যি দিনরাত কাঁদে, এমন বউ। আসে এই লুকোসেটে কাম নিলাম। একটু একটু করে কাম শিখলাম। তখনকার দিনে আমি নামসই করবের পারতাম না, তা চিঠি লেখা, আর চিঠি লেখব কাকে? বাপ মা বউ কেউই অক্ষর চেনে না। আর বৌ, বৌ কয় নাকি আট বছরের সেই কালো কিট্টিকিটা মিডোকে! দশ বছর বাড়ী যাই নাই, চিঠি দিই নাই। ততদিনে আমি সাণ্টার হইছি। মন ক'ল বাড়ী যাওয়া লাগে, বাপ-মা আছে না গেছে কে জানে? হঠাৎ বাপের জন্যি বড় কষ্ট হবের লাগল। বাপ খুসি হবি জানলে—ছাওয়াল সাহেবের এঞ্জিন চালায়। অনেক পথ হাটে হাটে যখন গাঁয়ে ঢুকলাম, তখন দেখি, ওমা, একি? গাঁয়ে ঢোকার পথে, বুঝছ না, নোতুন এক খ্যাড়ের বাড়ী, ঝক ঝাক বালিমাটিতে তোলা নোতুন বাড়ী, এক বর্ষাও পড়ে নাই তার গায়ে এমন বাড়ী, মনে কয় খ্যার পোয়াল থিকে ধানের বাসনা উঠবি। দেখি কি সে বাড়ীর দরজায় দাঁড়ায়ে এক কন্যে। কি যে রূপ! বুঝল না, কটা ফরসা না, কালো কালো, কিন্তুক রূপের বান; মনে ক'ল, নাকানিচোবানি খাওয়া লাগে এমন বানে। কিন্তুক কার বাড়ী চিনবের পারলাম না। এ বাড়ী আগে ছিল না।

—তোমার নিজের বৌএর কি হ'ল, তার কথা ক'লে না।

—আরে দূর, সেও নাকি এক বউ; আট বছরের মিয়ে বউ হওয়ার কি জানে। কিন্তুক বড় কষ্ট পালাম রে। বাড়ীর কাছে, যায়ে দেখি বাড়ী নাই, ঘর নাই, চষা খেত সেখানে। হায় হায় করবের লাগল। কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলাম,—বাপ কনে, মা কনে। তুমি কেডা?—না, আব্দলগনি সাণ্টার। এইখানে আমার বাড়ী ছিল। কেউ ক'লে বাড়ী যেন্ ছাড়ে আলে, তোমাকে চিনি না, এইখানে যার বাড়ী ছিল সে উঠে গেছে বড় সড়কের ধারে। ফিরে যায়ে দেখি সেই নোতুন খ্যাড়ের বাড়ীর দরজায় আমার বুড়ো বাপ বসে। বাপ আর ছাওয়াল কাঁদা-কাটা করলাম, মা আর ছাওয়াল কাঁদা-কাটা করলাম। আর দেখি, সেই ভাদুই-পদ্মা, থম্ থম্ যৈবন সেই মিয়ে। আম্মা; কি-না, ঐ মিয়ে কার? তোমার সেই বেটা বউ কনে গেছে যাক, আমি কোল ঐ মিয়েক ছাড়ব না। কও সম্মন্দ আটকাবি? আম্মা হাসে কয়—আটকাবিনে। সাঁঝকালে দেখি মিয়ে জল আনবের যায়। বুঝলানা চুল বাঁধেছে, সুরমা কনে পায়, সুরমাও দিছে চোখে সামনে আগায়ে ক'লাম,—মিয়ে, পেরান আমার যায়। না—কি হ'ল, পোকায় কাটছে? না। তো কি? মিয়ে তোমার ঐ পরীমুখ দেখছি, ঐ হাটন দেখছি, আর আমি বাঁচব না। লজ্জা পায়ে সে ক'ল—আমি যে নিকা করছি, ছোট কালে একজনের সাথে নিকা হইছে। কই,—যদি বাঁচে থাকে সে, তালাক দেও। সোভানাল্লা, কয় কি! —না—তার কি অন্যাই। আমি দেখবের ভালো না, সেজন্যি সে চলে গেছে, তাকে আমি তালাক দিবের পারব না। কাঁদে কাটে একছা' হলাম, মিয়েরমন গলে না। ভাবলাম রাত্তিরে লুকায়ে পারি তো আরও দু'এক কথা কাঁদা কাটা করব। বুঝলানা।— আব্দুলগনি হাসতে লাগল, তার সাদা দাড়িগুলি সুন্দর দেখাতে লাগল।

—সেই মিয়ে ?

—না বুঝে থাক,—বুঝে কাম নাই।

জয়হরি বলল,—আপনার সেই কালো-কিট্‌কিটা বউ ?

—সেই।

ইউনুস বলল,—আরে কই হ্যায়, লাগাও দুই বোতল আর।

—আবার ? মেহের প্রশ্ন করল।

—আড্ডা জমেছে আজ।

দোকানিদের লোক যথোচিত ব্যবস্থা করল।

—মেহের বলল, আমার বউএর কথা আর কয়ো না। বিটি যে এমন ভালোবাসা কনে শি কে জানে। কিন্তুক বড় রোগা হ'য়ে যাতিছে, কি করি বুঝি না।

জয়হরি বলল,—ভাত ভাত, পেট ভ'রে ভাত খাবের দিও।

পাত্রে পাত্রে মদ পরিবেশন ক'রে ইউনুস বলল,—দুনিয়ার সার এই মদ, দুনিয়ার বার মিয়েমানুষ। যদি কামে কাজে থাকবের চাও, যদি ওভারটাইম করবের চাও, একটুক্ একটুক মাল খাবা, তন্ দুরস্ত। আর যদি মন খারাপ হয়, ভাইসব মনের মতো মিয়ে মানুষ খুঁজে বার করবা মনের কথা তাকে কয়ে হাল্কা হবা। দুনিয়া-ছাড়া হবা তাক্ নিয়ে।

সেদিনের আড্ডায় সংঘের কথা হ'ল না। সেবারের মদ পাত্রগুলি নিঃশেষিত হ'লে আর কিছুক্ষণ হাসাহাসি গালগল্প ক'রে যে যার স্ত্রীর বাড়ীর দিকে চলতে আরম্ভ করল।

আবদুলগনি প্রথম কথা বলেছিল, সেই শেষ কথা বলল,—ভাই, বউ না থাকত যদি মক্কায় যাতাম বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতাম। শালা, এই এঞ্জিন ঠেলে বেরাতাম না। বাড়ী মানেই তো বৌ এর বাড়ী কও। মাধাই, আবার আসো একদিন। কি আনন্দই পালাম, কি আনন্দই দিলা। যাতেছিলা ডাল আলু কিনবের, তুমি আলে। বউ বকেতো চুপ ক'রে থাকে, পরে সেই পদ্মায় জল আনার কথা মনে করায়ে দেব। (ক্রমশঃ)

"বিকেলের থেকে আলো ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে নিভে যায়—তবু ঢের স্মরণীয় কাজ শেষ হয়ে গেছে।" জীবনানন্দ

একটি কবিতার মত গল্প

সুজিত কুমার নাগ

সব চেয়ে আশ্চর্য লাগে অন্নদা যখন হাসেন আর বলেন : জীবনটাই কাব্য।

কারণ ?

জলন্ত সিগারটি নিভিয়ে ম্লান হেসে বললে ভ্রমর : জীবনটাই খেলনা।

অর্থাৎ ?

লাবণ্য মৃদু হাসেন সবিনয়ে জানান : ভালবাসাই ব্যবসা।

তারপর ?

দত্ত সাহেব আরও গম্ভীর হন বলেন : সব ফাঁকি। হৃদয় নেই কোনটাতেই। মায়াবী পোশাক আর কাব্যের রূপ সমান।

আমরা পাঁচজন। চারজন মুখোমুখী করে বসে। দত্ত সাহেব মাঝখানে। কারণ তিনিই প্রাণ এই আসরের। ধরে নেওয়া থাক আমরা পঞ্চতীর্থ। বন্ধু।

আমি লিখি—লেখক। দত্ত সাহেব ব্যবসাদার—ব্যবসায়ী। ভ্রমর নাচিয়ে—নর্তকী। লাবণ্য গান গায়—গায়িকা। অন্নদা ছবি আঁকেন—শিল্পী।

ঘরের আলো জ্বলছে।

সুসজ্জিত ঘর। দত্ত সাহেবের এই ঘরে এর আগেও আমি এসেছি কয়েকবার লাবণ্যকে নিয়ে। অন্নদা, ভ্রমরের এই প্রথম আগমন। দত্ত সাহেবের সাথে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যেই এই আসর।

আলাপনের পর সুরু হল আলোচনা। অনেক রকমের।

দত্ত সাহেবের খানসামা ইস্‌মাইল বললে, চা খাবেন আপনারা ?

রাজি হলাম।

আমি বললাম অন্নদাকে, সত্যি আপনার আঁকা ছবি আমায় মুগ্ধ করেছে। শুধু তাই নয় আপনার ছবির মধ্যে নিজস্ব একটা দরদ আছে। রুচিমত।

ভ্রমর হাসলেন।

অন্নদা তাকালেন লাবণ্যর দিকে।

দত্ত সাহেব সিগার ধরালেন। ভ্রমর লীলায়িত কণ্ঠে বললেন, দত্ত সাহেব আরেকটা সিগার দিনতো!

আশ্চর্য হলাম এত সিগার খান কি করে ভ্রমর ? একটার পর একটা। বিরাম নেই। তাঁর দিকে তাকালাম।

পরিচ্ছন্ন চেহারা। চোখে মুখে গভীর রহস্য। হাতে দুগাছা সাধারণ চুড়ি। কাণে দুল। পরণে শুভ্রাবরণী। পায়ে স্লিপার। দত্ত সাহেব সিগার দিলেন।

ভ্রমর বললেন : আপনি তো লেখেন ?

আপত্তি করিনি। বললাম, হ্যাঁ।

ভ্রমর মৃদু হেসে বললেন, কোন দিন কী ভালবেসেছেন কোন মায়াবিনীকে ?

অন্নদা গম্ভীর হলেন।

লাবণ্যও। দত্ত সাহেব উঠলেন, জানালেন, ক্ষমা করবেন আমি আসছি। এখনই।

বললাম ভ্রমরকে, দেখুন ব্যাপারটা ব্যক্তিগত। ভালবেসেছি যাকে, তাকে যাচাই করিনি, আর তাছাড়া তার কথা নিয়ে কথা বলা আমার সয়না।

অন্নদা তাকালেন লাবণ্যর দিকে। লাবণ্য হাসলেন।

দত্ত সাহেব আবার এলেন। ইসমাইলও। বললে সে, চা-চিনি দুধ-সব আলাদা ঢেলে নিন আপনারা খুশী মত।

ভ্রমর বললেন : চিনি খাইনে আমি।

লাবণ্য বললেন, কেন ?

জানালেন, ডাক্তারের বারণ ?

কে ডাক্তার ? হেসে ফেললেন দত্ত সাহেব। ঝকঝকে হাসি।

গম্ভীর হয়ে গেলেন ভ্রমর, বললেন, ডাক্তার ? সে নাম ভুলে গেছি।

অন্নদা এবার মুখ খুললেন, বললেন আমায়, লেখক তো আপনি, আজকের এই আসরের আলাপনে একটা গল্প বলব। দেখুন তো আপনার সাহিত্যে স্থান পায় কিনা ?

ঘরের উজ্জ্বল আলো। বাইরের দিকে তাকালাম।

লাবণ্য খুশী হয়েছেন। বাইরে বৃষ্টি। অঝোর। তাঁর কণ্ঠ গুনগুন করছে। রবীন্দ্র সংগীত। ঝিলমিলিয়ে উঠলেন দত্ত সাহেব, খুশীর আবেগে, বললেন : আরও জোরে লাবণ্যদেবী 'এমন দিনে তারে বলা যায়।'

লাবণ্য বললেন, গান গাইছি পরে। বলুন অন্নদা আপনার গল্প।

ঘরের উজ্জ্বল আলো। ভ্রমর বললেন, অসহ্য। আলোটা নিভিয়ে দিন। অন্ধকার হোক। মুখোমুখী বসে গল্প শুনি আমরা। গল্প ? জীবনের না যৌবনের ? দত্ত সাহেব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, তাই হোক। গল্প শুনি আমরা। ঘরের আলো যাক নিভে।

না। অন্নদা বললেন, আলো জ্বলুক, মুখ দেখি মুখোমুখী। দেখি অন্ধকার হয়ে আসুক মন আলোতে।

লাবণ্য বললেন, আলো অন্ধকার, তার চেয়ে······

বাকীটুকু আর বলতে হলনা কাউকে, ইসমাইল এসে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলে। নীলাভ আলো জ্বলছে এখন। নীল হৃদয়ের মন যেন। যে মন কবিতায় ধরা দেয়, যে হৃদয় ঢাকা আছে পোষাকী বাহারে, সেই সব কথা যেন এই নীলাভ মনে ধরা দিতে চায় মৃদু কবিতায়।

আমরা পাঁচজন।

চারজন মুখোমুখী। আমি, লাবণ্য। ভ্রমর, অন্নদা। দত্ত সাহেব মাঝখানে।

অন্নদা বললেন : জীবনটাই কাব্য। তা নয় তো কি ? লিখিয়ে নই। তাই লিখে রাখিনি। বলতে পারি দেখুন এটা গ্রহণযোগ্য কিনা ?

আমি বললাম, বলুন।

অন্নদা বলতে সুরু করলেন।

'সে ছিল এক দিন। মনে লেগেছিল বসন্ত; বনে ফুটেছিল ফুল। 'একে একে এল যাহারা, হৃদয়ে দিয়েছে পাহারা।' সত্য। কিন্তু সে সব স্মৃতি আজ কথায় গানে! আমার ছবিতে। কি আশ্চর্য্য সে সব দিন, সে যখন আসতো আমার কথা হয়ে উঠত গান। ছন্দ হয়ে উঠত ছবি। এক এক করে পাঁচ বছর। জীবনটাই কাব্য। কবিতার মতনই। এমনি করে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। সে আসতো। বলতো এসেছি। জানি! এসেছো যখন তুমি আমার।'

এবার থামলেন অন্নদা। ভ্রমর বললেন, আশ্চর্য তারপর ? সিগার ধরালেন ভ্রমর।

লাবণ্য তাঁর হাতটি আমার হাতের মধ্যে ধরে রেখেছেন। আপত্তি করিনি।

দত্ত সাহেব বললেন, ভারি অদ্ভুত লাগছে তো শুনতে, আপনার ছবির মতনই জটিল। মাপ করবেন রসভঙ্গ করলুম। কিন্তু এত নিরস হলে তো চলবেনা। রসও চাই। রসের বৃত্তও তাই···

সোজা হয়ে দাঁড়ালেন দত্ত সাহেব। বললেন, অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই আমি সুরু করলাম।

ঢকঢক করে খেতে সুরু করলেন দত্ত সাহেব।

সেই নীলাভ ঘরে একটা অদ্ভুত পরিবেশ এলো যেন। স্পষ্ট দেখতে পেলাম সেই অন্ধকারের মধ্যে ভ্রমরের হাতের মধ্যে আরেক পানপাত্র। একটা আশ্চর্য চেতনায় দত্ত সাহেব সাগ্রহে এগিয়ে গেলেন ভ্রমরের দিকে। ওঁরা দু'জনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুই গ্লাসে ঢালতে শুরু করলেন, একটা নাচের ভঙ্গীতে দু'জনেই বসে রইলেন যে যার যায়গায়।

লাবণ্য আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন আমার পাশে।

অন্নদার আবার শুরু।

'তুমি আমায় নাও, আমি তোমার!' সে বললে, আমি তোমারই। তারপর এক এক করে বছর কাটল। সময়ের চাকায়। সে আর এলো না। আশ্চর্য হলুম এমন কেন হল ? যে আমায় যৌবনে সাজালে যোগিনী, তার যোগনিদ্রায় আমি কি সাড়া দেবনা ? কল্পনার রাজ্য থেকে পার হয়ে অগ্রসর হতুম, আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত, ভাবতুম কি হবে তাকে ভেবে ? আসবে কি সে মহালগ্নে ? আমার জীবনে ? না সে আর এলো না। কি দিয়ে গেল সে ? কার জন্যে করব তপস্যা ? কোন দয়াহীন দেবতার কাছে জানাব আমার প্রার্থনা ? কি নিয়ে থাকব আমি ? কি পাব আমার জীবনে ? একটা আশ্চর্য জিনিস সে শেখালে, ছবি আঁকা। সেই তার ছবি, আমি তারই ছায়া।'

এবার থামলেন অন্নদা।

মনে হলো তার মন যেন বিষাদে ভরে উঠছে। চোখ যেন অশ্রুমতী হয়ে উঠেছে।

এবার দৃষ্টি নিলাম লাবণ্যর দিকে।

রবীন্দ্র সংগীত হবে কি আবার? আবার তাকালাম। বারবার। মুখ লুকনো মাটির দিকে। পথে কি ফুল ফুটেছে? না উতল করা বৃষ্টি পড়লো মনে?

অন্নদাকে জানালাম, সত্যি এ কাহিনী শুনে দুঃখ হল মনে, জীবনে যাকে আর পেলেন না তার স্মৃতি নিয়ে আজও মালা গাঁথছেন। ছবি আঁকছেন, তারই ছায়া তো আপনি। আশ্চর্য লাগে কি করে আপনার মতন মেয়েকেও মনোনয়ন করলেন না?

দত্ত সাহেব চুপ করে ছিলেন। বললেন, চ-মৎকার। কাহিনী—গান, কাব্য? চ-মৎকার! কিন্তু অন্নদা জীবনটা কি শুধুই কাব্য? না আরও কিছু? পুরাণো দিনে কি শুধুই ব্যথা? না আরও অনেক স্মৃতি তাতে। হাসলাম।

দত্ত সাহেবের নেশা এসেছে। মনে না দেহে?

বলছেন তিনি, ভাল লাগা যেন মেঘ হয়ে উঠছে আকাশে। অনেক দূরের আকাশে রঙ্গ আব কি সবুজ হয়ে উঠবে না কারও মনে?

লাবণ্যর দিকে দৃষ্টি নিয়ে বললেন দত্ত সাহেব—গান?

লাবণ্য জানালেন, আরও পরে, এবার ভ্রমরের পালা!

ভ্রমর আমার দিকে তাকালেন। আমি হাসলাম।

ভ্রমর বললেন, জীবনটাই খেলনা। তাই নয়তো কি? এ যেন শোকেসে সাজানো পুতুল। ভাঙ্গো। ফেলো। নানাভাবে। আমরাও তাই, তাই নয় কি?

কোন ভূমিকা না করেই ভ্রমর বলতে শুরু করলেন,

"বেশ মনে পড়ে সে এক দিন। যে দিন সব মনে হত সুন্দর। আকাশ, পৃথিবী, পাখি বন, জ্যোৎস্না সবই ছিল মধুময়। সে আর আমি। কখনো লেকে, কখনো সিনেমায়। সেই মায়াময় আশ্চর্য্য বিকেল। সোনালী বিকেলে, পার্কের ঘাসে ঘাসে কবিতায় গানে। সে ছাড়া চিন্তা নেই। সে যখন আসতো অদ্ভুত লগতো ভাবতে। আরপর দিন গেলো। রাত এলো। রাত আর দিন সময়ের স্রোতে। সে বললে আমি তুমি এক। আমি ছায়া, তুমি কায়া। এসো। গেলাম। হৃদয়ে দেহে। অনু, পরামানুতে। রক্তে রক্তে মিশালাম। আনন্দে উল্লাসে, ব্যথা বেদনায় সে এলো। আমি হলাম কল্যাণময়ী। সে হল হিরন্ময়।"

এবার থামলেন ভ্রমর। দত্ত সাহেবের হাত থেকে নিজের হাত দুটি আলতো ভাবে সরিয়ে নিয়ে আবার সুরু করলেন ভ্রমর:

"তারপর আবার কি? সে বললে এসো আমাদের স্বর্গে গড়ি নতুন জীবন। ধরি সুরা। সুরে সুরময় হও। খাও। খেলাম। নাচো। নাচলাম। সুরার সুরে, জীবনে আর যৌবনে ভাবলুম না কি হবে অনাগত অতিথির আগমন শুনে ক্রন্দন সুরু করলে। বললে, সব ভুল হৃদয় ফাঁকি, জীবন যৌবনের। তখন আর ফিরে যাবার উপায় নেই যে। কি করব? সেই আমি সেই রয়ে গেলুম। সে চলে গেল, দিয়ে গেল স্মৃতি তীর্থের স্মৃতিকে। রেখে দিলাম তাকে আমার মনে। সে আছে আমার কোল জুড়ে। আমার বুকে।"

এবার থামলেন ভ্রমর।

দেখলাম ম্লান গভীর বিষন্ন তিনি।

তার দিকে না তাকালেও বুঝতে পারলুম তার চোখে জল। দত্ত সাহেব উল্লসিত হয়ে উঠলেন, বললেন—চমৎকার। অবাক লাগছে। কিন্তু ভ্রমর জীবনটা কি খেল্‌না? না খেলানো?

বাইরে দিকে তাকালাম।

আকাশে আসন্ন বৃষ্টি। সন্ধ্যাকাশে লাবণ্যের মন চলে গেলো কোন সুদূরে? তাঁরও কণ্ঠে সুর হোক, সুর হোক পরিচয়ের।

লাবণ্য গাইলেন।

ঘরের আবহাওয়া গেল বদলে। অন্নদা—ভ্রমরের কাহিনী কথায় হয়ে রইল জমা। আমার লেখনিতে। দত্ত সাহেব বললেন 'এমন দিনে তারে বলা যায়। সত্যি ভারি মিষ্টি গলা আপনার। অবাক লাগছে।'

আবার ইসমাইল এলো, বললে, খাবার আনব এখন? প্রতিশ্রুতি সকলের।

ঘরের আলো আবার জ্বলে উঠল।

আমরা সহজ হয়ে গেলাম।

আশ্চর্য্য লোক দত্ত সাহেব জমিয়ে তুললেন আলাপনের আসর।

বললেন: খেতে খেতে এবার একটি উপমা দেব।

বিস্মিত হয়ে উঠলুম। দত্ত সাহেবের উপমা।

দত্ত সাহেব জানালেন এই:

'সব ফাঁকি, হৃদয় নেই কোনখানেই। নইলে অন্নদা, ভ্রমরের এই কাহিনী শুনব কেন? অন্নদা যাকে ভালবাসলেন, যে শিল্পীকে, তার মধ্যে কি শিল্প-সৌন্দর্য ছিলনা? না অন্নদা দেখতেন তার রূপ আর অর্থ? ভ্রমর দিলেন সেই রূপময়কে তার দেহ, সে চলে গেল বলেই কি সে হয়ে গেলো দেহাতীত। একবার কি তাকে খুঁজেছিলেন? তার জন্যে কি বলেছিলেন সমাজের কাছে?

এবার থামলেন দত্ত সায়েব। আমি ভাবলাম, এ উপমা না উপন্যাস!

দত্ত সাহেবের আবার সুরু:

'মেয়েদের আবার ভালবাসা? ভ্রমর যদি হলেন মা, কেন সেই শিশুটিকে নির্মম ভাবে মারলেন? কেন তাকে বাঁচিয়ে রাখলেন না? অন্নদা যদি ভালই বাসলেন তবে কেন তার কাছে আর ফিরে গেলেন না? তিনি কি খুঁজে পেতেন না তাকে কোন লোকালয়ে? কোন শিল্পীর ঘরে? ভ্রমর কি দেখেননি সেই রূপময়কে আর কোন নাচঘরে? কোন সরাইখানায়? সুরাপাত্র কি ভয়ে দেয়নি তার মুখ?

দত্ত সাহেবের বিবরণের বিরতি। লাবণ্য বললেন, 'আপনার উপমা কি এই?

রবীন্দ্র সংগীত হবে কি আবার? আবার তাকালাম। বারবার। মুখ লুকনো মাটির দিকে। পথে কি ফুল ফুটেছে? না উতল করা বৃষ্টি পড়লো মনে?

অন্নদাকে জানালাম, সত্যি এ কাহিনী শুনে দুঃখ হল মনে, জীবনে যাকে আর পেলেন না তার স্মৃতি নিয়ে আজও মালা গাঁথছেন। ছবি আঁকছেন, তারই ছায়া তো আপনি। আশ্চর্য লাগে কি করে আপনার মতন মেয়েকেও মনোনয়ন করলেন না?

দত্ত সাহেব চুপ করে ছিলেন। বললেন, চ-মৎকার। কাহিনী—গান, কাব্য? চ-মৎকার! কিন্তু অন্নদা জীবনটা কি শুধুই কাব্য? না আরও কিছু? পুরাণো দিনে কি শুধুই ব্যথা? না আরও অনেক স্মৃতি তাতে। হাসলাম।

দত্ত সাহেবের নেশা এসেছে। মনে না দেহে?

বলছেন তিনি, ভাল লাগা যেন মেঘ হয়ে উঠছে আকাশে। অনেক দূরের আকাশে রঙ্গ আব কি সবুজ হয়ে উঠবে না কারও মনে?

লাবণ্যর দিকে দৃষ্টি নিয়ে বললেন দত্ত সাহেব—গান?

লাবণ্য জানালেন, আরও পরে, এবার ভ্রমরের পালা!

ভ্রমর আমার দিকে তাকালেন। আমি হাসলাম।

ভ্রমর বললেন, জীবনটাই খেলনা। তাই নয়তো কি? এ যেন শোকেসে সাজানো পুতুল। ভাঙ্গো। ফেলো। নানাভাবে। আমরাও তাই, তাই নয় কি?

কোন ভূমিকা না করেই ভ্রমর বলতে শুরু করলেন,

"বেশ মনে পড়ে সে এক দিন। যে দিন সব মনে হত সুন্দর। আকাশ, পৃথিবী, পাখি বন, জ্যোৎস্না সবই ছিল মধুময়। সে আর আমি। কখনো লেকে, কখনো সিনেমায়। সেই মায়াময় আশ্চর্য্য বিকেল। সোনালী বিকেলে, পার্কের ঘাসে ঘাসে কবিতায় গানে। সে ছাড়া চিন্তা নেই। সে যখন আসতো অদ্ভুত লগতো ভাবতে। আরপর দিন গেলো। রাত এলো। রাত আর দিন সময়ের স্রোতে। সে বললে আমি তুমি এক। আমি ছায়া, তুমি কায়া। এসো। গেলাম। হৃদয়ে দেহে। অনু, পরামাণুতে। রক্তে রক্তে মিশালাম। আনন্দে উল্লাসে, ব্যথা বেদনায় সে এলো। আমি হলাম কল্যাণময়ী। সে হল হিরন্ময়।"

এবার থামলেন ভ্রমর। দত্ত সাহেবের হাত থেকে নিজের হাত দুটি আলতো ভাবে সরিয়ে নিয়ে আবার সুরু করলেন ভ্রমর:

"তারপর আবার কি? সে বললে এসো আমাদের স্বর্গে গড়ি নতুন জীবন। ধরি সুরা। সুরে সুরময় হও। খাও। খেলায়। নাচো। নাচলাম। সুরার সুরে, জীবনে আর যৌবনে ভাবলুম না কি হবে অনাগত অতিথির আগমন শুনে ক্রন্দন সুরু করলে। বললে, সব ভুল হৃদয় ফাঁকি, জীবন যৌবনের। তখন আর ফিরে যাবার উপায় নেই যে। কি করব? সেই আমি সেই রয়ে

গেলুম। সে চলে গেল, দিয়ে গেল স্মৃতি তীর্থের স্মৃতিকে। রেখে দিলাম তাকে আমার মনে। সে আছে আমার কোল জুড়ে। আমার বুকে।"

এবার থামলেন ভ্রমর।

দেখলাম ম্লান গভীর বিষন্ন তিনি।

তার দিকে না তাকালেও বুঝতে পারলুম তার চোখে জল। দত্ত সাহেব উল্লসিত হয়ে উঠলেন, বললেন—চমৎকার। অবাক লাগছে। কিন্তু ভ্রমর জীবনটা কি খেল্‌না? না খেলানো?

বাইরে দিকে তাকালাম।

আকাশে আসন্ন বৃষ্টি। সন্ধ্যাকাশে লাবণ্যের মন চলে গেলো কোন সুদূরে? তাঁরও কণ্ঠে সুর হোক, সুর হোক পরিচয়ের।

লাবণ্য গাইলেন।

ঘরের আবহাওয়া গেল বদলে। অন্নদা—ভ্রমরের কাহিনী কথায় হয়ে রইল জমা। আমার লেখনিতে। দত্ত সাহেব বললেন 'এমন দিনে তারে বলা যায়। সত্যি ভারি মিষ্টি গলা আপনার। অবাক লাগছে।'

আবার ইসমাইল এলো, বললে, খাবার আনব এখন? প্রতিশ্রুতি সকলের।

ঘরের আলো আবার জ্বলে উঠল।

আমরা সহজ হয়ে গেলাম।

আশ্চর্য্য লোক দত্ত সাহেব জমিয়ে তুললেন আলাপনের আসর।

বললেন: খেতে খেতে এবার একটি উপমা দেব।

বিস্মিত হয়ে উঠলুম। দত্ত সাহেবের উপমা।

দত্ত সাহেব জানালেন এই:

'সব ফাঁকি, হৃদয় নেই কোনখানেই। নইলে অন্নদা, ভ্রমরের এই কাহিনী শুনব কেন? অন্নদা যাকে ভালবাসলেন, যে শিল্পীকে, তার মধ্যে কি শিল্প-সৌন্দর্য ছিলনা? না অন্নদা দেখতেন তার রূপ আর অর্থ? ভ্রমর দিলেন সেই রূপময়কে তার দেহ, সে চলে গেল বলেই কি সে হয়ে গেলো দেহাতাত। একবার কি তাকে খুঁজেছিলেন? তার জন্যে কি বলেছিলেন সমাজের কাছে?

এবার থামলেন দত্ত সায়েব। আমি ভাবলাম, এ উপমা না উপন্যাস!

দত্ত সাহেবের আবার সুরু:

'মেয়েদের আবার ভালবাসা? ভ্রমর যদি হলেন মা, কেন সেই শিশুটিকে নির্মম ভাবে মারলেন? কেন তাকে বাঁচিয়ে রাখলেন না? অন্নদা যদি ভালই বাসলেন তবে কেন তার কাছে আর ফিরে গেলেন না? তিনি কি খুঁজে পেতেন না তাকে কোন লোকালয়ে? কোন শিল্পীর ঘরে? ভ্রমর কি দেখেননি সেই রূপময়কে আর কোন নাচঘরে? কোন সরাইখানায়? সুরাপাত্র কি ভয়ে দেয়নি তার মুখ?

দত্ত সাহেবের বিবরণের বিরতি। লাবণ্য বললেন, 'আপনার উপমা কি এই?

এই অবসরে আমি তাকালাম অন্নদার দিকে, দেখলাম তিনি ম্লান হয়ে গেলেন দত্ত সাহেবের এই উক্তি শুনে। আর ভ্রমর? দেখলাম তাকেও। দত্ত সাহেবের হাতে হাত রেখে পরম আগ্রহ অ… শুনছেন এই যুক্তি।

'না তা নয়।' দত্ত সাহেব আবার বলতে স্থুরু করলেন, প্রসঙ্গ প্রসঙ্গই কিনা? আমার উপমা কিছুই নয়, সেইটাই উপমা বলতে পারেন, 'সব ফাঁকি হৃদয় নেই একথাটি বলি কেন জানেন?'

এবার উঠে দাঁড়ালেন দত্ত সাহেব।

স্থরা পাত্র ধরলেন। ধরালেন ভ্রমরকে। অন্নদা হাসলেন। দত্ত সাহেব বলছেন, জীবনটা ফাঁকি, হৃদয় নেই। সত্যি কি হৃদয় নেই কারও? কেউ কি দেখবে না, ফিরিয়ে নেবেনা শিল্পীকে সেই রূপময়কে?

দত্ত সাহেব পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন অন্নদার দিকে।

অন্নদা বললেন, কোথায় পাব আর সেই শিল্পীকে, সে এখন নাগালের বাইরে।

অন্নদা যাবার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন।

বললাম, একি উঠলেন যে?

হ্যাঁ, বললেন অন্নদা। দত্ত সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তবুও জানাই চিন্ময় আর নেই, সে ফুরিয়ে গেছে।

দত্ত সাহেব হেসে উঠলেন, চিন্ময় হারিয়ে গেছে বটে, কিন্তু দত্ত সাহেব আছে। ভ্রমর আপনি আপনাদের মনোনয়নকে না পেলেও আমায় পেতে পারেন। অপেক্ষা করি আজও!

'অপেক্ষা করে আর লাভ নেই। আমি অন্নদাই। চাই তাকে, যে ছিল হিরণ্ময়, যার শ্রী… আমি ছিলাম উদ্ভাসিতা।'

দত্তসাহেব হাসলেন।

দৃষ্টি ফেরালেন ভ্রমরের দিকে।

ভ্রমর মৃদু হেসে বললেন, রূপময়কে না পেলেও রূপহীনকে পেয়েছি ফিরে। অর্থবান না হলে… পেয়েছি অর্থহীনকে। শূন্য সে তাই তাকে করব পূর্ণ। নিজের হাতে যাকে নষ্ট করেছি তা… ফিরিয়ে আনব আমার রক্তে। সে আস্থক আমার বুক জুড়ে আবার ডাকুক 'মা' বলে। গা… কোল জুড়ে।

অন্নদা বললেন, সেই ভালো। সে আস্থক। আকাশ হাস্থক, সূর্য উঠুক আবার।

অন্নদা চলে গেলেন। যাবার আগে বললেন নমস্কারের ইংগিতে আমায়ঃ চলি কেমন?

তার মানে আমি চললাম বটে দিয়ে গেলাম স্মৃতি সৌরভ। সময়ের তালে এই স্মৃতি যদি ক… মনে পড়ে, তখন? তখনও কি মনে রাখবে না কেউ?……আমার ভাবনায় বাধা পড়ল। লা… উঠবেন বলে মনে হল।

ভ্রমর বললেন, এখনই যাবেন?

'হ্যাঁ' লাবণ্য মৃদু হাসলেন।

এই বৃষ্টিতে। বাইরে দুর্য্যোগ, অন্নদা গেলেন কি করে?

'যারা যেতে জানে তারা পারে, যারা পারেনা তারা থাকে। আর তা ছাড়া আমাকেও যেতে হবে ওঁর সঙ্গে, যতক্ষণ বৃষ্টি পড়বে ততক্ষণ লাবণ্য-কণ্ঠ গুনগুন করবে রবীন্দ্র সঙ্গীতে। কিন্তু সে সঙ্গীত যেন মুখর হয়ে ওঠে দুই আলোকে—মেঘে রৌদ্রে।'

ভ্রমর হাসলেন।

লাবণ্য মুখ লুকালেন মাটির দিকে চেয়ে।

দত্ত সাহেব সিগার ধরালেন। ভ্রমরকে দিতে চাইলেন।

ভ্রমর বললেন, না না চিন্ময় আর সিগারে দরকার নেই।

আমার দিকে তাকালেন ভ্রমর।

বললেন, তা হলে ভালবেসেছেন কি কোন মায়াবিনীকে! 'দেখুন যাকে ভালবেসেছি তাকে যাচাই করিনি, আর তাছাড়া তার কথা নিয়ে কথা হয় না, সে কথা হয় আমার মনে, অথবা কোন কবিতায়।'

ভ্রমর তাকালেন লাবণ্য দিকে। সেই সঙ্গে দত্ত সাহেবও।

"নারি, তুমি সকালের জল উজ্জ্বলতা ছাড়া পৃথিবীর কোনো নদীকেই
বিকেলে অপর ঢেউয়ে খরশান হতে
দিতে ভুলে গিয়েছিলে ; রাতের প্রখর জলে নিয়তির দিকে
বহে যেতে দিতে মনে ছিলো কি তোমার ?
এখনও কি মনে নেই ?

—জীবনানন্দ

মুস্কিল

অবধূত

একটা মুস্কিল লেগেই আছে।

কোথাও কিছু নেই, দরজায় হাতের আঙ্গুল চিমটে ভ্যা এ্যা এ্যা করতে করতে উপস্থিত হোল।

'দেখ্ দেখ্ আবার কি হোল দেখ্।'

হাতের কাজ ফেলে ছুটল সবাই। সবার আগে ছুটল ছোড়দি। ছোড়দির চেয়ে এ বাড়ী ছুটতে পারেই বা কে?

'চিমটেছে হাত। ওমা দেখেছ, একেবারে লাল হয়ে উঠেছে আঙ্গুল। চুপ কর বদমাস বাঁদ হাত চিমটে এসে আবার ষাঁড়ের মতন চেঁচান হচ্ছে।'

ভ্যা এ্যা এ্যা এ্যা—টানটা আরও বেড়ে গেল।

'দাঁড়া চুপ করে। ন্যাকড়া নিয়ে আসি। জলে ভিজিয়ে বেঁধে দোব' ছুটল ছোড়দি দোতলা পুতুলের বাক্সে ন্যাকড়া আছে।

ছোড়দা বেরিয়ে এল বাইরের ঘর থেকে লাটুতে লেত্তি জড়াতে জড়াতে। যেন কিছুই হয় এইভাবে আড়চোখে একবার দেখে নিলে হাতের অবস্থাটা। তারপর বাঁ হাতে হাফ প্যান্টের পকে থেকে একটি পেয়ারা বার করে প্যান্টের গায়েই রগড়ে মুছে বাড়িয়ে ধরলে "নে ধর্। কিছু হয়নি চল বাইরে লাট্টু ঘোরাবি।"

চিমটে যাওয়া হাতখানা বাড়িয়ে থপ্ করে পেয়ারাটা ধরলে। বাঁ হাতে চোখের জল মুছ মুছতে ছোড়দার পিছন পিছন টলতে টলতে বেরিয়ে গেল।

পুতুলের বাক্স থেকে ন্যাকড়া নিয়ে নিচে নেমে ছোড়দি দেখলে ভোঁ ভোঁ।

রান্নাঘর থেকে ঠাকুমা ডাক দিলেন: "মোচাগুলো ফেলে রেখে আবার কোথায় নাচতে গে সাবি। একমিনিট যদি একযায়গায় স্থির হয়ে বসে মেয়ে। কাজ শিখবে কে? অতবড় মেয়ে অষ্টপ্র ছুটে বেড়ালে কাকে কাজ শেখাব আমি।"

আবার তিনলাফে রান্নাঘর পৌঁছে গেল ছোড়দি, "ছুটে বেড়াচ্ছি বুঝি আমি? শুনতে পা বুঝি কানে? ওধারে হাত চিমটে যে এক কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিল ছেলে। ন্যাকড়া আনতে গেছি, দিয়ে বেঁধে দোব—ওমা, এসে দেখি সরে পড়েছে। এক্কেবারে ডাকাত হয়ে উঠছে দিন দিন।" ছোড়দি চোখদুটো বড় বড় করে আবার বঁটিতে গিয়ে বসল।

ছোড়দির বয়সটা অবশ্য অত বড়ই বটে। সাত পেরিয়ে আটে উঠেছে এই ফাল্গুনে। জন্মতিথি বায়না ধরে বসল সাড়ী কিনে দিতে হবে।

মা বললেন "চুপ কর, সাড়ী পরবার বয়স হোক আগে।" মায়ের কাছে সুবিধা হোল না। বা পানের কৌটাটা দিতে গিয়ে বললে "নিচু হও ত। নিচু হও না থপ করে। কানে কানে একটা বলে দি।"

উষানাথ নিচু হয়ে মাথাটা মেয়ের মুখের কাছে আনলেন। মেয়ের জেদ্‌কে তিনি ভয় করতেন। "টপ করে বল্ কি বলবি। আফিসের দেরী হয়ে গেল।"

মেয়ে বাপের গলা জড়িয়ে ধরে কানে কানে কি বললে। বাপ তৎক্ষণাৎ রাজী—"আচ্ছা আচ্ছা, আজই নিয়ে আসব।"

সন্ধ্যার পরই সাড়ী এল। একখানি কমলা রঙএর ডুরে আর একখানি অদ্ভুত ছাপকাটা পাতলা কাপড়। বাড়ীতে হাসাহাসি পড়ে গেল। উষানাথ চা খাচ্ছেন। মা বললেন, "উষা, এবার মেয়ের একটি জামাইও খুঁজে পেতে আন্। অতবড় মেয়ে সাড়ী পরে ঘুরে বেড়াবে। আর ত ঘরে রাখা যায় না।"

বাপের কোলে মুখ লুকিয়ে মেয়ের সে কি হাসি। বাড়ী শুদ্ধ সব জব্দ, দেখলে ত সাড়ী এল কি না!

সেই থেকে সকাল বিকেল ফ্রকের উপর সাড়ী সেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোড়দি। সকালে মাষ্টারমশাই আসেন। সে সময় ফ্রক ভিন্ন উপায় নেই। মাষ্টার মশাই গেলেই ফ্রকের উপর সাড়ী উঠবে। তারপর রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বলবে, "ঠাকুমা, দাও কি কি কাজকম্ম আছে। ঝট্ করে সেরে ফেলি, আবার স্কুলের বেলা হয়ে যাবে ত।"

স্কুলে সাড়ী অচল। সুতরাং কতটুকু সময়ই বা বেচারা সাড়ী পরে ঘরকন্না করতে পায়?

কিন্তু মুস্কিল বাড়ীতে পদে পদে। সন্ধ্যায় গানের মাষ্টার আসেন সপ্তাহে তিন দিন। সে সময় যেখানেই থাকুক না কেন ঠিক উপস্থিত হবে। এসে ছোড়দির কোল ঘেঁসে বসে কপালের উপর নেমে আসা এক রাশ ঝাঁকড়া চুলের ভিতর দিয়ে জল জলে চোখে ছোড়দির আঙ্গুলগুলির দিকে চেয়ে থাকবে। হারমোনিয়ামের এক একটা রিড এক একটা আঙ্গুল দিয়ে টিপ্‌ছে ছোড়দি আর নানান রকমের আওয়াজ বেরুচ্ছে। একদিন হঠাৎ থপ্ করে গোল গোল হাত দু'খানি দিয়ে সজোরে চেপে ধরলে একসঙ্গে ছটা রিড। হারমোনিয়াম থেকে উৎকট আওয়াজ বেরুতে লাগল।

হৈ চৈ কাণ্ড বেধে গেল "ছাড়্ ছাড়্। ছাড়্ শীগগীর পাজী।" মাষ্টারমশাই হো হো করে হেসে উঠলেন। "বাঙলার ভবিষ্যৎ ফৈয়াজ খাঁ।"—হাত বাড়িয়ে তিনি কোলের উপর তুলে নিয়ে বসালেন।

"আচ্ছা এবার গাও ত মনিবাবু। ধর ত একখানা খাম্বাজ।" কুছ্ পরোয়া নেই। মাষ্টার-মশাইয়ের কোলে বসে ঘাড় উল্টে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে "কোন্ তা?"

মাষ্টারমশাই বলেন, "ধর না ধর একখানা। যেখানা তোমার খুশী।"

ধরবে? মুখ নীচু করে তৎক্ষণাৎ আরম্ভ করবে, "বল্‌লে দবা বল্"

বাড়ীশুদ্ধ হাসাহাসির ধুম পড়ে যায়। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মা হয়ত হাসবেন নিঃশব্দে। দালানে বসে ঠাকুমা সলতে পাকাতে পাকাতে হা হা করে হেসে উঠবেন। শেষে ছোড়দা উঠে আসবে পড়ার ঘর থেকে। এসেই এক ধমক "উঠে আয় বলছি ষ্টুপিড্, কালোয়াতী করতে বসল!"

কে ওঠে? কোনদিন আরও চেপে বসে মাষ্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করবে "আল্ একতা?"

ছোড়দা তখন বার করবে একটা কাগজে মোড়া টফি পকেট থেকে। "দরকার নেই আর একটায়। উঠে আয়, এই দ্যাখ্।"

একান্ত অনিচ্ছায় উঠে যাবে টলতে টলতে। লাল কাগজে মোড়া টফিটা সঙ্গীতের চেয়ে কম মিষ্টি নয়।

স্কুল থেকে প্রাইজ নিয়ে এসেছে কুমারী সাবিত্রী মুখোপাধ্যায়ঃ বই, বোনার সাজসরঞ্জামের একটা বাক্স, ছবির একখানা এলবাম, আরও কত কি। ক্লাশে উঠেছে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ছবি আঁকার জন্য প্রাইজ পেয়েছে, আবৃত্তির জন্য পেয়েছে। বইগুলি সব দু'হাতে বুকে চেপে ধরে এনে ফেললে ঘরের মেঝেতে ঠাকুমার সামনে স্তূপাকার করে।

"দেখ ঠাকুমা দেখ, ছবিগুলো সব দেখ। কি রকম সব সুন্দর সুন্দর ছবি।" মা ঠাকুমা সবাই ঝুঁকে পড়লেন।

চুপ করে ঢুকল একটা ফাঁক দিয়ে। ঢুকে ধপ করে বসে পড়ল বইটইগুলোর ওপর। হা হা করে উঠল সবাই।

কিন্তু ছোড়দির কোনও বিকার নেই সব নষ্ট হোল বলে। জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিলে ভাইকে। কাদায় ধূলোয় ভাল ফ্রকটা যা তা হয়ে গেল। সে দিকেও ভ্রূক্ষেপ নেই। ভাইকে আদর হচ্ছে, "সব মনিবাবুর, সব আমাদের মনিবাবুর। জানলে মা, বড় হয়ে মনিবাবু কত সব প্রাইজ আনবে গান গেয়ে গেয়ে। দুষ্টু আমার লক্ষী আমার" বলে মুখের উপর চুমার পর চুমা। নাচতে নাচতে চলে গেল কাদা ধূলো মাখা ভাইকে কোলে তুলে নিয়ে। ঠাকুমা চেঁচিয়ে উঠলেন, "দুধটা খেয়ে যা সাবি।" কে শোনে কার কথা, ততক্ষণে ভাইবোন সামনের পার্কে পৌঁছে গেছে।

এতকাল বাইরের ঘরের এক কোণে দাঁড় করান থাকত সাইকেলখানা। ওটাতে এখন আর বড় একটা কেউ চড়ে না। কে চড়বে? থার্ড ইয়ারে উঠে এ বাড়ীর বড় ছেলে সুধামাধব চিত্তরঞ্জনে গিয়ে ঢুকল। সাইকেলখানা তার কলেজে যাবার জন্য কেনা হয়েছিল। এখন পড়ে আছে। যিনি এ বাড়ীর ছোড়দা তাঁর এখনও সিটে বসে প্যাডেলে পা পৌঁছায় না। তা না পৌঁছাক, তবু কাত হয়ে দাঁড়িয়ে প্যাডেল করতে করতে হিল্লী দিল্লী মেরে আসে বেণীমাধব। কিন্তু বাড়ীর ছোটবাবু অর্থাৎ মনিবাবুর ভয়ে এখন সাইকেলখানা চেনে বেঁধে কড়িকাঠের সঙ্গে টাঙিয়ে রাখতে হয়েছে। সকলের অলক্ষ্যে দেওয়াল ধরে ধরে গিয়ে ঘরে ঢুকে থেবড়ে বসে বন্ বন্ করে প্যাডেল ঘোরাতে লাগল। ক্যারর ক্যারর শব্দ হবে তাই শুনে স্ফূর্ত্তি দেখে কে। হা হা করে হেসে হাততালি দিয়ে উঠবে। একদিন ত সাইকেলখানা ঘাড়ে পড়েছিল আর একটু হলে! ভাগ্যি পাশের একখানা চেয়ারে ঠেকে গিয়ে আট্‌কে যায়। নয়ত কি যে হোত সেদিন। সেই থেকেই সাইকেল চেনে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতে হয়েছে।

এমনই সব ব্যাপার চলছে সারাদিন বাড়ীতে। গেল গেল শব্দ চারিদিকে। যতক্ষণ না ঘুমাবে ছেলে।

ছোড়দি নাম দিয়েছে রঘুডাকাত, ছোড়দা ডাকে এই ষ্টুপিড্ বলে। ঠাকুমা নাম রেখেছেন মনি, মা ডাকেন খোকন। বাবা বলেন "এই পাজী"।

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এক মাথা চুল। এই মাত্র আঁচড়ে পাট করে দেওয়া হো'ল, চক্ষু না পালটাতে কে কে সেই। সমস্ত চুল এসে কপাল ছাপিয়ে মুখের উপর ঢেউ খেলছে, দৃকপাৎ করবার ফুরসৎ নেই সেদিকে।

ভোর হোতে না হোতেই পিছু হেঁটে চার হাতে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেবে আসবে নিচে। এসে ঠাকুমার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে সুরু করবে "থাক্-মা, ও থাক্-মা!"

সাবিত্রী ঠাকুমার কাছে শোয়। ঘুম ভাঙলেও কান খাড়া পড়ে থাকবে বিছানায় যতক্ষণ না ছোট ভাইটি এসে ডাকছে "থাক্ মা ও থাক্ মা" তারপর "খোলদি খোলদি" বলতে বলতে ছোট হাত দুখানি চাবড়াতে থাকবে বন্ধ দরজার গায়ে।

লাফ মেরে ছোড়দি নেমে পড়বে বিছানা থেকে। দরজা খুলেই সামনে রঘুডাকাত। কোলে তুলে নিয়ে ছুটবে বাড়ীর পিছনের বাগানে। সকালে সর্ব্বাগ্রে বাগানে যাওয়া চাই। ফুলগাছগুলির মাঝে ঘুরতে ঘুরতে ভাইকে গান শোনাবে—

"শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি।"

শ্রীমান মনিমাধবের দিনের কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে ছোড়দির কোলে চড়েই। কি? না ঐ পাখীটাকে ধরে দাও এখুনি। ঐ যে সজনে গাছের ডালে লম্বা লেজ ঝুলিয়ে বসে আছে রামধনু রঙএর বড় পাখীটা, ঐ টাই চাই। জোর জুলুম লাগাবে কোল থেকে নামবার জন্যে। কিন্তু ছোড়দি অত কাঁচা মেয়ে নয়। নামিয়ে দিক, আর এই সকালের ঠাণ্ডাটা লাগুক খালি পায়ে। ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ী নিয়ে আসবে।

"চল বাড়ী যাই লক্ষীটি, তোমায় এখুনি একটা পাখী তৈরী করে দোব। সুন্দর সাদা তুলোর এই এতবড় পাখী।"

"না ঐ তে দাও"; কোলে বসে দুপা সজোরে চালাতে লাগল ছোড়দির সামনে পেছনে কিন্তু তা বলে এখন ছাড়লে চলবে না। চোখ মুখ ধুইয়ে দুধ খাইয়ে তবে ছাড়তে হবে। নয়ত পাজীকে আর ধরাই যাবে না।

কিন্তু মুস্কিলের কি আর শেষ আছে নাকি।

আজকাল কথাবার্তা এ বাড়ীতে সামলে সুমলে বলতে হয়। যা-শুনবে তাই বলে বসবে যার তার সামনে একরাশ থ আর ল বসিয়ে বসিয়ে।

পাঁচকড়ি ডাক্তারের ওষুধে ঠাকুমার বাতের ব্যথার বিন্দুমাত্র উপশম হয় নি। ডাক্তার আবার বলছে ইন্‌জেক্‌সন দেবে। সেই কথাই হচ্ছিল। ঠাকুমা বললেন "দেখ বৌমা ঐ হাবাতে ডাক্তারটা এলে বোল যে কাজ নেই তার আমার চিকিৎসা করে। শিশি শিশি তেতো বিষ গেলালে। রোগী ত যে কে সেই বরং টন্‌টনানিটা আরও বিষগুণ বেড়ে গেছে। আবার বলে কি না ইনজেকসন দেবে। ঝাড়ু মার ওর ইনজেকসনের মাথায়।"

ডান হাতের সবকটা আঙ্গুল মুখে পুরে বসেছিল ঠাকুমার কোলে মনিবাবু। মাথা ঘুরিয়ে ঠাকুমার মুখের দিকে চেয়ে শুনে রাখলে সব কথা।

দু'ঘণ্টা পরে ডাক্তার এল। ঠাকুমা বললেন, "ছেড়ে দাও ডাক্তার আমায়। তোমার ওষুধ ইনজেকসন সব মাথায় থাক। আমার আর চিকিৎসা করে কাজ নেই।"

কোথায় ছিল, কখন চুপি চুপি এসে ডাক্তারের পিছনে দাঁড়িয়েছে, সজোরে বলে উঠল, "জালু মালি ওল মাথায়" ইনজেকসন কথাটি বাহুল্য বোধে স্রেফ বাদ দিলে।

ঠাকুমা হাত বাড়িয়ে ধরে মুখ চেপে ধরলেন। মা এসে গালে ছোট্ট একটি চড় বসিয়ে দিলেন, "হতভাগা পাজী, যা মুখে আসে তাই বলে।"

ডাক্তার অবশ্য কিছুই বুঝলেন না। ইনজেকসনের বাক্স গুছিয়ে নিয়ে চলে গেলেন।

সন্ধ্যার পর ঊষানাথ চা খেতে বসেছেন। বসে আছে ঠিক—বাপের কোলের উপর চেপে। প্রতি চামচ হালুয়া নিজের মুখে তুলে সঙ্গে সঙ্গে সামান্য একটু চামচেয় করে মনিবাবুর মুখেও দেওয়া হচ্ছে। ঠাকুমা ডাক্তারের কথা সবিস্তারে বলতে বলতে হাসতে লাগলেন। হঠাৎ কি মনে উদয় হওয়ায় বাপের কোল থেকে মনিবাবু বলে উঠল, "জালু মালি ওল মাতায়" হো-হো শব্দে হাসির ধুম পড়ে গেল। তাতে অপ্রস্তুত হবার পাত্র নন মনিবাবু। ততক্ষণে খেবড়ে বসে ডিসখানা সামনে টেনে নিয়েছে। অল্প একটু চা ঢেলে দিতেই হবে।

সবচেয়ে বড় মুস্কিল বাধল বাড়ীতে। স্কুল থেকে সাঁতার শেখানো হচ্ছে। সাবিত্রী সাঁতার শিখছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে বললে: "শীত করছে।"

গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন ঠাকুমা, তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে মা মেয়ের কপালে হাত দিয়ে দেখলেন, তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। দৌড়ে এসে জাপটে ধরলে সাবিত্রীর রঘুডাকাত কিন্তু খোলদির মুখের দিকে চেয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। ছোড়দা ফুলগাছে জল দিচ্ছিল। সেখান থেকেই বললে "চট্‌করে শুয়ে পড় গিয়ে লেপের ভেতর ঢুকে। পিল আনছি এখনই ছুটো ডাক্তারখানা থেকে। দু মিনিটে সব ঠিক হো জায়েগা।"

দু মিনিটে নয়, দু দিনে নয়, দু সপ্তাহ পার হতে চলল, ঊষানাথ অফিসের ছুটি নিলেন। সুধামাধব চিত্তরঞ্জন থেকে চলে এসে সাইকেল নিয়ে ঘুরতে লাগল, ডাক্তার বরফ ইনজেকসন ওষুধ। বেণীমাধব আইসব্যাগ ধরে ঠায় বসে রইল বোনটির মাথার কাছে। ঠাকুমা উপোস দিতে লাগলেন। রাত জেগে জেগে মায়ের চোখের কোলে কালি পড়ে গেল। জ্বর চার পর্য্যন্ত ওঠে কিন্তু নামবার বেলা দুইয়ের নিচে কিছুতেই নামে না।

জ্বরের ঘোরে সাবিত্রী বিড় বিড় করে বকতে থাকে, "কি ডাকাত ছেলে রে বাবা, এখনই এক কাণ্ড বাধিয়েছিল আর কি।" কখনও বা চোখ বুজে চেঁচিয়ে ওঠে "গেল গেল ধর্ ধর্ পড়ল রে" আবার কখনও আস্তে আস্তে বলতে থাকে "পাখী নিবি ভাই। আচ্ছা চল্ দিচ্ছি—এখুনি তোকে একটা পাখী বানিয়ে।"

ডাক্তারের নিষেধ। জ্বরটা খারাপ জাতের, অতটুকু ছেলেকে যেন এ ঘরে আসতে দেওয়া না হয়।

না আসতে দিয়ে রাখাও দুঃসাধ্য। মাথা খুঁড়ে মুঠো মুঠো চুল ছিঁড়ে চেঁচিয়ে কঁকিয়ে হাত পা ছুঁড়ে অস্থির কাণ্ড বাধাচ্ছে। ঢুকবেই সেই ঘরে। নয়ত দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাক ছেড়ে কান্না জুড়ে দেবে, "খোলদি-ও খোলদি-খোলদি লে।"

আজ বাইশ দিন। রাত্রে জ্বর ছেড়ে গেছে সাবিত্রীর। অঘোরে ঘুমাচ্ছে সে। মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে, কাত হয়ে পড়ে আছে বিছানার সাথে মিশে। বেণীমাধব একবার সকালে এসে দেখে গেছে। না আজ আর আইসব্যাগ দিতে হবে না। সে বেরিয়েছে ক্লাশের ছেলেদের কাছ থেকে স্কুলের খোঁজ খবর নিতে। আজ পনেরো দিনের বেশী স্কুল কামাই হয়েছে।

সুধামাধব ডাক্তারের বাড়ী গেছে রিপোর্ট দিতে। মা কলতলায় কাপড় চোপড়গুলোয় সাবান দিচ্ছেন। ঠাকুমা কালীবাড়ী গেছেন চরণামৃত আনতে। ঊষানাথ উপরে দাড়ি কামাচ্ছেন আজ আফিসে বেরুবেন।

চুপি চুপি পা টিপে টিপে এসে ভেজান দরজাটা ঠেলে ঠাকুমার ঘরে ঢুকল মনি। ভিতরটা অন্ধকার। ভয় পেয়ে গেছে। চাপা গলায় ডাকল "খোলদি ও খোলদি।"

চমকে উঠল সাবিত্রী। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, হাঁ—এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মাঝখানে। ছোড়দি যে কোথায় আছে ঠিক করতে পারছে না। কাউকে দেখতে না পেয়ে ঘাবড়ে গেছে।

বহুকষ্টে একখানা হাত বাড়িয়ে ছোড়দি ক্ষীণকণ্ঠে বললে, "আয়।" খাটের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছোট্ট দু'হাতের মুঠিতে চেপে ধরলে। খাটের পাশে ছিল একখানা জলচৌকী পাতা। তার উপর উঠে দাঁড়াল। তারপর বহুকষ্টে ঝুলতে ঝুলতে উঠল খাটের উপর।

ছোড়দি চুপি চুপি বললে, "এ পাশে এসে শুয়ে পড়।" ছোড়দির পায়ের উপর দিয়ে ওপাশে গিয়ে কাঁথার তলায় লুকিয়ে শুয়ে পড়ল ছোড়দির বুক ঘেঁষে। ছোড়দি আবার চোখ বুজলে এবং ঘুমিয়েও পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

সমস্ত বাড়ী থম্ থম্ করছে। পাতি পাতি করে খোঁজা হচ্ছে ঘর, রান্নাঘর, বাথরূম, ঠাকুমার ঠাকুর ঘর, ছাত, বাগান এমন কি বাড়ীর সবকটা খাট চৌকীর নিচে পর্য্যন্ত।

পাছে সাবিত্রীর ঘুম ভেঙ্গে যায় এজন্যে চুপি চুপি সব হচ্ছে। ঊষানাথের আফিস যাওয়া মাথায় উঠল। সুধামাধবের কপালের শির খাড়া হয়ে উঠল। বেণীমাধব দু পাশের সব বাড়ীতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছে "আমাদের মনি এসেছে?"

নিঃশব্দে মাথা খুঁড়ছেন মা, কপালটা ফুলে উঠেছে। থানায় সংবাদ দিতে যাবার জন্য সুধামাধব তৈরী।

ঠাকুমা পুজো দিয়ে ফিরলেন। সাহস করে কেউ তাঁর সামনে গেল না। ঊষানাথ মার সামনে থেমে গেলেন। গলা দিয়ে তাঁর শব্দ বেরুল না।

"কি গো বাড়ীশুদ্ধ সব অমন চুপচাপ কেন?" বলতে বলতে তিনি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁর হাতে ফুল চরণামৃত। সাবিত্রী তাঁর বিছানাতেই শুয়ে আছে কি না। ঘর অন্ধকার। খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে তিনি নিচু হয়ে সাবিত্রীর কপালে ফুল বেলপাতা ছোঁয়ালেন। ছুঁইয়ে কাঁথার ভিতর হাত ঢুকিয়ে সাবিত্রীর বুকে ফুল বেলপাতা ছোঁয়াতে গিয়ে চমকে উঠলেন: "এ কি? কে এখানে?"

ততক্ষণে সবাই দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

"বৌমা ও বৌমা শীগগীর এস এধারে। এ পাজীটাকে এখানে এনে শুইয়েছ কেন? অতবড় অসুখ তোমাদের একটু আক্কেল নেই?"

হুড়মুড় করে সবাই ঘরের ভেতর ঢুকল। আস্তে আস্তে কাঁথাখানা সরাতে দেখা গেল, ছোড়দির গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে এই অসময়ে অগাধে ঘুমাচ্ছে ছোড়দির রঘুডাকাত। তিন সপ্তাহের জ্বরে সাবিত্রীর শুকনো মুখখানি পরম তৃপ্তিতে উজ্জ্বল। সেও অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

আতস

তপন দাশ

টেলিফোনে খবরটা পেয়েই জ্যোতি তাড়াতাড়ি খাতাপত্তর খোলা মেলা রেখেই দৌড়লো। ফোন করছিলো শ্রীলা। জ্যোতির সেজো বোন।—'কে দাদা? কী যে মুস্কল! ফোনে এত্‌... লাইন পাওয়া আজকাল সমস্যার ব্যাপার! হ্যাঁ, যে জন্য তোমাকে টেলিফোন – তুমি অফিসে বেরিয়ে যাবার ঘন্টা খানেক পর থেকেই বৌদি যেন কেমন হ'য়ে গিয়েছিলো। আগের মতোই সবাই ভেবেছিলে ও কিছু নয়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন হ'লো যে তোমাকে খবরটা না দিয়ে পারলুম না। তুমি এক্ষুনি চলে এসো. বৌদির আবার—'

বৌদির আবার? তারপর!

লাইনটা হঠাৎ ডিস্কানেক্ট হ'য়ে গেলো।

জ্যোতি রিসিভারটা রেখে দিয়েই পাশের রায়চৌধুরীকে বললো, 'আমি চললুম ভাই; এটা ম্যানেজ কোরো।'

শ্রীলা কান্না-কাঁপা গলায় বললো, 'দাদা, এবার বোধ হয় সত্যিই রাঙা-বৌদিকে হারাতে চললুম!' জ্যোতি চুপ ক'রে থাকলো অনেকক্ষণ। কথা বললোনা কোন। বেশ কিছুক্ষণ শ্রীলার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ম্লান হেসে কেবল বললো—'বোকা মেয়ে।'

অফিসের জামা-কাপড় না বদলেই জ্যোতি সুভদ্রার ঘরে ঢুকেছিলো। সাদা পাথরের মতো সুভদ্রার রোগজীর্ণ দেহটা বিছানার সঙ্গে প্রায় মিশে আছে। একজোড়া ঘোলাটে চোখের তারা কোটরের মধ্যে লুকিয়েছে। সরু সরু পল্‌কা দুটো হাত, যা এখনো আল্‌তো নড়েচড়ে ... ফিনফিনে কাগজের মতো ঠোঁট, যা এখন প্রায় শুনতে না পাওয়া ক্ষীণ ফিস্ ফিস্ কথা বলে ... খুব কাছে কান পাতলে তবে শোনা যায়। মনে হয়না যে এখনো বেঁচে আছে, মনে হয় সুভদ্রা বুঝি মরে গেছে একশো বছর আগে; যা আছে তা সুভদ্রার ম্যমি।

জ্যোতি যখন ঘরে ঢুকেছিলো—সুভদ্রার কোটরে অদৃশ্য হওয়া চোখ দেখে নিয়েছিলো জ্যোতিকে। পল্‌কা হাত একটু নড়লো। শ্রীলা এসেছিলো পেছন পেছন। জ্যোতি সুভদ্রার মাথার কাছে বসতে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সুভদ্রার মাথার কাছে ব'সে কী আর কাজ জ্যোতির! শুধু ব'সে বসে সুভদ্রার রুক্ষ চুল হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রতে থাক্‌লো। ভাবতে চেষ্টা ক'রলো এক্ষেত্রে কী তার করা উচিত। কী কথা সে বলবে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে। এমন কথা যার কোন মানে থাকবে না, যা শুধু বলার জন্যই কথা বলা। কিন্তু সুভদ্রার রোগ-ঝল্‌সানো মুখখানাই কেবল মস্ত বড়ো হ'য়ে ভেসে থাকলো ছবির মতো চোখের সুমুখে। জ্যোতি তবু কী কথা বলবে? কিছু নয়। সুভদ্রার মাথার কাছে ... এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা থেকে একটা ফুল নখ দিয়ে কেটে নিয়ে সুভদ্রার শুকনো মুখে বুলিয়ে দিতে ...

'ডাক্তারবাবু ব'লছেন, কিছুদিনের জন্যে তোমাকে বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে পারলেই তুমি আগের মতো সুস্থ হ'য়ে উঠবে। তাছাড়া তুমি ত' ভালো হ'য়েই উঠছো!'

সুভদ্রার পাতলা ঠোঁটে হাসির ভাঁজ পড়লো। যেন একঝলক ব্যঙ্গ বেদনার নির্যাস্ উঠে এলো সুভদ্রার ভেতর থেকে। আল্‌তো ন'ড়ে উঠলো সুভদ্রার ঠোঁট। জ্যোতি ঝুঁকে কান পাতলো সেখানে।

'ঠাকুরঝির সব তাতেই বাড়াবাড়ি! খবর পাঠিয়ে আন্‌লে ত' তোমায় এই দুপুর রোদ্দুরে! অথচ আমার কিচ্ছুটি হয়নি।'

'শ্রীলা মোটেই বাড়াবাড়ি করেনি।' সুভদ্রার একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে জ্যোতি বললো—'সুভো, আমারো যে ষোল আনা ইচ্ছে—এমনি ক'রে সব সময় তোমার কাছে থাকি!'

'মিথ্যে, সব মিথ্যে!' সুভদ্রা অভিমানে মুখ ফেরালো।

জ্যোতি ওর মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে বললো—'মিথ্যে নয় সুভো। মিথ্যে যে নয় তার কী প্রমাণ চাও বলো?'

সুভদ্রা মুখ ঘুরিয়ে থাকলো তবুও।

'অভিমান করোনা, লক্ষ্মীটি! যে কোন রকম উত্তেজনা আসা তোমার বেলায় এখন মারাত্মক ক্ষতিকর। ডাক্তারবাবু ব'লেছেন।'

অভিমানের উত্তাপ অনেকটা কমে যেতে সুভদ্রা বললো—'কী ভাগ্য তোমার! আমায় নিয়ে একদণ্ড তোমার জীবনে শান্তি এলোনা। কিছুই দিতে পারলুম না তোমাকে।' রোগ সুভদ্রার কান্নার শান্তিটুকুও শুষে নিয়েছে। শুধু গুটিকয় চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ হ'লো।

'তোমাকে পেয়েছি, এটাই কী কম শান্তি আমার জীবনে!'

'একটা কথা রাখবে আমার?' সুভদ্রার দুর্বল হাত দুখানা জ্যোতির সবল হাত মুঠোর মধ্যে ধরার চেষ্টা ক'রে মিনতি করলো।

'ব'লো, অসম্ভব না হ'লে নিশ্চয়ই রাখবো।'

'যদি না রাখো; মাথার দিব্যি রইলো!'

'আঃ কী সব ব'লতে সুরু ক'রলে আবার। ব'লেছি ত' রাখবো, রাখবো, রাখবো। হ'লো ত' এবার?'

'আমাকে ছুঁয়ে ব'লছো?'

'বেশ, তাই।'

'তবে শোন। যারা মরে বা মরতে চ'লেছে তারা আগে-ভাগে কিছুটা বুঝতে পারে। আমাকেও যেতে হবে। ন'গাড় ছ'মাস ধ'রে যমে মানুষে যে টানাটানি চ'লেছে তার অবসান হ'তে খুব দেরি নেই,—ওগো আমি জানি, সব বুঝি!'

জ্যোতি দু'হাত নিজের কানের ওপর চাপা দিয়ে ব'লে উঠলো 'চুপ করো, দোহাই তোমার সুভো, এসব আমি কিছুতেই শুনতে পারবো না। তুমি যদি না থামো তবে আমি—'

'তুমি, আমার কাছ থেকে পালাবে এই ত'?'

জ্যোতি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকালো সুভদ্রার মুখের দিকে। চোখের জল থুতনি দিয়ে গড়িয়ে সুভদ্রার মুখে প'ড়লো।

'কী বিশ্রী মেয়েলী স্বভাব তোমার! চোখের জল মোছো আগে। পুরুষ-মানুষকে কাঁদতে নেই।' সুভদ্রা বললো—'দেখ আমার দিকে, আমি হাসছি!'

জ্যোতি জোর ক'রে সুভদ্রার সঙ্গে মিশিয়ে হাসতে চেষ্টা ক'রলো। কান্না-হাসি-মেশা অদ্ভুত দেখালো জ্যোতির মুখ।

'যা বলছিলাম।' সুভদ্রা আবার আরম্ভ ক'রলো—'হয়তো আর বলার সময় পাবো না।'

জ্যোতি জোর ক'রে নিজের মনটাকে শক্ত ক'রতে চেষ্টা ক'রলো। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে কিছু সামান্য প্রলাপ বকে শান্তি পেতে চায়, তাকে আর সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত ক'রবে না সে। যদিও সে জানে সুভদ্রার প্রত্যেকটি কথা। সুভদ্রার মৃত্যুর দিকে এগোনোর প্রতিটি পদক্ষেপ তাকে প্রতি মূহূর্তে অশান্ত, পাগল ক'রে তুলবে। তবুও সুভদ্রা নেই—একথা ভাবতে তার মনে হয় পৃথিবীরও আয়ু বুঝি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু জ্যোতি জানে, সুভদ্রাকে সে ধ'রে রাখতে পারবে না—এমন কোন সঞ্জীবনী তার জানা নেই। সেকেণ্ডের সরু কাঁটার মতো সুভদ্রা এগোচ্ছে; হয়তো এমন একদিন আসবে যখন সুভদ্রা যে একদিন ছিলো তাও আর মনে হবে না। জ্যোতির মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ ক'রে উঠলো। সুভদ্রা এখনো আছে। এখনো তার অস্তিত্বের উষ্ণতা অনুভব করা যায়। সুভদ্রা তার সরু সাদা হাতে অনুভূতির সঞ্চার ক'রছে এখনো।

'মুখ ভার ক'রে কী ভাবছো অতো?'

'কিছু না, কী বলবে বলো এবার।'

'ঠাকুর ঝি হয়তো আড়ি পাতছে আড়ালে।'

জ্যোতি ব'ললো—'না, শ্রীলা এখন রান্নাঘরে।'

'ঠাকুরঝি-কে আমার বড়ো ভয়, ভীষণ অভিমানী ও। এসব কথা ওর শোনা উচিত নয়। ও আমাকে খুব ভালোবাসে—ভক্তি ক'রে তার চেয়েও বেশি। অথচ মজা কী জানো আর কেউ একটী বারের জন্যেও আমার কছে আসেনা, যেদিন থেকে আমার অসুখের খবরটা জানাজানি হ'য়ে গেল। সবারই যেন আড়োআড়ো ছাড়োছাড়ো ভাব। কিন্তু শ্রীলা ঠাকুর ঝি একবারের জন্যেও আমাকে এড়িয়ে চলেনি। যখন তুমি থাকোনা, তখন শ্রীলাই ত' থাকে আমার কাছে সব সময়। (সুভদ্রা একটু থেমে বললো) কিন্তু আজ বলছি-শ্রীলা ঠাকুরঝিও যেন আমার কাছে না আসে আর তুমিও।'

সুভদ্রা থামতেই জ্যোতি ব'ললো—'এখন বেলা ঠিক সাড়ে তিনটে, তোমার ওষুধ খাবার সময় হ'য়েছে।'

ওষুধের ছোট গ্লাসটা মুখের কাছে আনতেই সুভদ্রা বাধা দিলো দুর্ব্বল হাতে।

'ও আর লাগবে না—রেখে দাও।'

'না, না, ওসব কথা নয়; এখানে টুক্ ক'রে এটুকু খেয়ে ফেলো!' জ্যোতি জোর ক'রলো।

'আমাকে কচি-বয়েসের মেয়ে পেয়েছো নাকি। ওষুধ আমি খাবোনা, অমর হওয়ার ওষুধ এনে দিলেও না।'

জ্যোতি সুভদ্রার এই একগুঁয়েপনাকে ভালোরকমই জানে।

ওষুধের গ্লাসটা তাই নামিয়ে রেখে জ্যোতি ব'ললো—'এসব বড্ডো বেয়াড়া লাগে আমার।'

'লাগে লাগুক, শুধু মিছিমিছি কেন আর লোক দেখানো এ্যাতো বাড়াবাড়ি করো। মস্ত বড়ো একশো টাকা ভাড়ার ডাক্তার। তিনশো টাকা দামের ওষধের প্রেসক্রিপসন্ লেখে শুধু অকারণ। অসুখটা আমার। আমি জানি কী হবে!'

'কী হবে! জানো তুমি?'

'মরবো! বাস্ আর কী।'

'আমি চললাম, তুমি যখন তোমার কাছ থেকে তাড়াতেই চাও!' জ্যোতি উঠে পড়লো—'শ্রীলা কে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'কেন মিথ্যে আমার ওপর রাগ ক'রছো! তুমি কী বোঝো না যে সারা পরিবার আমাকে নিয়ে আজ ছ'মাস ধরে নাগাড়ে কী অসম্ভব বিব্রত হ'য়ে প'ড়ছে। আমি বিছানা থেকেও সব কিছু টের পাই। তাই ত' চাই যতো তাড়াতাড়ি পারি তোমাদের সব দুর্ভোগ থেকে রেহাই দিয়ে যেতে।'

'সুভো এসব অসহ্য কথা আমায় ব'লে কেন শাস্তি দিচ্ছি? তুমি যে দুর্ভোগ সৃষ্টি ক'রেছো তা কেমন ক'রে ভাবতে পারলে!'

'তুমি কী বোকা! কিছু বোঝো না তুমি।'

'বেশ নাই বুঝলাম। এই দুর্বল শরীরে যা-তা এলোমেলো ভাবনা ভাবা তোমার পক্ষে যে কোন মতেই উচিত হচ্ছে না; তা কেমন ক'রে বোঝা'বো। এখন চুপটি ক'রে ঘুমানোই দরকার।'

'চিরকালের মতোই যাতে ঘুমোতে পারি তারই চেষ্টা ক'রবো। দেখো, আবার ভাঙানোর চেষ্টা কোরোনা আমার ঘুম।' সুভদ্রার শুক্নো পাংশু মুখটা হাসতে গিয়ে বড্ডো বেশি ক্লান্ত মনে হ'লো।

জ্যোতি বেরিয়ে গেল পরদা সরিয়ে, পেছন থেকে সুভদ্রার তার অতি ক্ষীণ গলায় বললো—'কাছাকাছি থোকো, ডাকলেই যেন পাই।'

জ্যোতি বেরোতেই শ্রীলা ডাকলো—'আমার ঘরে এসো, কথা আছে।'

'কী কথা রে?'

'অফিস থেকে ফিরে কিছু মুখে দিয়েছো?'

'না, আমার ত' ক্ষিদে পায়নি।'

'না পাক, তবুও খালি পেটে অসুখের বিছানায় থাকতে নেই!'

শ্রীলার কথায় জ্যোতি হো হো ক'রে হেসে উঠলো, 'নারে সে ভয় নেই। আমি সম্পূর্ণ রোগ-প্রুফ হয়ে' গেছি। এই তোর কথা?'

'হ্যাঁ, তাই বলছিলাম যে তুমি অতো বেশিক্ষণ বৌদির ঘরে থেকোনা।'

'তোর কথা না হয় মানলাম, তোর বৌদির রোগটাও যে ভালো নয় তাও জানি—কিন্তু—'

এই সময় মা ঢুকলেন ঘরে।

'তোরা দুজনের আছিস্ দেখছি। যাক্ ভালোই হ'লো, একটা পরামর্শ ছিলো তোদের সঙ্গে!'

কথাটা মা জ্যোতিকেই বললেন বিশেষ ক'রে—'বৌমার অসুখটা অন্য কিছু হ'লে কথা ছিলোনা।

বাড়ীতে আরো সব ছেলে-মেয়েরা,—তাই বলছিলাম কী; বৌমাকে বরং কোন একটা ভালো স্যানিটোরিয়ামে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে মন্দ হতোনা।'

শ্রীলাও মা'র কথায় সায় দিলো—'মা যা বলছেন, সেই ভালো দাদা।'

শ্রীলার বলার ভঙ্গীতে জ্যোতির হাসি পেলো। একটু আগের সুভদ্রার কথাগুলো মনে পড়লো। তারপর মুখের চোয়াল শক্ত ক'রে জ্যোতি বললো—'তোমরা যা বলতে চাও সে ব্যবস্থাই হবে।'

শ্রীলা কী যেন একটা বলতে গেল। ততক্ষণে জ্যোতি ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

'দাদার কপালে এখনো অনেক দুর্ভোগ আছে মা।' শ্রীলা মাকে বললো।

শ্রীলার কথাটা শেষ না হ'তেই টেলিফোনটা বেজে উঠলো। রিসিভারটা তুলে নিলো শ্রীলা।

'হ্যালো। কে? ও, অমিতা বুঝি?'

অপর প্রান্ত সাড়া দিলো—'হ্যাঁ, আমি, কিন্তু জ্যোতির খবর কী? দু'খানা চিঠি লিখেও কোন জবাব পাইনি ওর কাছ থেকে।

শ্রীলা জবাব দিলো—'সেটা তোমার ভাগ্য!'

'তোমার রাঙা বৌদির অবস্থা কী?'

'সেই একরকম। মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে, নড়তে চাইছে না মোটে।'

অপর প্রান্ত ব্যঙ্গ মিশিয়ে বললো—'বহুকালের সাধনার ফল পেয়ে কী কেউ সহজে ছাড়তে পারে।'

'সাধনা ত' তুমিও কম করোনি!'

অপর প্রান্তের দীর্ঘশ্বাস পড়লো। তারপর বললো—'আজ সন্ধ্যায় তোমাদের ওখানে যাবো; আশাকরি জ্যোতির দেখা ও সময়ে পেতে পারি?'

'খুব সম্ভব।' শ্রীলা রিসিভার রেখে দিলো।

ঠিক সময়েই জ্যোতি এসে পড়লো—'কে টেলিফোন করছিলো রে শ্রী?'

'অমিতা।'

'ও!' জ্যোতি একটা গম্ভীর শব্দ ক'রলো মাত্র।

সারিবদ্ধ সাতখানা মোটর গাড়ি বাড়ীর সুমুখে। সারা বাড়ীময় একটা এলোমেলো বাতাস। অনেক মানুষের নিঃশব্দ আনাগোনার আলোছায়া থমথমে আশঙ্কা! মাঝে মাঝে টেলিফোনে মর্মর কথা। আবার চুপ। ফিসফাস! খাপছাড়া!

সুভদ্রার অবস্থা নাকি ভালো নয়। কেউ যেন কারো কানে চুপিসারে বললো—'বোধহয় শেষ হ'য়ে গেছে।'

'না এখনো আছে। তবে দেরি নেই আর।'

'ডাক্তার রজনী সেন এসেছেন। মস্ত ডাক্তার!'

'কী বলেন?'

'ভগবানের হাত!'

সুভদ্রা নিস্পন্দ, অসাড়!

শ্রীলা নিঃশব্দ লঘুপায়ে একবার উঁকি মেরে দেখলো রাঙাবৌদির ঘরে।

সুভদ্রার মমির দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন ডাক্তারেরা। জ্যোতি প্রায় পাগলের মতো পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছে দালানে। এখন সে কী করবে। কী তার কর্ত্তব্য, কেউ তা ব'লে দিচ্ছে না। এরকম নিদারুণ অসহায়তার জ্বালা আগে সে কোনদিন অনুভব করেনি। সুভদ্রা চ'লে যাচ্ছে! হাজার রকম অভিমানের বোঝা তার কাঁধে চাপিয়ে চ'লে যাচ্ছে দিব্যি! জ্যোতি কেমন ক'রে পথ আগলাবে তার। কেমন ক'রে ঠেকাবে তার যাওয়া। কী দিয়ে বাধবে তাকে! কোন অমোঘ সঞ্জীবনীতে উজ্জীবিত ক'রে তুলবে তাকে ঠিক আগের মতো। হাজার হাতড়েও কেন পাচ্ছে না সে, সুভদ্রাকে যা দিয়ে সে বাঁধবে, তার প্রশস্ত নির্ভুল উপায়টুকু। জ্যোতি সুভদ্রার ঘরের সুমুখে এলো। বেশ ভালরকমই দেখা চলে বাইরে থেকে সুভদ্রাকে। উন্মত্তের মতো জ্যোতি চেষ্টা ক'রলো সুভদ্রার পাশে যেতে। দরজার সুমুখ থেকেই কে পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালো—'দাদা, এখন তোমার ভেতরে যেতে বারণ। ডাক্তারবাবুদের মানা।'

শ্রীলার মুখের দিকে তাকিয়েই জ্যোতি ডুকরে কেঁদে উঠলো—'ওকে তোরা যেতে দিস্‌নারে শ্রী। ওর যাওয়া তোরা বন্ধ ক'রে দে।'

জ্যোতিকে জোর ক'রে ধ'রে এনে শ্রীলা তার নিজের ঘরে বসালো—'একটু স্থির হও দাদা, পুরুষ মানুষের অতো উতলা হ'লে চলে না।'

অমিতা এসেছে। শ্রীলা ঘাড় তুলে ব'ললো, 'বোস।' জ্যোতি অমিতার দিকে চোখ মেলে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলো। কোন কথাই বললো না। অমিতা ইশারা ক'রলো শ্রীলাকে। জবাবে শ্রীলা সুভদ্রার ঘরের দিকে ইংগিত ক'রে মুখখানা ম্লান করলো। অর্থাৎ বলতে চাইলো—ইতি হ'তে আর খুব সময় নেই।

জ্যোতি মুখ নামিয়েই ছিলো। কোনদিকেই তাকাবার ইচ্ছে নেই তার। এমনি এমনি শুধু হাতের মুঠো পাকাচ্ছিলো শক্ত করে। যেন কিছু একটা ধ'রে রাখতে চায় প্রাণপণে তার শক্ত মুঠোর মধ্যে।

'একটু বোস্ ভাই। দাদার দিকে নজর রাখিস,—আমি আসছি!'

শ্রীলা বেরিয়ে গেল।

অমিতা স'রে এলো জ্যোতির পাশে।

'মন খারাপ করে কী আর করবে ব'লো!'

জ্যোতি চুপ।

এক মিনিট, দু'মিনিট করে সময় হামাগুড়ি দিয়ে চললো। প্রতিটি মিনিট যেন এক একটা যুগ বলে মনে হয়। জ্যোতির চোখ ঘড়ির ডায়ালে স্থির হ'ল শেষে। সারা কপাল জুড়ে অজস্র ঘামের বিন্দু মুক্তোর মতো টলমল ক'রছে। নিঃশ্বাস পড়ছে খুব আস্তে। হঠাৎ জ্যোতি দুটো চোখ বন্ধ ক'রে ফেললো। নিজের মনেই বলে উঠলো—'এই ভীষণ অন্ধকার! এ আমি কেমন ক'রে সইবো।' অমিতা জ্যোতির একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ব'ললো—'তুমি কী বলছো জ্যোতি!' তারপর ছোট্ট রুমালে জ্যোতির কপালের ঘাম মুছে দিলো। জ্যোতি নিশ্চল পাথর হ'য়ে গেছে যেন। অমিতার মনে হ'লো জ্যোতি বুঝি এক্ষুনি জ্ঞান হারাবে। মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে ডাকলো—'জ্যোতি?'

একটু পরে যখন শ্রীলা বারান্দায় এসে দাঁড়ালো চোখের পলক পড়ছে না। মাথার সব চুল এলোমেলো ভেঙে পড়েছে পিঠের ওপর। আঁচল খসে গিয়ে মেঝেয় লুটোচ্ছে। মনে হ'চ্ছে পায়ের নিচে সব শূন্য। চারদিকের দেওয়ালগুলো যেন ক্রমে স'রে আসছে তার দিকে। তাকে যেন চেপে গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে দেবে। বাতাস যেন বন্ধ হ'য়ে গেছে,—অক্সিজেনের অভাবে সে আর নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। শ্রীলা স্পষ্ট শুনতে পেলো,—অনেক জোড়া পায়ের শব্দ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। সব গাড়ীগুলো—বিকট শব্দ ক'রে উৎকট পেট্রোলের গন্ধ ছড়িয়ে চ'লে গেল। বারান্দায় শ্রীলা দেখলো,—অযত্নে টবে বসানো ডায়াস্থাসের চারাটা ম'রে গেছে আর তার ঠিক পাশেই জিনিয়া ফুটেছে গোটাকয়। সুভদ্রার শখ ছিলো ফুলের!

'আলো কই? আলো!' চিৎকার শুনতে পেয়ে শ্রীলা চমকে উঠলো। ছুটে এলো ঘরের মধ্যে।

ফ্লোরেসেণ্টে উদ্ভাসিত ঘরের মধ্যে জ্যোতি এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত হাতড়ে বেড়াচ্ছে—'আলো জ্বেলে দাও! এ অন্ধকার আমি সহ্য ক'রতে পারছিনা!'

অমিতা ফ্যালফ্যাল ক'রে শ্রীলার মুখের দিকে তাকালো।

"হেমন্তে ঘাসে নীল ফুল ফোটে
হৃদয় কেন যে কাঁপে
'ভালোবাসতাম'—স্মৃতি—অঙ্গার—পাপে
তর্কিত কেন রয়েছে বর্তমান।" জীবনানন্দ॥

কবি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমাদের কথা কেউ সব জেনে নিয়ে
তবু প্রমাণের খোঁজে খুঁড়ে খুঁড়ে চলে যায়
কথার ওপারে। তারপর ফিরে চেয়ে দেখে এই
জন-গণ-মন অলীক শব্দের জালে
কিভাবে জড়ান।

মাপা দিন, বাঁচার লাইন
পরিপাটি পাতা ব'লে গড়গড় অনায়াসে
চলে যায় বটে স্বচ্ছন্দ মসৃণ
বরাদ্দ মাফিক ক্ষুধা
মিটিয়ে উচ্ছিষ্ট অনুভবে;
কিন্তু আলগা মুহূর্ত্তও আচমকা কখনো কখনো
পায়ের নিচের মাটি সরিয়ে দেখায় ধু-ধু ধাঁধা
অতল বিহ্বল।

চিহ্নিত সে জন তাই কথার পিছনে উপনীত
হয়েও ফিরেই আসে আমাদের প্রাঙ্গনে প্রান্তরে,
সেধে নিয়ে দায়
শব্দের খোলস খুলে অকপট খুঁজে খুঁজে ফেরে
অবিকল অনির্বচনীয়।

আমাদের নাম ধাম সব পরিচয়
তার চোখে পড়ি যদি
দুঃসহ সে বিদ্যুৎ-বিস্ময়।

সাংস্কৃতিকী

"ভারতীয় লিপি"

সম্প্রতি 'ইণ্ডিয়ান সিন্থেথিস' শিরোনামের একটি ইংরেজি প্রবন্ধে ভাষা ও শব্দশাস্ত্রের ভাষ্যকার
শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃতভাষার দেবনাগর লিপির একটি সন ধার্য্য করেছেন। মহর্ষি
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও দেবকীপুত্র কৃষ্ণের ও মহাভারতের যুদ্ধকালের সমসাময়িক বলে তাঁর ধারনা। এ-সম্পর্কে
তিনি সিন্ধুনাগসভ্যতার ব্রাহ্মীলিপির সঙ্গে দেবনাগর বর্ণের উদয়ের কথা-ও উল্লেখ করেছেন! সিন্ধুব্রাহ্মী
চৈনিক বা বোডো শঙ্গ-পশু চিত্রলিপি থেকে আগত (২০০০ খ্রীঃপূঃ)। যে ব্রাহ্মী পংক্তিতে দেবনাগর বর্ণ
মিশ্রণ পাওয়া যায়, সেখানে বঙ্গ-বর্ণও মিশ্রিত। যে পংক্তিতে ব্রাহ্মী 'ট' দেবনাগর 'র' আকার ধারণ
করেছে, সেখানে বঙ্গ 'স্' লিপি ও 'ঠঁ'-লিপি স্পষ্টত বিদ্যমান।

এ-কথা বলা বাহুল্য যে যদুই হোক আর তুর্বসই (গাঙ্গেয় তুর্বসু) হোক এঁরা শ্রীকৃষ্ণের
পূর্ব্বপুরুষ। সুতরাং বঙ্গ-দেবনাগর-চৈনিকশঙ্গ বর্ণের পংক্তি বৈদিক যুগের মিশ্রিত লিপিময় বলে সনাক্ত
করাই উচিত। ভারত রাষ্ট্রলিপি মৌর্য্য আমলে পুরোপুরি ব্রাহ্মী ভঙ্গী নেয়। তেমন ব্রাহ্মীবর্ণ শ্রী
শুঙ্গ-লিপিতে, আইঅনিয়ান (যোন) বর্ণে, আবু'সম্বেল লিপিতে, মোঅবাইট-প্রস্তরলিপিতে আছে।
ইরাণী কুফিক-লিপি-ও ব্রাহ্মী ভঙ্গীর বর্ণাকীর্ণ। 'লিপি' কথাটি ইরাণী। মৌর্য্য অশোকের পিতামহী
মাতা ছিলেন 'ইরাণী' আর পিতা ছিলেন 'যোন'।

জীবনানন্দ দাশ

এ অনুমান একটি উজ্জ্বল সত্য যে কাব্য-জ্ঞান না থাকলে মানব জাতির অতীত ইতিহাসে
সার্ব্বভৌমিকতা উপলব্ধিতে আসেনা। কাব্য-বোধ বিচারের সঙ্গে সমন্বিত হলে যে কাব্য-চেতনার স্ব
দেয় কোবিদ-হৃদয়ে, সেখানে দেশের সীমান্ত-রেখা ক্রমলীন হতে সুরু করে। কবি তখন মানবিক আদি
সত্যের বৃত্তে উপনীত হন। ইতিহাস সত্যের আলোতে পাখা মেলে দেয়।

এমন একটি কবি চেতনার মৃত্যু হল জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুতে। এ-যেন বাংলাদেশের কাব্য
হৃদয় থেকে খানিকটা বিদিশার বিদেশী মহাভারতের আলোর অন্তর্ধান। আবার কার ধ্যানে রবীন্দ্রোত্তর
বাংলা কবিতায় ততোটুকু সৎ ও মহৎ আলো দেখা দেবে জানিনে। শুধু আলো নয়, আলোর কারুকার্য
আলেয়া হলেও যার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করে তেমন কিছুইত কবিতা—সেই কবিতা রচনা করবার মন-প্রা
বুদ্ধি-হৃদয় জীনানন্দের মতো অপর কেউ ভারতবর্ষে সাম্প্রতিক কালে বহন করেছেন কি না সন্দেহ। এ
কৃতিত্বের দরুণই তিনি ঈর্ষা, অনাদর ও সৌহার্দ্য ভোগ করে গেছেন। সবই মহৎ কবির ভাগ্য ও ভো
দুর্ভোগ যদি সৃষ্টির গায়ে না লেগে থাকে তাহলে শিল্পী স্রষ্টা নাম অর্জ্জন করতে পারেন না।

হেনরি মাতিশ

ছবির গায়ে আবেগ-লেপনের কাব্য-ভাবটি প্রখ্যাত শিল্পী হেনরি মাতিশ উরোপায় কথায় ও কাজে প্রচার করেছিলেন। সম্প্রতি ৮৫ বৎসর বয়েসে এই যশস্বী চিত্রশিল্পীর মৃত্যু হয়েছে। দূর-প্রাচ্য ও নিকট-প্রাচ্যের অতীত শিল্প-কলার উপর একটি সুদৃঢ় আস্থা স্থাপন করে তিনি তদানীন্তন সেজান পদ্ধতিকে বর্জ্জন করেছিলেন। রঙের বিকট উল্লাসকে বর্জ্জন করে শান্ত-সমাহিত বর্ণবিন্যাসে তিনি চকিত-দৃষ্টির বস্তুজগৎকে তাঁর শিল্পকলায় প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। চকিতহরিণপ্রেক্ষণের দরুণ তিনি 'আরণ্যক' উপাধি লাভ করেছিলেন ইম্প্রেশ্যনিষ্টদের মতোই। গগ্যাঁর শিষ্য তাঁকে বলা যায়, যিনি নিগ্রোজীবনের রূপে আকৃষ্ট ছিলেন। নিগ্রোজীবন ছেড়ে মালয়ের যাভার ইন্দোচীনের জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছিল মাতিশের ভাবাবেগ। উরোপার শিল্পী-মন যখনই অতীতের দিকে তাকাতে চায়, তখনই আফ্রিকার-এশিয়ার সুদূর অতীতের সঙ্গে আত্মীয়তা খুঁজে পায়। কিন্তু ভারতীয় শিল্পীদের দেখতে পাই বিপরীত অবস্থায় দুর্ভোগ। তার কারণ ভারতীয় শিল্পীরা কাব্য-ইতিহাস অধ্যয়ন ছেড়ে দিয়েছেন এবং ভ্রমণের সুযোগ থেকে অর্থানটনের দরুণ বঞ্চিত। তবু বলব, মাতিশের মতো প্রখ্যাত শিল্পীর প্রাচ্যানুরাগ দর্শনে ভারতীয় শিল্পীরা হয়ত প্রাচ্যের শিল্পরত্ন উদ্ধারে মেতে উঠে পারতেন 'ফভ্' বা আরণ্যক-আন্দোলনের সমসাময়িক কালেই (১৯১৪ সন)।

দূর প্রাচ্য-শিল্পকলার কেন্দ্র প্রাচীন সিংহল ও সিঙ্গাপুর প্রাচীন বাঙালী-জাতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত মহাশয় সিংহল-শিল্পকলা সম্পর্কে যে পুস্তিকাটি রচনা করেছেন তা আমাদের শিল্পজ্ঞানকে স্বপ্রতিষ্ঠ করবার সহায়তা করে। মণীন্দ্রভূষণও দক্ষ শিল্পী কিন্তু তিনি মাতিশের মতো একটি শিল্প-আন্দোলনে বাঙালীর চিত্রশিল্প নিয়ন্ত্রিত করতে সমর্থ হননি।

শিল্প ঐতিহ্যগ্রাহী সন্দেহ নেই কিন্তু অন্ধ ঐতিহ্য-মোহ শিল্পের জীবনের পক্ষে মারাত্মক। আমাদের দেশে এই মোহ বিরাজিত বলেই পিকাসো-মাতিশের মতো শিল্প-স্রষ্টার যুগ্ম-আবির্ভাব অকল্পনীয় ও বিপ্লবী স্রষ্টা দুষ্প্রাপ্য।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

সাংবাদিকতা যে সাহিত্যের অনাত্মীয় নয় এ-কথা বুঝবার সুযোগ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারই আমাদের বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় দান করেছিলেন। উরোপীয় সাংবাদিকতায় সাহিত্য-স্বভাব ম্লান হতে সুরু করে সম্ভবত বোদলেয়ারের সমসাময়িক কালে, যখন তিনি এ-বস্তুটিকে অস্পৃশ্য বলে অভিহিত করেছিলেন। ইদানীং ইয়াঙ্কী সাংবাদিকতা সাহিত্য-স্বভাবে ফিরে আসছে দেখা যায়। অতএব আমরা ৺সত্যেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব স্মরণ করে প্রকৃত অভাব-বোধে কাতর হতে পারি। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী অভাব-বোধ আনয়ন করে, সে অভাব-বোধ নিবিড় হয়ে ওঠে কৃতী-ব্যক্তির তিরোধানে। আমরা তাঁকে পাইনে, অপূর্ণতা পূর্ণতায় ভরে ওঠুক এ-ইচ্ছায় জাগ্রত জীবন নিয়ে। তিনি অপূর্ণতার

হাহাকারে আমাদের মনে সন্তাপের শ্বাস ফেলে রেখে চলে যান। আজকের দিনে সংবাদে ও সাহিত্যে জড়াজড়ি করে যখন ইয়াঙ্কীযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে ও নির্ব্বিচারে সুরু হয়েছে তখন এই সাংবাদিকতার বাঙালী গুরুকে স্মরণ করে বলব যে এ-অনুভূতি তাঁর মনের কোনো কোণে ঠাঁই পায়নি।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

নূতন মেঘদূত রচয়িতা হিসেবে যাঁকে একদিন ভালো লেগেছিল তরুণ-চিত্তে, সেই যতীন্দ্রনা বাংলা-কবিতার কতো বেশি আত্মীয় ছিলেন তা তাঁর মৃত্যুর পর আজ মনে পড়ছে। তাঁর কবিতা ভাবে আমরা প্রথম প্রয়াসের নক্সা তৈরী করেছি তা-ও মনে পড়ে। মোহিতলালের পর নজরু জীবনানন্দ যতীন্দ্রনাথ, এই তিন নাম তখন যেন মুখস্তও করতাম। এঁরা কেউ নেই আজ। নজরু থেকেও নেই, যতীন্দ্রনাথের অনুগমন করলেন জীবনানন্দ। চোখের জল ফেলবার অভ্যাস আমারে অনেকদিন হল ঘুচে গেছে তবু খানিকটা শূন্যতা অনুভব করি বই কি! আর যতীন্দ্রনাথের মেঘ-তা পংক্তিটি স্মরণ করে ভাবি, গোবি-সাহারার বুক থেকে জল আশা কে করে? তারপর মনে-মা তাঁরই 'চোখের জল'-এর দু'টি পংক্তি দিয়ে মনকে শাসন করি:

ও-চোখে মানাবেনা চোখের জল আর।
কাঁদিয়া অপমান করোনা বেদনার।

কাব্য-ধর্ম্ম

সম্প্রতি ইংরেজ-কবি স্পেণ্ডর কল্‌কাতা-সফরে এসে তাঁর কাব্য-ধর্ম্ম ব্যক্ত করে গেছেন। এ ধর্ম্ম সম্পর্কে বাঙালী কবিমাত্রেই অবহিত। মানবিক বা মানসিক কীর্ত্তিকলাপের উপর যাঁদের র্নির্ভরশীল, সম্ভবত সম্প্রতি কোনো কারণে পাশ্চাত্যে তাঁদের স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে, সুতরাং তাঁদের একম কবিগোষ্ঠীর একজন আত্মীয়, কল্‌কাতার কবি-সহৃদয়দের সমীপবর্ত্তী হয়ে জানতে ইচ্ছুক হয়েছে স্বাধীন-চিত্ততা এতদ্দেশীয় কবিরা কী পরিমাণ ভোগ-দখল করে আসছেন। বাঙালী কবিরা চিত্তের স্বাধীনতা ভোগ না করতেন, তাহলে আজ বাংলা-কবিতা পৃথিবীর যে কোনো সভ্য দেশে শ্রেষ্ঠ কাব্য-সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হতে পারতনা। চিত্তের স্বাধীনতা সাম্প্রতিককালে বহু বহুমুখী। সেই বহুলতা বাংলা কাব্যে বিরাজিত।

নূতন কবিতা

নীল-নির্জন: নীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী [সিগনেট প্রেস—দু'টাকা]

বাস্তবতা-জাগ্রত ও স্বপ্নে-ডুবন্ত একটা চিত্তের অবস্থা নিয়ে এখনকার অনেক তরুণ কবি তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে থাকেন। অবস্থাটি যাঁর রচনায় যতো বেশি পরিস্ফুট হয়ে করুণ রসাপ্লুত হয় তিনিই এখন ততো বেশি সমাদৃত। শ্রীমান নীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্নি একজন সমাদৃত কবি। স্বপ্নভাব বেশি থাকলে এখনকার পাঠক-সমাজ হয়ত রসাস্বাদনে পরাঙ্মুখ হন, কেননা সমাজ বাস্তবতার পথে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। সামাজিক ক্ষেত্রে যে-বৃত্তি প্রবল, তাকে অস্বীকার করেও কবি-মানসিকতা ঊর্দ্ধগ হতে চায়, কিন্তু তা প্রৌঢ়তালব্ধ সাহসিকতা। তরুণ কবিদের সমাজে এখন আর আমরা সে-মানসিকতা দেখতে পাইনে। কিন্তু নীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্র-সায়াহ্ন-জ্যোতিতে উৎসাহিত হয়ে খানিকটা প্রবীণতা দেখিয়েছেন। তবে "রাত্রি ছিঁড়ে স্বপ্ন ওঠে, স্বপ্ন ছিঁড়ে মন" বলে তিনি যে-মনের প্রবল ছবি আমাদের নিকট উপস্থিত করেছেন, তাতে অন্তর্দ্বন্দ্ব সুপরিচ্ছন্ন। দ্বন্দ্বের নিরসন তাঁকে নিগ্রহ, সাহসিক ভঙ্গীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে বলে আমাদের দৃঢ় ধারনা। দ্বন্দ্বের পরিণতিতে একটি গভীরতর মনোভঙ্গী সোচ্চার হয়ে ওঠে, সে ভঙ্গী রূপগামীই হোক, আর স্বপ্নদর্শীই হোক। 'শীত-সায়াহ্নে' 'নীলনির্জনে'র কবি বলছেন:

"……এবার তবে মনে
শীতের সাদা ঝরাপাতার মতন নির্জনে
ঝরুক ঘনগহন নীরবতা।"

এ-নীরবতা আগামী বসন্ত-দিনে যে-গীতির মুকুল ফোটাবে তাতে হয়ত তাঁকে নিবিড়তম করে পেতে আমাদের সুযোগ ঘটবে॥

স. ভ.

অঞ্জনা: শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস (শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম)

একটি কবিতার বই। কবি ভক্তিময় ভাবকে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় একাগ্রতা ও সরলতা আছে এবং প্রতিদিনকার প্রার্থনার মতো একটা কর্তব্যবোধেও তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু কবিতার ধর্ম পাঠকের নীরব কবিকে সম্ভাষণ জানানো। কবির রচনা সে ব্যাপারে পরাঙ্মুখ হয়েছে।

বইটির কাগজ মূল্যবান। ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার। আশ্রমের প্রকাশক ও মুদ্রাকরের রুচির পরিচয় মেলে।

অমল দত্ত

উত্তর বসন্ত—মৃণালকান্তি। কবিতাভবন।

মিতার জন্য রোমান্টিক কবিতা—শান্তিকুমার ঘোষ। শনিরঞ্জন প্রেস।

অশোকের সময়ের গ্রাম—দুর্গাদাস সরকার। একক প্রকাশনী।

'দিগন্ত' ও 'আকাশের' কবি মৃণালকান্তি 'উত্তরবসন্তে' এসে যে তাঁর ইতিপূর্ব গ্রন্থের তুলনায় ভাবজগতের নোতুন কোনো দিগন্ত আবিষ্কার করেছেন এমন নয়, তবে তাঁর এই বইটি পড়ে অন্যান্য নানা কারণে যথেষ্ট তৃপ্তি পাওয়া যেকোন কাব্যামোদীর পক্ষেই সম্ভব। আধুনিক জগতের ও জীবনের কোন সংকট বা সমস্যায় তাঁর মন নেই, হাঁকডাক ক'রে নতুনতর কোন তত্ত্ব বা সংবাদ প্রচারেও তাঁর ইচ্ছা নেই—যৌবনোত্তর প্রাণের আনন্দবেদনাকে কেবল আহরণ ক'রে যাওয়া। তবে এই আহরণে বিষাদের ভাগই বেশি। করুণ স্বপ্ন ও স্মৃতির আলো আঁধারি উত্তরফাল্গুনী অবকাশের নিঃসঙ্গতাকে জড়িয়ে আছে। 'উত্তরমেঘ'-গুচ্ছে ষষ্ঠ লিরিক এই অবস্থার স্বাক্ষরবাহী। কোন কোন অত্যন্ত কোমল ভাবপ্রবণ কার্ণকাতর হৃদয় উত্তরযৌবন-জীবনে যে গোধূলি-ম্লান বিষন্নতার মুখোমুখী হয়—মৃণালকান্তির 'উত্তরবসন্তের' অভিজ্ঞান তারই। পুরোনো স্বপ্ন ও স্মৃতির সঞ্চয় মুখে বারবার হারানো দিনের তাই ছায়াপাত ঘটে। এখানেও দেখছি সেই অবলুপ্ত দিনক্ষণগুলো প্রধান ভূমিকা পেয়েছে—সেই আশায় থরোথরো ভঙ্গুর স্বপ্নযাত্রী সময়ের আবেগ, জীবনের সেই ক্ষণ-প্রেমে উদ্ভাসনের তপ্ত উদ্বেগ ও মৃদু উল্লাস। কবি এখনও 'ক্লান্তপক্ষ আশার মৌমাছি'। জীবনে জীবনে অনেক বিভ্রান্তি ও অপচয়কে ভর ক'রে যে ক্লান্তি বা বিষাদ আসে, তার রূপায়ন মানেই হতাশার রূপায়ন নয়—হতাশ জীবন সম্পর্কে বীতরাগ হতচেতন এক অপলাপী নেতিবাদের সূচনা করে। অবসন্ন প্রহরে যে কবি ভাবতে পারেন, 'অসীমের সকল আয়োজন জীবনের রঙে রসে। তেমনি রয়েছে নিটোল, সুন্দর!' অথবা দেখতে পারেন, 'মেঘ-ভাঙ্গা চাঁদ তোমার মুখ, রাত্রি আঁকা চোখে—' অথবা একদা যে কবি প্রিয়াকে ঘিরে 'অনাদি রাতের মোহ' ও আপন 'রক্তে গান' অনুভব করেছিলেন ও উত্তরবসন্ত রাতে 'তবু গান আসে' বলে নিশ্চিত প্রত্যয় ধ্বনিত করেন, তখন সেই কবিতে আমরা নিশ্চয়ই হতাশার আবিষ্কার করে ভ্রমে পড়ব। তন্দ্রাতুর ভাবরসে আবিষ্ট এই কবি চিরকাল নিরাভরণ কবিতাই প্রশ্রয় দিয়েছেন—তা'তে আপত্তি নেই—তবে এ বইয়ে দু এক জায়গায় ছন্দ একটু স্খলিত চালে চলেছে বলেই মনে হয়েছে। কবিতার ভাবে-ভাবনায় বা চিত্র-রচনায় কবি কথনো কথনো তাঁর পুর্ব ও সম-সাময়িক কবির কাছে ঋণী আছেন—তবে সে ঋণ যোগ্যের ঋণ। চীনা কবিতার প্রয়োগ-কৌশলেও কবি এই গ্রন্থে ঈর্ষাযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। 'একটি প্রশ্ন' তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কেবল টানা-টানা গদ্যে-পদ্যে-মিশোল ছন্দে নয়, অবিমিশ্র লিরিক ছন্দেও তার উপযুক্ত ধ্বনি নির্মাণে কবি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। 'ধূসর ছবি' এই জাতীয় কবিতার একটি অপরূপ উদাহরণ। তার নিরালা-দুপুর-সুলভ স্নিগ্ধ ছবি ও মিঠে সুরটি ভারি ভালো লাগলো—

নিমের ছায়ায় ঘুমায় একা দুপুরে রোদ্দুর,
একটি দিনের স্মৃতি তুমি চিরদিনের দূর।

পরিশেষে উৎসাহী পাঠকদের সুবিধার্থে জানাই: গ্রন্থারম্ভে Bergson-এর ঐশী প্রেমতত্ত্ববিষয়ক উদ্ধৃতির সংগে এ বইয়ের কোন কবিতারই কোন যোগ আমি পাইনি—তাঁরাও যেন পেতে চেষ্টা না করেন।

আলোচ্য দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে কবির দীর্ঘ দশ-এগারো বছরের কাব্য-রচনার যে ইতিহাস পাচ্ছি, তা'তে খুব বেশি উৎসাহিত হবার কিছু নেই। লেখকের কবি-মন আছে, মোটামুটি নির্ভুল ছন্দ লেখেন, পুরোনো আঙ্গিকে স্থানে স্থানে ছেঁড়াছেঁড়া ছবিকে বাঁধেনও।

তৃতীয় বইয়ের অল্প কয়েকটি কবিতায় লেখকের প্রস্তুতি পর্বের আভাস পাচ্ছি। সমসাময়িক জীবনের ক্লেশ ও ক্লান্তি তাঁর মনে ছায়াপাত করেছে ঠিক, তবে গভীর ও আত্মস্থ অনুভবের রসে তা কদাচিৎ রূপায়িত হয়েছে। শব্দচয়নে বা ছন্দ নির্বাহের যাথাযথ্য ও স্বকীয় দৃষ্টিভংগী প্রয়োগের পরিচয় এখনও আসেনি বলাই ভালো—আধুনিক জীবনের পীড়া ও অপঘাতকে শুধু জানা, তাই, এই লেখকের পক্ষে আপাতত বড় কথা নয়।

—নিখিলকুমার নন্দী

রাজকন্যা— গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় (পরিবেশক: সিগনেট বুকশপ)

স্বগত—সুকুমার রায় (কাহিনী—দাম ২॥০)

যে রাজকন্যায় জীবনানন্দ দাশ তাঁর কাব্যের প্রাথমিক সুর-বন্ধন করেছিলেন, সে এখনো বাঙালী কবি চিত্তে গীতিকাব্যের সুর জাগায়। এই অমরা কন্যা সম্ভবত বাঙালী কবিচিত্তের বিজয়িনী প্রিয়া। সে প্রিয়া বিশ্বপ্রকৃতিকে প্রণয়পাত্রী করে তোলে বলেই আমরা এখনও 'রাজকন্যা' গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত কবিতাবলীর মতো সুরেলা রচনা পাই। শুনতে পাই: 'ফাল্গুনে শালের বন—যেন কোনো কুমারীর মন—'। তবে যেখানে কবি বাস্তবজীব-সচেতন করেছেন চিত্তকে, সেখানে তাঁর পংক্তিগুলো পদ্যের পর্য্যায় থেকে কাব্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়নি।

'স্বগত' বইখানি জীবনানন্দের কাব্যেরই অপর পৃষ্ঠার নগ্নরূঢ়তা-মণ্ডিত চিত্রাবলীতে শোভিত, যা 'উরোপায়ণ' নামে বর্ণিত হতে পারে। জীবনানন্দ যে-ক্ষেত্রে অশ্বমনোরথ ভারতীয় আর্য্যতায় বেঁধে রেখেছেন, এখনকার (এলিয়টী-অধ্যায়ের) কবিতাবলী তা করতে সমর্থ হয়নি। ফলে ইদানীং-ও আমরা সুকুমার রায়ের মতো তরুণ কবি দেখতে পাচ্ছি।

স. ভ.॥

সংবাদ

'কবিতা-ভবন' নাট্যপরিষদ

'কবিতা-ভবন' একটি স্থায়ী নাট্য-পরিষদ গঠন করবার সংকল্প প্রকাশ করেছেন—এই সংবাদ সত্যি আনন্দদায়ক ও উৎসাহব্যঞ্জক। গত জুনমাসে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটক অভিনয় করে এঁরা তার লভ্যাংশ ৮০০৲ শতটাকা কবি হেমচন্দ্র বাগচিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কল্লোল-যুগের এই কবি বর্ত্তমানে অসুস্থ। এই নাট্যপরিষদের আন্তরিকতায় সাহিত্যসেবীমাত্রেই উৎফুল্ল হবেন।

সম্প্রতি এঁরা স্থির করেছেন যে একশো জন সভ্য নিয়ে নাট্য-পরিষদটিকে শক্তিশালী করবেন। সভ্যদের মাসিক চাঁদা হবে একটাকা। বছরে দু'টি নাটক প্রদর্শিত হবে। এঁরা এবার রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া' গল্পটিকে গ্রহণ করেছেন—নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসু। আগামী ডিসেম্বরে নাটকটি অভিনীত হবে।

নৃত্য-শিল্পী শান্তিবর্দ্ধন

'লিট্ল ব্যালে ট্রুপের' কর্ণধার শান্তি বর্দ্ধনের মৃত্যু-সংবাদ পূর্ব্বাশায় বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে। সেখানে সংবাদের এই ত্রুটী ছিল যে তিনি প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী মনি বর্দ্ধনের ছাত্র। শান্তিবর্দ্ধনের ভ্রা[illegible] শ্রীযুক্ত মন্মথ বর্দ্ধন আমাদের জানিয়েছেন যে শান্তিবর্দ্ধনের নৃত্যগুরু মণিপুরের 'সরকারী কৃষ্টি কেন্দ্রে[illegible] অধ্যক্ষ একজন মণিপুরী ভদ্রলোক—মণিবর্দ্ধন নন। 'লিট্ল ব্যালে ট্রুপ' বর্ত্তমানে শান্তিবর্দ্ধনের বিধবা পত্নী শ্রীযুক্তা গুল বর্দ্ধনের হস্তে ন্যস্ত।

হেমিংওয়ের নোবেল পুরস্কার

হেমিংওয়ের নোবেল-প্রাইজ প্রৌঢ়া পৃথিবীর তারুণ্যের উপর পুষ্পবৃষ্টি। এ-তারুণ্য যে ক[illegible] প্রগল্‌ভ হতে পারে তা হেমিংওয়ে তাঁর উপন্যাসগুলোতে দেখিয়েছেন। আমাদের তরুণ বয়েসী[illegible] প্রগল্‌ভতা-ই অনেকের পক্ষে অসহনীয়, ভাবছি হেমিংওয়েকে নোবেল-প্রাইজ-দেনেওয়ালা [illegible] হজম করে সহ্য করলেন।

আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যের নির্ব্বিচার পরিবেশনে পাঠকের মনে অতীতের কণ্ডুয়ন অথবা রুচির বিকৃতি সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কথাসাহিত্য ও কবিতা পরিবেষণে পূর্ব্বাশা লিমিটেড বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্ব্বাশার সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

কবিতা

অজিত দত্তের
পুনর্নবা — দেড় টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
নীল আকাশ — দেড় টাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
সংকলিতা — দু'টাকা
প্রাচীন প্রাচী — দেড় টাকা
অপ্রেম ও প্রেম — এক টাকা
পদাবলী — দুই টাকা
তিনজন আধুনিক কবি (বাংলা কবিতার আলোচনা) — নয় আনা

অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের
সৈনিক — দেড় টাকা

গোপাল ভৌমিকের
স্বাক্ষর — এক টাকা

গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
মহানগর — দু'টাকা

সুবোধ ঘোষের
পরশুরামের কুঠার — দু'টাকা
শুক্লাভিসার — দু'টাকা চার আনা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ফসল — এক টাকা চার আনা
ঋণ — দেড় টাকা
নতুন দিনের কাহিনী — দু'টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
পতাকা — দু'টাকা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
খেলনা — দেড় টাকা

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের
নয়নচারা — দেড় টাকা

উপন্যাস

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
বৃত্ত — এক টাকা বার আনা
মরামাটি (২য় সং) — দু'টাকা চার আনা
দিনান্ত (২য় সং) — সাড়ে তিন টাকা
কল্লোল — পাঁচ টাকা
কস্মৈদেবায় (২য় সং) — তিন টাকা
রাত্রি (দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ) — পাঁচ টাকা
মৌচাক — পাঁচ টাকা

শৈলেন ঘোষের
তিনরঙ — দু'টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা

COLOUR ILUSTRATION

PURVASA : KARTIC—1361 REGD. NO. 1512. 8 ANNAS

শিশু-সাহিত্যের আর একটি সেরা বই

॥ পড়ার আলোর মাঝে-মাঝে আলোর
কুমারের গল্প যদি পড়ো তাহলে
বড়ো হয়ে দেখবে এই আলোর
কুমার কতো বড়ো সত্যি গল্প ॥

আলোর কুমার

রচয়িত্রী :

জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তা, এম-এ, বি-টি, টি-ডি (লণ্ডন)

দাম : দেড় টাকা

বড়দিনের ছুটিতে পড়ার মতো বই

প্রকাশক :

পূর্ব্বাশা লিঃ—৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

: Sonjoy Bhattacharya. Printer & Publisher : Satya Prasanna Dutta, Purvasa Ltd., 54 Ganesh Chandra Avenue

COLOUR ILUSTRATION

পূর্ব্বাশা

সম্পাদক : সঞ্জয় ভট্টাচার্য

স্মৃতিচিত্র

প্রতিমা দেবী

লেখিকা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ। জোড়াসাঁকোর সেই অসামান্য পরিবারের ভিতরমহল থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য গুণী পুরুষদের গড়ে উঠতে দেখেছেন। প্রতিভার বিচিত্রপথে বিকশিত হয়েছিল ঠাকুর পরিবারের মন দিয়ে গুণীজনেরা মৌমাছির মতো আকৃষ্ট হয়ে বাস করে গেছেন। এই পরিবারের পরিবেশে। এমন একটি পরিবারের স্বরূপ চিত্রণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে স্মৃতিচিত্র। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনার এক বিরলতম নিকটচিত্রও উদ্ঘাটিত হয়েছে এ-গ্রন্থে। সচিত্র। দাম ২।০

কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ

জিম করবেট

ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশে পার্বত্য বনাঞ্চলে অসমসাহসী, অদ্ভুতকর্মা শিকারী বলে খ্যাতি ছিল জিম করবেটের। সেখানকার পাহাড়ী মানুষ ছাড়াও পাথর-গাছ-বন-কীট-পতঙ্গের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা জন্মে গিয়েছিল। সমস্ত অঞ্চলটি ছিল তাঁর নখদর্পণে। প্রকৃতির বিচিত্র ইশারা তাঁকে শিকারের সময় উপায় বাতলে দিত। এই প্রকৃতি-প্রীতির সঙ্গে ছিল তাঁর পর্যবেক্ষণের অসাধারণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি। মানুষখেকো বাঘের মতো ভয়ঙ্কর জীব শিকারের রোমাঞ্চকর সত্যগল্প এই লেখায় সাহিত্যের গৌরবলাভ করেছে। সচিত্র। দাম ৩৲

অনন্যা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

এক অনন্যা নারী। জীবনে তার শক্তি ছিল, দিনে দিনে বিকশিত হল সেই শক্তি। অর্থের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে তার থাকতে হল না। তবু তার সুখ নেই। তবু তার দিনরাত্রিতে স্বাদ নেই। একদিন তার কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হল এই প্রশ্ন: কী হবে আমার উপকরণে, কী হবে আমার স্বাধীনতায়, যদি আমি চতুর্দিকের মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের আস্বাদ না পাই? যদি আমার প্রাণ আলোকের মতো কোনো স্পর্শে একটি-একটি করে তার পাপড়িগুলি না খোলে? এ বিকাশ কে ঘটাবে? সে কি শক্তি? সে কি অর্থ? সে কি শুধু স্বাধীনতা? না কি একটি পুরুষের প্রতি সর্ব-সমর্পণের প্রেম? ত্যাগের দ্বারা পবিত্র একটি উজ্জ্বল উদ্ভাসনের কাহিনী। দাম ২॥০

প্রথম প্রেম

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একটি যুবক, একটি যুবতী, আর এই ধূলিরুক্ষ পৃথিবী। তবু যৌবনের সমাগমে এমন একদিন আসে যেদিন পৃথিবীকে স্বর্গ বলে মনে হয়, দেহকে মনে হয় সুধা-সৌন্দর্যের ইতিহাস। সেই হচ্ছে প্রথম প্রেম। নারী তখন নারীর অধিক, পুরুষ তখন পুরুষের উপরে। এ সেই প্রেম যার শোক নেই, গ্লানি নেই, পিপাসা নেই। জীবনে নারী হয়তো আসে বহুবার, কিন্তু প্রেম শুধু একবারই আসে, আর সে প্রেম প্রথম প্রেম। একটি আনন্দ-উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন কাহিনী অচিন্ত্যকুমারের নিপুণ লেখনীতে অমর হয়ে আছে। দাম ৩৲

জননী জন্মভূমিশ্চ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারের একটি চিরকালিক সমস্যার আধুনিকতম আলেখ্যলিখন। ভঙ্গপ্রবণ-সমাজের প্রথমতম প্রসঙ্গ। পুরোনোর সঙ্গে নতুনের সংঘর্ষ, সংস্কারের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যের। একটি ঘরোয়া কাহিনীকে অনুভবের গুণে গভীর ও বর্ণাঢ্য করে আঁকা হয়েছে। প্রাণবন্ত ভাষা, উজ্জ্বল চরিত্র ও বলিষ্ঠ মনোভঙ্গি—যা অচিন্ত্যকুমারের বিশেষত্ব সবই এই উপন্যাসে পরিস্ফুট। দাম। ২॥০

তিনবন্ধু

এরিখ মারিয়া রেমার্ক

দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী শান্তির সঙ্কীর্ণ ভূমিতে প্রেমের এই পট আঁকা। ভাঙনের স্রোতে সমস্ত বিশ্বাস ভেঙে গেছে, বন্ধন জেগে রয়েছে শুধু অটুট বন্ধুত্বের, আর প্রেমের। হোটেলে আত্মহত্যা, রেস্তোরাঁয় গণিকার ভিড় চোরাগোপ্তা খুন, হতাশা আর অবসাদ—যুদ্ধোত্তর জার্মানীর এই ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে পা ফেলে চলেছে তিনজন প্রাক্তন সৈনিক। তাদেরই একজনের অপ্রত্যাশিত প্রেম আর অন্যদের অকুণ্ঠ আত্মত্যাগের কাহিনী এই 'তিনবন্ধু'। দাম। ৪৲

কলেজ স্কোয়ারে : ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট **সিগনেট বুকশপ** বালিগঞ্জে : ১৪২।১ রাসবিহারী এভিনিউ

পূর্ব্বাশা

প্রতিসংখ্যা—আট আনা

অগ্রহায়ণ—১৩৬১

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
কবিতা : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য	...	৪৩৩
কবিতাগুচ্ছ :		
পুরাতন নিয়ম : হীরালাল দাশগুপ্ত	...	৪৪০
ভরা আলো : সুনীল চট্টোপাধ্যায়	...	৪৪২
অপরাজিতা : বটকৃষ্ণ দাস	...	৪৪৩
আবর্ত : শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	৪৪৪
ওয়েসিস্ : শ্রীতারক ঘোষ	...	৪৪৫
ঝড় : বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত	...	৪৪৫
অপর সম্ভাবনা : আলোক সরকার	...	৪৪৬
মধ্যদিনে যবে : দেবীপদ ভট্টাচার্য	...	৪৪৭
হোল্ডারলিন অবলম্বনে (কবিতা) : বুদ্ধদেব বসু	...	৪৫১
গড় শ্রীখণ্ড : অমিয়ভূষণ মজুমদার	...	৪৫৩
ভূঁদি : ইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য	...	৪৬৫
শ্রীমতী গ্যালিভার : কবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৪৭০
ভারত-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ : ইন্দ্রজিত	...	৪৮০
শিকার : শংকর চট্টোপাধ্যায়	...	৪৮৩
সাংস্কৃতিকী : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য	...	৪৮৮
সংবাদ :	...	৪৯২
নূতন বই :	...	৪৯৪

প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

মনোলীনা— ২।০

সেতু বন্ধ— ২।০

সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲

বিচিত্র হৃদয়— ২৲

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের

নূতন বোনাস

১৯৫৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রৈবার্ষিক ভ্যালুয়েশনে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরে প্রতি হাজার টাকার বীমায় সম্প্রতি বোনাস ঘোষণা করিয়াছে :

বোনাস আজীবন বীমায় ১৭৷৷০
মেয়াদী বীমায় ১৫৲

সুদের হার শতকরা মাত্র ২৸০ ধরিয়া এই হিসাব করা হইয়াছে।

১৯৫৩ সালে নূতন বীমা সংগ্রহের ক্ষেত্রে অন্যান্য কোম্পানীর তুলনায় হিন্দুস্থান পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার অধিক কাজ করিয়া সর্ব্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। ত্রৈবার্ষিক ভ্যালুয়েশনেও ইহার অসামান্য সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সুদৃঢ় ও নিরাপদ ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থান বীমাকারিগণের আর্থিক দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়া আজ জাতির শ্রেষ্ঠ আর্থিক প্রতিষ্ঠানরূপে সমাদৃত হইতেছে।

HINDUSTHAN CO-OPERATIVE INSURANCE SOCIETY LD.

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্
হেড অফিস : হিন্দুস্থান বিল্ডিংস কলিকাতা-১৩
শাখা : ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরে।

ডাক্তারদেরও পছন্দ

পিউরিটি বার্লি

কারণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সেরা শস্য থেকে
এই বার্লি তৈরি তো হয়ই, তা ছাড়া,
এর পেছনে আছে ১৫১ বছরব্যাপী
পেষাই-এর অভিজ্ঞতা।

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড পোস্ট বক্স ৬৬৪, কলিকাতা - ১

APBX-1125

পূর্ব্বাশা
অগ্রহায়ণ
V

[ন্যাশনাল একাডেমী]

নৃত্য-বায়ন

শিল্পী : শ্রীঅনিল রায়চৌধুরী

[দিল্লী]

পূর্ব্বাশা
অগ্রহায়ণ—১৩৬১

কবিতা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

[এক]

কবিতা সম্পর্কে যে সামান্য সচেতনতা ইদানীং বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে তাকে প্রগাঢ় করে তুলতে হলে ভালো কাব্য-সমালোচকের দরকার। খারাপ কাব্য-সমালোকরা যে কবিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন তা নয়, বরং আত্মবোধ নিবেদন করবার সৎসাহস দেখিয়ে তাঁরা সমাজমনকে কবিতার প্রতি আকৃষ্ট করে যান। পরবর্ত্তী কোনো ভালো সমালোচকের আবির্ভাবে খারাপ সমালোচকের আত্মবোধ যাচাই হয় এবং ভালো সমালোচক কবিতা সম্পর্কে তাঁর স্বকীয় মতামত স্পষ্টতর করবার ভরসা পান। এই উপায়ে কবিতার আলোচনা বেড়ে চলে—কবিতার দিকে অনেকের নজর পড়ে। এখন কবিতার দিকে অনেক বাঙালী শিক্ষিত ব্যক্তি নজর দিতে পারছেন বলে আমাদের একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে কবি জীবনানন্দ দাশের স্মরণ-সভায় উপস্থিত থাকতে পেরে। জীবনানন্দ সহজ কবি নন। দুর্ব্বোধ্য ও দূরচার বলে তাঁর কুখ্যাতিও করেছেন বহু মান্যগণ্য ব্যক্তি। সে অবস্থা থেকে যে বাংলাদেশ উত্তীর্ণ হতে পেরেছে তা জানতে পারা একটি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। ইংরেজ কাব্য-সমালোচকরা সম্প্রতি বলতে চান যে কবির অভিজ্ঞতাই কবিতা। কবিতা যদি কবির ব্যূহে বন্দী থাকে, তাহলে সে-ব্যূহ ভেদ করবার জন্যে সম্ভবত সপ্তরথীরই দরকার—একটি রথী সেই অভিমন্যু-চক্রে প্রবেশ করতে অসমর্থ। কথাটি নিরর্থক নয়। একটি কবির অভিজ্ঞতা জানতে হলে সপ্ত সমালোচক রথীরই দরকার। 'ষড়ভির্ব্বিশ্বরূপৈকপাশং' যে কবি-চিত্ত তাকে প্রদক্ষিণ করা এক ব্যক্তির কর্ম্ম হতে পারে না। ষড়্-ইন্দ্রিয়ের পাশবদ্ধ বিশ্বরূপের দর্পণ হল কবিমানস—বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জ্জনে পঞ্চেন্দ্রিয়ের পর অন্তঃকরণ নামক ষষ্ঠেন্দ্রিয়ও কবি-দেহে নিযুক্ত থাকে; সুতরাং সেই অন্তঃকরণ-স্বরূপ মনের খবর জানতে না পারলে, বা কবি তা জানিয়ে না গেলে, কবিতার পেছনে ঘোরাঘুরি করা অনর্থক।

সৎ কবি বৈচিত্র্যের সমন্বিত রূপ বা বিশ্বরূপ। বিশ্বচিত্র যেমন চাঞ্চল্য নিয়েও স্থিরতায় আসীন, সৎ কবির মানস-লোকও তেম্নি চাঞ্চল্য ও স্থিরতা সন্ধানী। কিন্তু সন্ধান করলেই কি মানুষ বিশ্বরূপের সঙ্গে এক আসনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে? নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের গাঁটছড়া বাঁধা হতে পারে কিন্তু যা নিত্য তা থেকে যায়, অনিত্য ঝরে পড়ে—মানুষ তাঁর মন নিয়ে বিশ্বচিত্র থেকে ধুয়ে মুছে যায়। আবার অবশ্য অনুরূপ সন্ধান নিয়ে মানুষ আসে কিন্তু তাতে-ও বা কি? সূর্য্যচন্দ্র-নক্ষত্র-আকাশ

যেমন স্থির তেমন প্রথমের স্থিরতায় কি দ্বিতীয় সন্ধানীর আবির্ভাব হতে পারে মানব-জননীর গর্ভে? বিশ্বপ্রকৃতি যে ধাবমানতায় অস্থির তেমন ধাবমানতা মরদেহে কই? অতএব কবির বা যে-কোনো অবতারের (যিনি মানব দেহে অবতীর্ণ) বিশ্বরূপ-প্রাপ্তি ক্ষণকালের চেতনা-রাজ্যের বিষয়। 'আমি সূর্য্য'—বল্‌লেই কি সূর্য্য হওয়া যায়? সূর্য্যের ভাবে অনুরঞ্জিত করা যায় মাত্র চিত্ত। সেই ঝলমল-করা চিত্ত দেখে আমরা বিশ্বরূপভ্রমে পতিত হই। সৎ কবি যদি বিশ্বরূপ, তাহলে তিনি যেমন ভ্রান্ত, তেম্নি আমরা তাঁকে সে-আখ্যা দিয়ে ভ্রমে পতিত।

তার চাইতে বলা ভালো, সৎ কবি সৎ ব্যক্তি—মনকে তিনি আবৃত রাখতে নারাজ। বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর ইন্দ্রিয়ের দ্বার-পথে মানসিক দ্বারকায় পৌছুতে পারলে যে কাণ্ডকীর্ত্তি-কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দেয়—অহং-বোধে যে পৌরুষ জাগে তাঁর চেতনায় এবং শেষটায় বিনয়-বোধে যে নম্রতায় শায়িত হয় তাঁর শরীর, তার রেখাপাত করে যাওয়াই সৎ ব্যক্তিরস্বরূপ, সৎ কবির কাব্য। তিনি অভিনেতা নন—এটুকু জানলেই তাঁকে সৎ ভাবা যায়।

সমালোচক যদি কাব্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে উৎসুক হন তাহলে প্রথমত তাঁকে বিচার করতে হবে কাব্যের আন্তরিকতা। আমি রুশ-রণাঙ্গনে গিয়ে লড়াই করছি, এ-কথা অনায়াসে ছন্দে গেঁথে বা চমৎকার বাক্য ব্যবহার করে বলে যেতে পারি, কিন্তু এ-বক্তব্যে কতোটা মানসিক সততা রক্ষিত বা নিবেদিত হল এ বিষয়টি সমালোচককে পরিমাপ করে দেখতে হবে। 'আমি শ্রেণীহীন, আমি জাতির নামে বজ্জাতি দেখছি'—এ-কথাটি কেউ বল্‌লেই যে সে আন্তরিক ভাব ব্যক্ত করছে তা না-ও হতে পারে। সততা ও শঠতা হাত ধরাধরি করে চলছে যেকালে, সেকালে ও-দিনে বাক্যাবলীর পরিমাপ খুব সাবধানে করতে হয়। সমালোচকের পরীক্ষা-শক্তির প্রাচুর্য্য না থাকলে এ-কাজ সম্পন্ন হয়না। কবির অভিজ্ঞতার সদসদ অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করবার ক্ষমতা না থাকলে আর যে-কর্ম্মই হোক, কাব্য-সমালোচনার কর্ম্মটি হয়না। কবিতা পড়ে ভালো-লাগার ভাবটি হয়ত অনেক পাঠক লাভ করে থাকেন, কিন্তু তা থেকে এমন কথা বলা যায়না সে তেমন পাঠকই সৎ সমালোচক। সমালোচক ও পাঠক উভয়েই আত্মবোধই নিবেদন করেন সত্য কিন্তু নিবেদনের ভঙ্গীটি হয় পৃথক। এই পার্থক্য বিরাজিত থাকে বলেই একজন সমালোচক এবং অপরজন পাঠক। পাঠকের ভালো লাগা কাঁচা আবেগের খাতিরে কিম্বা বুদ্ধিবৃত্তির কণ্ডুয়ন-চরিতার্থ হয় বলে। কিন্তু কাব্যগুণগ্রাহী সমালোচকের ভালোলাগা সাহিত্য-শিল্পের একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব আলোর পথ সঞ্চার করে দিতে পারে। এমনও হয় যে কবি স্বয়ং সে আলোক-পাত সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না তাঁর কাব্য-রচনা কালে। কবি যে তাঁর অভিজ্ঞতার সমস্ত অলিগলি আলোকিত দেখে একটি কবিতা সৃষ্টি করেন তা নয়। সৃষ্টির পরও যে তিনি সেই বাক্‌বন্দী রচনাটির কারুকার্য্য সম্পর্কে সু-অবহিত হতে পারেন তা-ও নয়। বাক্ সামাজিক; বাক্ চিত্রপ্রদায়ক; চিত্র বিচিত্ররসদাতা। একটি বাক্‌বন্দী সৃষ্টি যে ক'টি রসচিত্র দিতে সমর্থ, তা স্রষ্টা কবির চাইতে অনেকস্থলে অবলোকনকারী সমালোচকরা ভালো বলতে পারেন। যে-রচনা কবির মনঃপূত হচ্ছেনা, অনেকক্ষেত্রে সে-কবিতা কবিকে যশস্বী করেও তোলে, দেখা যায়। ধ্বনির স্বকীয় গুণের দরুণই তা হয়ে থাকে। তাই আমাদের মনে হয়, কবিতা ভাষান্তরিতা হতে পারেনা। ভাষান্তরিতা হয়ে যে-কবিতা কাব্য-গুণ বজায় রাখে সে-কবিতায় কতকটা স্থায়ী ভাবরস

আছে বলা যায়। কিন্তু ভাষা-শিল্পে ধ্বনি অবান্তর এবং স্থায়ী ভাব ও রসই সর্ব্বস্ব, তা ত নয়। গুণী কাব্যরসিকের চোখ আর কান সমান সজাগ থাকে। কাব্য দু'টি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গী হয়ে তবে অন্তরেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে। চিত্র-গীতি চেতনায় যে রঙ ফলায় তা-ই কাব্যের আস্বাদিত রঙ।

তাহলে বল্‌তে হয় যে চোখ-কান থাকলেই কাব্যের চিক্কণ-রূপ-দর্শন হয়না—চাই চেতনার অচ্ছোদ-সরসী। সৎ কবি সম্ভবত এই মানস-সরসীর মালিক। সৎ সমালোচক মানস-যাত্রীর কষ্টটুকু স্বীকার করে তবে সেই তীর্থে উপনীত হতে পারেন। তখন সলিল জ্ঞানই তাঁকে বলে দেবে এ-সরসী সহৃদয়—ব্যূহ-গুহা-কুহক প্রভৃতি কিছুই নয়। কিন্তু মুস্কিল এই, চেতনার মুখোমুখি দাঁড়াতেই অনেকে শেখেনি—ফলে চোখ-কান-নির্ভর হয়ে স্বপ্নভগ্নের হতাশায় বা কুহকের কুয়াশায় বসবাস করে যান। যেম্নি কবি, তেম্নি তাঁর পাঠক ও সমালোচক এই দুর্দ্দশা ভুগতে পারেন। সমালোচক যদি কবিতায় ভোজবাজি দেখতে সুরু করেন, তাহলে কবি 'হা হতোহস্মি' না বলে আর কিছুই বলতে পারেন না।

চেতনায় ফলিত চিত্র স্বপ্নে বা মত্তাবস্থায় ভোজবাজি দেখায়—কিন্তু শিল্পীর এলাকায় যখন তা বিবেচিত হয় তখন পরা বাস্তবতায় তা সুসমন্বিত রূপ ধারণ করে। পরা বাস্তবতা অতীতে পলায়িত মানবিক বা মানসিক জীবন। সে জীবন যে ম্যাজিসিয়ানের ম্যাজিকের মতোই কতকগুলো গুণবিধৃত বস্তু, এ-জ্ঞান নিয়ে যদি আমরা কবির যাদুর সম্মুখীন হই, তাহলে দেখতে পাবো মানুষের অতীত জীবন হতে আমাদেরই মতো কতকগুলো অনুভূতির ছবি কুড়িয়ে এনে কবি জোড়াতাড়া দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন। কবির নিকট অতীতের একটি দেশের নাম নামমাত্রে পর্য্যবসিত নয়—সে-নামে সে-দেশ জীবন্ত তাঁর চিত্তে। এই জীবন্ততার কারকশক্তি ইতিহাস-চেতনা। মানুষের সুদীর্ঘ ইতিহাস যাঁর জানা নেই, তাঁর নিকট কবির অতীতাচরণ 'ম্যাজিক' বলে প্রতীত হতে পারে। কিন্তু যিনি অতীতচারী তাঁর দৃষ্টিতে পরা-বাস্তব-সেবী কবি অত্যন্ত বেশি মানব—প্রগাঢ় ব্যক্তিসত্তা।

কিন্তু কবিকে এ-আদর্শে জানা হয়ত আমাদের দেশের নবীন রীতি নয়। যদি তা-ই সত্য হয়, তাহলে অতি দ্রুত সে-রীতির সংস্কার দরকার। অর্থাৎ বিপ্লবী সমালোচকের দরকার যদি দ্রুত-সংস্কারকে আমরা বিপ্লব আখ্যা দিই। অবশ্য বিপ্লবী সমালোচকের আবির্ভাবের আগেই বিপ্লবী কবির আবির্ভাব হচ্ছে বাংলায়, তা-ই জেনে আমরা সুখী।

[দুই]

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-বোধ সৌন্দর্য্য বা শ্রীতত্ত্বে নিহিত ছিল এবং সেই শ্রী হ'ল :

> "একটি রসময় রহস্যময় আয়ত্তের অতীত সত্য, আমাদের অন্তরেরই সঙ্গে তার অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ। তার সম্পর্কে আমাদের আত্মচেতনা হয় মধুর, গভীর, উজ্জ্বল। আমাদের ভিতরের মানুষ বেড়ে ওঠে, রাঙিয়ে ওঠে, রসিয়ে ওঠে। আমাদের সত্তা যেন তার সঙ্গে রঙে রসে মিলে যায়—একেই বলে অনুরাগ।" (অবতরণিকা—রবীন্দ্র রচনাবলী)

সৌন্দর্য্যানুরাগ কবির বা শিল্পীর মনের পুরণো কথা। সৌন্দর্য্যের সঙ্গে কল্যাণ এবং কুৎসিত,

কুরূপের সঙ্গে অকল্যাণ মিতালি পাতায় তা-ও ভারতীয় পুরাতন মানসিকতা। এই মানসিকতায় কবি-কৃতি রঞ্জিত করে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই বলেছিলেন উল্লেখিত উক্তির পর :

"কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করা।"

কবির সামাজিক প্রয়োজন এ-কথাটি থেকে অনুভব করে নেওয়া যায়। সৌন্দর্য্য ও তার সঙ্গী কল্যাণের অনুরাগে মানুষের চেতনার দর্পণটিকে দীপ্তিময় করতে পারলে জীবনের থেকে নানাবিধ ঔদাসীন্য দূরীভূত হবে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কবি-'সত্যে' উপনীত হয়েছিলেন যা প্রাচীন বাংলার নব্যন্যায়শাস্ত্রীরা 'অনিত্য'-প্রত্যক্ষ বলতেন। ঐ চেতনার বিষয় নিত্যতায় উত্তীর্ণ হতে পারত ঈশ্বরতত্ত্বে উপনীত হলে। রবীন্দ্রনাথ-ও নিত্যতা, মহিমা, মুক্তি, ব্যাপকতা ও গভীরতা সমন্বিত একটি দৈব আদর্শের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি ছিলেন।

এই অনুভব, বোধ বা অভিজ্ঞতা একটি সৌন্দর্য্যলিপ্সু মানসিকতা থেকে জন্ম নেয়। সুতরাং মনে করা যায় যে সেই মানসিকতায় কৌৎসিত্য-বোধও আছে। চিত্রশিল্পে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনো কৌৎসিত্য-বোধ ব্যক্তও করেছেন। কিন্তু কবি-কর্ম্মে তিনি কুৎসিত কুরূপের নিকট প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার প্রতি মনোযোগ বা অনুরাগ দেখান নি। রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞায় অনুরাগ হল 'প্রায়-একাত্মকতা'। কিন্তু 'অনুরাগ' মানে অনুসরণলব্ধ রঙ-ও হতে পারে এবং সে-রঙ একাত্মক হওয়ার লিপ্সা থেকে সম্পূর্ণ রূপে আলাদা হতেও পারে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা-কবিতায়, বিশেষভাবে কল্লোলযুগের কবিদের কাব্যানুভবে সৌন্দর্য্যলিপ্সু মানসিকতার সর্ব্বাঙ্গীন রূপ দেখতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ থেকে তাঁরা এক-পদ অগ্রসর হয়ে গেছেন কুৎসিতকে সৌন্দর্য্যের পাশাপাশি স্থান করে দিয়ে। তাঁদের গৌরব ও বৈশিষ্ট্য জীবনের সামগ্রিক রূপবোধে।

কেউ-কেউ রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যতত্ত্বে অসহিষ্ণু হয়ে এমন পংক্তি-ও সে-যুগে লিখেছেন :

"সৌন্দর্য্যের পূজারী হইয়া জীবন কাটায় যারা
সত্যের শাঁস কালো বলে খাসা রাঙা খোসা চোষে তারা !" ('মরুশিখা'-যতীন্দ্রনাথ)

কিন্তু এ-অসহিষ্ণুতা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের অর্দ্ধাংশের প্রতি দৃষ্টিপাতের ফলে লাভ করে যতীন্দ্রনাথ পরবর্ত্তী যুগে অপরার্দ্ধে ঠিক এম্নি আসক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর চাইতে কল্লোল-যুগের অপর কবিরা অনেক বেশি প্রসারিত বৃত্তে সৌন্দর্য্যকে ও কৌৎসিত্যকে উপলব্ধি করেছেন। যেমন যুবনাশ্ব তাঁর 'শিলালিপি'র এ-তিনটি পংক্তিতে নিবেদন করেছেন :

"মানুষের বলিষ্ঠ বুকে
পুষ্ট মাংসপেশীতে
স্বপ্নময় নয়নে জেগেছিল কী আলোড়ন ! শুধু প্রেম ?"

কিম্বা প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'প্রথমা'র 'নটরাজে'র দৃষ্টিতে বলেছেন :

"কোন্ দেশেতে লাগল মড়ক, ভাগাড় আঁধার শকুন-ঝাঁকের মেঘে
আবার কোথায় হাঁস চড়ে ওই শ্যাওলা-দীঘির ঘাটে
ঝিউড়ি মেয়ে ঘস্‌তেছে পা খেজুড়-গুঁড়ির পাটে।"

অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'অমাবস্যা'র লিরিক লিখতে বলেছিলেন :

"জুঁই-জ্যোৎস্নায় ফুলের ফরাসে বিছানা বিছালো বিছা"

অজিত দত্ত 'দেবদৈত্যে'র সমাবেশ-চিত্রের কল্কা এঁকে দেখিয়েছেন :

"নিশীথের হাওয়া আজ আফিমের নেশার মতন।"

বুদ্ধদেব বসু 'বন্দীর বন্দনা'য় 'প্রেমিক'-চিত্তের দৃষ্টিতে সেকালেই গোবিন্দচন্দ্র দাসের অথবা 'পিকাসো'র দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছেন :

"নতুন ননীর মতো তনু তব ? জানি, তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে কুৎসিত কঙ্কাল—
(ওগো কঙ্কাবতী)
মৃত-পীত বর্ণ তার ; খড়ির মতন শাদা শুষ্ক অস্থিশ্রেণী—"

সুন্দর ও কুৎসিতের দাবী পৃথিবীর ও জীবনের উপর নিত্য সত্য—কার স্থিতি ও বিস্তৃতি কখন যে কতোটুকু হবে তার নিশ্চয়তা নেই। কবি যখন পৃথিবীর জীবন বহির্ভূত জীব নন, তখন তাঁর অভিজ্ঞতার উপর এই উভয় দিকেরই দাবী আছে। তবে সে-দাবীর সদসদ লক্ষণ চেতনার প্ররোচনায় যে-কবি সহজে উপলব্ধি করে তাদের চিত্র কারুকর্ম্মে উদ্দীপ্ত হতে পারেন, তিনিই সার্ব্বকালীন কবি। কল্লোল যুগ থেকে এ-ধরনের সার্ব্বকালীন কবির প্রতিশ্রুতি নিয়ে অভিজ্ঞতার বিচিত্র পথ অতিক্রম করে গেছেন জীবনানন্দ দাশ। যেহেতু তাঁর রচনা তাঁর মৃত্যুতে সমাপ্ত হয়ে গেছে, তার জন্যে তাঁর সুদীর্ঘ কাব্য-সাধনার পরিমাপ করে এখন আমরা দেখতে পারি তাঁর 'বিশেষ অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস' থেকে বা তাঁরই দেওয়া কাব্য-সংজ্ঞা থেকে কোন্ রস প্রবাহিত। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের শ্রী-তত্ত্বজাত মাধুর্য্যরস থেকে জীবনানন্দ কোনোকালেই নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ভাবতে পারেন নি। অথচ রবীন্দ্রনাথ যে-পৃথিবী অথবা বাংলা দেশের যে-শতক থেকে এই রস আহরণ করেছিলেন, সে-পৃথিবী জীবনানন্দের বোধে ছিল 'নষ্ট'। আরেকটি রসসমৃদ্ধ পৃথিবী যে নষ্ট পৃথিবীর স্থান অধিকার করেছিল এ-শতকে, তা-ও নয়। ফলে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা আর জীবনানন্দের অভিজ্ঞতা বাস্তব ক্ষেত্রে পৃথক হয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আত্মচেতনায় 'মধুর, গভীর, উজ্জ্বল' কিন্তু আত্মচেতন বিংশ-শতকের বাঙালী কবি জীবনানন্দ গভীর হয়েছেন ঠিকই—হয়ত গভীরতরই হয়েছেন কিন্তু গভীরতর হবার দরুণই রবীন্দ্রনাথের মতো মাধুর্য্য-রসে উজ্জ্বল জাতক হয়ে উঠ্‌তে পারেন নি। অনুজ্জ্বলতা ও কঠোরতা বিশ শতকের জীবনের বিশেষ অভিজ্ঞতা ও চেতনালব্ধ ফল। জীবনানন্দের কাব্য এই দু'টি সম্প্রতি-লব্ধ গুণে গুণান্বিত।

অবশ্য এ-সব বিচার রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতীতির আদর্শ সামনে রেখে করা হচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেক কবিই তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা লব্ধ সত্যে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করে কবিতায় সে সত্য প্রকাশ করে যান। প্রত্যেকেরই কাব্য সম্পর্কে এবং আপন সত্তা সম্পর্কে একটা প্রতীতি ও চিত্র আছে—দু'জন কবি কাব্যে বা সত্তায় এক হতে পারেন না। সমালোচনার ভিত্তি এই জ্ঞানে স্থাপন করলে বাঙালী কবির অভিজ্ঞতা-সমূহ ক্রমশই প্রকাশ্য হতে সুরু করবে।

কবিতার চরিত্র-প্রকাশ করাই সমালোচকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। চরিত্র বলতে প্রথমত বোঝাবে,

প্রচলিত সত্য বা মিথ্যা যা-ই হোক, ভাবগত সাধারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য রস। দ্বিতীয়ত, শ্রুতির ও পাঠের স্বাদ—ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের প্রসঙ্গ এখানেই আসে এবং তৃতীয় প্রসঙ্গ ধ্বনিতত্ত্বে সমালোচককে প্রবেশ করতে হয়। এ-প্রসঙ্গে সমালোচক সাধারণত আপন সংস্কার-গত ধ্বনি-চিত্রের পশ্চাদ্ধাবন করে ভ্রমে পতিত হন। কবিতার শব্দ-বহির্ভূত কোনো চিত্রে বা সুরে চলে যাওয়া হয়ত আত্মরতি। তেম্নি, কবিতায় ব্যঞ্জিত কোনো শব্দের সূক্ষ্ম চিত্র বা সুর উপেক্ষা করাও অনুচিত কর্ম্ম।

আমরা এ-স্থলে উক্ত বিষয়গুলো পরীক্ষার জন্যে জীবনানন্দ দাশের একটি উপেক্ষিতা কবিতা গ্রহণ করছি :

ফিরে এসো

ফিরে এসো সমুদ্রের ধারে
ফিরে এসো প্রান্তরের পথে ;
যেইখানে ট্রেন এসে থামে
আম নিম ঝাউয়ের জগতে
ফিরে এসো ; একদিন নীল ডিম করেছ বুনন ;
আজো তারা শিশিরে নীরব ;
পাখির ঝর্ণা হয়ে কবে
আমারে করিবে অনুভব !—(মহাপৃথিবী)

গৌড়ীয় বৈষ্ণবতায় যদি সমালোচকের মন নিবিষ্ট থাকে, তাহলে তিনি এ-কবিতাটিকে উৎকৃষ্ট চিত্তের' প্রেম-রস নিবেদন' মূলক রচনা বলতে বাধ্য হবেন। অন্তত তার চাইতে সাধারণ-বোধ্য অন্য কোনো রস প্রথম-পাঠে কবিতাটি থেকে তাঁর পক্ষে আহরণ করা মুস্কিল। বলা বাহুল্য যে প্রেম নিবেদন জীবনশক্তিকে। রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদীয় মানসিকতা থেকে এখানেই জীবনানন্দ স্পষ্টই বিদায় গ্রহণ করলেন।

সমালোচক যদি বাঙালীর ঐতিহ্য উপেক্ষা করে বিলিতি ঢঙ্গে কবিতাটির রস উপলব্ধি করতে চান, তাহলে 'মনোভঙ্গী'র প্রশ্ন আসবে। এখানে কবির 'মনোভঙ্গী' করুণ রস নিবেদন করছে—অর্থাৎ এখানে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'যৌবনবেদনা রস'-এর আভাস আছে বলে উপলব্ধ হবে। অথবা তা-ও নিঃসঙ্গ বিরহী প্রেমিক চিত্তেরই রস।

ছন্দ প্রসঙ্গে বল্‌ব যে বাংলা প্রবহমান পয়ারের পদের একটি পংক্তি এ-রচনায় মাত্রিক ধ্বনিতে প্রসারিত করে নিতে হবে। 'ঝর্ণা' শব্দটিকে দু'-মাত্রায় রাখা যাবে না। কেন রাখলেন না কবি এ-কথাটিকে পয়ারে প্রচলিত ধ্বনিমাত্রার গম্ভীর বন্ধনে? যেহেতু, তিনি এ-শব্দটির উপর ঝোঁক দিতে চান অথচ পয়ারে বা প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রচলিত 'ঝরণা' লিপিটি পছন্দ করে ধ্বনিমাত্রার তরঙ্গিত বিস্তার দেখাতেও অনিচ্ছুক। প্রাচীনতাকে বর্জ্জনের ইচ্ছা ছন্দে ও লিপিতে পর্য্যন্ত ধাবিত! কিন্তু ভাষা ব্যবহারে তিনি এখানেও বঙ্গীয় পদ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। ক্রিয়াপদ কোথাও কথ্যভাষা অনুযায়ী, কোথাও বা সাধু-ভাষা অনুগামী হয়েছে। অবশ্য অচিরেই তিনি স্বকীয় কাব্য-ভাষারীতি

তৈরী করে আগামী দিনের কাব্যাচারীদের ব্যবহারের জন্যে রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু এখানে তিনি অস্থির।

ধ্বনি-তত্ত্বে প্রবিষ্ট চিত্ত এই অষ্টকটি বা আট পংক্তি থেকে যে-যে ধ্বনিচিত্র লাভ করবে, কাব্যের বিশিষ্টতা বর্ণন তার উপর অনেকটা নির্ভর করে। ধ্বনিবাদী প্রথমই জিজ্ঞাসা করবেন: কবি-প্রাণ কাকে আহ্বান করছেন? 'পাখির ঝর্ণা' হতে কাকে অনুরোধ জানাচ্ছেন? কোনো সৃষ্টিশীলা নারীর না বহু-নারীর মূর্ত্তি পাখীর ঝাঁক হয়ে এই কবি-পুরুষকে আদি সৃষ্টিস্বপ্ন দেখাচ্ছে? তারপর ধ্বনিবাদীর জিজ্ঞাস্য হবে: কোন বাস্তব পরিবেশে এই নারী বা 'রমণীসমাজ'কে তিনি ডাকছেন? সমুদ্রের ধারে সে কী পুরী? যেখানে ঝাউ বন আছে, নিমকাঠে জগন্নাথ তৈরী হয় যেখানে, যে ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নামে যাত্রীদল, সেই নীলাচলের কোনো প্রান্তরে কি কপোত-কপোতীর সুখনীড় তৈরী করে কবিচিত্ত সৃষ্টি অভিলাষী? আলঙ্কারিকরা এখানকার 'নীল ডিম' থেকে সুরু করে 'পাখীর ঝর্ণা' পর্য্যন্ত বিস্তৃত ধ্বনিচিত্রে নায়িকাকে 'সমাসোক্তি' ও 'সঙ্করালঙ্কার'-এ মুড়িয়ে চিনতে চাইবেন। একটা নীল ডিম ফেটে যেমন পাখী হয়, একটি শিশিরবিন্দু যেমন ঝর্ণার ছবি মনে এনে দিতে পারে—জড়, শীতার্ত্ত বস্তু যেমন উষ্ণতায় প্রাণময় হয়, এ-ধ্বনিচিত্রের নায়িকা তেম্নি হতে পারেন নায়ক কবি-পুরুষের উষ্ণতার সান্নিধ্যে এসে। কিন্তু এই অবলোকনে ভারতীয় ধ্বনিতত্ত্ব স্থির বসে নেই। 'ব্যঙ্গ্য'-ধ্বনি এ-পংক্তিগুলোতে কী আছে—কাব্য-চেতন ব্যক্তি তা ভাবতে থাকবেন। শব্দার্থ যা-ই বলুক, তাছাড়া একটি ভাব-ব্যঞ্জনা ধ্বনিময়ী পংক্তিগুলোতে আবিষ্কার করতে চাইবেন, যা স্থান-কাল-বিশেষিত কোনো জ্ঞানে বিধৃত নয়। আবহমান কাল ধাবিত নর-নারীর বিরহী সত্তার মিলনেচ্ছা যে পরিবেশে অবাধ ছিল, ধ্বনিস্মূরী কবিচিত্তকে সে-পরিবেশে বিচরণশীল দেখবেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতা যদি সে-যুগ আহ্বান করেছিল বলে ধ্বনিবাদীর প্রতীতি থাকে, যদি তিনি তখনকার সৎ ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন থেকে বলেন যে কবিচিত্তের এই পুনরাহ্বানে সে-যুগের কারো কণ্ঠ ও চেতনার সুর তিনি শুনতে পাচ্ছেন, তাহলে তাঁর মানসিক চিত্রসম্পর্কে সন্দিহান হয়ে কলহ করা যায়না। কবিতা কিন্তু এমন মানসিক চিত্র দিতে পারে বলেই 'মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত' করে থাকে। অবশ্য বিলিতি কাব্যের সমালোচকরা হাত বাড়িয়ে এসব চিত্র ধরতে পারলেও বলে থাকেন, আত্মরতি বা দুর্গমতায় তাঁরা হাত বাড়ালেন। কবিমনের সিঁড়ি তাঁদের স্বর্গের সিঁড়ি না হলে যেন সহজ নয়!

'ফিরে এসো' কবিতার অন্তর্গত নিঃসঙ্গতার আর্ত্তরব ও নির্জ্জনতা-পিপাসা কাব্যসূরীকে যতোটা সৎ বোধে উদ্বোধিত করবে তেমন আর কাউকে করবেনা—প্রেমিক চিত্তকেও না। প্রেমিক চিত্ত যদি অচৈতন্য অবস্থায় থাকে তাহলে এ-পংক্তিগুলো তাতে কামাতুর বেদনা ভিন্ন কোনো রস ফলিত বা ফেনায়িত করে তুলবেনা। বাঙালীর বিদগ্ধতা অচৈতন্যে নয়, চৈতন্যে ও চেতনাদানে।

॥ বহন্ত অরুণপ্সব উপ ত্বা সোমিনো গৃহম্ ॥

কবিতাগুচ্ছ

পুরাতন নিয়ম
হীরালাল দাশগুপ্ত

সমুদ্র কলঙ্ক রেখা দিগন্ত বলয়ে
বরফ-শীতল দেহ কঠিন পাথর
সবুজ ঘাসের ডগা শিশিরে শিশিরে
আর স্বপ্নশিহরিত বহু দূর অরণ্যের নীল
ইহাদের সাথে আছে মানুষের হৃদয়ের নিরিবিলি মিল
আছে বলে মনে হয়
মনে হয়
শাল তাল ব্যাঘ্র কুমীর বন্য হয়
ইহাদের সাথে ছিলো পূর্বপুরুষের পরিচয়
(ছিলো একদিন) নেই তার নাম
কোন জন কোরেছিলো জীবনের প্রথম সংগ্রাম
কুটিল কঙ্কাল আর নিষ্ঠুর পাথর খুঁজে খুঁজে
দেখা যায় পৃথিবীটা ঢাকা ছিলো একদিন সবুজে সবুজে
তার পর একদিন
(আভাষে ইঙ্গিতে তার কিছু জানা যায়)
—ইতিমধ্যে মহাকাল লিখে গেলো ইতিহাসে অনেক অধ্যায়—
পার হোয়ে মৃত্যু নীল অন্ধকার রাত
দেখা দিলো মানুষের প্রথম প্রভাত
তারপর ইতিবৃত্ত অতিপুরাতন
নিত্য নিত্য নব জন্ম ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল
আর মৃত্যু কদর্য্য-কুৎসিৎ
তথাপি আমরা শুধু এই সত্য জানি
প্রতি দিবসের রুদ্র রৌদ্র ব্যভিচার
আর মৃত অন্ধকারে রজনীর গ্লানি

নিষ্ঠুর গ্রানাইট বুকে চড়াই উৎড়াই
বহুদূরে থাকে থাক্ প্রক্সিমা সেন্টরাই
কিংবা নামহারা
অন্য কোনো তারা
আমরা চিনেছি শুধু রূপালী—হোলুদ-লাল এই সূর্য্যটারে
আর তার নীচে এই ধূসর সহর
আমরা দেখেছি চেয়ে সূর্য্যের কমলা রং গাছের সবুজে—
সকালের ঘনীভূত শীতের শয্যায়
আমরা দেখেছি চেয়ে পাথরের বুক-কাটা মাইল-মাইল ইস্পাতের পথ
আমরা জেনেছি এই খাঁটি
মাঠে মাঠে পায়ে পায়ে সোঁদা গন্ধ মাটি
শিশিরের ভেজা-অনুরাগে
সূর্য্য উঠবার বহু আগে
আমাদের হাতের ছোঁয়ায়
কলের চিম্‌নি আর কয়লার ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়
লেলিহান অগ্নিশিখা সহরের মুখে
মাঠে মাঠে সবুজের বুকে
আমাদের হাত দিয়ে বোনা
গুচ্ছ গুচ্ছ সোনা
আকাশের তারাগুলো গুঁড়ো-গুঁড়ো জল-জল হোয়ে
শিশিরের বিন্দু আর ধানের গমের শিষে শিষে
মাঠময় রোয়েছে ছড়িয়ে
এবং
তথাপি আমরা জানি
একে একে চলে গেছে যারা এসেছিলো
আর এই পৃথিবীরে একদিন প্রাণ দিয়ে ভালো বেসেছিলো
আপততঃ রোয়েছি আমরা এই খানে
আমরাও রমনীর কুটিল কটাক্ষে খুঁজি জীবনের মানে
অন্ধকার রাতে
শরীরের পরিচয় শরীরের সাথে

আড়ম্বর হীন
ভূমিকা বিহীন
পৃথিবীর প্রাণের প্রতীক
ক্রমশঃ প্রকাশিতব্য আমাদের ইতিহাস আকস্মিকতাহীন বৃত্তবন্দী গতানুগতিক
তথাপি আমরা—মানুষেরা—বেঁচে আছি বহুকাল ধরে
গুহায় গুহায় আর কুটীরে কুটীরে
প্রাচীন নগরে আর ধূসর সহরে
বহুকাল ধরি
জীবনের পরাজয় অস্বীকার করি
বারংবার
বিরহের শাদা অন্ধকারে রাখি মিলনের লাল অঙ্গীকার
যে-হেতু
আমরা মানুষ
সৃষ্টির বৈধতা
অতএব
জানি সুনিশ্চয়
একদিন-আস্‌বেই একদিন—হয়ত আগামীকাল—হয়ত বা একশো বছর পরে—
একদিন আস্‌বেই—একদিন নোতুন নিয়ম
সুতরাং
আস্‌বেই নোতুন মানুষ
নোতুন পৃথিবী গড়বেই
লিখবেই নোতুন কবিতা

ভরা আলো
সুনীল চট্টোপাধ্যায়

এমন আলো, যেন কোন্ দুর্লভ পুণ্যতিথির,
সকাল থেকে পথে ঘাটে আজ ছড়ালো।

যারা কাঁদছিলো মুখ ঢেকে
ধূলোর সংসার, ছাইমাটি আশা

ভিজে ভালোবাসায় মুখ ঢেকে
পথে বসে যারা কাঁদছিলো
কোন্ দূর নদী ডেকে বল্‌ল তাদের ঃ

তীর্থযাত্রার সময় হলো হে আমার মানুষের দল!
সেই উদাস সুন্দর লগ্ন এসেছে।
কত যুগ পার হ'য়ে, আমি তোমাদের স্নানের জল ব'য়ে এনেছি,
অগণ্য ঢেউ-এ ঢেউ-এ নিরন্তর জলের নির্মল মন্দির গড়ে ;
কত উপাসনার ভেসে-যাওয়া ফুলের গন্ধ, চন্দন বনের ছায়া,
কত সূর্যস্তোত্র সন্ধ্যামন্ত্রের উচ্চারণ ধরে রেখেছি বুকে ;
তোমাদের গলায় দোলাবো জলের উপবীত,
তোমাদের সর্বাঙ্গে দেব আমার সুচির পুণ্যের পূর্ণ অভিষেক।

হে আমার ব্যথিত তীর্থযাত্রীর দল!
আমি সমুদ্র জানি, সূর্যালোক ; আমি পাহাড় জানি, বিপুল সময় ;
বিশাল আকাশের সব ছায়া আমি জানি,
চিরপ্রবাহ আমার তবু তোমাদের তীর্থস্নানের পথ-চাওয়া,
আমি নদী। অনেক আমার অবগাহনের জল।

আর এমন আলো, যেন সেই উদাস সুন্দর লগ্ন!

অপরাজিতা
বটকৃষ্ণ দাস

আমিও বিনিদ্র রাত কাটালাম অন্ধকারে তার
আর্ত কণ্ঠস্বর শুনে। পরম দুঃখের অন্তরালে
সমস্ত মুখের রেখা মুছে দিয়ে ধূসর দেয়ালে
যে-অপরাজিতা জ্বালে প্রশান্তির প্রদীপশিখার
নীলাভ' আলোক, আনে নিরুচ্চার নেপথ্যে ভাষণে
গভীর বৃষ্টির পর স্বচ্ছ, স্থিত ইন্দ্রনীল রঙে
নিবিষ্ট আকাশ, এই উতরোল হাওয়ার সারঙে
সে-ও কি লুণ্ঠিত আজ স্বল্পপ্রাণ হেমন্তের বনে?

তবে কে বেদনা থেকে হাত ধ'রে পরম শান্তির
সমুদ্রে আমাকে নেবে? যন্ত্রণার দুঃসহ অনলে
অটল স্বভাবশিল্পে নাম যার অপরাজিতার
নির্জন শরীরে লেখা,—অলক্ষিত সেই তাপসীর
প্রতিভা নিঃশেষ যদি, তবে কে বিষণ্ণ ধারাজলে
অনিত্যের অকিঞ্চনে দেবে নিত্যকালের আধার?

আবর্ত
শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

আকাশ এখনো ঠিক আকাশের মত
পৃথিবী এখনো আছে সেই,
শুধু সরে গেছে জল বহু ঘুরপথ-ও
চিকচিকে বালি ফেলে দুপাড় ঘেঁষেই!

মৃত নদী, থেমে গেছে ভাঁটি ও উজান,
উলুবনে শুধু শাঁ শাঁ হাওয়া বয়ে যায়,
ডানা-ছেঁড়া কোন হাঁস যদি গায় গান
সময়ের বুকে উঠে সময়ে মিলায়!

ঠিকরায় তবু রোদ, জলাভূমি জলে
ভরে যায় থৈ থৈ প্রতিটি বছর,
শামুক সোনালী দাগ আঁকেও বিরলে
শাদা উই মাটি কেটে বেঁধে নেয় ঘর!

তবু এক আশা নিয়ে জানো, মনোরমা,
বেঁচে আছে সব মন বহুদিন ধরে,
যদি জোয়ারের টানে পলি হয় জমা
যদি কুলকুল রব সারাদিন ঝরে!

তা হলে আবার এক বড় জনপদ
গড়া হয় সারাদিন পাখিদের গানে,
আকাশ উপুড়-করা দুপুরের পথ
এঁকে রাখে ঘুঘু-ডাকা শ্রাবণে অঘ্রাণে।

ওয়েসিস্
শ্রীতারক ঘোষ

দিনের শব্দের জ্বালা হাজার শিখায়
পোড়ালো সন্ধ্যাকে?
এ কি পোষ? হিম কই?
চারদিকে বোশেখি আগুন।—
প্রাণ জ্বলে—তৃষ্ণাতুর বুক
হল মরুভূমি॥

স্বপ্নদেখি ঃ
একখানা আশ্বিনের মেঘে গড়া হাত।
একটি শিশির-কণা—
এক ফোঁটা জল
বিভোল চোখের॥

প্রাণ জ্বলে যায়।
শুকিয়েছে চোখ।
শুধু স্বপ্ন ঃ এক ফোঁটা জল॥

ঝড়
বীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত

এক-একদিন মনে নেমে আসে দুর্নিবার ঝড়।
প্রক্ষিপ্ত স্তননে-হাঁকে থরোথরো দোলা লাগে হাড়ে।
ঝড়ের দৌরাত্ম্য দ্রুত পরিব্যাপ্ত। উত্তুঙ্গ পাহাড়ে
বন্যার উদ্বেল উৎস খুলে দেয়। শিলীভূত স্তর—

গ্রানাইট ধ্বস্ নামে।—ঘূর্ণিস্রোত। আর্তি আনে। জ্বর
ছড়ায় শরীরে-মনে। অগ্ন্যুৎপাত। নির্দয় প্রহারে
তীব্র বিষ ঢালে যেন। শান্তি কেড়ে নেয় অভিসারে।
উদ্বাস্তু পৃথিবী। ম্লান, মেঘাবৃত অসীম অম্বর।

তুমি যবে কাছ থেকে দূরে যাও, স্বপ্ন ধূলিসাৎ—
পৃথ্বী অন্ধকার ঠেকে, আশ্চর্যের লগ্ন হয় দূর,
মুহূর্তে আকাশ ভেঙে অতর্কিতে রুদ্র বজ্রপাত,
ঝড়ের ঝঞ্ঝনা নামে। ঠোকাঠুকি সমস্ত বস্তুর
অগ্রিম সংঘাত লাগে। তাই ত তোমাকে অনুনয়
সর্বদা ঘনিষ্ট হও। টেনে নাও—ঝড় আর নয়।

অপর সম্ভাবনা
আলোক সরকার

বিচিত্র ছবির ভিড়ে আমরা এসেছি কয়দিন।
পথের বাঁকের কাছে কৃষ্ণচূড়া রক্তিম নিশ্বাসে
আলো কম দোকানীর ঘর আলো পরম বিশ্বাসে
স্টেশনের বাঁকা পথে গ্রামবাসী প্রৌঢ় স্থির চোখ—
সরলতা স্নিগ্ধ হাসি অন্য রঙ্ করেছে মলিন
নিজের স্মরণে তার খোঁজ পাবে—থাক্ সেই শোক।

ভালোবাসবো ব'লে দেখি পৃথিবীকে তা যদি না হয়
ম্লানতার ছায়া আসে উঁচুনিচু সর্পিল পথের
দরজা ঠিক খুলে যাবে। হেঁটেছি যখন জীবনের
অতিবৃদ্ধ রুগ্নপথে দেখলাম চতুর ছলনা।
অর্থ? তা জানিনি কিছু। কোনদিন তির্যক প্রলয়
তাকে না জানায় যেন। জেনেছি অপর সম্ভাবনা।

॥ মধ্যদিনে যবে ॥
দেবীপদ ভট্টাচার্য

লালবাঁধের বুক থেকে ছুটে-আসা এক ঝলক আগুনে হাওয়া। এরই মধ্যে সংগীতভবনের স্বরচর্চার আভাস মিলছে নারীকণ্ঠে ও তারযন্ত্রে। গেরুয়া ধুলো উড়ছে রাস্তায়। কলাভবনের পাশের বুদ্ধ মূর্তিটি এখান থেকে নজরে পড়ে। নির্মেঘ আকাশ, নির্জন দুপুর। মধ্যদিন। শান্তিনিকেতন, শ্রীপল্লী। হেলানো চেয়ারে শুয়ে শুয়ে মনে হোলো দুপুরের রূপ কারো চেয়ে কম নয়। সকাল ও সন্ধ্যার, অপরাহ্ণ ও রাত্রির মনোহরণ-করা মায়ায় ভুলে কতবার নিজেকে সুখী মনে করেছি। কিন্তু আজকের এই গেরুয়া-ধুলো ওড়া, উত্তপ্ত দুপুরে আমি দুপুরকে ভালোবেসে ফেললাম। আর অনুকম্পা বোধ করলাম ইংরেজ কবিদের জন্যে যাঁরা তাঁদের কবিতায় দুপুরকে আঁকেন নি। এমন রৌদ্রস্নাত দুপুর দেখবার সৌভাগ্য তাঁদের বড়ো হয়নি। তাই দুপুর রয়ে গেল তাঁদের কাব্যের উপেক্ষিত।

বৈদিক ঋষিরা নয়ন মেলে জগতকে দেখেছেন। মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুগন্ধে ভরা পৃথিবীতে তাঁরা বন্দনা করলেন উষাকে। যে বর্ণনায় আশ্চর্য সহজতা, বিস্ময়কর বলিষ্ঠতা। অব ম্র্যমজইব চিন্বতী উষো যাতি স্বসরস্য পত্নী, সূর্য প্রেমিকা উষা তাঁর দেহের আবরণকে উন্মোচন করে এগিয়ে চলেছে। মর্যো ন ঘোষামভ্যেতি পশ্চাৎ, সূর্য্য উষাকে অনুসরণ করছে যেমন যুবক চলে যুবতীর অনুসরণে। কিম্বা অধি পেশাংসি বপতে নৃতূরী বাপোর্ণুতে বক্ষ উস্রৈব বর্জহং—রবীন্দ্রনাথ যার অনবদ্য অনুবাদ করেছেন, 'বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি।' আদি-গ্রীকের নয়ন-মন তো এই একই রূপময় সূত্রে গাঁথা। আমাদের 'সংস্কৃত' সাহিত্যে কিন্তু সন্ধ্যা ও রাত্রির সিংহাসন পাতা। অভিসার ও মিলনের প্রশস্ত কাল ঐ দুটি। সংস্কৃত কাব্য-নাট্যের রসিক জনমাত্রেই অবগত আছেন যে পূর্বরাগ ও মিলন এই দ্বৈতবাদই তাঁদের কাব্যজীবিত :

কোন বসন্ত মহোৎসবে বেণুবীণার কলরবে
মঞ্জরিত কুঞ্জবনের গোপন অন্তরালে
কোন ফাগুনের শুক্লনিশায় যৌবনেরি নবীন নেশায়
চকিতে কার দেখা পেতেম রাজার চিত্রশালে।
ছলা করে তার বাঁধত আঁচল সহকারের ডালে ॥

বেদে উষার বন্দনা কি সুন্দর! বেদ আমাদের সভ্যতার উষা। তাই বেদে উষার বর্ণনা। আর সংস্কৃত সাহিত্য আমাদের অপরাহ্ণ ও রাত্রি। বেদে শব্দের যে নবীনতা, ছন্দের যে স্বাধীনতা লক্ষ্য করি সংস্কৃত শব্দে বা ছন্দে তার অভাব। বেদের ভাষা living সংস্কৃতের ভাষা dead. বেদে সরলতা, সংস্কৃতে কৃত্রিমতা। বেদের 'প্রকৃতি' কি পবিত্র, কি উজ্জ্বল। আর সংস্কৃত কাব্য-নাট্যে 'প্রকৃতির' প্রতিটি অঙ্গ নারীর বিভিন্ন ভোগাঙ্গের সঙ্গে তুলিত। তাই সন্ধ্যা ও রাত্রির রূপ দেখি সম্ভোগাশ্রিত। এই ভোগবাদের শেষ অঙ্কই বুঝি রঘুবংশের বা গুপ্তযুগের অগ্নিবর্ণ-অধ্যায়। সন্ধ্যা ও রাত্রির একছত্র

আধিপত্যের মধ্যেও কালিদাসের একটি স্বপ্নকল্প দুপুর কিছুতেই ভুলতে পারিনে। সেদিনও এমনি উত্তপ্ত হাওয়া। মালিনী-লতাকুঞ্জে নলিনী পত্রে নখরেখায় লিপি-লিখনরতা শকুন্তলা। বিরহিনী শকুন্তলার সামনে অকস্মাৎ এসে দাঁড়ালেন দুষ্মন্ত। তারপর—

শকুন্তলা। মুঞ্চ দাব মং। ভূতো বি মহীজনং অনুমান ইস্সং।
রাজা। ভবতু মোক্ষ্যামি।
শকুন্তলা। কদা।
রাজা। অপরিক্ষত কোমলস্য তাবৎ কুসুমস্যেব নবস্যষট্পদেন।
অধরস্য পিপাসতা ময়া তে সদয়ং সুন্দরি গৃহতে রসোজস্য ॥

—বলে দুষ্মন্ত শকুন্তলার মুখখানি তুলে ধরবার চেষ্টা করলে শকুন্তলা সলজ্জভাবে রাজাকে বাধা দিলেন। এ দৃশ্য কি ভুলবার। শুধু কালিদাসই নন। আমাদের বৈষ্ণব কবিরাও রাধা-কৃষ্ণের অভিসার-মিলন-মান শুধু সন্ধ্যা বা রাত্রির আঁধার আলোকে ঘটিয়ে ক্ষান্ত হননি। দুপুরও মিলনের নির্বাক সাক্ষী হয়ে আছে। মনে পড়ল সেই পদটি :

হেদে গো বিনোদিনী এপথে কেমনে যাবে তুমি।
শীতল কদম্ব তলে বৈসহ আমার কোলে
সকলি কিনিয়া লব আমি।
এ ভর দুপুর বেলা তাতিল পথের ধুলা
কমল জিনিয়া পদ তোরি।
রৌদ্রে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় দুখ
শ্রমভরে আউলান কবরী ॥

কিন্তু তার চেয়েও উপভোগ্য রাধিকার মেঘাবৃত দুপুরকে সন্ধ্যাভ্রম। দিবাভিসার।

শান্তিনিকেতনের এই মৃদু-গীতধ্বনি-সুরভিত দুপুরে মনে মনে দেখতে লাগলাম 'পাগলিনী রাধিকার' ছবি।

দুপুরের রূপ রবীন্দ্রনাথ যেমন দেখেছেন তার বাইরের রূপ তার ভিতরের রস এমন পরিপূর্ণ করে দেখা কখন কেউ দেখেনি। ভারতীয় সংগীতের অন্তর-রূপটি রবীন্দ্রনাথ কতভাবে বোঝাতে চেয়েছেন। আমাদের রাগ-রাগিনী ঋতুচক্র বা দিনরাত্রির প্রহরের রূপান্তরের সঙ্গে বাঁধা। সে-রাগ-রাগিনী তো বাইরের কর্মজগতকে মেনে চলে না, বরং তাকে অবজ্ঞা করে চলে। রবীন্দ্রনাথ তবু দুপুরের সারং রাগকে পছন্দ করেন নি। তাই তাঁর দুপুরের গানে বেশির ভাগ বিকেলের বা সন্ধ্যার সুর। অমনি মন-উদাস করা সুর। 'প্রখর তপন তাপে' গানটিতে তাই ঘটেছে ভীমপলশ্রী, মুলতানী ও ভৈরবী মিশ্রণ। আসলে রবীন্দ্রনাথ দুপুরের মোহ-জাগানো রূপটিকেই অনুভব করেন সব চেয়ে বেশি। এই অনুভূতি তাঁর বালক-মনে প্রথম জেগেছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন বালক, জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তখন বন্দীপ্রাণ জীবন। সেই বালকপ্রাণ অনুভব করত :

'মাথার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্মতীক্ষ্ণ ডাক আমার কানে আসিয়া পৌছিত এবং সিঙ্গির বাগানে পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলার সমুখ দিয়া পসারি সুর করিয়া 'চাই চুড়ি চাই, খেলেনা চাই' হাঁকিয়া যাইত—তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।'

'ডাকঘর' এর অমলের মনটা যে উদাস হয়ে যেত সে এই দুপুরের মায়ায়, এই রৌদ্র মাখানো অলস বেলায় তরুমর্মরে ছায়ার খেলায়। তাই সে বলত—

'দুপুর বেলা সবাই যখন ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে তখন আমি কোথায় কতদূরে কেবল কাজ খুঁজে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব।'

এমনি এই দুপুরের মোহ। বালক রবীন্দ্রনাথ ভৃত্যরাজকতন্ত্রের শাসনে জানলায় বসে বসে দেখেছিল দুপুরের এই মন উদাস করা রূপ। তাই বুঝি গল্পগুচ্ছের পোষ্ট মাষ্টারের দীর্ঘনিশ্বাস ধ্বনিত হয় এই নির্জন মধ্যাহ্নে, কংকাল গল্পের নায়িকার মিথ্যা প্রণয় লীলাভিনয় এই রৌদ্রতপ্ত দুপুরে, রাজীব-মহামায়ার সাক্ষাৎ মধ্যদিনের করুণ নিস্তব্ধ মুহূর্ত্তে।

এ দুপুর অবশ্য রৌদ্রদীপ্ত। রৌদ্রঢালা দুপুরের ছবি ও গান রবীন্দ্রনাথে বেশি। সাহাজাদপুর থেকে লিখেছেন—'এখানকার দুপুর বেলাকার মধ্যে একটা নিবিড় মোহ আছে। রৌদ্রের উত্তাপ, নিস্তব্ধতা, নির্জনতা, পাখিদের সুন্দর সুদীর্ঘ অবসর—সবশুদ্ধ আমাকে উদাস করে দেয়।' অথবা কলকাতার ১৮৯৫ এর ৯ই এপ্রিল। সেদিনের দুপুরের ভাবনার সঙ্গে অমলের ভাবনার কী অপূর্ব মিল :

'ঢং ঢং করে দশটা বাজল। চৈত্রমাসের দশটা নিতান্ত কম বেলা নয়। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে।…ইচ্ছে করছে কেনো একটা বিদেশে যেতে—বেশ একটি ছবির মতো দেশ —পাহাড় আছে, ঝরণা আছে, পাথরের গায়ে খুব ঘন শৈবাল হয়েছে, দূরে পাহাড়ে ঢালুর উপরে গোরু চরছে,—আকাশের নীল রংটি খুব স্নিগ্ধ…'

দুপুরের কত রঙে রঙ-করা চিত্রই তিনি এঁকেছেন কথার তুলিতে। কখনও বা আঁকতে আঁকতে চলে গেছেন বর্তমান থেকে অতীতে, সুদূর অতীতে। 'ছবি ও গান' কাব্যের 'মধ্যাহ্ন' কবিতাটিতেই প্রথম এই মনের ভাবটি ধরা পড়েছে :

বুঝি বা এমনি বেলা ছায়ায় করিত খেলা
তপোবনে ঋষি বালিকারা,
পরিয়া বাকল বাস মুখেতে বিমল হাস
বনে বনে বেড়াইত তারা।
হরিণ শিশুরা এসে কাছেতে বসিত ঘেঁসে
মালিনী বহিত পদতলে,
দুচারি সখীতে মেলি কথা কয় হাসি খেলি
তরুতলে বসি কুতূহলে ॥

'মানসীর 'কুহধ্বনি' কবিতায় যে-দুপুর তাকে কবি অভিহিত করেছেন 'রৌদ্রময়ী রাতি' আখ্যায়। সেখানেও গাজিপুরের দুপুরের মধ্যে বহু শতবর্ষের পার হওয়া দুপুরের অনুধ্যান।

আবার এই দুপুরের রৌদ্রের মধ্যে কবি শুনেছেন রুদ্রের ডিমিডিমি ডমরুধ্বনি, আহ্বান করেছেন সেই উন্মত্ত শম্ভুর ডমরুধ্বনিকে আপন অন্তরে স্পন্দিত হতে। বুক পেতে দিতে চেয়েছেন সেই পাগলের রুদ্র আহ্বানকে স্বীকার করে।

সেদিন জীবনের রণক্ষেত্রে
দিকে দিকে জেগে উঠল সংগ্রামের সংঘাত
গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।
একতারা ফেলে দিয়ে
কখনো বা নিতে হলো ভেরি
খর মধ্যাহ্নের তাপে
ছুটতে হল
জয় পরাজয়ের আবর্তনের মধ্যে।
পায়ে বিঁধেছে কাঁটা
ক্ষত বয়ে পড়ছে রক্তধারা ॥

এই জীবনমধ্যাহ্নকেও কবি স্বীকার করেছেন। তাই তাঁর দুপুর শুধু স্বপ্নময় ললিত নয়, সে হয় বেশী কঠোরও।

আমার কি জানি মনে হয় আষাঢ়ের প্রথম দিবসে যে 'আশ্লিষ্টসানু' মেঘকে রামগিরি আশ্রমবাসী 'কনকবলয়ভ্রংশ রিক্ত প্রকোষ্ঠ' নির্বাসিত যক্ষ দেখতে পেয়েছিল সেও বুঝি দুপুর বেলায়। আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতায় বর্ষণক্লান্ত দুপুর আশ্চর্য্যভাবে দেখা দিয়েছে। 'ভিজে মেঘের দুপুরে' আধুনিক কবি সোনালি ডানার চিলের গান শুনেছিলেন যার কান্নার সুরে 'বেতের ফলের মতো চোখ মনে আসে'। সেই কান্নার সুরে কবির মনে নব-যক্ষের বেদনা জাগে 'আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে?'

তবে দুপুরকে আমরা কাব্যেই রূপ দিয়েছি, কর্ম্মে দিইনি। প্রচণ্ড দুপুরে জানলা বন্ধ করে মনে মনে কৃত্রিম 'স্তব্ধ বিজন সন্ধ্যা-বেলা' রচনা করে দুপুরকে ফাঁকি দিতে চেয়েছি। কিন্তু দুপুরকে ফাঁকি দিয়েছি বলে দুপুর আমাদের ফাঁকি দিচ্ছে। তাই জীবনের বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্র থেকে আমরা প্রায়শ হটে আসছি। দুপুরকে যেদিন জীবনে গ্রহণ করব সেদিন আমাদের জাতীয় জীবনের যথার্থ মধ্যাহ্ন হবে। এমন মধ্যাহ্ন যে আসেনি তা নয়। উনিশ শতকে এসেছিল। কিন্তু আমরা তাকে ধরে রাখতে পারিনি। তাই মধ্যাহ্ন নিয়ে আজ আমাদের জাতীয় জীবন-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কী আশ্চর্য্য। দুপুর যে প্রায় গড়িয়ে গেছে, সংগীতভবনের গীতধ্বনি বহুক্ষণ নীরব। পিছনে তাকিয়ে দেখি—

গোরুর গাড়ির সারি হাটের রাস্তায়
রাশি রাশি ধুলো উড়ে যায়
রাঙা রাগে
রৌদ্রে গেরুয়া রঙ লাগে।

হ্যেল্ডারলিন অবলম্বনে

বুদ্ধদেব বসু

বিদায়

কথা ছিলো বিচ্ছেদের ; তা-ই ভালো হবে, বলেছিলে।
তবে কেন মনস্তাপ ঘিরে এলো, যেন মোরা আতঙ্কিত
আততায়ী ?—হায়, কতটুকু
জানি মোরা আপন আত্মারে ? অন্তরের অন্ধকারে ব'সে
আদেশ করেন এক অলঙ্ঘ্য দেবতা।

সেই দেবতারে প্রতারণা ? সেই তাঁকে প্রত্যাখ্যান, যিনি
সত্তার সর্বস্বস্রষ্টা, জীবনের প্রাণস্পন্দ, আমাদের অদ্ভুত প্রেমের
আদি উৎস, প্রেরণা, প্রহরী ?
—কিছুতেই আমি তা পারি না

তবু এই সংসারের উদ্ভাবনে অন্য কত দুর্জয় অন্যায়
হানে ভিন্ন নাগপাশ, বাঁধে অন্য নির্বোধ বিধানে আমাদের ;
তারপর অভ্যাসের মৃত আবর্তন
দিনে-দিনে জীর্ণ করে প্রাণ।

আমি তো জেনেছি সব সে-দিনেই : যবে সেই কবন্ধ, বিকট
আতঙ্কের বদ্ধমূল সংক্রমণে ছিন্ন হ'লো মানুষ, দেবতা ;
জানি, আজ দেবতার নূতন তর্পণে
প্রেমিক-প্রেমিকাদের হৃৎপিণ্ডে হবে রক্তবলি।

আর নয়, কথা নয়। কোনোদিন, কোনোদিন আর
পিশুন নিয়তি যেন শান্তির সময়ে
আমারে না দণ্ড দেয় নির্বাসনে নিঃসঙ্গ ভ্রমণ ;—
অন্তত বিদায় হোক আমাদের একান্ত সম্পদ।

তুলে ধরো পানপাত্র তুমি নিজে, যাতে পূত, তীব্র হলাহল
—উদ্ধারের মন্ত্র-পড়া—যাতে গূঢ় মৃত্যুর গণ্ডূষ
নিঃশেষে তোমারই সঙ্গে পান ক'রে অবশেষে ঝ'রে যেতে পারে
আমার হৃদয় থেকে যুগপৎ ঘৃণা আর প্রেম।

যাবো আমি, ছেড়ে যাবো। হয়তো বা দূর ভবিষ্যতে কোনোদিন
তবু ফিরে দেখা হবে, দিওতিমা! কিন্তু ততদিনে কামনার
শোণিতক্ষরণ থেমে গেছে; অভিষিক্ত মৃতের মতন
পরম শান্তিরে নিয়ে তুমি আর আমি

পথে-চলা নম্র কথা বিনিময় ক'রে যাবো, কখনো গম্ভীর
ভাবনায় দ্বিধান্বিত। কিন্তু এইক্ষণে
বিদায়ের জনপদ ডেকে-ডেকে আনে যে ফিরায়ে
অপসৃত বিস্মৃতেরে, আমাদের অন্তরে সে কোন

হৃৎপিণ্ড উষ্ণ হ'য়ে ওঠে, বিস্ময়ে তোমারে আমি অবিরল
দেখি চেয়ে-চেয়ে, কানে শুনি বীণাধ্বনি, কলস্বর, যেন দূর অতীত কালের
মধুর, মধুর গান; আর স্বচ্ছ সরসীর 'পরে
অতি ধীরে খুলে দেয় পদ্ম তার সোনালি সৌরভ।

টেবিলক্লথ

আমার টেবিলে ছিল শীত
তোমার বসন্ত-ফুল বিনে
কি করে যে জানলে জানিনে
পেতে দিয়ে গিয়েছিলে বসন হরিৎ।
রঙছুট কাপড় ক'দিন
একটি ফুলের মন রাখে!
ভুলে গেছি আজ যে তোমাকে
খুলতে না পেরে জানালার অন্য ঋণ।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

গড় শ্রীখণ্ড

অমিয়ভূষণ মজুমদার

[পূর্ব্বানুস্মৃতি]

আবদুলগনি দলবল নিয়ে লোকো-সেডের দিকে হাঁটতে সুরু করল। একটা ছোটখাট চাঁদ উঠে পড়েছিল, তার বাঁদর-রঙের আলো পাথরের টুকরোর অমসৃণ পথে পড়ছে। ইঞ্জিনখানার কালিমাখা এই পুরুষ কয়েকটি তখনও সম্ভবত স্ত্রীদের নিয়েই আলোচনা করছে, তার ফলে তাদের হাসাহাসির শব্দ দূর থেকে কানে আসছে। এরা সুখী কিনা এ নির্ণয় করা কঠিন। সুখের কোন জাত্যগুণ সহসা চোখে পড়ে না যে তার সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করা যাবে। আত্মা যদি একটি কল্পনা মাত্র হয়, সুখ ও দুঃখ একই বিষয়: স্নায়ুর কুঞ্চন-প্রসারণ মাত্র। এদের মধ্যে যে স্নায়ু-উৎক্ষেপগুলি আত্মবিস্তার ও আত্মরক্ষণের পক্ষে সহায়ক সে গুলিকে সুখ বলা যেতে পারে। বেঁচে আছি—বেঁচে আছি এ অনুভবের চাইতে গভীর আর কোন অনুভূতি? মনের এ অবস্থায় রুগ্ন দেহকেও সবল বোধ হয়, প্রাচীন বটের পাশে দাঁড়িয়ে তার মতোই জীর্ণ ত্বকের গভীরে প্রাণ-স্পন্দিত মনে হয় নিজেকে, তখন সমুদ্র-উদধি, সূর্য্য, বৃক্ষারণ্য, হিমাচলও প্রাণ সখা হয়। আনন্দ ও হাস্য, পরে করুণার জন্ম হয়। এগুলিকে জীর্ণ বা সংকীর্ণ করতে কোন অসার্থকতা যথেষ্ট বিদ্বেষপরায়ণ নয়।

চিন্তা-ভাবনা নির্জন না হ'লে আসে না। ফিরবার পথে জয়হরি বকতে বকতে চলল। তখন চিন্তা না ক'রে তার কথায় কান পেতে রাখতেই ভালো লাগল মাধাই-এর।

কিন্তু মাষ্টারমশাই লোকটির ছাত্রদের উপরে অবশ্যই প্রখর দৃষ্টি ছিল। পরদিন সকালেই সে উপস্থিত হ'ল।

—ও পাড়ায় গিয়েছিলে, মাধাই; কথাবার্ত্তা হ'ল?

—কথাবার্ত্তা তেমন না, গল্প-সল্প আর কি।

—কিসের গল্প, মাধাই?

বলা কি উচিত হবে, ভাবল মাধাই। মদ আর মেয়েদের কথা কি ক'রে বলা যায় মাষ্টারমশায়ের মতো লোককে।

—বলো, মাধাই, মেহনতি মজুরের লজ্জার কি আছে।

—বউদের কথা হ'ল।

মাষ্টারমশাই হেসে বলল,—পৃথিবীর আধখানা বউরা, তাদের কথা বলতে লজ্জা নেই। কিন্তু তার চাইতে বড় কথা প্রথমদিনেই যারা তোমার সামনে বউদের নিয়ে আলোচনা ক'রেছে তারা তো তোমার বন্ধু। রবিবারে খোঁজ রেখে আবার যেয়ো।

মাধাই কাজে যাবার আগে পোষাক পরছিল তখন কথাটা মনে হ'ল তার। মাষ্টারমশাই

দু'কথায় আবদুলের সব কথা সমর্থন করেছে, জীবনের সাথে স্ত্রীদের যে যোগটার কথা আবদুলগনি বলেছিল সেটা মূল্যহীন নয়।

গোবিন্দর কথা মনে হ'ল, আর সেই সুকন্যা না কি নাম যার সেই মেয়েটির কথা। গোবিন্দবাবু কি তাকে সুখী করার জন্যেই চলে গেল।

ষ্টেশনের পথে চলতে চলতে মাধাই চিন্তা করল, তাই হয় বোধ হয়, বেঁচে থাকা তখনই ভালো লাগে যখন আপন একজন থাকে। সংঘের কাজের বিদ্বেষের নেশাটাকে আর তেমন ধরছেনা। বাকিটুকু কর্ত্তব্যের মতো, ডিউটির মতো ভারি বোধ হ'চ্ছে। গোবিন্দবাবু বোধ হয় একথা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিল। মাষ্টারমশাইএর অবশ্য এসবে দৃক্‌পাত নেই, সব সময় অন্যের চিন্তায় ব্যস্ত, যেন সকলকেই পরীক্ষায় পাশ করাবে।

কিন্তু মদ? কাজের ছোটখাট অনেক অবসরে কথাটা মনে করল। মদ যদি খারাপ জিনিষ না হয়, ভদ্রলোক ছি-ছি ক'রে ওঠে কেন? যারা খায় গোপন করে কেন? মন হাতড়াতে গিয়ে যে দৃশ্যটা সে খুঁজে পেল সেটা ছি-ছি করার মতোই। ধাঙ্গর পাড়ায় রোজই দেখা যায়, রাস্তার পাশে মরার মতো স্ত্রী-পুরুষরা পড়ে আছে, মুখের উপর ভন্ ভন্ ক'রে নীল মাছি উড়ছে। কি কুৎসিত, কি ময়লা!

তবে মদ যে পথে পথে খেতে হবে এমন কথা নয়। সাহেবরা খায়, তারা খানায় পড়ে থাকে না। গোবিন্দবাবুও খান। তা হ'লেও –

মাধাই 'তাইলেও' কথাটা উচ্চারণ ক'রে ফেলল চিন্তা করতে করতে। তা হ'লেও মদে কি হবে। মাধাই স্বচক্ষে দেখেছে স্পেশ্যাল ট্রেনের কাঁচের জানলা দিয়ে কাঁটা-চামচ, তোয়ালের ফুলে, কাঁচের আলোর সেই স্বর্গরাজ্যে বসে সাহেবরা মদ খেতে খেতে চলেছে। তখনও কিন্তু তাদের বসার ভঙ্গিটিও নির্জীব। মুখের কথা বোল না, যেন জোর ক'রে কেউ তাদের পাচন খাওয়াচ্ছে।

আবার একদিন মাষ্টারমশাই এসে বলল,—ঘরে আছ, মাধাই?

—আসেন, প্রণাম হই?

—কি হ'ল, মাধাই?

—কই, তেমন কিছু আর কি?

খানিকটা সময় আলোচনা ক'রে মাধাইকে কথার মাঝখানে পরিখা খুঁড়ে শক্ত হ'য়ে থাকতে দেখে একটু থেমে হাসিহাসি মুখে মাষ্টারমশাই বলল,—তুমি কি বাঁচতে চাও, মাধাই?

আজ মাধাই অত্যন্ত দুঃসাহস প্রকাশ করতে বদ্ধপরিকর। সে বলল,—তাই চাই।

—বাঁচতে হ'লে ঘরদোর লাগে, অন্নবস্ত্র লাগে।

—তা লাগে।

—এখন যা পাচ্ছ তা যথেষ্ট নয়।

—তা নয়।

—যথেষ্ট পাওয়ার কি উপায়?

—ঠিক জানি না, মাষ্টারমশাই!

—দল বেঁধে দাবি করতে হবে, দর কষাকষি করতে হবে। এক সময়ে তুমি টাকার জন্য গোরুকে বিষ দিতে।

মাষ্টারমশাই তার সম্বন্ধে কতদূর খবর রাখে জেনে মাধাই বিস্মিত হ'ল। কিন্তু ধীরভাবে বলল,—আর কোনদিনই কাউকে বিষ দেব না।

—এখনই বলা যায় না।

—তা না যাক, টাকাতে সুখ হয় না। আপনার টাকা আমার চেয়ে বেশী।

—আমি তোমার চাইতে সুখী কিনা এইতো তোমার প্রশ্ন?

—না বাবু, তা করি নাই। আমি পারিনে, ভালো লাগে না।

পরে একদিন আসব ব'লে মাষ্টারমশাই সেদিনের মতো চলে গেল। কিন্তু মাধাই মাষ্টারমশাইএর জন্য অপেক্ষা করল না। ইতিমধ্যে একদিন লোকোসেড মহল্লায় গিয়ে এমন পরিশ্রম করল যে খবর যখন মাষ্টারমশাইএর কাছে পৌছাল তখন সে স্তম্ভিত হ'ল, কোলকাতা নামে এক সহর থেকে যে শ্রমিক নেতারা এসে পারস্পরিক নেতৃত্বের মহার্ঘতার প্রচার করছিল তারা বিপন্ন বোধ করল সাময়িকভাবে।

কিন্তু ফিরতি পথে মাধাই একটা কাজ ক'রে বসল, তার খবর কারো কাছে পৌছল না। রজনীর দোকান থেকে এক বোতল মদ কিনে কিছু খেয়ে কিছু সঙ্গে নিয়ে সে বাসার পথ ধরল। গলা সুর সুর করছিল। প্ল্যাটফর্মে উঠে অন্ধকার জায়গা দেখে আরও খানিকটা গলায় ঢেলে দিল সে। বাসার কাছাকাছি পৌছাতে পৌছাতে কিম্ভূত একটা অনুভূতি হ'ল তার। মন যেন বল পাচ্ছে অনেকদিন পরে। সে সম্মুখের অন্ধকার শূন্যকে লক্ষ্য ক'রে গর্জন করে উঠল—এই ওপ্।

নিজের ঘরের বারান্দায় বসে সে একটা সিগারেট ধরাল। কয়েকটান ধোঁয়া গিলে শরীর অস্থির ক'রে উঠল। শরীরকে সুস্থ করার জন্য বোতলের বাকি মদটুকু চুষে চুষে খেল। তার বোধ হ'ল সে আর বাঁচবে না। চোখে জল এল। অন্ধকারে শায়িত নিজের একটি বিপন্ন প্রাণকে যেন সে দেখতেও পেল। তার মনে হ'ল মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার। ঘরে ঢুকে মাটিতে বসে বিছানায় মাথা রাখল। দেহ ও মস্তিষ্ক একটি আচ্ছন্নতায় ডুবে যাচ্ছে। আচ্ছন্ন অবস্থায় মাধাই বিছানা থেকে ফসকে মাটিতে শুয়ে পড়ল। মূর্চ্ছা ও ঘুমের মাঝামাঝি অবস্থায় সে কখনো কখনো ফোঁপাতে লাগল, যেন তার একটি অন্তরাত্মা আছে, এবং সেটা অত্যন্ত ব্যথিত এবং তার চাইতে বেশী ভীত হ'য়ে কাঁদছে।

এগোলেও মৃত্যু, পিছোলেও তাই। সুরতুন একদিন ভয়ে ভয়ে বলেছিল ফতেমাকে, আগুনের বেড়াপাক। মোকামে পুলিশ চালের পুঁটুলি কেড়ে নেবার ভয় দেখালে টেপির মা তাদের ভয় দেখাতে ষ্টেশানে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের তলার গিয়ে বসত আত্মহত্যার ভঙ্গীতে। সেই অভিনয় যে কত মর্মান্তিক তার পরিচয় দিয়েছে ফুলির মৃত্যু। বাঁচার জন্যই চালের কারবার। চাল প্রাণ দেয় ব'লেই চালের জন্য এত করা, যদি সেই বাঁচার আশ্বাস আর না থাকে, চাল যদি বিষের দানা হ'য়? এসব কথা ভাবতে গিয়ে একদিন নিজের কাছে কৌতুকের মতো মনে হ'ল—কি ভয়টাই না পেতে সে পুলিশদের। মৃত্যুর তুলনায় পুলিশ যে কিছু নয় এটা সে যেন আবিষ্কার করল।

আর একটি সমস্যা হ'য়েছে ফতেমা। ফতেমা গ্রাম-মুখো হ'য়ে পড়েছে ক্রমশ। দু'তিন মাস

সে এদিকে আসেনি। স্বরতুন একবার খোঁজ করতে গিয়েছিল তবু সে আসে নি। অবশ্য এ সময়টায় চালের কারবারে মন্দা পড়ার কথা, কিন্তু স্বরতুনের বিপন্ন বোধ হয় চুপ ক'রে বসে থাকতে হাত গুটিয়ে কিম্বা একা একা চালের মোকামে যেতে।

স্বরতুন বন্দরের এক মহাজনের আড়তে একটি কাজ যোগার ক'রে নিল। সকাল থেকে কাজ আরম্ভ—মহাজনের গুদামঘরের নিভৃততম অংশে বসে কেরোসিন কুপির স্বল্প আলোয় বস্তা পচা চাল থেকে পোকা ঝেড়ে ফেলার কাজ। দু'বেলা খাবার জন্য ঐ চাল থেকেই কিছু কিছু পায় সে, যদি সে একমাস কাজ করে, আর একমাস কাজ থাকে, তবে নগদ তিনটে টাকাও পাবে।

দিনের বেলায় বাজারের বটতলায় সে রান্না করে। সে এ বিষয়ে একা নয়। বটগাছটার আর একদিকে একটি সংসার আছে। একটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত কৃষক, তার স্ত্রী, একটি শিশু, একটি বুড়ী। এত দুঃখেও এরা এক সঙ্গে আছে।

কিন্তু রাত্রির আশ্রয় নিয়েই হ'চ্ছে মুস্কিল। বটতলায় একা একা রাত কাটাতে তার সাহস হয় না। মাধাইএর ঘরের বারান্দা আছে, কিন্তু সেখানেও ফতেমা নেই। তবু মাধাইএর বারান্দা এর চাইতে ভালো, ঘরের মধ্যে মাধাই থাকে। এ ছাড়াও এ সমাধানের আরও বিঘ্ন আছে। মাধাইএর ঘর থেকে মহাজনের আড়ত প্রায় ক্রোশ পথ, সন্ধ্যার পরে আড়ত থেকে বেরিয়ে পৌঁছতে রাত হ'য়ে যায়। দিবার বন্দর থেকে মাধাইএর ঘরে যাওয়ার যে পথটায় অনেক রাত পর্য্যন্ত আলো থাকে ছোট ছোটা দোকান গুলিতে স্বভাবতই স্বরতুন সেটাকে বেছে নিয়েছিল। কিন্তু দিনেক-দু'দিনে সে ভুল বুঝতে পারল, প্রথম দিনেই সে যে বিপন্ন হয় নি, এ তার ভাগ্য। পথটা সহরের কুৎসিত পল্লীর প্রান্ত দিয়ে গেছে। একটা সুফল হ'য়েছে : জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খানা-খন্দ দিয়ে ওঠানামা জন-মানব পরিত্যক্ত একটি পথ সে খুঁজে পেয়েছে। একলা একলা রাত্রিতে আন্দাজে হাতড়ে পথ চলতে গায়ে কাঁটা দেয়। উপায় কি—এই ভাবে স্বরতন। অনেকদিন পরে শুনেও মাধাই ব'লেছিল—কও কি, পুরানো গোরস্তান দিয়ে আসতা। ডাকাবুকো ইয়াজ ব'লেছিল—ই আল্লা, কলিজার জোর আছে।

মাধাইএর সাথে দেখা প্রায়ই হয় না। দৈবাৎ দেখা হ'লে মাধাই অভ্যাসমতো ব'লে—কি খবর কবে আসলে? কিন্তু উত্তর শোনার জন্য মাধাই দাঁড়ায় না। এ কথা সত্য নয় যে মাধাই এর আগে কোনদিন বিনা-প্রয়োজনে স্বরতুনের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছে। একদিন স্বরতুনকে পাশে বসিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করেছিল ভোর রাত্রির অস্পষ্ট অন্ধকারে, সেটা যে ব্যতিক্রম এটা স্বরতুনও জানে। তবু এরই মধ্যে কিছু একটা সে অনুভবও করেছে। বন্দরে গিয়ে কাজ সুরু করার আগে একবার, দুপুরের পরে রান্না করতে এসে আর একবার সে গ্রামের লোকদের খোঁজ নিল একদিন। চেনা চেনা লাগল একজনকে। তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল—সে চিকন্দির লোক, ঘাস বিক্রী করতে এসেছে। স্বরতুন তাকে ব'লে দিল সে যেন চিকন্দি যাওয়ার পথে বুধেডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে রজবআলি সান্দারের বৌ বৌ ফতেমাকে ব'লে যায়, মাধাই রাগ করেছে, সে যেন আসে। খবর পেয়েও ফতেমা আসে নি, এর না আসায় একরকম ভালোই হ'য়েছে, হয়তো মাধাই রাগ করেনি, ফতেমার কাছে আর একবার সে নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন হ'ত।

মহাজনের গুদামে চালের কাজ শেষ হ'য়ে গেছে। স্বরতুন আবার একেবারে বেকার বসে

সমস্তদিন সে মোকামের সঙ্গীদের কাছে খোঁজ খবর নিয়ে কাটিয়েছে। এদের মধ্যে দু'একজন বলেছে, তারাও আবার মোকামে যাব যাব করছে। অন্যান্য দিনের চাইতে কিছু আগে স্বরতুন মাধাইএর বারান্দায় এসে বসেছিল।

সন্ধ্যার পর পর মাধাই এল। মাধাই তাকে লক্ষ্যও করল না। বারান্দার অন্য পাশে বসে আপন মনে একটা বোতল থেকে কি খেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে উঠে মাধাই ঘরের মধ্যে চলে গেল। ঘরের দরজা খোলা রইল। কিছুক্ষণ পরে শিশি বোতল পড়ার মতো কিসের একটা শব্দ হ'ল, তারপর একটা ভারি নরম জিনিষ পড়ার শব্দ হ'ল। স্বরতুন সন্তর্পণে উঠে দরজার উঁকি দিয়ে দেখল মাধাই মাটিতে উবুর হ'য়ে শুয়ে আছে। স্বরতুনের প্রাণের মূলদেশটা শূন্য হ'য়ে গেল। সে ঘরে ঢুকে আবার তেমনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। হায়, হায়, কি করতে পারে সে। নিজের সমস্ত চিন্তাশক্তি একাগ্র করেও সে প্রতিকারের কোন পথ খুঁজে পেল না। অথচ মাধাইকে সাহায্য করার জন্য তার সমস্ত প্রাণ ব্যথিত হ'য়ে উঠেছে। সে এগিয়ে গিয়ে মাধাইএর শিয়রের কাছে বসে মৃদুস্বরে ডাকতে লাগল,—ভাই, বড়ভাই। যখন সে মাধাইকে স্পর্শ করার সাহস কিছুতেই সংগ্রহ করে নিতে পারল না, উঠে এসে তার পায়ের কাছে স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইল। এমনি ক'রে প্রায় সারাটা রাত কাটল। একবার মাত্র ঢুলুনি এসেছিল স্বরতনের, সঙ্গে সঙ্গে নিজের তিরস্কারে সে খাড়া হ'য়ে বসল। শেষ রাতের দিকে মাধাই পাশ ফিরে শুল। স্বরতনের মুখে একটা ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল।

ভোর হ'চ্ছে তখন, মাধাই বলল-একটু জল দে, খাই।

স্বরতুন জল এনে দিল।

—আরও জল দে।

দ্বিতীয়বার জল এনে দিয়ে স্বরতুন বললে,—কেন, ভাই, জ্বর আসছে?

মাধাই কথা বলল না, ক্লিষ্টমুখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—একটা কিছু দে, পরি।

স্বরতুন দড়ি থেকে মাধাইএর একটা কাপড় এনে দিল। মাধাই বিছানায় বসে জামা খুলল, জুতো খুলল। কাপড় পালটে বিছানায় শুয়ে পড়ে চোখ বুঁজল। মাধাই চোখ বুঁজে এপাশ ওপাশ করতে লাগল, তার কপালে বিন্ বিন্ ক'রে ঘাম ফুটে উঠল। স্বরতুনের মনে হ'ল ঘামগুলির জন্য মাধাইর কষ্ট হ'চ্ছে কিন্তু দড়ির আলনা থেকে মাধাইএর গামছা নিয়ে এসেও ঘাম মুছিয়ে দিতে সাহস পেল না। কিন্তু মাধাই চোখ বুঁজেও ঘুমাতে পারছিল না। সে একবার তার লাল টক্‌টকে চোখ মেলে স্বরতুনকে খানিকটা সময় দেখল। সে দৃষ্টিতে অনুভূতির কোন চিহ্ন ছিল না। কিন্তু হাত বাড়িয়ে স্বরতুনের একখানি হাত টেনে নিয়ে নিজের কপালের উপরে রেখে আবার চোখ বুঁজল।

দুপুর গড়িয়ে গেলে মাধাই উঠে বসে ডাকল,—স্বরো রে।

—কি কন, বায়েন?

—বেলা পড়ছে?

—তা পড়ল।

—কেউ আসছিল?

—না, আপনে কিছু খালেন না বায়েন?

—না। মনে কয় জ্বর আসছে। তুই কি খাওয়াদাওয়া করছিস? তাই কর গা। সাঁঝো আগে ডাকে দিস।

মাধাই আবার শুয়ে পড়ল।

সুরতুন বারান্দায় এসে চুপ করে বসল। দুপুরের রোদে পুড়ে আসছে বটে, বাতাসটা লাগল। সুরতুন এই প্রথম অনুভব করল তার চোখ দুটি জ্বলে যাচ্ছে। ভাবতে গিয়ে অবাক কি ক'রে সমস্ত রাত ঠায় বসে কাটাতে পারল সে।

মাধাই তাকে আহারাদি করতে ব'লে দিয়েছে। আহারের প্রয়োজন নিজেও সে অনুভব কিন্তু মাধাইকে একা রেখে যেতেও মন সরল না। মাধাইএর কি প্রয়োজন এখন তার কিছুই বুঝতে পারছে না। হয় তো তার শিয়রে বসে তার কপালে হাত রাখাটা উচিত ছিল। এখন সে যাবে?—না এখন আর যাওয়া যায় না।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে সুরতুনের মনে হ'ল ঘরের মধ্যে মাধাই চলে বেড়াচ্ছে। মাধাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল,—জাগছিস।

—শরীর ভালো, বায়েন?

—হয়।

—ডিপ্‌টিতে যান?

—হয়। সিক্ দেব। ছুটি নিব। মনে কয় কাল থিকে তুইও খাস নাই।

কুণ্ঠিত বোধ ক'রে সুরতুন মুখ নামিয়ে নিল।

মাধাই ছুটি নিয়ে ফিরে এলে রান্না-বান্নার কি ব্যবস্থা হবে, কি করা সম্ভব হবে তার পক্ষে ভাবতে লাগল সুরতুন। ঘটনাটা কোনদিকে গড়াতে পারত এ অবস্থায় তার আলোচনার আছে ব'লে মনে হয় না। কারণ মাধাই প্রায় চ'লে যেতে যেতে ফতেমা এল।

—কি হইছে রে, বায়েনের?

—তলে তুমি খবর পাইছিলা।

—হয়। বায়েন কেমন।

—এখন মনে কয় ভালোই আছে। পরশু রাত, কাল সারাদিন রাত কি যে তার হ'ল পারি নাই।

মাধাই ছুটি নিয়ে বাসায় ফিরে দেখল ফতেমা বসে আছে, সুরতুন নেই। মৃদু বলল,—কাল থাক্ দেখছিলাম সে ফতেমা না, সুরো।

ফতেমা বলল—সুরোকে বাজারে পাঠাইছি। খাতে হবি তো।

একটু থেমে ফতেমা প্রশ্ন করল—অসুখ করেছে, ভাই?

মাধাই মাথা নাড়ল। কিন্তু সুরো ধরতে না পারলেও ফতেমার চোখে ধরা পড়া গেল— চোখ দুটি তখনও লাল, মাথায় চুলগুলি বিশৃঙ্খল, চোখমুখ বসে গেছে। ফতেমা তার কথায় হ'ল না; মাধাই ঘরে ঢুকে বিছানায় বসেছিল, ফতেমা এগিয়ে গিয়ে তার চুলে হাত রাখল।

—না, ভাই, অসুখ তোমার করেছে।

কিন্তু শুধু অসুখই নয় তো, ফতেমা এবার আরও লক্ষ্য করল মাধাইএর পায়ের একটি আঙুলে ন্যাকড়া জড়িয়ে বাঁধা, কপালের বাঁ পাশটা তামাটে রঙে হ'য়ে ফুলে আছে। ফতেমা আকুল হ'য়ে উঠল, কান্না-কাতর স্বরে বলল, কও সোনাভাই, কি হইছে তোমার।

সোহাগের স্বরে মাধাইএর অপূর্ব অনুভূতি হ'ল। একবার নিজের পায়ের দিকে, আর একবার ফতেমার মুখের দিকে চেয়ে ছেলেমানুষি স্বরে বলল মাধাই,—অন্যাই করছি। নেশা করছিলাম কাল।

—নেশা তো বেটাছাওয়াল ক'রেই, অন্যাই কি করছ। প্রবোধ দিল ফতেমা—কিন্তুক এমন ক'রে নেশা করবের নাই। দেখতো পায়ের কি দুর্গতি করছ।

মাধাইএর মুখ অত্যন্ত বোকা বোকা দেখাল।

ফতেমা আবার হাসল, বলল,—তা হঠাৎ নেশা করলা কেন!

মাধাইএর মন খালি করে কথা বলতে ইচ্ছা হ'ল। একটু ইতস্তত করে অবশেষে বলল—ভালো ঠেকে না। কেমন যেন একা একা লাগে।

ফতেমা খানিকটা সময় ভাবল কিন্তু কোন সমাধান খুঁজে পেল না।

একটু থেমে সে বলল,—আমি রান্নার যোগাড় করি, তুমি ছান ক'রে আস। শরীর সুস্থ হবি। চা না কি খাও, তা খাইছ?

ফতেমা নিজে থেকে মাধাইএর র‍্যাশানের ঝোলা খুঁজে চাল বার করল। কুলোয় ক'রে চাল নিয়ে বারান্দায় গিয়ে বাছতে বসল।

ঘরের মধ্যে কিছুকাল খুটখাট্ ক'রে, জামা খুলে মাধাইও বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। ফতেমা তাকে আসতে দেখে চোখের দৃষ্টিতে স্বাগত করল, মুখেও বলল, আস।

—তোমার সাথে কথা কওয়ার জন্য আলাম।

—আসবাইতো। ব'স। জিরাও।

ফতেমা মুখ নিচু ক'রে পটু হাতে চালের ধান কাঁকর বেছে ফেলতে লাগল, মাধাই খুঁটিতে হেলান দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে কাজ দেখতে লাগল তার।

ফতেমা বলল,—বিড়ি খালে না সোনাভাই।

মাধাই বিড়ি ধরাল। বিড়ি ধরানোর পর বিস্ময় বোধ হ'ল তার। বাড়ীতে অভ্যাগত এলে পুরুষের পক্ষে এরকম অনুরোধ করা স্বাভাবিক, ফতেমা কোথায় শিখল এমন ক'রে বলতে? টেপির মা নিজে বিড়ি খায় ব'লে তার মুখে এটা কতক মানাত। কিন্তু ফতেমা বিড়ি খায় না।

মাধাই বলল,—ছান করতে কও, কিন্তুক মাথা এখনও দপ্ দপ্ করতিছে।

ফতেমা কথা না ব'লে সরে এল মাধাইএর কাছে, পিঠে গলায় হাত রেখে পরখ ক'রে বলল, জ্বর না বোধায়। রাত জাগছ, উপাস পারছ। যাও ওঠ, অল্প ক'রে ছান ক'রে আস।

মাধাই স্নান ক'রে এসে দেখল উনুনে আঁচ দেয়া হ'য়েছে, বঁটি নিয়ে আনাজ কুটতে বসেছে সুরতুন। ফতেমা হাড়িকুড়ি মেজে ঘসে পরিচ্ছন্ন ক'রে নিচ্ছে। মাধাইকে দেখে ফতেমা তাড়াতাড়ি বলল,—তুই যে কি মেঠাই আনছিস, তাই আগে ভাইকে খাবের দে।

সুরতুনের দেয়া মিঠাই খেয়ে জল খেয়ে মাধাইএর মনে হ'ল এমন স্নিগ্ধতা সে কোনদিন আর অনুভব করেনি।

স্নান-আহার ক'রে খানিকটা গড়িয়ে নিয়ে মাধাইর মনে হ'ল শরীরে কোন কষ্ট নেই আর। ঘরের মধ্যে বারান্দায় ফতেমারা ছিল না। কোথায় বা গিয়েছে কোন চালের ধান্দায় ভাবল হাসি হাসি মুখে মাধাই। বহুদিন পরে আবার সে এদের কথা ক্ষণেকের জন্যও চিন্তা করল।

বাইরের দিকে চাইতে গিয়ে তার বহু পরিচিত কাঁঠাল গাছটার প্রথম ডালটায় চোখ পড়ল। কিছুদিন সে লক্ষ্য করেনি। মনে হ'ল যেন ডালটা বেড়েছে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় পাতা কাঁপছে। সেখান থেকে সরতে সরতে তার দৃষ্টি পড়ল আরও দূরের দৃশ্যপটে। দিগরের আবর্জনা বয়ে পাকা নালাটা খানিকটা দূরে গিয়ে খানিকটা নিচু জমি প্লাবিত ক'রে একটা জলা সৃষ্টি ক'রেছে। বর্ষায় জল বেড়ে ছোট একটা বিলের মতো দেখায়। প্রথম চাকরি পাবার পর একদিন সে ছিপ নিয়ে গিয়েছিল মাছ ধরতে, খুব পাকা একটা শোল পেয়েছিল সে। এখন জলাটার জল অনেক কমে গেছে। জলের ধারে ধারে বুনো ঘাসের সবুজ ঝোপগুলিও ঠাহর হ'চ্ছে চোখে।

মনের গতি চিন্তার গণ্ডীবদ্ধ না হ'লে যেমনটা হয়, তেমনি হ'ল মাধাইর। বহুদিন ভুলে যাওয়া গ্রামের কথা মনে পড়ল তার। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় তিক্ত কোন ছবি নয়, একটি বিশেষ দিনের স্মৃতি। রটন্তীকালীর পুজা হয়েছিল সান্ন্যাল বাড়ীতে। আর সেবারই প্রথম ঢাক বাজানোর সাহস হ'য়েছিল তার। দুখানা ঢাক নিয়ে সে আর তার বাবা গিয়েছিল সান্ন্যাল বাড়ীতে। ধানক্ষেতের আলের উপর দিয়ে পথ। ধানের পরিপূর্ণ গোছাগুলি ঢাকের গায়ে লেগে একরকম মৃদু বাজনার শব্দ উঠছিল। অদ্ভুত, অদ্ভুত। এতদিনকার পুরানো কথা কি ক'রে এত স্পষ্ট হ'য়ে মনে পড়ল, ভাবল মাধাই। পূজামণ্ডপে নোতুন ধুতি গামছা পেয়ে সে যখন ভাবছে আর কি, এর চাইতে আর কি বেশী পাওয়া যায়, ঠিক তখনি তাদের কাঁসি বাজানোর ছোকরাটা তার বাবার ঢোল বাঁশি নিয়ে এল। তার বাবা ছিনাথ ঢোল কাঁধে উঠে দাঁড়াল, তার হাতে সানাই-বাঁশি দিয়ে, কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল,—ঠিক করে বাজাস সারগাম। কষে রাখিস তাল। সান্ন্যালমশাই স্বয়ং বসেছিলেন, অন্দরের দরদালানে। সানবাঁধানো আঙিনায় সমবেত বাজনদারদের মধ্যে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াল ছিনাথ বায়েন। রোগভোগে ছিনাথের শরীর তখন জীর্ণ। তবু সে বাজনদারদের সেরা। সে আবার বলল,—বাজাস্ বোল ঠিক ক'রে, কর্ত্তাকে কইছি ছাওয়ালে আনছি। তারপর বাজনা সুরু হ'ল। বলে, দাঁড়িয়ে নাচতে নাচতে, পিছিয়ে গিয়ে, প্রমত্ত তাণ্ডবে সম্মুখে হেলে পড়ে ছিনাথের সে কি বাজনা। মাধাই প্রাণপণে মুখস্ত বাজনাগুলি বাবার সাথে জুড়ি দেবার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছিল, কিন্তু ওস্তাদি ভর করল ছিনাথের মাথায়। নোতুন বোল তৈরী হ'তে লাগল তার মনে যা সেগুলি ঝঙ্কার দিয়ে বাজতে লাগল তার ঢোলে। মাধাই অবাক হ'য়ে যাচ্ছিল, দম পাচ্ছিল না, কিন্তু থামবার উপায় ছিল না। ছিনাথ কথা বলল না কিন্তু তার ঢোলের বাজনা তেড়ে তেড়ে উঠে মাধাইএর সমস্ত নির্জীবতার উপর তর্জন করতে লাগল। মাধাইএর স্পষ্ট মনে পড়ে সাবাস ক'রে উঠেছিল অন্য সব ঢুলিরা। আর তাদের দিকে ফিরে হাসি হাসি মুখে কাৎ হয়ে ঘুরতে না ঘুরতে তেহাইএর মাথায় ঘা চাটি দিল ছিনাথ।

মানুষের কৃতকর্মের বিচারে বলা যায় এই শেষ কাজটি না ক'রে তার উপায় ছিল না। কিন্তু তা

জীবনধারা অনুসরণ করতে করতে বলে ওঠা যায় না তার এই বর্ত্তমান ঘটনা আগেরগুলির অপ্রতিরোধ্য পরিণতি।

আগের ঘটনার অল্প কিছুদিন পরেই তাদের পরিবারে এল বিঘোর দুর্দিন। ছিনাথের স্বাস্থ্য কিছুদিন থেকে ভেঙ্গে পড়েছিল। সে বৎসর শীতের গোড়াতে যখন তার জ্বর হ'তে সুরু করল তখন সে নিজেও হাল ছেড়ে দিল। তার জ্বর সাধারণ নয়, বিপথ থেকে কুড়িয়ে আনা বিষাক্ত ক্ষতগুলি সহস্রমুখে আত্মপ্রকাশ করল। মৃত্যুটা হ'ল বীভৎস। তারপর এল না-খেয়ে থাকার দিন।

উঠে দাঁড়িয়ে মাধাই বিড়ি ধরাল। গ্রামের জীবন সে চিরকালের জন্য ত্যাগ ক'রে এসেছে। না-খেয়ে থাকার দিনের নাগালের বাইরে সে। এতদূর থেকেও মাঝে মাঝে যখন তার বাবা-মা বর্ত্তমান ছিল, তাদের গৃহ ছিল, সে সময়ের কথা মনে হ'ল।

ফতেমার কথা মনে হ'ল। ফতেমা লাজুক নয়, প্রয়োজন হ'লে সে অগ্রসর হ'তে পারে তার সঙ্গীদের মুখে ছোটখাট ঘটনা শুনে মাধাই বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু এমন সোহাগ-ঝরান কথা শুনবার অবকাশ মাধাইএর আগে হয়নি। স্ত্রীলোক এমনভাবে কথা বলে ব'লেই বোধ হয় শ্রান্ত পুরুষরা বাড়ীর দিকে ছুটে যায়। কিন্তু সাধারণের চাইতেও বুঝি বা বেশী কিছু ফতেমা, ভেঙে-পড়া পুরুষের পদস্খলন যারা স্নেহ দিয়ে ক্ষমা করতে পারে তাদের মতো বোধ হয় ফতেমা। ঠিক এই কথাগুলির সাহায্যে চিন্তা না করলেও মাধাইএর মনে পড়ল ফতেমার কথার সুরে তার নেশার এতটুকু প্রচ্ছন্ন সমালোচনাও ছিল না। বোধ করি এমন স্ত্রীদের কাছেই পুরুষ বরাবর ফিরে আসে।

পরদিনও ফতেমাকে মাধাই যেতে দিল না। ঘুম ভেঙে উঠে সে বলল—আজ না গেলি হয় না?

—থাকবের কও, ভাই?

—হা, থাক।

চার পাঁচ দিন ফতেমা রেঁধে খাওয়াল মাধাইকে। মাধাই কাজে যাচ্ছে। সে যখন ষ্টেশনে ঘুরে বেড়ায় তখন তাকে দেখে তার সঙ্গীরা অবশ্যই বুঝতে পারেনা তার আর অন্তরকে গত কয়েকটি দিন কত কিছু এনে দিয়েছে। ইতিমধ্যে একদিন সে ব'লে ফেলল জয়হরিকে—হাত পোড়ায়ে খায়ে বেটা-ছাওয়ালের চলে না। ফতেমা রাঁধে খাওয়ায়, বেশ আছি।

—ফতেমা থাকে নাকি আজকাল তোমার কাছে?

—আছে কয়দিন।

—এ ব্যবস্থা আগে করলেই পারতা।

কিন্তু সেদিনই অন্য এক সময়ে জয়হরি রসিকতা ক'রে বলল,—দুটাই রাখবা?

মাধাই বুঝতে না পেরে বলল,—কি কও?

—কই যে দু'জনকেই পুষবা? শেষে দু'জনে চুলাচুলি হবে।

—না, ওরা ঝগড়া করেনা।

—পুরুষের ভাগ নিয়ে করবি।

রসিকতার তলদেশ দেখতে পেয়ে মাধাই প্রায় ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠল। বিরস মুখে বলল,—ওরা আমাকে ভাই কয়।

সন্ধ্যায় ডিউটি শেষ ক'রে বাড়ী ফিরে মাধাই দেখল ফতেমা কুপি জ্বালিয়ে ঘরের কাজ করছে।

—সুরো কই ?

—গাঁয়ে পাঠাইছি। শ্বশুরের অসুখের খবর নিয়ে আইছিল একজন।

—রাত্তিরেও রাঁধা লাগাবি নাকি ?

—হয়।

রাত্রিতে নোতুন ক'রে রাঁধার প্রয়োজন হ'য়েছে কেন সেটা ফতেমা ঠিক সাহস করে বলতে পারল না। ফুলটুসির ছেলে জয়নাল ও সোভান এসে খেয়ে গেছে। শুনে যদি মাধাই বিরক্ত হয় এই ভয় হ'ল ফতেমার।

মাধাই ঘরের ভেতরে বসে বসে বিড়ি টানছে, আর ফতেমা বাইরে বসে রান্না করছে। ফতেমা বলল,—আনাজ নামানের সময় কাঁচা তেল দিয়ে নামানি খাও ? মাধাই বললে,—হুঁ।

কৌতুকের মনে হলেও সত্য এ কয়েকটি দিনে মাধাই একপক্ষে সুরতুন-ফতেমা অন্যপক্ষে—এদের পারস্পরিক অবস্থানের যেন পরিবর্ত্তন ঘটেছে। এরা যেন খানিকটা আশ্রিতের মতো ছিল, খানিকটা অপ্রাপ্তবয়স্ক মাধাইএর চোখে। এখন যেন তার সমকক্ষ ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

খানিকটা সময় ঘরে কাটিয়ে মাধাইএর মনে হ'ল ফতেমার সান্নিধ্যে বারান্দায় গিয়ে সে বসবে। এরকম আকাঙ্ক্ষা এর আগে কোন সময়েই তার হয়নি। কিন্তু না চাইতে জয়হরির রসিকতাটাও তার মনে পড়ে গিয়ে মনে অস্বাচ্ছন্দ্য এনে দিল।

ফতেমা বাইরে থেকে ডেকে বলল,—লকড়ি কৈল নাই। দু'একদিনের মধ্যে আনতে হবি।

—কাল মনে করায়ে দিও কি-কি লাগবি।

মনের অস্বাছন্দ্যর চাইতে সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষাই অবশেষে প্রবল হ'ল, মাধাই বাইরে গিয়ে বলল,—আবার আসলাম তোমার কাছে বসতে।

—কেন, ভয় করল সোনাভাই ? ফতেমা যেন শিশু ভ্রাতার ভয় দূর করছে।

মাধাই অপ্রতিভের মতো হাসল, উঠে যাচ্ছিল সে। ফতেমা হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরে বসাল।

—বসো না কেন্, ভাই।

মাধাই বসে বসে লক্ষ্য করল ইতিমধ্যে ফতেমারও কিছু পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। প্রথম দিনের তুলনায় অনেক পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে তাকে। পরিধেয় ও মাথার চুলেই পরিচ্ছন্নতার ভাবটা বেশী লক্ষ্যণীয়। মাধাইএর মনে হ'ল ফতেমা পথে বেরিয়ে পড়ার আগে হয়তো এরকমই ছিল কিম্বা এর চাইতেও লক্ষ্মীশ্রী বেশী ছিল তার।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাধাই বলল অবশেষে—রান্না কর তুমি, আমি একটু ঘুরেফিরে আসি।

পরদিন দুপুরবেলায় মাথাই ডিউটি সেরে ফিরেছে। আহার্য্যের আয়োজন দেখে বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করল,—বিয়ে সাধির ব্যাপার নাকি ?

ফতেমা বললে,—সে হারামজাদারা আবার আইছে।

—কে ?

—কাল যারা খায়ে গিছল।

দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। ফুলটুসির ছেলে জয়নুল আর সোভান উপস্থিত হ'ল। কোথায় কোন উৎসব উপলক্ষ্যে হয়তো দরজায় কলাগাছ লাগিয়েছিল তারই একটা তারা সংগ্রহ ক'রে এনেছে। দেহে এমন বল হয়নি তাদের কাঁধে ক'রে আনবে, সমস্তটা নাল মাটি দিয়ে হেঁচড়ে টেনে এনেছে, পথের আবর্জনায় কলাগাছটি ক্লেদাক্ত হ'য়ে উঠেছে।

ফতেমা ধমকের স্বরে বলল,—ইল্লত। কোন্‌থে কুড়ায়ে আনলি, কি হবি ?

ছেলে দুটি সম্ভবত মাধাইকে দেখেই ভয় পেয়েছিল, বোকা বোকা মুখ করে দাঁড়াল। ফতেমার তিরস্কারে তারা বিমর্ষ হয় নি. তার প্রমাণ মাধাই শুনতে পেল। ছোট ছেলেটা উঠে এসে ফতেমার পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল,—আম্মা, রান্না সড়ে উঠে কলাগাছটা কাটে দিবা। উয়েতে থোর আছে। ঠিক দুই পয়সার হবি।

ফতেমা মিষ্টি হেসে বলল,—সোনার চাঁদ ছাওয়াল। অমন করে পয়সা আনতে হবিনে তোর। কিন্তুক এখন তোরা যা, রাধে রাখব। পরে আসিস।

এবার বড়ছেলেটা বলল,—কনে যে যাই বুঝিনে। বাড়ীতে চাল না নিয়ে ঢুকলি আব্বা পাঠার কোলজের মত কোলজে কাটে নিবে বলেছে।

—ক'স কি ? তোরা চাল পাবি কনে ?

—সে কয় তা জানিনা। তোগের ফতেমা আম্মার কাছে থিকে চাল আনিস।

এবার ফতেমার রাগ হ'ল। সে বলল,—তোগের আব্বাকে কয়ে দিস, ফতেমা তার নিকার বৌ না।

—উরে বাস। এ কথা কলি তার পাঠাকাটার ছুরি বসায়ে দিবি গলায়।

একটু থেমে ছেলেটি আবার বলল,—কেন আম্মা, আমি এখন খালে তোমার বায়েন রাগ করে ?

ফতেমা উত্তর দিল না।

—তুমি যে কও আমি ছোট ছাওয়াল। ছোট-ছাওয়ালের' পরেও বায়েন রাগ করে ?

বড় ছেলেটি বলল,—চুপ কর চুপ কর, বায়েন ঘরে আছে।

হঠাৎ মাধাইএর কি হ'ল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে ওদের কাছে দাঁড়াল। ওরা ভয় পেয়ে দৌড়ে পালানোর উদ্যোগ করল। মাধাই এক মুখ হেসে ফেলে বলল,—আয় আয় খায়ে যা। তোরা আগে খায়ে যা নে।

মাধাই এত উত্তেজিত বোধ করল যে তার মনে হ'ল সে নিজেই ওদের আসন করে খেতে বসাবে। মাধাইএর অনুরোধে ফতেমা ওদের খেতে দিল। মাধাই দাওয়ায় উবু হ'য়ে বসে বিড়ি টানতে টানতে ওদের খাওয়ার তদ্বির করল।

ফতেমার ভঙ্গীতে যতই গতিহীনতার প্রতিশ্রুতি থাক, তাকে চঞ্চল হ'য়ে উঠতে হ'ল। সুরতুন গ্রাম থেকে দুঃসংবাদই বয়ে এনেছে। ফতেমার শ্বশুর রজবআলি অত্যন্ত পীড়িত।

সব শুনে মাধাই বলল,—তোমার যাওয়াই লাগে।

ফতেমা অনুমতি পেয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল সেটা তার মুখের ভাবেও বোঝা গেল।

ফতেমা প্রায় তখন তখনই চলে গেছে। যাওয়ার আগে অনেকক্ষণ বসে সুরতুনকে কি কি যুক্তি দিয়ে গেল, মাধাই শুনতে না পেলেও আভাসে ইঙ্গিতে বুঝতে পারল তার অনেকখানি তার নিজের সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে। মাধাই শুয়ে শুয়ে ফতেমার কথা চিন্তা করতে লাগল। অনেকদিনের পরিচিত ফতেমাকে আজ যেন সে অনেক বেশী ক'রে চিনতে পেরেছে তার মনে পড়ল ফতেমা যখন ফুলটুসির ছেলেদের মা হ'য়ে বসেছিল সেই দৃশ্যটা। শিশুদের অনুকরণ বৃত্তির চাইতে সামান্য কিছু গভীর গৃহকর্ত্রী হওয়ার আস্বাদন নিজে সে পেয়েছিল কিছু সময়ের জন্য। জয়হরি—আব্‌দুলগনিদের সংসার কি রকম কে বলতে পারে। তাদের স্ত্রীও কি ফতেমার মতো এমন পটু, এমন স্নিগ্ধ।

(ক্রমশঃ)

"মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসে
আমার উত্তর ঋতুর মতন
যুক্তি খোঁজে তাঁর মন প্রসূত ফলের
উদ্দাম এমনই সে আর গর্ব্বোন্নত যে
নাম হয় তার প্রেম

অস্বীকার কে করে সত্যের আলাপ শুনতে সম্প্রতি
উপস্থিত তাই বলছি জানিতদের
আশা নেই হীন-হৃদয় যে
 যুক্তির চক্ষু পাবে
স্বাভাবিক প্রদর্শনী না থাকলে, না থাক
 প্রমাণ-প্রয়াসের মন নেই আমার
কিম্বা বলার কোথায় এর জন্ম"

॥ এজ্রা পাউণ্ড-ক্যাণ্টো ৩৬ ॥

ভুঁদি

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

গরীব হইলেও আত্মসম্মান আছে তো? ভায়েরা তাই আর থাকিবে না ভুঁদির বিবাহের কথায়। বারবার ভদ্রলোকদের দেখাইতে আনিয়া এই কীর্ত্তি! ছি, লজ্জায় মাথা কাটা যায় যেন! দরজায় খিল আঁটিয়া বসিয়া থাকা, শুনাইয়া শুনাইয়া কথা বলা। দীর্ঘকালের জন্য গা ঢাকা দেওয়া, সবই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ যাহা হইল তাহার আর তুলনা মেলেনা।

দেখিতে আসিয়াছিল পাত্রের কাকা ও বন্ধু। আজ ভুঁদি খিলও দেয় নাই, শুনাইয়া শুনাইয়া কথাও বলে নাই, গা ঢাকাও দেয় নাই। এত বোঝানর ফল ফলিয়াছে ভাবিয়া পুলকিত হইয়া ওঠে মা। ভায়েরা ভাবে, যাক্, সুবুদ্ধি হইয়াছে এতদিনে। রান্না করিতেছিল ভুঁদি—মা বলিল—"যা, মা, কাপড়টা বদ্‌লে একটু পোষ্কার ঝোষ্কার হ'য়ে নে, ভদ্দরলোকরা ব'সে আছেন, আমি জলখাবারটা সাজিয়ে ফেলি ততক্ষণ।"

"এই যে যাই, মা", সুশীল সুবোধ বালিকার মত উত্তর দেয় ভুঁদি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মা।

ভায়েরা ভদ্রলোকদের সহিত কথা বলিতেছে, মা ভাঁড়ার ঘরে খাবার গুছাইতে ব্যস্ত, এমন সময় ভুঁদি ঢুকিল বৈঠকখানা ঘরে। ভায়েরা হতভম্ব, ভদ্রলোকদের চক্ষু কপালে উঠিবার জোগাড়। রংটা কালই, তাহার উপর মুখে কালিঝুলি মাখা থ্যাবড়া থ্যাবড়া করিয়া, পরণে শেলাই করা নোংরা, হলুদের ছোপধরা কাপড়, চুলগুলি মাথার উপর ঝুঁটি করিয়া তোলা, খুন্তি হাতে প্রবেশ করিয়াই কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করে ভুঁদি, "কে দেখ্‌বে গো আমায়, দেখো।"

পাত্রের বন্ধু সন্ত্রস্ত হইয়া ওঠে—দিবে নাকি ঐ খুন্তির বাড়ি এক ঘা কষাইয়া? সেইরূপ ভঙ্গীতেই উঁচাইয়াছে না খুন্তিটা? জলখাবার খাইবার জন্যও অপেক্ষা করেনা আর, "দেখা হ'য়েছে, পরে খবর দেব", বলিয়া জুতাটা কোনোরকমে পায়ে গলাইয়া লইয়া কাকাকে টানিয়া লইয়াই প্রায় অদৃশ্য হয় সে।

"লজ্জা করেনা, রোজ রোজ লোক ডেকে আন্‌তে? বাবা এক কাঁড়ি দেনা রেখে গেছে, বাড়ী ভেঙে পড়্‌ছে, শাকভাত জোটেনা দিনান্তে, বোনের বিয়ে?" ভাইদের কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়াই যাহা বলিবার বলিয়া দিয়া যেমন আচম্বিতে আসিয়াছিল তেমনি আচম্বিতে অদৃশ্য হয় ভুঁদি।

গুম্ হইয়া বসিয়া থাকে ভায়েরা কতক্ষণ—জলখাবার লইয়া মা আসিয়া তো অবাক্—"কোথায় গেলেন এরা?" জিজ্ঞাসা করে আশ্চর্য হইয়া। "কোথায় গেলো তা জিগ্যেস করোগে তোমার ধনুদ্ধরী মেয়েকে", ফাটিয়া পড়ে ভায়েরা। কিন্তু বোনের কথাটা মনে লাগিয়াছে তাহাদের—সত্যি, ঠিকই বলিয়াছে তো সে! বেশ কিছু ঋণ রাখিয়া গিয়াছে পিতা, শোধ করিতে হইবে দুই ভাইকেই—তাহার উপর বাড়ীর অবস্থাও পড়োপড়ো, কোন্ মান্ধাতা আমলে যে তৈয়ারী হইয়া ছিল কে জানে! কলে কাজ করে দুই ভাই—র‍্যাশনটা সস্তায় পাওয়া যায়, তাই ডাল ভাত জোটে কোনরকমে। বোনের বিবাহ দিতে গেলে ঋণের উপর ঋণ করিয়াই দিতে হইবে—যতই কম খরচ হোক্, হাজার, দেড় হাজার

তো হইবেই নিশ্চয়! কিন্তু মায়ের তাগাদায় ও নিজেদের কর্তব্যবোধে বিবাহ দিবার চেষ্টা করিয়াছে বোনের। কিন্তু বোনই যখন—"বুদ্ধি আছে মেয়েটার", না ভাবিয়া পারেনা ভায়েরা। কিন্তু আগে ভাগে বলিলেই তো পারিত, তাহা হইলে আর বারবার দাঁড়াইয়া অপমান হইতনা!

মা এদিকে অগ্নিশর্মা হইয়া ভুঁদির মুণ্ডপাত করিতে করিতে রান্নাঘরে প্রবেশ করে। নির্বিকার ভাবে রান্না করিয়া চলিয়াছে ভুঁদি। যেন কিছুই হয় নাই।

"তোর জন্যে কি গলায় দড়ি দেবো, কালামুখী?" দাঁতে দাঁত চিপিয়া বলে মা।

"গলায় দড়িটা পরে দিও, কিন্তু আগে একটা কথার জবাব দাও, জামাই এলে শুতে দেবার জায়গা আছে তোমার? দেড়খানা তো ঘর—একটাতে তুমি থাক কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে—আধখানাতে দুভায়ে গুঁতোগুঁতি ক'রে শোয়—জামাই শোবে কোথায়?" ধীরে সুস্থে জিজ্ঞাসা করে ভুঁদি।

"নির্লজ্জ, বেহায়া কোথাকার!" গর্জন করিয়া ওঠে মা।

"কি ক'রব, তোমাদের যখন চোখ নেই, মাথা নেই, তখন আমাকে নির্লজ্জ, বেহায়া হ'তে হ'য়েছে", উত্তর আসে।

"বেরো, বেরো, দূর হ'য়ে যা বাড়ী থেকে, পাপ কোথাকার—তোর মুখ দেখলেও ঘেন্না করে।" বলিয়া বাহির হইয়া যান মা।

"বের হ'লে যে তোমাদেরই মুখে চুণকালি পড়বে, নয়ত কবে বের হ'য়ে যেতুম, কি রাজসুখেই রেখেছ যে আহা, মরে যাই—" তরকারীটা নামাইতে নামাইতে উত্তর দেয় ভুঁদি।

কথাটা সে মিথ্যা বলে নাই—রাজসুখই বটে। বড় ভাই দুটি ভোরে কলে চলিয়া যায়—তাহাদের চা করা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষার ঠেঙাইয়া কলের কালিমাখা কাপড়জামা পরিষ্কার করা পর্যন্ত সবই করিতে হয় তাহাকে। ছোট ভাইবোন চার পাঁচটি। মা নিড়বিড়ে চিরকাল, নড়িতেই পারেনা বলিতে গেলে—রাতে একে তুলিতে, উহার বিছানা বদলাইতে হয় তাহাকেই—সকালে তাহাদের মুখ ধোওয়ান, জামা ছাড়ান, খাওয়ান, দাওয়ান—তাহাও। বেলা এগারটায় খাইতে আসিবে দুই ভাই—সময় সংক্ষেপ, দাঁড়াইবার জোটি নাই—সবই হাতের কাছে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। ঝিএর কাজ ধোপার কাজ, রাঁধুনীর কাজ, বাকী নাই কিছুই। নিজের দিকে একটু তাকাইবার সময় হয়না—মাথা হইয়া থাকে রুক্ষ এতখানি, হাতের নখগুলি বাটনা বাটিয়া বাটিয়া, পোড়া বাসন মাজিয়া মাজিয়া বিকৃত, কুৎসিৎ,—জল ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া পা হাজায় ভর্তি হইয়া গিয়াছে, দেখিলে ঘৃণা করে। কাপড় শতচ্ছিন্ন, ময়লা, তেলকালিতে ভরা। খাবার বেলায়ও তো রাজভোগ! ভাত থাকিলে ডাল থাকেনা, ডাল থাকিলে ভাত, দুটার কোনটাই আবার কোন কোনদিন দৃষ্টিগোচর হয়না—ইহা তো নিত্য নৈমিত্তিক। কিন্তু কোনদিন কোন অভিযোগ করেনা সে—যতদূর পারে যাহাতে সংসারের এতটুকুও সাশ্রয় হয় তাহা করিয়া চলে। লেবু কচ্‌লাইতে কচলাইতে তিক্ত রস বাহির হইবেই—তাই আজ বড় দুঃখে কথাগুলি বাহির হইয়া গেছে।

পুকুরে বাসন মাজিতে গিয়া সে এই কথাই ভাবিতেছিল। গরিবের মেয়ে বটে কিন্তু একেবারে অশিক্ষিতা সে নয়। পিতা থাকিতে মিশনারী স্কুলে লেখাপড়া, শেলাইবোনা, কিছু কিছু শিখিয়াছিল—এখনও ঠোঙা গড়িবার জন্য যে কাগজ কেনা হয় তাহা নিয়মিত পাঠ করে সে স্বল্প অবসরের মধ্যেও।

বিবাহ! কথাটা শ্রুতিমধুর বটে, কিন্তু উহা গরীবদের জন্য নয়। সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া মহার্ঘ বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া সুন্দর সহাস্য মুখে যে একটি সলজ্জ মধুর ভাব ফুটাইতে পারিবে বিবাহ তাহাকেই সাজে। বরের মত বর হইবে সে, যে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে, সম্পদে ঝলমল্ করিবে। গরীবের আবার বিবাহ! পেটে ভাত নাই, পরণে কাপড় নাই, সৌন্দর্য তো দূরের কথা, স্বাভাবিক লাবণ্যও নাই। অনাহারে, কষ্টে, যৌবন যেন শুকাইয়া মরিয়া গেছে—তাহাদের বিবাহ মানে অশান্তি-বর্ধন, দারিদ্রের সংখ্যাবৃদ্ধি—রুগ্ন, শীর্ণ, অবহেলিত, অনাদৃত, অনাহুত কতকগুলি অভাগার দলকে পৃথিবীতে টানিয়া আনা। আর তাহাদের ঘরে পাত্র মিলিবে কিরূপ? হয় কলে কাজ করে অথবা রেলের অতি নিম্নপদস্থ কর্মচারী, না আছে চেহারা, না আছে স্বাস্থ্য, না শিক্ষা, না অর্থ। তাই তাহাদেরই সমপর্যায়ের কাহারও বিবাহ হইতে শুনিলে ক্ষেপিয়া যায় ভুঁদি। নিজের পিতাকেও সে মনে মনে এতটুকু শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেনা—সংস্থান নাই, ভবিষ্যতের চিন্তা নাই, শুধু একগাদা ছেলেমেয়ে! তাহার পর নিজেতো গেল মরিয়া—ইহারা কি খায়, কোথায় দাঁড়ায়, কে ভাবিবে সে কথা?

......কয়েকদিন হইতেই মা বড়ছেলের সঙ্গে গুজ্ গুজ্ করিতেছে। তাহাকে দেখিলেই চুপ করিয়া যায় দুজনেই। ভুঁদি শঙ্কিত হইয়া উঠে, কেননা মায়ের বুদ্ধিসুদ্ধির উপরও যেমন আস্থা নাই তাহার তেমনি বড় ভায়েরও। সমান অবুঝ, আত্মসুখী, কাণ্ডজ্ঞানহীন দুজনেই। মেজভাই উহাদের মধ্যে একটু ভাল—মাথা ঠাণ্ডা করিয়া কাজ করিতে জানে অন্তত।

কিন্তু ইহাদের মন্ত্রণার রহস্য ভেদ হইয়া গেল শীঘ্রই। সেদিন বড়ভায়ের বন্ধু মন্মথ আসিয়া কথা নাই বার্তা নাই বলিতে আরম্ভ করিয়া দিল চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া, "এ আপনাদের অন্যায় মাসীমা, ওর যখন অত বিয়ে করার ইচ্ছে অথচ আপনারা বিয়ে দেবেন না। আর কেনই বা ইচ্ছে হবেনা—রোজগারপাতি করছে, সবাইকারই তো সাধ আহ্লাদ আছে?" স্তব্ধ হইয়া শোনে ভুঁদি।

মা ইনাইয়া বিনাইয়া বলে, "কি করব, বাবা, আমার কি অসাধ? কিন্তু সংসারের এই অবস্থা!"

"সংসারের অবস্থা যদি না ফেরে তো ওর বিয়ে হবেনা? ও কিসের জন্য খাটবে তাহ'লে? এটাতো বোঝা উচিত আপনাদের?"

মন্মথ থামিতে না থামিতেই ভুঁদি আসিয়া উপস্থিত হয়।—"বিয়ে হবে কি না হবে সে পরামর্শ দিতে পরকে ডাকা হয়নি। আপনার কাজকর্ম গেছে বুঝি? কলের চাকরী ছেড়ে ঘটকালী পেশা নিয়েছেন?"—পরে মার দিকে ফিরিয়া বলে, "খবরদার বলছি, যদি কারও সঙ্গে বাড়ীর কথা নিয়ে আলোচনা কর তো ভাল হবেনা! ছেলের বিয়ে দেবে? তাই গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর? বোকার ঢিবি কোথাকার—বুড়ো হ'য়ে মরতে চললে, কাণ্ডজ্ঞান হ'লনা এখনো?"

বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়ে মন্মথ। মা যাহা মনে আসে তাহাই বলিয়া গালি দেয় মেয়েকে। অবাক্ হইয়া যায় ভুঁদি। ছেলের বিবাহ হইলে এই সংসারের উপর কতখানি ঝামেলা বাড়িবে—আজ একটি, কাল আর একটি ক্রমশ বাড়িয়াই চলিবে—ছোট ভাইবোনগুলির কি হইবে—ভাই না বুঝিলেও মা-ও কি বোঝেনা সে কথা? বিবাহ কি পলাইয়া যাইতেছে? এই তো চব্বিশ পঁচিশ বয়স, দুচার বৎসর গেলে একটু সামলাইয়া লইয়া বিবাহ করিতে ক্ষতি কি?

এই লইয়া সংসারে অশান্তি লাগিয়াই থাকে। বড়ভাই একটুতেই রাগিয়া যায়, দশকথা শুনাইয়া দেয়, খাওয়াপরা কিছুই পছন্দ হয় না তাহার আজকাল। ভুঁদিকে সাহস করিয়া কিছু বলিতে না পারিলেও মায়ের উপরই তাল পড়ে!—সেদিন মায়েতে ছেলেতে লাগিয়া গিয়াছিল এক চোট! ভুঁদি কি একটা কথা বলিতে গেলে সশব্দে ফাটিয়া পড়িল বড় ভাই, "মুখ নাড়িস্নি, যা, থুবড়ী হ'য়ে ব'সে আছি বিশমুনি পাতর হ'য়ে, আমরা হ'লে গলায় দড়ি দিতাম। কাল সাপ একটা, নিজের কাজ গোচাচ্ছে, আর আমাদের ফাঁকি দিচ্ছে।"

আগাইয়া আসে ভুঁদি—"কি কাজটা গোচাচ্চি শুনি?"

"তা নয়ত কি? মনে করিস্ আমরা ঘাসে মুখ দিয়ে চলি? এত টাকা আস্‌চে, উড়ে যাচ্চে কোতায়? নেই, নেই শব্দ ঘোচেনা কেন? আমাদের মাতায় তেপত্তর বুলিয়ে নিজে টাকা জমাচ্চ, সে কি আর বুঝিনে?" বলে বড় ভাই।

এক মিনিট স্তব্ধ হইয়া যায় ভুঁদি, "হ্যাঁ, অনেক টাকা জমিয়েছি, নেবে,? তোমার বিয়েতে খাট দেবো'খন, নিও। তার আগে দুটো দড়ি আর দুটো কলসী নিয়ে এসো—এনে মায়েতে ছেলেতে গঙ্গায় ডুবে মরগে, কাজ হবে।" বলিয়া উত্তরের অবকাশমাত্র না দিয়া বাহির হইয়া যায় সে।

"ও থাকতে আমাদের ঘরে শান্তি হবে না, তুমি দেখে নিও," বড় ভাই রাগে জ্বলিতে জ্বলিতে বলে মাকে।

"দেমাকে মাটিতে পা পড়্‌চেনা, যা মুকে আসে তাই বলে!" ঝঙ্কার দিয়া ওঠে মা।.........

কয়েকদিন পরে ঘাটে বাসন মাজিতে গিয়াছিল ভুঁদি। পাশে বসিয়া তারু ঠাকরুণও মাজিতে ছিল ভুঁদিকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, "অমরের বিয়ের ঠিক্ হ'য়ে গেলরে ভুঁদি, আসছে মাসের তিন তারিকেই বিয়ে। আর মোটে বারো দিন, কি ক'রে যে সব জোগাড়পাতি হবে তাই ভাব্‌ছি।'

পরের বাড়ী রান্না করিয়া খায় তারু, তাহার ছেলে অমর টোটো কোম্পানিতে ডিউটি দেয়—তাহার বিবাহ? মাথায় রক্ত উঠিয়া যায় ভাবিতে ভুঁদির। "কি সাহসে বামুনমা, ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন!' ঝাঁঝের সহিত জিজ্ঞাসা করে সে।

"কেন, লা? ছেলের বিয়ে দোব, তার আবার সাহস অসাহস কি?" বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে তারু ঠাকরুণ।

"আপনিই পান্‌না খেতে, ছেলে কাজকর্ম করেনা, বিয়ে?

দপ্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে তারু ঠাকরুণ,—"আমি খেতে পাই, না পাই, তোর কি লা? নিজেতো থুবড়ী হ'য়ে আচিস্, ভাইদেরও রেকেচিস্। মা-টা কেঁদে মরে, বলি, আমরা কি কিছু বুজ্‌তে পারিনা! বেশী ঘাঁটাস্‌নি আমাকে—দোব হাটে হাঁড়ি ভেঙে—আমার নাম যাকে বলে তারী বামুনি, কারুর খাতির নেই আমার কাচে।' মুখখানি একখানি হইয়া ওঠে তাহার বোধহয় আত্মমহিমায়।

"কি, কি বল্‌লেন? বলুন আর একবার?" চীৎকার করিয়া ওঠে ভুঁদি।

"ওঃ বল্‌বেনা, কেন শুনি? তোর ভয়ে নাকি? সোমত্ত ভাই, সোমত্ত বোন, বিয়ে করবনা, বিয়ে করবনা, কেন লা?" বলিয়া অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে তারু।

হাতেই বড় ঘটিটা ছিল—এক হাতে চুলের ঝুঁটি ধরিয়া আর এক হাতে ঘটি দিয়া মুখ থেঁতো করিয়া চলিয়াছে ভুঁদি—"এই কথা বলার উত্তর এই—এই—এই—"

পাশের বাড়ীর বিনোদিনী আসিয়া দুইজনকে আলাদা করিয়া না দিলে কি যে হইত বলা যায় না।

কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়াছে ভুঁদি।

অক্টোবর

…"একটি কথাও বলেনি সে;
আমার ভাবনা যায় ভাবনায় মিশেঃ
তারপর সে কি মনে রাখে, তেতো নিয়ে
বাগানের গাছ থেকে, যেখানে বানিয়ে
রেখেছে প্রাচীন পাম-সাগু শিরে বেড়া,
বাঁকা পথ-রেখা যায় যেখানে ঝোপেরা
দুয়ার দেখায় তবু কুড়োবো যে তাকে
সাধ্য নেই নিষেধের ফল ঝুলে থাকে।"…..

॥ এডওয়ার্ড টমাস ॥

[এডওয়ার্ড টমাস প্রথম মহাযুদ্ধে মৃত সৈনিক কবি। মনোভঙ্গীর এই বিষণ্ণ প্রকাশ তাঁকে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের সমগোত্রীয় করে তোলে। অনুভব-প্রধান এই ঋজু গীতিসুর আমাদের মনে প্রাকৃত কবিতাবলীর গীতিভঙ্গীর স্বাদ এনে দেয়।]

শ্রীমতী গ্যালিভার

কবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দশটা থেকে বেলা সাড়ে বারোটার প্রাথমিক সময়টুকু একাগ্র দৃষ্টির জালটাকে জানালার বাইরেই টাঙ্গিয়ে রাখলেন অনুরাধা। হু-হু-হাওয়া দুপুরে একটা রোদ-শুকনো চিল পাখসাট দিচ্ছে সামনের বিরাট বাড়িটার কার্নিস-কিনারে। বিপরীত দিকের জানালা দিয়ে আসা গঙ্গার সলিলসঙ্গী আরাম-বাতাসের আশ্বাসে একটা নিমেষহীন সময়ের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে ইচ্ছা করে বড়। নির্নিমেষ চোখের তারায় বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু অফিসে আসার প্রথম দিনে প্রথমেই—বাইরের আকাশ বাতাসের উদার ঔজ্জ্বল্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা স্থান-কাল-পাত্রোচিত নয়, মনে হতেই, বাইরের আলো অফিস অনুশাসনের অন্ধকারে নিমেষে লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু অফিসে কাজ নিলেও কোনো অনর্থনৈতিক ইতিহাস সঙ্গে বয়ে আনতে পারেন নি তিনি ভাবতে গিয়ে অস্বস্তির বেড়ায় আবার আটকে গেলেন। পারিবারিক দুরবস্থা তাঁকে চাকরীতে ঠেলেনি, তেমন কোনো বিপর্য্যয় না ঘটলে হয়ত ঠেলবেও না কোনো দিন। স্বচ্ছল মাইনের চাকরী, পৈতৃক যুগের বাড়ী দুটোই আছে স্বামী মহিতোষের এবং স্বামীতৃপ্তও অনুরাধা। কাজেই আর পাঁচ জন জীবিকান্বেষিণীর মত ড্যালহাউসির ভীড়ে পা মেলাবার আপাত-কারণ নেই তাঁর।

অথচ আশ্চর্য্য। অনুসন্ধানের চরকে অনেক হয়রান করে তবে হদিস পেয়েছেন অতি সাময়িক এই কেরাণীত্বের। অতি সাময়িক বলেই বোধ হয় আরো ভালো লাগল। জীবনের অচেনা মহল ড্যালহাউসির সঙ্গে পরিচয়-পরিচ্ছেদ শেষ করে অন্য কোনো পৃথিবীর অন্বেষণে নিযুক্ত হতে পারবেন আবার।

আসল কারণটা জানেন তিনি একাই। আর কিছুটা তাঁর স্বামী মহীতোষ। আর জেনে পর্য্যন্তই স্ত্রীর এই সুখে থাকতে ভূতে কিলোনোর খেয়ালকে সংযত করতে বিস্তর চেষ্টা করেছিলেন।

—ট্রামে বাসের কুমড়ো-বোঝাই ভীড়ে দশটা-পাঁচটা না করলে বুঝি ভালো লেখা যায় না।

—লংকা না খেয়ে যাঁরা ঝালের স্বাদ পান, তাঁরা নমস্য, আমার অতটা শক্তি নেই। কিন্তু কথা তা নয়, অভাবের পৃথিবীকে না জানতে পারাটা বড় বিশ্রী, আকাশ-উঁচু আসনে বসে জীবনকে বোধ হয় ঠিক মাপা যায় না।

স্বামীর সঙ্গে অনুরাধা পারতপক্ষে নিজের ধ্যান-ধারনার কথা আলোচনা করেন না, তবু পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনের সাহচর্য্যে স্ত্রীকে কিছুটা চিনেছিলেন, তাই আপত্তির দেয়ালটাকে তেমনি উঁচু করে তুলতে পারেন নি মহীতোষ।

কিন্তু অনুরাধা রায় উপন্যাস লেখেন, ভবিষ্যতে আরো লিখবেন তাই তাঁর কিছু অভিজ্ঞতার দরকার, এটা নেহাৎই তাঁর স্বামীকে-বলা-কারণ। আসলে, অনুরাধা রায়ের মনের তৃতীয় নেত্র খুলেছিল দৃষ্টির তলায় আবিষ্কারের কাজল নিয়ে। প্রাত্যহিক কর্ম্মপঞ্জীর প্রতিটী ঘটনাতেই সৌন্দর্য্যের এক একটা

ভাস্বর দ্বীপ আবিষ্কার করতে পারতেন তিনি। এমন কি ভ্যাপসা কলকতায় ভোরের নলপ্রপাত, রাস্তা টেপা রোলারের গজেন্দ্র গতি, ভিখিরীদের ফুটপাতে পদ্মনাভ শয়ন, ইত্যাদি সর্ব্বকর্ম তুচ্ছই তাঁর রূপান্বিষ্ট জীবনে আলো বিকীরণ করত। এবং মানুষ মহীয়ান, পৃথিবী অপরূপা, এই ধরণের কতকগুলো ধারনার হাত ধরে ধরেই চিন্তার সড়কে প্রথম হাঁটতে শিখেছেন অনুরাধা। তার জন্যে অনেকবার অনেক সংগতি-হীন কাজ করতেও পেছন-পা হন নি। নার্সের চাকরী নিয়ে মাদ্রাজের একটা অখ্যাত শহরে ছিলেন কিছুদিন, উড়ো সখি হয়ে উড়ন্ত পাখীদের কাছাকাছিও এসেছিলেন, এমনকি একটা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের বিপনী-বনিতা হয়ে বম্বেতে চলেও গিয়েছিলেন হঠাৎ একদিন। তবুও অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়ে এতটুকু ঝলসায় নি তাঁর চোখ। পৃথিবীর দিকে আজো তাঁর অসীম বিজিগীষা।

—কি ভাবছেন মিসেস রায়? অনেকক্ষণ পর একটা অপ্রত্যাশিত সম্ভ্রম-উষ্ণ গলা শোনেন অনুরাধা দেবী। তাড়াতাড়ি সচকিত হয়ে নড়ে চড়ে বসতে হয়। এতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে থাকাটা বাস্তবিক লজ্জার। চোখ তোলেন প্রশ্নকর্তার দিকে।

—আমি এই সেকশ্যনের হেড এ্যাসিষ্টেন্ট, নির্ম্মল সেন। ভদ্রলোকের গলায় একটা অহেতুক বিনয়ের সুর শব্দ করে।

—তা, নমস্কার। অনুরাধা চিরদিনই স্বল্পবাক। বেশী কিছু না বলে স্মিত মুখে টেবিলের দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ হলেন। আর ঠিক সেই ফাঁকে কথার বাঁধে কোদাল চালালেন নির্ম্মল সেন।

—সত্য আমাদের পরম সৌভাগ্য আপনার মত একজন লেখিকাকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি। আমরা ছাঁ-পোষা মানুষ, খাই দাই ঘুমোই। আপনাদের মতন দু-একজন আছেন বলেই দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির কিছুটা আভাস পাই তবু।

কথা-কলায় নির্ম্মল সেনের বুৎপত্তির কিছুটা আভাস পেলেন অনুরাধা।

তারপর হাত কচলে, ঘাড় নামিয়ে নির্ম্মলবাবু অনেক কিছুই বলে গেলেন এবং সব শেষে শোনালেন তাঁর মূল হিতোপদেশঃ

—আপনারা সব কোয়ালিফায়েড মানুষ, আফিসের সাধারণ লোকদের সঙ্গে খাপ না-ও খাইয়ে নিতে পারেন। তাই বলছিলুম—। এই পর্য্যন্ত বলে চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। তারপর গলাটাকে কান-শোনানো স্বরে নামিয়ে শেষ করলেন বাকীটুকু।

—এখানকার আফিস গার্লদের সঙ্গে মিশবেন না। কোনো গুণ নেই, রঙ-ঢঙে সঙ্ এক-একটা। আধঘণ্টা অন্তর অন্তর হিমানী পাউডার ঘষছে আর কাজ থাক না থাক পি, এর ঘরে সেঁধুচ্ছে। চাকরীই রেখেছে ওই করে। মিশবেন না, মিশবেন না, ওরা আপনার উপযুক্ত নয়।

কিন্তু সৌন্দর্য্য-আপ্লুত মন অনুরাধা দেবী, নির্ম্মল সেনের কথায় এতটুকু বিচলিত হলেন না। এমন কি নির্ম্মলবাবুকেও তাঁর খারাপ লাগল না, সহ-কর্ম্মিনীদের বিরুদ্ধে অহেতুক নিন্দা গুঞ্জন করার জন্যে।

পরে, টিফিন-ঘরে আলাপ করলে সকলে। বীথি মজুমদার, মায়া বোস, জগৎলক্ষ্মী সেন ইত্যাদিদের মত প্রায় সব মেয়েই।

—আপনিত বই লেখেন, না? বিস্ময়ের চোখ তুলে প্রশ্ন করল কে যেন।

মৃদু হাসলেন অনুরাধা।

—কি কোরে জানলেন? কে বলেছে?

—কে আবার! ওই হেড প্রোটেষ্টাণ্ট।

—হেড প্রটেষ্টাণ্ট?

—হ্যাঁ, ওই নির্ম্মল সেন, হেড এ্যাসিস্টেণ্ট। ওকে আমরা প্রোটেষ্টাণ্ট বলি। একটু বেশী সাত্বিক কিনা। কেন আপনাকে আমাদের সম্বন্ধে বলে নি কিছু? অথচ জানেন ওরই বোন পালিয়ে গিয়েছিল সিনেমার সাইড পাট করা ছোকরার সঙ্গে!

এবার কেমন যেন বিপদে পড়েন অনুরাধা দেবী। কি বলবেন ভেবে না পেয়ে চুপ করে এক-দিকে তাকিয়ে থাকেন।

—বলেনি বুঝি? না বললেও বলবে একদিন না একদিন।

অনুরাধার মুখের দিকে তাকিয়ে সচকিতে আলোচনার মোড় ফেরাবার চেষ্টা করল মেয়েরা। জীবনের কোথাও এতটুকু কুশ্রীতা সহ্য করতে পারেন না তিনি, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি কথায় স্বভাবতঃই মুখ ম্লান হয়ে আসে। কিন্তু তবু ভাববার চেষ্টা করেন। সংসারের অযুত যুদ্ধে এরা অক্লান্ত অনীক। ওদের প্রাণ শক্তি তবু অফুরন্ত। দশটা থেকে পাঁচটার ঘানিচক্রে ঘুরেও যখন-তখন মুখ উজ্জ্বল করবার সময় পায়, প্রচ্ছদে আনে বর্ণবন্যা। মেয়েদের ওপর তার শ্রদ্ধা আরো প্রগাঢ় হল যখন শুনলেন সংসার সময়ের সভ্রান্ত তর্জনী শাসনের মধ্যেও গান গায় প্রণতি। উলের ঊর্ণনাভ বুনতে পারে রাধারাণী। মনের দোলনায় একটা শান্ত শ্রদ্ধাকে দুলিয়ে সবাইকেই সমান ভাবে গ্রহণ করলেন অনুরাধা দেবী। আর মেয়েরাও ওর জন্যে সম্মান আভিজাত্যের এমন একটা উষ্ণ আসন ছেড়ে দিল যে অফিসে আসার প্রথম দিন থেকেই মনে হ'ল সহজ সৌন্দর্য্যের একটা খনিই দৈবাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছেন তিনি।

যতদিন গেল সতেজ ডালহাউসির পৃথিবীতে পরিচয়ের শাখাপ্রশাখায় নিত্য নতুন ফল ফলাতে আরম্ভ করল অনুরাধার ক্রমবিস্মিত চোখের সামনে। তাঁর সেই চিরাচরিত সৌন্দর্য্য পীড়িত মনটা দপ্তরের এ-মন থেকে সে-মন অশ্রান্ত পরিভ্রমণ করে দুঃস্থই হয়ে পড়ল একরকম।

নতুন জিনিস দেখলেন কতকগুলো।

দেখলেন, শ্রাবণের ধারাঝিরি আকাশে রামধনুর বর্ণবিচ্ছুরণে, কৃষ্ণচূড়ার অগ্নিমুখ ফুলঝুরিতে গঙ্গার ইস্পাত সেতুর ওপরে হুমড়ি খাওয়া পশ্চিম সূর্যের অরুণ রক্তিম খেলায়, এরা কেউই কোনোদিন বিস্মিত হয় না। অবকাশের আসনে বসে জীবনের জানালায় একদণ্ডও চোখ রাখেনি কেউ। ধোঁয়া থাকার অন্ধকারে এরা অন্য আলো জ্বালিয়েছে, তার জ্যোতি আলাদা, ছায়া-ক্ষেপণ পৃথক।

টিফিনের অবসরে আসর বসে টিফিন ঘরে। সেখানে অনুরাধা দেবীও যেতেন প্রথম প্রথম তাঁর চিরাচরিত খনি-খোঁজা মন নিয়ে। কিন্তু জীবনের গলিত গল্পের শবগন্ধে অস্থির হয়ে উঠলেন অল্পদিনেই। কুমারী সহকর্ম্মিণীদের কাছে বিবাহোত্তর জীবনের গল্প ছাড়া আর কিছু বলতে শুনলেন না বীথিদের। অনেক দিন লক্ষ্য করেছেন, এই জন্যে মেয়েদের মধ্যে বীথির একটা নির্লজ্জ চাহিদাও আছে। কাজ

ফাঁকির সামান্যতম অবসরেও বীথির বহুদিন গত নববিবাহিত দয়িত-আচরণের কাহিনীতে জর্জ্জর হয়ে আসা মেয়েদের নৈমিত্তিক অভ্যাসের মধ্যে।

শুধু কি গলিত গল্প, চরিত্রবিকাশও দেখলেন কত বিচিত্র।

মায়া বোসকে দেখলেন। প্রতি মাসের ঠিক মাইনে পাওয়ার দিনটাতে একরাশ নোট হাতে অনাবশ্যক চেঁচায় মায়া। অনুপস্থিত স্বামীর দেহপাত কামনা করে সেদিন দশটা থেকে পাঁচটা।

একটু একটু করে মায়ার কাছ থেকেই শুনলেন ওর আক্ষেপ-আখ্যায়িকা।

—চাকরী কি মেয়েরা সখ করে করে? (কথাটা কেন যেন ভাল লাগলনা অনুরাধার)। সেবার ওঁর চাকরী গেল তাই ঢুকলাম এই হেঁটুরে দাসীবৃত্তি করতে। কিন্তু এখন কি দরকার আমাকে চাকরীতে পাঠানোর? আমি কি আর বুঝিনা, ওই ধুমসো গতরখাকি বোনগুলোকে পার করবে আমার কাঁধে তক্তা রেখে। আপনিই বলুন ভাই, তার চেয়ে বিধবা হওয়া ভাল না?

আরো অনেক কথাই বলেছিল মায়া। একটা একটানা উৎপাদন-যন্ত্র হয়ে শরীর বিকল, তার ওপর আবার চাকরী। মাথার ঘাম পায়ে ঝরিয়ে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দূরে থাক, মাইনের পাই-পয়সা পর্য্যন্ত তুলে দিতে হয় স্বামীর হাতে। অনেকবার এই বিসদৃশ্য দৃশ্যের প্রতিকূলে কথা বলেছিলেন অনুরাধা।

—ওভাবে নিজের স্বামীকে নামিয়ে তুমি কিন্তু ওপরে থাকতে পারো না কিছুতেই। তোমার চাকরীর টাকা যে ভাবেই হো'ক তোমাদেরই সংসারের জন্যে খরচ হচ্ছে। অনুরাধাকে অন্যান্য মেয়েদের মত শ্রদ্ধার দূরত্বে রাখে বলে মায়া আর স্বামী সম্বন্ধে কোনো অশুভ উক্তি করলনা বটে, কিন্তু যথারীতি মাইনে পাওয়ার দিনে চেঁচাতেও ছাড়ল না।

অফিসের সমস্ত মেয়ের প্রাণবিন্দু হলেন দপ্তর অধিকর্ত্তার সহকারী। ভদ্রলোকের অফিসপ্রদত্ত নাম পারসোনাল এ্যাসিষ্টেণ্ট, সংক্ষেপে পি. এ। কিন্তু মেয়েদের কাছে তাঁর নাম আরো অর্থবহ। যতীন ভট্টাচার্য্যকে 'প্রিয়ে' বলেই ডাকে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে। নামটা যখন প্রথম চালু হয়েছিল তখন হয়ত শ্লেষ-কৌতুকে উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু এখন ব্যবহার হয়ে বিশেষণের সবটুকু গন্ধ হারিয়ে, অস্তিত্বমাত্র বিশেষ্য হয়ে সকলেরই জিবে স্থায়ী হয়ে গেছে।

পি. এর ঘরে মেয়েদেরই বেশী ডাক পড়ে। কারণ যতীন ভট্টাচার্য্যের বিশ্বাস ছেলেদের মত মেয়েরা অত ফাঁকিতে রপ্ত হয়নি, কাজ যেটুকু পাওয়া যায় তা ওদের দিয়েই। আর মেয়েদের যে পি. এ বেশী ডাকেন এতে কৃতজ্ঞও দপ্তরের সব মেয়ে। যখনই পি. এর কেবিন থেকে ডেকে পাঠানোর স্লিপ এসেছে, স্লিপ-প্রাপ্তাকে যেতে হয়েছে ক্লোকরুমে, কম সময়ের মধ্যে যতটা সম্ভব প্রসাধন শেষ করে অতিরঞ্জিত মুখে গিয়ে সানন্দে ঢুকতে হয়েছে পি. এর কাঠ-কেবিনের স্থিতিস্থাপক দরজা ভেদ করে। এ নিয়ে মেয়েদের মধ্যে একটা উহ্য প্রতিযোগিতাও আছে। যে যতবার পি. এ-শমন পেয়েছে, টিফিন ঘরের গল্প তাকে ঘিরেই গুঞ্জিত হয়ে ওঠে ততবার সেদিনকার মত।

এতটা ছন্দপতন অনুরাধা দেবী বাস্তবিকই সহ্য করতে পারেন না। বাড়ীতে কথা হয় স্বামী মহীতোষের সঙ্গে।

—সত্যি, আমি যতই দেখছি ততই মুষড়ে পড়ছি। এরা কি পৃথিবীরই মানুষ?

—সেকি? এ কয়দিনেই তোমার পৃথিবী নির্ণয় হয়ে গেল? মৃদু হেসে হয়ত ঠাট্টা করে মহীতোষ। অনুরাধা আহত হন, মহীতোষের কথায় নয় তত, নিজেরই আবিষ্কারের আঘাতে। বাস্তবিক, পৃথিবী তাঁর সামনে এভাবে নির্ণীত না হলেই যেন ভালো, আরো ভালো ছিল।

—ওদের একটা আশ্চর্য্য দুর্ব্বলতাও লক্ষ্য করলাম। মেয়েদের মধ্যে অনেকেই আমার কাছে প্রমাণ করতে চায় যে তারাও এককালে সুকুমার কলার চর্চ্চা করত। প্রণতি নাকি আগে রেডিওতে গান করত, নাচতে পারত বীথি।

—তা হতে পারে, এমন আর কি? শনি আর রবিবার আজকাল সব বাপমাই মেয়েকে নাচ-গানের স্কুলে পাঠায়। মহীতোষ এমনি বলেছিলেন কথার পিঠে।

—দূর, দূর। তুমি ভাবছো ওরা সত্যি কোনাদিন নাচগান শিখেছে নাকি, আর শিখলেও ঘটা করে শেখানোর মতন? সত্যি যে শেখে সে কখন ওভাবে প্রাচীরপত্র আটকে বেড়ায়? ওটা বুঝলে, আমাকে বোঝানো যে ওরাও এক একজন কলাশিল্পী! হঠাৎ একটা আশ্চর্য্য তেতো গলা বেরিয়ে আসে অনুরাধা দেবীর কণ্ঠ থেকে।

মহীতোষ মুখে কিছু বলেন না। শুধু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন স্ত্রীর কিছু পরিবর্ত্তন এসেছে। সহজেই অবিশ্বাস করতে পারেন অনুরাধা আজকাল। এটা একরকম ভালই হয়েছে ভাবেন। হাওয়ার উল্টো দিকে পাল খাটালে নৌকা চলে না চিরদিন, চিরদিন কেন, কোনদিন। কিছু বাস্তব হাওয়া তার।

—আচ্ছা নির্ম্মলবাবু, ওরা অত পি, এর কথায় থাকে কেন বলুন ত? একদিন প্রশ্নই করে ফেলেন অনুরাধা দেবী। ওর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পেয়ে নির্ম্মলবাবুও সহর্ষে প্রায় আট-টুকরো হয়ে যান। অনেক হিজিবিজি কথার পর তবে আসল কথায় আসেন:

—পি, এর কথায় ওরা নাচবে না ত কি? এ অফিসের প্রত্যেক মেয়েই পিওরলী টেম্পোরারী এ্যাণ্ড পুওরলী টু। পরীক্ষা দিয়ে ত আর আসেনি কেউ। এমন কি মাস গেলে আপনারো চাকরী যেতে পারে। ওই পি, এ ব্যাটাই ফ্রেশ স্যাংশন্ করিয়ে করিয়ে ওদের চাকরী রেখেছে, অতএব—।

'অতএব' বলে একটা অশ্রাব্য কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু অনুরাধা দেবীর সঙ্গে কথা বলছেন মনে হতেই, দাঁত দিয়ে জিব চেপে ধরেন জিবের ভেতরে। অফিসে পুরুষ কেরাণীদের সঙ্গেই যা একটু কথাবার্ত্তা বলেন অনুরাধা। এমন কি টিফিনের সময় মেয়েদের টিফিন ঘরেও যান না, অতি ছোট ধরনের সব কথাবার্ত্তার আওয়াজ থেকে কান বাঁচানোর জন্যে। অনেক সময় অনন্যোপায় হয়ে শুনতে হয় কিছু কিছু।

—অনুরাধাদি আপনি পাউডার টাউডার মাখেন না কেন? অকারণেই একদিন সিঁড়ির মুখে ধরে বল্ল জগৎলক্ষ্মী।

—তেমন অভ্যস্ত নই। আর কি দরকার, তেমন গরম ত পড়ে নি। আলোচনাটাকে যতদূর সম্ভব ব্যক্তিগত থেকে সাধারণ পর্য্যায়ে আনবার চেষ্টা করেন অনুরাধা দেবী।

—প্রিয়ে, মানে, পি, এ সাহেব কিন্তু হাড়ে হাড়ে চটেন, তেলতেলে মুখে অফিসে এলে। একবার মীরার পাউডার ছিল না, ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই ওকে শুনতে হয়েছিল,—এটা অফিস না B. O. C. র গুদাম ঘরই—যা চাকরীর বাজার, কি দরকার বাবা ওপরয়ালা ক্ষেপিয়ে? অনুরা

উত্তর দেবেন কি, তিনি যে কোনদিন কথা বলতে জানতেন এ তথ্য পর্য্যন্ত ভুলতে বসলেন। কিন্তু পি, এরও কোনো দোষ দেখতে পান না তিনি। মেয়েরা যেভাবে দিনের পর দিন পি, এর কেবিনে অযাচিত হাসি-গল্পের অমায়িক মলাটে ভেতরের অন্তঃসারহীন করুণ দৈন্যকে ঢাকবার চেষ্টা করে আপ্রাণ, তাতে এতটুকু সম্মান রেখে কথা বলাটাই পি, এ র পক্ষে অস্বাভাবিক হ'ত।

অনুরাধা রায় এতদিন পরে বুঝতে পারলেন দশটা পাঁচটার ডালহাউসীতে তিনি সত্যি অচল। শুধু পাউডার মাখেন না বলে নয়, ভাষণে ভূষণে তাঁকে তাঁর নিজস্ব জগতেই মানায়। পদ্মপত্রে জল-ফোঁটা-চাকরী রাখতে হলে হাসি গল্পের রাংতায় উজ্জ্বল থাকতে হয় সর্ব্বদা; গায়ের রঙে জামা, জামার রঙে সাড়ির জমি, আর সাড়ির জমির রঙে জুতো সযত্নে নির্ব্বাচন করতে হয়। খাদি তাঁতের সাধারণ সংযতশ্রী চেহারা চোখে পড়ার চাইতে চোখের ফাঁকে ফাঁকি পড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। অফিসে যতই পুরোণো হতে লাগলেন অনুরাধা অভিজ্ঞতার তীরে ততই তিক্ত পলির স্তর পুরু হয়ে জমতে লাগল।

মায়া বোসের আরেক কাণ্ড সেদিন। মাইনে পাওয়ার দিন হওয়া সত্ত্বেও মায়ার আর্ত্তনাদ নেই। হাসছে মায়া অনর্গল।

—বেশ হয়েছে। আঃ কি যে আনন্দ হচ্ছে আমার! কেমন ভোঁতা মুখ থেঁতো হল আজ। বিস্মিত হয়ে এদিক ওদিকে তাকান অনুরাধা। অবশেষে বীথিই বিশদ করে। কি একটা কারণে মায়ার বিল আজকে পাশ হয়নি। মাইনে পায়নি মায়া। আর ওদিকে নাকি ওর শাশুড়ীর দারুণ অসুখ। স্বামী মাইনের টাকা নিতে এসে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে। আর স্বামীর হতাশ-মুখ ফিরে যাওয়ায় কি কোরে যে একটা হিংস্র আনন্দের খোঁজ পেল মায়া! অনাবিল হাসছে। টিফিনের সময় ক্যান্টিনে তার প্রায় সব বান্ধবীদের খাইয়েও দিল।

—অত যে টাকা খরচ করলে? মাইনেত পাওনি আজ? ক্যান্টিনের নিমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে বল্লেন অনুরাধা।

—অনুরাধাদি যে কি বোকা, আমি যত মাইনে পাই ঠিক ততই বুঝি বলি বাড়িতে? ত্রিশটাকা কমিয়ে বলি। নইলে রক্ষে আছে। গেলবার জন্যে পাঁচশোটা বোয়াল হাঁ করে রয়েছে সেখানে।

অনুরাধা দেবী ফাইলে সান্ত্বনা খুঁজতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু ছুটির কিছু আগে এসে যখন রাধারাণী বক্তব্য নিবেদন করল, কোনো সান্ত্বনাই আর কোথাও খুঁজে পেলেন না—অনুরাধাদি একটা কথা বলবো, কিন্তু কাউকে বলবেননা বলুন? অনুরাধা কিছু বলবার আগে তাঁর হয়ে যেন নিজেই মন্ত্রগুপ্তির স্বীকৃতি দিয়ে দিল রাধারাণী। তারপর বল্ল সব।

একাউণ্টসে কাজ করে একজন, সোমেন সেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে রাধারাণীর। লোকটা অবশ্য লোভনীয় কোনো দুর্ব্বলতা দেখায়নি রাধারাণীর সম্পর্কে, তবু এত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও চিঠি চাইবার অন্য কোনো অর্থের ইঙ্গিত আছে বইকি।

—সত্যি, এতদিনে বুঝতে পারছি আমি ভীষণ ছেলেমানুষ, বেশ ছোট ছিলাম। একদিন চা খেতে খেতে ম্লান হয়ে বল্লেন অনুরাধা।

—তার মানে, বলতে চাও, তুমি এখন বেশ বড় হয়েছো? মহীতোষ হাসেন।

সত্যি বিশ্বাস করো, এ কয়মাসে আমি প্রচণ্ডই বড় হয়ে গেছি। অনেক কিছু, অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখতে পাই আজকাল।

—আমার কিন্তু মনে হয় আজকালই তুমি ঠিক সাইজমত হয়ে আসছ। আগেই বরং তুমি একটু উঁচু ছিলে। ত্যাখোনা উঁচুতে উঠলে সব কিছু কেমন সুন্দর লাগে অথচ কোনো কিছুরই আসল পরিচয় স্পষ্ট হয় না তেমন। স্বামীর কথাকে মেনে নিলেন কিনা বোঝা গেল না, চুপ করে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বল্লেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে অস্ফুট শব্দে :

—নাঃ, যাই বল, আমি সমতলে আসতে চাইনা আর। ছোট ছোট মানুষেরা তাদের চেয়েও ছোট ছোট সব দৈন্য নিয়ে যে নিদারুণ হানাহানি করে, যে কোনো সুস্থ, স্বাভাবিক উচ্চতা বিশিষ্ট মানুষের পক্ষে তা সহ্য করা অসম্ভব। ভাবছি চাকরীটা ছেড়ে দেবো।

—আমারও মনে হয় ছেড়ে দিলে তোমার আরো খারাপ লাগবে। ছোট মানুষদের কাছ থেকে তোমাকে যদি পালাতেই হ'ল, তাহলে তোমার ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা রইল কোথায়?

কিন্তু পরদিন অফিসে গিয়ে যা শুনলেন তার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না অনুরাধা।

—শুনেছেন অনুরাধাদি? আমাদের অফিসে আর্টিষ্ট কমলা রায়চৌধুরী আসছেন! সত্যি দেশটা যে কি হ'ল একটা কেরাণীর চাকরীর জন্যে শিল্পী, সাহিত্যিক—। নির্ম্মল সেনের কাছে আরো ভাল করে শুনলেন। তাঁর জায়গায় নতুন একজন আসছেন। অনুরাধা রায়ের সাময়িক চাকরীর স্থায়িত্বস্থিরতা খুবই কম।

ভেবেছিলেন রেহাই পাবার এমন একটা সুবর্ণসুযোগে খুবই সুখী হবেন। কিন্তু নিজের চেয়ারে বসে জানালার দিকে তাকিয়ে একবার, আরেকবার বিরাট হলঘরটার দিকে, মনে হ'ল নিজে স্বেচ্ছায় বিদায় নিলেননা এতদিন, অন্যের জন্যে জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে বাধ্য হওয়াটা বড় বিসদৃশ। বিশেষ করে মায়া, বীথি জগৎলক্ষ্মী ইত্যাদি মেয়েরা যদি ওঁরই মত সাময়িক হয়েও থেকে যায়, তাহলে শুধু ওঁরই যাওয়ার কোনো মানে হয় না।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত মায়া হ'ল অনুরাধা দেবীর অফিসের প্রতিটী পদার্থের ওপর। বহুদিনের দেয়াল ঘড়ির টিক্ টিক্ প্রাণ-স্পন্দনে নতুন আহ্বান শুনলেন।

—অনুরাধা দি আপনি প্রিয়ে (মানে ওই পি-এ) সাহেবের সঙ্গে দেখা করুন না কেন? অবশ্য আপনার চাকরী গেলেই বা কি, থাকলেই বা কি? আমার মত ত আর গণ্ডা কয়েক হাড়গিলে হাঁ করে নেই বাড়ীতে! যথারীতি পলতে পাতা চিবোনো মুখে কথা বল্ল মায়া বোস।

—থাকলে কিন্তু মন্দ হত না।

কেন যে বল্লেন কথাটা। কেউ বুঝল না। এমন কি তিনি নিজেও না।

—আমি যা বল্লাম। তাই করুন। পি এ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে অন্য কোনো সেকশনে বদলি হয়ে যান।

—হাঁ। তাই করুন। প্রিয়েটা হ্যাংলা হলে হবে কি, লোকটা খারাপ নয়। তবে আপনি আবার যা মুখ-গোমড়া করে থাকেন। একটু ইজি হলে।

অনুরাধার থমকানো মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করল বীথি।

বাস্তবিক বীথির কথার ইঙ্গিতটা একটু বেশী স্পষ্ট। যতীন ভট্টাচার্য্য, যাকে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে প্রিয়ে বলে ডাকে তাঁর মনোনয়ন লাভ করতে হলে নেহাৎ মনোরঞ্জন না হোক, একটু দৃষ্টিরঞ্জন হতে হবে বৈকি।

একবার ভাবলেন আজই পদত্যাগপত্র দিয়ে বাড়ী চলে যান। কিন্তু ততক্ষণে তাঁর জায়গায় যিনি নতুন আসবেন তাঁকে নিয়ে জল্পনার জাল বোনা অনেকখানি এগিয়ে গেছে কেরাণী মহলে। কৌতূহল বোধের তাগিদে দেখে যাওয়ার জন্যে থেকে যাওয়া এমন কিছু দোষাবহ নয়।

—আমাদের কি রকম ভাগ্য বলুন ত অনুরাধাদেবী। শিল্পী সাহিত্যিকা গায়িকা ছাড়া আমরা কথাই বলছি না।—নির্ম্মলবাবু একটা বোকা ধরনের হেসে অনুরাধার মানসিক গতিকে অনুধাবন করবার চেষ্টা করেন।

বাস্তবিক। সাহিত্যিকা অনুরাধা রায়ের ছেড়ে যাওয়া চেয়ারে শিল্পী কমলা—ঘটনাটায় বেশ একটা লক্ষণীয় আকস্মিকতা আছে।

বাড়ী ফিরে স্বামীকে বলবার চেষ্টা করেও কিছু বলতে পারেন নি। কি বলবেন! যেখানে সকলে চাকরী রাখতে পেরেছে সেখানে তিনি রাখতে পারবেন না। এটা কিন্তু বলার মত নয়। বিশেষ করে তাঁর জায়গায় যিনি আসছেন, তিনি আফিসে বসবার আগেই, অনুরাধা রায়কে মুছে ফেলবার যে উপক্রম তার পক্ষেও যেমন কোনো যুক্তি নেই বিরুদ্ধে ও না।

ছোট হওয়ার মধ্যে যে কত সুবিধের সোনা লুকোনো এতদিনে বুঝলেন। অফিসে কাজ করার এ কয়মাসে দুবার কি তিনবার পি, এর ঘরে ঢুকেছেন, তাও নেহাৎই দরকারে। অথচ যতীন ভট্টাচার্য্য এমন কিছু সুন্দরবনের প্রাণী নন। অবশ্য অনভিপ্রেত কিছু বলে বসা অস্বাভাবিক নয় ওর পক্ষে। কিন্তু ওটাকে ত চাকরীর মধ্যেই ধরে নিয়েছে মেয়েরা। আকাশ-উঁচু আসন থেকে জীবন মাপবার জন্যে নীচে নেমে, 'হাটি পথ, না ছুঁই মাটী'র নীতিতে চললে বোধ হয় জীবনকে জানা যায় না।

পরদিন অফিসে অনুরাধা দেবী এলেন কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে। সারারাত কুরুক্ষেত্র করেছেন মনের সঙ্গে। যতবারই চাকরী ছাড়ার কথা মনে হয়েছে ততবারই কমলা রায় চৌধুরীর অচেনামুখ ছায়া নামিয়েছে ভেতরে। যদিও সমস্ত সময় না হোক, কোনো কোনো মুহূর্ত্তে তিনি নিজেই লজ্জা পেয়েছেন এই ধরনের জান্তব চিন্তায়। কিন্তু কি করবেন জান্তব তাগিদ ত তাঁর নেই। দক্ষিণ কলকাতায় বাড়ী. স্বচ্ছল আয়ের চাকরী দুটোই দুর্ভাগ্যক্রমে আছে তাঁর স্বামীর।

মনের গলিতে অনেকবার পায়চারী করে অবশেষে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন আজ অফিসে। কিন্তু টিফিন পর্য্যন্ত গেল তাঁর সাহস জড়ো করতেই। ভেতরে ভেতরে কেন যেন একবার ছোট, একবার বড়, হচ্ছিলেন অনুরাধা। অবশেষে উঠলেন। সিড়িতেই দেখা মায়া বোসের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গেই ভয়াবহ অশুভ উচ্চারণ শুনলেন :

—বাঃ, আজকে আপনাকে ত খুব সুন্দর লাগছে অনুরাধাদি। সত্যি, আপনি সিল্কের কাপড়

পরেন না কেন কোনোদিন? উত্তর কি দেবেন, ঘামতে থাকেন অনুরাধা। তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে ক্লোকরুমে ঢুকে পড়েন।

ঘণ্টাখানেক পরে টিফিন রুমে যখন এসে হাত পা ছেড়ে বসে পড়লেন, কারো উপস্থিতিই প্রথমে টের পেলেন না। সমস্ত চেতনা ঘসা-আয়নার মত হয়ে গেছে, নিজের উপস্থিতিই নিজের কাছে তেমন স্পষ্ট নয়।

অনুরাধার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করল জগৎলক্ষ্মী:

—অনুরাধাদির মুখটা ভীষণ চেনা-চেনা মনে হয়, কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে আগে।

—আগে কোথাও ছাখোনি। যতদিন অফিসে আসছ, ততদিন ধরে প্রত্যেকদিনই আমাকে এখানেই দেখেছো। বিশেষ কিছু বুঝল না জগৎলক্ষ্মী, শুধু আরেকটা প্রশ্ন করল:

—কোথায় গিয়েছিলেন?

পৃথিবীকে এতদিন তিনিই প্রশ্নের শরশয্যায় শুইয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু পৃথিবীর হাতেও যে তিনি নিজে এভাবে একদিন প্রশ্ন-বন্দী হতে পারেন প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারলেন না।

—কোথায় গিয়েছিলেন অনুরাধাদি?

—প্রিয়ের ঘরে! অনুরাধা দেবী কথা বল্লেন, কিন্তু নিজের গলায় নয় যেন। শব্দ দুটো অনেকক্ষণ ধরে অর্থ বিস্তার করল নির্ব্বাক নিশ্চুপ ঘরটায়। তারপর,

—কি হল? চারকোণ থেকে কারা যেন একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠল। কোনো কথাই শুনতে পাননি, এমনিভাবে কাত হয়ে বসে রইলেন অনুরাধা।

—কি হল?

—অন্য সেকশ্যনে বদলী করার কথা বিবেচনা করবেন। তিনদিন পরে আবার দেখা করতে বললেন।

—হুররে। চাকরী থেকে গেলে কিন্তু খাওয়াতে হবে ভাই। এতক্ষণে রাধারাণীর গলা চিনলেন অনুরাধা।

—পাউডারটা কিন্তু বাপু বড্ড কড়া করে মেখেছো। অতটা মাখলে মেশে না, মুখে খড়ি হয়ে থাকে।

সত্যি, কিছুতেই মেশাতে পারছেন না নিজেকে। তেমন করে নীচেও নামতে পারলেন না, ওপরে ওঠার সিঁড়িটাও ভাঙ্গা। যন্ত্রণার ত্রিশঙ্কু আসনে মৃত্তিকা-মূর্ত্তি ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না নিজেকে। প্রথমদিনের নির্ম্মল সেনের হিতোপদেশ তাঁর নিজেরই ধাক্কায় প্রতিধ্বনিত হয়ে আরো দূরে কোনো অন্ধকারের পাহাড়ে গিয়ে আরো জোরে আওয়াজ তুলছে। অথচ সে আওয়াজে কান পাততে পারছেন না তিনি। অস্ফুটকণ্ঠে কি যেন বললেন অনুরাধা, বোঝা গেল না। সেদিন আর অফিস করলেন না। ছুটী নিয়ে বাড়ী গেলেন। পর পর তিনদিনই ছুটী নিলেন।

তারপর যেদিন গেলেন, তাঁর পূর্ব্বতন চেয়ারে দেখলেন কমলা রায়চৌধুরীকে। সাদা খদ্দরের প্রচ্ছদে মনে হচ্ছিল কমলা নয়, অনুরাধাই বসে আছেন তাঁর নিজের আসনে। কিন্তু তা বোধ হয়

আর সম্ভব নয়। অনুরাধার কাপড়ের দুর্লংঘ্য ঝিলিমিলি দেয়ালটাই আলাদা রেখেছে কমলা আর তাঁর আসন। আলাপ করবেন বলে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলার কাছে।

—আপনিই কমলা রায়চৌধুরী? বিনীত প্রশ্ন করলেন অনুরাধা।

—আজ্ঞে হ্যাঁ! আপনি বুঝি এই সেকশ্যনেই কাজ করেন।

—করতুম। আজকে ঠিক হবে কোথায় বসবো। টেবিলের ওপার থেকে এতক্ষণে নির্ম্মলবাবু দেখতে পান অনুরাধা দেবীকে।

—আরে মিসেস রায় যে? বাঃ, আপনাকে ত আজ বেশ অন্যান্য মেয়েদের মতই ঝকঝকে লাগে। অনুরাধা দেবী বুঝতে পারলেন তাঁর থমকানো গম্ভীর মুখকে অগ্রাহ্য করেই রূপ চর্চ্চা করলেন নির্ম্মলবাবু। কিছু বললেন না। পি-এর ঘরের দিকে এগুলেন। কিছুদূর গিয়েছেন, হঠাৎ একটা অতি পরিচিত কান-শোনানো স্বর শুনলেন:

—এখানকার অফিস গার্লদের সঙ্গে মিশবেন না। রঙ চঙে সঙ এক একটা। আপনারা সব কোয়ালিফায়েড মানুষ।

অনুরাধা দেবী চকিতে ফিরে তাকাতেই চমকে থেমে গেলেন নির্ম্মল সেন।

কিন্তু পি এর ঘরের দিকে আর যাওয়া হ'ল না। সিঁড়িতে এক রকম ছুটতেই ছুটতেই নামতে আরম্ভ করেলন। ফাইলের লাল ফিতের শেকল দিয়ে অসংখ্য ছোট ছোট মানুষ তাঁকে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে ফেলবার জন্যে ছুটে আসছে। নিস্তার পাওয়ার বোধ হয় আর কোনো উপায় নেই। নিজের পৃথিবীতে পৌছোবার জাহাজটাও বোধ হয় অব্যবহারে অচল হয়ে গেছে এতাদিনে।

—ও কি। ওরকম হাঁপাচ্ছ কেন? অফিসের বাইরে আসতে আসতে প্রশ্ন করলেন অবাক হয়ে মহীতোষ।

—আমি হেরে গেছি। ওদের কাছে ভীষণ হেরে গেছি।

মহীতোষ কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ পর অনুরাধা নিজেই বললেন—চাকরীটা ছেড়ে দেবো।

—চাকরীটা ছেড়ে দেবে কি। ছোট বোনটার বিয়ে হোক! কপট গলায় ঠাট্টার যথেষ্টই সুর মিশিয়েছিলেন মহীতোষ যাতে ভুল হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা না থাকে, তবু ভুল করলেন অনুরাধা রায়। মর্ম্মান্তিক!

—না! না! তোমার বোনের জন্যে মেয়েছেলে হয়ে আমি কেন চাকরী করবো? তুমি ই-ত করছো। পারবো না। পারবো না আমি—অস্বাভাবিক জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন অনুরাধাদেবী। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই যখন বুঝতে পারলেন যে তিনি যে সুরে যে চিন্তায় আর্ত্তনাদ করলেন তার কোনটাই তাঁর মতন নয়—পৃথিবীর ছোট ছোট মানুষদের অন্যতমা মায়া বোসের অবিকৃত প্রতিধ্বনি, শোকে আরো গভীর মুহ্যমান হলেন, আর তৎক্ষণাৎ স্বামীর ডান হাতটা ধরে ফেল্লেন আসন্ন পতনটাকে কোনো রকমে আটকাতে।

ভারত-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ

ইন্দ্রজিত্

পূর্ব্বানুসৃতি

ফিরিঙ্গি আমল

ইংরেজ ভারতবর্ষে কায়েমী ভাবে আসার আগে ভারতে এসেছিল পোর্ত্তুগীজরা, সেকথা পূর্ব্বে আলোচনা করেছি। কিন্তু তারা সংস্কৃতির ভেতরে কিছু জিনিষ দিয়ে গিয়েছিল সেকথা ভারত সংস্কৃতি অবশ্য স্বীকার করবে। যথা ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে পোর্ত্তুগীজ পাদ্রী, মানো এল 'দা আসম্পপ্‌ সাম একখানি বাংলা ব্যাকরণ লেখেন। উক্ত বইটি বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ বলে মনে করেন পণ্ডিতেরা। এই বইটি আবার পোর্ত্তুগীজদের রাজধানী লিসবন সহরে ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে ছাপা হয়। এ ছাড়া অনেক পোর্ত্তুগীজ বাংলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তকও রচনা করেছিলেন ও নিজেরাও সে সময় শিখেছিলেন বাংলা কিছু কিছু। তাদের মধ্যে বাংলা দেশে এণ্টুনি সায়েব অন্যতম।

মুসলমান রাজত্বের পতনের পর আর ইংরেজ এদেশে আসার পর পরই আমরা এমন কোন ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সাহিত্য বা শিল্প সংস্কৃতির পরিচয় পাইনে আর সেটা পাওয়ার আশা করা উচিৎ নয়, কারণ যুগ এখানে এত দ্রুত পরিবর্ত্তিত হয়েছে যে বিরাট কোন স্থিতিশীল সংস্কৃতি সে সময় আশা করা অন্যায়। তবে লৌকিক প্রবাদ ও ছড়া গান ও সাহিত্য গত মুসলমান সাম্রাজ্যকে উদ্দেশ্য করে রচনা করা হোয়েছিল তার পরিচয় আমরা পাই।

ভারতবর্ষে খৃষ্ট ধর্মের প্রসার কায়েমী ভাবে অর্থাৎ সর্ব্ব ভারতীয় শাসকশ্রেণীর ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোল ইংরেজ আসার পর, কিন্তু বহু শতাব্দী পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে এই খৃষ্ট ধর্ম এসেছিল। কিন্তু সেটা সর্ব্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়েনি, সেই অঞ্চলেই ছিল সীমাবদ্ধ হোয়ে, তবে একটা অভিনব জিনিষ আমরা পাই সেটা হোল খৃষ্ট ধর্ম। যদিও এদেশের নয় এটা জেরুজালেম ভূমির ধর্ম তথাপি দক্ষিণ ভারতে সাধারণ অনেক লোক অনেক দিন থেকে এ ধর্মকে রক্ষা করে আস্‌ছিল যারা সেই দক্ষিণ ভারতীয় এবং এই দক্ষিণ ভারতীয়দের কাছে এ ধর্ম অনেক দিন আঞ্চলিক ধর্ম হিসেবেও টিকে থাকার কারণ হোল যে দক্ষিণ ভারতে এই খৃষ্ট ধর্ম তার নিজের প্রাণ ধর্ম হিসেবে প্রাণ রক্ষা করলেও এ দেশের লৌকিক আচারের পোষাক পরে নিয়েছিল। কারণ বহিরাবরণকে দেশীয় না করলে ভারত-ভূমিতে খৃষ্ট ধর্ম কায়েমী আসন অধিকার করে রাখতে পারে না এ তথ্য অবগত হোয়েছিলেন তখনকার দিনেরও খৃষ্ট ধর্ম যাযকরা।

সেই কারণে আমরা লক্ষ্য করি যে দক্ষিণ ভারতীয় সাধারণ লোকেরা খৃষ্ট ধর্মে সে যুগে দীক্ষিত হোয়েও তাদের পূর্ব্ব পুরুষকৃত জাতীয় অনুষ্ঠান ভুলতে পারেনি এবং এই না ভোলার জন্যে তাদের খৃষ্ট ধর্ম যাযকরাও এতে কোন রকম আপত্তি কোরলেন না বরং তার পরিবর্ত্তে তারা নিজেদেরও লোকাচারের বহিরাবরণে নিজেদের আবৃত করে নিয়েছিলেন। বিদেশের ধর্ম এদেশে এ দেশীয়দের সে

যুগে কোন রকম নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতিতে বা লোকাচারে কোন রকম বাধা দেয়নি বরং করেছিল উৎসাহিত।

তাই দেখি যে দক্ষিণ ভারতীয়রা খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হোয়েও রথ চালাচ্ছে, বিয়ের ব্যাপারে এদেশের জাতীয় লোকদের মতনই মালা-বদল করে বিয়ের উৎসব সম্পন্ন করছে। এ সব আচার যে খৃষ্ট ধর্মের ভেতরে নেই সে কথা বলা বাহুল্য, কিন্তু ভারত সংস্কৃতির ইতিহাসে এই তথ্যটি উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করলাম বলে লিপিবদ্ধ করলাম। এবার আবার ইংরেজ আসার পরের খৃষ্ট ধর্মে ফিরে আস্‌ছি।

জেরুজালেমের যীশুখৃষ্ট নিপীড়িত ভারতবাসীর হৃদয় জয় করেছিলেন। খৃষ্টান ধর্মযাযকরা তখন সারা ভারতবর্ষ ঘুরে সাধারণ লোকদের বোঝাচ্ছেন যে মানুষের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা আর পৃথিবীর বুকে সত্যের প্রতিষ্ঠা করাই ছিল খৃষ্টের মূল কথা, যখন খৃষ্ট তাঁর বারজন শিষ্য নিয়ে তাঁর মানব ধর্ম প্রচার আরম্ভ করলেন সে সময় শাসকশ্রেণী তাঁর পেছনে লাগতে পেছ পা হয়নি, কিন্তু সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা যে ধর্মের উদ্দেশ্য, যে ধর্ম পাপ পুণ্যের বিচার করতে চায় তুলাদণ্ডে, তার গতি রোধ করতে পারে এমন কোন জিনিষ আজও জন্ম নেয়নি বোধ হয়। সেই কারণে খৃষ্টবাদ তার অপ্রতিহত গতি হারালো না। উনিশ শতকের ভারতবাসীদের খৃষ্ট ধর্মের যাযকরা দেখালেন ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের অর্দ্ধনগ্ন শরীর, কেমন কোরে বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে হত্যা করে মেরেছে বহুদিন আগে, যার স্মৃতি ছিল উনিশ শতকেও। ভারতের মানুষ দেখলো যীশুখৃষ্ট ক্রুশের গায়ে ঝুলছেন, আত্মা তাঁর অমরত্ব লাভ করেছে দেখলো ভারতবাসী। সুন্দরের সত্যান্বেষী সৎ মানুষকে কণ্ঠরোধ করে মারা হোয়েছে যার প্রাণহীন দেহের প্রতিচ্ছবি সাক্ষ্য দিচ্ছে কারুণ্যের প্রতীকের।

খৃষ্ট ধর্মের শাসকদের নিপীড়িত ভারতবাসী প্রাণের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারলো না কিন্তু যীশুখৃষ্টকে স্বীকার করে নিলো দেবতা বলে। বঞ্চিতেরা অসৎ হয়না বরং তারা হয় সরল, তাদের সেই নরম মাটির মতন, শিশুর মতন সরল মনকে উনিশ শতকে খৃষ্ট তাঁর বাণীর ভেতর দিয়ে আহ্বান জানিয়েছিলেন। শুধু নিপীড়িতদের নয়, সকলকে। আবেদন তাঁর সার্ব্বজনীন ছিল : মানুষের রাজ্যে সত্যের জয় হোক, মর্ত্ত্যভূমি হোক ভগবানের রাজত্ব, আর সেখানে সবাই করুক সুখে বাস।

খৃষ্টবাদ জনশিক্ষা দিতে আরম্ভ করল, দীক্ষিত করতে আরম্ভ করল, আবেদন জানালেন খৃষ্ট ধর্মের যাযক সে পথের অনুগামী হওয়ার জন্যে, কোল পাতলেন খৃষ্ট ধর্মের যাযক হতভাগ্যদের স্থান দেওয়ার জন্যে। যীশুখৃষ্টের আবেদনময় মুখটি মনে করে তাদের নিজেদের শান্তি ও কল্যাণের পথ ভারতীয় জনসাধারণ ক্রুশের পায়ে সমর্পণ করলো। ভারতভূমির ওপর যারা ধর্মের উচ্চাসনে বসেছিলেন তাঁরা হয়তো সেদিন বুঝতে পারেননি গভীর ভাবে যে দিনে-দিনে ভারত-সংস্কৃতি নতুন সকালের গন্ধ পেয়েছে। সে সকালের সূর্য্য প্রথম উঠেছিল জেরুজালেমে কিন্তু সে সকালের রোদ এসে পড়েছে পরবর্ত্তী উনিশ শতকে ভারত ভূমির ওপরে।

রাজ্য-শাসক ইংরেজরা তখন ভারতবর্ষের ওপর রাজ্য পরিচালনার সুব্যবস্থা করবার চেষ্টা করছেন, দেশের লোকদের ইংরেজী ভাবাপন্ন করতে চেষ্টা করছেন, গাইছেন নিজেদের জয় গান, বল্‌ছেন শাসক ইংরেজ ভারতের বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্যের মর্মার্থে যে ভারতের দান আছে কিন্তু অবদান নেই। যে দান ভারত সংস্কৃতি বলে পরিচিত সেটা পচা অতীত, সে অতীত নিয়ে কাজ চলেনা চলমান জগতে।

ভারতবাসীকে নিতে হবে নতুন শিক্ষা নতুন দীক্ষা, ত্যাগ করতে হবে অতীতের জরাজীর্ণ কুসংস্কার যাকে ভারতের লোকেরা সংস্কার বলে গৌরব বোধ করে। ইংরেজ বুঝলো না এদেশের অনেক অনেক কথা কিন্তু বোঝাল প্রায় সব কথা তাদের নিজেদের টীকা টিপ্পনীর ভেতর দিয়ে। শুনলো ভারতবাসী শব-গামিনীর হাত থেকে রক্ষা করেছে ইংরেজ এদেশের লোকদের, নরবলি বন্ধ করেছে তারাই ভারতে আসার পর।

এই সূত্রে কথাটা বলে নেওয়া ভাল যে নরবলি প্রথা ইংরেজ এসে বন্ধ করেছে স্বীকার করি কিন্তু শবগামিনীর প্রথা বন্ধের আন্দোলন ঠিক তারাই মূল কারণ নয়। ইংরেজ আসার সময়ও একদল ব্রাহ্মণ শ্মশানে অপেক্ষা করতেন যে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা মৃত স্বামীর শবগামিনী হোতেন তাঁদের উক্ত কাজ করবার পুর্ব্বেই এই ব্রাহ্মণরা তাদের অর্থাৎ সেই শবগামিনীর স্ত্রীলোকদের অনেক সময় বোঝাতেন মৃত স্বামীর সঙ্গে পুড়তে হবে তাদের সহধর্মিনীদের এমন কোন বিধান শাস্ত্রে নেই তবে এটা লোকাচার সুতরাং স্বামীর শবগামিনী হওয়াটা সম্পূর্ণ স্ত্রীর ইচ্ছাধীন, শাস্ত্রের অধীন নয়। তবে সতীদাহ প্রথা আইন করে বন্ধ করেছিলেন ইংরেজ সরকার সে কথা অবশ্য স্বীকার্য্য।

যারা খৃষ্ট ধর্মের অনুগামী হবে তারা ইংরেজ সরকারের সুদৃষ্টিতে পড়বে এমন লোভ দেখালেন গরম ইংরেজ সরকার। সেই কারণবশত বহু লোক খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হোলেন, বেশীর ভাগ তাঁরাই হোলেন যাঁরা হিন্দু শাস্ত্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হোয়েছিলেন। জনসাধারণ হিন্দু ধর্মের ওপর আস্থা হারাতে আরম্ভ করলে, ক্রমে ক্রমে উচ্চ স্তরের লোকেরাও হোলেন খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত।

ইংরেজ শাসক ভারতবর্ষকে নিজেদের মতন করে তৈরী করতে লাগল, কিন্তু একটা জিনিষ হোলো মুসলমান শাসনকালে বিধি-ব্যবস্থা যেমন ছিল ইংরেজ সরকার মোটামুটি ভাবে সে ব্যবস্থাকে মেনে নিলো। কারণ তারা জানতো যে রাজত্ব পরিচালনা করতে হোলে সংস্কারের পরিবর্ত্তনটা হঠাৎ না করে ধীরে সুস্থে করলে উদ্দেশ্যটা পুর্ণ হয়। তারা রাজত্ব করতে এসেছিল সুতরাং রাজত্ব করবার এই বিশেষ নিয়ম কানুনটি তারা ভাল করেই জানতো।

ইংরেজ নতুন কোন সহর তেমন নতুন কোরে কিছু তৈরী করল না, হিন্দু আমল আর মুসলমান আমলে তৈরী সহরগুলোর ওপরে তারা মন সংযোগ করলো। হিন্দু দেবালয় মুসলমান শাসনে অনেক নষ্ট হোয়েছিল। বাংলার গৌড় সভ্যতার ওপরে পরবর্ত্তী যুগে মুসলমান স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন আজও পাওয়া যায় একথা বললে অন্যায়ের পরিবর্ত্তে ন্যায় কথা বলা হবে বলে আমি মনে করি। হিন্দুর এই সংস্কৃতিকে জোর করে নষ্ট করবার জন্যে জোর করে হিন্দু ভারতীয়কে ধর্মান্তরিত করণের জন্যে সাম্রাজ্যবাদী মুসলমান হিন্দুর চোখে একদিক থেকে শ্রদ্ধা পায়নি একথা মিথ্যে নয়, একথা সত্যি। কিন্তু ইংরেজ প্রকাশ্যে জোর করে পরবর্ত্তী কালে ভারতীয় ধর্মের ওপর আঘত দিল না বরং লোকেদের নিজস্ব ধর্ম রক্ষা করবার ভার নেবে, একথা বলল ইংরেজ সরকার।

ইংরেজ আমলে রাজধানী হোল প্রথমে ক'লকাতা, পরে দিল্লী। দিল্লীকে রাজধানী করবার ভেতরে একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিরাট উদ্দেশ্য লুকিয়ে ছিল। লক্ষ্ণৌয়ের নবাব ওয়াজেদালী শাকে বন্দী করে কোলকাতা অঞ্চলে মেটেবুরুজ নামক স্থানে রেখে দেওয়া হোল কারণ দেশের নানা বিশেষ করে ওয়াজেদালী শার মত নবাবকে লক্ষ্ণৌতে বন্দী করে রাখলে অনেক রকম বিদ্রোহের

সঙ্কেত দেখা দিতে পারে। মুসলমান সংস্কৃতির নাগরিক সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর ইংরেজ নিজেদের মতন করে গড়তে লাগল। বসালো সেখানে ইস্কুল, স্থাপনা করলো গির্জ্জা, হাসপাতাল, সবই করলো যা করা উচিৎ মনে করলো। মুসলিম বহিরাবরণ বহিরাবরণই থেকে গেল। কেবল নগরের আভ্যন্তরীণ ভাগটা ক্রমে ক্রমে ইংরেজী হোয়ে গেল। তেমনি আগ্রা, এলহাবাদ, কানপুর, লাহোর, ঢাকা এ সমস্ত মুসলিম সহরে ইংরেজ সংস্কারের রূপ আত্মপ্রকাশিত হতে লাগল। তেমনি আবার হিন্দু সংস্কৃতির নাগরিক স্থাপত্য-শিল্পের আভ্যন্তরীণ ভাগে ঠিক এমনি পরিবর্ত্তনই এল, যথা বারানসী, হরিদ্বার, লছমনঝোলা,ইত্যাদি।

হাঁ, ইংরেজ সরকার দুটো সহরকে বলতে গেলে এক রকম গঠনই করেছে কারণ সেগুনোর প্রাচীন অস্তিত্ব থাকলেও তাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হয়েছে ইংরেজের। সে দুটো হোল বোম্বাই আর কোলকাতা। কারণ ইংরেজ সেকালে জাহাজে করে মাল আনতো এদেশে বিক্রী করবার জন্যে আর জাহাজে করেই এদেশের সম্পদ নিয়ে যেত নিজেদের দেশে। এই বোম্বাই সেই জন্যে বন্দর হিসেবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধে তারা নতুন করে গঠন করলো। আর কোলকাতা বড় গঙ্গার উপকূলে আর যোদ্ধা ইংরেজরা ভারত অধিকার করার পুর্ব্বে বাংলা দেশে এই কোলকাতার আশে পাশেই তো তাদের ছাউনি ফেলেছিল। সে জায়গাগুনো যথা হুগলী, ব্যারাকপুর, শ্রীরামপুর ইত্যাদি। কিন্তু চন্দননগর তখন ফরাসী সরকারের অধীনে আর একটি সহরও ফরাসীর অধীনে আজও, সেটা পণ্ডিচেরী। ফরাসীরা ভারতবর্ষে আসলেও এবং দুই একটা জায়গা দখল করে রাখলেও বুদ্ধিমান ইংরেজ ভারতে পদার্পণ করার পর ফরাসীরা সে দেশ থেকেই টের পেয়েছিল যে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার আর তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তারা তার চেষ্টাও করেনি তেমন আর। সেই কারণে পণ্ডিচেরী আ- চন্দননগর ইংরেজ ফরাসী সরকারের কাছ থেকে কেড়ে নেয়নি জোর করে।

হিন্দু ভারতে নাগরিক সভ্যতায় আমরা পাই অন্নছত্রের খবর আর তার পরবর্ত্তী মুসলমান নাগরিক সভ্যতায় পাই সরাইখানার সংবাদ। এই দুটো জিনিষই দুই যুগে ছিল তাদের অপরিহার্য্য। ইংরেজ এসে করলো ভাবের ঘরে চুরি, যথা অন্নছত্রের মতন তারা খুলল খাবার বিক্রী করবার হোটেল আর সরাইখানার মতন তারা করলো মদ্য বিক্রী করবার কেন্দ্র। মুসলমান কাজী পরিণত হলেন জেলাম্যাজিষ্ট্রেট আর হাকিমে। ডিহিদার রূপান্তরিত হোলেন এক রকম গভর্ণরে। কাজীর বিচার বলে এক রকম খামখেয়ালের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষে ইংরেজ আমদানী করলো তাদের নিজেদের আইন, সৃষ্ট করলো ভারত পরিচালনার পক্ষে আইন। সেই আইন মানুষ হত্যা করবার নৃশংস উপায় উঠিয়ে দিয়ে একমাত্র ফাঁসী দিয়ে প্রাণদণ্ডের বিধান দিল। আইনের চোঙ্গার ভেতর দিয়ে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ঘোষণা করলেন দেশের জমিদারদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কারণ জমিদারের ওপরে কর আদায়ের ভার দিয়ে দিলে একদিক থেকে ভাল হবে। প্রথম কথা দেশের জমিদারদের নিরক্ষর প্রজারা দেবতার মতন শ্রদ্ধা করে। তাদের সেই আসন ইংরেজ অধিকার করলে দেশে রাজা প্রজা উভয়ে ক্ষেপে উঠতে পারে। সেই কারণে তাদের ঠিক তেমনি রেখে দেওয়া হোল, শুধু কর গ্রহণ করবার জন্যে। ইংরেজ নিযুক্ত করলো নিজেদের কর্মচারী সংস্কৃতি রক্ষার জন্যে।

শিকার

শংকর চট্টোপাধ্যায়

গল্পটা কিন্তু আজও ঠিক তেমনি করেই স্থরু করেন মহিতোষবাবু। রিটায়ার্ড ফরেষ্ট অফিসা মহিতোষ মিত্র। হয়ত করেন, কিন্তু ঠিক আগের মত গল্পের পরিণতির কাছে এসে হঠাৎ থেমে যেতে তার আর তেমন দেরী হয় না। আগে যেথানে তাকে গল্পের মাঝখানে থেমে গিয়ে ছুটো বা চুরুট ধরাতে হোত আজকাল একটাতেই গল্প শেষ হয়ে যায়। যদিও গল্পের মাঝখানে হঠা থেমে পড়ে আজও তাকে বলতে শোনা যায়:

—একটু অপেক্ষা করুন ও ঘরটা একবার ঘুরে আসছি।

অপেক্ষা কিন্তু বেশীক্ষণ করতে হয় না। মিনিট ছুয়েকের মধ্যেই তিনি আবার ফিরে আসে নিজের নির্দ্দিষ্ট সোফাটায় গা এলিয়ে বসেন। আর তারপর যখন কেউ উদগ্র কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞ করেন:

—কি হল তারপর?

তথন ঠিক আগের মতই তার এলান শরীরটা নড়ে চড়ে ওঠে। সোফার পাশে রাখা এ্যাস্ট্রে ঠুকে ঠুকে চুরুটের ছাই ঝাড়েন। চুরুটের ছাইটা ঝাড়তে বেশ খানিকটা সময় নেন এবার মহিতো বাবু। তার এই চুরুটের ছাই ঝাড়ার বিলম্বিত ভঙ্গিটা দেখে অনেকেরই মনে হতে পারে যে চুরুটে ছাই ঝাড়বার সঙ্গে সঙ্গে নিজের চিন্তারও অনেকথানি ছাই যেন ঝেড়ে ফেলতে চান তিনি।

তারপর, যখন তার গল্পের শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেরই মুখে অস্বস্তির ছায়া ভেসে উঠতে দে যায়, তখন, ঠিক তখনই, রিটায়ার্ড ফরেষ্ট অফিসার মহিতোষ মিত্রের ভারী গম্ভীর গলাটা শোনা যা আবার:

—সেবারেও কিন্তু বাঘটা আমার গুলির হাত থেকে বেঁচে পালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু। এবা একটু থেমে পড়েন তিনি। কি যেন ভাবেন একপলক। তারপর আবার বলতে স্থরু করেন। কি বাঘিনীটার পায়ে গুলিটা গিয়ে বিঁধেছিল। কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা দীর্ঘ বিলম্বিত দী নিঃশ্বাসে ঘরের বাতাসটা চম্‌কে ওঠে। এবার কিন্তু ঘরের ভারী নিস্তব্ধতা কাটিয়ে শ্রোতাদের কাউ বলতে শোনা যায় না:

—কিন্তু সেই গুলি-লাগা বাঘিনীটার শেষ পর্য্যন্ত কি হোল?

প্রশ্নটা শ্রোতাদের অনেকেরই মনে উঁকি দেয় কিন্তু কেউ আর মুখ ফুটে বলতে পারে না কথাটা কারণ মহিতোষবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে মনগুলো। যে মু খানিক আগেও একটা উৎসাহের আলো জ্বলতে দেখা গিয়েছিল, এখন সে মুখে একটা ছায়া অস্পষ্টতা ছড়িয়ে পড়েছে। মহিতোষ মিত্রের মুখটাকে ছুর্ব্বোধ্য জটিল করে তুলেছে। আর সন্ধ্যেটা হাস্য-পরিহাসের চপলতার মধ্যে স্থরু হয়েছিল এবং যার পরিসমাপ্তি ঘটল গম্ভীর এক অভি

মধ্যে, সেই ঘন গভীর সন্ধ্যায় মহিতোষবাবুর বাংলো থেকে পথে নেমে শ্রোতাদের অনেকেরই মন একটা এলোমেলো ভাবনার সিঁড়িতে বার বার পা ফেলতে গিয়ে পিছলে ফিরে আসে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা কথাতেই বার বার ভাবতে হয়, গল্পের ও নির্ব্বাক পরিসমাপ্তির মধ্যে নিশ্চয় কোথাও কোন রহস্যের স্থপ্ত বীজ লুকিয়ে আছে। যে রহস্যের অবগুণ্ঠন কোনদিন কারো কাছে উন্মোচিত হবে না।

হয়ত হবে না। কিন্তু চিন্তার গভীরে একবার ডুব দিলে কোনদিন মহিতোষবাবুর মনের ছুর্জ্ঞেয় রহস্যের কোন সূত্র হয়ত পাওয়া যাবে। যে রহস্যের কাহিনী মহিতোষবাবুর শিকার কাহিনীর চেয়েও রোমাঞ্চকর, অদ্ভুত।

সত্যিই অদ্ভুত। মহিতোষবাবুর যৌবনের দিনগুলো গভীর অরণ্যের গভীরতর কোন প্রদেশের শিশু কুঞ্জের সম্পদের হিসাব রাখতে রাখতেই হয়ত ক্ষয়ে যেতো, আর শিকারের পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে মহিতোষবাবুর যৌবনের দিনগুলো যেমন কাটছিল, তেমনি কেটেও যেত হয়ত। কিন্তু ঘটনা ঘটল। শাল আর মহুয়ার অরণ্যের শান্ত, স্তিমিত জীবনটাকে হঠাৎ এক ধাক্কায় এলোমেলো করে দিয়ে গেল।

এতদিন মহুয়া আর শাল গাছের মাথার উপর মদঝিম্‌ঝিম্ আকাশ শুধু সূর্যের সোনাই ছড়িয়েছে। সেবার হঠাৎ-ই সে আকাশে ঘনিয়ে এলো কঠিন ভাল্লুক-গা মেঘ। ঝড়ের মাদল বাজল মেঘে মেঘে, স্থরু হোল প্রচণ্ড বর্ষা। প্রথম হীরের কুচির মত চক্‌চকে বৃষ্টির ফোঁটা, মহুয়া আর শাল পাতার অরণ্যে তীক্ষ্ণ তীব্র হয়ে বিঁধল, তারপরই লোহা-রঙ হাসির ফোটায় জল ছল্ ছল্ হোল মহুয়া আর শাল পাতার অরণ্য। ঝড় আর জল। জলের স্রোতে ভাসল গুটিকয়েক পাহাড়িয়া গ্রাম।

একটা গাছের শিকড়ে আটকে ছিল ছুটো মানুষ। একটি নারী আর একটি পুরুষ। একেবারে জংলী। জলের স্রোত ভাসিয়ে এনে ফেলে দিয়ে গেছে তাদের ছুজনকে এখানে। যথন মহিতোষবাবুর চোখে পড়ল তাদের তথন ছুজনেরই অজ্ঞান অবস্থা, পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে আছে, যেন কেউ কাউকে ছাড়বেনা কিছুতেই। কোন স্রোতই যেন বিছিন্ন করতে পারবেনা তাদের। কেমন যেন অদ্ভুত মায়া হোল তার। ছুজনকেই টেনে তুল্লেন তিনি ডাঙায়। তারপর নিজের বাংলোয় এনে তুল্লেন তাদের। রাত ভোর চল্লো তাদের শুশ্রূষা। প্রথম চোখ মেল্লো মেয়েটি। চোখ মেলেই আকুল হয়ে খুঁজল কাকে। মহিতোষবাবু বুঝলেন মেয়েটির চোখের ভাষা। ওদের ভাষায় মেয়েটিকে বুঝিয়ে বল্লেন ছেলেটির কথা। মহিতোষবাবুর উত্তরে মেয়েটি কিছু বল্লোনা। শুধু একটু কৃতজ্ঞতার হাসি হাসল মৃদু। মহিতোষবাবু দেখলেন মেয়েটির চোখে মুখে ফুটে উঠছে এক কৃতজ্ঞতার ভাব।

তারপর দিন-কয়েক মধ্যে তারা ছুজনেই বেশ সুস্থ হয়ে উঠল, কিন্তু এই দিন কয়েকের মধ্যে মহিতোষবাবুর মনটাও কেমন বদলাতে স্থরু করেছিল, আস্তে আস্তে ছেলেটাকে কেমন যেন ছুঃসহ লাগতে স্থরু করেছিল তাঁর। আর মেয়েটির প্রতি একটা গোপন প্রেম ফণা তুলতে স্থরু করেছিল তাঁর মনে।

একদিন তাদের যাওয়ার দিন ঘনিয়ে এলো। দিন ছুয়েক আগের থেকেই মহিতোষবাবুর মনটা কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠছিল। শুধু বেদনা নয় ছেলেটির প্রতি একটা হিংস্র বাসনাও আস্তে আস্তে দানা বাঁধতে স্থরু করেছিল তাঁর মনে। ছেলেটির আর মেয়েটির চলে যাবার আগের রাত্রে তুচ্ছ কারণে

হঠাৎ ছেলেটির সঙ্গে কথা কাটাকাটি সুরু হোল মহিতোষবাবুর। আস্তে আস্তে সেটা ভীষণ আকৃতি নিলো। বুনো জংলি ছেলেটার গালাগালির উত্তরে কাঠের দেয়াল থেকে হান্টারটা টেনে নিলেন তিনি। তারপর এলোপাথারি কয়েক ঘা ছেলেটার শরীরে পড়তেই, মার খাওয়া জন্তুর মত পালিয়ে গেল ছেলেটা সেই রাত্রে।

ঘরের কোণায় ভয়ে কাঁপতে থাকা মেয়েটাকে নিয়ে দরজায় ভারী তালা লাগালেন মহিতোষ মিত্র। তারপর কয়েকটা দিন মেয়েটাকে প্রায় ঘরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখতে হ'ল তাকে। আস্তে আস্তে কেমন নিস্তেজ হয়ে এলো মেয়েটা। পালিয়ে যাবার সমস্ত উৎসাহই যেন স্তিমিত হয়ে এলো তার। নিশ্চিন্ত হলেন মহিতোষবাবু। যে প্রেম তার মনের গভীরে সবে ফুটতে সুরু করেছিল, তা একদিন সারা মন ভরে ছড়িয়ে পড়ল। মহিতোষবাবুর ভালোবাসার কাছে ধরা দিল মেয়েটি।

সেই পালিয়ে যাবার সন্ধ্যা থেকে ছেলেটিকেও আর দেখা গেলনা সেখানে।

বেশ কাটছিল মহিতোষবাবুর দিন। কিন্তু হঠাৎ এক সন্ধ্যায় জঙ্গল থেকে ফিরে এসে দেখলেন বাসা খালি। মেয়েটি নেই। বাংলোর দারোয়ানের মুখে খবর পেলেন সেদিন দুপুর থেকেই নাকি ছেলেটিকে বাংলোর চারপাশে ঘুরতে দেখা গেছে। নির্ব্বিকারভাবে সব শুনলেন তিনি, তারপর সেই রাত্রেই বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লেন জঙ্গলের পথে।

বাংলো থেকে বেরুবার সময় দারোয়ান বেয়ারের ছুটে এসেছিল সঙ্গে যাবার জন্য। কিন্তু একমাত্র আদেশে তাদের নিরস্ত্র করছিলেন তিনি।

জঙ্গলের পথ অন্ধকার আর জটিল, গোপন নাড়ীর মত পায়ে পায়ে তার জটিলতা। অস্পষ্ট অন্ধকারে পথ বেছে নিয়ে হাঁটতে সুরু করলেন তিনি। বুনো লতা, এলান গাছের ডালে বার বার ধাক্কা খেলেন মহিতোষবাবু। কাঁটা ঝোপে আটকে গিয়ে শরীর ক্ষত-বিক্ষত হ'ল। তবুও ভ্রূক্ষেপ করলেন না তিনি কিছুরই।

তারপর একসময় বনের অন্ধকার তরল হয়ে এলো, পথের মাঝখানে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন মহিতোষবাবু। কান পেতে ত্রস্ত পায় চলার আওয়াজ শুনলেন। ভুরু দুটো কুচকে ছোট তাঁর। শিকারের গন্ধ পাওয়া কুকুরের মত কানটা শব্দ চিনে চিনে এগিয়ে গেলো কিছুটা, তারপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অস্পষ্ট অন্ধকারে ঘন ঝোপটার আড়ালে যা চোখে পড়ল তা হ'ল এক টুক্‌রো রঙীন শাড়ীর আঁচল, আর পাশে আর একজনের ঝাঁকড়া চুলের কিছুটা দেখা গেল।

শব্দ-না-পায়ে, আস্তে আস্তে অনুসরণ করে বনঝোপে ঢুকলেন মহিতোষ মিত্র। তারা ততক্ষণে আরো খানিকটা এগিয়ে গেছে। এবার বন্দুকের নিশানা ঠিক করে ট্রেগার টিপলেন তিনি, হাতটা তার একটুও কাঁপলনা, চোখের পাতা ঘন হয়ে একবারও নেমে এলোনা চোখের উপর। তারপর যা তিনি শুনলেন তা হোল একটা মানুষের আর্ত্তনাদ, আর পাকা পাতা মাড়িয়ে বুনো পায়ের ত্রস্ত দৌড়ে চলার আওয়াজ। বনঝোপ পেরিয়ে ঘটনার জায়গায় গিয়ে দেখলেন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বেদনায় ছট্‌ফট্ করছে মেয়েটি, ছেলেটি পালিয়েছে।

এইখানেই হয়ত কাহিনীটার শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি, আরো একটু আছে।

সেই রাত্রে, সেই বনের পথ ধরে মেয়েটার শরীর কাঁধে নিজের বাংলোয় ফিরে এসেছিলেন

মহিতোষ মিত্র। বাংলোর জমিতে পা দিয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। তারপর প্রায় দিন তিনেক ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলেন তিনি। জ্ঞান হয়ে শুনেছিলেন তারপর বেয়ারার মুখে। ছেলেটা নাকি পিছু পিছু এসেছিল তার বাংলো পর্য্যন্ত। জ্ঞান ফিরে আসা মেয়েটির ঘরেও নাকি ঢুকেছিল অতর্কিতে জানলা গলিয়ে, মেয়েটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আশায়, অজস্র কাকুতি মিনতি করেছিল মেয়েটাকে, কিন্তু আশ্চর্য্য মেয়েটা নাকি তাকে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

তারপর তার শরীর সেরে গেলে মহিতোষবাবু মেয়েটিকে নিয়ে চলে এসেছিলেন অন্য জায়গায়। ঘুরে বেড়িয়েছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জঙ্গলে জঙ্গলে, কিন্তু আশ্চর্য্য, একটি দিনের জন্যও তিনি আর বন্দুক ছোননি কখনো।

শোনা যায়, সেই মেয়েটি, যার নাম তিনি রেখেছিলেন জয়ন্তী, তার কাছে নাকি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কোনদিন আর বন্দুক ছোঁবেন না। জঙ্গল-জীবনে অনেক বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভোলেননি মহিতোষবাবু. রিটায়ার্ড ফরেষ্ট অফিসার মহিতোষ মিত্র।

রিটায়ার করবার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেককেই নিজের জীবনের এক দুর্ব্বোধ্য শিকার কাহিনী শুনিয়েছেন তিনি। এটা যেন কেমন তার স্বভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে ক্রমশ। কিন্তু প্রত্যেক বারই তিনি কাহিনীর এক জটিল মুহূর্ত্তে এসে থেমে পড়েছেন। তারপর মিনিট কয়েকের জন্য পাশের ঘর থেকে ঘুরে এসেছেন। যে ঘরে পঙ্গু জয়ন্তী দিনের পর দিন বিছানার সঙ্গে এক হয়ে গেছে সেই ঘরে। ফিরে এসে চুরুটের ছাই ঝেরেছেন অনেকক্ষণ ধরে। এস্‌ট্রেতে ধুকে ধুকে চুরুটের ছাই ঝারবার সময় প্রত্যেকবারই তিনি হয়তো একটা কথাকেই ভেবেছেন।

পালাবার অমন সুন্দর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সেদিন জয়ন্তী কেন ছেলেটার সঙ্গে পালিয়ে যায় নি? প্রত্যেকবারই এই একটা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রিটায়ার্ড ফরেষ্ট অফিসার মহিতোষ মিত্র, দুটো উত্তর দিয়েছেন :

নিজের শরীরের পঙ্গুতা কিংবা হয়ত মহিতোষবাবুকেই হঠাৎ ভালোবেসে ফেলেছিল জয়ন্তী। কিন্তু সত্যিই কোনটা যে আসল কারণ, তার উত্তর মহিতোষবাবুর মন কোনদিনই মেলাতে পারেনি। পারবেও না হয়ত কোনদিন।

অরণ্যের রমনীরা না জানি কি অপরূপ-কায়
রাজ্যলোভ পত্নীসেবা ছেড়ে বনে নতুবা কে যায়।
॥ অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত॥

সাংস্কৃতিকী

একাডেমীর ছবি

চৌরঙ্গীতে দু'টি দর্শনোপযোগী শিল্পকলার 'একাডেমী' যেসব ছবি ও ভাস্কর্য্য এবার আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত করলেন তা দেখে সারা ভারতবর্ষের শিল্পীর মানসিক অবস্থা আমরা খানিকটা অনুধাবন করতে সমর্থ হব। বহুকাল প্রায় কলকাতার শিল্পী-সমাজই তাঁদের রঙ-তুলির বা সিমেন্ট-এর সাহায্যে রূপচর্চ্চা করে আমাদের সামনে বিশেষ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এবার শান্তিনিকেতন, অন্ধ্র, দিল্লী, বোম্বে, আমেদাবাদ, কাশী, নাগপুর প্রভৃতি কেন্দ্রের শিল্পপ্রতিভা তুলনা করে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হল। অবশ্য বাঙালী শিল্পী কলকাতা, শান্তিনিকেতন ও দিল্লী জুড়ে সংখ্যায় এখনও গরিষ্ঠ, অগ্রসরতায় পুরোগামী না হলেও। অগ্রসরতা কথাটি উরোপীয় শিল্প-আন্দোলনের দিকে নজর রেখে ব্যবহার্য্য। কারণ, শিল্প-প্রকরণ-বিচারে ইদানিং ভৌগোলিক সীমান্তের প্রতি আগেকার দিনের সর্বাংশ গণ্য হওয়া উচিত নয়। শিল্পীর মানসিকতা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু শিল্পের আঙ্গিক বা প্রবণতা কোনো বিশেষ দেশের ট্রেড-মার্ক মেনে চলতে পারে না। চিত্রকলায় চৈনিক, ভারতীয়, মিশরীয়, এসিরীয়, পারসিক, পাশ্চাত্য প্রভৃতি প্রাচীন পদ্ধতি একসময়ে তৈরী হয়েছিল। সেই প্রাচীন পদ্ধতিগুলো বুশম্যান ও শক জাতির প্রাচীনতম পদ্ধতিরই বিচিত্র আঞ্চলিক পরিণতি। যেমি প্রাচীনতম পদ্ধতির দাবীদার আজ কেউ নেই, তেম্নি আঞ্চলিক প্রাচীন পরিণতির উপর দাবী জানাবার ইচ্ছাও আর কারো মনে না থাকা উচিত। মনে করা উচিত যে জীবন্ত ও জীবিত শিল্প-পদ্ধতি মানব-সভ্যতার অন্তর্গত একটি বিষয়, তার এখনকার বৈশিষ্ট্যগুলো সর্ব্বমানবের সম্পত্তি।

বস্তুর প্রতিকৃতি হিসেবে চিত্রাঙ্কণ সুরু হয় বুশম্যান সভ্যতায়। বস্তুতে অবাস্তবতার স্পর্শ আগে মণ্ডন-মিশ্রণে এবং তা শক জাতির দান। আর্য্যরা চিত্র বলতে আশ্চর্য্যজনক বস্তু বোঝাতেন। গৌড় পাণ্ডুয়ার মকর-দেহ (ভাস্কর্য্য) থেকে বাঙালী (বর্ম্মণ ?) মণ্ডন-প্রিয়তা শিখেছে ; ব্রাত্য বাঙালী জ্যামিতিক ও বাস্তব পদ্ধতিতে নানা যন্ত্র-চিত্র আঁকত। এ-বছর দিল্লীর ও শান্তিনিকেতনের বাঙালী শিল্পীদের চিত্রে মণ্ডন-প্রবণতার পুনরাবির্ভাব দেখা গেল। কিন্তু পার্ক ষ্ট্রীটে 'আর্টিষ্ট্রি হাউসে' যে তরুণ শিল্পী শ্রীশক্তিপ্রসাদ রায়বর্ম্মণ তাঁর পঞ্চাশটি চিত্রে একটি পৃথক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন, তাঁর ইট-রঙ ও রাজপুতনার লাল-পাথরের রঙ এমন বাস্তব বিষয়ে মগ্ন এবং ন্যাশনাল একাডেমীর হরি সেন মহারাষ্ট্রী বোলন-রাজপথের ব্যঞ্জনায় এতো বেশি বাস্তব যে বলতে হয় বুশম্যানী ও শক বাস্তবতা উরোপে যে 'এক্সপ্রেশনিজম্'-এর জন্ম দিয়েছিল তার প্রভাব এঁরা কাটিয়ে উঠে অন্যত্র যেতে এখনও রাজি নন। অবশ্য বুশম্যানী পৃথুলতাকে শাক্য বিরাটত্বে উন্নীত করবার বৃত্তি যেমন হেনরীমূরে দেখা যায়, তেমন ভাবেও অনুভাবিত হয়েছেন অনেক প্রবীণ বাঙালী শিল্পী—তাঁদের মধ্যে দ্বৈতবাদী রামকিঙ্কর এবং দ্বৈধবাদী রথীন মৈত্র উপস্থিত আছেন 'একাডেমী অব্ ফাইন আর্টস্'-এ। রামকিঙ্করের 'কম্পোজিশন' নামক চিত্র-দুটি 'ন্যাশনাল একাডেমী'র দু'টি সম্পদ। সৃষ্টির দু'টি পর্য্যায়কে তিনি আইনষ্টাইন-সুলভ দ্বন্দ্ব-

পরিকল্পনায় উপনীত করেও 'বায়োলজির' জৈব-চেতনায় বেঁধে রাখতে সমর্থ হয়েছেন এ-দু'টি চিত্রে। তাঁর নারীমূর্ত্তি যে 'ভল্যুম' দেখাচ্ছে সে ভল্যুমের মুখ আমরা মৌর্য্যআমলের পাটলীপুত্রের নটী ভাস্কর্য্যে দেখতে পাই। মানবিক দেহের 'ভল্যুম' গোপাল ঘোষে প্রায়ই ক্ষুদ্র—বিরাট মূর্ত্তি তাঁর জগতে 'প্রকৃতি'। এ-প্রকৃতির প্রতিকৃতিতে উল্লেখ্য অপূর্ব্ব ভাবকাব্য-ময় গোপাল ঘোষের 'পাখীর জগৎ'- চিত্রটি। দূর থেকে অণ্ডজদের জগৎ সাদা একটি ডিম বা কপোত বা ঘুঘু। কাছে গেলে ধরা পড়ে তা তাদের চারণ-ক্ষেত্র। চর, জল, জংলা সবই বর্ণের বিভেদে একে একে ধরা পড়ে। এই ভাবময়তা গোপাল ঘোষের স্বকীয় রীতি। বাস্তবকে স্বীকার করেও যতোটা রোমান্টিক হওয়া যায় গোপালবাবু ততোটুকু রোমান্টিক। রূপের রূপাতীত অনুভব পাওয়া যায় তাঁর চিত্রে। তেম্নি দিল্লীর দুজন কৃতী বাঙালী শিল্পী—শ্রীঅনিল রায় চৌধুরী (ন্যাশন্যাল একাডেমী) এবং চিন্তামণি কর (একাডেমী অব্ ফাইন আর্টস্) বর্ণে বর্ণাতীত ভাব আনতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁদের বর্ণের বিন্যাস শুধু পদ্ধতির ঔৎকর্ষ দেখাতেই ব্যস্ত নয়, চিত্রিত বিষয়ের অন্তরের রূপে প্রবিষ্ট সে বর্ণের ভঙ্গী। এ-ভঙ্গী কলকাতার তরুণ শিল্পী শ্রীকমল রায় চৌধুরী তাঁর 'হিমালয় অভিযান' চিত্রে দেখাতে সমর্থ হয়েছেন (একাডেমী অব্ ফাইন আর্টস্)।

এ-শতকে নব্যবাংলার চিত্রকল্প ও চিত্রজল্প চিত্রদেবীর প্রতিষ্ঠানভূমি চিৎপুর থেকে আবির্ভূত হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের আশ্চর্য্য প্রতিভা আরব্য সিন্ধবাদ, মৌর্য্য তিষ্যরক্ষিতা, পারস্য নূরজাহান, কালোমেয়ে যমুনার যে ভাবময় আলেখ্য প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছিল তা রাজা রবিবর্ম্মার পৌরাণিক নাগর-নাগরীর প্রতিকৃতিমূলক চিত্ররূপে দুর্লভ। ভাব বা কাব্যাত্মক জল্পনা তিনি মৌর্য্য, আরব্য-পারস্য ও ভারতীয় আখ্যায়িকা-উপাখ্যান থেকে সংগ্রহ করে রঙতুলির মুখে ফোটাতে চেষ্টা করেছেন। চিত্রগন্ধ বা হরিতাল বর্ণকে আদি বর্ণ হিসেবে আবিষ্কার করে তার প্রচুর ব্যবহার করা এবং এই ব্যবহার-কারণে সামগ্রিক চিত্রে একটা কুয়াশা-ধূসর পৌরাণিক ভাব এনে দেওয়া অবনীন্দ্রনাথের ছবির বর্ণের বিশেষত্ব। তাঁর 'যমুনা'-চিত্রটি এবার একাডেমী অব ফাইন আর্টসের প্রদর্শনীতে দেখা গেল। কালো মেয়ের মানসিক ধূসরতা তার হলুদ শাড়িতে বৈপরীত্য বোধ এনে আমাদের মনের কাছাকাছি যাতে তাকে টেনে আনে ঠাকুর-শিল্পীর অভিপ্রায় যেন তা-ই ছিল। অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-শৈলী এখনও প্রাচ্য-চিত্র-কলার নিদর্শন হিসেবে অনুসৃত হয়। ন্যাশন্যাল একাডেমীর 'চিতা ও বাঘিনীকন্যা' (কল্যাণ সেন অঙ্কিত) এবং 'নাগিনীকন্যা' (দীপেন বসু অঙ্কিত) এই শৈলীর উল্লেখ্য নিদর্শন। একাডেমী অব ফাইন আর্টসে আচার্য্য নন্দলাল বসুর 'রাধা' এই শৈলীর অন্তর্গত নয় প্রাখর্য্যের দরুণ—প্রাখর্য্য বর্ণের অঙ্গে নেই আছে রেখার অঙ্গে। রেখার ঋজু প্রখর রেখা আমরা ভ্যান্ গগে প্রথম দেখতে পাই—তাঁর শিহরিত শিখার রূপও উর্দ্ধাধ রেখার ভঙ্গীতে তরুকাণ্ডের আলোকপিপাসা নিয়ে উত্থিত হত। 'রাধা' চিত্রে এ-পিপাসার পূর্ণ পরিণত রূপ দেখতে পেলাম। পাশ্চাত্য চিত্রানুরাগী এখনকার বাঙালী শিল্পীমাত্রেই রেখার এই উর্দ্ধাধ ভঙ্গীতে হাত সাবলীল করে তুলছেন। কুতুবের কেল্লার ভাঙা প্রাচীর আঁকতে যেমন শক্তিপ্রসাদ রায়বর্ম্মণ তেম্নি হিমালয়ের তুষারক্ষেত্র বিন্যাস করতে কমল চৌধুরী, তেম্নি নৃত্যকলার আদিম আণবিক বিচ্ছুরণ দেখাতে অনিল রায় চৌধুরী, তেম্নি 'গৃহাভিমুখী'র বাঁকা পথ আঁকতে সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় এবং 'বর্ষাশেষে'র দৃশ্যে আমেদাবাদের দশরথ প্যাটেল তুলির মুখকে নিয়োজিত রেখেছেন। হয়ত ভ্যান্ গগই এঁদের আদর্শ কিন্তু সে আদর্শ আচার্য্য

নন্দলালে ইত্যবসরে প্রাচ্যের শিল্প-শৈলীর অন্তরঙ্গ হয়ে গেছে। অবনীন্দ্রনাথ থেকে নন্দলাল যেমি পৃথক হয়েছেন সৃষ্টির আদিম রোমাঞ্চ অনুসন্ধান করতে গিয়ে, তেমি দেবীপ্রসাদ পৃথক হয়েছিলেন শক্তি-স্ফূর্ত্তির শিহরণ ও স্বেদস্রোত অনুভব করে। তিনি অন্ধ্র-চিত্রকলায় সেই অনুভব দান করে এসেছেন। একাডেমী অব ফাইন আর্টসে আমরা দক্ষিণী চিত্রকলার স্রোতস্বান, উজ্জ্বল, প্রাণময় রঙরূপ দেখে দেবীপ্রসাদের শক্তির পরিণতি উপভোগ করলাম। হয়ত এই শক্তির আদিম উৎস গগ্যাঁর তুলির গাঙ্গেয় মুখ। অন্ধ্রজাতি তাঁদের আদিম শক্তির উৎস সন্ধান করে আলোতে বর্ণে ও ছায়ায় চিত্রনেত্র হয়ে উঠেছেন যেমি গগ্যাঁ নেগ্রিটো জীবন-আলেখ্যে চিত্রের ভবশক্তির রূপ যো সেই আদিমতার ধ্যানে বসেছিলেন।

বিশশতকের অর্দ্ধাংশ বাঙালীর চিত্রলেখনী গুরুর গৌরবে যেমন ভ্রাম্যমান ও শ্রদ্ধেয় ছিল, এখন আর তা নয়। বৈদেশিক গুরুরা এখন অগ্রসরতার জন্যে চিত্রকরদের ও ভাস্করদের আরাধ্য হয়ে উঠেছেন। কটক-ভুবনেশ্বর-জাত শিল্পের শরণ নিয়ে কেউ কেউ 'মডার্ণ আর্টের' কলেবর তৈরী করে চলেছেন কি তা-ও যামিনী রায়ের হাতে ব্যবহৃত হতে হতে এখন দৃষ্টিতে উদ্বেগ সৃষ্টি করে। পারস্য চিত্রের ধাঁচ নমুনা-নক্সাও উদিত হচ্ছে মুঘল-তসবীরস্বে ঘোলাটে না হয়ে কিন্তু রূপালঙ্কারের এই শাক্য জাল মাকড়সার মতোই পুরনো মনে হয়। প্রাচীনতা দান করা অবশ্য 'আধুনিক আর্টে'র একটি দুর্দ্দমনীয় লক্ষণ। কি প্রাচীন পদ্ধতি হুবহু অনুকরণ করে শৈল্পিক প্রবীণতা রচিত হতে পারে না। প্রবীণতাকে বহু উপকরণ সংগ্রহ করে নির্ম্মাণ করতে হয়—যেমি করেছেন পিকাসো বা মাতিস। আমাদের দেশে নির্ম্মাণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের পর শান্তিনিকেতন-শিল্পী রামকিঙ্কর। এই নির্ম্মাণ দেখলাম একাডেমী অব ফাইন আর্টসে একটি 'স্থির-জীবন'-চিত্রে। সেখানে রামকিঙ্করের 'মাছের জন্ম' সমুদ্রের জ্যামিতিক জটিলতা এড়িয়ে বাজারে এসে পচে গেছে। চিত্রফল মাছের মতোই রূপোলি দা শ্যাওলারঙা মেঝেতে তার অপেক্ষায় কা হয়ে আছে আর চিংড়ির লালচে পচা রসের জন্যে জ্বলছে কেরোসিনের কুপীর আগুন। এই 'মাছগুলি' ছবিটির পৌরাণিকতা শ্রী জি-এম হাজারনিশ যে দক্ষতায় বর্ত্তমানের বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে এবং যাবতীয় রঙছুট রঙে হাজির করেছেন তা তুলনাহীন (একাডেমী অব ফাইন আর্টস্)। মৎসকন্যার ম্যাজিক বা আশ্চর্য্যজনক রস এখানে নেই। অত্যন্ত নিভৃত জল-তরঙ্গে প্রাচীর প্রাচীন সমুদ্র তার পচা ফল নিয়ে খড়্গের সম্মুখীন, আগুনের শুদ্ধিতে অগ্রসর, বর্ত্তমানের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে। সমুদ্রের এই দান সমস্ত শৈবালে হাজির হয়েছে ও হতেছে বিস্মৃত যুগে সুরু হয়ে কাল-তরঙ্গের প্রত্যেক অধ্যায়ে। এমন একটি ধ্রুপদী বাস্তবের চিত্রকে শিল্পী হাজারনিশ নৈশ অন্ধকারের আড়ালে চুপচাপ স্থাপন করে বসে আছেন। ফলে মাৎস্য ন্যায়ের দেশের চৌরঙ্গী শিল্পশালা মৎস্যেন্দ্রনাথের দেশের রাজস্মৃতিবিজড়িত একটি স্বর্ণপাত্র শিল্পীকে উপঢৌকন দিয়ে আত্মবিচার সমর্থন করেছেন।

আত্মসচেতনতা অতীতের মূলকাণ্ড আশ্রিত হয়ে বৃক্ষবৎ উর্দ্ধোত্থিত বা লতা-লাস্যে ছন্দিত হতে পারলে শিল্পীকে আত্মস্থ করে তোলে। এই আত্মস্থতা ভারতীয় শিল্পীবৃন্দে আধুনিক যুগে ফরাসী চিত্রশালার প্রাণপুরুষ পিকাসো থেকে যতো প্রবল বেগে এসেছে, হয়ত রবীন্দ্রনাথের কুৎসিত রূপালোচনা থেকেও ততোটাই আলোক প্রাপ্ত হয়েছে। এ যেন প্রৌঢ় মননের আলো, শিল্পীর পার্থিব পৃথুলতার উপর নির্ভরশীলতা। বোম্বের আকবর পদ্মজীর 'নারী ও তক্ষক' এবং মোহন সামন্তের 'শিকার'-প্রা

ছয়টি চিত্র আর কলকাতার অন্নদা মুন্সীর 'মনের আলেখ্য' যে সুর-রিয়্যালিষ্ট বর্ণধ্বনিসুর জাগিয়ে তোলে তা অতীতের সাক্ষ্যে মনের ভিত্তিতে তৈরী বিষবৃক্ষের নিদারুণ জটিল সত্তার ছবি। শিল্পী-মন এ ক্ষেত্রে যে শৈল্পিক বিচার (জাষ্টিস্) যষ্টি ঠিক রেখে ছবি আঁকে তা নয়—অত্যন্ত বেশি ব্যক্তিগততত্ত্ব অভিব্যক্ত করে থাকে আন্তরিকতা প্রকাশিত করবার আগ্রহে। এ-যেন ফরাসী শিল্পীর জার্ণাল্সের কালো দাগে ভরা আত্মকথা বা রোমান ক্যাথলিকের পাপের আবরণ উন্মোচন। অপলাপ থেকে মুক্তির আগ্রহে এ-শতকে এ শিল্পাচার অভিনন্দিত হতে সুরু করেছে। এ-মুক্তি পাপ-পরিস্রুতিতে বা আমোদিত সত্তার জৈবিক পরিক্রুতিতে ব্যক্ত হয় ব'লে নিকোলসনের 'রিলিফ' গোছের জ্যামিতিক চিত্র-ও বোম্বে শিল্পী 'গৈতণ্ডি' এঁকে দেখিয়েছেন। একে হয়ত ম্যাজিকের ড্রইং হিসেবে কেউ কেউ অভিনন্দিত করেন।

এ-অভিনন্দন ভালো কি মন্দ তার বিচার কোনো জষ্টিস্ করতে পারবেন বলে মনে হয় না। আন্দোলনটিকে বন্ধ করা যায় উপেক্ষা করে। এই মননের বা মনোভঙ্গী প্রদর্শনের ভীড়ে গিয়ে সব শিল্পীই যে আত্মদূষণে অস্থির হয়ে দূষিত রক্তের বন্যাস্রোতে ভেসে চলেন তা নয়। আমি জানিনে দিল্লীর শিল্পী আমিনা লোধী (ন্যাশন্যাল একাডেমী) পাঠান-লোধী কি না। তা যদি হয়, তাহলে শকশলভ পাঠানের শকসুলভ লীলায়িত রেখাকে তিনি পরম পরিণতি দান করেছেন বলা যেতে পারে। সুর-রিয়্যালিজ্‌ম্ থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি তিনটি চিত্রে শক-সুলভ রেখাস্পর্শে উদ্বোধিত হয়ে। 'গরুড়', 'গঙ্গাজন্ম' আর 'হংসবেগ' যেমন স্বাভাবিক শকযবন চিত্র-বিষয়, তেমি তার রেখার আবেগ শকোচিত। পাঠানের আত্মস্থতা 'গরুড়'-ভঙ্গীতে যেমন স্থবির, শাক্য হংসবেগে তেমন দেখছিনে। এই ঐতিহাসিক স্থিতি ও গতি শিল্পী হৃদয়ঙ্গম করেছেন বোঝা যায়।

দু'টি একাডেমীতে হাজারোর্দ্ধ প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হয়েছে। রঙ আর রেখার হাটে পৌছে মোটামুটি একটা চাক্ষুষ বোধ নিয়ে ফিরে আসা যায়। খুঁটিয়ে সব ছবিগুলো দেখতে গেলে হাজার ঘণ্টা অন্তত লাগে। কিন্তু এই সময়ক্ষেপ আজ কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। মোটের উপর আমাদের চাক্ষুষ বোধ এই হল যে ন্যাশন্যাল একাডেমীর শিল্পীর ক্ষেত্র একটু বেশি প্রসারিত—শিল্পীর মনোক্ষেত্রও সেখানে খানিকটা মুক্তির হাওয়া বেশি পেয়েছে। আর, গৌড়ীয় শিল্প ক্রমেই গৈরিক হয়ে চলেছে শিল্পীর মানসিক সন্ন্যাসের রঙে ও রূপে। এ কী উত্থান না পতন তা আমরা জানিনে। তবে এই বলা যায়, 'দশভুজা'র মৃৎভাস্কর্য্য দেখে আজও আমরা যতোটা বিস্ময় ও সমন্বয় বোধে জাগ্রত হই, রাফাএল 'দিসপুটা' ছবি আঁকতে হয়ত তেমনি অনুভূতি পেয়েছিলেন ; গৌড়ীয় মাটির কৃষ্ণ ও হরিৎ-গুণ ধ্রুপদী সৌন্দর্য্যে এখনও অবিনশ্বর হতে পারে কালোবিড়ালের বা কালো সাপ বা চিতার চিত্রজন্মের কিম্বা হেনরীমূরিশ ভাস্কর্য্যের পাশাপাশি। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, রক্তক্ষয়, রতি সবই বাস্তব এবং চিরন্তন, তবু মানুষ সৌন্দর্য্যের শক্তিকামনায় ব্যাকুলচিত্ত হয় আর একমাত্র সে-কারণেই সভ্যতার মুখরক্ষাও হয়। বাঙালী যদি একাগ্র হয়ে সুন্দরকে ধ্যান করতে পারেন, তাহলে, প্রাচীনতম সভ্যতার ইতিহাস থেকে তাদের স্বাক্ষর মুছে ফেল্‌লেও, শিল্পের ক্ষেত্রে অন্তত তাঁদের মানমন্দির অক্ষয় আলো ফলিত করতে থাকবে।

স. ভ.

সংবাদ

ইতিহাসের পটক্ষেপ

এবার আমেদাবাদে 'ঐতিহাসিক মহাসম্মেলন'-এর অধিবেশনে ডক্টর মোতিচন্দ্র ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও ইতিহাসের জ্ঞান সম্পর্কে কতগুলো স্পষ্টোক্তি করেছেন। ইতিহাসকে মুদ্রা-শিলাশাস্ত্র প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রমাণের পথে পরিচালিত করতে গিয়ে আমরা যে এতোকাল প্রত্ন ইতিহাসের বন্ধ্যা-সাধনা করেছি তা তিনি প্রকারান্তরে জানিয়ে দিয়েছেন। ভারতের প্রাচীনতন ইতিহাসে চন্দ্রবংশের যে অধ্যায়গুলো উপেক্ষিত ডক্টর মোতি চন্দ্র তাঁর অভিভষণে সে-অধ্যায়গুলোর দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। ইতিপূর্ব্বে পূর্ব্বাশায় পশ্চিমী চন্দ্রবংশ (উইচি-কুশান) সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। ডক্টর চন্দ্রের আলোচনার মূল দৃষ্টি ভঙ্গী উদীচীর কুশান পরাক্রমে নিবদ্ধ দেখা যায়। এই হিন্দু শকক্ষাত্রি খ্রীষ্টীয় শতকের অঙ্কুরোদগমনকালে ভারতীয় ইতিহাস-বিধাতার স্থান দখল করেছিলেন। তখনই আমরা পেরিপ্লাসের সমুদ্র-পরিক্রমা গ্রন্থে মম্বনোস (মুম্বাই=বোম্বে) বন্দরের নাম প্রথম শুনতে পাই। 'পৈঠান' ছিল তাঁদের দক্ষিণী রাষ্ট্রের পীঠস্থান। পরবর্ত্তীকালে তাঁরাই জৌনপুরী পাঠান সুলতান হয়েছিলেন। এই 'রাষ্ট্রমিবরাহিম' সুলতানরা যে সঙ্গীতলয়জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন তার প্রমাণ এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত 'সঙ্গীতশিরোমণি'-গ্রন্থের পত্রসংখ্যা ২—২৬। অনেক পণ্ডিত মিবার-হিমালয়-ব্যাপী সার্ব্বভৌম সুলতান-বংশে 'ইবরাহিম'-নাম সন্দর্শন করেছেন—এ যে কোন্ শর্কী ইব্রাহিম তা অনির্ণেয়।

ইতিহাস নির্ভুলভাবে রক্তমাংসসমন্বিত করে রচনা করবার পথে জটিলতা দুস্তর। ভারতে সাহিত্যে ধর্ম্মযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক লড়াই এবং আঞ্চলিক বিদ্বেষ বৌদ্ধ ও কৌটিল্য কাল থেকে সুরু। সাহিত্যে ও শাসনে তা বিসর্পিত। সুতরাং জনমানস কোন্ অধ্যায়ে কোন্ বিশেষ সংস্কৃতির শুভানুধ্যায়ী ছিল তা জানা যায়না। একমাত্র বাংলাদেশে 'শুভ শকাব্দী' কথাটি লিখিত হত। তার মানে বাংলার কোনো সব সোনার চাঁদ ছেলেই প্রশ্রয় পেয়েছে। ইস্তক চাঁদসদাগর। তিনিই 'চাঁদ' মুদ্রালেখর মালিক প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কিনা, চন্দ্রবংশে উৎসাহী ঐতিহাসিকরা তা বলতে পারেন।

ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায়ে জীবন দেখতে চাইলে কেবল প্রত্ন-প্রস্তর সে মনস্কাম পূরণ করে না। প্রাচীন সাহিত্য-প্রকরণ পাঠ করে যে সামাজিক চিত্র পাওয়া যায়, তা-ই ইতিহাস রচনার আসল উপাদান হওয়া উচিত। কেম্ব্রিজে তৈরী ভারত-ইতিহাস এসব উপাদান উপাখ্যান-জ্ঞানে বর্জ্জন করাতে আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন চিত্র যা পেয়েছি, তা শুধু সংস্কৃতির বিভ্রাট ও রাজায় রাজায় লড়াই। ডক্টর মো এ-বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন বলে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

গোবিন্দ দাস জয়ন্তী

ঢাকার প্রাক্তন সাময়িক পত্র 'সোনার বাংলা'র সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের অন্যতম শ্রী

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুকবি শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের জন্মশতকবার্ষিকী উদ্‌যাপন করার উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠন করেছেন। তান্ত্রিক বাংলার ত্যাগ ও ভোগ যে স্মরদশায় জর্জ্জরিত ছিল গোবিন্দ দাস বাঙালীর সেই স্বভারের কবি। 'স্মরগরল'-প্রণেতা মোহিতলাল গোবিন্দ দাসের রচনায় আকৃষ্ট ছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দ দাসের মতো ভোগবাদে জীবনের সর্ব্বস্ব রূপ দেখতে রাজি হননি। কল্লোল-যুগের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতানৈক্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর এই ধরনের পার্থক্যে রচিত হয়েছিল। তন্ত্রের সঙ্গে উপনিষৎ যে বিন্দুতে মিলিত হতে পারে বাঙালীর কাব্য-শক্তি সেই নূতন উৎসকেন্দ্রের সন্ধান পেলেই, আশা করি, নূতন যুগের কাব্য-প্রতিভা উৎসারিত হবার সুযোগ লাভ করবে। গোবিন্দ দাসের জয়ন্তী প্রসঙ্গে তা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত হবে। স. ভ.

নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

এবার লখনউতে 'নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন'-এর অধিবেশন। আমরা এর সাফল্য কামনা করি। শীতের মরশুমের অনেক উৎসবের মত, সঙ্গীতের রাজ্যে-এর সুরু ও শেষ হবে। বহুজনের পরিচয়-ও নমস্কার বিনিময়ই এ অধিবেশনের প্রথম পত্তন।

তবে এ সম্মেলন কোনো গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেজন্য যতটা সম্ভব বাংলার বাইরের সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, দার্শনিক প্রভৃতিকে অধিবেশন পরিচালনার জন্য ডাকা উচিত, জননী-প্রদেশের সাহিত্যিকরা শুধু দর্শক হিসেবে অধিবেশনে যোগদান করলে গতবৎসরের মতো অপ্রীতিকর আবহাওয়া তৈরী হয় না। তাঁরা যাবেন শুধু সাহিত্য-দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করতে। কারণ, প্রবাসী বাঙ্গালীরাই শুধু বাংলা ভাষাকে অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার শব্দ-মাধুর্য দিয়ে পরিপুষ্ট করতে পারেন, 'নতুন রক্ত' সঞ্চার করতে পারেন। তাছাড়া, সমগ্র ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙ্গালী চিন্তাকেও বহন করে নিয়ে যেতে পারেন।

অমল দত্ত

নূতন বই

নির্ব্বাণ : শান্তিকুমার দাশগুপ্ত : প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৯৪৬ সালে যে সময় আমরা দেখেছিলুম আমাদের সাহিত্যের রীতিনীতিতে আর ১৯৫৪ সালে শেষে এসেও সাহিত্যের যে গঠন, সেই গঠনের রূপ প্রকাশে বহুতর উন্নতি ঘটেছে এমন কথা বলবার বিশেষ কোন সুযোগ নেই। কিন্তু ক্যানভাস বদলে গেছে, ১৯৪৬ সালের দেশের যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও সামাজিক কাঠামো ছিল, সে কাঠামো ভিন্নতর রূপ নিয়ে এখন অন্যতরভাবে প্রকাশিত হ'চ্ছে। বর্তমান সমাজে ও রাষ্ট্ররূপে সেই গঠন নেই। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসের মূলবক্তব্য ১৯৪৬ সনেও না। আরো আগে যখন দেশে কংগ্রেসের রাষ্ট্র আন্দোলন দেশের ভিতর পুরোপুরি ছড়িয়ে পড়েছে, যদিও সে সময় নির্দেশ উপন্যাসের বলবার ভংগীতে কোথাও লেখক স্পষ্ট করে নির্দেশ করেন নি। তবুও ধরে নেওয়া যায় কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের পরেরকার সূচনাগুলো, দেশের ভিতর জাগরণের সম্ভাবনা চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল সেই সময় নিয়েই এ উপন্যাসের গতি।

এটা হ'লো উপন্যাসের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য যার ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হ'তে পারে এবং হওয়া উচিত, সেই টেকনিক ও ষ্টাইল ১৯৪৬ সনেও আমাদের সাহিত্য গঠনের বহুতর রূপায়ণ এনে দিয়েছিলো, একেবারে আধুনিকতম শিল্প নৈপুণ্যের কথা ছেড়ে দিলেও একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে জানলেই যা অনেক জানা হোয়ে যায় তা-ও এই উপন্যাসে খুব বেশী করে প্রাদুর্ভূত। তাই এই উপন্যাসের দুর্বলতা, লেখকের চিন্তা ধারনা ও বিষয়বস্তুর প্রয়োগ-ব্যবস্থায়। শরৎচন্দ্রকে তিনি পুরোপুরি অনুধাবন ক'রেও শরৎচন্দ্রের শিল্প নৈপুণ্যের যে মহাগুণ তাঁর ক্যানভাস, রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী টেকনিক, ষ্টাইল এমনভাবে যা সমস্তব্যবস্থার প্রকাশের ভিতর সমীকরণ ঘটতো, যে তা ভাগ ক'রে দেবার ফুরসুৎ ঘটতো না যদিও শরৎচন্দ্র রোমান্টিক ধর্ম্মী, কিন্তু রোমান্টিসিজম আমাদের চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় না। পড়ার সংগে সংগে মনের প্রতি অবস্থার ভিতর ছড়িয়ে গিয়ে ভিন্নতর রূপ নেয়।

কিন্তু এ উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের ধারারক্ষী হোতে গিয়েও হয় নি। রাজকুমার উপন্যাসের নায়ক সুদর্শন, যে কোন ব্যক্তি তার চেহারায় মুগ্ধ হোতে পারে এবং হয়, আর তাই এ উপন্যাসে দেখানো হোয়েছে। এই রাজকুমারের সাথে এই উপন্যাসে চারটি মেয়ের সংযোগ দেখানো হোয়েছে। এই চারটি মেয়ের পরিবেশ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিত্রিত। কিন্তু সতীর সঙ্গে রাজকুমারের প্রথম সাক্ষাৎ উপন্যাসে যেভাবে দেখানো হোলো, সেই হাল্কা প্রচলিত দেবদাসের কাহিনীর মত কিম্বা 'পরিণীতা' গল্পের প্রেম কাহিনীর মত। এ যে বাস্তবসম্মত হয় না, প্রশ্ন এখানে তা নিয়ে নয়। বাস্তবের অন্যান্য রূপও আছে সে টুকু জানার। আমি যেটা খুব বেশী ক'রে জানি, তা জানার জন্যেই যারা সাহিত্যের সংগী হ'তে চায় না, সে চায় নিজেকে নিজের বাস্তবের ভিতর নতুন ক'রে চিনতে, এ না পেলেই সে অখুসী। কিম্বা সুরভীর সাথে রাজকুমারের প্রথম সাক্ষাৎ, সেখানেও সেই নাটকীয়

পরিকল্পনা। প্রতি পরিবেশের জন্যে একটি প্রস্তুতি প্রয়োজন। যে প্রয়োজনের ভিতর চলতে গিয়ে সে সমস্ত কিছু দেখে নেবার সুযোগ পায়, কিন্তু সুরভীর প্রয়োজন এ উপন্যাসে একান্ত বলে ধরে নিলেও, সে প্রস্তুতি আরো সুচারুরূপে হোতে পারতো, হওয়া উচিত ছিলো। যেমন মিনতির সাথে পরিচয়ে এই রাজকুমারের পুর্ব ঘটনাগুলো ধারারক্ষী হোয়ে একটা সামঞ্জস্য দেয়। তবুও এখানে একটা কথা উঁকিঝুঁকি মারে, মিনতির সাথে পরিচয়ের জন্যেই কি রাজকুমারের মদ্যপ বাবার দেশান্তর, মার মৃত্যু, তার সহকর্মিদের ও দেশের জন্যে মনেপ্রাণে বৈরাগী গ্রাম্য পণ্ডিত পরাণ প্রভৃতির গ্রাম্যজমিদারের অত্যাচারে পীড়িত হোয়ে দেশচ্যুত করা এ সমস্তই যেন ছকেবাঁধা অবস্থায় রাজকুমারকে একেবারে নিরলম্ব করবার জন্যে। এ জন্যেই মিনতির সাথে রাজকুমারের ঘটনা মনে ছাপ রাখে না। প্যথোজ আনবার জন্যে আমাদের যে টেকনিক বহু প্রচারিত সেই টেকনিক এখানে গ্রহণ করায়, মিনতি রাজকুমারের ঘটনা আমাদের স্পর্শ ক'রেও করে না। সেজন্যেই, সিচ্যুয়েশনের সাথে চরিত্রের সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ, এবং সেই বিশ্লেষণের ভিতর স্বাভাবিকত্ব প্রয়োগ উপন্যাসে প্রায় অনুপস্থিত। কাঁচা ডায়লগ, সর্বোপরি সমস্ত কিছুর দুর্বল রিফ্লেকসন পুরনো টেকনিক। যেমন সমস্ত জিনিষে এ্যাকসানও থাকে রিঅ্যাকসনও থাকে। এ নিয়েই সমস্ত কিছুর গতি। এ গতির চেষ্টাও এ উপন্যাসে ছিলো। জমিদারী ব্যবস্থার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন সেই সব লোক আর প্রতিবাদী এবং শেষে কংগ্রেসে যারা স্বার্থ নিয়ে ঢুকেছিলো এবং সেই স্বার্থ উদ্ধারের পর যে টাকার জোরে বলীয়ান মনোতোষ ও তার স্ত্রী সুরভী আর রাজকুমারের ভিতর দিয়ে নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা এতসব থাকার পরও মন টানে না। কারণ এ দ্বন্দ্ব এত কাঁচা ভাবে দেখানো হোয়েছে, এ অনুভূতির যে চেতনা এ বই-এ বর্তমান তাতে মন ভরে না! সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যে অনুরণন আসবে যা শিল্পনৈপুণ্যে সাহিত্য হয় সেই নৈপুণ্য নেই। কিন্তু এই নৈপুণ্যের ঝঙ্কার মাত্র এক জায়গায় দেখেছি সাধারণ হাজতবাসের মানুষগুলো নিয়ে গুণ্ডা সর্দার রতনের সাথে রাজকুমারের প্রথম পরিচয়ের রাত্রিতে; অন্তত রতনের রাজকুমারের উপর সমকামীতা নিয়ে কয়েক লাইনের মধ্যে যে বীভৎসতা বেরিয়ে এয়েছে সে রীতিমত নৈপুণ্যের অধিকারী মনের ব্যঞ্জনা।

সেইজন্যে প্রয়োজন ঘটনার স্বাভাবিকত্ব আনয়ন, ড্যায়লগের সুস্থ ও সাবলীল প্রয়োগ এবং কি জন্যে সমস্ত প্রয়োগ-ই শিল্পসম্পন্ন হোয়ে উঠতে পারে সেই ধারণা, এর কিছুরই অভাব থাকলে সাহিত্য হোয়ে ওঠে না। কিন্তু তবু এ বই এ একটা জিনিষ দেখেছি। যে জন্যে এ বই শেষ পর্যন্ত পড়া যায় তা হ'চ্ছে এতে একটা গতি আছে যে গতির অভাব আজকাল বহু উপন্যাসেই দেখা যায়। এ গতি এসেছে লেখকের রোমান্টিক দৃটিভংগীর জন্যে, আর এই অতি রোমান্টিকতার জন্যে এ উপন্যাসের প্রাখর্যেরও অবনতি ঘটিয়েছে; যা বলেছি ওপরে।

তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

দক্ষিণ-নায়ক : অরবিন্দ গুহ (ক্যালকাটা পাবলিশার্স)

'দক্ষিণ-নায়ক' তরুণ কবি শ্রীঅরবিন্দ গুহের প্রথম কাব্য-গ্রন্থের নাম। দক্ষিণের নায়ক হওয়া কবিতার দিক থেকে উন্নতির সোপান তৈরীর ছবি আনে কিন্তু সে-ছবি শুধু সম্প্রতির মনোনয়নেই

যদি পর্য্যবসিত থাকতে চায়, তাহলে কবিতার অন্তরের দিক থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা প্রচুর। 'ইমেজ' চিত্রকল্প বা বাকৃচরিত্র ব্যবহারের যুগ বা হুজুগ এসেছে সাম্প্রতিক কবিতায়। সে ইমেজ মনোমুগ্ধ সম্ভবপর দেখা অধীত বিস্তাফলে তা কবিতা-পাঠক যাতে বুঝতে না পারেন কাব্য-কৌশল সম্ভবত সেই ছলাকলা। আর এই ছলাকলায় পতিত কবির সংখ্যাই সম্ভবত প্রচুর। 'দক্ষিণ-নায়কে'র কবি তরুণ বয়েসী শ্রীঅরবিন্দ গুহ কাব্য-কলার কৌশল প্রথম কবিতা 'ঘরে থেকো'-র প্রথম পংক্তিতেই দেখিয়েছেন এই বলে :

> "এই বৈশাখী দুপুর বেলার কলকাতাকে
> বিশ্বাস নেই।"

সাম্প্রতিক চিত্তের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন এড়িয়ে পাঠককে কী কুহক দেখাবেন তা-ই তাঁর মনে তখন কুহর তুলছে। তিনি শেষ-পংক্তিতে অর্থাৎ অষ্টাদশ পদে গিয়ে আত্মপ্রকাশ বা আত্মগ্রহ বা আত্মপ্রতারিত রূপ দেখালেন এই বলে : "ঘরে থেকো, আমি যেটুকু জ্বলার একলা জ্বলি।" এই প্রজ্জ্বলন ও প্রজ্জ্বালন কর্ম্মই এখনকার প্রেম ও কবিতা এবং দক্ষিণ নায়কের কর্ম্মকৃতির প্রতিকৃতি।

প্রেম কর্ম্মের মূলাধার। শ্রমেরও পেছনের উৎস তা-ই। আত্মজ এই সন্তানের প্রতি আমাদের দিনের তরুণতরুণীর অবহেলা যদি আন্তরিক আলেখ্য দেখায় বলে আমরা বিশ্বাস করতে চাই তাহলে বাংলার শক্তির উৎস সম্পর্কে নিরুৎসুক হয়ে কাব্য-পাঠকরাও ঘরে বন্ধ থাকব। যদি দক্ষিণ নায়ক উপঢৌকন হিসেবে নৈরাশ্য ও মৃত্যু ঢালেন তাহলে তা ছাড়া গতি কী? এ-জীবনের স্বাদ যদি তাঁর আন্তরিক হয়ে থাকে, তাহলে সে-অন্তর বর্জ্জন করে গাত্রোত্থান করতে হবে। নৈরাশ্য প্রৌঢ়তার হলে মানায়, তরুণ চিত্তে তার ছলাকলা-ও সাংঘাতিক দুর্ভাবনা মনে এনে দেয়। দক্ষিণ-নায়কের মানসিক দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা, ভীরুতা প্রভৃতির চিত্রাবলী বর্ণনার দিক থেকে সুন্দর।

কবিতার বহিরঙ্গের সজ্জায় কবির জ্ঞান যথেষ্ট আছে বলে মনে হল।

ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া বিল্ডিংস্
৬৪নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা-১৩

১৯৫২ ইং পর্য্যন্ত প্রথম ১৬½ বৎসরে পাঁচটি সার্থক ভ্যালুয়েশান।

প্রতি ভ্যালুয়েশানে পলিসি-হোল্ডারদের বোনাস্ এবং শেয়ার-হোল্ডারদের ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় বীমাজগতে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

এন্, সি, দত্ত
চেয়ারম্যান।

খাদ্যপ্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড্' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

সুপার-নিও-কড্

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ
কলিকাতা-১৭

PURVASA : AGRAHAYANA—1361 REGD. NO. 1512. 8 AN

ছেলেমেয়েদের পড়ার পরেও
পড়বার মতো দু'খানি বই

আলোর কুমার

লেখিকা : বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তা

দাম দেড় টাকা

নাবিক রাজপুত্র ও সাগর রাজকন্যা

লেখক : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

দাম দু'টাকা

বিলিতি কারটিজ কাগজে বহু বর্ণে ও চিত্রে মুদ্রিত এই গল্পের বইগুলো বাড়ির ছেলেমেয়েরা হাতে পেলে মনে করবে যেন ইস্কুলের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে ওরা এগুলো প্রাইজ পেয়েছে

প্রকাশক :

পূর্ব্বাশা লিমিটেড

৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা—১৩

tor: Sonjoy Bhattacharya. Printer & Publisher : Satya Prasanna Dutta, Purvasa Ltd., 54 Ganesh Chandra Ave

পূর্ব্বাশা

পিউরিটি বার্লি

সবসময়

আমি পছন্দ করি...

আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে পিউরিটি বার্লি সবসময়েই ভাল।

পিউরিটি বার্লি সেরা শস্য থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরি হয় — তা ছাড়া, এই বার্লি তৈরির পেছনে আছে ১৫১ বছরব্যাপী পেষাই-এর অভিজ্ঞতা।

অ্যাটলাণ্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড

পোস্ট বক্স ৬৬৪, কলিকাতা - ১

APBX-11

গল্প শুনিয়া আমি অভিভূত হইয়াছিলাম।

শুধু গল্প নয়, গল্প বলিবার আশ্চর্য ভঙ্গিতেও।...শরৎচন্দ্রের গল্প সকলে পড়িয়াছেন ও মুগ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহার অনুপ্রেরণা আরেক ধরনের, তাহাতে ভাবের সংক্রামকতা আরো অব্যর্থ।...

—মোহিতলাল মজুমদার

অনেকেই হয়তো জানেননা যে শরৎচন্দ্র খুব ভালো গল্প-বলিয়ে ছিলেন। এদিক দিয়েও তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের আর্টিষ্ট। তাঁর লেখার থেকে গল্প-বলার কায়দা ছিল আরো মনোহর।...

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প

গোপালচন্দ্র রায়

প্রেমের গল্প, হাসির গল্প, কান্নার গল্প, সাধুর গল্প, অসাধুর গল্প, সতীর গল্প, অসতীর গল্প মায় ভূতের গল্প। গোপালচন্দ্র রায় এই আশ্চর্য্য গল্পগুলি সংগ্রহ করেছেন। শরৎচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ে রায়মহাশয়ের মতো এমন অধ্যবসায়ী, ধৈর্যশীল, এবং পরিশ্রমী সংগ্রাহক বাংলাদেশে বিরল। বহু বৎসর যাবত এই কার্যে তিনি লিপ্ত আছেন। খ্যাত-অখ্যাত যত লোক শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে বহু বহু কাহিনী তিনি শ্রদ্ধাভরে সংগ্রহ করেছেন। তাঁর মূল্যবান সেই সংগ্রহ থেকে নির্বাচন করে বর্তমান গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। সিগনেট-প্রেসের বই। দাম ২॥০

চাঁদের পাহাড়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালীর ছেলে শঙ্কর, পাকা খেলোয়াড়, নামজাদা বক্সার ওস্তাদ সাঁতারু—এফ-এ পাশ করে সুবোধ ছেলের মতো কাজকর্মের সন্ধান করল না, দেশান্তরের হাতছানি পেয়ে সে পাড়ি দিল সুদূর পূর্ব-আফ্রিকায়। ইউগাণ্ডা রেলওয়ের নতুন লাইন তৈরী হচ্ছিল—চাকরী পেয়ে গেল। ডিয়োগো আলভারেজ নামে দুর্ধর্ষ এক পর্তুগীজ ভাগ্যান্বেষীর সঙ্গে সেখানে তার হঠাৎ দেখা। শঙ্কর এই দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষীর সঙ্গ ধরে মহাদুর্গম রিখটারসভেলড্ পর্বতে অজ্ঞাত এক হীরের খনির সন্ধানে চলে গেল।
জিম্বোনেক বা বুনিপ নামে অতিকায় এবং অতিক্রুর এক দানবজন্তু সেই হীরের খনি আগলে থাকত। পর্যটকরা যার নাম দিয়েছেন চাঁদের পাহাড়, সেই রিখটারসভেলড্ পর্বতে গিয়ে জীবন মৃত্যু নিয়ে শঙ্করকে যে রোমাঞ্চকর ছিনিমিনি খেলতে হল তার আশ্চর্য বিবরণ যে কোনো বয়েসের কল্পনাকে উত্তেজিত করবে। বিভূতিভূষণের হাতে তরুণদের জন্য লেখা এ-বই ক্ল্যাসিক হিসেবে পরিগণিত হবার যোগ্য। সচিত্র। সিগনেট প্রেসের বই। দাম ২।০

মহাজীবনকাহিনীর
৩য় খণ্ড
প্রকাশিত হয়েছে

পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার প্রণীত

এই অধ্যায়ে রামকৃষ্ণসান্নিধ্যে জ্ঞাত-অজ্ঞাত নানাজনের আনাগোনা। গিরিশ ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, মাস্টারমশাই, অশ্বিনী দত্ত। গোপালের মা, লক্ষ্মী, বিনোদিনী, ভুবনমোহিনী। আরো অনেকে।

ইতিহাস, কাব্য ও উপন্যাসের
নৈবেদ্যে ভক্তিপবিত্র অর্চনা
সচিত্র। পাঁচটাকা

সিগনেট বুকশপ
১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
১৪২।১ রাসবিহারী এভিনিউ

অগ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশি। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজো মানুষে খুঁজবে। মানুষলীলা কেন? এর ভিতর তাঁর কথা শুনতে পাওয়া যায়। এর ভিতর তাঁর বিলাস, এর ভিতর তিনি রসাস্বাদন করেন। মানুষের ভিতরে নারায়ণ। দেহটি আবরণ, যেন লণ্ঠনের ভিতর আলো জ্বলছে। অথবা শার্সির ভিতর বহুমূল্য জিনিস দেখছি। যেন বলছে, আমি মানুষের ভিতর রইচি, তুমি মানুষ নিয়ে আনন্দ কর। প্রতিমাতে তাঁর আবির্ভাব হয় আর মানুষে হবে না? মানুষের ভিতরে যখন ঈশ্বরদর্শন হবে তখনই পূর্ণ জ্ঞান হবে। তিনিই এক এক রূপে বেড়াচ্ছেন। কখনও সাধুরূপে কখনও ছলরূপে—কোথাও বা খলরূপে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

পূর্ব্বাশা

প্রতিসংখ্যা—আট আনা

পৌষ-মাঘ—১৩৬১

সূচীপত্র

আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে : অনিল বিশ্বাস ... ৪৯৭
কবিতা : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ... ৫০১
কিমাশ্চর্য্যম্ : ইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য ... ৫১৪
কবিতাগুচ্ছ :
সে : সুধীরকুমার গুপ্ত ... ৫১৭
একা-একা : স্বদেশরঞ্জন দত্ত ... ৫১৮
কিছুই দিইনি : অরবিন্দ গুহ ... ৫১৮
একটী স্কেচ : প্রমিত বসু ... ৫১৯
মেঘলা মন : বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় ... ৫২০
জনান্তিকে : পবিত্র সরকার ... ৫২১
পুরানো : শামসুর রহমান ... ৫২২
আমার সংসার : বটকৃষ্ণ দে ... ৫২৩
গড় শ্রীখণ্ড : অমিয়ভূষণ মজুমদার ... ৫২৪
সুন্দরী : রণজিৎকুমার সেন ... ৫৩২
ভিজিট : সন্দীপ গুপ্ত ... ৫৩৭
নূতন বই : ... ৫৪২
বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন : স. ভ. ... ৫৪৪
সাম্প্রতিক ইতালীয় উপন্যাস : বনবিহারী দত্ত ৫৪৫
রোমের চিঠি : আতাউর রহমান ... ৫৪৯
কবিতাগুচ্ছ :
কালতরী : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ... ৫৫০
হোল্ডারলিন অবলম্বনে : বুদ্ধদেব বসু ... ৫৫১
সনেট : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ... ৫৫২
শীতের রাত্রি : সুশীলকুমার গুপ্ত ... ৫৫২
মৃগতৃষ্ণা : অরুণ ভট্টাচার্য ... ৫৫৩
একটি মুখের কুয়াশা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৫৪
ছায়া-মূর্ত্তি-পূজা : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ... [illegible]
গড় শ্রীখণ্ড : অমিয়ভূষণ মজুমদার ... [illegible]
কবিতা : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ... [illegible]
ভারত-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ : ইন্দ্রজিৎ ৫৭৫
মীড় : অমল দত্ত ... ৫৭৭
বৈকালিক : সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ... ৫৮০
ছায়া-পথ : শ্রীনীলোৎপল চক্রবর্ত্তী ... ৫৮১
বারান্দা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ... ৫৮১
সাংস্কৃতিকী :

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের

নূতন বোনাস

১৯৫৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রৈবার্ষিক ভ্যালুয়েশনে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরে প্রতি হাজার টাকার বীমায় সম্প্রতি বোনাস ঘোষণা করিয়াছে :

বোনাস আজীবন বীমায় ১৭৷৷০
মেয়াদী বীমায় ১৫৲

সুদের হার শতকরা মাত্র ২৸০ ধরিয়া এই হিসাব করা হইয়াছে।

১৯৫৩ সালে নূতন বীমা সংগ্রহের ক্ষেত্রে অন্যান্য কোম্পানীর তুলনায় হিন্দুস্থান পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার অধিক কাজ করিয়া সর্ব্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। ত্রৈবার্ষিক ভ্যালুয়েশনেও ইহার অসামান্য সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সুদৃঢ় ও নিরাপদ ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থান বীমাকারিগণের আর্থিক দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়া আজ জাতির শ্রেষ্ঠ আর্থিক প্রতিষ্ঠানরূপে সমাদৃত হইতেছে।

HINDUSTHAN CO-OPERATIVE INSURANCE SOCIETY LD.

হি ন্দু স্থা ন কো-অ পা রে টি ভ
ই ন সি ও রে ন্স সো সা ই টি লি মি টে ড্
হেড অফিস : হিন্দুস্থান বিল্ডিংস কলিকাতা-১৩
শাখা : ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরে।

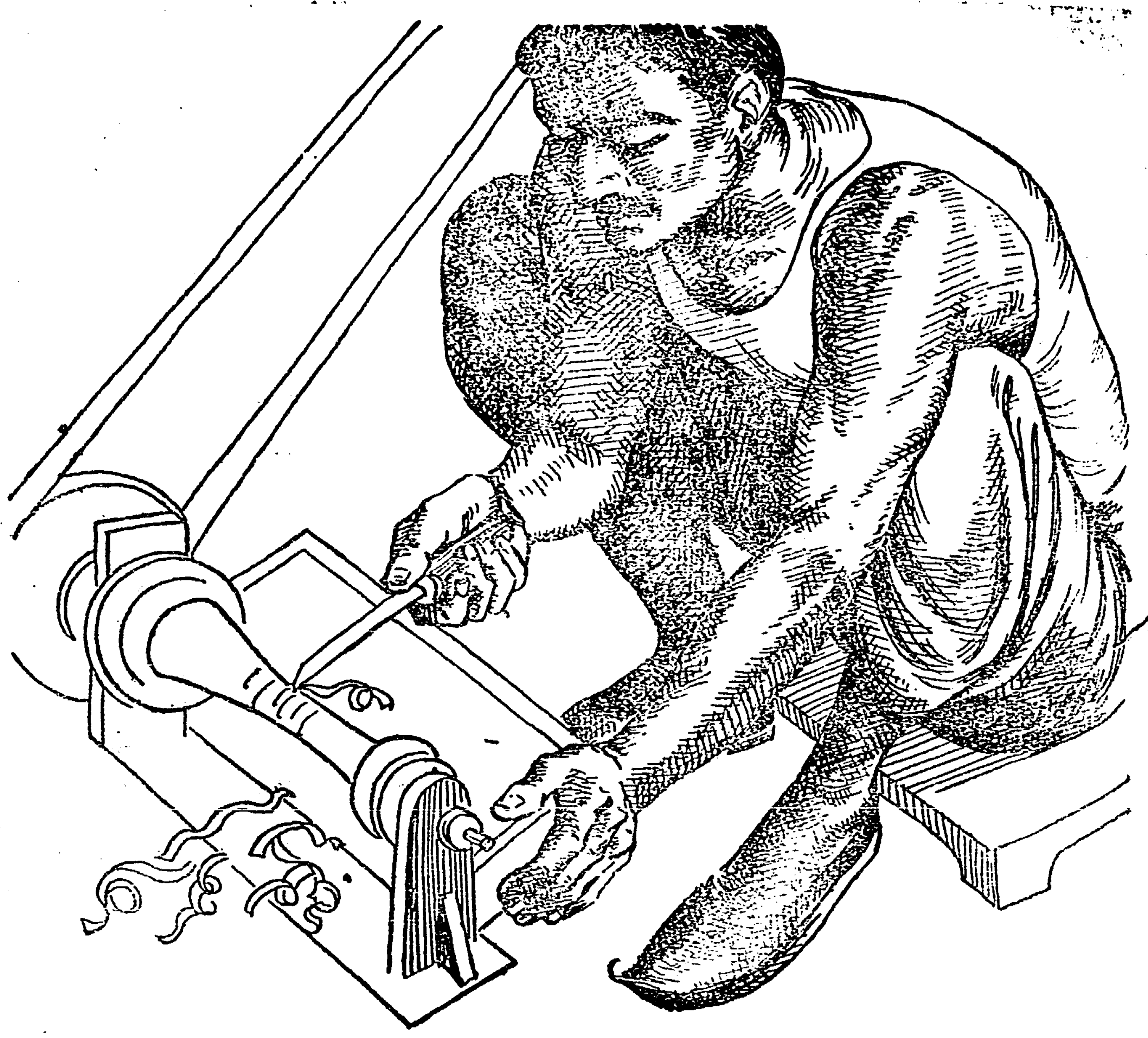

এ আমারই পরিকল্পনা!

হাজার হাজার গাঁয়ে বিজলী বাতি জ্বলবে। তাঁত চলবে, কুঁদ ঘুরবে; চারদিকে কাজের সাড়া পড়ে যাবে। গাঁয়ে গাঁয়ে কত রকম কুটির-শিল্পই না চালু হবে।

সবাই কাজ পাবে — কেউ বসে থাকবে না।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমাদের বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ১২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে কলকারখানা ও শিল্পাঞ্চলে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। আমরা আজ যে পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় দেশগুলির মধ্যে নিজেদের স্থান করে নিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প, এই পরিকল্পনা তারই পরিচয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন কাজে লক্ষ লক্ষ টন ইস্পাত ব্যবহৃত হবে। নানাদিকে, নানাভাবে আমাদের দেশ এবং জাতির জন্য আরও সফল ও সমৃদ্ধিপূর্ণ ভবিষ্যতের ভিত্তি গঠনে সাহায্য করবে ইস্পাত।

টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড TN 3933

সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে

অষ্টম খণ্ড

সপ্তদশ খণ্ড

রবীন্দ্র রচনাবলী

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

অষ্টাদশ খণ্ড

ঊনবিংশ খণ্ড

বিংশ খণ্ড

উল্লিখিত খণ্ডগুলি ছাড়া এখন পাওয়া যাচ্ছে—। কঃ কাগজের মলাট, প্রতি খণ্ড আট টাকা। প্রথম, সপ্তম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, ত্রয়োবিংশ থেকে ষড়্‌বিংশ খণ্ড॥ খঃ রেক্সিনে বাঁধাই, সাধারণ কাগজে ছাপা, প্রতি খণ্ড এগার টাকা। সপ্তম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ খণ্ড। গঃ রেক্সিনে বাঁধাই, মোটা কাগজে ছাপা. প্রতি খণ্ড বারো টাকা। সপ্তম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, একবিংশ ও দ্বাবিংশ খণ্ড।

রবীন্দ্র-রচনাবলী পাবার সহজ উপায় আপনি কোন্ কোন্ খণ্ড সংগ্রহ করেছেন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগে (৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭) চিঠি লিখে তা জানিয়ে, স্থায়ী গ্রাহক হয়ে থাকা। ক খ গ কোন্ রকমের বই আগে কিনেছেন তা জানালে সেই রকম বই দেবার চেষ্টা করা হবে। কোনো খণ্ড প্রকাশিত বা পুনর্মুদ্রিত হলেই গ্রাহকদের চিঠি লিখে জানানো হয়। গ্রাহক হবার জন্য অনুরোধ পত্রই যথেষ্ট, কোনো দক্ষিণা বা অগ্রিম মূল্য জমা দিতে হয় না।

বিশ্বভারতী

৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭

ছেলেমেয়েদের পড়ার পরেও
পড়বার মতো দু'খানি বই

আলোর কুমার

লেখিকা: বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তা
দাম দেড় টাকা

নাবিক রাজপুত্র ও সাগর রাজকন্যা
লেখক: সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
দাম দু'টাকা

বিলিতি কারটিজ কাগজে বহু বর্ণে ও চিত্রে মুদ্রিত
এই গল্পের বইগুলো বাড়ির ছেলেমেয়েরা হাতে
পেলে মনে করবে যেন ইস্কুলের পরীক্ষায় প্রথম
স্থান অধিকার করে ওরা এগুলো প্রাইজ পেয়েছে

প্রকাশক:
পূর্ব্বাশা লিমিটেড
৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা—১৩

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

সুধীন্দ্রনাথের আলোকচিত্রটি গ্রহণ করেছেন
শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

পূর্ব্বাশা
পৌষ—১৩৬১

আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে

(১৮৯৮—)

অনিল বিশ্বাস

জীবন ও সাহিত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একের প্রভাবে অন্যের উপর ক্রিয়াশীল। তাই জীবন যেমন সাহিত্যের নিয়ামক, তেমনি সাহিত্যও জীবনের প্রাণরস। বস্তুত সাহিত্য তো জীবনেরই অঙ্গীকার। সেজন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেদিন বিংশ শতকের বেদীতে জলে উঠ্‌লো, সেদিন সৈনিক ছুটেছিল কুরুক্ষেত্রে তার হাতিয়ার নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছিল বিহ্বলার বীরত্ব উদ্দীপনাও: "মুহূর্ত্তং জ্বলিতং শ্রেয়ঃ"। কিন্তু এ উৎসাহ তো পারদধর্মী। তাই না ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে গেলো এই দিগন্তশায়ী মরীচিকা। কালায়নে ধরা বা পড়ল এর নিঃসারতা। যুদ্ধানুভূতির বিবর্ত্তনে তাই ধীরে ধীরে জেগে উঠ্‌লো তিনটি বাঁক—উন্মাদনা, করুণা ও মোহভঙ্গ। ইংলণ্ডে ফুটেচে প্রথমের প্রকাশ ব্রুকের "সৈনিকে" (১৯১৪)। এখানে আছে দৈহিক স্নায়ুবিকার। হিংসা দেশপ্রেম নাম ধরে শুধু উত্তেজনাই সৃষ্টি করে চলেচে। এর পরে দ্বিতীয় বাঁকে দেখা যায় ফরাসী বারবুসের "আগুনের নিচে" (১৯১৬)। এরি আরেক ভিয়ান চোখে পড়ে স্যাসুনের "পাল্টা আক্রমণ" (১৯১৮) ও ওয়েনের "কবিতা"য় (১৯২০)। তৃতীয় পর্বে অনিবার্য ভাবেই জন্ম নিয়েচে নিরাশার নৈরাজ্য। মোহমুক্তিতে এসেচে মণ্টেগুর "মোহভঙ্গ" (১৯২২) যা এগিয়েচে এলিয়টী "পোড়োমাঠে" (১৯২২)। এরচেয়েও ভয়াল হয়েচে পরবর্ত্তী ধারা যা রূপায়িত হয়েচে "ফাঁপা মানুষে" (১৯ ৫)। এ যেন দান্তের নরকেরই রলরোল। তবে এসব গণচিত্তে এখনো চারিয়ে যায়নি। তাইতো এলো রিমার্কের "পশ্চিম রণাঙ্গণে সবি নীরব" (১৯২৯)। এই যে মোহভঙ্গ এ শুধু ইউরোপেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এ সাগর পাড়ি দিয়ে উপস্থিত হলো মার্কিণ মুলুকেও। আর এখানে এর সঙ্গে যুক্ত হ'লো ব্যঙ্গ ও অসূয়া, যা ভাবালুতারই উল্টো পিঠ। ফলে এর সাহিত্যিক প্রতিফলনে দেখা গেল আপটন সিনক্লেয়ারের "১০০%" (১৯২০), ডসপ্যাসসের "তিন সৈনিক" (১৯২১), কামিংসের "বিস্তৃতঘর" (১৯২২), এণ্ডারসন ওষ্টলিংএর "গৌরবের কী দাম" (১৯২৪) ও ফকনরের "সৈনিকের বেতন" (১৯২৬)। এরি উপান্তে এলেন ১৯৫৪ এর নোবেল পুরস্কৃত আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে তাঁর "অস্ত্রের বিদায়" (১৯২৯) নিয়ে।

এবার তাঁর সাহিত্য পরিক্রমা। হেমিংওয়ের প্রথম আত্ম-প্রকাশ ফুটে ওঠে "তিনটি গল্প ও দশটি কবিতায়" (১৯২৯)। এর পর কবিতার দিকে না ঝুঁকে তিনি এগিয়েচেন গল্প-উপন্যাসে। মাঝখানে অবিশ্যি আছে পঞ্চমবাহিনী নামধেয় একটি নাটিকা। গল্প চয়নিকার মধ্যে উল্লেখ্য হ'লো "আমাদের কালে" (১৯২৪), "নারীহীন নর" (১৯২৬), "স্পেনের মাটি" (১৯৩৮) এবং "পঞ্চমবাহিনী ও প্রথম ৪৮টি গল্প" (১৯৩৮)। এর পর উপন্যাসের ব্যাপকতা নেই এখানে, যা টলষ্টয় বা রমাঁ রঁলায় লক্ষ্যণীয়। বিষয়বস্তুর দিক থেকে একে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—যুদ্ধ-কেন্দ্রিক, আত্মজৈবনিক ও মানবিক। প্রথম পর্যায়ে ভিড় করেচে "সূর্যও ওঠে" (১৯২৬), "যন্ত্রের বিদায়" (১৯২৯), "নদীর উপরে ও বনানীর ভেতরে" (১৯৫০)। দ্বিতীয় ধারার পরিচয় মেলে "বসন্তের জোয়ার" (১৯২৬), "আফ্রিকার সবুজ পাহাড়" (১৯৩৫), "অপরাহ্নিক মৃত্যু"তে (১৯৩২)। তৃতীয় পর্যায়ে আছে "অস্তিমান ও নাস্তিমান" (১৯৩৭), "কার আশায় ঘণ্টা বাজে" (১৯৪০), এবং "বুড়ো ও সমুদ্দুর" (১৯৫২)। এই শ্রেণীবিন্যাসে শুধু মৌল সুরটিই ধ'রে দেয়া গেল। সাহিত্যিক কীর্ত্তিকে সত্যি কোনো কোনঠেসা ভাবে ভাগ করা যায় না। তাহলেও উপলব্ধির জন্যে এই ভাগ সহায়ক। আর এ থেকে লিখিয়ের মানসনির্মিতির পরিচয়ও খানিকটা ফুটে ওঠে। বিবর্ত্তনে দেখা যায় হেমিংওয়ে যুদ্ধোত্তর নৈরাশ্য পেরিয়ে আশ্রয় নিয়েচে স্বকীয় উপলব্ধিতে। এও আবার পাড়ি দিয়েচে মানুষের শাশ্বত জিজ্ঞাসায়।

এই যে হেমিংওয়ী সাহিত্যসম্ভার এতে বিদ্রোহীর পদসঞ্চারই বিশেষ করে অনুভব করা যায়। এরি নৃত্যপাগল ছন্দে ঝরে গেচে মননের ফুলঝুরি, ডুবে গেচে শ্রেয়োগুণের রাজত্ব আর জেগে উঠেচে দেহের নৈরাজ্য। বিমূর্ত্তনের দেশে এসেচে মূর্ত্তন। এতো দেহ কামনার কাচমণি হীরা। আতুর আর্ত্তিতে এ ঝল্সে ওঠে। তাইতো "অস্ত্রের বিদায়ে"র এ্যাম্বুলেন্স আধিকারিক বলচে : "সাল তারিখ ও বাহিনীর সংখ্যা, নদীর নাম, রাস্তার সংখ্যা এবং গ্রামের মূর্ত্তিমান নামের পাশে গৌরব, সম্মান, বীরত্ব বা পবিত্র প্রভৃতি বিমূর্ত্ত শব্দগুলোকে নোংরা দেখায়।" এখানে ফুটে উঠেচে "নব বস্তুবাদে"র স্বরূপ। এখানে হেমিংওয়ে জয়েসেরই সগোত্রীয়। তবে এই একাত্মতা মননের সূক্ষ্ম সুরে। কিন্তু উপায়ে নয়। হেমিংওয়ে মন ও আত্মার জায়গায় প্রতিষ্ঠা করেচেন দেহকে আর তার কবোষ্ণ পিপাসাকে। তাইতো তাঁকে বলা হয়েচে "সাহিত্যের গুহামানব"। অর্থাৎ ইনি সাহিত্যে আমদানি করেচেন আদিমতা। একরকমের বিলাস যা রুশোর মধ্যেই ফিরে গেচে বন্য যুগে। হেমিংওয়ী জগতে তাই ভিড় করেচে সৈনিক, খেলোয়াড়, পুরস্কারলোভী যোদ্ধা, ও মাটাডোর। এখানে এসেচে মাতাল, গণিকা ও বিকৃত লোকেরা। এ ছাড়া আছে মৃত্যু ও হিংসার হৈচৈ। মদ্যপানই এখানকার উপজীব্য। এত মদ ব্যয়িত হয়েচে যে ব্যাবেলাসের পর সাহিত্যে আর এরকমটি দেখা যায়নি। তার পর প্রচলিত যৌন ব্যবস্থারও লঙ্ঘন এসেচে অনিবার্য ভাবেই। তাই এই উচ্ছৃঙ্খলায় চরিত্ররা কথা কয় "এ্যালকোহারেন্টনি" বা এলোমেলো মত্ততায়। আর এসব পঠনের অনুভূতি হ'লো "স্যাটিসফিকশন" বা "হৈচৈরস"। ফলে তিনি হথোর্ণ, পো ও মেলভিসের মতোই "নৈশ অঞ্চলের" অধিবাসী। তবে তাঁর সঙ্গে ফকনরের একটু তফাৎ আছে। ফকনর যেখানে কল্পনাবিলাসী, সেখানে হেমিংওয়ে "হারান সন্ততির" নায়ক।

এজগতে তাই স্বভাবতই বিশ্ববীক্ষা অনুপস্থিত। হয়তো জীবন জিজ্ঞাসাই এখানে অবান্তর। তা সত্ত্বেও হেমিংওয়ী জগতে মাঝে মাঝে উপলব্ধির ভাস্বরতা ঝিলকিয়ে ওঠে আর পর মুহূর্তে মিলিয়ে

যায়। কোনো জীবনদর্শনে এগুলো বিধৃত হয়নি। হেমিংওয়ের কাছে জীবনই বিপদসংকুল আর বিপদজনক বাঁচনের উপরই এ নির্ভরশীল। স্পেন দেশের ষাঁড়ের লড়াই হ'লো জীবনের প্রতীক—মাটাডোর হ'লো জীবন, আর ক্রুদ্ধ ষাঁড় মৃত্যু। তাই মৃত্যু ছাড়া জীবন সমস্যার কোনো সমাধান নেই। 'কার আশায় ঘণ্টা বাজে'র উপজীব্য হ'লো ডানের বাণী "কোনো লোকই দ্বৈপায়ন নয়, নয় স্বয়ংসম্পূর্ণ……অতএব জিজ্ঞেস ক'রোনা কার জন্যে ঘণ্টা বাজে; এ তোমার জন্যেই বাজে।" এরপর মানুষের আরেকটা দিক উদঘাটিত হয়েছে "বুড়ো ও সমুদ্দুরে"। মার্কিন মাছ শিকারে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ, প্রণয়ীই ঘাতক হতে পারে। তবে মানুষের চাই অপরাজেয় বিশ্বাস। এ সব ধ্যান-ধারণা দর্শনের ছেলেখেলা ছাড়া কিছু নয়।

হেমিংওয়ের বৈশিষ্ট্য ভাবধারণা ততটা নয়, যতটা তার রূপায়ন কৌশলে। দেহসর্বস্ব উপভোগের উপলব্ধি ভরিয়ে দিতে তিনি ব্যবহার করেচেন সংবেদনী ভাষা। অভিজ্ঞতার স্বকীয়তা তাই প্রকাশ পেয়েছে রূপ-রস স্পর্শ-গন্ধবহ শব্দ চিত্রে। এদিকে থেকে স্মরণীয় মারিয়ার মোড়া মাথার স্পর্শানুভূতি ও গন্ধানুভূতি যা প্রকাশ পেয়েছে 'কার আশায় ঘণ্টা বাজে'র উনিশ অধ্যায়ে। তাঁর এই অনুভূতি থরো, হপকিন্স ও মান্স ফিল্ডের সগোত্রীয়। দৈহিক সংবেদন অর্থের লাবণি মারফতে হয়েছে ব্যাপ্ত। এখানে ব্যঞ্জনাই মুখ্য। অর্থাৎ হেমিংওয়ে অর্থের পরিস্ফুটনে ঝোঁক দেননি ততটা যতটা দিয়েচেন এর ব্যঞ্জনায়। ঘটনার যাথার্থ্যেই হয়েচে এ সার্থক। তাই তো দেখা যায় তার চরিত্র ভাবব্যঞ্জীয়জ, কিন্তু ভাব-সংবেদনী নয়। অর্থাৎ তারা তাদের নিজেদের ভাবই লিখে যাচ্ছে শুধু, কিন্তু অন্যের ভাব উপলব্ধি কর্তে পারছেনা। হয়তো দেহের নৈরাজ্যেই এটা স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও তিনি সমর্থ হয়েচেন একটি বিশেষ রচনা-শৈলী গঠনে যারজন্যে রীতিমত একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেচে তাঁকে কেন্দ্র করে। এর বিশেষত্ব হচ্চে সহজ কথার সরলতা। জটিল বা যৌগিক বাক্যের ছড়াছড়ি নেই এখানে। তিনি নিজেই এর ভাষ্য রচনা করেচেন : "স্পষ্টভাষণেই বোঝা যায় লেখন প্রতিভার বাড়া কমা।" স্পষ্ট লেখনের ব্যঞ্জনাই এখানে মুখ্য। তিনি বিশ্বাস করেন মানুষের অভিজ্ঞতা জটিলতার জালে বাঁধা পড়ে। মনন ও প্রাণন সারল্যেরই পূজারী। এ ছাড়া প্রকাশনের আরেকটি দিক হ'লো অনুভূতির স্ফুটন কৌশল। ভাবানুভূতির প্রকাশ নেই এখানে। কারণ, তাহলে দরকার হবে বিশেষণের বিমূর্ত্তন। তাই তিনি ঘটনার বর্ণনা করেচেন আর ভাবানুভূতিকে রেখেচেন অনুমিতির উপর নির্ভরশীল। "অস্ত্রের বিদায়ের" হাসপাতালের দৃশ্যটি এখানে স্মর্ত্তব্য। ক্যাথারিন ও আরোগ্যশায়ী সৈনিকের পারস্পরিক টান হুইস্কির মারফতে রূপ ধরেচে। শুধু শব্দ, সংবেদনা ও যাতায়াতের বর্ণনা আছে। আর ভাবানুভূতিকে অনুমিতির উপরে ছেড়ে দেয়া হয়েচে। এও খেয়ালীপনার নামান্তর। ধ্রুপদীপনা স্বভাবতই এখানে অনুপস্থিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা পেরিয়ে বিশশতক আজ পঞ্চাশোর্দ্ধে শয়ান। মাঝখানে সে পেরিয়েচে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। "হারাণ সন্ততির পরে"ও চলেচে সাহিত্যায়ন। এর বাঁকে বাঁকে শোভা পায় কত না সাহিত্যসম্ভার। নরমান সেইলারের "নগ্ন ও মৃত" (১৯৪৮) এবং জেমন জোনসের "হেথা হ'তে অনন্ত" (১৯৫১) যুদ্ধ চেতনায় এনেচে নতুন সংযোজনা। একটা দর্শনের আভাসও আছে। এজগৎ হেমিংওয়ী জগৎ থেকে একটু আলাদা। এর সুরও স্বতন্ত্র। কাজেই এ জগৎ পুরনো থেকে

একটু দূরে, যেমন চিরকালই হয়ে থাকে সাহিত্যজগতে। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে হেমিংওয়ের সাহিত্য কীর্ত্তির স্থায়িত্ব নিয়ে। তাঁর "হৈচৈরস" কি কালায়নে টিকবে এইটে বেশিকরে মনকে নাড়া দেয়। জনপ্রিয়তার দিক থেকে বিচার করলে তাঁকে আসন ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু জনপ্রিয়তা তো রসোত্তীর্ণতার লক্ষণ নয়। তাই হেমিংওয়েতে দেখা যায় একটা বৈষম্য। এ ব্যবধান গড়ে উঠেচে জনপ্রিয়তা ও রসোত্তীর্ণতাকে কেন্দ্র করে। এক দিকে আছে "পুরাণ", অন্য দিকে "বাস্তব"। যে যুদ্ধোত্তর অনুভূতি নিয়ে তিনি তাঁর সাহিত্য সাধনা সুরু করেছিলেন, তা আজ অন্য বাঁক নিয়েচে। "হৈচৈরস" সাম্প্রতিকী। এ কালায়নে হয় বিবর্ণ। হেমিংওয়েরও হবে তাই। তাই তাঁর বৈশিষ্ট্য থাকবে ঐতিহাসিক হ'য়ে। যুদ্ধোত্তর মানবিক পোড়ো মাঠে তিনি যে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন, তা প্রকাশ পেয়েচে দেহের নৈরাজ্য স্থাপনায়। তার সাম্যরক্ষায় এর প্রয়োজন ছিলো। মার্কিন মুলুকে তিনি এনেছিলেন ষাঁড়ের লড়াইয়ের প্রাণিক উদ্দীপনা। স্পেনীয় ভাষায় এ হ'লো "আফিকৃশান" বা কামনার উদ্দীপনা। সাহিত্যের গতিবদলে এর স্থান অনুপেক্ষনীয়। এখানে তাঁর সঙ্গে পার্থক্য আছে মার্কটোয়েনের। টোয়েনের যেখানে আছে কল্পনার সহানুভূতি, সেখানে হেমিংওয়ের আছে অনুভূতির সংহতি। তাঁর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য কালজয়ী। এ হ'লো রচনাশৈলীর নতুনত্ব। একথা নোবেল কমিটিও স্বীকার করেচেন। "জোরাল শিল্পনৈপুণ্য ও আধুনিক সাহিত্যকলার উপর তাঁর রচনাশৈলীর ব্যাপক প্রভাবের" জন্যেই তিনি আজ নোবেল-পুরস্কৃত। কালান্তরে হয়তো তাঁরি বন্ধুর পরিচিতি আরো উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠবে:

বিশের আগেই হ'ল যুদ্ধফের্তা সুদক্ষ সৈনিক;
পঁচিশে বিখ্যাত হ'য়ে, ভারিকিক তিরিশে,
আখরোটি লাঠি কেটে বানাল যুগের লেখাশৈলী,
প্যারিসের রাস্তাশায়ী—মিস্ত্রীর আবাসে॥

"আনন্দ থেকে নিয়েছি এমন একটি ভঙ্গিমা
যা যেমন দ্বন্দ্বসমাকুল, তেমনি পথভ্রষ্ট।"—র‍্যাবো

কবিতা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

কল্লোলোত্তর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

একটি আন্দোলনের সুফল বা কুফল আন্দোলক শ্রেণীতে যতোটা ফলাও হয় তার চাইতে বেশী সমন্বিত হয় পরেকার যুগে। পরেকার যুগে যাঁরা বিশিষ্ট রূপে আবির্ভূত হন তাঁদের পরিপাক শক্তি এবং দৃষ্টি প্রখর ও প্রশস্ত হতে বাধ্য। 'কল্লোল' আন্দোলনের বেলায়ও তাই হয়েছে। অবশ্য ভিন্ন দৃষ্টি নিয়ে যাঁরা বৈশিষ্ট্য-অভিলাষী তাঁরা খানিকটা সঙ্কীর্ণতায় ও সঙ্কোচে একটি অপরিসর বৃত্তে পরিভ্রমণ করতে সুরু করেন। কবিতার স্রোতকে খণ্ডিত করে দেখবার ইচ্ছা যেমন আমার নেই তেমনি তার অগ্রসরতাকেও হরিৎ-দৃষ্টিতে অদ্বৈত দেখতে চাইনে। অখণ্ড অগ্রসরতা কল্লোলোত্তর কবিদের মধ্যে শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্তে অতি সুস্পষ্ট।

সুধীন্দ্রনাথের 'নবীন লেখনী' যেদিন প্রথম জাগল সেদিনটি হয়ত গৃহকোণ বিদেশী সাহিত্যে-উৎসাহী কবিকে নানা ইন্দ্রজাল দেখাচ্ছিল যার সঙ্গে পরিচয়-গ্রন্থী বন্ধন করতে পরবর্ত্তী বহু কাব্য-প্রবণ মন অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু প্রথম দিনে তিনি 'নব অলিখিত লেখনী' নিয়ে জানতেন না 'কী জানি কেমন ভাগ্যলিখন' তার আছে। তাই লেখকের জিজ্ঞাসু মন লেখনীকে প্রশ্ন করেছিল:

তোর অন্তরে কভু কি শিহরে
উঠিবে রণি
স্ফীত ধমনীর লহুর অধীর
নাটনধ্বনি।
তোরে দিয়ে কভু হবে কি রচন
প্রণয় লিপির ব্যাকুল বচন।

কল্লোল-যুগের চিত্র এ-কথাগুলোতে ব্যক্ত। সুধীন্দ্রনাথ আকস্মিক দৃশ্যপট রচনা করে আবিভূ্ত হননি। কল্লোল-অধ্যায়েও প্রশ্নপাত করে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি জানেন লেখকের পথের বাধা: 'অশ্রুর নদী, শাসনের শিখা, হিংসার বিষ, যশ মরীচিকা' এবং জানতেন তার দরুণ লেখনীর 'গমনচোর' ভঙ্গীর কথা। তবু যখন লেখনী ধারণ করলেন এই ব্যক্তি, তখন তাঁর মনে এই অঙ্গীকার ঝঙ্কৃত হয়েছিল:

"জ্বেলে দেবে সহমরণের চিতা
তোর ও মোর।"

আমরণ লেখকের জন্ম হ'ল সেদিন। তারপর 'অবরুদ্ধ পরাণ পল্বলে' তিনি দেখতে পেলেন 'উন্মাদ শ্রাবণবন্যা ছুটে আসে ভৈরব নিঃস্বনে।'

এখানে আমরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে লেখনীর কর্ম্মকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করতে পারিনে। ভৈরব নিঃস্বনের কথা শুনেই ভাবতে পারিনে আমরণ কাব্যব্রতধারীর রৌদ্র রস-মণ্ডিত রূপ। বস্তুত এ-কবির শ্রাবণের রুদ্রতা রবীন্দ্রনাথের বৈশাখী রুদ্রতাও নয়, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের কলস্বনও নয়। এ-রুদ্রতার রূপ খানিকটা ভারতচন্দ্র 'মানসিংহে'র শিবির ভঙ্গের দৃশ্য আঁকতে বর্ণনা করেছেন। সহজ, প্রাকৃতিক অভিশাপ বলা যেতে পারে তাকে। ভাঙবার বিলক্ষণ চেষ্টা থাকে তার কিন্তু ভাঙে না, সহজে ভাঙতে পারেনা। যেম্নি মানসিংহের শিবির বাংলাদেশে ভাঙেনি, তেম্নি সুধীন্দ্রনাথ বাঙালীর মানসিক শিবির সম্পূর্ণ ভাঙতে পারেন নি। তিনি শ্রাবণের মেঘ থেকে স্বীয় মূর্ত্তিকে সংবর্ত্তের মেঘের দৃশ্যে অপসারিত করে বিনম্র হয়ে গেছেন উত্তর কালে।

'অর্কেস্ট্রা'-পুর্ব্ব অধ্যায়ে সুধীন্দ্রনাথের এ-মনোভঙ্গীর ইশারাটুকু পেয়ে আমরা সত্যিকারের কল্লোলোত্তর যুগের মনোগাহনে অবতরণ করতে পারি। সাহিত্যকে নেশার সামিল করতে চাওয়া এক কথা আর ব্রতকর্ম্ম করা আরেক কথা। সুধীন্দ্রনাথ কাব্যকৃতী। শ্রাবণ-ব্রত তাঁর। প্রস্রবণের অপেক্ষা তিনি করেন নি—তিনি জানেন কোন্ মেঘে জল হয় এবং কোন্ মেঘ কী বর্ণের। অতএব 'সংবর্ত' কালীন মেঘের অপেক্ষায় তিনি কাল কাটিয়েছেন 'উত্তর ফাল্গুনী'র মারাত্মকতা পার হয়ে। মানুষের ইতিহাসে প্রলয় আসবেই কালাবর্ত্তে। আর্য্যাবর্ত্তে যে এমন প্রলয় বহুবার এসে গেছে মানুষের জীবনে ও সৃষ্টিভঙ্গীতে তা তিনি ইতিহাস-অধ্যয়নে যেমন জেনেছেন, দর্শন-শাস্ত্রের মর্ম্ম উপলব্ধি করে যেমন সচেতন হয়েছেন, তেম্নি আপন প্রাণমন-আত্মার পরিচয়-লিপি গ্রহণ করতে গিয়ে সুপরিজ্ঞাত হতে পেরেছেন। 'অর্কেস্ট্রা'-গ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথের প্রেমাভিজ্ঞতার চিত্রগুলো মাত্র পাওয়া যায়। শিল্পী সেখানে 'আত্মচিত্র' ও মনশ্চিত্র আঁকতে ব্যস্ত। অভিজ্ঞতারও স্বাক্ষর তাতে বিদ্যমান যাকে 'মেরিডিথ'-কাব্যার্দর্শ বা বৌদ্ধ নৈরাশ্য বলা যায়। 'হৈমন্তী'-কবিতায় তার সুরু:

"বৈদেহী বিচিত্রা আজি সঙ্কুচিত শিশিরসন্ধ্যায়
প্রচারিলো আচম্বিতে অধরার অহেতু আকুতি।"

মধুসূদন দত্তের ক্রিয়াপদ ব্যবহারে সঙ্কোচ নেই 'নবীন লেখনী'র, কেননা তিনি আপন হৃদ-গত শক্তিমত্তার অভূতপুর্ব্ব পরিচয় লাভ করেছেন। শব্দের আসল কথা যে পদধ্বনির চরিত্র সুভাষিত করা তা তিনি নিশ্চিত জ্ঞানে উপলব্ধি করেছেন। 'প্রচার' যদি সক্রিয় হতে চায় তাহলে তাকে ক্রিয়াপদের বেশ পরালে ভাষা পঙ্গু বা প্রাচীনতাদুষ্ট হয়না। কবি এখানে নূতন বার্ত্তা প্রচার করতে অগ্রসর: ফলভারানত হেমন্ত শুধু সংস্কোচের ও নিরুৎসাহের কাল নয়, সদাসীতা বৈদেহী সীতার মতো ফসল ভারাতুর; যাকে জৈব চেতনার প্রতীক ভাবা যায়, আত্মপ্রচার করে সে যতোই বিচিত্র হোক বস্তুত তার সত্তা বৈনাশিক ফলদাত্রী। জৈব জীবন লাঞ্ছনায়ও জীবনের জয় ঘোষণা করে। দর্শন-বিচার-বিতর্ক হৃদয়ের জৈব তাড়নাকে তাড়াতে পারেনা। হয়তো কল্লোল-যুগের দর্শনেও মোটামুটি এই সিদ্ধান্ত ছিল কিন্তু কল্লোল-যুগের বিশিষ্ট কবি জীবনানন্দ দাশ পুঁথিগত-দর্শনছুট। সুতরাং জীবনানন্দের 'হেমন্ত'-চিত্র আর সুধীন্দ্রনাথের 'হৈমন্তী' চরিত্র এক নয়। একসময় জীবনানন্দ বিরক্ত বৈরাগী হয়ে গেছেন রমণীর কদর্য্য অভিজ্ঞতা লাভ করে। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ জ্ঞানবশত সুস্থির হয়ে বলছেন:

"জানি, অলজ্জিত রাতে শ্লথনীবি কম্প্র আত্মদানে
দেয়নি সে মোরে অর্ঘ, খুঁজেছিল বসন্ত সখাকে।"

'বসন্তসখা'র আবির্ভাব বুদ্ধ সহ্য করলেও জীবনানন্দ সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু এই মহাপ্রতীক ভিন্ন প্রেমের জৈব চেহারা কাব্যময় করা যে কঠিন! নর এবং নারী প্রত্যেকেরই স্বকীয় কামবৃত্ত আছে। কুসুমায়ুধ সে বৃত্তের প্রণেতা। জীবনানন্দ নারীকে নর-জৈবতায় ও নর-শৈবতায় আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথ নারীস্বাতন্ত্র্যকে আর্য বা মোঙ্গোলবিক্রমে পর্য্যুদস্ত করেন নি। তিনি প্রকৃষ্ট আর্য্য রাজন্যতায় বিশ্বাসী, যাকে দ্রাবিড় মনোভঙ্গীও বলা যায়।

কাজেই ভারত সংস্কৃতির নিকষে ঘসে জীবনানন্দের চিত্ত থেকে মনোগুণের আমেজ বেশি পাওয়া যাবে এবং সুধীন্দ্রনাথে পাওয়া যাবে রাজন্যধীর রজোগুণের আবেশ বেশি। কার্ষ্ণেয় বা রাবণ চরিত্রফল 'অর্কেস্ট্রা'র শেষ কবিতার হাহাকারে ব্যঞ্জিত। একে শাক্য পটভূমিকায় ভালো মানায়। ইন্দ্রসেনা বা ইন্দ্রিয়সেনা হয়ে ভারতীয় রাজন্যরা যে ফল দান করে গেছেন, আজকের জীবনে যে তার ব্যতিক্রম হবে, মানবিক অন্তঃকরণের পটে বুদ্ধের প্রজ্ঞার পরও তেমন কোনো পট পরিবর্ত্তন হয়নি। সমাজতত্ত্বে যাঁরা মনোযোগী তাঁরা দেখতে পাবেন যে সামন্ততান্ত্রিক মনোবৃত্তিটুকু পর্য্যন্ত ধনতান্ত্রিক পরিবেশে চেহারা পরিবর্ত্তন করতে অনিচ্ছুক হয়। এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে ধনতান্ত্রিক ও সহানুধ্যায়ী সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব সুযোগ-সুবিধে পেলেই উঁকিঝুঁকি দেয়। তা থেকে জ্ঞান লাভ করে আমরা শুধু এ-সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে বহুযুগ আচরিত কতগুলো পদ্ধতি আমাদের মনোভঙ্গী তৈরী করে তোলে। দেশ-বিভেদে বা দেশের অঞ্চল-বিভেদে তার প্রকৃতি আলাদা হতে পারে, এই মাত্র। প্রেমকামতা ও ধর্ম্মকামতা মানব-সভ্যতার উষাকাল থেকে উত্থিত হয়ে অদ্যাবধি মানব-সমাজে ও মানব-মনে অব্যাহত। এই দু'টি মনোভঙ্গীর সূত্রে বিশ্ববন্ধন বা বিশ্বৈকচিত্র দর্শন সম্ভবপর বলে শৈল্পিক কর্ম্মকৃতি অতি স্বাভাবিক ভাবে প্রেম ও ধর্ম্মে আকর্ষিত হয়। বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ছিল এই দু'টি কামতাকে ভক্তিতে এক করে ফেলা। প্রেমের উৎক্রান্তি নিয়ে প্রশ্ন যেমন বাঙালী ধর্ম্মগুরুর তেম্নি ভাবনা শিল্পগুরুরও ছিল। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তে জীবনানন্দ দাশ এই উৎক্রান্তির পথ নিয়েছিলেন, যা সুধীন্দ্রনাথ নিতে অনিচ্ছুক। ফলে 'সংবর্ত'-কালীন পট-পরিবর্ত্তনের আশায় তিনি স্থির হয়ে বসেছিলেন। অবশ্য সে-'সংবর্ত' ঘনীভূত করেছিল বিশ্বরাষ্ট্রনীতি গত মহাযুদ্ধের নিনাদ শুনিয়ে। মানুষের বাস্তব ইতিহাসে সুধীন্দ্রনাথ যতো বেশি আশান্বিত, জীবনানন্দের ইতিহাসচেতনা কিন্তু ততোবেশি আশার আশা করে না। সে-ইতিহাসচেতনা আশার সোওয়ারী, এমন এক কুহকিনী আশা, যে কানে-কানে কুহর তুলে চোখের উপর আলোর আর অন্ধকারের মিছিল সাজিয়ে দেয়। জীবনানন্দ স্বপ্নের হাতের জাদুবিদ্যা আপন হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

গত যুদ্ধ যখন আমাদের আশ্বিনের আকাশে এলো, তারপর তার বীভৎসতায় জীবনানন্দ জীবনকে কুৎসিত ও কুরূপ ভাববার অবকাশ প্রচুর পরিমাণে পেয়েছেন। কিন্তু 'সংবর্তে'র সম্ভাবনা লক্ষ্য করে কালান্তর-বোধে সুধীন্দ্রনাথের লেখনী 'নান্দীমুখ' লিখে চলেছে এই ভঙ্গীতে:

"তোমার যোগ্য গান বিরচিব বলে
বসেছি বিজনে, নব নীপবনে
পুষ্পিত তৃণদলে।

শরতের সোনা গগনে গগনে ঝলকে ;
ফুকারে পবন, কাশের লহরী ছলকে
শ্যাম সন্ধ্যার পল্লবঘন অলকে
চন্দ্রকলার চন্দনটীকা জ্বলে।
মুগ্ধ নয়ান পেতে আছি কান
গান বিরচিব বলে।"

তখনকার স্নায়বিক যুদ্ধ উপভোগ করবার যাঁদের বয়েস বা বিবেচনা ছিলনা তাঁরা 'সংবর্তের' এই নান্দীমুখ থেকে কতোখানি কব্যাস্বাদ লাভ করেছেন বা করতে পারবেন তা আমার জানা নেই। কিন্তু আমি সেই সেনারাজ্যে দাঁড়িয়ে এ-সুর স্মরণ করে বলতে পারি যে তখন যুদ্ধের প্রতি উদ্দীপ্ত এই গাথার প্রতিচ্ছত্র মনে রোমাঞ্চ জাগাতে পারত। শুনতাম ভারতসেনার মুখে অত্যন্ত সুস্পষ্ট আশায় গাথা। এ সেনা সেদিনও ভোলেনি বিধ্বস্ত বিদেহ নগর। বলে চলেছে যেন রামরাজত্বের উদ্দেশে :

"তবু অন্তরে থামেনা বৃষ্টিধারা
আর্দ্র, ধূসর, বিদেহ নগর
মৎসর প্রেত-পারা,
প্রকৃতির লীলা আবরি কুহেলীকানাতে,
ইঙ্গিতে যেন চায় অভিযোগ জানাতে ;
তন্ময় ধ্যান ভেঙে যায় তার হানাতে।
ছায়া-প্রচ্ছদে যাতায়াত করে কারা ?
কী নাম শুধাই উত্তর নাই
ঝরে শুধু বারিধারা ॥"

প্রকৃতির হিংস্রতার মতোই ইতিহাসের হিংস্রতা অধ্যায়ে অধ্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়—যুদ্ধ তেমনি প্রাকৃতিক হিংস্র দুর্য্যোগ। প্রকৃতি জনকের পুণ্যভূমিকেও ছেড়ে কথা কয়না। বিদেহ ধ্বংস হয়েছে দেহবাদের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়ে। অহিংসা আর হিংসার মধ্যে কাকে রেখে কাকে মারা সম্ভবপর ? সুধীন্দ্রনাথ যুদ্ধের প্রাক্কালে স্থির করলেন : "স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে শুদ্ধির তাণ্ডবে।" ভাঙবার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন তিনি পৃথিবীর সভ্যতা যেদিন প্রলয়ের সম্মুখীন। এ-ভাঙন মন্ত্র সেদিনকার মানুষের জীবনের চার-দেয়ালেই ধ্বনিত হচ্ছিল। ব্যক্তি, সমাজ, জাতি আর পৃথিবী সেই চারটি দেয়াল। মানুষের জীবনের পরিধি বেড়ে গিয়েছিল তখন।

বামপন্থী কাব্য-চর্য্যার কাল ১৯৩৮ সন, যখন সুধীন্দ্রনাথ এ-কবিতাটি রচনা করেন। তাঁর মনের সহধর্ম্মী হয়েও এমন সুর-গীতিময় ছন্দধ্বনি অনেকেই তুলতে পারেন নি সেদিন। আমরা যে-কালে পয়ারের আলস্যে বেশি কারুণ্য আনতে চেয়েছি কিম্বা ছন্দঝঙ্কারে 'বণিকের জতুগৃহ' পুড়ে যাবার স্বপ্ন বিতরণ করছি, তিনি সেকালে মাত্রিকছন্দের পদমাত্রায় প্রীতিময় তন্ত্রীলয়বৎ সুন্দর ধ্বনি দিতে চেয়েছেন প্রলয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তাছাড়া এ-রণগাথার বাক্যবিন্যাসেও তদানীন্তন দুর্ব্বোধ্যতার চাতুরী নেই, কুয়াশা নেই। সেদিন, সুতরাং, এ-কবিতার ঔৎকর্ষ ছিল অপরিসীম ; যতোই সংগ্রাম মার্কা কবিতা-রচিত হোক, কাব্যবিচারে প্রগতি এ-ধরণের রচনাতেই নির্ণেয়।

এখন থেকে বত্রিশ বছর আগে সুধীন্দ্রনাথ যখন তরুণ বয়েসে লিখতে সুরু করেন তখনকার একটি রচনা 'লগ্নহারা'র বাক্যাবলী দেখে মনে হয় যে তিনি ম্যাথু আর্ণল্ডের (To Marguerite) আসক্ত ছিলেন। আর্ণল্ড কবিতা বলতে 'জীবন-সমালোচনা' বুঝতেন। সুধীন্দ্রনাথ কবিতা বলতে 'জীবন-সমালোচনা'র বাইরে চলে গেছেন তা নয়। অবশ্য 'জীবন' বলতে বা তার ইংরেজি শব্দ 'লাইফ' বল্‌তে এমন একটি জটিল পটভূমি আমাদের মনের উপর তুলে ধরে, এতো সুবৃহৎ তার ব্যাস ও অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ, যে জীবনের প্রকৃত সমালোচনা নিজের মনোদর্পণে সুস্পষ্টভাবে ফলিত করে তোলা সম্ভবত অসম্ভব ব্যাপার। সুধীন্দ্রনাথ তবু স্বাবলম্বী হয়ে জগৎ-সংসারের চিত্র আমাদের চোখের উপর খানিকটা তুলে ধরেছেন। তা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞার ছবি। যোগ্য শক্তির পরাক্রম, বিনয় ও সদিচ্ছাপূত একটি জগৎ আমরা সে-অভিজ্ঞা থেকে মনের উপর তুলে আনতে পারি ১৯৫৩-পর্য্যন্ত তাঁর কাব্য-বস্তু অনুসন্ধান করে। নিরীশ্বর সেই সাংখ্যের জগতের ঈশ্বর তিনি স্বয়ং, পুরুষ। সুতরাং অর্কেস্ট্রার দিনের বোধ বা নারী-প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতি শেষ-পর্য্যন্তও ক্ষুণ্ণ হয়নি। 'যযাতি' কবিতায় তিনি তাঁর প্রৌঢ় মনের চিত্র দেখাতে তৎপর হয়েছেন। মৃত্যুবাহিনী কাম-কলা হিংসাত্মক বেশে রাষ্ট্রে, সমাজে, মানবিক মনে বিসর্পিত। তার দর্পণস্থ রূপ দেখাতে গিয়ে তিনি বলছেন :

"অর্থাৎ কৃতান্ত আজ
ব্যক্ত সর্ব ঘটে ; এবং প্রৌঢ়ের কেন সকলেরই
কর্তব্য যেমন অরণ্যে রোদন, তেমনিই সম্প্রতি
সাধ্য লোকালয়ে সে-বৃথা বিলাপ ॥

প্রৌঢ়তা এখানে বড়ো চিত্র নয়—মৃত্যুকে অকুতোভয়ে অবিলাপে স্বীকার করে নেওয়ার ভঙ্গী ও নমনীয় মনের ছবিটি চমৎকার। তাছাড়া অনবদ্য পয়ার ভঙ্গীতে 'পিওর প্রোজ' (নির্জ্জলা গদ্য ভঙ্গীর বাক্য) ব্যবহার। বাংলা ছন্দবদ্ধ কবিতায় এ-ধরণের গদ্য-বাক্য ব্যবহারের রীতি ও কৌশল সুধীন্দ্রনাথের যেমন ধ্বনিশাস্ত্রানুগভাবে জানা আছে, তেমন আর কারো জানা আছে বলে আমি অন্তত জানিনে। শব্দ-ধ্বনি কোথায় কিরূপে প্রযুক্ত হলে কাব্যরীতি লজ্যিত হয়না, এ-জ্ঞান সুধীন্দ্রনাথ যদি মালার্মে থেকেও এনে থাকেন, তবু বল্‌বো, বাংলা কবিতার ধ্বনির উন্নয়নকল্পেই তিনি বৈদেশিক ধ্বনিজ্ঞ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন।

১৯৩৮ সনে সুধীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 'পরিচয়'-পত্রিকার শেষ-পর্য্যায় চলছিল। শ্রীবুদ্ধদেব বসু তখন 'কবিতা'-পত্রিকার যোগ্য পরিচালনার ফলে জীবনানন্দ দাশকে কল্লোল-যুগের শ্রেষ্ঠ ফসল দাতৃ-হিসেবে পরিচিত করতে সমর্থ হয়েছেন। শ্রীবিষ্ণু দে-ও 'পরিচয়'-যুগের অর্দ্ধপরিচিতির সার্থক মোচন করতে

সচেষ্ট হচ্ছেন তখন 'কবিতা'য় এবং শ্রীসমর সেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীগত নৈরাশ্যের অনুভব নিখুঁত গদ্যে সময়োপযোগী রসে পরিবেষণ করছিলেন 'কবিতা'-পাঠকদের। সে-সময়েই 'পূর্ব্বাশা'য় প্রথম কৈশোরক কবিতা লিখেছিলেন শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়। শ্রীসমর সেনও কয়েক বছর আগে তাঁর প্রথম কবিতা 'পূর্ব্বাশা'তেই প্রকাশিত করেন। তরুণ কবিদের মধ্যে তখন সর্ব্বাধিক উল্লেখ্য ছিলেন শ্রীদিনেশ দাস, শ্রীঅরুণ মিত্র প্রভৃতি। দিনেশ দাসের 'কাস্তে' সুধীন্দ্রনাথের মনে অনুরণন তুলে বলতে চেয়েছিল যে তার চেহারা 'বিকল প্রেমিকে'র। 'ক্রন্দসী'-গ্রন্থান্তর্গত কিছু-কিছু কবিতা সুধীন্দ্রনাথ 'পূর্ব্বাশা'য় প্রকাশিত করেন।

তখন বাংলা কবিতা শ্রেণীগত মনন ও মন ব্যক্ত করতে চাইত বামপন্থার হাওয়া সেবন করে। বলা বাহুল্য যে শ্রেণীগত কোনো পন্থা কবিতা-বিচারে সুধীন্দ্রনাথের মনে গণ্য হয়নি। গণ্য হয়েছিল 'পরিচয়'-পত্রের ধীমান শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য-বিচারে। তিনি তখন সমর সেনের কবিতার একটি আলোচনা প্রকাশ করেন। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার রস-ও তিনি শ্রেণী-প্রতিনিধিত্বের পাত্রে গ্রহণ করে পান করেছিলেন। জীবনানন্দে তিনি শ্রেণীর মনোভঙ্গী খুঁজে পাননি। তখনকার তাঁর একটি পত্রে (লেখকের নিকট লিখিত) জীবনানন্দের সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য বিধৃত ছিল:

> জীবনানন্দ দাশকে বুদ্ধদেব আজকালকার শ্রেষ্ঠ কবি বলে। আমিও তাঁর লেখা মন দিয়ে পড়ি। গোটা কয়েক কবিতা খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু এখনও তাঁর মূল ছুঁতে পারিনি। যেদিন পারব সেই দিনই লিখ্‌ব, কাউকে বলতে হবেনা। একদিন এই গ্রীষ্মের ছুটিতে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়। তিনি মুখে যা কবিতা-সম্বন্ধে বল্লেন তা আমি গ্রহণ করতে পারিনি। এখনই যদি লিখতে বসতাম তবে মতামতের পার্থক্য আমার উপভোগের অন্তরায় ঘটিয়ে তাঁর কবিতার প্রতি অবিচার করাতে আমাকে প্রণোদিত করত। তাই তাঁর মতামত ভুলতে সময় নিচ্ছি।"

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ তখন বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সজনীকান্ত দাসের 'লম্বা রিভিউ' করেছিলেন বলেই লেখক তাঁকে জীবনানন্দের কবিতায় আলোক-পাত করতে অনুরোধ জানিয়েছিল। কবির 'মূল' বলতে ধূর্জ্জটিপ্রসাদ শ্রেণীগত সমাজচেতনা বুঝতেন। অবশ্য, সে-মূল জীবনানন্দ সমূলে উৎপাটন করেই কবি-ব্রতে নিজেকে দীক্ষিত করেছিলেন। প্রকৃত কবিতা রস বা সৃষ্টি করতে যাঁরা অগ্রসর হন, কাব্য-চেতনাই তাঁদের মনে দিনগতপাপক্ষয়কর যন্ত্র হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকে। ধূর্জ্জটিপ্রসাদ সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর ক্ষয়িষ্ণু মনোভঙ্গীর রূপ দেখতে পেয়ে হয়ত প্রীতি-আস্বাদন করেছিলেন কিন্তু এ ক্ষয় ত সার্ব্বমানবিক তখন। সমাজতান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক নির্ব্বিশেষে সব দেশেই তখন ক্ষয়ের আবেগ। গত মহাযুদ্ধের পটভূমিকা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে যেম্নি 'উরুপা'য়, তেম্নি 'এশিয়া'য় একটা গোধূলি-বর্ণ দেখা যায়। আমাদের দেশের উপরও গোধূলির রক্তমেঘ অনুভূত হচ্ছিল। অরুণ মিত্র দেশের 'সীমান্ত এমনই অনিশ্চিত' দেখতে পেয়েছিলেন, যার ফলে প্রাক্তন শক-রাজ্যের অধিবাসীদের প্রতি তিনি আবেগ অনুভব করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে লেখক বলতে পারে যে শোক-বিলাসী বলে আখ্যাত হলেও সে তখন বাঙালীজাতির প্রাক্তন প্রতিষ্ঠান 'পামীর' বা 'বাম-ই-তুনিয়া'র পাখা মেলার স্বপ্ন দেখছিল। জীবনানন্দ তখন 'ক্লান্ত নাবিক'

বনলতাসেনের নায়ক। সুধীন্দ্রনাথ যেন তখনই সব চাইতে বেশি প্রস্তুত, সেই সময়টির 'যোগ্য গান' রচনার জন্যে। সেই সুরকেই তিনি সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ 'সংবর্তে'র ব্রত-কর্ম্মের প্রথম কবিতার স্থান দান করেছেন। যুগের জীবনতত্ত্ব তাঁর চাইতে বেশি কেউ কাব্যে পরিবেষণ করেন নি।

'বামপন্থা' কবিতার বিষয় হতে পারে কি না এ-প্রশ্ন যেমন কেউ-কেউ সে-সময়টাতে আত্যন্তিক জ্ঞান-বিচারে বিবেচনা করছেন তেম্নি স্বপ্নভ্রষ্টতায়ও কেউ কেউ তখন আহত হয়েছেন। কিন্তু আমরা মনে করি, কবি উত্থানপাদ পুরুষ। কোনো অবস্থাই তাঁকে পতিত রেখে চিন্তাবসাদে আবদ্ধ রাখতে পারে না। তাঁর মুক্তি তাঁর নিজের কৃতিত্ব। এ-কৃতিত্ব বুদ্ধদেব বসুতে যেমন গোড়াতেই অঙ্কুরিত ছিল, তেম্নি উপ্ত হয়েছিল সুধীন্দ্রনাথে তাঁর 'অর্কেস্ট্রা'র আমলে।

সুধীন্দ্রনাথের দ্বান্দ্বিক মনের প্রতিমা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে 'উত্তর ফাল্গুনী'র 'দ্বন্দ্ব' কবিতায়। দেহ ও মনের চিরন্তন দ্বান্দ্বিকতা এড়িয়ে এবং দ্বান্দ্বিক জড়বাদের চাইতে বৌদ্ধ দর্শনের দ্বান্দ্বিক পরিণতিতে প্রস্থান করে তিনি বরং আরাম পান। এ-ক্ষেত্রে উপায়-অনুসন্ধিৎসু এলিঅট তাঁর 'ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডে'"একটি চাবির আওয়াজ শুনেছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কয়েদখানায় বসে। শুনেছিলেন 'দয়ধ্বম'-আওয়াজের সঙ্গে। বৌদ্ধ অনুভবের গাত্রে মুক্তির শব্দ র‍্যাবোর নমুনায়:

Dayadhvam : I have heard the key
Turn in the door once and turned once only
We think of the key, each in his prison..."

বুদ্ধ যে 'আর্য্যসত্যে' বিশ্বাসী ছিলেন এলিঅট তাতে খ্রীষ্টানোচিত বিশ্বাসী হবার প্রয়াস দেখিয়েছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের পর। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের লগ্ন যেদিন এলো, সেদিন এলিঅটের প্রজ্ঞা নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ সদয় আর্য্যসত্যে বিশ্বাসী হতে চেয়েছেন বিপরীতভাবে 'দেহের দয়া'য়—বৈদেহী, মারজয়িনী দয়ায় নয়। তিনি বুঝতে পেরেছেন: 'বিসংবাদ, বিকর্ষণ আর্য্যসত্য জাগ্রত জগতে'—সুতরাং বল্‌ছেন:

আজিকে দেহের পালা; রিক্ত শেজে শুয়ে তাই ভাবি
হয়তো বা তারই কাছে পড়ে আছে অমরার চাবি।"— দ্বন্দ্ব

সম্যক দর্শন ও জ্ঞান অনুধাবন করে 'দেহবাদ'-কে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে বিশ-শতক, সুধীন্দ্রনাথ সেই বিষজর্জ্জর বিশশতকের বাংলাদেশের নৈষ্ঠিক ও দুঃসাহসিক কবি। এ-দুঃসাহস তারুণ্যের আবেগে ক্ষণজীবী নয়, ক্রমোন্নত হয়ে সুদৃঢ়, চেতনায় চৈত্যের মতন স্থানকাল-ব্যাপী। একটি শাশ্বত জীবনের জৈবতায় বা জন্ম-মৃত্যুতে অকাতর।

কল্লোল-শাখা

কল্লোল-যুগের দিকে যথার্থ দৃষ্টি নিয়ে তাকালে তাকে সমৃদ্ধ শাখান্বিত অবস্থায় পাওয়া যায়। মূল কাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ফলফুল যে ব্যক্তির কাব্য-সাধনার অন্তর্গত হয়ে পরবর্ত্তী যুগে বহু কাব্য-প্রবণ প্রাণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তিনি জীবনানন্দের চাইতে বেশি স্মরণীয় আর কেউ ছিলেন না।

সচেষ্ট হচ্ছেন তখন ‘কবিতা’য় এবং শ্রীসমর সেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীগত নৈরাশ্যের অনুভব নিখুঁত গদ্যে সময়ানুগ রসে পরিবেষণ করছিলেন ‘কবিতা’-পাঠকদের। সে-সময়েই ‘পূর্ব্বাশা’য় প্রথম কৈশোরক কবিতা লিখেছিলেন শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়। শ্রীসমর সেনও কয়েক বছর আগে তাঁর প্রথম কবিতা ‘পূর্ব্বাশা’তেই প্রকাশিত করেন। তরুণ কবিদের মধ্যে তখন সর্ব্বাধিক উল্লেখ্য ছিলেন শ্রীদিনেশ দাস, শ্রীঅরুণ মিত্র প্রভৃতি। দিনেশ দাসের ‘কাস্তে’ সুধীন্দ্রনাথের মনে অনুরণন তুলে বলতে চেয়েছিল যে তার চেহারা ‘বিকল প্রেমিকে’র। ‘ক্রন্দসী’-গ্রন্থান্তর্গত কিছু-কিছু কবিতা সুধীন্দ্রনাথ ‘পূর্ব্বাশা’য় প্রকাশিত করেন।

তখন বাংলা কবিতা শ্রেণীগত মনন ও মন ব্যক্ত করতে চাইত বামপন্থার হাওয়া সেবন করে। বলা বাহুল্য যে শ্রেণীগত কোনো পন্থা কবিতা-বিচারে সুধীন্দ্রনাথের মনে গণ্য হয়নি। গণ্য হয়েছিল ‘পরিচয়’-পত্রের ধীমান শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য-বিচারে। তিনি তখন সমর সেনের কবিতার একটি আলোচনা প্রকাশ করেন। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার রস-ও তিনি শ্রেণী-প্রতিনিধিত্বের পাত্রে গ্রহণ করে পান করেছিলেন। জীবনানন্দে তিনি শ্রেণীর মনোভঙ্গী খুঁজে পাননি। তখনকার তাঁর একটি পত্রে (লেখকের নিকট লিখিত) জীবনানন্দের সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য বিধৃত ছিল:

> জীবনানন্দ দাশকে বুদ্ধদেব আজকালকার শ্রেষ্ঠ কবি বলে। আমিও তাঁর লেখা মন দিয়ে পড়ি। গোটা কয়েক কবিতা খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু এখনও তাঁর মূল ছুঁতে পারিনি। যেদিন পারব সেই দিনই লিখ্‌ব, কাউকে বলতে হবেনা। একদিন এই গ্রীষ্মের ছুটিতে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়। তিনি মুখে যা কবিতা-সম্বন্ধে বল্লেন তা আমি গ্রহণ করতে পারিনি। এখনই যদি লিখতে বসতাম তবে মতামতের পার্থক্য আমার উপভোগের অন্তরায় ঘটিয়ে তাঁর কবিতার প্রতি অবিচার করাতে আমাকে প্রণোদিত করত। তাই তাঁর মতামত ভুলতে সময় নিচ্ছি।”

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ তখন বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সজনীকান্ত দাসের ‘লম্বা রিভিউ’ করেছিলেন বলেই লেখক তাঁকে জীবনানন্দের কবিতায় আলোক-পাত করতে অনুরোধ জানিয়েছিল। কবির ‘মূল’ বলতে ধূর্জ্জটিপ্রসাদ শ্রেণীগত সমাজচেতনা বুঝতেন। অবশ্য, সে-মূল্য জীবনানন্দ সমূলে উৎপাটন করেই কবি-ব্রতে নিজেকে দীক্ষিত করেছিলেন। প্রকৃত কবিতা রচনা বা সৃষ্টি করতে যাঁরা অগ্রসর হন, কাব্য-চেতনাই তাঁদের মনে দিনগতপাপক্ষয়কর যন্ত্র হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকে। ধূর্জ্জটিপ্রসাদ সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর ক্ষয়িষ্ণু মনোভঙ্গীর রূপ দেখতে পেয়ে হয়ত প্রীতি-আস্বাদন করেছিলেন কিন্তু এ ক্ষয় ত সার্ব্বমানবিক তখন। সমাজতান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক নির্ব্বিশেষে সব দেশেই তখন ক্ষয়ের আবেগ। গত মহাযুদ্ধের পটভূমিকা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে যেমি ‘উরুপা’য়, তেমি ‘এশিয়া’য় একটা গোধূলি-বর্ণ দেখা যায়। আমাদের দেশের উপরও গোধূলির রক্তমেঘ অনুভূত হচ্ছিল। অরুণ মিত্র দেশের ‘সীমান্ত এমনই অনিশ্চিত’ দেখতে পেয়েছিলেন, যার ফলে প্রাক্তন শক-রাজ্যের অধিবাসীদের প্রতি তিনি আবেগ অনুভব করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে লেখক বলতে পারে যে শোক-বিলাসী বলে আখ্যাত হলেও সে তখন বাঙালীজাতির প্রাক্তন প্রতিষ্ঠান ‘পামীর’ বা ‘বাম-ই-দুনিয়া’র পাখা মেলার স্বপ্ন দেখছিল। জীবনানন্দ তখন ‘ক্লান্ত নাবিক’, বনলতাসেনের নায়ক। সুধীন্দ্রনাথ যেন তখনই সব চাইতে বেশি প্রস্তুত, সেই সময়টির ‘যোগ্য গান’ রচনার জন্যে। সেই সুরকেই তিনি সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ ‘সংবর্তে’র ব্রত-কর্ম্মের প্রথম কবিতার স্থান দান করেছেন। যুগের জীবনতত্ত্ব তাঁর চাইতে বেশি কেউ কাব্যে পরিবেষণ করেন নি।

‘বামপন্থা’ কবিতার বিষয় হতে পারে কি না এ-প্রশ্ন যেমন কেউ-কেউ সে-সময়টাতে আত্যন্তিক জ্ঞান-বিচারে বিবেচনা করছেন তেমি স্বপ্নভ্রষ্টতায়ও কেউ কেউ তখন আহত হয়েছেন। কিন্তু আমরা মনে করি, কবি উত্থানপাদ পুরুষ। কোনো অবস্থাই তাঁকে পতিত রেখে চিন্তাবসাদে আবদ্ধ রাখতে পারে না। তাঁর মুক্তি তাঁর নিজের কৃতিত্ব। এ-কৃতিত্ব বুদ্ধদেব বসুতে যেমন গোড়াতেই অঙ্কুরিত ছিল, তেমি উপ্ত হয়েছিল সুধীন্দ্রনাথে তাঁর ‘অর্কেস্ট্রা’র আমলে।

সুধীন্দ্রনাথের দ্বান্দ্বিক মনের প্রতিমা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে ‘উত্তর ফাল্গুনী’র ‘দ্বন্দ্ব’ কবিতায়। দেহ ও মনের চিরন্তন দ্বান্দ্বিকতা এড়িয়ে এবং দ্বান্দ্বিক জড়বাদের চাইতে বৌদ্ধ দর্শনের দ্বান্দ্বিক পরিণতিতে প্রস্থান করে তিনি বরং আরাম পান। এ-ক্ষেত্রে উপায়-অনুসন্ধিৎসু এলিঅট তাঁর ‘ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডে’ একটি চাবির আওয়াজ শুনেছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কয়েদখানায় বসে। শুনেছিলেন ‘দয়ধ্বম’-আওয়াজের সঙ্গে। বৌদ্ধ অনুভবের গাত্রে মুক্তির শব্দ র‍্যাবোর নমুনায়:

> *Dayadhvam* : I have heard the key
> Turn in the door once and turned once only
> We think of the key, each in his prison...”

বুদ্ধ যে ‘আর্য্যসত্যে’ বিশ্বাসী ছিলেন এলিঅট তাতে খ্রীষ্টানোচিত বিশ্বাসী হবার প্রয়াস দেখিয়েছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের পর। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের লগ্ন যেদিন এলো, সেদিন এলিঅটের প্রজ্ঞা নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ সদয় আর্য্যসত্যে বিশ্বাসী হতে চেয়েছেন বিপরীতভাবে ‘দেহের দয়া’য়—বৈদেহী, মারজয়িনী দয়ায় নয়। তিনি বুঝতে পেরেছেন: ‘বিসংবাদ, বিকর্ষণ আর্য্যসত্য জাগ্রত জগতে’—সুতরাং বল্‌ছেন:

> আজিকে দেহের পালা; রিক্ত শেজে শুয়ে তাই ভাবি
> হয়তো বা তারই কাছে পড়ে আছে অমরার চাবি।”— দ্বন্দ্ব

সম্যক দর্শন ও জ্ঞান অনুধাবন করে ‘দেহবাদ’-কে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে বিশ-শতক, সুধীন্দ্রনাথ সেই বিষজর্জ্জর বিশশতকের বাংলাদেশের নৈষ্ঠিক ও দুঃসাহসিক কবি। এ-দুঃসাহস তারুণ্যের আবেগে ক্ষণজীবী নয়, ক্রমোন্নত হয়ে সুদৃঢ়, চেতনায় চৈত্যের মতন স্থানকাল-ব্যাপী। একটি শাশ্বত জীবনের জৈবতায় বা জন্ম-মৃত্যুতে অকাতর।

কল্লোল-শাখা

কল্লোল-যুগের দিকে যথার্থ দৃষ্টি নিয়ে তাকালে তাকে সমৃদ্ধ শাখায়িত অবস্থায় পাওয়া যায়। মূল কাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ফলফুল যে ব্যক্তির কাব্য-সাধনার অন্তর্গত হয়ে পরবর্তী যুগে বহু কাব্য-প্রবণ প্রাণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তিনি জীবনানন্দের চাইতে বেশি স্মরণীয় আর কেউ ছিলেন না।

মূল কাণ্ডের দু'টি শাখা 'প্রগতি' আর 'কালিকলম'। 'প্রগতি'র দু'জন সম্পাদকই কবিতায় আসক্ত ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অজিত দত্তের চাইতে বুদ্ধদেব বসুই কবিতা-অন্দোলনে বেশি অগ্রসর হয়ে গেছেন। "'কালি-কলমে'র দ্বৈত সম্পাদকতার দফতর থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'লেখনী'ই 'অগ্নি-আখরে' নাম লিখতে এগিয়ে এলেন নজরুলের 'অগ্নিবীণা'র আসরে।

দু'টি শাখা থেকে যে দু'জন কবি আমাদের জন্যে কাব্য-ফল চয়ন করে এনেছিলেন তার স্বাদ আলাদা; কারণ, কল্লোল ঔপনিষদীয় কিম্বা বাস্তব তরু নয়। কল্পতরু। সমসাময়িক স্বপ্ন আর কল্পনা তাঁর কাণ্ডে নূতন কাব্যফল আস্বাদের অভিপ্রায়ে শাখাঙ্কুর উদ্‌গমে সাহায্য করেছিল। যেমন জীবনানন্দের কাব্য-চরিত্র তেম্নি প্রেমেন্দ্র মিত্রের ও বুদ্ধদেব বসুর কাব্য-ভঙ্গী অনুধাবন করে আমরা সে সময়কার কাব্যগঠন মোটামুটি অনুভব করতে পারি।

স্বপ্ন আর কল্পনা পৃথক ব্যাপার হলেও তারা এক ঘরেরই বাসিন্দে। স্বপ্নের পরিস্রুত বা বিশুদ্ধ রূপকেই কল্পনা বলা যায়। কল্পনায় যুক্তি-বিচার সক্রিয় থাকে, স্বপ্নের অবস্থা সত্য হলেও অযৌক্তিক হতে পারে। অযৌক্তিক ব্যাপার সত্য বলেই গ্রাহ্য হয়। স্বপ্ন যেমন সর্ব্বজনের অভিজ্ঞতায় আছে তেম্নি অযৌক্তিকতাও সর্ব্বমানবিক হয়ে সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্য বা শিল্পকলা অযৌক্তিক স্বপ্নের পথে বিচরণ করবার সৎসাহস লাভ করে অযৌক্তিক স্বপ্ন লৌকিক সত্য বলেই। স্বপ্নদর্শী জীবনানন্দ সম্প্রতি তাঁর স্বপ্নের জন্যে যেমন সমাদৃত তেমন হয়ত তাঁর কল্পনার রূপের জন্যেও আদৃত নন।

কল্পনা কবিতার ক্ষেত্রে এসে বাস্তবকে স্বপ্নশীল করে তোলে। জীবনানন্দ এম্নি কল্পনায় বাস্তবের নাটোরের বনলতা সেনকে স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে উপস্থিত করেছেন—কিম্বা মৃণালিনী ঘোষালের 'শব'-কে রূপকথার নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য সূক্ষ্ম-বিচারে এসব রূপকথার বা স্বপ্নের অবয়ব বাস্তব জ্ঞানরাজ্যের এলাকা সন্ধান করেই আনা যাবে। ইংরেজ কবি অ্যাণ্ড্ ল্যাঙের 'ওডিসি' কবিতায় এ-ধরণের স্বপ্নবৎ বাস্তবের মিশ্রণ ঘটেছিল। কীট্‌স্ তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'লা বেল ডেম সেন্‌স মার্‌সি' কবিতায় বাস্তবকে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন একটু ঐতিহাসিক বুদ্ধি খাটিয়ে। স্বপ্নাবস্থায় কবি থাকেন না—স্বপ্নাবস্থা-টাকে ব্যবহার করেন শুধু। 'ধূধূ এক প্রান্তর' কথাটি বলে সেখানে আমি প্রেতের আবির্ভাব ঘটালেও কোনো বাঙালীর সংস্কার তাতে আপত্তি জানাবে না। তেম্নি অ্যাণ্ড্ ল্যাঙ জানতেন:

As one that for a weary space has lain

পংক্তিটি বলার পর *Lulled by the song of Circe* বল্‌লে তার অযৌক্তিকতা নিয়ে তর্ক উঠবেনা ইংরেজ কাব্যাস্বাদীদের মনে, যদিও সার্সি তাঁদের ইংল্যাণ্ডের ত্রিসীমানায় 'ওডিসি'র যুগেও মানায়না। ঠিক তেম্নি জীবনানন্দ 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে' কথাটির হাজার বছরী হাঁটার অযৌক্তিকতা আমাদের নিকট উপস্থিত করছেন যেহেতু তিনি জানতেন জন্মান্তরে যে আমরা বিশ্বাসী। আর, যাঁরা ঐতিহাসিক তাঁদের নিকট এই চরণভঙ্গী অবলীলায় হাজার-বছর আগেকার বাঙালী চর্য্যাপদের আচার্য্যদের বিচরণ-চিত্র যে এনে দিতে পারে, তা-ও নিশ্চয়ই এই জ্ঞানী কবি জানতেন। মোটের উপর ব্যাপারটা স্বপ্নে হাঁটা নয়। এরই নাম ন্যায়শাস্ত্রের 'জাষ্টিস্'। অযৌক্তিকতার সমর্থন।

এ-ধরনের স্বপ্নাত্মক কাব্যে, বলাবাহুল্য, কল্লোলের শাখায়িত কাব্য হুবহু সংবর্দ্ধিত হয়নি। *World losers and world forsakers* হয়ে অ্যাণ্ড ল্যাঙের মতো *Pale moon gleams*'-এ পাণ্ডুর

দেখাতে চায়নি সেই কাব্য শাখায় উদ্গত শক্তি। প্রেমেন্দ্র মিত্র মৃত্তিকায় যৌবনবন্দী উদ্দাম কবি এবং বুদ্ধদেব বসু যৌবন-বন্দী হলেও অলৌকিক আলোতে ঈষৎ-মুগ্ধ কবি। রজোগুণে ভরপুর প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছিল 'রাতের রাজা' হবার ঔপন্যাসিক কল্পনা আর বুদ্ধদেবের সাধ সাদাসিধে ননীর তনু নায়িকাকে 'কঙ্কাবতী' নামে উপাখ্যানের কঙ্কালী মেয়ে করে তোলা। তার মানে, স্বপ্ন-ভঙ্গী ম্লান প্রবাহে হলেও খানিকটা করে শাখাতেও রূপায়িত করেছিল কল্লোল-যুগের কল্পতরু।

এঁদের পার্থক্য আমাদের বিচারে এ-রকম: জীবনানন্দ কবি-সত্তায় প্রেমিক, বুদ্ধদেব প্রেমিক সত্তায় কবি আর প্রেমেন্দ্র মিত্র বিদ্রোহী সত্তায় কবি ও প্রেমিক। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মনোভঙ্গী সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকটা তুলনীয়। বুদ্ধদেবের দ্রোহ কদর্য্যতা ও স্থূলতার বিরুদ্ধে এবং এ মনোভঙ্গীতে তিনি জীবনানন্দের অনুষঙ্গী। প্রেমেন্দ্র মিত্র বা সুধীন্দ্রনাথ স্থূলতাবিরোধী নন। জীবনানন্দ ক্ষয়িষ্ণু সমাজের স্থূলতার বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে শেষ পর্য্যন্ত প্রেমের রাজ্য থেকেই যেন নিজেকে নির্ব্বাসিত করে ফেলেছিলেন। তার মনোনীতা নায়িকা বা নেত্রী 'নারী' কল্পলোকবাসিনী বা অতীতের ইতিহাসে সঞ্চারিণী। কিন্তু বুদ্ধদেব নারীকে 'কঙ্কাবতী'র সুরে বেঁধে রেখে তাঁর প্রেমিক চিত্তের প্রেম ও অপ্রেম অবাধে নিবেদন করেছেন। তাঁর প্রেমের দর্পণধারিণী সে কন্যা। ইংরেজ 'প্রি-রাফাএলিট' কবিবৃন্দের মতো প্রেমিকাকে নিয়ে যেন স্বর্গে-মর্ত্ত্যে বিচরণ করতে তিনি উৎসুক ছিলেন।

এ-ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর মনোভাব উইলিয়ম মোরিসের মনোভঙ্গীর সঙ্গে সমধিক সমতাপ্রাপ্ত। মোরিস বলেছিলেন:

Love is enough, though the world be a-waning." । বুদ্ধদেব তাঁর 'বন্দীর বন্দনা'র অধ্যায়ে বলছেন:

"অমৃতের অন্বেষণে ভালোবাসি, শুধু ভালোবাসি
ভালোবাসি—আর কিছু নয়।"

কিন্তু প্রি-রাফাএলিটের প্রাণময় ভালোবাসা বুদ্ধদেব অনুকরণ করেন নি। 'অমৃতের অন্বেষণ' অমরা পর্য্যন্ত তিনি করতে রাজি নন। মোরিস হারানো প্রিয়ার অন্বেষণে অমর অপ্সরলোকেও যেতে রাজি ছিলেন,

To seek the unforgotten face
Once seen, Once kissed, once reft..."

এই ছিল মোরিসের কামনা কিন্তু এমন প্রেমকামতা বুদ্ধদেবে নেই। এই কামতার পেছনে যে অবিনশ্বরতার স্পৃহা জাগ্রত তা ঈট্‌স্ ও জীবনানন্দে সুলভ। ভঙ্গুর প্রেমের দৃশ্যেও ঈট্‌স্ বল্‌ছেন:

"...From this night
Not a whisper, not a thought
Not a kiss nor look be lost,"

নারীর স্থূলতা-সম্পর্কে বিতৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও জীবনানন্দ 'মৃণালিনী ঘোষালে'র 'শব'কে স্বপ্নাতুর বাস্তবতায় মুড়ে এম্নি চিরন্তন করে গেছেন :

"……ম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো
এইখানে ; এইখানে মৃণালিণী ঘোষালের শব
ভাসিতেছে চিরদিন : নীল লাল রুপালি নীরব।"

মৃতের প্রেমিক-সত্তা কি ভাবে ফিরে আসে তার চিত্র লরেন্স যেমন তাঁর 'দি শিপ অব ডেথ'-এ দিয়েছেন অনেকটা তেমন ভাবে ভাবিত হয়েই বুদ্ধদেব উত্তরকালে তাঁর 'কোনো মৃতার প্রতি' কবিতাটি রচনা করেছেন। বিস্মৃতি মথিত করে তার আত্মা আসে—লরেন্স বলেছিলেন—এই তাঁর বলার নমুনা :

...the frail soul steps out, into the house again
Flilling the heart with peace.
Swings the heart renewed with peace
even of oblivion."

আত্মার উপর বিশ্বাস বা অবিশ্বাস এখানে বড়ো কথা নয়। কবির দৃষ্টিতে আত্মা মানে সত্তা। '*Custom of Soul*' হৃদয়ের ইচ্ছারজ্জুতে যে কেমন আবদ্ধ থাকে প্রেমিক চিত্তে, তা এজ্রা পাউণ্ড তাঁর ৩৬-সংখ্যক ক্যাণ্টোতে বিশদভাবে জ্ঞানসন্ধিৎসুদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। তেমন কবিত্বময় সত্তার নিয়ম প্রেমিকমাত্রেই বহন করেন। প্রেমিক-কবি বুদ্ধদেব ত বহন করেনই। তিনি প্রেমস্মৃতি কি রকম পাত্রে বহন করছেন তা তাঁর 'কোনো মৃতার প্রতি' কবিতাটি উদ্ধৃত করলে আমাদের বিচারের পক্ষে সুবিধে হবে।

কোনো মৃতার প্রতি

'ভুলিবোনা'—এত বড়ো স্পর্দ্ধিত শপথে
জীবন করে না ক্ষমা। তাই মিথ্যা অঙ্গীকার থাক।
তোমার চরম মুক্তি, হে ক্ষণিকা, অকল্পিত পথে
ব্যাপ্ত হোক। তোমার মুখশ্রী-মায়া মিলাক মিলাক
তৃণপত্রে, ঋতুরঙ্গে; জলেস্থলে, আকাশের নীলে।
শুধু এই কথাটুকু হৃদয়ের নিভৃত আলোতে
জ্বেলে রাখি এই রাত্রে—তুমি ছিলে তবু তুমি ছিলে।

এই মৃতা যদি ত্বগস্থিমাংসময়ী এ যুগের 'কঙ্কাবতী'-ও হয়, তাহলেও কবি তাকে তাঁর স্বকীয় অমৃতলোকে চিরন্তনী করে রাখছেন না। সে যেমন ছিল 'ক্ষণিক' তেম্নি শুধু 'এই রাত্রে' কবি তাঁর অস্তিত্বের অস্থি এনে হৃদ্‌পাত্রে রেখে দীপারতি করছেন। স্মৃতিমন্থন আছে, বিস্মৃতির বুকে শান্ত

দোলা-ও আছে, মৃতা সত্তার আবির্ভাবও ঘটছে কিন্তু লরেন্স যে অধিবাস-ভঙ্গী দিয়েছেন তার, তেমন ইঙ্গিত এ কাব্যখণ্ডে নেই। বরং বলব, এ কাব্যের রচনাকার সত্তাকে প্রকৃতির সত্তায় মুক্তি দিয়ে লরেন্সের উল্টো পথেই যেতে চাচ্ছেন। এ-সমাধি যেন আর্ষ বৈদিক পদ্ধতির। এ-সমাধিতে বুদ্ধদেবের চরিত্রোচিত ও তাঁরই কাব্যগত রূপ যদি আমরা আবিষ্কার করতে পারি তাহলে দেখা যাবে প্রকৃতি-পরায়ণ বুদ্ধদেব এই আপাত-ভঙ্গুর স্মরণকে অবিস্মরণীয় করে তোলবারও আয়োজন করেছেন। মৃতার 'মুখশ্রীমায়া'কে তিনি তাঁর চিরকাম্য বস্তু প্রাকৃতিক সত্তায় অর্পণ করছেন। প্রেম ও কবিতার চিরন্তন তর্পণ সমাধা করছেন; এই রাত্রি দেখানো সমাধির অর্চ্চনা তার কাছে তুচ্ছ।

এই সপ্তপদী কাব্যে সপ্তপদী হাঁটায় যে নিবিড় সখ্যরস বিতরিত তা 'হাজার বছর হাঁটা'র ফল স্বপ্নিলা 'বনলতা সেন' দান করে না। নাবিক উল্লসিসের মনে সার্সি যে মোহমায়া-জাল বিস্তার করেছিল কিম্বা মহানাবিক শ্রীকৃষ্ণের মনে রাধা যে পরকীয়া রসদীপ্তি এনেছিল, বনলতা সেন সেই ইন্দ্রজালের আলোছায়াগত প্রেমরসটুকু শুধু উপঢৌকন পাঠায় আমাদের মনের দ্বারে, তার চাইতে গভীরতর বিষয়ে মনোনিবেশ করায় না সাধারণত। জীবনের সঙ্গে এই ধরণের প্রেমের মিল কোথায় সে-জিজ্ঞাসা সাধারণত 'বনলতা সেনে'র পাঠকচিত্তে জাগ্রত হয় না। সেখানকার 'দু'দণ্ড শান্তি' দার্শনিক দৃষ্টিতে প্রস্থিত বলে কেউ বিচার করেন না। অবশ্য আমরা সে বিচার উপস্থিত করেই বলছি যে পরকীয়া এবং স্বকীয়া যে বিন্দুতে মিলে যায় সেই ক্ষণিকের স্থির বিন্দু নিয়েই 'বনলতা সেন' এবং 'কোনো মৃতার প্রতি' কবিতা দু'টি রচিত। কিন্তু বুদ্ধদেব ঢের বেশি শান্তির আয়োজন করেছেন এই সখ্যভাবগত বিন্দু-বর্ণনায়। শান্তরস যে সংযত প্রেম থেকে প্রবাহিত হতে পারে, 'বন্দীর বন্দনা'র কালেও বুদ্ধদেব সেই সংযত প্রেমের উপাসক বা প্রেমিক ছিলেন। বহুবল্লভা নারীর প্রতি আক্রোশ ছিল তাঁর যৌবনে কিন্তু সে-আক্রোশও কালের কঠোর স্রোতে ক্ষয়িত হয়ে গেছে 'কোনো মৃতার প্রতি'-রচনার সময়ে। মৃতা যদি বহুবল্লভা দ্রৌপদী-ও হয়ে থাকেন, তবু এ-সময়ে কবি দেখতে পাচ্ছেন যে দ্রৌপদীর শাড়ি 'অন্তহীন'—সে-শাড়ি কৃষ্ণাপ্রেমদ্রোহে এক-এক করে খুলে ফেলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই বাস্তব জ্ঞানে জ্ঞানী, স্থানকাল-পরায়ণ বুদ্ধদেব স্থৈর্য্যে ও সংযমে যে পরিশেষে শান্তরসের এমন একটি অনবদ্য নৈবেদ্য সাজাবেন তাতে বিস্মিত হবার কোনো কারণ নেই। আমরা বরং বিস্ময়বোধে অদ্ভুত রস পেতে সুরু করি জীবনানন্দের আশ্চর্য্য চর্য্যা পাঠ করে। স্থানকালপাত্রকে তিনি লোষ্ট্রবৎ ছুঁড়ে ছুঁড়ে চলেছেন। বিজ্ঞ দার্শনিকের ভঙ্গীতে তিনি বলতে জানেন : আমি কিছুই জানিনে। এমন ছুঁড়ে দেওয়া প্রেমেন্দ্রমিত্রের পক্ষেও সম্ভবপর হয়নি যিনি 'প্রথমা'র কালে মনে করতেন 'মাটির ঢেলা' পৃথিবী ছোঁড়াছুঁড়ির পালায় আবদ্ধ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাস্তব, বৈজ্ঞানিক ও রাজোগুণান্বিত স্বভাব নটরাজ মূর্ত্তিকে ধ্যান করেও প্রেমে বন্দী হতে জানত পুরাকালের রাজন্যদের মতো। মাটির ঘর তাঁর নিকট জীবনানন্দ-ভঙ্গীর উপেক্ষা পায়নি, এমন কি বুদ্ধদেব-ভঙ্গীর বিতৃষ্ণাও লাভ করেনি।

বুদ্ধদেবের এই কবিতাটির মনোভঙ্গী তিন ভাগে তিন নক্সার। প্রথম দু'টি পংক্তিতে তিনি প্রাণবাদী বা বাস্তববাদী। বিস্মৃতিকে মানব-মনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলে ধরে নিচ্ছেন। তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম পংক্তিতে তিনি স্মৃতি-প্রতিষ্ঠা বা প্রেতকৃত্য করছেন। কার মুক্তি তিনি চাচ্ছেন, সে প্রশ্নেই কাব্যান্তর্গত ব্যঙ্গ্যের সন্ধান মিলবে। স্বকীয়া মুক্তি কি পরকীয়া মুক্তি, তা-ই হবে কাব্য-

নারীর স্থূলতা-সম্পর্কে বিতৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও জীবনানন্দ 'মৃণালিনী ঘোষালে'র 'শব'কে স্বপ্নাতুর বাস্তবতায় মুড়ে এম্নি চিরন্তন করে গেছেন :

"......ম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো
এইখানে ; এইখানে মৃণালিণী ঘোষালের শব
ভাসিতেছে চিরদিন : নীল লাল রুপালি নীরব।"

মৃতের প্রেমিক-সত্তা কি ভাবে ফিরে আসে তার চিত্র লরেন্স যেমন তাঁর 'দি শিপ অব ডেথ'-এ দিয়েছেন অনেকটা তেমন ভাবে ভাবিত হয়েই বুদ্ধদেব উত্তরকালে তাঁর 'কোনো মৃতার প্রতি' কবিতাটি রচনা করেছেন। বিস্মৃতি মথিত করে তার আত্মা আসে—লরেন্স বলেছিলেন—এই তাঁর বলার নমুনা :

...the frail soul steps out, into the house again
Flilling the heart with peace.
Swings the heart renewed with peace -
even of oblivion."

আত্মার উপর বিশ্বাস বা অবিশ্বাস এখানে বড়ো কথা নয়। কবির দৃষ্টিতে আত্মা মানে সত্তা। '*Custom of Soul*' হৃদয়ের ইচ্ছারজ্জুতে যে কেমন আবদ্ধ থাকে প্রেমিক চিত্তে, তা এজ্রা পাউণ্ড তাঁর ৩৬-সংখ্যক ক্যান্টোতে বিশদভাবে জ্ঞানসন্ধিৎসুদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। তেমন কবিত্বময় সত্তার নিয়ম প্রেমিকমাত্রেই বহন করেন। প্রেমিক-কবি বুদ্ধদেব ত বহন করেনই। তিনি প্রেমস্মৃতি কি রকম পাত্রে বহন করছেন তা তাঁর 'কোনো মৃতার প্রতি' কবিতাটি উদ্ধৃত করলে আমাদের বিচারের পক্ষে সুবিধে হবে।

কোনো মৃতার প্রতি

'ভুলিবোনা'—এত বড়ো স্পর্দ্ধিত শপথে
জীবন করে না ক্ষমা। তাই মিথ্যা অঙ্গীকার থাক।
তোমার চরম মুক্তি, হে ক্ষণিকা, অকল্পিত পথে
ব্যাপ্ত হোক। তোমার মুখশ্রী-মায়া মিলাক মিলাক
তৃণপত্রে, ঋতুরঙ্গে; জলেস্থলে, আকাশের নীলে।
শুধু এই কথাটুকু হৃদয়ের নিভৃত আলোতে
জ্বেলে রাখি এই রাত্রে—তুমি ছিলে তবু তুমি ছিলে।

এই মৃতা যদি ত্বগস্থিমাংসময়ী এ যুগের 'কঙ্কাবতী'-ও হয়, তাহলেও কবি তাকে তাঁর স্বকীয় অমৃতলোকে চিরন্তনী করে রাখছেন না। সে যেমন ছিল 'ক্ষণিক' তেম্নি শুধু 'এই রাত্রে' কবি তাঁর অস্তিত্বের অস্থি এনে হৃদ্‌পাত্রে রেখে দীপারতি করছেন। স্মৃতিমন্থন আছে, বিস্মৃতির বুকে শান্ত

দোলা-ও আছে, মৃতা সত্তার আবির্ভাবও ঘটছে কিন্তু লরেন্স যে অধিবাস-ভঙ্গী দিয়েছেন তার, তেমন ইঙ্গিত এ কাব্যখণ্ডে নেই। বরং বলব, এ কাব্যের রচনাকার সত্তাকে প্রকৃতির সত্তায় মুক্তি দিয়ে লরেন্সের উল্টো পথেই যেতে চাচ্ছেন। এ-সমাধি যেন আর্ষ বৈদিক পদ্ধতির। এ-সমাধিতে বুদ্ধদেবের চরিত্রোচিত ও তাঁরই কাব্যগত রূপ যদি আমরা আবিষ্কার করতে পারি তাহলে দেখা যাবে প্রকৃতি-পরায়ণ বুদ্ধদেব এই আপাত-ভঙ্গুর স্মরণকে অবিস্মরণীয় করে তোলবারও আয়োজন করেছেন। মৃতার 'মুখশ্রীমায়া'কে তিনি তাঁর চিরকাম্য বস্তু প্রাকৃতিক সত্তায় অর্পণ করছেন। প্রেম ও কবিতার চিরন্তন তর্পণ সমাধা করছেন ; এই রাত্রি দেখানো সমাধির অর্চ্চনা তার কাছে তুচ্ছ।

এই সপ্তপদী কাব্যে সপ্তপদী হাঁটার যে নিবিড় সখ্যরস বিতরিত তা 'হাজার বছর হাঁটা'র ফল স্বপ্নিলা 'বনলতা সেন' দান করে না। নাবিক উল্লসিসের মনে সার্সি যে মোহমায়া-জাল বিস্তার করেছিল কিম্বা মহানাবিক শ্রীকৃষ্ণের মনে রাধা যে পরকীয়া রসদীপ্তি এনেছিল, বনলতা সেন সেই ইন্দ্রজালের আলোছায়াগত প্রেমরসটুকু শুধু উপঢৌকন পাঠায় আমাদের মনের দ্বারে, তার চাইতে গভীরতর বিষয়ে মনোনিবেশ করায় না সাধারণত। জীবনের সঙ্গে এই ধরণের প্রেমের মিল কোথায় সে-জিজ্ঞাসা সাধারণত 'বনলতা সেনে'র পাঠকচিত্তে জাগ্রত হয় না। সেখানকার 'ছু'দণ্ড শান্তি' দার্শনিক দৃষ্টিতে প্রস্থিত বলে কেউ বিচার করেন না। অবশ্য আমরা সে বিচার উপস্থিত করেই বলছি যে পরকীয়া এবং স্বকীয়া যে বিন্দুতে মিলে যায় সেই ক্ষণিকের স্থির বিন্দু নিয়েই 'বনলতা সেন' এবং 'কোনো মৃতার প্রতি' কবিতা ছু'টি রচিত। কিন্তু বুদ্ধদেব ঢের বেশি শান্তির আয়োজন করেছেন এই সখ্যভাবগত বিন্দু-বর্ণনায়। শান্তরস যে সংযত প্রেম থেকে প্রবাহিত হতে পারে, 'বন্দীর বন্দনা'র কালেও বুদ্ধদেব সেই সংযত প্রেমের উপাসক বা প্রেমিক ছিলেন। বহুবল্লভা নারীর প্রতি আক্রোশ ছিল তাঁর যৌবনে কিন্তু সে-আক্রোশও কালের কঠোর স্রোতে ক্ষয়িত হয়ে গেছে 'কোনো মৃতার প্রতি'-রচনার সময়ে। মৃতা যদি বহুবল্লভা দ্রৌপদী-ও হয়ে থাকেন, তবু এ-সময়ে কবি দেখতে পাচ্ছেন যে দ্রৌপদীর শাড়ি 'অন্তহীন'—সে-শাড়ি কৃষ্ণাপ্রেমদ্রোহে এক-এক করে খুলে ফেলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই বাস্তব জ্ঞানে জ্ঞানী, স্থানকাল-পরায়ণ বুদ্ধদেব স্থৈর্য্যে ও সংযমে যে পরিশেষে শান্তরসের এমন একটি অনবদ্য নৈবেদ্য সাজাবেন তাতে বিস্মিত হবার কোনো কারণ নেই। আমরা বরং বিস্ময়বোধে অদ্ভুত রস পেতে সুরু করি জীবনানন্দের আশ্চর্য্য চর্য্যা পাঠ করে। স্থানকালপাত্রকে তিনি লোষ্ট্রবৎ ছুঁড়ে ছুঁড়ে চলেছেন। বিজ্ঞ দার্শনিকের ভঙ্গীতে তিনি বলতে জানেন : আমি কিছুই জানিনে। এমন ছুঁড়ে দেওয়া প্রেমেন্দ্রমিত্রের পক্ষেও সম্ভবপর হয়নি যিনি 'প্রথমা'র কালে মনে করতেন 'মাটির ঢেলা' পৃথিবী ছোঁড়াছুঁড়ির পালায় আবদ্ধ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাস্তব, বৈজ্ঞানিক ও রাজোগুণান্বিত স্বভাব নটরাজ মূর্ত্তিকে ধ্যান করেও প্রেমে বন্দী হতে জানত পুরাকালের রাজন্যদের মতো। মাটির ঘর তাঁর নিকট জীবনানন্দ-ভঙ্গীর উপেক্ষা পায়নি, এমন কি বুদ্ধদেব-ভঙ্গীর বিতৃষ্ণাও লাভ করেনি।

বুদ্ধদেবের এই কবিতাটির মনোভঙ্গী তিন ভাগে তিন নক্সার। প্রথম ছু'টি পংক্তিতে তিনি প্রাণবাদী বা বাস্তববাদী। বিস্মৃতিকে মানব-মনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলে ধরে নিচ্ছেন। তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম পংক্তিতে তিনি স্মৃতি-প্রতিষ্ঠা বা প্রেতকৃত্য করছেন। কার মুক্তি তিনি চাচ্ছেন, সে প্রশ্নেই কাব্যান্তর্গত ব্যঙ্গ্যের সন্ধান মিলবে। স্বকীয়া মুক্তি কি পরকীয়া মুক্তি, তা-ই হবে কাব্য-

বিচারের জিজ্ঞাস্থ। এবং তা স্থনির্দ্ধারিত করতে হলে, ৬ষ্ঠ ও সপ্তম পদে এসে কবির হৃদগত সখ্যরসের ধ্রুপদী পরিচয় নিতে হবে, যদি ইতিমধ্যে আমরা সে-সম্পর্কে অজ্ঞান থেকে যাই। এ-কবিতার বাচ্যাতিরিক্ত ভাবের আয়োজন নজরে না পড়লে, কবিতাটি সহজ ও সাধারণ জ্ঞানে উপেক্ষিত হবে। কিন্তু যখন এর ব্যঞ্জনা-ক্ষমতা বা ব্যঙ্গ্য আমাদের অনুভবে ও উপলব্ধিতে আসতে স্থরু করবে তখন দেখতে পাব যে প্রত্যেকটি পংক্তির প্রত্যেকটি শব্দ স্থনির্ব্বাচিত হয়েছে ব্যঙ্গ্যকে ধ্বনিত করবার অভিপ্রায়ে। জীবনানন্দও শব্দ নির্ব্বাচনে তৎপর ছিলেন। তাঁর ভাষাকে অলঙ্কৃত বা অলঙ্কার-বর্জ্জিত করবার অভিপ্রায়েই প্রধানত সেই তৎপরতা নিয়োজিত হয়েছে। বাস্তবকে স্বপ্নাচ্ছন্ন করবার কৌশল বা স্বপ্নকে বাস্তবে নিয়ে আসবার ক্ষমতা তাঁর কতোটুকু তারই পরীক্ষা দিয়ে গেছেন তিনি বাংলাভাষা-ভাষীদের নিকট। বুদ্ধদেব বস্থ এ-পরীক্ষায় বসেন নি। প্রেমেন্দ্র মিত্র বরং এ-পরীক্ষায় এসে বসেছেন সম্রাটোত্তর 'ফেরারী ফৌজ' নিয়ে জল্পনার কালে। স্বপ্ন-ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে জীবনানন্দের সহমর্ম্মী হয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র আর শব্দ-ব্যঞ্জনা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব ও সুধীন্দ্রনাথ একই রকমের প্রযত্নশীল। তবে সুধীন্দ্রনাথের শ্রুতিতে শব্দাবলীর প্রাচীনত্ব ও নবীনত্ব সম্পর্কে কোনো বাছবিছার নেই—মূল অর্থ ও ধ্বনি সৌকর্য্যে শব্দসম্পদ পাংক্তেয় হয় তাঁর কবিতায়। স্বপ্ন-ব্যঞ্জনায়ও প্রাচীনত্ব ও নবীনত্বের বিচার বরদাস্ত করা চলেনা। কিন্তু বুদ্ধদেব শব্দ-সম্পর্কে প্রাচীনত্ব ও নবীনত্বের বিচার করতে ইচ্ছুক এবং তিনি নবীনতার পক্ষপাতী।

বুদ্ধদেব বস্থর পরিণতি আঁকাবাঁকা রেখায় হয়নি কারণ তিনি যাত্রা স্থরু করেছিলেন সহজ সরল রেখায়। সহজাত অলৌকিক আলোর আভা তিনি সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ ও পালন করেছেন। তাঁর বস্তুনিষ্ঠ মন 'দময়ন্তী'র যুগে একটু ভারি হয়ে উঠলেও 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র অধ্যায়ে তা ভারসাম্যে স্থির হতে পেরেছে। বুদ্ধদেব বস্থ যে এ-যুগের স্বতন্ত্র মানসিকতায় উজ্জ্বল একটি বৃত্ত তা চিনে নিতে আশা করি কোনো কবিতা-পাঠকের মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকেনা।

কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রকে তাঁর পরিণতির 'মৃত এক মহাদেশ' থেকে আবিষ্কার করা কঠিন, যেহেতু গোড়ায় তিনি 'জীবন-মহাদেবে'র নৃত্য-ভঙ্গীতে মুগ্ধ ছিলেন। মধ্য অধ্যায়ের 'শিব নীলকণ্ঠ' পাংক্তেয় কবিতার রস বা বিষামৃত মনস্তত্ত্বের এলাকার বস্তু। মনস্তত্ত্ব অতিমাত্রায় স্বাতন্ত্র্যপর। স্থতরাং জটিলতা এর পায়ের নূপুর। নূপুরধ্বনির স্থিরতা নেই। কখনো সহজ, কখনো জটিল, কখনো কঠোর এবং কখনো বা অস্পষ্ট। উপাখ্যান-উপন্যাস পাঠে ও ঘটনার ইতিহাসে আসক্ত হয়ে যে মনের যাত্রা স্থরু হয় তার রচিত কাব্যে উপন্যাস-গত মনস্তত্ত্ব অবাধ প্রবেশপথ লাভ করে। মেরিডিথ ও টমাস হার্ডির কবিতায় মনস্তত্ত্বের ছায়া ও দৃশ্যবিন্যাস উপন্যাস-সুলভ হয়েছে দেখা যায়। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার স্থানকালপাত্রপাত্রী অনেক ক্ষেত্রে মেরিডিথের 'লভ্ ইন্‌দি ভ্যালি' কবিতার ঘটপটাদি স্মরণ করায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কথা' কবিতার সুর টমাস হার্ডির প্রৌঢ়-প্রেমের মনোদৃশ্য বর্ণনার এ-কথাগুলো ধ্বনিত করে তোলে :

> *"Or is it only the breeze, in its listnessness*
> *Travelling across the wet mead to me here"*

প্রবীণ ঔপন্যাসিকের এই ক্রতোস্মর-মন্ত্রের কাতরতা মনে পৌছুলেই মনে পড়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কথা'র শব্দাবলী :

> "বৃষ্টি হয়ে গেলে পর
> ভিজে ঠাণ্ডা বাতাসের মাটিমাখা গন্ধের মতন"

একই রকম মনোযন্ত্রের তন্ত্রীলয়। কিন্তু এ-যন্ত্র হাতে নিয়ে গীতিকার হতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মনে কোনো যন্ত্রণার বাধা উপস্থিত হয়না। অত্যন্ত সহজ স্রোতে তিনি কথার ধ্বনি বইয়ে দিয়ে যান। নিজের মনোযন্ত্রের সঙ্গে পরিচয় যাঁর সমাপ্ত, সেই শিল্পী আপনার মনশ্চরিত্র ব্যাখ্যায় কার্পণ্য করতে পারেন না। তাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় তাঁর মনশ্চিত্র ও মনশ্চরিত্র অকপটে প্রসারিত হয়েছে। এই মনকে যাঁরা সহৃদয়তায় গ্রহণ করতে পারে, তাঁদের নিকট তিনি সমুদ্ভাসিত কবি। তাঁর হৃদিস্থিত 'নীল তারা' আর গৃহ-স্থ 'তিনটি জোনাকি' একই রকম আলো বিতরণ করবে সহৃদয়-মানসিকতায়। আকাশের তারায় যে তাঁর টেনিসন-সুলভ ভীতি আছে তা-ও কাব্য-পাঠকরা দেখতে পাবে তাঁর সম্রাট-অধ্যায়ের মনোভঙ্গীর গীতি শুনে। বাইরণের "আমরা যাবনা নৌকোবিহারে" কবিতার অথবা টেনিসনের 'কম্ ডাউন ও মেড' কবিতার *'Cease to move so near the Heavens'*—উপদেশ প্রেমেন্দ্র মিত্র 'ছাদে যেওনাকো' কবিতায় হুবহু মেনে চলেছেন কিন্তু জীবনানন্দ 'সুরঞ্জনা' কবিতায় এই উপদেশের বিপরীতগামী মনোভঙ্গী প্রকাশ করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র ভূমি ছাড়তে রাজি নন আর জীবনানন্দ 'নক্ষত্রের রুপালি আগুন' ছাড়তে গররাজি। যদিও তাঁরা উভয়েই 'স্বপ্ন' দেখতে চান, প্রেমেন্দ্র মিত্র মৃন্ময়ী পুতুল ও প্রতিমার চাইতে বেশি কামনা করেন না—জীবনানন্দের 'নারী' তাঁর স্বপ্নের দ্যুতিতে নেই। তবে 'ফেরারী ফৌজে'র অধ্যায়ে পৌছিয়ে সম্রাটধ্যায়ী কবি যে মৃত 'মহাদেশে' দেখছেন, তাতে পুতুল ছাড়া প্রতিমা পাবেন কি না সন্দেহ। প্রতিমা খানিকটা আকাশ-চারিণী। মৃত্তিকাসক্তি প্রতিমার অবয়ব-গঠনে সমর্থ কিন্তু তাতে অলৌকিক প্রাণময়তা দান করতে হয়ত সমর্থ নয়। শেষ 'আবিষ্কার'-এ তিনি বল্‌ছেন :

> "মৃত সেই মহাদেশ
> আর বার করি বিচরণ
> একটি পুদ্গল বীজ করিতে বপন।"

মরা মাটির ইচ্ছা-শক্তির সীমা কতোটুকু তা আমাদের জানা নেই বলে এই বীজের অলৌকিক ফলাফলও মনে অজ্ঞাত। মৃত মহাদেশের পুত্র কোন্ জনকের কোল আলো করবে তা-ও আমরা জানিনে। তবে কবি হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে রজোগুণী, আদর্শশীল ও আশাবাদী বলে স্বীকার করব।

কিমাশ্চর্য্যম্

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য

"সুন্দর জামাই করব, উচ্চশিক্ষিত জামাই করব।" কি যে শখ সুবাসিনীর! নিজে শিক্ষিত পরিবারের কন্যা, সুন্দরী, কিন্তু রূপার অভাবে অশিক্ষিত, অসুন্দরের হাতে পড়িতে হইয়াছে। হিন্দু ঘরের মেয়ে মানাইয়া চলিতেছেন বটে কিন্তু মন কোন দিন ইহাতে সায় দেয় নাই। তাই সব থাকিয়াও তিনি বড়ই একা, পুত্র হয় নাই। তিন কন্যা। নিজের না পাওয়ার ব্যথা কন্যাদের পাওয়ার মধ্য দিয়া উপশম করিতে চান।

মেয়ে তিনটি মাথায় মাথায়। ছোট হইতেই মায়ের দৃষ্টি ইহাদের উপর তীক্ষ্ণ। নিজের বলিতে কিছুই রাখেন নাই সুবাসিনী। তিন জনের পিছনে গানের, নাচের, লেখাপড়ার মাষ্টার রাখিয়া এবং নিত্য-নতুন গহনা কাপড়ের ফরমাস দিয়া স্বামী সুশান্তকে অশান্ত করিয়া তুলিতেছেন।

"মেয়ে সন্তান বিয়ে দিয়ে দোব, পরের বাড়ী চ'লে যাবে, তার জন্যে এত খরচ কেন বাপু? বলি, বিয়ের সময়ও তো সেই এক কাঁড়ি ঢাল্তে হবে? না অমনি পার হবে?" কতবার ঠোঁটের ডগায় আসিয়াছে সুশান্তের—কিন্তু শিক্ষিতা সুন্দরী স্ত্রীকে রীতিমত সমীহ করিয়া চলেন তিনি। নিজের বিদ্যা ও সৌন্দর্যের অভাব স্ত্রীর মৌন উপেক্ষায় আরও প্রকট হইয়া ওঠে তাহার মনে।

সুশান্তের বন্ধুরা হয়ত বলেন, "কিরে শান্ত, মেয়েদের জজ ব্যারিষ্টার, না খেমটাউলি করবি? গেরস্ত ঘরের মেয়ে সব, এ সব কি?"

শান্ত ছোট্ট করিয়া বলেন, "ওদের মায়ের ইচ্ছা।"

"সে জানি, তুই যে প্রকটা ভেড়ারাম এক নম্বরের তা তো সবাই জানে—আরে মেয়েদের অত আস্কারা দিতে নেই, পরে পস্তাবি দেখিস্।" আসন্ন পস্তানোর আশংকায় বোধহয় শান্তর মুখ-খানি কেমন কেমন হইয়া যায়। মনে মনে ভাবেন আজই স্ত্রীকে কিছু বলিবেন—কিন্তু সেদিন তাহার সহিত দেখা হইতেই সুবাসিনীর প্রথম কথা—

"দ্যাখো, তিতুর তো পরীক্ষা হ'য়ে গেল। এবার একটু আনন্দ করবার সুযোগ ওকে দেওয়া উচিত তাই বাড়িতে একটু পার্টিটার্টি দেওয়া দরকার।" কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া অনেক সাহস সঞ্চয় করিয়া বলেন সুশান্ত, "ওসব আমাদের চোদ্দপুরুষে হয়নি—ওসব হবে না।"

"তোমাদের চোদ্দ পুরুষে তো অনেক কিছুই হয়নি—কিন্তু এখন হবে।"

অমোঘ বাণী। ইহাকে নাকচ করিবার সাহস সুশান্তর নাই—তবু একবার ক্ষীণ স্বরে বলেন, "লেখাপড়া তো অনেক হ'ল এবার একটি পাত্তর দেখে—"

মাঝ পথেই বাধা দিয়া দৃঢ়বদ্ধওষ্ঠে বাঁকা হাসির আভাস আনিয়া বলেন সুবাসিনী, "সে ভাবনা আমার, তোমার নয়।"

অগত্যা—চৌদ্দপুরুষে না হইলেও পার্টি, বন্ধুবান্ধব বেশ জমিয়া উঠিল ক্রমে সুশান্তর গৃহে।

তিতু ওরফে তিতলী সুবাসিনীর কন্যা হইলেও চেহারায় সুশান্তর ধার ঘেষিয়া গেছে—তবু শিক্ষা, সাজসজ্জা, সর্ব্বোপরি বিত্ত সে দোষ অনেক খানিই ঢাকিয়া রাখিয়াছে—লোলুপ মধুপের সংখ্যাধিক্যই তাহা প্রমাণ করে। কিন্তু লোলুপ হইলেই গুঞ্জন করা যায় না সুবাসিনীর দরবারে। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, সমৃদ্ধি, শিক্ষা, আভিজাত্য-গেটপাশ চাই।

প্রতিযোগিতায় রায় বাহাদুর নীরদ বিজলীর পুত্র কমলকোরক ওরফে কোরক লাহিড়ীই পরিল বিজয় মুকুট। এবং এই সম্মান চিরস্থায়ী করিতে এতটুকু গাফেলতি দেখা গেলনা তাহার মধ্যে। তিতলী সুবাসিনী তো বটেই সুশান্তও তৎপর হইয়া উঠিলেন। বন্ধুদের ঠাট্টা বিদ্রূপ গায়ের কাপড় করিয়াই কোরককে প্রস্ফুটিত কমলে রূপান্তরিত করা যায় কী উপায়ে সেই চিন্তা ও কার্য্যে নিমগ্ন রহিলেন।

"ওদের দুজনকে দেখে দেখে আমার আশ মেটে না—সমস্ত মন ভ'রে যায়, যেন মনে হয় ও তিতু নয় আমি," কতবার মনে মনে বলেন সুবাসিনী।

মেজ মেয়ে কুহু আর ছোট মেয়ে পিউ বলে, "মা তিতু-তিতু আর কোরক-কোরক ক'রে গেল, আমাদের কথা আর মনেই থাকে না।"

উত্তরে মা হাসেন শুধু।

সেদিন সুশান্ত বলিতেছিলেন, "আচ্ছা, তুমি ওদের একটু একলা থাকার সুযোগ দাওনা কেন? ওরাও তো নিজেদের মধ্যে কিছু বলতে চায়?" স্তব্ধ হইয়া যান সুবাসিনী—তারপর স্বভাবসিদ্ধ বাঁকা হাসি হাসিয়া বলেন, "ভূতের মুখে রাম নাম!" এতটুকু হইয়া যান সুশান্ত।

অধিকার কায়েমী না করিয়া স্বত্ব ছাড়িবার পাত্রী হয়ত সুবাসিনী নহেন, তাই এত সতর্কতা।

পুকুরের জল দাগ কাটিয়া পৃথক করিবার চেষ্টাকে বাতুলতা ছাড়া আর কি বলা যায়। তাই সুবাসিনীর ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় কোরক ও তিতলীর সুযোগ আসিয়া যায় বৈকি।

এমনই একদিন সন্ধ্যায়—ছোট মেয়ে পিউ-এর বন্ধু জয়ী আসিয়াছে—সতর্ক হইয়া যান সুবাসিনী, কোরকের দৃষ্টিপথে পাছে পড়ে সে—রূপের চটকে। বলনে চলনে অনেক পিছনে তাঁহার মেয়েরা জয়ীর কাছে। "চলমা, চলমা, ওপরে বস্বে,"—ড্রইংরুমে প্রবেশোদ্যত জয়ীকে প্রায় ঠেলিতে ঠেলিতে লইয়া যান তিনি উপরে, "কতদিন তোমায় দেখিনি, গল্প করব দুদণ্ড।"

"চলুন মাসীমা, সেই ভাল," মাসীমার স্নেহের স্পর্শে বিচলিত হইয়া বলে জয়ী।

আধঘণ্টা ধরিয়া বকিয়াও তাহার উঠিবার লক্ষণ দেখা যায় না—মন ওদিকে পড়িয়া আছে ড্রয়িং রুমে। অগত্যা জয়ী ও পিউকে রাখিয়া কোরক ও তিতলীকে লইয়া সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়া যাইবার জন্য নামিয়া আসেন তিনি। দ্বারে ভারী পর্দা ফেলা—ঠেলিয়া ঢুকিতে যাইবেন শুনিলেন, হাসিতে গলিয়া পড়িয়া কথা বলিতেছে দুইজনে। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল জীবনে এমন হাসি তিনি কখনও হাসেন নাই। সামনের দেওয়ালে টাঙানো লম্বা আয়নায় নিজের ছায়া পড়িয়াছে। আজও কত

সুন্দর তিনি। কালোপাড় শাদা শাড়ীতেই এমন মানাইয়াছে যে নিজেরই তাকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। এত রূপ! তিতলী হইলই বা তাঁহার কন্যা, কিন্তু এই রূপের একাংশও কি আছে তাহার মধ্যে? সমস্ত মনটা কেমন জ্বালা করিয়া ওঠে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন সুবাসিনী। ভিতরে হাসি তখনও সমানভাবে চলিয়াছে। দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলেন "কী বেহায়া!"

দ্বারের পর্দ্দা সরিতেই তিতলী ও কোরক স্বস্থানে ফিরিয়া যায়—মুখে ফুটিয়া ওঠে সলজ্জ মাধুর্য্য।

গম্ভীর ভাবে বলেন সুবাসিনী, "ওমা, আপনি এখনও রয়েছেন? আমি ভেবেছি চলে গেছেন!" কোরক অবাক্ হইয়া স্মৃতির সমুদ্র হাতড়াইতে থাকে ইনি পূর্ব্বে কোনদিন 'আপনি' বলিয়াছেন কিনা—

"ভালই হ'য়েছে, একটা কথা বলা হয়নি আপনাকে, তিতুর বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে শোনেননি বোধহয়? ওর শরীরটা বিশেষ ভালনা, তাই কালই ওকে নিয়ে একটু চেঞ্জে যাচ্ছি আমরা। আচ্ছা নমস্কার, আসুন তাহ'লে।"

চিত্রার্পিতা তিতলীর হাত ধরিয়া প্রায় টানিয়াই বাহির করিয়া আনেন সুবাসিনী একেবারে সুশান্তের ঘরে—

"হ্যাগা, সেই ঝাঁপড়দার অনুকূল গাঙ্গুলির মেজ ছেলের কথা বলেছিল না ঠাকুরঝি, ব্যোমকেশ না কি নাম, গোবিন্দপুরের ইস্কুলে মাষ্টারী করে? দেখো, আসছে মাসেই তিতুর বিয়ে দেওয়া চাই তার সঙ্গে।"

হাঁ হইয়া যান সুশান্ত।

আর্য্যপিতা হোরা

"যাহোক তাহোক ধন্যবাদ" বলে ধনি
ফিরায় বদন আর তপনের তাপে দোলে ফুল
ফাঁসে ম্লান হলে তা'রা এসে তুলে সরায় পবন,
সে-ও দ্রুত চলে যায় পাশ থেকে। ঠিকই যা' হোক
একটি প্রহর ছিল দিবালোকে এবং দেবতা
সবিশেষ যাঁরা কেউ এর চেয়ে গর্ব্বের বিষয়
হয়ত দেখেনি: চলে গেল সেই প্রহর যেমন।

॥ এজ্রা-পাউণ্ড ॥

কবিতাগুচ্ছ

সে

সুধীরকুমার গুপ্ত

খুঁজেছি অনেক তাকে এক মন থেকে অন্য মনে;
ধূসর স্মৃতির ভিড়, অযুত প্রশ্নের কলরব,
হাসির পিছনে থেকে অশ্রুসিক্ত কাহিনীরা সব
আমাকে নিয়ত বেঁধে রাখে।
কোথা সেই পলাতকা ক্ষণ—
মুখোমুখি দুটি মনে সে আকাশ একান্ত নির্জ্জন?

যখন ডেকেছি নাম ধরে,
শিরা ও ধমনী বেয়ে উদ্বেলিত রক্তের প্রবাহে
যে খুসীর ঢেউ ওঠে জেগে,
মনে হয় সে ঢেউয়ের দুর্নিবার দোলাতে কোথাও
অন্য এক রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার স্পর্শ আছে লেগে।
বিহ্বল চেতনা থেকে দিবসের রং নিভে আসে
আর এক রাত্রির দীর্ঘশ্বাসে।

জানিনা তো কোথা সে সময়
একটি পলকে যার যুগান্তের দৃষ্টি বিনিময়।
আয়ুর পরিধি থেকে নানা স্বপ্ন, সাধ, আকুলতা
বিচ্ছিন্ন কাহিনী রচে; হৃদয়ের আছে কি ক্ষমতা
নির্ম্মম জটিল গ্রন্থি সব খুলে ফেলে একে একে
একদিন জীবনের অসহায় বিশৃঙ্খলা থেকে
খুজে পাবে এইসব স্বপ্ন, সাধ, আকাঙ্ক্ষার তল?
সৃষ্টির ব্যথা কি পাবে সত্তা এক সূর্য্যকরোজ্জ্বল?

অনেক স্তব্ধতা আর কোলাহল নিয়ে এ হৃদয়
তবুও একাকী হয়ে রয়।
হেঁটেছি কত না পথ, অগণিত দেয়ালে, সিঁড়িতে

নানা আশা প্রয়াসের বোঝাপড়া সাঙ্গ করে নিতে
কেটে গেছে কত ক্লান্ত দিন—
আরো কত দীর্ঘ রাত নিরুত্তাপ সংশয় কঠিন।

জেনেছি অনেক দুঃখ, তবু সেই দুঃখে যাতে মন
জাগে সর্ব্বনাশা ক্ষোভে অরণ্যের ঝড়ের মতন
রুদ্র দাবদাহের শিখাতে,
হৃদয় পায়নি আজো; অবুঝ আগ্রহে, ধারণাতে
নিজের যা প্রয়োজন স্থির করে নিয়েছে হৃদয়
আর এক আগুনে যেন সঁপে দিতে হবে মনে হয়।
সব মোহ মুছে গেলে, সব অশ্রু ঝরে গেলে তবে
হৃদয় হয়তো ওই আকাশের মত স্বচ্ছ হবে।
তখনো সেখানে সে কি রৌদ্র, প্রেম, বসন্তের রাত
আমার হৃদয় থেকে তুলে নিতে বাড়াবে না হাত?

একা-একা

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

আমি একা-রাত্রির মত মৌন নিঃসংগ হৃদয়।
কি দিয়েছি, কী চেয়েছি কবে কার কাছে
আজ তার কিছু আছে, কোনো দাম আছে?
অতীতের মৌন-গুহা খুঁড়ে কিছু পাওয়া যাবে। নিছক সময়

ক্ষয়িয়ে দেওয়াই হবে সার।
তার চেয়ে এই ভালো, বেশ আছি। ক্লান্ত নদী। সুনির্জন রাত্রি। অন্ধকার।

কিছুই দিইনি

অরবিন্দ গুহ

সমস্ত দুপুর অন্ধকার,
আজ মেঘ জুড়ে আছে আকাশের এপার-ওপার।
তোর সঙ্গে নগরের অন্ধকারে হাঁটি,
তোর শরীরের পটে এঁকে রাখি আমার ছায়াটি।

তুই ভুলে যাবি কিন্তু আমার চিন্তায় অদ্বিতীয়
এ-দুপুর—তুই আজ অপরূপ, অনির্বচনীয়।

সমুদ্রসম্ভার নিয়ে যে-মেঘ আকাশে উপনীত,
তারই এক খণ্ডে তোর শরীরের সর্বস্ব রচিত।
তোর প্রাণে অবিকল বৃষ্টির বিষণ্ণ মধুরিমা,
তোর রক্তে বিদ্যুতের উজ্জ্বল মহিমা।
ইচ্ছার পরিধি আমি নির্জনে সঙ্কীর্ণ ক'রে আনি;
তোর কণ্ঠে উঁকি দিলো রবীন্দ্রনাথের বনবাণী।
আমি শূন্য, আমি ব্যর্থ। মনে-মনে ভাবি—
আমার উপায় নেই। তুই কেন সব ছেড়ে যাবি?
যাকে তোর ভালো লাগে, যে তোকে যথার্থ ভালোবাসে—
সব ছেড়ে কেন তুই ফিরে যাবি দুঃসহ আকাশে।

চল, ফিরি। সাঙ্গ হ'য়ে এসেছে গোধূলি।
তুই চ'লে গেলি। আমি নিজের শরীর এনে তুলি
বিপরীত পথে। বাড়ি যাবো। কোনদিক?
আপন ছায়াকে নিয়ে যাত্রা করে পুরোণো পথিক।
আপন ইচ্ছার মুখোমুখি
হই—হায়, আমিও যে তোর মতো অসুস্থ অসুখী।

যা দেবার প্রতিশ্রুতি ছিলো, আমি তার
কণামাত্র দিতে আজো পারিনি। আকাশে অন্ধকার
নিরুপায় মেঘ আজ অকস্মাৎ সব লজ্জা ভোলে—

কিছুই দিইনি বেঁধে তোর স্নিগ্ধ, সুন্দর আঁচলে॥

একটী স্কেচ

প্রমিত বসু

ছোটো এক ফুল
হাওয়ার ঢেউএ দোলে;
একফালি চাঁদ—
তিনটি জোনাকি,
পথ খুঁজে হোলো সারা;

ছায়ার ঝিনুকে
তিনটি সোণালি তারা।
মিহি আলো ছোঁয়া,!
থাকতো যদি সে আশা—
পাবো ঠিক তার ;—
একমুঠো ভালোবাসা।

মেঘলা মন
বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়

মেঘলা মনের কান্না শেষ হয়না কো।

বেশ, যদি তুমি চাও তা'ই নিয়ে থাকো
নির্জন মনের দাও অবেলায় ছুটি,
তাহলে শিথিল হোক স্মৃতির ভ্রূকুটি।

এ-মেঘ কাঙাল কেন, কেন খালি চায়
যা' পায়নি কোনোদিন, কোনোদিন যা' পাবার নয়
তারি পাশে ঘুরে ঘুরে মৌমাছ-স্বরে গান গায়
কেন তার মিছিমিছি চায় পরিচয়!
কেন সে এ-কথা রোজ ভোলে
আমাদের মাঝখানে অনেক আড়াল মাথা তোলে
প্রতিদিন দুচতুর হয়
মাঝখানে ব্যবধান—অবুঝ সময়।
চোখের কাজল-ধোয়া কান্নার জল
জানোনা এখানে নিষ্ফল?
করুণ চোখের কোলে ক্লান্তি, নিরাশা
ফোটায় না কারো মুখে সান্ত্বনার ভাষা,
হয়না কঠিন রেখা মোলায়েম জেনো।

মেঘলা মনের কান্না কেন?

চপল আঙুলগুলি চাপা অনুরাগে
জানালার পর্দায় কেন আজো কাঁপে?

মেঘলা মনের কোণে ঝাপসা আকাশে
ঝিরঝিরে হাসি নিয়ে কে আসে, কে আসে!
অতি চেনা সুরভিত কার নিঃশ্বাস?
চাপা ঘরে ছেড়ে দিয়ে করো পরিহাস।
কঠিন দেয়ালে আঁকি যত আঁকিবুঁকি?
ভুলতে চেয়েছি যাকে দিয়ে যায় উঁকি
ঘসা আয়নার মতো একখানি মুখ……
থামাও থামাও বন্ধু শ্লেষ, কৌতুক।

নির্জন মনের হোক অবেলায় ছুটি
শিথিল করুক স্মৃতি অকরুণ মুঠি
মুছে যাক সীমারেখা, একূল ওকূল;
মেঘলা মনের কোণে আকাশকে ছুঁয়ে
এবার পড়ুক তবে ঝ'রে ঝ'রে ভুঁয়ে
এক রাশ শাদা যুঁই—কুঁড়ি আর ফুল!

জনান্তিকে
পবিত্র সরকার

জানলার পাশে একফালি মেঘ হঠাৎ থমকে ভাবছে;
পেলনা পেলনা তবু নাম তার, খাতা রয়ে গেল শূন্য।
কপাটের 'পর তিনটে চড়াই (তিনটে চড়াই জ্যান্ত)!
হঠাৎ ফসল-পিঙ্গল রোদ হলুদ দেয়ালে পিছলায়।

জানলার পাশে একফালি মেঘ হঠাৎ থমকে ভাবছে;
পাইনি পাইনি এখনো সে নাম, খাতা পড়ে আছে শূন্য।
কিচমিচ করে তিনটে চড়াই পিঙ্গল রোদ মাখছে—
ইটের পাঁজার মাঝখানে থেকে পাক খায় নৈঃশব্দ।

একটা উদাস ঘুঘু বার বার ভেঙে পড়ে মৃদু কান্নায়;
তিনটে চড়াই লাখো চড়ায়ের দলে মিশে গেল চুপচাপ,
পাইনি পাইনি তবুও সে নাম, পেছনে তাকিয়ে দেখতেই—
অদ্ভুৎ এক নীল পটভূমি, কখন মিলালো মেঘটা!

পুরানো

শামসুর রহমান

পুরানো, কেবলি পুরানো।
যত কথা ফোটে তারার মতন অলক্ষ্যে এই
নিরিবিলি মনে, বাতি জ্বেলে একা জানলার পাশে
দাঁড়ানো আকাশে হাউই উড়ানো, অথবা যা বলি
একান্ত নিজে (ভাবি সে আমারই) তবু কী-যে হয়
পুরানো যে তা-ও পুরানো।

পুরানো শুধুই পুরানো।
অভিনব কত পরিভাষা খুঁজি, .
যেই গান ধরি অজানার টানে,
দুপুরে নদীর আঁকাবাঁকা জলে হঠাৎ মাছের
ঝল্‌সানি আর গ্রামান্তে কোনো বেলা-নেমে-আসা,
রাত্তিরে খাটে অঘোরে ঘুমানো
ভোরে যে কবিতা জন্ম লগ্নে গুঞ্জন তোলে
ভাবি সে-নতুন আমারই এবং
সুদূর মদির দু'জনের রাত, ক্ষুধার করাত—
পুরানো সে-ও তো পুরানো।

পুরানো কেবলি পুরানো।
বর্ষার ঝড় জলের ভয়ের ছায়া রেখে মনে
প্রাণপণে ঐ শাদা দেয়ালের পিঁপড়ে-সারির
বার্তা রটানো রসদ জোগানো,-
দরজার খিল খুলে সচকিত কোনোদিন কারো
অবিশ্বাস্য হাসি আর রাঙা শাড়ির আঁচল
দেখার ভাগ্য, ডালের পাখির ফল-ঠোক্‌রানোর,
নিবিড় তরুণ বিশ্বাসী সুর, ঈশ্বরহীন ভবঘুরে প্রাণ,
বিবর্ণ কোনো মৃত্যু-শিয়রে নীরবে দাঁড়ানো,
অন্য প্রাণের জন্মদিনের উৎসবে দীপ জ্বালানো কখনো:
পুরানো শুধুই পুরানো॥

আমার সংসার

বটকৃষ্ণ দে

দেয়ালে রবীন্দ্রনাথ, পড়ার টেবিলে বই কিছু,
ঠোঁটে হাসি, চোখে জল, আনন্দে-ও ফল্গু-অশ্রুভার
বুকে নিয়ে ঘর করি—এ আমার নিত্যের সংসার
টুকিটাকি পুতুল পার্বণ! এরি মধ্যে দিন পিছু
ছোট সুখ, ছোট দুঃখ। আর তুমি আছ, এরই মাঝে
স্মৃতি-বেদনার পদ্মের সৌরভে। বড়ো এসে বাজে
ছিন্ন দিন, বিদীর্ণ বীণায় বাজে বেসুরোর সুর,—
আমার ব্যথায় ভরা এ-সংসার তবু-ও মধুর!

এ সংসার ভ'রে দিতে একদিন তুমি-ও তো ছিলে!
(মনে পড়ে?)—আর তুমি আসবে না! ভীরু ভালোবাসা
— দরিদ্র দিনের দান!—রাত্রিতে একটু-ও আলো-আশা
আনবে না। অথচ একদা জানি, আকাশের নীলে
স্থির-চক্ষু দৃষ্টি মেলে প্রতিশ্রুত নক্ষত্রের নামে
সংসারের নিয়েছো শপথ। তাই তোমারি ধেয়ানে
স্মৃতির খেয়ার পারে যে-যাত্রীর যাত্রা এসে থামে,
তাকে, কী আশায়!—ভাবি, তুমি বুঝি! কিন্তু, কোনখানে?

এ-ও মিথ্যে স্বপ্ন জানি! দুরাশার শীর্ণ সরোবরে
আমার শ্রাবণ আর মনোগন্ধ মৌসুমী-বাহার
ফোটাতে পারে না। প্রজ্ঞা তোমার অপরূপের রূপ
আঁকবে না। জাগৃতির ধ্যানে তুমি আসবে না। ধূপ
পুড়ে-পুড়ে ছাই হবে। অস্ত-তূণ মৃগ-অভিসার
শেষ হবে। আর আমি বর্ষার বিমর্ষ হাহাকারে
দুই চক্ষু বর্ষা নিয়ে ফিরে আসি, আমার সংসারে!

দেয়ালে রবীন্দ্রনাথ। পড়ার টেবিলে কিছু বই।
অশ্রুধার-ধারাসারে তবু ফল্গু-আনন্দ অথই।
তুমি নেই। আসবে না। ক্ষতির শাশ্বতী হয়ে পার,
অনুভবে দেখা দেয়—মধুমান আমার সংসার॥

গড় শ্রীখণ্ড

অমিয়ভূষণ মজুমদার

[পূর্ব্বানুস্থৃতি]

মাধাই ফতেমার কথা ভাবছিল। এমনি তাদের যাওয়া আসা। অন্যান্যবার যাব এ কথাটাও মাধাইকে বলে না যারা এবার তবু একবার অনুমতি নেবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল। দীর্ঘদিন ধ'রে এ ব্যাপারটা ঘটেছে কিন্তু এমন ফাঁকা বোধ হয়নি মাধাই এর।

ভাষায় পৌঁছে দেবার মতো অনুশীলিত মন হয় মাধাইএর, তথাপি মাধাই যা ভাবল সেটা কতকটা এই রকম: পরের জন্যে করা নয়, না ক'রে পারে না ব'লেই ফতেমা এমন ক'রে পরের জন্যে উদ্বিগ্ন। কথাটা শ্বশুর বটে কিন্তু কি করেছে শ্বশুর তার জন্যে, আহার আশ্রয় কিছু সে দেয় নি। শোকে সান্ত্বনা দূরের কথা। ঠিক এজন্যেই ফুলটুসির ছেলেদের জন্যে এমন আকুল হ'য়ে ওঠে ফতেমা। যদি মাধাই বলত তোমাকে ছাড়া আমার চলেনা ফতেমা, হয়তো সে বাকি জীবনটা মাধাইএর সুখ সুবিধার ব্যবস্থায় কাটিয়ে দিতে পারে।

সুরতুন এসে যখন ডাকল তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। সুরতুন বললে,—ভাবি ক'লে—লাকড়ি নাই।

—আজই যাওয়া লাগবি। ব'লে মাধাই উঠে দাঁড়াল। ফতেমা কবে আসবি কইছে?

—না, তা কয় নাই। যে কয়দিন না আসবি আমাকে তোমার রাঁধাবাড়া করবের কইছে।

কিছুক্ষণ বাদে মাধাই দা, লাঠি, দড়িদড়া নিয়ে লাকড়ি আনবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়াল।

—তাইলে তুই থাকবি আজ? বাজারে যাবি? রান্নার কি আছে তা ও আমি জানি নে।

—ভাবি কলে কিছু লাগবি নে আজ। একটা কথা কব? লাকড়ি আনবের বাঁধে যান?

—হয়।

—চান করিনে অনেকদিন। কন তো আপনার সঙ্গে যাতাম।

—তা চল। না হয় লাকড়ির বোঝা তোর মাথায় চাপায়ে দেব নে, কিন্তু অবেলায় চান করবি?

সুরতুন কিছু না ব'লে দরজায় কুলুপ এঁটে চাবিটা মাধাইএর হাতে দিয়ে তার পেছন পেছন হাঁটতে লাগল।

পদ্মার তীরে বাঁধ একটি নয়, তিনটি। প্রথমটি জল ঘেঁসে—চাঁই চাঁই পাথর মোটা মোটা তারের জালে বাঁধা। তার পেছনে প্রায় চার পাঁচ হাত উঁচু বাঁধ, তারও পেছনে তৃতীয়টি, প্রায় ছোটখাট একটি পাহাড়ের মতো। দ্বিতীয় বাঁধের মাথায় ও তৃতীয়টির পায়ের কাছে একটি অধিত্যকা। এই অধিত্যকাটুকু সুধু ঘাসে ঢাকা নয়, বাবলা, খেজুর, ঝাউ বনে ভেসে আসা কলাগাছ, কাশে মিলে ছোটখাট একটা জঙ্গল সৃষ্টি করেছে। সে জঙ্গলে, খ্যাঁকশিয়াল থাকে, খরগোস, বুনো কাছিম, দু'এক জাতের বকের খোঁজও পাওয়া যায়। জঙ্গলের মধ্যে ছোট ছোট খাদ চোখে পড়ে। বর্ষায় প্রথম

বাঁধ ছাপিয়ে দ্বিতীয় বাঁধের মাথার উপর দিয়ে তৃতীয়টির গোড়ায় গিয়ে লাগে। বর্ষার পর পদ্মার জল সরে গেলে এই খাদগুলি জলাশয়ের মতো দেখতে হয়। শরতের কাছাকাছি এসে বেশীর ভাগ খাদগুলি শুকিয়ে যায়, দু'একটায় থাকে, এবং সে জলের ময়লা টল্‌টল্ করে।

বাবলা খেজুর প্রভৃতি গাছগুলি বড় হ'লে রেল কোম্পানির সম্পত্তি-সামিল হয়, কিন্তু সে গুলির ডালপালা কিম্বা শিশু-বাবলা ঝাউ প্রভৃতির খবরদারি করে না কর্ত্তৃপক্ষ। সে সব অল্পমালের কর্মচারি লকড়ি সংগ্রহের প্রয়োজন বোধ করে, কিম্বা ঝাউএর ঝাঁটা বিক্রী ক'রে যে সব উটকো লোক তাদের চলাফেরায় জঙ্গলে সরু সরু পথ আছে। অবশ্য এমন নয় এ জঙ্গলে কেউ হারিয়ে যেতে পারে।

পথে বেরিয়ে মাধাইএর কথাটা মনে হ'ল কিন্তু সমাধান করতে পারলনা। সুরতুনদের মতো যারা তারা স্নান করে কোথায়। বুধেডাঙ্গায় থাকবার সময়ে৷ চৈত্র বৈশাখ দূরের কথা আশ্বিন কার্ত্তিকে গ্রামের ডোবাগুলি শুকিয়ে গেলে পানীয় জল সংগ্রহ করার জন্যেই দুর্ভাবনা করতে হয়। সে ক্ষেত্রে পদ্মায় গিয়ে দৈনিক স্নান দূরে থাক সাপ্তাহিক স্নানও হয় না। গ্রামের বাইরে কি হয়? আহার্য্যের ব্যাপারে, নিদ্রার বিষয়ে মাধাইএর এই ভুয়দর্শন যে ও সবগুলি সকলের জন্য সমান নয়। নানা উপকরণের আকণ্ঠ আহার একদিকে আর একদিকে অনাহার এই দুইয়ের মাঝখানে বহু শ্রেণী, বহু ধাপ, বহু স্তর। কিন্তু মাটির তলায় গঙ্গা, সেই জলও যে সকলের সমান আয়ত্তাধীন নয় এই হাস্যকর বিস্ময়টা তাকে পেয়ে বসল।

সে বলল,—তোরা চান করিস কনে।

সুরো ভাবল উত্তর দেয়ার আগে। গ্রামের বাইরে এবং গ্রামের ভেতরে বর্ষার সময় যখন আকাশ স্নান করায় সেটা ছাড়া প্রত্যেকটি স্নানের ব্যাপারই একটি ছোট-খাট অভিযান। সে বলতে পারত রাত্রির অন্ধকারে চিকন্দির সান্ন্যালদের পচাপুকুরে, ষ্টেশনের ইঞ্জিনের জল নেয়ার লোহার থামে, সন্ধ্যার অন্ধকারে এবং ভোর রাতে চড়নকাশির কাদাভরা জলায়—সে ফতেমা কিম্বা অন্য সঙ্গীর সঙ্গে স্নানের অভিযানে যোগ দিয়েছে। তারপর টেপির মা সন্ধান দেয় এই বাঁধের জলের। তারপর সপ্তাহে একবার সে স্নান করে আসছে যে, কখনো ফতেমার সঙ্গে গিয়ে, কখনো দুপুর রোদের নির্জনতায় একা। এত কথা বলা যায় না ব'লে সুরো বললে—করি।

মাধাই জীবনে অনাহারের সম্মুখীন হ'য়েছিল ব'লে সেটায় তার বিস্ময় বোধ হয় না। কিন্তু, গ্রামে থাকার সময়ে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমলে সে স্নানের প্রয়োজনে জল পেয়েছে। গ্রামের বারোয়ারী-তলার পুকুরে অন্ত্যজদের অধিকার ছিল সান্ন্যালদের হুকুমে।

মাধাই বলল বিজ্ঞের সুরে,—স্নান না করে থাকিস, খোস পাচড়া হবি।

তা হয় না। গায়ের মরামাসের সঙ্গে ধূলোমিশে এমন একটি আবরণ তৈরী হ'য়েছে যা একটি দ্বিতীয় ত্বক বলা যায়।

সুরতুনের পরিচিত খাদটা পথের ধারেই। কিন্তু সেখানে জল শুকিয়ে গেছে।

—তাইলে, ব'লে সুরতুন মাধাইএর দিকে তাকাল।

মাধাই বলল—আরও দূরে একটা না কয়টাই আছে। বাঁয়ের দিকে চলে যা।

জ্যামিতিক পাহাড়ের মতো সর্বোচ্চ বাঁধটির গায়ে গড়ান রাস্তা বয়ে নামতে নামতে মাধাই বলল,

সবুজ জল দেখলে নামবিনে, তলায় বাবলার কাঁটা থাকতে পারে, জলও ময়লা, তলের গাছগাছড়া পচে জল সবুজ হ'য়েছে। ওরি মধ্যে একটায় রেল-কোম্পানি কোন কাজে বালি ঢালছিল, জল চুমুক দিয়ে তোলা যায়।

আরও কিছুদূর একসঙ্গে গিয়ে সুরো জলাশয়ের খোঁজে চলল, মাধাই শুকনো ডালপালা সংগ্রহের চেষ্টায় নামল।

সমস্ত অধিত্যকায় তুটি মাত্র মানুষ। মাধাইএর দায়ের খট্‌খট্‌ শব্দ সুরোর কানে আসছে, সুরোর জল ছিটিয়ে সাঁতারে শব্দও কানে যাচ্ছে একেকবার মাধাইএর।

এক সময়ে মাধাই ডাকল,—আর ভিজিস না, দিনকাল ভাল না, বর্ষার জমা জলে জ্বর হয়।

কথাটা ঠাহর ক'রে শুনে সুরতুন বলল,—তুমি এদিক দিয়ে আস, এ পথেই উঠে যাব।

আরও কিছুক্ষণ কাজ চলল। সুরতুন লক্ষ্য ক'রে দেখল জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে মাধাইএর কিছু কিছু চোখে পড়ছে, কখনো তার দা সমেত হাত, কখনো পিঠের খানিকটা, কখনো বা মাথার চুলগুলি।

সুরতুন ভিজে কাপড় চিপতে চিপতে বলল,—সারা জঙ্গলে লাকড়ি কাটলা, নিবা কেমন করে।

—আজ কি আর সব নেয়া যাবি। পারিস তো তুই কয়খান শুকনা ডাল নে, আমি কিছু নি। কাঁচা লাকড়িই বেশী, সেগুলে শুকাক, আর একদিন আসব।

এদিকের পায়ে চলা পথ সুরতুনের অপরিচিত। সে জন্য মাধাইকে আসতে হ'ল জলের ধার পর্য্যন্ত। মাধাই সঙ্গে দড়ি এনেছিল, শুকনো ডালপালার একটা স্তূপ বেঁধে কাঁধে তুলে চলতে লাগল,—পথে কয়েক বোঝা এমন জমায়ে রাখছি, নিতে হবে।

খানিকটা দূর হেঁটে বোঝা নামিয়ে গুছিয়ে রাখা ডালপালা বোঝায় বেঁধে আবার হাঁটে মাধাই, সুরতুন, কখনো দড়ির মাথা ফিরিয়ে দিয়ে, কখনো লকড়ি তুলে তুলে দেয়।

মাধাই প্রশ্ন করল,—তোকে এক বোঝা বেঁধে দিব?

—দেও।

—শুকনো ডালের চাইতে কাঁচা ডালপালাই বেশী, সুরতুন বলল, এ সব যদি আর কেউ নিয়ে যায়।

—কেউ নেয় না। জড়ো করা শুকনো কাঁচা লকড়ি দেখলে সকলেই ভাবে এ আর একজনের।

সামনে মাধাই, পেছনে সুরতুন, তুজনে বোঝা নিয়ে ধীরে ধীরে চলেছে।

এক সময়ে সুরতুন বলল,—তোমার পায়ের বিষ সারছে?

—হয়।

লজ্জিত সুরে সুরতুন বলল,—ফতেমা সঙ্গে সঙ্গে দেখবের পায়, আমি সারারাত বসে থাকেই দেখবের পারলেম না।

—তুই সারারাত ব'সে ছিলি।

বোঝার আড়াল থেকে সুরতুনের মুখ দেখা গেল না।

বাসায় ফিরে লকড়ির বোঝা নামিয়ে সুরতুন তখন তখনই বলল, বাজারে যাই, কেন্ কয়েন?

—কি হবি?

—তরকারি আনাজ আনা লাগবি, তোমার কষ্ট হবি।

—তুই যেন আজ ফতেমা হলি।

ফতেমাকে সুরতুন ঈর্ষ্যা করে না। সুরো জানে ফতেমা হওয়া তার পক্ষে সহজসাধ্য নয়। ফতেমা যে সব বিষয়েই তার অনুকরণীয় এমনও তার বোধ হয় না। ফুলটুসির ছেলেদের জন্য দেখা হওয়া মাত্র খরচপত্র করা তার কাছে অনেক সময়েই বাড়াবাড়ি বোধ হয়। কিন্তু মাধাইএর প্রয়োজনে ফতেমা যা করল তার জন্য সে খুসি হয়েছে। ফতেমা এসে পড়ায় মাধাই সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত বোধ করেছিল।

আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুরো ফতেমার কাজগুলি লক্ষ্য করেছিল, এবং ভেবেছিল চেষ্টা করলে কি নিজেও পারবে না। তবু এখন যেন মাধাইএর কথায় একটু বেদনা বোধ হ'ল তার। সে ভাবল: অন্যের সম্বন্ধে না হ'ক সে কি মাধাইর সম্বন্ধেও স্নেহশীল হ'য়ে উঠতে পারে না।

সুরতুন বলল—কেন কয়েন, কি কষ্ট তা কি কওয়া যায় না?

মাধাই কথাটা শুনে যারপর নাই বিস্মিত হ'ল। কিন্তু হাসি হাসি মুখে বলল, কষ্ট কই?

চল যাই বাজার ক'রে আসি। বাজার করে তোর হাতে দিয়ে ডিউটিতে যাব। আসে খাব, রাঁধে রাখিস।

বাজারের পথে এটা সেটা কথা হ'ল। সুরতুনের মনে পড়ল মাধাইএর সঙ্গে এরকম ক'রেই একদিন সে বাজারে গিয়েছিল। হাতে পক্ষী আঁকার দিন ছিল সেটা। ঘটনাটা মনে পড়তে সুরতুন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিল।

মাধাই বলল, বাজনা শুনছিস?

সুরতুন ঠাহর ক'রে শুনল দূর থেকে কিসের একটা বাজনার শব্দ আসছে।

—ও কি?

—সার্কাস। যাবি একদিন দেখতে?

—নিয়ে যাও যাব।

সুরতুন একা একা বাজার সওদা করে, কিন্তু মাধাইএর সঙ্গে বাজারে আসা আর একা বাজারে আসা এক নয়। একটা ছোট-খাট চায়ের দোকানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মাধাই বলল—র'স একটু চা খেয়েনি। তুই-ও আয়।

মাধাই দোকানটায় ঢুকে গেল কিন্তু সুরতুন ক্রেতাদের যাওয়া-আসা দেখতে লাগল। সহসা সে বিস্মিত হ'ল। চেহারার পরিবর্ত্তন সাধনের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও টেপিকে চিনতে তার অসুবিধা হ'ল না। বিস্ময়ের কারণটা বেশভূষার বিবর্ত্তন। পুরুষদের মতো পায়জামা আর পাঞ্জাবী, শাড়ীর আঁচলের মতো খানিকটা ওড়না জড়ানো টেপিকে দেখে সুরতুন অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল, ততক্ষণে কানের কানবালা তুলিয়ে সুগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে উঁচু গলায় কথা বলতে বলতে টেপি চলে গেছে। তার সঙ্গীর দিকে চাইতে সুরতুনের সাহস হয় নি। গালে গালপাট্টা, মাথায় পাগড়ি, কিন্তু সাহেবের মতো পোষাক।

মাধাই চা খেয়ে ফিরতেই সুরতুনের প্রবল ইচ্ছা হ'ল সে মাধাইকে বলবে টেপির কথা কিন্তু তার টেপির দেয়া কোকিয়ানের কথাও মনে পড়ে গেল। সুরতুন স্থির করল যদি বলতেই হ'য় বাসায় গিয়ে বলবে।

চাল ডাল তেল কিনে মাধাই বলল,—আলাম যখন মাছের বাজারও ঘুরে যাই, সস্তা হয় নেবনে।

মাছের বাজারটায় যাবার পথে কয়েকটি বড় বড় আধুনিক কায়দায় সাজান দোকান আছে। তার মধ্যে একটি সদর রাস্তার ধারে, এবং ঝক্‌ঝকে ক'রে সাজান। সন্ধ্যা হ'তে তখনও দেরী আছে, তবু কাঁচের শো কেশে দু'একটি আলো জলতে আরম্ভ করছে।

স্বরতুন মাধাইয়ের পাশে পাশে চলতে চলতে বলল,—টেপি না?

মাধাই হো হো করে হে'সে বলল,—মাটির পুতুল। আরও আছে।

কাপড়ের দোকানদার পাঞ্জাবী, বাঙালী ও হিন্দুস্থানী এই তিন পদ্ধতিতে পুতুল সাজিয়ে কাপড়ের বিজ্ঞাপন দেয়ার ব্যবস্থা করছে। প্রথাটা খুব পুরাতন নয়, এ সব পথ দিয়ে স্বরতুন একা হাঁটতে সাহস পায় না ব'লেও বটে এগুলি স্বরতুনের দেখা ছিলনা। ব্যাপারটির আকস্মিকতায় ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হ'য়ে বলল সে—ঠিক যেন দুগ্‌গা ঠাকুর। মনে মনে সে টেপির সঙ্গে পুতুলগুলির রূপের তুলনা করতে লাগল।

মাছের বাজারে মাছ কিনে মাধাই বলল,—তুই এবার বাসায় যা। যা পারিস রাঁধ। আমার যাতে যাতে রাত হবে।

স্বরতুন ফিরে চলল। কাপড়ের দোকানের সম্মুখ দিয়েই তার পথ। ঠিক সেখানেই একটি বিস্ময়কর ঘটনা আবার ঘটল। এবার স্বরতুন টেপির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রথমে সে ভয় পেয়ে ভেবেছিল পুতুল হেঁটে বেড়ায় এ কোন রাজ্য, কিন্তু টেপি দোকান থেকে নেমে রাস্তায় এসে হাঁটতে সুরু করলে। স্বরতুনকে দেখতে পেয়ে থামল না বটে, বলল,—ভালো আছিস?

টেপি স্বচ্ছন্দ গতিতে আগে আগে চলছে, পেছনে স্বরতুন।

রেশমি পায়জামা, সাটিনের পাঞ্জাবি, নকল বেনারসির ওড়নায় শ্যামা টেপি। পিঠের উপরে দোলান লম্বা বেণী চক্ চক্ করছে ওড়নার তলে।

ধামাভরা চালডাল, সুতোয় বাঁধা বোতলে তেল, হাতে মাছের এক টুকরো, ধামা কাঁকালে বাঁকা হ'য়ে চলছে স্বরতুন। তার পরিধেয় আমলিন মোটা সরু লালপাড় ধুতি। তার চুলগুলিতে আজ ময়লা নেই, কিন্তু সদ্যস্নাত হ'লেও তেলের অভাবে লাল হয়ে উড়ছে। তার চৌকো ধরনের মুখে টিকোলো নাক, টানা টানা ভ্রূর নিচে বড় চোখ কিন্তু ভয়ে সঙ্কুচিত। কিন্তু তার বাবার নাম রেখেছিল বেলাত আলি। তার রঙের জিল্লা বিলাতওয়ালাদের মতো ছিলো এই প্রবাদ। আজ স্বরতুনের সদ্য-স্নাত ত্বক পথের জনতার মধ্যে অনন্য বোধ হ'চ্ছে। ধবধবে সাদা নয়, বরং রোদে পুড়ে পুড়ে পাকা খড়ের মতো রঙ্।

স্বরতুন ভাবল আশ্চর্য্য সুখী হ'য়েছে টেপি। স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করে সে। সে স্থির করল মাধাইকে সে জিজ্ঞাসা করবে কোন দোকানের সম্মুখে অমন পুতুল সাজান থাকে, আর কেন টেপি সেই দোকানে যায়।

মাধাই যখন খেতে এল তখন রেল-কোলোনীর এই নগণ্য অংশটিতে নিশুতি রাত। তার আগে রান্নার কাজ শেষ ক'রে স্বরতুন টেপির কথা ভাবল, ফতেমার কথা ভাবল, অবশেষে নিজের কথা ভাবল। নিজের কথা চিন্তা করতে বসে স্বরতুন স্থির করল সকালে উঠেই সে মহাজনের কাছে যাবে কাজের

খোঁজে। বাজারে যে অঞ্চলে চাল বিক্রী হয় সেখানেও খোঁজ নিয়ে দেখবে চাল কারবারির পরিচিত কাউকে পাওয়া যায় কি না। বসে খেলে আর কয়দিন। মহাজনের কিছু, মাধাইএর কাছে আর কিছু জমা আছে, সব জড়ালে, স্বরতুন আঙুলে গুণে গুণে দেখলে তিনকুড়ির কাছাকাছি হ'লেও যেতে পারে, কিন্তু তা'তে কদিন যায়। ফতেমা আটকে থাকলে যদি বা চলে তার নিজের তো অন্যগতি নেই চালের কারবার ছাড়া।

কিন্তু খেতে বসে মাধাই বলল,—বেশ তো রান্না শিখেছিস।

—ফতেমার রান্না দেখলাম যে।

—তা ভালোই করছিস।

আর কোন কথা নেই।

মাধাই খেয়ে উঠে গেলে, এঁটো পরিষ্কার ক'রে এসে স্বরতুন কথা বলার ভঙ্গিতে দাঁড়াল।

—কিছু কবি? গাঁয়ে যাওয়ার কাজ আছে।

—না। গাঁয়ে যায়ে কি করব। কই যে বায়েন, এবার কি করব কও। ফতেমা চালের মোকামে যাবের চায় না; পুলিশ আছে, চেকার আছে, মরল আছে কি করি বোঝা যায় না। চাল হ'লে এদিকেও সস্তা হবি ই সন। খাব কি?

—কেন্ তুই গাঁয়ে কি করতি দুর্ভিক্ষের আগে। এবার শুনতিছি গাঁয়ে চাষবাস হবি।

স্বরতুন ভাবল। তারপর কষ্ট ক'রে কথা তৈরী ক'রে বলল,—জমি জিরাৎ নাই, ধান কুড়ায়ে, বাড়া বানে কয়দিন চলবি। বাড়াবানার কাজে এখন চিকন্দির দাস পাড়ার মিয়েরা নামছে। আমাদের কাজ নি।

—হুম্। মাধাই বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়ার মতো কথাটা উড়িয়ে দিল বলতে বলতে, এই তো বেশ আছিস। রাঁধবাড় খা।

—বসে বসে খাওয়াবা?

—আপত্তি কি? যে কয়দিন চাকরি করি খা-না কেন্। দু'জনের খাওয়া পড়া আমার টাকায় চলে। টাকা দিয়ে আমার আর কোন কাম। যা এখন যা।

আহার পর্ব মিটলে স্বরতুন বারান্দায় তার শয্যা বিছিয়ে নিচ্ছিল। মাধাই বলল,—আজ ফতেমা নাই, একা বাইরে শুবি কেন।

কথাটায় স্বরতুন বিস্মিত হ'ল। বহুদিন তারা বারান্দার আশ্রয়ে কাটিয়েছে। সব সময়েই ফতেমা থাকে নি। কখনো সে একা, কখনো বা ফতেমা বারান্দায় অনেক শীত বর্ষার অন্ধকার রাত্রি কাটিয়েছে।

স্বরতুন বলল,—আমার পাটি কাঁথা ময়লা কালো।

মাধাই হাসিমুখে বলল—তা ঠিক বলছিস, আমার ঘর সাহেবদের মতন মার্বেলের তৈরী। রাত্তিরে সার্কাসে যাব নে।

—না গাঁয়ে যাব না।

দুপুরের আহারাদি শেষ ক'রে মাধাই ডিউটিতে গেছে, সুরতুন বসে চাল ঝাড়ছিল। নিজের রান্নার সময়েও ফতেমা চাল ঝেড়ে পরিষ্কার ক'রে নেয়। সুরতুন নিজের বেলায় অত হাঙ্গামা করেনা। কিন্তু মাধাইএর জন্যও রান্না করতে হবে, সুতরাং একটু সতর্ক হ'তে হয়।

পায়ের শব্দে চোখ তুলে চেয়ে সুরতুন অবাক হ'য়ে গেল—সামনে দাঁড়িয়ে টেপি। সাদামাটা রঙিন একটা শাড়ীতে তাকে গতসন্ধ্যার মতো ঝক্‌ঝকে দেখাচ্ছে না। চোখের কোলে অস্বাস্থ্যের কালো চিহ্ন। কিন্তু তবু তাকে বড় ঘরের ঝি বউ-এর মতো দেখাচ্ছে। হাতে সোনার চুড়ি, গলায় সোনার হার এসবতো আছেই, পায়ে জুতোও আছে।

টেপি ভূমিকা না ক'রেই বলল,—তোর কাছে এক কাজের জন্যে আলাম। আমাকে একটু ওষুধ আনে দিতে হবি।

—আমি? কও কি? আমি কি চিনি, কনে যাব।

—আমি তোকে দোকান দেখায়ে দেব, টাকা দিব।

—তুমি নিজে যাওনা কেন? তুমি তো বাজারে ঘুরে বেড়াও। লোকের সঙ্গে কথা কও। সুরতুন ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে বলল—কোকিয়ান না তো? তুমি কি কৌটাই দিছলা। ভয়ে মরি।

—ভয়ের কি? কৌটা দিছিলাম আমি, ফিরায়েও নিছিলাম আমি।

—তবে টাকা দিছিলা কেন।

—ভাবছিলাম তোকে ব্যবসায় নিলি তোর হিল্লে হবি, পরে মনে হ'ল ও তোর কাম না, পারবি না। পুলিশের পাকে পড়ে সকলকে জড়ায়ে ফেলবি।

কথাটা শুনে সুরতুন টেপির প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করল। কথার সুর পালটে সে বলল—ওষুধ কেন, কার অসুখ?

—অসুখ না, ওষুধ আমারই লাগে।

সুরতুন ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে টেপির সঙ্গে বার হ'ল।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে টেপি বলল, কাল তোকে মাধাইর সঙ্গে বাজারে দেখে মনে হ'ল তোর কাছে আসার কথা।

বাজারে দেখার কথায় সুরতুনের মনে একটু সাহস হ'ল প্রশ্নটা করার। প্রশ্নটা তার মনে কিছুক্ষণ থেকে উঁকি দিচ্ছিল। সে বলল, অমন মেম সাহেবের মতো সাজে কাল ক'নে যাওয়া হইছিল।

টেপি সুরতুনের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কি ভেবে নিয়ে বলল, তোকে কওয়া যায়। আমি আর চেকারের কাছে থাকি না। কাল যাকে দেখছিস সে চেকার না।

টেপির প্রাণের ভেতরে কথাগুলি পুঞ্জীভূত হ'য়ে বহিঃপ্রকাশের জন্য চাপ দিচ্ছিল। বলার লোক প্রতিবেশীদের মধ্যে নেই। সুরতুনের প্রশ্নে প্রকাশের বাধাটা দূর হ'তেই টেপি বলতে লাগল, চেকার বদলি হ'য়ে গেছে তিনদিন হয়। যাবার সময় আমাকে বেচে দিয়ে গেছে। এক কাপড়ের দোকান থিকে আমার জন্যে কাপড় জামা কিনত। সাত শ' টাকা ধার হইছিল। পরশুদিন দোকানের লোক আসে উপস্থিত। অনেক কথাবার্ত্তা ক'য়ে শেষ পর্য্যন্ত দোকানদারের কাছে টাকার বদলে আমাকে জমা

রাখে গিছে। কি করি কও সুরো। দোকানদার পাঞ্জাবি। কেন্ যেন কান্না পায়, ঘিন্না ঘিন্না করে। কাল পাঞ্জাবী সাজে বার হইছিলাম। চেকার গিছে আপদ গিছে, কিন্তুক কও সুরো কওয়া মাত্র অন্য আর একজনকে ঘরে আসবের দেয়া যায়?

টেপির অজ্ঞাতসারে তার কথাগুলি বাষ্পগাঢ় হয়ে যাচ্ছিল। সুরতুনের কাছে স্পষ্টই হ'ল না সবটুকু, সে বিস্মিত হ'য়ে নির্বাক হ'য়ে রইল, দেখো দেখি মানুষ নাকি বেচা যায়।

টেপি বলল, আমি সময়ে যা পারব, আজই তা পারব কেন। আমার এক বুড়ী পড়সি কইছে এই ওষুধ আনে মসুর দানার সমান হালুয়ায় মিশায়ে খাওয়ালে পুরুষ ঘুমায়ে পড়ে।

দুজনে নীরবে পথ অতিবাহিত করতে লাগল। টেপির সমস্যা ফতেমা বুঝতে পারত হয়তো, হয়তো বা সে আন্দাজ করতে পারত টেপি আফিং কিনতে যাচ্ছে এবং এ পদ্ধতি যে কতদূর বিপদজনক তাও বলতে পারত। সুরতুন টেপির জন্য একটা অনির্দ্দিষ্ট সমবেদনা অনুভব করল।

দূরে দাঁড়িয়ে থেকে আফিমের দোকান থেকে রতিভর আফিং কিনিয়ে সুরতুনের হাত দিয়ে টেপি বলল,—চল তোর সঙ্গে ফিরে যাই।

ফিরবার পথে টেপি বলল,—সুরো, তুই আজকাল মাধাইএর কাছে থাকিস?

—হয়, আছি কয়দিন।

টেপি একটু ইতস্তত ক'রে বলল,—সাহস হয়, একটা দুটে ছাওয়াল মিয়ে চায়ে নিস। মনে কয় এমন ক'রে তাইলে মেয়েছেলেকে বেচে দেয়া যায় না।

(ক্রমশঃ)

মেল

একটি মাঠের চোখ : এখনও সে কাকচক্ষু জল,
উপরে বাসক-ঝোপ হয়ে আছে ভুরু অবিকল;
শুধু নীলশাড়ি-পরা তারাটির ডুব, ওঠা-নামা
ঘুচে গেছে বলে' মেল ভুলে যায় মেঠো-পথে থামা॥

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

সুন্দরী

রণজিৎকুমার সেন

বহুকালবাদে আজ আবার সুন্দরীকে দেখে অবাক হ'লাম। উজ্জ্বল রক্তবর্ণ সিঁদুরের টিপে সারা কপালে এয়োতির চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। চওড়া লালপেড়ে শাড়ীখানিকে সারা দেহের উপর নরম ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে সরু কোমরে এনে গাছমোড়া ক'রে জড়িয়েছে; দু'হাতে দু'টি বলয় আর চারগাছা ক'রে প্লাষ্টিক আর কাঁচের চুড়ি মাঝে মাঝে ক্বণিত শব্দ ক'রে উঠ্‌চে। পাতাকাটা সিঁথির মাঝামাঝি সরল রেখা জুড়ে যেন সিঁদুরের লাল ফৌজের মিছিল চ'লেছে। কথার ফাঁকে দাঁতগুলোর দিকে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম—স্বচ্ছ হীরকের মতো দিব্বি ঝক্‌ঝকে। নাকে ছোট্ট নোলক, দু'কানে দুল্‌ছে সাবেকি ধরণের মাকৃড়ি। সব মিলিয়ে আজ যেন সুন্দরী সত্যি-সত্যিই অপরূপা।

হাসি পেলো সুন্দরীর দিকে তাকাতে গিয়ে। বহুকাল বাদে দেশের বাড়ীতে এসেছি। আসার পথে কোন্ ফাঁকে না জানি সুন্দরীর চোখে প'ড়ে গিয়ে থাকবো, একসময় বাড়ীতে দেখা ক'রতে এসে টিপ্ ক'রে এক প্রণাম। প্রথমটা চিন্‌তে কষ্ট হ'লেও ভুল শুধ্‌রে নিতে দেরী হ'লো না। ব'ল্‌লাম, 'আরেঃ, সুন্দরী যে! বাপের বাড়ী কবে এলি, তোর কর্ত্তার খবর কি, সেও সঙ্গে এসেছে তো?'

মাথা নিচু ক'রে সুন্দরী ব'ল্‌লো, 'এসেছিল, ক'দিন হ'লো আবার বীরনগরে চ'লে গেছে।'

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'তোরা তবে বীরনগরেই আছিস? তা—ইদানিং দু'পয়সা ঘরে আনতে পারছে তো কানাই, না আগের মতো এখনও আড্ডা দিয়ে দিয়েই ফিরচে?"

কানাই সুন্দরীর স্বামী। বুঝলাম, স্বামীর কথা মুখ ফুটে ব'লতে লজ্জা পাচ্ছে সুন্দরী। একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বল্‌লো, 'মার অসুখের তার গেল, তাই আমাকে রেখে গেল এখানে। মা আর এ সংসারে নেই কাকাবাবু?' বল্‌তে গিয়ে গলার স্বর কিছুটা আর্দ্র হয়ে উঠ্‌লো সুন্দরীর।

বিস্ময় প্রকাশ করে বল্‌লাম, 'সে কি, এ বলিস কি তুই, কবে এমন দুর্ঘটনা ঘটলো?'

আঙুলের কড় গুণে হিসেব ক'রে সুন্দরী বল্‌লো, 'গত অমাবস্যার আগের পূর্ণিমায়।'

দুঃখ পেলাম সুন্দরীর মা রত্নেশ্বরীর মৃত্যুসংবাদে। একসময় রত্নেশ্বরী আমাদের বাড়ীতে এসে ঢেঁকিশালায় বসে ধান ভান্‌তো। তার সঙ্গে শিবের গীত গাইতো আমাদের মনোহর চাকর। সে অনেক কালের কথা। সুন্দরীর তখন আর কতই বা বয়স, খুব বেশী হ'লে বছর বারো হবে। যেমন কুৎসিৎ চেহারা, তেম্‌নি তার শরীরের গড়ন। গ্রামের যে কুমোর সবচাইতে খারাপ কালীপ্রতিমা তৈরী করে, সেই কালীপ্রতিমার চাইতেও কুৎসিৎ ছিল দেখতে সুন্দরী। হাট্‌তে গিয়ে সুন্দরীর কোমরে কাপড় থাকতো না, নাক দিয়ে অনবরত শ্লেষ্মার তরঙ্গ বইতো। জন্মলগ্নে বাপ মা আদর করে নামটা সুন্দরী রাখ্‌লেও উঠ্‌তে বস্‌তে সবাই তাকে দূর দূর ক'রতো। প্রথম যৌবনোদ্গমে নিজের রূপ সম্পর্কে যখন অনেকখানি সচেতন হতে গেল সে, তখন আর চোখের জল তার আটহাতি তাঁতের মোটা কাপড়ে ধ'রে রাখতে পারলো না, মাটিতে স্রোত বইলো। বাপ গণপতি সারাদিন

বাজারে কাটা-তামাকের দোকান সাজিয়ে ব'সে থাকলেও মেয়ের চোখের জল তার চোখ এড়াতো না। কিন্তু না এড়ালেও ইচ্ছে করেই চোখ ঘুরিয়ে নিতো সে। নিজের তার গৌরবর্ণ চেহারা, কিন্তু রত্নেশ্বরী শেষপর্য্যন্ত এমন কুরূপাকে যে কি করে পেটে ধরলো, একথা ভেবেই তার ব্রহ্মরন্ধ্র আগুন হয়ে উঠতো। পরের ঘরে মেয়ে দিতে হ'লে হয় মেয়ের রূপ চাই, নয় তো টাকার জোর থাকা চাই। গণপতির ভাগ্যে দুটোই সমান বিরূপ। অথচ মেয়ের শরীরের গড়ন ক্রমেই যেমন সার-দেওয়া কলাগাছের মতো হয়ে উঠচে, তাতে গ্রামে থেকে বেশীদিন মেয়েকে ঘরে রাখাও বিপদ। রাগে দুঃখে সুন্দরীর নরম পিঠের উপর একদিন উত্তম মধ্যম বসিয়ে দিল গণপতি। এমন আরও কতদিনই হয়ত বসিয়ে থাকবে!

রত্নেশ্বরীকে হঠাৎ সেদিন কি কাজে ডাকতে গিয়ে গণপতির কাণ্ড দেখে সহসা থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লাম।—'আঃ—কারো কি গণপতি, মেয়েটা এমন কি অপরাধ করলো যে মেরে একেবারে দম বন্ধ করে দিচ্ছ?'

কিছু মাত্র দ্বিধা করলো না গণপতি, বল্‌লো, 'মেয়ে তো নয়, আমার সাতজন্মের শত্তুর। মুখপুড়ির মুখ দেখতেও আমার ইচ্ছে করে না দাদাবাবু। কোথাও পার করে দিতে পারলে আমি এখন শ্বাস ফেলে বাঁচতাম। কিন্তু এমন মুখপুড়িকে যে কারুর হাতে জোর করেও গছিয়ে দেওয়া যাবে না!'

বল্‌লাম, 'ছিঃ বাপ হয়ে তাই বলে মেয়েটাকে এম্‌নি ক'রে মারবে? সংসারে রূপ সকলের সমান থাকে না, মানুষের হাতও নেই তাতে। তাই ব'লে কোনো মেয়ের যে বিয়ে হয় না, তা নয়। বাপ যখন হ'য়েছ, তখন সুন্দরীর তেমন কিছু রূপ না থাকলেও তার বিয়ের ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে।'

গণপতির মুখে এবারে আর কথা ফুটলো না। সুন্দরী তখন খিড়্‌কি-দুয়ারের একপাশে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। কাছে এগিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'ছিঃ, কাঁদিসনে। তোর বাপের ইদানিং রোজগারপাতি ভালো হচ্ছেনা, তাই মাথার ঠিক নেই; কি করতে হঠাৎ কি করে বসে। দুঃখ করিসনে তুই। তোর খুব ভালো রোজগেরে বর জুটবে দেখবি; তোর বাপ তখন দেখবি তোকে আদর করেও কুল পাবেনা।'

কিন্তু কথা শুনে সুন্দরীর দুঃখ আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেল। ফোঁপানো কান্না ক্রমেই গুম্‌রে উঠ্‌তে লাগলো। বললাম, 'চল, বাড়ীর ভিতরে চল দিকি, তোর মাকে একটা খবর দিয়ে আমি বিদেয় হই।'

তেমনি কাঁদতে কাঁদতেই বাড়ীর উঠোনের একপাশে এসে দাঁড়ালো সুন্দরী। রত্নেশ্বরীকে আর গলা ছেড়ে ডাকতে হ'লো না। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে বটি দিয়ে তেঁতুলের বিঁচি ছাড়াচ্ছিল। আমাকে দেখতে পেয়েই অম্‌নি উঠে এসে উঠোনের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আমার কোনো কথার অপেক্ষা না রেখেই নিজে থেকে বলে উ্‌ঠলো, 'এই যে দাদাবাবু, এসেছেন যখন, তখন আপনিই বিচার করে যান। মেয়ের রূপ নেই বলে কোনো মেয়ে তার বাপের হাতে এমনি করে রোজ রোজ মার খায়? বুঝলাম বিয়ে দিতে এককাঁড়ি টাকা লাগে, তা—টাকা কামাই ক'রে মেয়েকে বিয়ে দিতে পারবে না তো মরদ হয়েছিল কেন? আপনারা তো লেখাপড়া শিখেছেন দাদাবাবু, বলুন, একবার আপনিই বলুন দিকি, ত্রিসংসারে এমন বাপের কথা কোথাও কখনও শুনেছেন?'

বুঝলাম—গণপতি চণ্ডাল হ'লেও রত্নেশ্বরী রত্নগর্ভা ভগবতী। মধ্যস্থ হয়ে আমি দু'কথা বুঝিয়ে বললেও তাদের স্বামী-স্ত্রীতে আজ যে একটা মস্ত কাণ্ড ঘটে যাবে, তাতে ভুল নেই। হয়ত তেমন

কাণ্ড নিত্যই ঘটে! বললাম, 'আমি গণপতিকে বুঝিয়ে বলেছি, তোমাকে আর কিছু বলতে হবেনা। হাতের কাজ সেরে তুমি বরং একবার আমাদের ওখানে এসো, কিছু কাজ জমে আছে।'

ব'লে আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করলাম না। রত্নেশ্বরীর উঠোন ছেড়ে খিড়কি-দুয়ারের বাইরে পা বাড়ালাম। পিছন-পিছন যে সুন্দরী আমাকে অনুসরণ করছে, বুঝতে পারিনি। হঠাৎ তার ডাক শুনে থামতে হলো। বললো, 'আমাকে আপনি অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে পারেন, কাকাবাবু? কত লোক তো কত বাড়ীতে দাসীবাঁদিগিরি করেও খায়, আমিও পারবো।'

তাকিয়ে দেখলাম—এতক্ষণের চোখের জল শুকিয়ে কালো দু'টি গালের দু'পাশে সরু খালের চরের মতো দাগ বসে গেছে। বল্‌লাম, 'কি বোকা মেয়ে তুই বল্‌তো! বাপের মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে উঠেছিল, দু'ঘা মেরেছে, এরপর বাপই আবার দেখবি কাছে ডেকে নিয়ে আদর করবে। তুই কেন দাসীবাঁদি হতে যাবি, অভাব কি তোর?'

সহসা আবার বুঝি চোখ ফেটে জল এলো সুন্দরীর! বল্‌লো, 'সংসারে মেয়েদের যা না থাকলে সবকিছুরই অভাব থেকে যায়, আমার যে তার কিছুই নেই কাকাবাবু! আমি কুৎসিৎ, মুখপুড়ি, পাড়ার সবাই ডাকে আমাকে শাকচুন্নি। কি আছে আমার বলুন?'

সাদরে সুন্দরীর গালে তর্জ্জনীর ঈষৎ টোকা মেরে বল্‌লাম, 'নাই কি তোর, সব আছে। আমরা কৃষ্ণজাতি, আমাদের গৌরী তাই কালী সেজে নৃত্য করে। যা ঘরে যা।' বলে সোজা এবারে বাড়ীর পথ ধরলাম। সারা পথ কিন্তু সুন্দরীর কথা একটুও মনে হ'ল না, মনে হলো গণপতির পিতৃত্বের কঠোর তিক্ততায় মেশানো তার কঠিন নৃশংসতাকে। বিচিত্র সংসারের রূপ, বিচিত্র তার নানা চরিত্র।

এরপর সুন্দরীকে আর বড়-একটা চোখে পড়েনি। রত্নেশ্বরীকে ডাকতে গেলে হয়ত চোখে পড়তো, কিন্তু ডাকার প্রয়োজন হয়নি; রত্নেশ্বরী নিজেই এসে যথাসময়ে ঢেঁকীশালার কাজ গুছিয়ে রেখে গেছে।

এমনি করে কিছুকাল কেটে যাবার পর হঠাৎ একদিন গণপতি নিজেই দেখলাম ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমাদের ঘরের ছাউনিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এতকাল ঢেঁকীশালার কাজে কেবল রত্নেশ্বরীই আমাদের বাড়ীতে এসেছে, গণপতি কোনোদিন আসেনি। বাজারে তামাকের দোকান করে খেলেও মনে মনে যথেষ্ট আভিজাত্যবোধ ছিল গণপতির। আজ হঠাৎ তাকে এ অবস্থায় দেখে কৌতূহল নিয়েই জিজ্ঞেস করলাম, 'খবর কি গণপতি?'

করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে গণপতি বল্‌লো, কিছু খবর নিয়েই এসেছি দাদাবাবু। তারপর সেইখানেই উবুহাঁটু হয়ে বসে পড়ে বল্‌লো, 'আমাদের বাজারের হারু বেপারী সুন্দরীর একটা সম্বন্ধ এনেছে। ছেলে অবিশ্যি কিছু করে না, বীরনগরে বাপের কিছু জমিজিরেত আছে, তার জোরেই ঘরে খেয়ে পাঁচ দোরে গালগল্প করে কাটায়; তবে ছেলেদের পক্ষের দাবীদাওয়া কিছু নেই। আমি রাজি হলে হারু একাজ করিয়ে দিতে পারে বলেছে।'

বুঝলাম—মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আমার মতামতের অপেক্ষা রাখে গণপতি। বল্‌লাম, 'বাপের জমিজিরেতটাই তো আর যথেষ্ট নয়। বসে খেলে রাজকোষও একদিন শূন্য হয়ে যায়। ছেলে যদি নিজে কিছু না করে কেবল আড্ডা দিয়েই ফেরে, তবে তার উপর তোমার মেয়ের ভাগ্যটাকে ছেড়ে দেওয়া কি সত্যিই উচিৎ হবে?'

কথা কেটে গণপতি এবারে তার সেই চিরাচরিত সুরে বল্‌লো, 'সুন্দরী কি ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে যে ছেড়ে দেবো না বলেন? কি আছে ওর, কে নেবে ওকে? তার চাইতে হারু বেপারী যদি সত্যিই কিছু ব্যবস্থা ক'রতে পারে তো করুক না!'

দেখলাম গণপতি মনে মনে মেয়ে বিয়ের ব্যাপারটা একরকম স্থির করেই ফেলেছে। এক্ষেত্রে বাধা দিয়ে তার পিতৃমনে আঘাত দেওয়া মিথ্যে। একরকম অনাসক্ত কণ্ঠেই তাই বললাম, 'তা মন্দ কি! উদ্যোগ ক'রে দেখ না, ভালোয় ভালোয় কাজটা যদি চুকে যায় তো নিশ্চিন্ত হ'তে পারো তুমি। আর ছেলে মানে—'

গণপতি নিজে থেকেই এবারে উপযাচক হ'য়ে ছেলের নাম ব'লে দিল: 'কানাই।'

বল্‌লাম, 'কানাইওতো ব্যাটাছেলে! সংসার করতে গেলে সেই কি আর পারবে শুধু আড্ডা দিয়ে ফিরতে! ঘাড়ে চাপ পড়লে নিজে থেকেই তাকে কাজ দেখ্‌তে হবে।'

দু'হাতের তালুতে দু'গাল ঢেকে কিছুক্ষণ নীরবে ব'সে আকাশ পাতাল কি যেন ভাবলো গণপতি। তারপর একসময় হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠতে উঠতে বললো, 'তাহলে হারুকে কথাটা দিয়েই দিই, না কি বলেন দাদাবাবু?'

বললাম, 'বিলক্ষণ, এই নিয়ে নাকি আবার ভাবনা! রত্নেশ্বরীর সঙ্গে যাহোক একটা ব্যবস্থা করে যা কিছু করবার করে ফেল গিয়ে, যাও।'

বুঝলাম—কথাটা শুনে খুসী হলো এবারে গণপতি। মনে মনে সেই খুসীর আতর মেখেই একসময় আমার সামনে থেকে উঠে গেল সে।...

শেষ পর্য্যন্ত বীরনগরের কানাইর সঙ্গেই সুন্দরীর বিয়ে স্থির হলো। দেশের বাড়ীতে উপস্থিত থাকলে মেয়ের বিয়েতে নিশ্চয়ই নিমন্ত্রণ করতো গণপতি, কিন্তু তার আগেই আমাকে আমার নতুন চাকরীর স্থলে রওনা হতে হলো। সুন্দরীর জন্য যে মনে মনে চিন্তা না হলো, এমন নয়। যেমন কুৎসিৎ, কুরূপা, তাতে শেষ পর্য্যন্ত কানাইর সঙ্গে অদৃষ্টকে মানিয়ে চলতে পারলে হয়! তবে আপাতত উঠতে বসতে বাপের হাতে মার খাওয়া থেকে রেহাই পেলো বটে মেয়েটা। এও সুন্দরীর কম ভাগ্য নয়।

আজ দীর্ঘকাল বাদে দেশের বাড়ীতে ফিরে সুন্দরীর সেই ভাগ্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে যেমন মনটা ভরে গেল, তেমনি দুঃখ পেলাম সুন্দরীর মুখে তার মায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে। বড় ভালো মহিলা ছিল রত্নেশ্বরী। আমাদের ঢেঁকীশালার কাজের মধ্য দিয়ে যতটুকু তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, বুঝেছিলাম—পল্লীবাংলার অপরিসীম স্নেহময়ী মাতৃহৃদয়ের উচ্ছল প্রাণরসে উজ্জীবিতা সে। তাতে এতটুকুও খাদ নেই।

আঙুলের কড় গুণে গুণে সুন্দরী তার মায়ের মৃত্যুর তারিখের একটা সহজ হিসেব খাড়া করে অপলক নেত্রে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। রত্নেশ্বরীর কথা ভাবতে গিয়ে কখন যে তার সংসারের অতীত দিনগুলির মধ্যে অকস্মাৎ ডুবে গিয়েছিলাম, নিজেরই লক্ষ্য ছিল না। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সুন্দরীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'সতীলক্ষ্মী ছিল রত্নেশ্বরী, শাখা সিঁদুর বজায় রেখে স্বর্গে যেতে পেরেছে, তার মতো সৌভাগ্যবতী কে আছে! বাপ-মা তো আর চিরকাল কারুর থাকে না, সেজন্যে

দুঃখ করিস নে তুই। তোকে নিয়ে তোর মার কি কম ভাবনা ছিল! তবু তোর বিয়েটা সে নিজের হাতে দিয়ে যেতে পেরেছে, এই তো তার শান্তি।'

কথা সরলো না সুন্দরীর মুখে। ধীরে ধীরে আমার মুখের দিক থেকে চোখ দু'টোকে নামিয়ে নিয়ে একই ভাবে বসে রইল সে।

বিয়ের ঘটকালির গোড়া থেকেই সুন্দরীর নিজের সম্বন্ধে জানবার একটা ব্যাকুল আগ্রহ ছিল। কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যাবার পর এবারে তাই জিজ্ঞেস করলাম, 'স্বামীর ঘরে গিয়ে কেমন কাটছে তোর, কই কিছু বল্‌লি না তো?'

ভেবেছিলাম, জবাব দিতে স্বভাবতঃই লজ্জা বোধ করবে সুন্দরী, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে দেখ্‌লাম একটা দীপ্ত আভায় তার মুখখানি সহসা কেমন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লো, 'আমি সুখে আছি কাকাবাবু। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার মতো সুখী বোধ করি পৃথিবীতে কেউ নয়।'

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'কানাইর তবে তোকে খুব মনে ধরেছে?'

উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমটা লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে নিল সুন্দরী, তারপর একরকম নির্লজ্জের মতই বল্‌লো, 'হুঁ—। বলে—আমি নাকি খুব সুন্দর, আমার মতো নাকি আর দ্বিতীয়টি নেই! হাতে আমার বালা গড়িয়ে দিয়েছে, বলেছে—বালায় নাকি আমাকে খুব মানায়।'

শুনে বিস্মিত হ'লাম না; সুন্দরীর সারল্যকে মনে মনে অভিনন্দন জানালাম। পৃথিবীতে কোথায় যে কার স্থান সুন্দরের ললিত লাবণ্যে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে, কেউ কি তার হিসেব দিতে পারে? যে শূন্য কান দু'টোকে তামাক কাটা শক্ত হাতে আকর্ষণ ক'রে চুলের মুঠো ধরে একদিন সারা মার মেরেছে গণপতি, সুন্দরীর সেই কান দু'টি আজ উজ্জ্বল মাকড়িতে সুশোভিত হ'য়ে উঠেছে, চুলের সরু গলিপথ জুড়ে ঝিক্‌মিক্ ক'রছে সিঁদুরের সুষমা। কার অধিকার আছে আজ সুন্দরীকে মুখপুড়ি আর শাকচুন্নি ব'লে ব্যঙ্গ ক'রতে! নারীত্বের গৌরবে সেমুখ যে আজ দীপ্ত গর্ব্বে গর্ব্বময়ী।

সুন্দরীর বিয়েতে উপস্থিত থেকে কিছু দিয়ে ওকে আশীর্ব্বাদ ক'রতে পারিনি। এবারে তাই পকেট থেকে দু'টো চাঁদির টাকা বার ক'রে সুন্দরীর হাতের মুঠোয় গুঁজে দিয়ে ব'ললাম, 'ধর, এই দিয়ে কিছু মিষ্টিমুখ করিস। আশীর্ব্বাদ করি তুই আরও সুখী হ।'

সহজ ভাবেই টাকা দু'টো হাতে নিয়ে উপুর হ'য়ে আমার পায়ের ধূলো মাথায় নিল সুন্দরী, তারপর উঠে বাড়ীর পথে পা বাড়াতে বাড়াতে ব'ললো, 'আমি কি এখনও সেই ছোট্টটি আছি—যে মিষ্টি কিনে খাবো কাকাবাবু? টাকা দু'টো নিয়ে আমি আমার সিঁন্দুরের কৌটায় রেখে দিচ্ছি। দু'দিন বাদে আপনার নাতি হ'লে তাকেই বরং কিছু দেবো; বল্‌বো—তোর দাদু দিয়েছে, এ তোর এক দাদুর দেওয়া জিনিষ।'

জবাব দেবার অবকাশ পেলাম না। সুন্দরীর দিকে শেষবারের মতো একবার ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম—আসন্ন মাতৃত্বের বসন্তরাগে সারা দেহে তার পল্লবিত হ'য়ে উঠেছে। প্রভাতের প্রতীক্ষায় এ যেন রাত্রির তপস্যা।

ভিজিট্

সন্দীপ গুপ্ত

চলেনা ঠিক, চালানো হয় হাওয়াটা যখন ভালো থাকে। সেটা যখন বদলায় (যেমন অসুখ করলো কারু—এমনি বেয়াড়া অসুখ যে হোমিওপ্যাথির বড়ি খাইয়েও শায়েস্তা করা গেলনা দুরন্ত জ্বর) তখন ধার করতে হয়। খুচখাচ এমনিতর ধার লোকনাথ অনেকগুলি করেছে। তার কিছু কিছু শোধ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বেশির ভাগ আজো পরিশোধ করা হয়নি। এর ফল হয়েছে এই যে চেনা মহলে লোকনাথের দুর্নাম রটে গিয়েছে। চট করে তাকে কেউ টাকা দিতে চায়না আজকাল।

এমনি অবস্থায় বাঘাটা দিন দুয়েক খামোকা হেঁচে হেঁচে ব্যামো বাঁধালে। লোকনাথের সন্তান কটির ভিতর (সংখ্যায় কম নয়) এই ছেলেটি ছিল সবচেয়ে ডানপিটে, অর্থাৎ কবিতার ভাষায় যাকে বলা চলে 'প্রাণচঞ্চল।' দিবারাত্রি চর্কিপাক খাচ্ছে; এটা ছাড়াচ্ছে; ওটা ভাঙছে। বয়েস ওর পাঁচ পুরো হয়নি, কিন্তু দুষ্টুমিতে দশ বছুরে ছেলেকেও হার মানায়। এই ছেলেটির পায়ে কিছু ত্রুটি ছিল; কিন্তু ঐ বাঁকা পায়ে অবাঞ্ছিত কোন দ্রব্য ও যখন তড়িৎ গড়িতে আক্রমণ করতো তখন তা' থেকে ওকে নিরস্ত করা একপ্রকার দুঃসাধ্য। লোকনাথ এমনিতে বাচ্চাদের কাউকে পছন্দ করতোনা। ওর ধারণা জন্মেছিল যে ওর দারিদ্র্যের জন্য এই 'শূয়োরের পাল'ই মূলত দায়ী। কিন্তু বাঘার প্রতি একটুখানি মমতা চিত্তের একটি কোণে সে পোষণ করতো।

লোকনাথের স্ত্রী মুখভার করে বললে: ওগো, বাঘার জ্বর যে ছাড়তে চাইছেনা।

ত্রিফলার জল ঠিক মত খাওয়ানো হচ্ছে? বললে লোকনাথ।

হচ্ছে তো।

তাহলে আরো একদিন সবুর করো। জ্বর আপনি ছাড়বে।

আপনি ছাড়বে! বিরক্তিতে অন্নপূর্ণা কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠলো: না খেয়ে খেয়ে বাছা আমার কাদা হয়ে গেল। অমন দুরন্ত দামাল ছেলে! বিছানা ছেড়ে উঠতে চাইছেনা কো!

তা আর কি করা যাবে? লোকনাথের অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছিল, সুড়ুৎ করে খানিকটে সর্ষের তেল নাসারন্ধ্রে চালিয়ে দিলে।

অন্নপূর্ণা বললে: তুমি ডাক্তার দেখাও!

ডাক্তার! শব্দটা এমনি অবিশ্বাস্য যে লোকনাথ তেলের বাটিতে আঙুল চুবিয়ে বিমূঢ় দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল: ডাক্তারে কি করবে।

কি আবার করবে? অসুখ সারাবে। উঠোনে ঝাড় দেবার জন্যে তো ডাক্তার বদ্যি কেউ ডাকে না।

লোকনাথ উঁচু মার্গের হাসি হাসলো। ডাক্তারে কি আর রোগ সারায়, অন্ন? ও অম্‌নি সারে।

যেটি সারবার প্রকৃতির নিয়মে সেটি সারে, যেটি সারবার নয় সেটি টেঁকে। মাঝ থেকে ডাক্তারের হাতে টাকা গুঁজে গচ্চা দিয়ে কোন মানে হয়?

বলা বাহুল্য এই চিত্ত-চমৎকারা থিওরি লোকনাথের নিজস্ব। অন্নপূর্ণা ইতিপূর্ব্বে বার কয়েক তা' শুনেছে, কোন মতামত প্রকাশ করেনি। কিন্তু নিজের শিশুর উপর এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রয়োগ করতে তার বিলক্ষণ আপত্তি ছিল। অশ্লীল একটা চীৎকার জুড়ে সে বললে: চুপ করো। লজ্জা করে না বাপ হয়ে একথা বলতে তোমার?

লোকনাথ বললে: লজ্জা? সত্যিটা বলব তাতে আবার লজ্জাটা কিসের? লোকে ডাক্তার ডাকে কেন? লোক দেখাবার জন্যে: 'এই ছাখো আমি চৌখুট্টি, টাকার ডাক্তার এনেছি!' কি জানে ছাই তোমার ডাক্তার? ছ' বচ্ছর মেডিকেল কলেজে ঘেঁষটে ঘেঁষটে টুকে টুকে পাশ করে...

তুমি আনবেনা তাহ'লে ডাক্তার?

বললাল তো। এক কথা কাহাতক বলবো?

এই তোমার শেষ কথা?

হ্যাঁ হ্যাঁ শেষ কথা। ওসব আড়ম্বর বুজরুকি বড়লোকদের ঘরে মানায় যাদের পয়সা আছে। আমাদের মত গরিব-গুর্ব্বোর ডাক্তার না হলেও রোগ সারে। আমার বাবা...

রাখো তোমার বাবা! অন্নপূর্ণা গর্জ্জে উঠলো: আমার ছেলের জন্য আমি ডাক্তার চাই। তুমি যদি না আনো, আমি ফটকুকে পাঠাবো সুবোধ ডাক্তারের বাসায়। নয়তো নিজে যাবো।

বুড়ো আঙ্গুল ও অনামিকা সহযোগে একটি মুদ্রা প্রস্তুত করে লোকনাথ বললে: পয়সা?

আমার বালা জোড়া বাঁধা দেবো। তোমার মত অমানুষের হাতে যখন পড়িছি তখন যে কিছুই থাকবেনা তা আমি জানি।

লোকনাথ ঠোঁট সূচল করে বললে: অ-হ!

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সুবোধকে ডাকতে হোল। অবশ্য এর হেতুটা এই নয় যে ওর স্ত্রী ওকে ছোট মনে করছে কিম্বা ওর ছেলে-মেয়েরা ওকে শত্রু ঠাউরে ভয় পাচ্ছে। মেয়েলি সেন্টিমেন্টের পরোয়া লোকনাথ করে না। কেবল কিছুদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়তেই...। ব্যাপারটা অবশ্য গুরুতর কিছু নয়। দুটো চীনে মাটির কাপ ভাঙবার অপরাধে অন্নপূর্ণা একদা উত্তম মধ্যম দিয়েছিল বাঘাকে। এসব ক্ষেত্রে শিশুরা সাধারণত কান্নাকাটি করে হাট বসিয়ে দেয়। কিন্তু বাবা পাছে পৌরুষে আঘাত লাগে এই আশঙ্কায় তখন কাঁদে নি। খালি সন্ধের সময় লোকনাথ যখন আফিস থেকে ফিরে এলো তখন তার হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে চুপি চুপি সে বলেছিল: বাবা, মা আমাকে মেরেছে। শিশু কণ্ঠের এই উক্তিটা স্মরণ করেই লোকনাথের কণ্ঠায় শক্তমত কি একটা পাকিয়ে উঠলো আর মনে হোল যে বাঘাকে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেওয়াটা ঠিক নয়। টাকার হিসেবটা পরে ভাবলেও ক্ষতি হবে না, কিন্তু আপাতত ডক্টর সুবোধ বসুকে নিয়ে আসা দরকার।

এলো সুবোধ বসু এম. বি.। ছোকরা হালে প্র্যাক্‌টিস্ সুরু করেছে; তাই গাম্ভীর্য্যের পরিমাণটা ঈষৎ বেশি। স্টেথিস্‌কোপের অগ্রভাগে টোকা দিতে দিতে সে বললে: হুঁ, ভয়ের বিশেষ কিছু দেখ্‌চিনে তবে... ঘস ঘষ করে প্রেস্‌ক্রিপশান লিখতে লিখতে কথাটা সে সম্পূর্ণ করলেনা।

ডাক্তারের পিছু পিছু লোকনাথ ঘর থেকে বেরুলো। বারান্দায় সুবোধ একবার দাঁড়ালে। কিন্তু লোকনাথকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে সেও তার অনুগমন করলে। সদর দরোজা খুলে দিয়ে ডাক্তারকে পথ দেবার জন্য লোকনাথ একপাশে সরে দাঁড়ালো। ডাক্তার ইতস্তত করছিল। লোকনাথ দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে নম্রস্বরে বললে: আজ তাহলে আসুন ডাক্তারবাবু।

সুবোধ ফিশ ফিশ করে বললে: ইয়ে। আমার ফীজ্। মানে চারটাকা।

লোকনাথ সলজ্জভাবে বললে: ওটা পরে দেবো।

ডাক্তারের মুখের চেহারা দর্শনীয় হয়ে উঠ্‌লো। লোকনাথ চাপা গলায় বললে: ডোণ্ট্ ওয়রি। টিউশনির টাকা কটা পেলেই...বডডো টাইট যাচ্ছে কিনা। আপনি কিছু ভাববেন না সুবোধবাবু, ডাক্তারের অন্ন মেরে কি আর রুগী বাঁচে? হ্যা, হ্যা।

কিন্তু বাঘার ব্যামোটা বোধ হয় ট্যারাচা ছিল। সুবোধের ওষুধগুলো গলাধঃকরণ করিয়েও ওর কোন উন্নতি দেখা গেল না। দিনে দিনে ও-হেন ছেলে বিছানার ভেতর ল্যাপটে যেতে লাগলো।

অন্নপূর্ণা পুনর্ব্বার ঘ্যাঙানি জুড়লে: সুবোধকে খবর দাও, ফের ডাকো।

ফী হজম করবার কথা লোকনাথ কারুকে বলেনি। বললে: সুবোধ বোঝে কি ছাই? আমি বড় ডাক্তার দেখাবো।

এবার ষোল টাকা ভিজিটের এক ডাক্তার এলো। ব্যস্ত-সমস্ত মানুষ। রুগীকে মিনিটখানেক দেখলে কি দেখলেনা, বাঁশের চোঙের মত মোটা একটা ঝর্ণা-কলম বুক পকেট থেকে বার করে প্রেসক্রিপশান লিখতে সুরু করলে।

লোকনাথ ডাক্তারের পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে বিষণ্ণ বদনে বললে: কিরকম মনে হোল স্যার?

ডাক্তার ভারি গলায় খালি বললে: সীরিয়াস্। কিন্তু সিঁড়িতে পা দেওয়ার মুখে সে ঘুরে দাঁড়ালে এবং নাক চুল্‌কুতে চুল্‌কুতে বললে: আমার ফী!

লোকনাথ অম্লানবদনে উত্তর দিলে: পরে দেবো।

পরে দেবো? হোয়াট্ ইজ দিস্?

লোকনাথ ইংরিজিতে অক্ষম নয়। বললে: সরি ডক্টর। একটা কমিশন আজই পাবার কথা ছিল। আন্‌ফরচুনেটলি তা' পাইনি। তা পেলেই আপনার দেনাটা মিটিয়ে দেবো।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ডাক্তার বললে: সিলি!

লোকনাথ বললে: অসুবিধে ঘটলো আপনার। কিন্তু পাওয়ামাত্র, যদি কাল পাই তো কালই— আপনার বাসায় টাকা কটা পৌছে দিয়ে আসব।

এ ওষুধগুলোর একটু দাম ছিল সুতরাং লোকনাথ নিজের বিবেচনামত তালিকা থেকে দুটো একটা ওষুধ বাদ দিয়ে দিলে। আশ্চর্য্য, বাঘার অসুখ ঐতেই কিন্তু সেরে গেল। অন্নপূর্ণা বললে: দেখেছ, ডাক্তারে অসুখ সারে কিনা?

লোকনাথ মুখ বিকৃত করে বললে: ছাই, আপনি সেরেছে। ওষুধ না খেলেও সারতো।

এ তর্কের মীমাংসা হওয়া শক্ত। কারণ চট্ করে বিপরীত একটা নজির পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল

না। কিন্তু আকস্মিক ভাবে তা' ঘট্‌লো। লোকনাথ নিজেই একদিন রক্তচক্ষু নিয়ে বাসায় ফিরলো এবং রাত্তিরে হোল ধুমজ্বর।

অন্নপূর্ণা ব্যস্ত হয়ে উঠলো। লোকনাথ হাত নেড়ে ক্ষীণ স্বরে নিষেধ করলে: আপনিই ছেড়ে যাবে, অন্ন, তুমি ভেবোনা। কিন্তু থার্ম্মোমিটারের পারদ যেরকম গতিতে উর্দ্ধগমন স্বরু করলে, তাতে ভাবিত না হয়ে উপায় ছিলনা।

শটকুকে স্ববোধের বাসায় পাঠানো হোল। ডাক্তার খবরের কাগজে ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগানের ফুটবল্ ম্যাচের বিবরণ পড়ছিল। মুখ না তুলেই বললে: কি চাই?

আমার বাবার জ্বর। আপনি একবার আস্‌বেন?

কে তোমার বাবা?

আমার বাবা শ্রীযুত লোকনাথ মিত্র। ২৩ এর বি…

ও। ডাক্তার খবরের কাগজের পাতা থেকে চক্ষু তুললে। বললে: ফীয়ের টাকা এনেছ সঙ্গে করে?

এমন অদ্ভুৎ উক্তি সে আশা করেনি। বললে: না তো।

তাহলে নিয়ে এসো। হ্যা, তুটো ফী। একটা তোমার ছোট ভাইরের—ঐ যে কি যেন নাম যার অস্থখ করেছিল, আরেকটা তোমার বাবার। চারটাকা চারটাকা আট টাকা। এই আট্‌টা টাকা নিয়ে এসো। তারপরে যাবো।

বিচলিত হলেও শট্‌কু বিমূঢ় হয়নি। বললে: টাকা আপনি বাসায় গেলে পাবেন, মা বলে দিয়েছেন।

একটা কঠিন উক্তি স্ববোধের জিভ থেকে বেরিয়ে আসছিল। কারণ, চিকিৎসক শ্রেণীতে সে নবাগত; তার খ্যাতি অল্প, আয় অল্প, পুরো চারটে টাকার শোক এতো সহজে বিস্মৃত হওয়া তার পক্ষে একটু কঠিন। তবু ভদ্রতার খাতিরে আত্মসম্বরণ করতে হোল। বললে: ও। তা তোমার মাকে বোলো গিয়ে তাহলে যে টাকা দেবো বলে যারা টাকা দেয়না, সেখানে আগাম না নিয়ে তো যেতে পারিনে। ওই ফীয়ের ওপরই তো আমাদের করে খেতে হচ্ছে হে, বুঝেছ? স্ববোধ টেনে টেনে খানিকটে হাসলো।

কিন্তু অন্নপূর্ণা কিছু জানতোনা। এখন শট্‌কুর মুখে আদ্যোপান্ত ব্যাপারটা অবগত হয়ে সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। লোকনাথ ঘুমুচ্ছিল, তার গায়ে সজোরে একটা ঠ্যালা দিয়ে ভীষণভাবে সে বললে: হ্যাঁগা, তুমি নাকি স্ববোধ ডাক্তারকে পয়সা দাওনি?

ঘুম ও জ্বরের জড়তায় লোকনাথ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকালো। তারপর বস্তুটা হৃদয়ঙ্গম করে সহজভাবেই সে উত্তর দিলে: না, দিইনি।

কেন দাওনি?

কেন? কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল, তবু উত্তেজনা-জড়িতস্বরে লোকনাথ বললে: কেন দেবো? ওর ওষুধে অস্থখ সেরেছিল বাঘার?

ন্যায় শাস্ত্রের এই সূক্ষ্ম কৌশল অন্নপূর্ণা চট করে আয়ত্ত করতে পারলেনা। বললে: শট্‌কু গিয়েছিল, তাকে যা নয় তাই বলে গালাগাল দিলে ডাক্তার বেটা। তোমার জ্বালায়…

লোকনাথ চিঁ চিঁ করে বললে: আমার ডাক্তারের কোন দরকার নেই। তারপর কায়ক্লেশে একটি নিঃশ্বাস মোচন করে চক্ষু বুজলে।

কিন্তু মুখে না চাইলেও শরীরের দিক থেকে প্রয়োজন ছিল। সেটা টের পাওয়া গেল যখন বেহুঁশ জ্বরে লোকনাথ প্রলাপ বকতে স্বরু করলো। রাত্তির যখন গভীর। বিব্রতা অন্নপূর্ণা গামছা ভিজিয়ে ওর মাথায় মুখে ও কপালে জল দিতে লাগলো। ভোরের দিকে রুগী নিস্তেজ হয়ে এলো। ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না; একটা আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি। অন্নপূর্ণা শট্‌কুর হাতে আটটি টাকা গুঁজে দিয়ে বললে: শিগগির স্ববোধকে আসতে বলিস! ও যেন কেমন করছে!

স্ববোধ বস্থ এম. বি. এম্‌নিতে লোক মন্দ নয়। এই অসময়ে শট্‌কুর শুখনো মুখ দেখে ও লোকনাথের অবস্থা শুনে তাড়াতাড়ি গায়ে একটা সার্ট চাপিয়ে ডাক্তারি ব্যাগটা হাতে নিয়ে সে বেরিয়ে এলো। কিন্তু রুগীর ঘরে ঢুকে একচমক পরীক্ষাকার্য্য সমাধা করেই ওর মুখখানা, শরবৎ ভেবে চিরতার জল খেলে যেমন হয়, তেম্‌নিধারা আকৃতি ধারণ করলো। ইন্‌জেক্‌শানের স্থচটা বার করতে যাচ্ছিল, কি ভেবে তা আর করলেনা। হাতব্যাগের বোতাম টিপে অকস্মাৎ উঠে দাঁড়ালো।

অন্নপূর্ণা কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে: ভালো হবে তো ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার মুখ ফিরিয়ে বললে: শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

শট্‌কু ওর পিছু পিছু ছুটে গেল। হাতে সেই আটটি টাকা: বললে: ডাক্তারবাবু, আপনার টাকা ক'টা।

স্ববোধ ওর ডানহাতখানা মুঠিতে চেপে ধরে বললে: টাকা আমি নেবোনা।

শিবের গীত

কাঁদে কুচকুচ তুই কান্তা
ভর দিয়ে দেখি শুধু ধ্যান তা
বহনের কামনার কান্না
কাহনে-বাহনে কিছু ধান না! স.ভ.

নূতন বই

নরকে এক ঋতু ঃ র‍্যাঁবো [অনুবাদক—শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্য্য ॥ প্রকাশক—নাভানা ॥ ২৲]

র‍্যাঁবোর ধরনের মানসিকতা আজকাল ফরাসীর অপরাধ-প্রবণদের ভেতরও কিছু-কিছু পাওয়া যায়, যেমন জ্যঁা জেনে। তবে, সম্ভবত ফরাসী সংস্কৃতির উদারতার এদিকটা পারী কম্যুনের দিনে র‍্যাঁবোর মতো বালকের আবির্ভাবেই গত শতক থেকে সুরু হয়েছিল। র‍্যাঁবো যথার্থত ভাবতেন যে মোন্‌গল্‌ রক্তেই এ-ধরণের অপরাধ ও বেপরোয়া দেওয়ানা বৃত্তি ফরাসীর গল্‌-এলাকার মানুষদের ভেতর সঞ্চিত হয়ে আছে। অপরাধ খুব স্বাভাবিক-ভাবে অসহায়তায় ঢলে পড়ে দয়া-প্রার্থী হয়ে থাকে—এ-বৃত্তি-ও র‍্যাঁবোতে দেখা যায়। অপরাধীর জগৎ আলাদা—আলো-ছায়া সেখানে অপার্থিব অপ্রাকৃত রেখায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন ছবি দেখায়, যাকে ভাষায় ব্যঞ্জনা দিলে কাব্যধর্ম্মগত ছবি হয়ে ওঠে। অবশ্য বাস্তব জীবনের বিকৃত অবস্থাই কিম্বা উৎসাহউদ্দীপনাহীন ক্লান্তিকর বাস্তব জীবনই সমাজে অপরাধ-প্রবণ মানুষের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে ; সুতরাং ফরাসী র‍্যাবোর জীবন ও কাব্য বিচার করে আমরা শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে অপরাধী মানব বলে করুণা দেখাতে পারি, যেমন রাবণকে দয়াপ্রার্থী হতে দেখে আমরা তাঁকে মানব (রাক্ষস নয়) ভেবে ক্ষমা করে ফেলি। উনিশ-শতকে বাংলাদেশে মধুসূদন ব্যতিরেকে আর কেউ র‍্যাঁবোর মনোভাবের সমান্তরাল হতে পারতেন না ; যদিও দুজনের অপরাধ দু'ধারায়, তবু অ-স্বাভাবিক জীবন-যাপনে উভয়েই উৎসাহী ছিলেন। অপরাধ বস্তুটিকে ফরাসী মননশীলরা মানবিক বলে থাকেন। তাঁদের ধারণা ও যুক্তি এই : যেমন অস্বাভাবিক জীবন মানবই যাপন করতে পারে তেমন অপরাধও মানবই করতে পারে—পশু অপরাধী হতে অসমর্থ। এই উদারতা ফরাসী জীবনে যে-ধরনের ফল প্রসব করে, তার উত্তম নমুনা র‍্যাঁবো। তবে এ-জীবন থেকে যে জীবনের সৎ আলো বিচ্ছুরিত হয় না, এমন নয়। দ্বন্দ্বাচ্ছন্ন অবস্থা কাটিয়ে র‍্যাঁবো এ-ধরণের কথা-ও বলেছেন :

"মন আমার, সাবধান হও। হিংসাত্মক নমস্কারের দলে ভিড়োনা।"

"না—আজ আমার বিদ্রোহ মৃত্যুর বিরুদ্ধে। গর্বের চোটে কাজটা খুবই হাল্কা মনে হচ্ছে"

"অবসন্ন হয়েই মরেছি কেবল। তাতেই তো কবর—পালালাম কাব্যের দিকে, ভয়েরও ভয় যা।"

র‍্যাঁবোর গ্রন্থখানি যিনি অনুবাদ করেছেন, তিনি ফরাসী ভাষা জানেন, তার উপর তিনি একজন তরুণ বাঙালী কবি। সুতরাং আমরা ভাবব যে র‍্যাঁবোর রব ভাষান্তরিত অবস্থায় যতোটুকু সম্ভবপর ধ্বনিত হয়েছে। বইটির অবয়ব-প্রসাধনে 'নাভানা' যত্নের ত্রুটী করেন নি।

স. ভ.

অনুলেখা নাম ঃ হৃষীকেশ ভাদুড়ী। আড়াই টাকা ॥

না-উপন্যাস না-ছোটগল্প। শুধু একনায়কত্বকে সামনে রেখে বিভিন্ন টুক্‌রো কাহিনীর সংকলন—একই সুতোয় গাঁথা নানাকথার মালা—এই ধরণের সাহিত্যিক কারুকর্ম যদিও হামেশাই আমাদের চোখে পড়ে না, তবু কখনো কখনো দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে, বিস্মিত এমনকি স্তব্ধ করে।

কিন্তু যে কাহিনীতে সন্দেশ বা চানচুর কোন রসেরই আস্বাদ নেই, কেবল রসসৃষ্টির অক্ষম প্রচেষ্টা মাত্র উপস্থিত, তেমনি গল্পরচনায় পাঠকের মন কখনো তৃপ্ত বা স্থিরনিবিষ্ট হ'তে পারে না ; বিশেষ ক'রে যে-ধরণের রচনা শিল্পক্রীড়ার বিশেষ অনুশীলনে আস্থাশীল, সেইসব রচনার ক্ষেত্রে অকুশলী লেখকের উপস্থিতি পাঠকের ধৈর্য্যকে প্রহারই করে, কোন আহারই যোগায় না। হৃষীকেশ ভাদুড়ীর 'অনুলেখা নাম' গল্পরচনায় কাঁচা হাতের ছাপ এতবেশী প্রকট, এবং এইসঙ্গে বালক-সুলভ উচ্ছ্বাসের এতবেশী ছড়াছড়ি যে বইটি নতুন লেখকের প্রথম রচনা হ'লেও, লেখককে কোনরূপ সাধুবাদ অভিনন্দিত করতে আমাদের মন সায় দেয় না। যে অমলদাকে লেখক প্রায় পরমপুরুষ ব'লে অভিহিত করতে চেষ্টা ক'রেছেন তার চরিত্রে কোন বৈশিষ্ট্যই কোথাও দানা বাঁধেনি, এবং বইয়ের অন্তর্গত প্রত্যেকটি টুক্‌রো কাহিনীকেই অত্যন্ত মন্থর ও ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। আমরা লেখকের কাছে অন্যধরণের অভিজ্ঞ রচনা প্রত্যাশা করি।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নতুন পৃথিবীর গান / নতুন দিনের গান } শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য। মানসবানী ঃ বৈকুণ্ঠপুর ঃ পোঃ রাজপুর ২৪ পরগণা।

প্রাচীন পৃথিবীতেও ভারতীয় মানবতাবাদ প্রভাব বিস্তার করেছিল, বিগত দিনেও শুভচিন্তা ও শুভবুদ্ধি আমাদের আদর্শ ছিল। তাই যে বিরাট ঐতিহ্য ভারতবাসীকে সদা অনুপ্রাণিত করছে তাতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের ভাব কিছুটা নিহিত আছে—কারণ পুণ্য-লব্ধফল নিজস্ব। কিন্তু সমবায় নীতিতে পরস্পর সহযোগিতা প্রথম অঙ্গীকার, দায়িত্ব একার নয়, সকলের।—একজনের আত্মশুদ্ধিতেই অপরের দোষক্ষালণ হবে না—নিজেরও নয়।

বহু বৎসর ধরেই আমাদের দেশে সমবায় অন্দোলন চলে এসেছে। তবে একে আন্দোলন মনে করা হয়নি, কারণ আন্দোলন পরিচালনা করতো ব্রিটিশ সরকার নিজেদের শোষণ স্বার্থ রক্ষা করে। বর্তমান ভারতে সমবায় কল্যাণরাষ্ট্রের মানদণ্ড, মহত্তর সমাজব্যবস্থার ইঙ্গিতে। কাজেই, এ সময়ে কালীপদবাবু এ আন্দোলনের চারণকবি হয়ে জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবেন বলে আমি মনে করি। কারণ তিনি এ আন্দোলনে কায়মনোবাক্যে একাত্ম হয়েছেন। এঁর প্রতিটি কবিতা সুরসংযোগে গীত হলে লোকের মনোহরণ করতে পারবে।

সমবায়ের সূত্র কালীপদবাবু অনেক মহত্তর ভাবনায় উত্তরণ করেছেন, যার মূল্য কবিতা হিসাবেও যথেষ্ট। পাঠক যদি কবি না হয়ে থাকেন, এ বই দুটীর নিশ্চয়ই তিনি সমাদর করবেন। জানিনা, কবিরা সমবায়-নীতি অনুসরণ করতে পারেন কী না?

অমল দত্ত

'বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন'

নাগরিক জীবনের সঙ্গে পল্লীজীবনের সংস্কৃতির যোগাযোগ আজকাল প্রচার ও উৎসবানুষ্ঠানে করতে হয়। গতবছর-ও তা করা হয়েছিল, এবারেও করা হবে। ৩০নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটে ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটির একাংশে উক্ত সংস্কৃতি সম্মেলনের কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত। সম্মেলনের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিমাত্রই সদস্য পদ গ্রহণ করিতে পারেন।

আদর্শ বলতে সম্ভবত উদ্যোক্তারা মুখ্যত সংস্কৃতির যোগাযোগই বোঝেন—অনুষ্ঠানটি হয়ত গৌণ। গত এক বৎসরে এই আদর্শসেবী সদস্যরা পল্লী-নগরের সাংস্কৃতিক অনৈক্য কি পরিমাণে দূরীভূত করেছেন তা আমরা জানিনে। যে পরিমাণ ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বাঙালীমাত্রেরই হৃদয়ারাধ্য বস্তু, স্তূপীকৃত সে জঙ্গলের কিয়দংশ সরাবার মতো ব্যক্তি আজ বাংলাদেশে কেউ নেই। সুতরাং সম্মেলনের মান শেষটায় অবধারিত ভাবে বার্ষিক ও বাহ্যিক অনুষ্ঠানে বা উৎসবে মাত্র পর্য্যবসিত হয়। এসব উৎসব বন্ধ করার প্রস্তাব অবশ্য আমাদের মনে স্থান পায়না, তবে আমরা উদ্যোক্তাদের এই অনুরোধই জানাতে পারি যেন তাঁদের উদ্দেশ্যটি সচ্চিত্র লাভ করে ক্রমে পল্লীর ও নগরের ব্যবধানের উপর একটি শক্ত সমর্থ সেতু রচনা করে দেয়।

পল্লীর সংস্কৃতিতে অদ্ভুতরস পেয়ে হয়ত নাগরিকরা আনন্দিত হন কিন্তু নাগরিক সংস্কৃতিতে কিম্ভূত রস পেয়ে যে পল্লীবাসীরা নিরন্তরই দুঃখিত হচ্ছেন, এ ব্যাপারটা দূর করতে হলে প্রভূত পরিশ্রমের দরকার—আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি। সুতরাং পরিশ্রমী পুরুষরা যতো বেশী পরিমাণে এই সম্মেলনের সদস্যপদ গ্রহণ করবেন, 'বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন' ততবেশি পরিমাণে আদর্শ-সেবী হতে পারে। সংস্কৃতির বৃত্ত এমনই বুনোটে তৈরী যে নগর কোনোদিন পল্লী হবেনা, পল্লীরও নগর হবার সম্ভাবনা বিশেষ নেই। এ-সূত্রটি এ-উপলক্ষে বিবেচ্য।

কড়ির মতন বক, পাণকৌড়ি আর
এই নিয়ে ভাবা যায় বিলের সংসার। স.ভ.

পূর্ব্বাশা
মাঘ—১৩৬১

সাম্প্রতিক ইতালীয় উপন্যাস

বনবিহারী দত্ত

গত কুড়ি বছরের সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইতালীয় উপন্যাসে কোন গোষ্ঠীবিভাগ নেই। সুইডিস বা ইংরেজী উপন্যাসিকদের মত ইতালীয় উপন্যাসকারেরাও আজ ভাবীকালের দ্বারা অনুসৃত হচ্ছেন না। কারণ, স্বাধীন রাজনৈতিক মতবাদের সৃষ্টি। যুদ্ধপূর্ব ইতালীয় উপন্যাসে রাজনৈতিক চিন্তাধারার আভাষ ছিলনা বললেই চলে, কিন্তু, আজ কয়েকজন উপন্যাসিকের মধ্যে যখন সেই শ্রেণীর মতাদর্শ রূপ পেল, সাহিত্যে বিশেষ জীবনবেদের ইঙ্গিত যখন তাঁরা দিলেন তখনই ইতালীয় উপন্যাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হল। পণ্ডিত মহলে সে সূচনা সমরোত্তর অগ্রগতি বলে আখ্যা পেল।

ইতালীর যুদ্ধোত্তর সাহিত্য যথেষ্ট প্রাণশীল। বিশেষ করে উপন্যাসের ক্ষেত্রে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। ক্ষুদ্রকায় এ প্রবন্ধে তাঁদের সকলের আলোচনা করা বৃথা। তদপেক্ষা এ কালের ভাবধারার ধারক এমনি ক'জনের আলোচনা করাই সমীচীন।

অধুনাতন ইতালীর সর্বশ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক গাব্রিয়ল দ্য আনানজিওর কৃতী উত্তরাধিকার মৃতপ্রায় হল কতিপয় লেখক নামধেয়দের দ্বারা। তারপরেই উল্লেখ করতে হয় সাম্প্রতিক কালের মোরাভিয়া প্রসঙ্গ।

ফাসিস্ত শাসনের শেষের দিকে সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারী হয় আলবার্তো মোরাভিয়ার রচনার প্রতি। ছদ্মনামে লিখতে সুরু করেন মোরাভিয়া। তাঁর প্রথম উপন্যাস Gli Indifferenti (The Time of Indifference) এই ফাসিস্ত শাসনের মৃতবৎসার কালে উজ্জ্বল সাফল্যের অখণ্ড স্বাক্ষর রাখে। প্রাণবান ইতালীয় সাহিত্যচেতনার ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখেন মোরাভিয়া। মোরাভিয়ার শিল্পী-জীবনে ক্লাসিক ঐতিহ্য স্বপ্রধান। আর সঙ্গে সঙ্গে আনানজীয় ক্ষয়বাদ, ম্যারিনেশীয় ভবিষ্যতবাদ ও অসুস্থ মনোবিকারের সকল প্রভাব হতেই তিনি আশ্চর্যরূপে মুক্ত। তাঁর প্রথম উপন্যাসেই

মোরাভিয়া তাঁর সত্যকার কাব্যময় জগতের সন্ধান পান। ইতালীর মধ্যবিত্ত জীবন—ভণ্ডামী, নৈতিক অধোগামিতা, মনোবৃত্তিক পলায়নপরতা, পাশবিক ক্ষুধা যে জগতের প্রাত্যহিক ঘটনা, সে জগৎ নিয়েই সাহিত্যকাজ সুরু করলেন তিনি; জীবনের এই ক্ষুদ্রতা, বিকৃতি যা তাঁর মত জীবনশিল্পীর কাছে এক বিশেষ অর্থবহন করে—সেই পৃথিবীতেই প্রাণ পেল মোরাভিয়ার চরিত্রদের ভেতরে।

যদিও যুদ্ধ-শেষেই মূলতঃ তাঁর শিল্পকর্ম প্রচারিত হল ব্যাপকভাবে তথাপি তাঁর পরবর্তী দুটি উপন্যাস—Il conformista (The conformist) আর La Ramana (The Woman of Rome) আধুনিক ইতালীয় উপন্যাসে বিস্ময়কর প্রতিনিধিত্ব অর্জন করেন। Il conformista-র বিষয় তাঁর প্রথম উপন্যাসের মতই মধ্যবিত্ত জীবন প্রণালীর প্রতিবেশে গড়া। সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি হল এই: সম্ভ্রান্ত কোনো যুবক তার সমকামবৃত্তির প্রাবল্য একদিন অকস্মাৎ জানতে পেরে শঙ্কিত হয়, তার মর্যাদাবোধে আঘাত লাগে। পুনরায়, যে সমাজে সে বাস করে সেই সমাজিক শ্রেণীর মতই স্বাভাবিক হতে চায় সে। দুভার্গ্যবশতঃ, যারা তাকে স্বাভাবিক হতে সহায়তা করবে তারা দুজন হল তার মা এবং স্ত্রী। মা তার কামোন্মাদ—আর স্ত্রী তার ধূর্ত, যার একমাত্র বাসনা ছিল ধনী স্বামীর গৃহিণী হওয়া। সুতরাং, এই পরিবেশ তার শারীরিক দুর্বলতার প্রতিষেধক না হয়ে তাকে বিপথে ঠেলে দেয়—রাজনৈতিক অপরাধে প্রবৃত্ত হয় সেই যুবক।

La Romana মোরাভিয়ার আরেকটি উল্লেখ্য সৃষ্টি। একটি প্রস্ফুট চরিত্র, শিল্পগত ঐক্য আর মনোগ্রাহী কাহিনী এর বৈশিষ্ট্য। চিরাচরিত সংজ্ঞায় এটি উপন্যাস। এর নায়িকা ডিফোর 'মোল ফ্লাণ্ডার্সের' মত একজন গণিকা। ইতালীয় মধ্যবিত্ত সমাজ এখানে মূর্ত হয়েছে অপরূপ হয়ে। এ সমাজবাসী মানুষের অন্তরের কথা অব্যক্ত। অর্থের দৈন্যে, বুদ্ধি ও শিক্ষার অভাবে প্রকাশহীন নানাভাবে। তবুও, এই স্তরের মানুষের যে স্ব স্ব নৈতিক জগৎ আছে, শুভচেতনাও যে অজ্ঞান অন্ধকার থেকে মধ্যে মধ্যে তাদেরও প্রবুদ্ধ করে এখানে এই হল মোরাভিয়ার লক্ষ্য। উপন্যাসটি নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি বলেন অনেকে। বস্তুত, গ্রন্থটির এই একটি দুর্বলতা। যদিও মনে হয়, একাজ মোরাভিয়া স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে করেছেন কেননা, তাঁর অপর উদ্দেশ্য উৎকর্ষ ও প্রতিকর্ষকে একই সৌন্দর্য জগতে বিধৃত করা। অলোকসামান্য দক্ষতা নিয়ে এক দৃষ্টিকোণ থেকে আরেক কোণে বিচরণ করেছেন তিনি ইচ্ছেমত।

মোরাভিয়া তাঁর স্বসৃষ্ট জগতকে উপভোগ করেন, নীতি-প্রচারের উদ্দেশ্যে শিল্পকর্ম সাধন করেন না কখনো। তিনি যা দেখেন, যে জীবন বিশ্লেষণ করেন তা একান্তই উর্ধ্বশিল্পমানসের সৃষ্টি। কাহিনীশেষে যে নৈতিক সত্য উদ্ঘাটিত তাঁর রচনায়, তার জন্য পৃথক কোন প্রয়াস নেই মোরাভিয়ার। স্বতই সে-সত্য তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি থেকে উৎসারিত হয়ে আসে যেন।

ইগ্‌নেজিও সিলোন যদিও খ্যাতিবান উপন্যাসিক তবুও মোরাভিয়ার তুলনায় তাঁর সৃষ্টিকাজ নিম্নশ্রেণীর। সামাজিক সমস্যার প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষণীয়। তাঁর জীবনের রাজনৈতিক পটভূমি প্রথমতঃ কমুনিস্ট পরে স্যোসাল ডেমোক্রাট হিসাবে। তাঁর উপন্যাসের নায়ক নায়িকারা দরিদ্র, নিঃস্ব শ্রেণীর প্রতিনিধি। অশিক্ষা আর দারিদ্র্যের সমস্যামোচনই তাঁর লক্ষ্য। কর্মী হিসাবে

জীবনে যদিও তিনি ভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের অংশভাক্‌, তথাপি, সাহিত্যে সামাজিক সমস্যার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ডিকেন্সের অনুগামী। ডিকেন্সের মত তিনিও মানুষের সনাতন সুকৃতিতে বিশ্বাসী। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি, নানা রঙে রঞ্জিত মনুষ্য চরিত্র অঙ্কনে তাঁর কৃতিত্ব অপরীসীম। তাঁর উপন্যাস Fontamara, Pane e Vino, Una Manciata di more হতে উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সম্বরণ করা কষ্টসাধ্য। সিলোনের রচনাশৈলী মোরাভিয়ার মত তেমন সচেতন, সূক্ষ্ম ও মার্জিত নয়। অনেকের মতে তাঁর শব্দগঠন অসংলগ্ন, কিঞ্চিৎ দোষদুষ্ট। তবুও তাঁর অন্যতম গুণ: তাঁর রচনা মধ্যে মধ্যে মনোগ্রাহী, স্বচ্ছন্দ ভাব ও ভাষায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

সিলোন যদি সমাজবাদী হন গ্যারেসী তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত। গ্যারেসী মনে প্রাণে সাম্রাজ্যবাদী। বর্তমান ইতালীয় সরকারের প্রতি তাঁর গভীর অবিশ্বাস। তাঁর সাহিত্যজীবন সুরু হয় প্রাকৃতিরিশে যখন তিনি সর্বপ্রথম Bertoldo-তে লিখতে সুরু করেন। 'বারটোল্ডো' ছিল তৎকালীন ইতালীর সবসেরা হাস্যরসের পত্রিকা। যুদ্ধের কয়েক বছর পূর্বে তাঁর প্রথম উপন্যাস It destino Li cheama Ctotilde-তে ইংরাজী সাহিত্যের জেরোমের হাস্যরসের ধারাকে অবলম্বন করেন। যুদ্ধশেষে তিনি 'ক্যানডিডো' নামে এক সাময়িকীর সম্পাদক হন। 'ক্যানডিডো' 'রায়টোল্ডোর' আদর্শ অবলম্বনে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ হতে ১৯৩৯ পর্যন্ত 'ক্যানডিডো' ইতালীতে প্রকাশিত সাপ্তাহিকের মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত হয়। এমন কি ১৯৪৮ সালের কম্যুনিস্ট বিরোধী প্রচারে 'খৃষ্টান ডেমোক্রাট' দলের বিজয় সম্ভব করে তোলে এই 'ক্যানডিডো'। তৎকালে 'ক্যানডিডোয়' গ্যারেসীর যে সব রচনা প্রকাশিত হয় সে সব ইতালীয় সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। অবশ্য এর পর 'ক্যানডিডো'কে তিনি পুরোপুরি রাজনৈতিক মতাদর্শের পত্রিকা করে তোলেন। দুভার্গ্যবশত, শক্তিশালী এ-পত্রিকাটির স্থির মতবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হল অবশেষে।

Don Comillo গ্যারেসীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বিষয় বস্তু এক ধর্মযাজক ও কম্যুনিষ্ট মেয়রের সংঘাত; স্থান, উত্তর ইতালীর এক গ্রাম। 'ক্যানডিডোয়' পূর্বপ্রকাশিত এ কাহিনীর সব অংশ তেমন সুসংহত গঠনে দৃঢ় নয়। গ্যারেসী-রসরচনায় অদ্বিতীয়, কিন্তু যখনই তিনি আবেগময় হয়ে পাঠকদের অনুভূতি দ্বারে সাড়া তুলতে চেষ্টা করেন তখনই তাঁর রচনা অতিসাধারণ পর্য্যায়ে গিয়ে পৌছয়। প্রকৃতবিচারে রসরচয়িতা হিসাবে ইতালীয় সাহিত্যে তাঁর দান অপরীসীম কিন্তু যখনই তিনি গুরুবিষয় নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন তখনই তা আশ্চর্যরূপে ব্যর্থ হয়ে দাঁড়ায়। শোনা যায় তাঁর আগামী রচনাগুলি আর এ-জাতীয় হবে না; কিন্তু সেইটেই হবে সবচাইতে দুঃখের, কেননা তিনিই প্রকৃতরূপে ইতালীয় সাহিত্যে রসকৌতুক প্রাণনারপথিকৃৎ।

আরও তিনজন নবীন লেখকের উল্লেখ না করলে আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না। কারণ, বর্তমান ইতালীর প্রভাবশীল বামপন্থী ধারাকে শক্তিমান এ তিনজন প্রাণবান করে তুলতে সর্বদাই সচেষ্ট। ভাস্কো প্রাতোলিনি কম্যুনিস্ট আর তাঁর সাহিত্যে রূপ পেয়েছে একটি বিশেষ স্থান—ফ্লোরেন্স। তিনি নিজে ফ্লোরেন্সনিবাসী। আর স্বস্থানের দরিদ্র, নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণকে অবলম্বন করে তাঁর ভাবচেতনা প্রবাহিত হয়েছে। তাদের হৃদয়ানুভূতি, ব্যথাবেদনা, প্রবল প্রতিক্রিয়া সকল মূর্ত হয়েছে তাঁর সুবেদী চিত্তে। তাঁর প্রথম উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে ফ্লোরেন্স ফাসিস্ত শাসনের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দুঃস্থ

সাধারণদের নিয়ে। তাঁর সর্বাধুনিক গ্রন্থটিতে তিনি ভিন্ন পন্থা নিয়েছেন, সেখানে কতকগুলি কল্পিত চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তিনি ; পড়তে পড়তে মনে হয় তিনি যেন তাঁর বিশেষ লক্ষ্য থেকে দূরে সরে গেছেন এখানে। নিশ্চিত রূপে, তাঁর এ লক্ষ্যভ্রষ্টতা অযত্ন জনিত আর তার পক্ষে এ-ভ্রম ক্ষতিকর। প্রাতোলিনি 'ফ্লোরেণ্টাইন', যে কারণে সেরা সমালোচকদের বিরূপ সমালোচনাও তাঁর উপর বর্ষিত হয়। তথাপি, তাঁর রচনাভঙ্গী ক্লাসিকগুণ মণ্ডিত আর সর্বদাই মৌল ভাব-কল্পনায় প্রবহমান।

প্রাতোলিনির পরেই উল্লেখ করা চলে সিজার পাভিস ও কার্লো লেভি-র নাম। যদিও রচনার গুণবিচারে তাঁদের দুজনে কেউই প্রাতোলিনির সমকক্ষ নন্। উভয়ের রাজনৈতিক আদর্শ আছে। পাভিস সিলোনের মতই কম্যুনিস্ট ছিলেন এবং সেকালেই তিনি প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন। সিলোনের সোশ্যাল ডেমোক্রাট দলে যোগদান তাঁকে নির্দিষ্ট পথের সন্ধান-দিল,—জলন্ত সমস্যাকীর্ণ জীবনের ইঙ্গিত পেলেন তিনি ; কিন্তু, পাভিসের চিন্তাজগতের নিঃস্বতা তাঁকে দিনদিন আত্মরতিময় একক অস্তিত্বের বশবর্তী করছে।

কারলো লেভি সামাজিক সমস্যাগুলিতে গণতান্ত্রিক সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ দক্ষিণ ইতালীর অনুন্নত মানুষের জীবনালেখ্য। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা, L' orologio-তে দেখা যায় তাঁর শিল্পীজীবনে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। তাঁর মনোভঙ্গিতে, চেতনায় সর্বত্র সূক্ষ্ম পরিবর্তন তাঁকে নবতর উপলব্ধির ক্ষেত্রে পৌঁছে দেবে। মনে হয়, সমাজ ও রাজনীতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী—ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সমস্যার মাধ্যমে রূপ লাভ করবে। হয়ত সেদিন তিনি ভ্রষ্ট হবেন তাঁর দলগত আদর্শ থেকে, তবুও এই সাহিত্য-বোধের নাটকীয় আত্মপ্রকাশ তাঁকে জয়েসের একমাত্র উত্তরসাধকরূপে পরিণত করবে বলে আশা করলে অন্যায় হবে না নিশ্চয়।

অবশেষে, এ আলোচনা প্রসঙ্গে মনে পড়ে ফরাসী ও ইংরেজী উপন্যাসের প্রাথমিক কালের কথা। ফরাসী উপন্যাসের বক্তব্য বরাবরই সুস্পষ্ট, বাস্তবানুগ ও সূক্ষ্ম। ইংরেজী উপন্যাসের প্রকাশভঙ্গী সে তুলনায় কিঞ্চিৎ স্থূল ও কাহিনীবাহুল্যে জর্জর, যদিচ আবেগময়তার ক্ষেত্রে উভয়েই ছিল তুল্যমূল্য। কিন্তু আজ মানবমনের নানামুখী বৃত্তির সম্প্রসারণে, সমাজসাম্যবোধের তাগিদে ও জীবনের প্রতি সাহিত্যের অখণ্ড কর্তব্য বোধে বিশ্বসাহিত্যের সব উপন্যাসই আবেগময়তা থেকে মননশীলতায় উন্নীত হয়েছে। কলাকৈবল্যে বিশ্বাসী নই আমরা, নির্দিষ্ট তালিকা আছে আমাদের সম্মুখে। প্রত্যেক মানবতাবাদী সাহিত্যের মত ইতালীয় উপন্যাসেও সে লক্ষণ সুস্পষ্ট। নবীন কয়েক জনের মনে ভ্রান্তি দেখা দিলেও, মতের পরিবর্তন হলেও, জীবনের প্রতি আস্থা হারাননি তাঁরা কেউ-ই।

"দীন পেত্রার্কের দূর মৃত্যুর বেদনা
দেবতা-নিশ্বাসে খোঁজে বুঝি যুক্তিকণা।" স্যর ফিলিপ সিড্‌নী

রোমের চিঠি

আতাউর রহমান

[সম্পাদকের নিকট লিখিত ব্যক্তিগত এ-চিঠি এখনকার রৌম্য সাহিত্যিকদের সম্পর্কে একটি প্রত্যক্ষ চিত্র দান করে বলে তার কিয়দংশ এ-স্থলে মুদ্রিত হ'ল। সম্পাদক]

রোম। ২০.১.৫৫.

কায়রো থেকে রোম। এক জগৎ থেকে অন্য জগৎ। তবুও যেন কোথায় খানিকটা মিল আছে। কায়রো থাকতে রোম সম্বন্ধে যে আবছা ধারণা হয়েছিল, এখানে এসে তা যাচাই করতে গিয়ে বার বার মনে হয়েছে, এ'ত আগেই জানি। ইতিহাসের Continuity মানতেই হয়। তবে ইয়াঙ্কি লেখকদের বই পড়ে রোম সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, সে রোমকে খুঁজে পাওয়া যায় না। হয়ত ভাষা না জানার জন্যই খুঁজে পাচ্ছি না। কায়রোতে হৈ হুল্লোড় করে দিন কেটেছিলো। এখানে তা একদম অনুপস্থিত। শতকরা ৫জন রোমান ইংরাজি জানে কি না সন্দেহ। দু' একটা কথা ইতালীতে এখন-বলতে পারি, কিছু কিছু বুঝতেও পারি, কিন্তু কোন কাজে এলো না। আগামী সপ্তাহে রোম থেকে বিদায় নিতে হবে। ইগনাৎসিও সিলনীর সঙ্গে ২।৩ দিন আলাপ হলো। ভদ্রলোক এক অক্ষর ইংরিজি জানেন না, তাঁর সুন্দরী স্ত্রী চমৎকার ইংরিজি বলেন। তিনিই দোভাষীর কাজ করলেন। কিছুতেই রাজনৈতিক আলোচনা বা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করলেন না। ভারতীয়দের সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা মানব রায় আর উদয়শঙ্করকে দিয়ে। * * * * * * * । চুপ-চাপ অল্পভাষী সিলোনীকে আমার ভালো লেগেছে। যখন চুপ করে থাকেন তখন বৈশিষ্টহীন অতি সাধারণ বলে মনে হয়, কিন্তু ঠোঁট খুললেই মনে হয় যা বলছেন তার প্রত্যেকটি কথা তিনি বিশ্বাস করেন এবং শ্রোতাও বিশ্বাস করুক—এই চান। আলবার্তো মোরাভিয়ার সঙ্গেও আলাপ হলো। মোরাভিয়া ইংরিজি জানেন। যতক্ষণ ছিলাম টাকা আর মেয়ে মানুষ—এই ছিলো আলোচনার বিষয়। ফারুক, আর তার ইতালীয়ান নায়িকা, ইতালীতে কি কি ভালো Pornography আছে, আরবরা কোন ইতালিয়ান অভিনেত্রীকে ভালোবাসে—এই আলোচনাতেই রাত ১০টা বেজে গেলো। আবার বোধ হয় আগামী কাল দেখা হবে।

রোমে অনেক দর্শনীয় জিনিষ আছে। তার মধ্যে মাত্র মুসোলীনির কীর্ত্তি কলোশিয়াম আর আর জুলিয়াস সিজারকে যেখানে হত্যা করা হয়েছিলো সেই সেনেটের ধ্বংস স্তূপ ছাড়া বেশী কিছু দেখা হয় নাই। একটা মিউজিয়ামও দেখি নাই, তবে ভ্যাটিকানের গির্জ্জা দেখেছি। আমার মনে হয় বর্তমান কালে সবচেয়ে আরামে থাকে পিতা পোপ। ....

উত্তর

কায়রোতে কুড়িয়ে পাওয়া স্বর্ণ আলিঙ্গন
কোথায় এখন, রোমা, সৌধ-সাধে স্মৃতি
শুধু মনে-রাখা ধূ-ধূ প্রেতময়ী প্রীতি
আত্তির শঠতা বেছে করে নেওয়া যেন গুপ্তধন।

কবিতাগুচ্ছ

কালতরী

[ডি-এইচ্. লরেন্স-এর ইংরেজী অবলম্বনে]

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

গম্ভীর গিরির ভালে ক্ষীণ ইন্দ্রধনুর তিলক—
এ-পারে তুমি ও আমি—ব্যবধান দম্ভোলিপ্রহত—
অবরোহী পাদদেশে ছত্রভঙ্গ শ্রমিকের দল,
অসিত স্থাণুর মতো, বদ্ধমূল সবুজ গোধূমে ॥

আমার ঘনিষ্ঠ তুমি, অনাবৃত চরণযুগল—
বিরঞ্জন বাতায়ন মাঝে মাঝে উদ্‌গীরণ করে
উলঙ্গ কাষ্ঠের ঘ্রাণ ; সে-উগ্র গন্ধের ফাঁকে ফাঁকে
ভেসে আসে চেতনায় উচ্ছ্বসিত কেশের সুরভি—
চটুল চপলা খসে আচম্বিতে নভস্তল থেকে ॥

হরিতাভ হিমবাহে দেখা দেয় মসীকৃষ্ণ তরী,
সন্নিহিত শর্বরীর অগ্রদূত যেন—গতি তার
কোন্ নিরুদ্দেশে ?—নিরুত্তর, নির্লিপ্ত আকাশে হাঁকে
বজ্র নিরন্তর—ভয় নেই, তবু ভয় নেই, আজ
এই উদ্যত দুর্যোগে আমার সম্মুখে তুমি, আমি
আছি তোমার পাশেই—দিগম্বর বিদ্যুতের জ্বালা
নির্বাপিত পুনরায় চমকিত শূন্যের অগাধে—
নাস্তিসাক্ষী আমাদের দৃষ্টিবিনিময়—চরাচরে
অনাত্মীয় আর যা সমস্ত কিছু ঃ মগ্ন কালতরী ॥

হেল্ডারলিন অবলম্বনে

বুদ্ধদেব বসু

আশা

ওগো আশা, প্রেমাস্পদা, কর্মঠ, করুণাময়ী দেবী,
যে-তুমি করো না তুচ্ছ খিন্ন, ম্লান দুঃখের ভবনে,
বরং, মর্ত্যের আর দেবতার অন্তর্গামী হ'য়ে
স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করো, ক্লান্তিহীন, সানন্দ সেবিকা—

কোথায় এখন তুমি ? দীর্ঘ দিন বাঁচিনি এখনো,
অথচ আমার সন্ধ্যা হিম হ'য়ে নেমে আসে, আর
এখনই ছায়ার মতো বীতস্বর, সংগীতবিহীন,
ঘুমঘোরে ঢ'লে প'ড়ে কম্পমান হৃদয় আমার।

ঐ নিম্নে, যেখানে প্রত্যহ ঝরে পাহাড়ের বুক বেয়ে নেমে
কলস্বরে নির্ঝরিণী অবিরল, ফোটে হেমন্তমাধুরী নিয়ে
বিলম্বিত অজস্র জাফরান, সেই
শান্ত স্তব্ধতায়, প্রেয়সী, তোমার অভিসারে

যাবো আমি, অথবা, যখন মধ্যরাতে
গুঞ্জিত কান্তার ভ'রে লক্ষ-লক্ষ অদৃশ্য অদ্ভুত জীব
জেগে থাকে, আর ঊর্ধ্বে, শাশ্বত আনন্দময়
পুষ্পদল, মুঞ্জরিত নক্ষত্রেরা দীপ্যমান,

সেইক্ষণে আকাশদুহিতা, তুমি দেখা দিয়ো ! নেমে এসো তোমারই পিতার
কাননের প্রান্ত থেকে, আর যদি পার্থিব সত্তার রূপ
অসম্ভব মনে হয়, তবে মোর উন্মুখ প্রাণেরে
অন্য কোনো আবির্ভাবে ক'রে দিয়ো আতঙ্কবিধুর।

সনেট

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

তোমাকে চেয়েছি আমি দিন-রাত রৌদ্রে-অন্ধকারে,
মনের গভীর নীলে, হৃদয়ের স্বর্ণাভ সবুজে ;
স্মরণের স্তব্ধদ্বারে, শতাব্দীর বিভ্রান্ত গম্বুজে,
দিক্‌ভ্রান্ত হন্যে হ'য়ে খুঁজেছি সর্বত্র বারে-বারে !
চাতক যেমন ক'রে মেঘ খোঁজে, নদী সমুদ্রকে,
নাবিক দূরের দ্বীপ, পুণ্য লোভী আতুর মন্দির ;
মরুযাত্রী ওয়েসিস্, রাজনীতিবিদ গণ-ভীড়,
তেমনি তোমাকে আমি চেয়েছি তো এই মরলোকে

দিকে দিকে তীব্র বেগ, অনিবার্য বিপ্লব, প্রগতি ;
অনেক যৌবনস্বপ্ন মধ্যপথে সহসা নিহত ;
ক্ষতিয়ে দেখিনি আজো সংসারের সর্বশেষ ক্ষতি,
তোমার অস্তিত্ব শুধু মেঘময় রহস্যের মতো।
দারুণ গ্রীষ্মের দিনে তুমি আছো তাই বেঁচে আছি,
প্রকম্পিত শীত এলে তোমাকেই স্মরি আর বাঁচি ॥

শীতের রাত্রি

সুশীলকুমার গুপ্ত

শীতের দারুণ রাত্রি। নেমে আসে নিষ্ঠুর মৃত্যুর
হিমস্রোত। হাওয়ার চাবুকে কাঁদে ধূসর পার্কের
বিশীর্ণ গাছের সারি, ঢেলে দেয় বিশুষ্ক পত্রের
অঞ্জলি। পীতাভ মাঠে ঘাসের সবুজ মিঠে সুর
মুছে যায় একেবারে। পাণ্ডুর নভের গণ্ড বেয়ে
অশ্রুর শিশির ঝরে। ভীত ত্রস্ত চাঁদ-গ্রহ-তারা
কুয়াশায় ঢাকে মুখ। নগরের দেহ-মন ছেয়ে
নেমেছে মৃত্যুর ঘুম, পরিশ্রান্ত কর্ম্মের পাহারা।

তবুও জীবন জাগে। বেজে যায় দুরন্ত ঝিঁঝিঁর
নূপুর। ইঁদুর হাঁটে। বাদুড়ের চঞ্চল ডানায়
প্রাণের আবেগ। দৃপ্ত শিশিরের পদধ্বনি। যায়
রাত্রির নীরব যাত্রী। কোনো ঘরে মিলনে নিবিড়
উষ্ণ প্রেম, নবজাত শিশুর ক্রন্দন। ফুটপাতে
ডাষ্টবিনে খাদ্য খোঁজে ক্ষুধিতের হাত। মৃত্যু যুঝে
দুঃসাহসী প্রাণ কোনো। বিদ্রোহী কবির চেতনাতে
বসন্তের স্বপ্ন-প্রেম আগ্নেয় ভাষার নীড় খোঁজে।

মৃগতৃষ্ণা

অরুণ ভট্টাচার্য

আবার রাত্রি এলো। অন্ধকারের গভীর থেকে
যেন কান্নার স্বর শুনলুম। যন্ত্রণায় যে-কথা মনে হয়েছিল
আজ আবার স্মরণ করলুম ঃ
ভালোবাসার ছল করে দস্যুর মত লুঠ করেছিলুম।

এখন কাম্য শুধু ঘৃণা।
নাগকেশরের রেণু ছিটিয়ে শরীরে,
বেলফুলের তীব্র গন্ধে অশান্ত
অস্থিরতা নিয়ে মনে
আমার হয়ে প্রার্থনা কোরো সেই সঙ্গে ঃ
করুণা নয়, ভালোবাসা নয়
শুধুমাত্র অবিমিশ্র ঘৃণা।

মন্দিরের গাত্রে মৎস্যনারীদের বিলোল দেহ
আমার দুঃখরজনীর ধূসর স্মৃতিচারণায়।
বহুদূর বরোবুদুরের সীমাহীন বিস্তৃতিতে
ছায়াঘন গ্রামের বুড়োশিবতলায়
আমার ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই।

এই লক্ষ লোকের ভীড়ে, শহরের
মাতাল গন্ধে, বর্ষার
টইটুম্বুর জলদীঘিতে আমার শান্তি নেই,
শান্তি নেই।

নেই, এই একমাত্র সত্য। জীবনের
কতটুকু পথ বা হেঁটেছি, জেনেছি অপরিসীম
লাঞ্ছনার দম্ভ, মিলেছে স্নেহের কারুণ্য,
ভালোবাসার কৃপণতা। মুঠি ভরে
কুড়িয়েছি সোনা, মিলেছে ধূ্লা।
আকাশ হয়েছে শূন্য, রৌদ্র ঝরিয়েছে মেঘ।

এতদিন ধরে যা চেয়েছি তা মিথ্যা, আর মনে হয়েছে
সত্যের ছায়াটুকু
মলিন ভিক্ষুণীর মত অসহায়। ওই দ্বারের কাছে
কারা? যাদের চরণচিহ্ন মুছে গেল আকাশে?

মুছে যাক, আমার শেষ নিঃশ্বাস
দিনের শেষে গলিত সোনার অশ্রুতে মিশে যাক,
আর যে-অন্ধকারের তীরে দাঁড়িয়ে শপথ নিয়েছিলাম
সেই অন্ধকারে
আমার মৃগতৃষ্ণার অনুবর্তন শেষ হোক্‌।

একটি মুখের কুয়াশা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মরণ চাইনা আমি, মরণতো অপরূপ ভোরের অস্বস্তি
তোমার মুখের মত জুঁইফুল, নবজন্ম অব্যর্থ যন্ত্রণা
ঋতুর বসন্তে; নচিকেতা নই; অন্য এক আশ্চর্য নিয়তি
আমার ক্লান্তির কানে নিত্য দেয় মৃত্যুহীন নিশির মন্ত্রণা।

তোমার মুখের মত নিরুত্তর রহস্যের কারুকার্য্যে মেয়ে
আমার কি কাজ? শিল্পী নই, রৌদ্রে পুড়ে যেতে অতল, অগাধ
সমুদ্রের গর্ভে যেতে কোথাও পাইনা সাড়া চিত্তে কি হৃদয়ে
পাইনা কফির কাপে, অ্যাল্‌কোহলে জীবনের আমৃত্যু আস্বাদ।

আরেক নিয়তি আছে আমার বুকের কাছে অতি সন্তর্পনে
আমাকে পাড়ায় ঘুম; প্রেম নেই স্নেহ নেই স্বপ্নদেখা নেই
অন্যদেশে নিয়ে যায়, তোমার মুখের মত অশান্ত নির্জন
তার মুখ জ্বলে না। সে কন্যার দুহাত ধ'রে এই হেমন্তেই
অন্যদেশে চ'লে যাবো; ঘুমেও তোমার স্মৃতি তোমার মুখশ্রী
চোখে আনবোনা আর জুঁইনাম আর একদিনও রাখবনা মনে॥

ছায়া-মূর্ত্তি-পূজা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

[এক]

তোমার চোখের ছায়া তামসী গুহার থেকে ছোঁড়া
অন্ধকার ধূমকেতু, শায়কের মতো এসে বিঁধে
পতিত প্রান্তরে, ছোট উপত্যকা-হ্রদে, চন্দ্রবোড়া।

সব মনে থাকে যদি না ভুলি এ-শরীরের ক্ষিদে,
বটের মঠের ছায়া নবনীতা এ-ছায়ার কাছে!

এ যেন বালুর মাঠ যোগ্য রথে সব পথ ঘুরে
মৃত মদনের স্মৃতি চতুর্দ্দোলে স্তূপে নিয়ে বাঁচে,
দুইটি কপোত-বুক চোখের কাজল-লতা জুড়ে
তীব্র পুরা ছায়া শেষে স্তিমিতা করবে ভেবে মনে।

ছড়ায় শরীরে ছায়া যেন লুব্ধ লোধ্র হরিতাভ
যেন মৃত্তিকার প্রাণ-অঙ্গারের বিস্তর স্মরণে
তোমাকে সধূমা আমি সে-ভূমিতে ফের ফিরে পাব।

[দুই]

তোমার প্রাচীন-মূর্ত্তি মৃত্তিকা-খননে
হয়ত বা পাওয়া যাবে ভেবে মনে-মনে
ফল্গুতীরে বালু খুঁড়ি হৃদয়ের মতো
টেনে আনি মুখ-খানি হেলানো আনত
আমার শরীরে। পরী, এতো তুমি কালো
হয়ে গেছো এ'ক'দিনে, আর এতো আলো
সূর্য্যের মতন চোখে? কি বিদ্বেষে জানি!
তোমার নেত্রে কি আমি রাত্রির মাখানি
মিশাইনি রুদ্রমদে, নাহোক স্বরেলা হ'তে—
ভেসে যেতে হিরণ্যাভ নীহারের স্রোতে?
তুমিই চাওনি এতো প্রিয়াতুর মন,
তাই-ত ভোরের রৌদ্রে মিছে সমর্পণ
চাতুরিতে করে গেলে। মৃত-মৃত্তিকার
পাথর হতেও লাগে আগুনের ধার॥

[তিন]

আমি শুধু ঘৃণা নিয়ে শ্বাস ফেলি আকাশের নীচে
তোমার বাষ্পের ঘরে, তোমার রক্তের গন্ধ পীচে
রাস্তার পিশাচ ডাষ্টবিন। দিনরাত্রি উষ্ণে-শীতে
আমার শরীরে আছে শোষিতের চিহ্ন, তা-ই দিতে
চলেছি তোমার কাছে তোমার উচ্ছ্বাসে ভোর বেলা;
ফোটে কি তেমন ফুল যাকে তুমি করো অবহেলা
তবু যা ছায়ায় জাগে কখন সূর্য্যের আগে এসে
ভূতপূর্ব্ব নম্র হাত গা' ছোঁয় সে মন ভালোবেসে।

গড় শ্রীখণ্ড

অমিয়ভূষণ মজুমদার

[পূর্ব্বানুসৃতি]

সেদিন রাত্রিতে সার্কাস দেখার কথা ছিল, সুরতুন তা ভুলে গিয়েছিল। মাধাই সকাল সকাল ডিউটি থেকে ফিরে বলল, কিরে রান্না হয়েছে?

সুরতুন তখনও উনুন ধরায় নি, সে বিব্রত মুখে বলল, ভাত নামাতে আর কত বেলা। তুমি ঘরে বস, এখুনি হবি।

—কেন সার্কাসে যাবি না?

—সে কি?

—বাঘ সিংহ মানুষের কত খেলা।

কৌতূহলের চাইতে সুরতুনের বিস্ময়ই বেশী। সে বলল, আচ্ছা আমি উনুন ধরাই। মাধাই ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে সুরতুনের কাজকর্ম লক্ষ্য করতে লাগল। এক সময়ে সে বলল,—তুই রান্না শেষ কর, আমি আসি।

মাধাই যখন ফিরে এল ততক্ষণে সুরতুনের ভাত নেমেছে।

মাধাই খেয়ে উঠে বলল,—আমার সিগ্রেট শেষ হ'তে হ'তে তোর খাওয়া হওয়া চাই।

সুরতুন হাঁড়িকুরি তুলে রেখে সামনে এসে দাঁড়াতেই মাধাই তাকে একটা কাগজে মোড়া পুঁটলি দিয়ে বলল,—কাপড় জামা আছে পর।

সুরতুনের পরিহিত-খানা পুরানো হলেও জীর্ণ নয়, কাপড়ের কথায় সে বিস্মিত হ'ল। জামা সে জীবনে কখনও গায়ে দিয়েছে ব'লে তার জানা নেই। ফতেমার যখন সুদিন ছিল তখন তার গায়ে সে দেখেছে বটে, টেপিও গায়ে দেয়। কিন্তু দুর্দান্ত শীতের দিনেও বড়জোর গায়ে কাপড়ের উপর কাপড় জড়িয়েছে, জামা পরার দুঃসাহস তার হয় নি।

তাকে ইতস্তত করতে দেখে মাধাই বলল,—যা, যা, দেরী করিস নে। খেলা আরম্ভ হ'য়ে যাবে।

কাপড় জামা নিয়ে সুরতুন বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। কাপড় পালটে জামা হাতে ক'রে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল অনেকটা সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে।

—কি রে, দেরী কি? চুল আঁচড়াবি নে?

সুরতুন অন্ধকার বারান্দা থেকে ভয়-সংকীর্ণ গলায় বলল,—জামা না পরলে হয় না, পরবের জাননে।

—আহা। মাধাই বিরক্ত হ'ল।—এ দিকে আয়। দুই হাতায় হাত ঢুকা, ধুর ও রকম না।

অবশেষে মাধাই উঠে গিয়ে জামা পরিয়ে দিল,—পয়লা নম্বর বোকা তুই! নে এবার চুল আঁচড়া।

চুল আঁচড়ানোর সমস্যা কি ক'রে সমাধান হবে সুরতুন ভেবে পেল না। সে মুখ নীচু ক'রে ভীত-স্বরে বলল,—কাঁকই নাই।

—কি আছে !

দেয়ালের গায়ে বসান একটা ছোট তক্তা থেকে মাধাই তার চিরুণী নামিয়ে দিল।

—নে তাড়াতাড়ি সারে নে। ব'লে মাধাই নিজের পোষাক পাল্‌টাতে লাগল।

জট পাকানো ময়লা চুলে চিরুণী বসাতেই সঙ্কোচ লাগল স্বরতনের, আঁচড়াতে চুল ছিঁড়ে ব্যথা লাগতে লাগল, তাও সহ্য হ'চ্ছিল কিন্তু পট্‌ পট্‌ করে দু'তিনটে চিরুণীর দাঁত ভেঙ্গে যেতেই স্বরতুন ভয়ে মুখ কালো করে বলল,—থাক বায়েন, আর আঁচড়াব না।

—চল তাইলে। ম্লান আলোকে মাধাই স্বরতুনের চোখের জল দেখতে পেল না।

দরজায় তালা ঝুলিয়ে মাধাই বলল,—যদি তোর চুল কোনদিন আর ময়লা দেখি নাপিত ডাকে কাটে দেব। বাঁধে যায়ে চুল ঘসে আসবি।

তখনও সার্কাসের দ্বিতীয় প্রদর্শন সুরু হ'তে দেরী আছে। অন্ধকার গলি পথ দিয়ে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি চলে সার্কাসের আলোকোজ্জল তাঁবুর কাছাকাছি এসে মাধাই বলল,—ঐ দেখ। আলোর চাকচিক্য, তাঁবুর আয়তন ও পরিধি, লোক জনের চলাচল দেখে স্বরতুন হক্‌চকিয়ে গেল।

মাধাই বলল,—টিকিট কাটে ঐ তাঁবুর মধ্যে ঢুকব। খেলা শেষ হলে যে দরজায় তুই ঢুকবি সেখানে দাঁড়ায়ে থাকবি আমি আসে নিয়ে যাব।

টিকিটের ঘরে টিকিট কেটে মাধাই বলল,—দাঁড়া, পান খায়ে নি।

সার্কাসের সামনে যেমন বসে, সস্তা কাঁচের দু তিন খানা বড় বড় আরসি দিয়ে সাজান ডেলাইট-জ্বালা লাল সালুতে উজ্জ্বল পানের দোকানের সামনে দাঁড়াল মাধাই।

—পান খাবি তুই? মাধাইএর প্রশ্নে আশেপাশের লোক ও দোকানদার স্বরতুনের দিকে চাইল। স্বরতুন লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে অস্ফুটস্বরে বলল, না।

না' বলার সময়ে মুখ নামিয়ে নিলেও স্বরতনকে বার বার চোখে ভুলে চাইতে হ'ল পানের দোকানে কোনাকুনি ক'রে বসানো আরসিগুলিতে স্বরতুনের একাধিক প্রতিচ্ছবি পড়েছে। অন্ধকারে কাপড়-জামা পরার সময়ে এ যে কল্পনা করাও যায় নাই। নীল জমিতে সবুজ ডুরের জোলার শাড়ীতে, নীল ব্লাউজে একটি সুন্দরী মেয়েকে বারাংবার দেখে স্বরতুন মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে গেল যেন।

সার্কাসের তাঁবুতে ঢুকে খেলা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত নিজের রূপের প্রাবল্য তার নিজের রক্তেই যেন জোয়ার এনে দিল। আয়নায় দেখা তার প্রতিচ্ছবির অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি সে যেন খুঁটে খুঁটে দেখতে লাগল। লজ্জাও হ'ল। মাধাই কি দেখেছে তাকে ?

সার্কাসের কোন খেলাই স্বরতুন দেখে নি। তার বিস্ময় ও ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রমবোধ একসময়ে তাকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছিল। খেলার অবসরে এদিকে ওদিকে চেয়ে সে পুরুষদের গ্যালারির মধ্যে মাধাইকে আবিষ্কার করল। আর যেখানে লাল সালুর ঘেরের মধ্যে পুরুষ ও মেয়েরা চেয়ারে বসেছে তার মধ্যে টেপিকে দেখতে পেল, গালপাট্টাওয়ালা এক সাহেবের পাশে। টেপি তা হ'লে সাহেবকে ঘুম পাড়ায়ে রাখতে পারে নাই। ঠিক এমন সময়ে দুটি সিংহের হাঁকডাকে সে আবার সার্কাসের দিকে মন দিল।

খেলা শেষ হ'লে মাধাই এসে স্বরতুনকে ডেকে নিল। এরার অন্ধকার পথ নিয়ে তাড়াতাড়ি চলার দরকার ছিল না। মাধাইএর পেছনে চলতে চলতে স্বরতুনের আবার মনে পড়ল নিজের প্রতিচ্ছবির কথা। মাধাই শুধু প্রাথমিক অবস্থায় নয়, স্বরতুন যখন চালের কারবার স্বাবলম্বিনী হ'য়েছে তখনও একবার সখ করে সে স্বরতুনকে শাড়ী কিনে দিয়েছে, কিন্তু সে তো লজ্জা নিবারণের উপাদান, এরকম ময়ুরআঁকা ব্যাপার নয়। ট্যারচা চোখে স্বরতুন নিজের শাড়ীর আঁচলটা আর একবার দেখে নিল। মাধাইএর কাজের অর্থ সে বোঝে না, বুঝবার চেষ্টায় মাধাইকে কোনদিন প্রশ্নও সে করে নি। মাধাই যে তাকে অত্যন্ত স্নেহ করে এটার চূড়ান্ত প্রমাণই যেন আজ সে পেল।

তারপর তার টেপির কথা মনে হ'ল। টেপি তার সঙ্গীটিকে ঘুমপাড়িয়ে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু পরে ব্যাপারটা অন্যরকম হ'য়েছে। টেপির আজকের সজ্জা অন্যান্যদিনের চাইতে কম উজ্জ্বল নয়। একি কখনও হ'তে পারে টেপিকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছে ঐ সাহেবটি। সাহেবের মেজাজ তো! সে কি আর টেপির মতো একটি মেয়েকে সাজিয়ে দেয়। যখন মাধাই তাকে জামা পরিয়ে দিয়েছিল তখন মাধাইর সামনের ভয়ে স্বরতুন ত্রস্ত। এখন মাধাইকে তেমন ভয়ঙ্কর বোধ হ'লনা। ফলে, সেই জামা পরার ঘটনাটা মনে পড়ে স্বরতুনের শরীর থরথর করে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। মাটিতে যেন পা সোজা হ'য়ে পড়বে না।

ঘরের কাছে এসে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে স্বরতুন কি-হবে কি-হবে এই ভয়ে অস্থির হ'য়ে ইতিউতি করতে লাগল। তার সহসা মনে হ'ল টেপি যেমন ওষুধ কিনেছিল তেমন কিছু তারও সংগ্রহ করা দরকার ছিল। টেপিকে যেমন ওরা সাজায় তেমনি তো সাজিয়েছে মাধাই তাকেও।

মাধাই দরজা খুলে তার চৌকিতে বসে জুতো জামা খুলে বলল,—জামা রাখ, একটু জল দে খাই।

স্বরতুন জল গড়িয়ে দিয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মাধাই বিছানায় শুয়ে বলল—এখন আর কি ঘুমা গা যা। কাল মনে করিস মাথায় দেয়ার তেল আনে দেব। তোরা আমার কেউ না, কিন্তক তোরা ছাড়াই বা কে আছে আমার।

বাইরের অন্ধকারে জামা কাপড় পালটে স্বরতুন কোথায় রাখবে বুঝতে না পেরে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক করছে। সে ভেবেছিল মাধাই ঘুমিয়ে পড়েছে। মাধাই বলল,—রাখ, আমার জামার পাশেই রাখ। কাল তোর জন্যে দড়ির আনলা ক'রে দেব।

বিব্রত স্বরতুন কিছু না ব'লে বাইরে চলে গেল।

পরদিন সকালে স্বরতুন ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, মাধাই কলে জল সংগ্রহ করতে গেছে, এমন সময়ে টেপি এল। এদিক ওদিক চেয়ে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে টেপি বলল,—মাধাই কনে? নাইতো? তোমাকে একটা কথা বলবের আসলাম।

—কও না।

—কাল যে ওষুধ কিনছিলাম তা কৈল কাওকে কবা না, মাধাইকেও না।

—কেন্‌ কি হ'লে।

—ও বিষ। কাউকে খাওয়ালি সে ঘুমাতেও পারে, মরবেরও পারে।

—সব্বোনাশ।

—তা ভাই, তুমি সাক্ষী থাকলা। এই দেখ যতটুকু কিনছিলা ধরাই আছে। তুমি নিজে হাতে নিয়ে ফেলায়ে দেও।

—তুমি ফেলায়ে দেও, তাইলেই হয়। তুমি তো তাকে বিষ দিবের চাও নাই।

স্বরতুনের ইচ্ছা হ'ল সে টেপিকে প্রশ্ন করে তার নোতুন সঙ্গীটির সম্বন্ধে কিন্তু কথা সংগ্রহ করতে পারল না।

এমন সময়ে দু'হাতে দু'টি বালতি জল নিয়ে মাধাই এল ঘরে জল রেখে ফিরে এসে বলল,—টেপি যে অনেকদিন পরে আলি।

খুব মিষ্টি হেসে টেপি বলব,—আলাম। তুমি ভালো আছ ?

—তোর মা কনে ? বাঁচে আছে।

—আছে, চালের কারবার করে না। মোকামের কাছে এক গাঁয়ে বসছে।

—গাঁয়ে ব'সে কি করে।

—চিঠি লেখছে। একজন পড়ে শুনাল। ভাবে মনে হ'ল মালা বদল করছে কারো সাথে। একটু হেসে টেপি বলল আবার, আমরা বোষ্টম।

—নোতুন সংসার দেখবের যাবা কেমন ?

—না, মনে কয়। দূরে থাকে সেই ভালো। যাকে দেখবের চালেও গাঁজা খাওয়া বোষ্টমদের সঙ্গে থাকবের পারিনে।

কথাটা কৌতুকের বলে মনে হ'তে পারে, কিন্তু টেপির বেশভূষা ভঙ্গির দিকে লক্ষ্য করে মাধাইএর অনুভব হ'ল, টেপির যে-মা মাথায় গামছা বেঁধে পুরুষদের দলে বসে গাঁজা খেতে খেতে অশ্লীল আলোচনা করতে পারে, টেপির বর্ত্তমান অবস্থা তার থেকে অনেক পৃথক। এমনকি তার এই রেল কোম্পানির ঘর হীন অবস্থার কোন গ্রাম্য চাষীর কুড়ের তুলনায় যত পরিচ্ছন্নই হ'ক তার পটভূমিকাতেও টেপিকে যেন অসঙ্গতভাবে উজ্জ্বল দেখায়। যেন সে অন্যকোন লোকের অধিবাসী।

মাধাই প্রস্তুত হ'য়ে এসে বলল, ডিউটিতে যাব।

—চলো এক সাথে যাই।

খানিকটা দূর চলে মাধাই বলল,—তাইলে তুই ভালোই আছিস আজকাল।

—তা আছি। তুমি কেমন আছ, দাদা ?

মাধাই প্রশ্নের স্বরটিতে এবং তার চাইতেও বেশী সম্বোধনে বিস্ময় বোধ করল। টেপির কথাবার্ত্তায় পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। এর আগে কোনদিন কারো কাছে এমন সম্বোধন সে শোনে নি।

পথ চলতে চলতে ধীরে ধীরে বলল মাধাই,—আমার আর ভালো মন্দ কি আছে ? আছি আছি।

কিন্তু টেপিতো স্বরতুন নয়, সে বলল— বিয়ে কর, সংসার কর।

মাধাই রসিকতার সুরে বলল,—তুই তাইলে কন্যে খোঁজ।

–তা পারি, তুমি কও যদি আমি ভালো লোক দিয়ে কন্যের খোঁজ আনতে পারি।

খানিকটা নীরবে চলে আবার বলল টেপি—স্বজাত বিয়ে করাই ভালো, তা যদি না মান এক কন্যের খোঁজ আমার আছে। এমন রূপ দেখলে চোখ ফেরান যায় না, কিন্তু বিযত্নে ছাই-ঢাকা।

মাধাই হাসি হাসি মুখে বলল,—কেন্‌রে দিগনগরের মিয়ে ? যারা চিকন চিকন চুল ঝাড়ে।

—মস্করা করি নাই দাদা। চোখ চায়ো, আজ ক'য়ে গেলাম।

আহত এবং ক্লিষ্টের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে সমবেদনার আশ্রয় খোঁজা। মাধাই একসময়ে অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করে সংঘের কাজের আড়ালে আত্মগোপনের চেষ্টা করেছিল। তার নিজের জীবনটাকে অর্থহীন বোধ হ'ত তাই সংঘের কাজ ক'রে, কাজের লোক হ'য়ে জীবনের ফাঁকিটাকে সে ভরে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করেছিল ওটা বিদ্বেষের পথ, জীবন আরও ফাঁকা হয়ে যায় ওপথে। নেশার মতো। যতক্ষণ বেহুঁস ততক্ষণ ভালো, হুঁস এলেই ঘৃণা। হঠাৎ এল ফতেমা। পুরানো স্বরতুন আর ফতেমার সান্নিধ্যে সে সমবেদনার একটু ছোঁয়াচ পেল। পৃথিবীর অন্য সব লোকের চাইতে এরা তার বেশী পরিচিত। এদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে সময় কাটানোর সময়ে অন্য কোন কথা মনে থাকে না। আর এদের অভাব পূরণ করা, যা সে আগেই করত, এমন একটা কাজ যাতে নিজেকে ব্যাপৃত রাখা যায়, অথচ যা ক্লান্তি আনে না। মাধাই স্থির করেছিল নিজের উপার্জনের কিছুটা সে ফতেমা স্বরতুনদের জন্য ব্যয় করবে। মাধাইএর এই মনোভাবটার তুলনা অন্যত্র দেখতে পাচ্ছি। নিজের উপার্জনের লক্ষ লক্ষ টাকা দান করছে এমন লোক যেমন আছে, ভিক্ষা করে অন্যের স্কুল স্থাপন করছে এমন দু'একজনকেও দেখতে পাচ্ছি। মাধাই তো তবু তার বিনিময়ে সেবা পাচ্ছে, সম্মান পাচ্ছে।

টেপির পাশাপাশি চলতে চলতে একটি সুঘ্রাণ পাচ্ছিল মাধাই, যে সুঘ্রাণ আকর্ষণ করে। মাধাইএর দয়াস্নিগ্ধ মনে এই কথাটা উঠল, যখন টেপি আর স্বরতুন চালের ব্যবসা করত স্বরতুনকে টেপির তুলনায় হীন ব'লে বোধ হ'ত না এখন যেমন হয়। পুরুষের আদরে টেপির এই পরিবর্ত্তন। মাধাই ভাবল সাবান এসেন্স কাপড়চোপরের পরিচ্ছন্নতা কিছু কিছু ব্যাপারে সে লক্ষ্য রাখবে। সেদিন ডিউটি সেরে ফিরবার সময়ে মাথায় দেয়ার তেল ও একটা সাবান কিনল মাধাই। মধ্যবিত্তের চোখে সেগুলি নিচের স্তরের হ'লেও মাধাইএর চোখে তেমনটা নয়।

দিবানিদ্রা সেরে উঠে মাধাই বলল,—মনে কয় যে লকড়ি কাঁচা কাটে রাখে আসছিলাম তা শুকাইছে।

—আনবের যাবা ?

—তা যাওয়া যায়। তুইও চল না কেন চান করে আসবি।

স্বরতুন খুব একটা প্রয়োজন বোধ করছিল না স্নানের। মাধাই ঘুমুলে ঘরে তোলা জলে হাঁড়িকুরি ধোয়ার সময়ে হাত ধুয়ে নিয়েছিল, আঁজলা করে করে জল তুলে মাথায় চাপড়ে চুল ভিজিয়ে নিয়ে, ভিঁজে আঁচলে মুখ চোখ মুছে নিয়েছিল। কিন্তু সে সময়েই সে স্থির করেছিল এখানেই যদি থাকতে হয়, ভোরে রাত থাকতে বাঁধের জলে স্নান করতে যাওয়া যায় কিনা রোজ, মাধাইকে জিজ্ঞাসা করে নেবে।

—চল, তা যাই।

—এক কাজ কর, ঘরে তেলের শিশি আর সাবান আছে, তা আন। নোতুন কাপড় জামা আন।

স্বরতুনকে প্রায় জলের ধারে পৌছে দিয়ে মাধাই তার আগের বারের কাটা লকড়ির খোঁজে গেল। স্বরতুনের হল মুস্কিল। না পারে তেলের শিশি খুলতে, না পারে সাবান মাখতে সাহস করে। খানিকটা বাদে মাধাই নিজেই এল।

—কি রে বসে আছিস ?

সুরতুন তেলের শিশিটা দেখিয়ে মুখ নীচু করে হাসল।

—খুলবের পারিস নাই।

খুলতে মাধাইএরও জোর লাগল, পকেট থেকে ছুরি বের করে তার সাহায্য নিতে হ'ল।

—এক কাজ কর, চুলে অনেক ধুলা আছে। সাবান দিয়ে মাথা ঘসে নে।

—কি কাম।

—ক'লাম ঘসে নে। ময়লা থাকে লাভ কি।

সুরতুন নিজের মাথা ঘসার কাজটা জীবনে করে নি। গ্রামে থাকার সময়ে কোনদিনই তার এসব কথা খেয়াল হ'ত না। চালের কারবারে বেরিয়ে বরং একবার সে মাথা ঘসেছিল, যেদিন মোকামের ছোট নদীটিতে সন্ধ্যা বেলায় তারা দল বেঁধে স্নান করতে নেমেছিল। ফতেমা সেদিন অনেকটা সময় মাথা ঘসে দিয়েছিল।

—কি হ'ল ? মাধাই প্রশ্ন করল।

—আমি জানি নে।

তখন সুরতুনকে শিউরে দিয়ে, ভয়ে দিশেহারা ক'রে দিয়ে মাধাই তার ঝাঁকড়মাকড় চুলগুলি আর সাবান নিয়ে দু' হাতে মাজতে বসল। চুল ঘসে ঘসে পরিচ্ছন্ন করে মাধাই বলল, এবার গায়ে সাবান মাখে ডুব দিয়ে নিয়ে, চুল ঝারে মাথায় তেল দিস। আমি লকড়ি বাঁধে আনি।

মাধই ফিরে এসে দেখল সুরতুনের স্নান হ'য়ে গেছে। পরিচ্ছন্ন জামা কাপড়ে একপিঠ ফাঁপানো চুলে সুরতুনকে চেনা কঠিন।

মাধাই বলল,—তোর ছাড়া শাড়ী কি করলি, ধুয়ে নিয়া কাম নাই। যে ময়লা ও আর পরে কাম নি।

—কি করব।

—পা দিয়ে ঠেলে জলে ফেলে দে।

সম্মুখে সুরতুন, পেছনে মাধাই। লকড়ির ভারে মাধাই হেঁট হ'য়ে চল্‌ছে কিন্তু ইতিমধ্যে মাধাই সুরতুনকে লক্ষ্য করে'ছে কয়েকবার।

সে বলল, কাঁপিস কেন ?

—জার লাগে।

—তা জার একটু লাগবের পারে। অবেলায় সাবান ঘসা তো।

একটু কাল চুপ ক'র থেকে সুরতুন বলল,—কাপড় ফেলায়ে দিলাম—

—আবার কিনলি হবি। টেপির মতো গয়না দিবের পারব না, সিল্কের শাড়ীও না। জোলাকি এক আধখান ধারে হলিও কিনে দেব।

ঘ র ফিরে মাধাইএর কথা মতো চুল আঁচড়ে সিঁথি কেটে সুরতুন যখন ঘরময় কাজ করে বেড়াতে লাগল মাধাইএর বিস্ময় বোধ হ'ল এই ভেবে, এমন রূপ এমন গঠন কোথায় লুকানো ছিল। একটা

মালিকানা বোধও হ'ল তার। এই দেহটির কি দুরবস্থা হ'য়েছিল অনাহারে। খড়ে যেমন চাপ চাপ মাটি দিয়ে গড়ন ঠিক ক'রে, রং-সাজ দিয়ে পুতুলটি তৈরী করে, ততটুকু না হ'লেও সুরতুনের এই রূপের খানিকটা তার তৈরী। সে ছাড়া আর কেউ সুরতুনকে এমন ক'রে সাজাতে এগিয়ে আসে নি অন্তত একথাটা তো ঠিক। কাজের এক অবসরে মাধাই সুরতুনকে ডাকল।

—কি কও।

লাইন দেখা রেল কোম্পানির আলোটা তুলে সুরতুনকে মাধাই যেন পরীক্ষা করল। নিজের ঘরে তেমন বড় আরসি ছিল না যে তার সম্মুখে সুরতুনকে দাঁড় করাবে। মাধাই ভাবল,—ওকি বুঝতে পারে ওকে কেমন দেখায়। স্বাস্থ্য ও দেহবর্ণ কথা দুটির প্রয়োগ না করতে পারলেও মাধাই অনুভব করলে টেপির চাইতেও সুরতুন গরিয়সী।

মাধাইএর উপলব্ধি হ'ল জীবনের শূন্য পূর্ণ হ'য়েছে। সুরতুনকে নিয়ে এই খেলা তার মুখে যেন স্বাদ এনে দিল। এটা একটা করবার কিছু। কিন্তু যারা মনের গোপন তথ্য নিয়ে বহু আলোচনা করতে অভ্যস্ত তারাও কি মনের গতির নির্দ্ধারণ করতে পারে। মনের কোন হদিসই যার জানা নেই সেই মাধাই পোর্টার কি ক'রে জানবে তার মন কোন রূপটি ব্যবহারে কখন আত্মপ্রকাশ ক'রে বসবে। আমি কর্ত্তা, আমি অভিভাবক, আমার প্রাচুর্য্য থেকে দান ক'রে ওকে ধাপে ধাপে একটি স্বচ্ছন্দ জীবনের দিকে নিয়ে যাচ্ছি এই ছিল মাধাইএর অনুভব। এবং এরই ফলে তার হৃদয় আতৃপ্ত হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু আর একটি বিষয়ের দিকে নজর ছিল না তার। মলিন সুরতুনকে দেখে যা কোনদিন হয়নি তেমনি একটি কামনা সংগোপনে তার চেতনার অজ্ঞাতে বেড়ে উঠছিল তার সন্ধান মাধাই কখনো রাখে না। প্রকাশের মুহূর্ত্তেও তার চেতনায় পরিস্ফুট হয় নি। ইতিমধ্যে সুরতুনের জন্যে সে এক জোড়া রোল্ড গোল্ডের বালা এনে দিয়েছে। চোখে দেবার সুর্মা।

সুরতুন প্রসাধনে আর কিছু জানত না, কিন্তু সুর্মা দেয়া জানত। বোধ করি তাদের সমাজে পুরুষরাও পালে-পার্বণে সুর্মা ব্যবহার ক'রে বলে। সে রাত্রিতে আবার সার্কাসে যাবার কথা ছিল। সুরতুন নিজেই আজ সেজেছে। রান্না শেষ ক'রে মাধাই ডিউটি থেকে ফেরার আগে চুল বেঁধে, চোখে সুর্মা দিয়ে সুরতুন প্রস্তুত হ'য়ে ছিল। সার্কাসে যাবার জন্য পোষাক পরে ফিরে দাঁড়িয়ে সুর্মা আঁকা চোখ জোড়া দেখে মাধাই যেন তারই আকর্ষণে—এগিয়ে গেল সুরতুনের দিকে। আকস্মিক দুর্দমা কামনায় মাধাই সুরতুনের সুগঠিত অবয়ব ছাড়া অন্য সবই বিস্মৃত হ'য়ে গেল।

উদ্বেল অবস্থাটা কেটে গেলে মাধাই লক্ষ্য করল সে তখনও ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, যে কুপিটা দরজার কাছে ছিল সেটা ছিটকে পড়ে খুলে গিয়ে ধপ্‌ ধপ্‌ করে জ্বলছে। সুরতুন নেই। মাধাই ধোঁয়ায় ও কেরোসিনের গন্ধে বিরক্ত হ'য়ে জুতো সুদ্ধ পায়ের চাপ দিয়ে কুপিটি চটকে লেপ্‌টে আগুনটা নিবিয়ে দিল।

সার্কাসে যাওয়া হ'ল না, বলা বাহুল্য ঘুমও হ'ল না। মাধাই নিজের বিছানায় বসে সুরতুনের জন্য কিছুকাল অপেক্ষা করল যেন অপেক্ষার সময় পার হ'য়ে গেলে তার সাড়া পাওয়ার জন্য কান পেতে রইল।

শিশুদের বেলায় দেখেছি কখনো কখনো এমন হয়, আকস্মিক অঘটন ঘটিয়ে দেবার পরও আদর

পেলে তার চোখে জল আসে, সে অনুতপ্ত হয়; পক্ষান্তরে অনাদর পেলে সে যেন আরও মরীয়া হ'য়ে যায়। আরও গভীর অন্যায় করার চেষ্টা করতে থাকে। যদি সুরতুন থাকত কি করত মাধাই চিন্তা করার মতো বিষয়। সুরতুন না থাকাতে তপ্ত অশ্রুজলের মতো যে কথাগুলি মাধাইএর মনের মধ্যে প্রবাহিত হ'ল তা এই রকম—কিছু অন্যায় করে নি সে। তার মতো একজন একান্ত দরিদ্র ভূমিজার প্রাণরক্ষা করা থেকে আরম্ভ করে আজকের এই রাত পর্য্যন্ত যা সে দিয়েছে তার জন্য সুরতুনের শত জন্ম কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। যদি সতীপনা তার এতদূর তবে নিঃসম্পর্ক পুরুষের দানগুলি গ্রহণ না করলেই সঙ্গত হ'ত। মেয়ে মানুষের কিছু অভাব আছে সংসারে?

মাধাইএর তখন মনে পড়ল না দুর্ভিক্ষের সেই দুঃসময়ে যখন আশ্রয়হীন মেয়েদের দেহ কসাইএর দোকানের মাংসের চাইতেও সহজ প্রাপ্য হ'য়েছিল এই র‍্যাশানের স্বর্ণদ্বীপে কেন সে সুরতুন ফতেমাদের লালিত করেছে। প্রকৃত পক্ষে তারাও যে অন্য অনেকের কামুকতায় ক্লিন্ন হয়নি তার কারণ মাধাইএর আশ্রয়। লোকে জানত এরা মাধাইএর আত্মীয়া।

মাধাই উঠে দাঁড়িয়ে লাইন দেখা আলোটা জ্বালল। হাতের পিঠে একটা জ্বালা করছে, চিবুকেও। আলো তুলে সে দেখতে পেল অনেকটা জায়গা ছ'ড়ে গেছে হাতের পিঠে, রক্তাক্ত হ'য়ে উঠেছে হাতটা। আরসিটা তুলে দেখল চিবুকেও বিন্দু বিন্দু রক্ত।

কর্কশ ক্রোধে মাধাই দাঁত চেপে বলল—শালী বনবিলাই।

কিছু একটা চাই, কিছু একটার অবলম্বন এরকম একটা মনোভাব নিয়ে মাধাই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। দরজা খোলা পড়ে রইল।

রাগের মাথায় দরজা বন্ধ করা অসম্ভব ছিল, কিম্বা ক্রোধমত্ত মনের কোন অংশ অভ্যাস বশে সুরতুনের জন্য দরজা খুলে রাখল—এ নিশ্চয় ক'রে বলা সম্ভব নয়।

মাধাইএর ঘর থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে অন্ধকার পথে দিশেহারা হ'য়ে ছুটে সুরতুন কোলনির প্রান্তসীমায় এসে প'ড়েছিল। কিন্তু এ জায়গাও যেন যথেষ্ট গভীর আশ্রয় নয়। সুরতুন উঁচু বাঁধের মাথার উপর দিয়ে হাঁটতে লাগল। একবার তার মনে হ'ল বাঁধের নিচের জঙ্গল লুকানোর পক্ষে ভালো কিন্তু তার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন একটা শিয়াল থ্যাক্ থ্যাক্ ক'রে তাকে ধমক দিয়ে উঠল। গতি দ্রুততর ক'রে চলতে চলতে সুরতুনের মনে হ'ল, এই বাঁধ যেখানে গিয়ে ব্রিজের নিচে লেগেছে তার কাছে কতকগুলি কুটির আছে। প্রায় একবছর হ'ল সেগুলি খালি পড়ে আছে, বাঁশের গায়ে মাটি বসান দেয়ালগুলি ভেঙ্গে পড়েছে সেগুলির প্রতি এত অযত্ন। সুরতুনের বোধ হ'ল, ঐ রকম একটা ঘরে গিয়ে যদি দরজা বন্ধ করে দিতে পারে তবে সেই নিশ্চিদ্র আবরণে সে নিশ্চিন্ত হবে।

ঘরগুলির কাছে এসে একটু ভয় ভয় করল তার। সে শুনেছিল এগুলি এক সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনে তৈরী হ'য়েছিল। তারা চলে গেছে বটে তাদের উত্তরাধিকারী কি কেউ নেই। যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে চলে একটি ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে অনেকটা সময় সে লক্ষ্য করল সেই গভীর অন্ধকারে কোন মানুষের সাড়া পাওয়া যায় কি না। ক্রমশ সাহস সঞ্চয় ক'রে সে ঘরটিতে প্রবেশ ক'রে হাতড়ে হাতড়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিল।

সকালে পাখপাখালির ডাকে ঘুম ভাঙলে সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। তার বাঁদিকে ঘরের ছাদ

আর দেয়ালের মাঝখানে অনেকটা জায়গা ভাঙা, সে দিক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে তার গায়ের উপরে। আরও খানিকটা সময় ক'রে বসে থেকে সুরতুন ইতি কর্ত্তব্যতা নির্ধারণের চেষ্টা করল।

সুরতুন ঘরটির বারান্দায় গিয়ে বসল। মাধাইএর কাছে ফিরবার মুখ আর তার নাই। মাধাইকে সে শুধু যে আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছে তাই নয়। ঠিক সময়ে একটি অভূতপর্ব বন্য আগ্রহ সে অনুভব করেছিল মাধাইএর প্রতি। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি ছিল, মাধাইকে নিজস্ব করার দুর্বার ক্ষুধা ছিল।

সম্মুখে বাঁধটা অনেকটা চওড়া। বাঁধের নিচের দুটি ধাপ ক্রমশ উঁচু হয়ে সর্ব্বোচ্চটির সাথে মিশেছে ব্রিজের তলে। এ অঞ্চলে লোকচলাচল কম। বাঁধের উপরে যতদূর চোখ যায় সবুজ ধান গাছের মতো উঁচু উঁচু ঘাসের মাঠ। উপরে ছাই রঙের আকাশ। এ দু'য়ের মাঝখানে সাদা ঢেউ তোলা কাচের মতো ব্যবধান। ঘাসের সবুজ তলটির উপরে দু'একটি সরু সরু গাছ চোখে পড়ে। সেগুলি ঘাসের জঙ্গলের উচ্চতার সমতা বুঝতে সাহায্য করছে।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সুরতুন বারান্দাটিতে বসে রইল। খাড়া রোদ গায়ে এসে না পড়লেও দুপুরের উত্তাপে কষ্ট হওয়ার কথা। সুরতুন যেন ক্ষুৎপিপাসাতেও কাতর হবে না এমন তার বসার ভঙ্গি। ভেতরে পিপাসার কষ্ট একসময়ে দুঃসহ হ'য়েছিল, কিন্তু বাঁধ ও বাঁধের জঙ্গল ডিঙিয়ে জল খেতে যাবার চেষ্টা করা কিম্বা রেলকোলোনির কল থেকে জল আনার চেষ্টা করা তার কাছে সমান অসম্ভব বোধ হ'ল। একটা পুরো দিন সুস্থ দেহে উপবাস করা সুরতুনের জীবনে এই নোতুন নয়। এর আগে একবার রজবআলির .কাছে মার খেয়ে সে নিজের ঘরের অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল, নিরম্বু উপবাস ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু একটু পার্থক্য আছে, তখন না খাওয়া আধপেটা খাওয়াই ছিল দিনের সহজ নিয়ম। মাধাইএর সঙ্গে পরিচয়ের পর এমনটা আর হয় নি। এরই ফলে সৈন্যবাহিনীর পরিত্যক্ত এই ঘরের কোণে টিনের কৌটা ইত্যাদির জঞ্জাল পড়ে থাকতে দেখে তার দুর্দমনীয় লোভ হ'চ্ছিল আহার্য্যের সন্ধান করতে।

দ্বিতীয় দিনের সকালে জন সমাগম হ'ল। তিন হাত লম্বা একটি লোক। মাথাটা দেহের তুলনায় অনেক বড়। মাথার পাতলা চুলে কানের দু পাশে পাক ধরেছে। চিবুকে দশ পনরটি দাড়ি, তিন চার আঙুল লম্বা। একমুখ হলুদে দাঁত মেলে সে হেসে বলল—তোমার বাড়ী কোন দ্যাসে, মিয়ে? কালও দেখছিলাম, আজও দেখছি। মনে করছিলাম মাটির পুতুল, মনে করছিলাম পরী, এখন দেখি মিয়ে।

মানুষের সাড়ায় সুরতুন ভীত হ'য়েছিল, কিন্তু লোটির মুখের দিকে চেয়ে তার তার সাহস ফিরে এল। দিঘার বাজারে দুধের দোকানের পাশে এ লোকটিকে ঘাস বিক্রী করতে সে দেখেছে, কখনো কখনো বনজঙ্গল থেকে কুড়ানো শাকপাতা।

—কেন, মিয়ে কোন দ্যাসের লোক তুমি।

সুরতুন বলল,—বুধেডাঙায় ছিল, এখন কোনখানেই নাই।

—বুধেডাঙায় যাবা, আমার সাথে গেলি যাতে পার। আমার বাড়ী চড়নকাসি।

কোথাও তো নিশ্চয়ই যেতে হবে, নিজের বুদ্ধিতে কিছু ঠাহর হচ্ছে না এমন সময়ে এই প্রস্তাবটি এল। সুরতুন অন্যমনস্কের মতো উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—চলেন, আমি ও গাঁয়েই যাই।

পথে যেতে যেতে লোকটি সুরতুনকে গ্রামের অনেক সংবাদ দিল। তার মধ্যে চৈতন্য সাহা ও রামচন্দ্রের খবরও ছিল। চৈতন্য সাহার বেলায় সেগুলি মুণ্ডলাদের গানে প্রচারিত, রামচন্দ্রের ক্ষেত্রে রূপকথার শক্তিকল্পনা। সুরতুনের মন এতটা ভারমুক্ত হয়নি যে সে প্রশ্ন করবে। সে নীরবে শুনে যাচ্ছিল।

লোকটি প্রস্তাব করেছিল উঁচু সড়ক ছেড়ে আলের পথে চলার, তাতে নাকি তাড়াতাড়ি গ্রামে পৌঁছানো যাবে। উঁচু সড়কে প্রকাশ্যে চলার চাইতে অপেক্ষাকৃত অপ্রধান হ'য়ে চলা যায় আলপথে। সুরতুন রাজি হয়েছিল। আলের দুধারের জমিতে আউসের চাষ হ'য়েছে। কখনো কখনো পরিপুষ্ট ধানের ছড়া গায়ে এসে লাগছে।

কৌতুহল নিয়ে না শুনলেও লোকটির গল্প, আগ্রহভরে গ্রহণ না করলেও ধানের স্পর্শে সুরতুনের মনের উপরে শান্তির মতো স্পর্শ দিচ্ছিল, যেমন জ্বরতপ্ত দেহে সকালের বাতাসটুকু দিতে পারে।

কিছুদূর গিয়ে লোকটি এক অদ্ভুত প্রস্তাব ক'রে বসল,—কেন্ মিয়ে, তুমি আমাকে বিয়ে করবা?

বিয়ে? প্রস্তাবটার আকস্মিকতা ও প্রস্তাবকারীর স্বরের দৃঢ়তা লক্ষ্যণীয়। কেউ যদি লঘুস্বরে রসিকতা করত, তার একটা অর্থ করা যেত। অন্য কোন পুরুষ যদি এমন দৃঢ়স্বরে বলত সুরতুন নিঃসন্দেহে ভয়ে ফুঁপিয়ে উঠত। কিন্তু নির্জীব এই লোকটির মুখের দিকে এই প্রস্তাবের পরও সুরতুন চাইল। লোকটি বরং লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিল।

—কেন্, আপনে আমাকে বিয়ে করবের চান কেন্?

—এমন লজ্জত আর দেখি নাই।

—কেমন লাগে দেখতে?

লোকটি অকবি নয়। সে বলল,—মিয়ে নোতুন ধানের মতন। আমার এক পাখি ধানের জমি; চাষ দিছি, বুঝলা। আমার নাম ইস্কান্দার। আউস উঠলি সেই খ্যারে ঘরে ছাউনি দিব।

ইস্কান্দারের গলা আবেগে ধ'রে এসেছিল। হয়তো একথা সত্যি তার এই প্রৌঢ় চাষী জীবনে সুরতুনের মতো সুবেশী কোন রূপবতীর ছাপ এর আগে পড়েনি। ধানের জমির আল দিয়ে চলতে চলতে ধানের অজস্রতা যা তার প্রৌঢ় শিরায় বিয়ের প্রস্তাব করার সাহস এনে দিয়েছিল ঘরের কথা উঠতেই তার সবটুকু নিমেষে স্তিমিত হ'য়ে গেল। কিছুকাল চিন্তা ক'রে সে বলল,—ঘরে আমার ছাওয়ালের মা আছে, মিয়ে; তোমাকে বিয়ে করা হবিনে। ছাওয়ালের মা অরাজি।

কিছুকাল ইস্কান্দার তার ছেলের মায়ের গুণ বর্ণনা করল। তার ধানের ভালোবাসার মূর্তিরূপা সেই বিগতযৌবনা স্ত্রীলোকটির গৃহকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিল। তারপর তার ভালোবাসাবৃত্তি ধান-স্ত্রীলোক-বর্ষার আকাশকে আশ্রয় ক'রে ঘরের দিকে একমুখী হ'য়ে রইল।

বুধেডাঙার সীমান্তে যেখানে পথের ধারে একটা খেজুর গাছের গায়ে পরগাছার মতো অশ্বত্থগাছ উঠেছে সেখানে দাঁড়িয়ে ইস্কান্দার বলল,—পথ চিনবা? যাও। মিয়ে, আবার বাজারে যাবা কবে?

—বলতে পারিনে, কেন্?

—তোমার পাশে পাশে হাঁটতাম।

—বলতে পারিনে কবে আবার যাব বাজারে। ব'লে সুরতুন পথ ধরল।

ইস্কান্দার তার চিবুকে হাত রেখে অবাক হ'য়ে সুরতুনের দিকে চেয়ে রইল। এ মেয়েকি গল্পে শোনা জীন পরীদের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে এই যেন তার সমস্যা।

খানিকটা দূরে গিয়ে সুরতুন ত একবার পেছনে ফিরে দেখতে পেয়েছিল ইস্কান্দার গালে হাত রেখে তাজ্জবের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

স্ত্রী জাতির এই মস্ত দুর্বলতা তাদের এরকম প্রেম নিবেদন বিমনা ক'রে দেয়। এ আমার বক্তব্য নয় যে তারা চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, বিপথে যায়। কিন্তু তারা চিন্তা করে। মূঢ় বালকও যদি রাজেন্দ্রাণীর কাছে তার হৃদয় খুলে দেয়, সে বালকের যে দুর্দশাই হ'ক রাণী একসময়ে কিন্তু বালকটির কথা চিন্তা না ক'রে পারেনা।

ইস্কান্দারের কথাগুলি ভাবতে ভাবতে সুরতুন ফতেমার বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল। মাধাইএর কথা মনে হ'ল। অনেকটা সময় মনে হয়নি ব'লেই যেন চতুর্গুণ প্রবল হ'য়ে মনে পড়ে গেল। যে বোবা আশঙ্কায় সে রাত্রির অন্ধকারে বাঁধের পথে ছুটে পালিয়েছিল সে ভয়টা নেই; কিন্তু খানিকটা গ্লানি, খানিকটা নিজের আচরণের জন্য অনুতাপ মিলে একটি পাথরের মতো তার মনের সব স্ফূর্তিকে আচ্ছন্ন করে দিল।

আহার্য্য সংস্থানেরই বা কি উপায় অবশিষ্ট রইল? এই গ্রামে এর তার বাড়ীতে ধান ভেনে? এক সময়ে সেটাকে অনেকখানি মনে হ'ত কিন্তু চালের কারবারে অন্তত দুবেলা কিছু আহার করার অভ্যাস হ'য়ে গেছে। ভূমিহীনাদের ভিক্ষাবৃত্তির চাইতে অন্তত একটি মহৎ বৃত্তি সেটা। কিন্তু সে জীবনের উপর যেন পর্দা পড়ে গেল।

আর এই রূপ! মাধাই যা আবিষ্কার করল, বোকা ইস্কান্দারের চোখেও যা ধরা পড়ে। কোথায় লুকাবো? সুরতুনের মনে হ'ল মাটিতে গড়িয়ে আগেকার মতো মলিন করবে পরিধেয়, মাটি মাটি করবে ত্বকে, ধুলো তুলে তুলে মাথায় দিয়ে চুলগুলিতে জট পাকাবে। (ক্রমশঃ)

"শমনের স্পর্শ ছাড়া মনে নেই ঝঞ্ঝার বিরাম
বিস্মৃতিতে নেই মুহূর্তেক-জপা কোনো ক্লিন্ন নাম"

কবিতা

[ত্রিশের দশক]

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

কল্লোল-প্রগতির ও কালিকলমের সাহিত্যিক আন্দোলনের পর যুগ হিসেবে বাংলা সাহিত্যের বিচার করা মুস্কিল—দশক হিসেবে সাহিত্যের মতিগতি এবং চিত্রচরিত্র দেখাই প্রশস্ত। দশকগুলোও শতকের নমুনায় শেষ দিকে হিসেব-নিকাশ দেখায়। আমরা যদি ত্রিশের দশকটির দিকে দার্শনিক দর্শকের ভঙ্গী নিয়ে তাকাই তাহলে সেখানে 'পরিচয়' (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত), 'বিচিত্রা' (উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত) 'বঙ্গশ্রী' (সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত), 'পূর্ব্বাশা' (সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত) 'কবিতা' (বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত) এবং 'চতুরঙ্গ' (বুদ্ধদেব বসু এবং হুমায়ুন কবির সম্পাদিত) নামক ষট্‌-চক্রের সাহিত্য-পত্রিকার নূতন প্রতিষ্ঠান দেখতে পাব। দশকের মানসিক ফসল এসব পত্রিকার মারফৎ-ই বেশি পরিবেষিত হয়েছে। 'কবিতা' পরিবেষণে অগ্রসর ছিল 'পরিচয়-পূর্ব্বাশা-বিচিত্রা-কবিতা-চতুরঙ্গ'। অন্যান্য বহু ক্ষণজীবী সাহিত্য-পত্রিকাও কবিতা-পুষ্টির সহায়তা করেছে। উরোপা-আনা ষোল-আনা আস্‌তে চেয়েছে এসময়কার কবিতায়।

রবীন্দ্রনাথ কোনো জাতীয় কবিতাতেই বিশেষ আপত্তি জানান নি, আপত্তি ছিল তাঁর দুর্ব্বোধ্য কবিতায়। কবিতায় দুর্ব্বোধ্য অলঙ্কার প্রয়োগ বা দুর্ব্বোধ্য ভাষা ব্যবহার সব ক্ষেত্রে যে কবি-কৌশলে সম্পাদিত হত, তা নয়। নূতন রূপকল্পের উদ্ভাসের দরুণ তার মূর্ত্তিদানের ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে দুর্ব্বোধ্যতার ইঙ্গিত দেখা দিত। এ-ব্যাপারটি ইতিহাস-চেতনার ফলে পাউণ্ড এবং এলিঅটে ত ছিলই, তাছাড়া ছিল ইংরেজ কবি ডান ও জেরার্ড হপকিন্সে। দুর্ব্বোধ্যতা মেটাফিজিক্যাল চিন্তা থেকেও আসে, যেমন 'চর্য্যাপদে' দেখা যায় : তেম্নি ডান্‌ ও হপকিন্সে তা অনুভব করা যায়। তবে হপকিন্স ধ্বনির ব্যঞ্জনায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দুর্ব্বোধ্য হতেন ; দ্বৈতার্থ বহন করবার ক্ষমতা তাঁর শব্দের বিন্যাসে থাকত ; অভ্র প্রাকৃত কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছের এই ক্ষমতা ছিল। দ্বৈত-বোধ আশ্রয় করে অদ্বৈত পূর্ণতার বোধে কবিতার অঙ্গ প্রসাধন বিধেয় বলে অন্তত কাব্যসূরীবৃন্দ বলবেন। কিন্তু পদ্যকার ও সমালোচক ষ্টার্জ মুর হপকিন্সের জড়িমা দূর করবার অভিপ্রায়ে আপন স্থূলতার পরিচয় দান করলেন—আপন হস্তক্ষেপে তিনি হপকিন্সের যে সংশোধিত পরিণতি দেখালেন তাতে না রইল হপকিন্সের আবেগময় ভাষা, না রাগরাগিণীর উত্থানপতন।

পদান্তে অনুপ্রাসের ধ্বনি ছাড়া যে পংক্তির অন্তর্গত শব্দ-পরম্পরার বিন্যাস ধ্বনির একটি স্পন্দন জাগাতে পারে এ-জ্ঞান রবীন্দ্রনাথের গদ্য-ছন্দের কবিতা ত্রিশেই আমাদের মনে এনে দিয়েছিল। হপকিন্সে মনোযোগী হলে তা আগেই হয়ত আসত। প্রেমেন্দ্র মিত্র 'প্রথমা'র যুগে গদ্যভাষায় কবিতা লেখেন কিন্তু ত্রিশের বৎসরগুলোতে রবীন্দ্রনাথ হপকিন্সের চেতনায় জাগ্রত হলেন। "দেখতে পাব বেদনার বন্যা নামে কালের বুকে" পংক্তিটি রবীন্দ্রনাথ যখন 'বিশ্বলোক'-বর্ণনায় স্থাপিত করলেন তখন শব্দ-স্থপতি

হপকিন্সের "সীসকের ও স্বর্ণের প্রতিধ্বনি" গ্রন্থের অন্তর্গত শব্দ-গরিমা শোনা গেল। গদ্য-ছন্দের কবিতায় শ্রীসমর সেন এই ধ্বনির প্রতি খানিকটা মনোযোগী হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম কবিতা পূর্ব্বাশায় বেরয়, পরে তিনি 'কবিতা'-পত্রিকায় বিশিষ্টতা অর্জ্জন করেন। রূপকল্পেও তিনি বৈশিষ্ট্য দেখতে সমর্থ হয়েছেন।

১৯৩৩-এ রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে যে গদ্য-কবিতার ভঙ্গী দেখান তা বাংলা কবিতার অন্তর্গত নানা দিকের বন্ধন-মোচন করেছিল। ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের মনে আমরা হিন্দু মাতৃমন্ত্রের ছায়া দেখতে পেলাম 'শিশুতীর্থ' কবিতায়। একটি নবজন্মকে স্বাগত জানাচ্ছেন তিনি, যখন বাংলার তরুণ শাক্তবৃন্দ বন্দীশিবিরে। হিটলারের রাজ্য-প্রাপ্তিও এই সনে। হিটলার-সম্পর্কে অচেতন প্রাচ্য-ভারতে 'পূর্ব্বাশা'র জন্মও এই সন বলে বামপন্থার হুজুগের দিনে 'পূর্ব্বাশা'র সাহিত্য-প্রচেষ্টাকে ফ্যাসিজম্‌-এর সহায়ক রূপে কুখ্যাত করবারও অপচেষ্টা হয়েছে। সে যা-ই হোক, সমর সেনের গদ্য-কবিতা প্রকাশ করা ছাড়াও পূর্ব্বাশা ১৯৩৪-এ শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের, শ্রীবুদ্ধদেব বসুর এবং শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গদ্য-কবিতা (লরেন্সের অনুবাদ) প্রকাশিত করেন। ১৯৩৬-এ যখন 'কবিতা'-পত্রিকা বেরয় তখন গদ্য-কবিতার ছন্দ সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা ব্যক্তির। সমর সেন সেই ছন্দসূত্র সম্পর্কে তখনই সচেতন হন। কিন্তু এ-ছন্দের ধ্বনি-সূত্র বিচিত্রতায় উজ্জ্বলতর হয়েছিল শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তীর কবিতায়। তিনি যেন শব্দময়ী পৃথিবীর পুরনো আর নূতন শব্দ জড়িয়ে তার যোগ্য ভাষা দেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন।

এ-ছন্দে ঔৎসুক্য বহু ধ্বনি-সিদ্ধ কবির ছিলনা। ১৯৩৪-এ 'পরিচয়ে'র দ্বারা পরিচিত কবি শ্রীবিষ্ণু দে 'পূর্ব্বাশা'য় যে পঞ্চমাত্রিক পূর্ণাঙ্গ-ধ্বনির ছন্দে 'পুনশ্চ' নামে কবিতাটি প্রকাশ করেন তার বক্তব্য ও ভাষা প্রাচীন হলেও ছন্দ-কৃতিটি নূতন ছিল। রবীন্দ্রনাথ, মোটের উপর, এ-দশকে বাঙালী তরুণ কবিদের চিত্তে ধ্বনি-জ্ঞান বিতরণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আটপৌরে কথা-বার্ত্তায়ও যে বাঙালীর ভাষা ছন্দের দোলা আনতে সমর্থ এ তথ্য সবাই ইতিপূর্ব্বে জান্‌তেন না, জানলেও কাব্য-নির্ম্মাণে তার ব্যবহার মানতেন না।

ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-ছন্দের কবিতা বাংলা কবিতার রোমান্টিক ভাবটিকে ইতিহাসানুগ ও বাস্তব স্বভাবাপন্ন করে মোড় ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল। তার প্রতিক্রিয়া নানা চিত্তে নানা আকারে চল্‌তে লাগল। আটপৌরে হতে গিয়ে পৌর মধ্যবিত্ত তরুণ দিনেশ দাস 'কাস্তে' নামক বিখ্যাত কবিতাটি রচনা করলেন যাতে পৌরাণিক কৃষি-সভ্যতার ধার ঝিলকিয়ে উঠ্‌ল। সমর সেন উর্ব্বশী-কামনায় পৌরুরবিক সুর শোনালেন। এবং অবশেষে বিষ্ণু দে ঘোরতর অরোমান্টিক হয়ে উঠলেন। ফলে হট্টি 'ঘোড়-সওয়ার'-এর একটি মূর্ত্তি আঁকতে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুভবে দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠলেন। বাস্তবতার দৌড় লাগাম মানে না—রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন জাতীয়তাবাদে, ইতিহাসে, প্রেমস্বভাবে বাস্তবতা আবদ্ধ থাকবে কিন্তু বিষ্ণু দে দেখালেন যে বাস্তবতার আরো রাস্তা আছে।

কবি-কর্ম্ম বস্তুত অন্তঃকরণের প্রকাশ। ত্রিশের দশকে নানাজাতির অন্তঃকরণই প্রকাশিত হয়েছে বাংলা কবিতায়। দেশাত্মবোধের ও বামপন্থার ছাপ এসেছে কবিদের মনে কিন্তু যে-স্থলে ছাপগুলো অভিজ্ঞতার স্পর্শ পায়নি, পুঁথিগত বা বিশ্ববার্ত্তাগত জ্ঞানের মারফৎ চেতনায় বা চিন্তায়

এসে ভাবনার অবকাশ দিয়েছে, সে-স্থলে তার বর্ণনা কাব্য-ধর্ম্মে অভিষিক্ত হতে পারেনি। মগজ সক্রিয় হওয়া আর অন্তঃকরণে ছাপ পড়া হয়ত এককথা কিন্তু অভিজ্ঞতা এমনই একটি ব্যাপার যাতে মগজের কাজ ব্যতীতও অন্তঃকরণ ছাপ গ্রহণ করে। তাকে অনুভব বলা যায়। কোনো বিষয়ে অনুভব পেতে হলে তার ভেতরে বসবাস করতে হয়। বাম-পন্থার অন্তর্গত হয়ে যেহেতু কবিদের ভেতর কেউ বাস করবার সুযোগ পাননি তারই জন্যে ভাবনা-বিষয়ক উপাদানে ভালো কবিতা-ও তৈরী হয়নি। বরং দেশাত্মবোধে অনেক ভালো কবিতা তৈরী হয়েছে, কেননা এ-বোধ ছিল অভিজ্ঞতার ও অনুভবের অন্তর্গত। এলিঅট উরোপার মঙ্গলকামনায় গতযুগের অবসানে যে 'জর্নি' চালিয়ে হিমালয় পৌছিয়েছিলেন তাতে অভিজ্ঞতার ব্যাপারটা অনুপস্থিত ছিল। তিনি ভেবে-চিন্তে অনুভবেরই প্রান্তে তাঁর জ্ঞানকে পৌছিয়ে দিতে চেয়েছেন যা খানিকটা জীবনানন্দে দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৩-এ পুনশ্চ কাব্য-গ্রন্থে 'শিশুতীর্থ' কবিতায় যে 'সিন্ধুতীরে' এসে দাঁড়িয়েছেন তাকে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার বাইরের দেশাত্মবোধ আমরা বল্‌বনা।

অনুভবের একটা ভিত্তিভূমি বাস্তব ক্ষেত্রে থাকা চাই—সে অনুভব রঞ্জিত হয়ে চলে বা জটিল আকার ধারণ করে ক্রমান্বয়ে জ্ঞানার্জ্জনের ও অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের দ্বারা। পরিপক্ক অনুভূতি কবিতার জন্ম দেয়। ত্রিশের দশকে যে সাম্যবাদের জ্ঞান এসেছিল তা এ-যাবৎ-কাল জ্ঞানের দ্বারাই রঞ্জিত বা জটিল হচ্ছে। অভিজ্ঞতার বা অনুভূতির ভিত্তি তা পায়নি; সুতরাং বামপন্থার কাব্যকৃতি অন্তঃকরণের যে ছবি দেখায় তাতে কাব্য-পাঠক মনে সাড়া পান কিনা সন্দেহ। কল্পনার দেখাকে স্বপ্নের দেখাতে তুলে না ধরতে পারলে কাব্য-কর্ম্মে ও কাব্য-ধর্ম্মে খুঁত থেকে যায়। স্বপ্ন সম্পূর্ণত অন্তঃকরণের তৈরী বস্তু। অন্তঃকরণের প্রক্রিয়াকে অতি প্রযত্নে আয়ত্ত, অনুভব এবং প্রকাশ করতে হয়; যিনি তা করতে পারেন তিনিই কবি। প্রকাশ করাতে প্রযত্ন থাকার অর্থ এই নয় যে তা বৈজ্ঞানিক সুবোধ্য বাক্যে আপন কৃতিত্ব প্রদর্শন করবে। ন্যায়শাস্ত্রের বিচার ভাষা ও ভাব অনেক ক্ষেত্রে মানতে অস্বীকারও করতে পারে। যেমন স্বপ্ন তা মানে না। সেই অবাধ্যতাকেও যত্ন সহকারে কবিতার স্থান দেওয়া যায়, যেমন হপকিন্স দিয়েছেন। এজ্রা পাউণ্ড-ও সে-চেষ্টায় সফল হয়েছেন। বাংলা-কবিতায় এ-ধরণের যে প্রয়াস হয়েছে তা 'কবিতা'-পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সুযোগ লাভ করেছিল ত্রিশের দশকে।

অন্তঃকরণের প্রকাশে সমর সেন যে বিদ্রূপের আশ্রয় নিয়েছিলেন তার বীজ সুধীন্দ্রনাথে ছিল। জীবন সমালোচনায় বা সামাজিক আচরণের চিত্র প্রদর্শনে সে যুগ কুরূপকে আবৃত করে স্বরূপ প্রকাশে বিশেষ মনোযোগী না হয়ে স্বরূপের প্রতিই যে নিষ্ঠ দেখিয়েছে তা বলবনা। সমর সেন মধ্যবিত্ত জীবনে নেতি-বাচক দিকটিকে এতো বেশী উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন, যার দরুণ তিনি শেষপর্য্যন্ত ক্লান্তকর। কোন একটি অভিজ্ঞতা শুধু নেতিবাচক দিক নিয়ে মানুষের জীবনে উপস্থিত হয়না—তা যদি হত তাহলে সে-অভিজ্ঞতার পরমায়ু মানব সভ্যতা থেকে নাকচ হয়ে যেতো। মধ্যবিত্ত জীবনে না-পাওয়ায় শূন্যতাই যদি থাকত তাহলে তা নিয়ে একটি শ্রেণী কি উপায়ে বেঁচে যাচ্ছে? না-পাওয়ার নৈরাশ্য থেকে শোকার্ত্ত পংক্তি রচিত হতে পারে এবং রোমান্টিক কবিরা এই শোক-ব্যঞ্জনায় কাব্যে মাধুর্য্য রসও দিতে পারেন। সমর সেনের কবিতা ক্রমে রুক্ষ হাহাকার দিয়েছে, বিদ্রূপ-বিষ ছড়িয়েছে, মাধুর্য্য দেয়নি। মাধুর্য্য আনে নৈরাশ্য জনিত শোকাচ্ছন্নতায় হঠাৎ একটু আশার বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হলে। তার জন্যেই কবিরা জীবনের

স্বরূপ সন্ধান করেন এবং এ- সন্ধানে নৈরাশ্যের ভেতরও আশার আলো দেখা দেয়। অবশ্য সে-আশা সামাজিক চেহারা থেকে আসেনা—ব্যক্তি জীবনের অঙ্গ থেকেই অথবা বাঁচবার সাধ থেকেই কবিকে জীবনের আশার দিকটি কুড়িয়ে নিতে হয়। বিষ্ণু দে নৈরাশ্য-চক্র পরিভ্রমণ করেছেন, আশান্বিত সমাজ কল্পনা করেছেন এবং অবশেষে ইদানীং ব্যক্তি-জীবনের প্রতি আকর্ষিত হয়েছেন। সমর সেন অর্দ্ধপথে পরিক্রমা শেষ করে কাব্য থেকে অন্তর্হিত।

ত্রিশের দশকে কাব্য-সঙ্কলন গ্রন্থ একাধিক বেরিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একটি সঙ্কলন গ্রন্থের সম্পাদকতা করেছিলেন এবং বিষ্ণু দের কবিতা বর্জ্জন করেছিলেন। তখনকার বুদ্ধিজীবী তরুণ চিত্ত কিন্তু শ্রীবিষ্ণু দে এবং শ্রীসমর সেনের উপর আত্যন্তিক আশা পোষণ করেছিলেন। হয়ত এ-আশার পেছনে রবীন্দ্রনাথের বিচারের প্রতি একটি কটাক্ষ উদ্যত ছিল। কবিদের প্রতি কাব্যোৎসাহীর যুক্তিহীন আশা-আগ্রহ কবিকে কদাচিৎ সুপথ দেখায়। তেমি, উপেক্ষা ও অনাদর কবি-প্রতিভার শিকড় শুকিয়ে ফেলে। রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-সমালোচনা বাংলাদেশে তেমন কিছু হয়নি।

'প্রগতি'র সম্পাদক শ্রীঅজিত দত্ত একজন উপেক্ষিত কবি। যতীন সেনগুপ্ত, মোহিত লাল, প্রভৃতি যে-কালে (বিশের দশকে) বাংলা-কবিতার একটি উপেক্ষিত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনছিলেন, সেকালেই অজিত দত্ত তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর এঁকেছিলেন বহু স্মরণীয় কবিতায়। যে-কবি এমন পংক্তি রচনা করেন : "মোর কাব্যে অনশ্বর হয়ে থাক এ জন্মের দেহ" তাঁর কাব্য-দেহে ঐলিজাবেথীয় উপেক্ষিত নাট্যকারদের ভঙ্গী আমরা অনায়াসেই আবিষ্কার করতে পারতাম কিম্বা পারতাম ভবভূতির কাব্যানুবাদ সন্ধান করতে। কিন্তু তা করা হয়নি। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় বিচিত্রা-পত্রিকা মারফৎ পরিচিত হয়ে বাংলা কবিতায় অজিত দত্তের মনোভঙ্গী বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। কাব্যে যাঁরা পুরাতন অবহেলিত ঐতিহ্য আমদানী করেন, তাঁরা নিজেরাও অনেক ক্ষেত্রে এই ভ্রান্তিতে পতিত হন যে তাঁরা নূতন কথা বলছেন। কাব্য সমালোচকরা ত এ ভ্রান্তিতে পতিত হবেনই। বিশ-শতকে নূতন কথা বলবার কিছুই নেই। আছে পুরাতন অনুভবকে নূতন রঙ মাখিয়ে উপস্থিত করার কাজ।

হিটলার যুদ্ধের মাদল বাজাচ্ছেন ত্রিশের শেষ দিকে। এলিঅটের সাহিত্য-সাধনা 'ক্রাইটেরিয়ানে'র তরী টলমল। প্রথম যুদ্ধাবসানে তাঁর 'থ্রি হুহাইটেড লেপার্ড্‌স'-এর স্বপ্ন স্বস্তিকা-মার্কা আর্য্য ব্যাঘ্রের হলুদ-কালো ডোরায় রুশিয়ার লাল-প্রান্তরে রোদ পোহাতে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী দারুণ অস্বস্তি। রবীন্দ্রনাথ সে-সময়েই বাঙালী কবির মানস-মুকুরে শক্তির ছায়াপাত দেখতে উৎসুক হয়েছিলেন। প্রেমের প্রতিমা কেমন তৈরী হচ্ছে তা দেখবার অভিপ্রায় তাঁর ছিলনা। ১৯৩৯-সনে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'জেসন' লিখেছিলেন।' বৈশালী গণতন্ত্রে আশ্বাস ছিল তাঁর, স্বৈরিণী-উরোপায় বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ সিন্ধুতীরের যবন-গৃহে জেসন-লীলা, স্বস্তিকা-লীলা সব কিছু ঐতিহাসিক নিষ্ঠায় অবলোকন করেই হয়ত পরিচয়ের সুযোগ্য সম্পাদক হিসেবে রচনা করেছিলেন এ-পংক্তিগুলো :

"যে-প্রাক্তন তৃষা
মেটাতে পারেনি সিন্ধু, হয়তো বা নির্ব্বাণ হবে তা
জোয়ার-ভাঁটার সন্ধি নদীবক্ষে, যেথা

মুকুরিত মহাশূন্য, সমুদ্রের পিতা ও প্রতীক,
দুরত্যয়, স্বচ্ছ, প্রগতিক।" (১৯৩৯)

এ-সমুদ্রের পিতা ও প্রতীক বৈদিক স্বস্তিমন্ত্র যা সম্পূর্ণত ভারতীয়। ইণ্ডোজার্ম্মাণ জাতির আদি জনক তখন ইরাণ-তুরাণে। শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র যদিও আঙ্গিকে সুধীন্দ্র-ধর্ম্মী, তবু অভীপ্সায় ইরাণ-তুরাণী হয়েছিলেন :

"কহিও তাহারে করিনে পরোয়া পিতৃঋণ,
রক্তে আমার ওমরী আদিম সাকী ও সুরা।" (চতুরঙ্গ—১৯৩৯)।

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ-ও 'তুষার'-রক্ত প্রতীক্ষায় ছিলেন :

"কবে
চৈত্র-তপ্ত দীপ্ত নারী এক
তুষারের বর্ম্ম ছিঁড়ে দৃপ্ত দৃঢ়তায়
দেখা দেবে " । (চতুরঙ্গ—১৯৩৯)।

বুদ্ধদেবের আত্মবিদ্রূপাত্মক 'গাধা'-কবিতা সে-সময়কার। পারস্য গাধার ওষ্ঠ-জাত ধ্বনিকে খরোষ্ঠী লিপির অক্ষর বিধৃত ধ্বনি মনে করা হত ভারতে। গ্রেধ্রোসিয়া বা অশ্বপতির দেশ ছিল সে-অঞ্চল। মোটের উপর, বাঙ্গালী কবির চিত্ত সে-সময়ে বাংলার ভূগোলের সীমা ছাড়িয়ে আপন সত্তার সন্ধান করেছিল ঐতিহাসিক জাতিতত্ত্বে। রবীন্দ্রনাথের লেখা সিন্ধুসভ্যতার ইতিবৃত্ত 'শিশুতীর্থ' কাউকে প্রেরণা দিয়েছে, কেউ বা স্বকীয় চেষ্টায় ইতিহাস-অনুসন্ধান করে ভারতীয় সীমার বাইরে মহাভারতীয় এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছেন। ঘোর-সওয়ারে আসক্ত শ্রীবিষ্ণু দে বা উর্ব্বশীতে নিরাসক্ত শ্রীসমর সেন আত্মপ্রসারের কাজে দিক্ খুঁজে পান নি, যেহেতু তাঁদের মানসমুকুল ছিল এলিঅটের কড়াই-এ। অবশ্য এলিঅট শৈলেন্দ্র তুষার জাতির পদচিহ্ন দেখিয়েছিলেন, হিমালয়ে। 'আমার প্রেম' কবিতায় শ্রীবিষ্ণু সেইজন্যেই 'অলকানন্দা'র কথা ভেবেছেন। তা-ও বহু পরে—'পীতবোমা'র যুগে।

বঙ্গশ্রী-সম্পাদক শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এবং অতঃপর শ্রীসজনীকান্ত দাস যেমন কাব্য ভাষায় সাধু ও সাধারণ শব্দ প্রয়োগ করেছেন, তেম্নি চতুরঙ্গ-সম্পাদক হুমায়ুন কবির কাব্য ভাষায় জটিলতার প্রশ্রয় দেননি। অবশ্য 'পুনশ্চে'র রবীন্দ্রনাথ 'নবজাতক'-গ্রন্থে-গ্রথিত পয়ার ছন্দে ফিরে এসে পংক্তি-পদে কথ্য-ভঙ্গীর ভাষা প্রয়োগ করতে সুরু করেছিলেন—যেমন :

"মানুষের চিত্ত নিয়ে সারাবেলা
মহাকাল করিতেছে দ্যূত খেলা
বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন,—
কিন্তু কেন ?" (কেন)

সুতরাং কাব্যভাষার আইন-কানুন শ্লথ হয়ে গিয়েছিল তখন। ভাষার মুক্তি যে কোন্ পথে

সে চিন্তা ফুরিয়ে গেলেও কবিতার ভাষা-বন্ধন কোন্ পথে সে-কথাটি তখনও ফুরোয়নি। ছন্দ-বন্ধনে ভাষা আসতে চাইল অনেকের বিবেচনায় কিন্তু ভাষার প্রাক্তন শব্দ-ধ্বনি, অলঙ্কার বা যথেচ্ছ শব্দব্যবহার বর্জ্জন করে বাংলা-কবিতা তখনই ব্যঞ্জিত হতে চাইল। এ-ব্যঞ্জনায় সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন। এবং পূর্ব্বাশা-সম্পাদক খানিকটা সচেষ্ট ছিলেন, যেমন :

সূর্য্য তোমার গেলনা কুজ্ঝটিকা
স্বপ্ন হলনা শেষ :
এখনো আকাশে অনেক অন্ধকার
রাত্রি অনুর্ব্বর।

'পৃথিবী'-গ্রন্থস্থ কবিতাটির এ-পংক্তিগুলো সূর্য্যের প্রতি নিবেদন হিসেবে দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু যুদ্ধোত্তত পৃথিবীর সভ্যতার দিকে তাকালে সূর্য্যের কুজ্ঝটিকা যে শীতের কুজ্ঝটিকা নয়, সভ্যতা-সূর্য্যের কুহেলী কুঁয়াশা তা খুব সহজেই বোঝা যেতে পারত। তাছাড়া কিছু বুঝতে হলে আকাশ-বিজ্ঞান এবং নবজন্মের অভীপ্সা বোঝাতে হয়ত সমর্থ ছিল পংক্তিগুলো। জন্মের মূল কারণ নিয়েও টানাটানি চলছিল সে যুগে। সমর সেনের 'গ্রহণ' ('কবিতা'-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতার-সঞ্চয়) গ্রন্থ এ-যুগের কারণের কদাচার বর্ণনায় মুখর : যেমন :

"অবশেষে শূন্যের সরাই খানায়
ভ্রাম্যমান বিলোল দিন অদৃশ্য হয়
পিছনে রেখে যায় শুধু কারণের গন্ধ
কয়েক প্রহরের নিশাচর শাস্তি।"

গদ্য-ভঙ্গীর অনিবার্য্য গতিবিধিতে তিনি রূপকল্প সন্ধান করেছেন সরাইখানায় কিন্তু 'কারণ' মদ্য 'কারণ'-সলিল-ভঙ্গীতে এসে গেছে গাঙ্গেয় হাফিজিআনার হাত বেয়ে, যখন তিনি বল্ছেন :

"জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
আকাশ-গঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে।"

কবিকে উপাখ্যানের উপাধানে শয়ান না দেখলে সম্ভবত বাঙালী পাঠকের চিত্ত ভরে ওঠেনা। 'আকাশ-গঙ্গা' প্রতীক বা রূপকল্প যতো সহজবোধ্য 'কারণ সলিল, বা 'অপ্রকেত সলিল' তেমন নয় হিন্দু মানসে অথচ এ-সলিলের একটি তন্ত্রে অপরটি বেদে বিধৃত। ও'দুটি ব্যাপার হিন্দুত্বের বাইরে নয়, অথচ আমরা এম্নি মজাদার হিন্দু যে রূপকথা আর উপাখ্যান ছাড়া কিছু বুঝিনে। মাগন ঠাকুর, আলাওল, মৈমনসিংহ গীতিকা প্রভৃতি আমাদের গাথা-বোধের জন্যে দায়ী। কবিরা দুর্ব্বোধ্য আখ্যা পেতে সুরু করলে অগত্যা উপখ্যান রূপকথার প্রতীক আমদানী করেন সচেতনভাবে।

ইতিহাস-পুরাণকে জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে কী প্রক্রিয়ায় কবিদের জড়ানো উচিত তা ষ্টিফেন স্পেণ্ডর অডেনের কাব্য-সমালোচনা প্রসঙ্গে এ-সময়ে বিবৃত করেন। এই দুই ইংরেজ কবি তখন বাংলা

দেশে ঔৎসুক্যের সঞ্চার করেছিলেন। স্পেণ্ডর এলিঅট-ধর্ম্মী। কিন্তু ইংরেজি কাব্য-পাঠক ধর্ম্মে ও
ইতিহাসে যতোটুকু ওয়াকিবহাল, আমাদের দেশের কাব্য-পাঠকরা তার শতাংশের একাংশও এই
সংস্কৃতির ছায়া মাড়ান না, স্থতরাং ইতিহাস-দর্শী কবিরাও বাঙালী পাঠকের নিকট দুর্ব্বোধ্য থেকে
যান। অজিত দত্ত এ-সময়ে 'ভোর হ'ল মোহেঞ্জোদারোতে' (চতুরঙ্গ) কবিতাটি অনর্থক লিখলেন,
কারণ সৎ-ইতিহাসের পাঠক বাঙালী কাব্য-পাঠকরা নন। ইতিহাসকে রূপকথা করে তুলেছিলেন
জীবনানন্দ—বহু তরুণচিত্ত সে-কাব্যে উৎসুক হল। অবশ্য তরুণ সময় সেনকেও মধ্যবিত্ত তরুণচিত্ততা
'ইস্কুল'-মাষ্টার করে তুলতে চাইলেন। তার একমাত্র কারণ তাঁর গদ্য-ভাষণ এবং যৌবনবেদনারস।
রোমান্টিক তিনিও কিন্তু ছন্দশীলতার কঠিন পথে এসে যুগোচিত ব্যথা-শোক-আর্ত্তি প্রকাশে অশক্ত
ছিলেন। বিষ্ণু দে অপরপক্ষে ভেবেছিলেন যে রোমান্টিক হওয়া-না হওয়া একটি পোষাক পরা-না-পরার
মতো ইচ্ছাধীন। স্পেণ্ডরের কাব্য-কৌশল-ব্যাখ্যা কাব্য-নির্ম্মাতাদের মতির উপর এমন ছাপ আনবার
সুযোগ করে দিয়েছিল। রোমান্টিক একটি মনশ্চরিত্র। বাস্তবতার রাজ্যে বসবাস করেও যে রোমান্টিক
হবার অনেক রাস্তা খোলা থাকে, তখনকার দিনের অনেক চরিত্র-সাধক এ-কথাটি বিস্মৃত হয়েছেন।
রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতাকে এই বিস্মৃতির জন্যে দায়ী করা উচিত হবেনা— কারো কারো ধাতই থাকে
অরোমান্টিক। তাঁরা রোমান্টিক কবিতা লিখতে গেলেও কৃতকার্য্য হননা। আর রোমান্টিকদের সুবিধে
এই যে বাস্তবতায় বসবাস করেও তাঁরা চরিত্র-ভ্রষ্ট হননা।

উরিপিদিস্ অবলম্বনে

"শুধুই দেখবে তবে লাল তলোয়ার
চিহ্ন তার থেকে যাবে কপাল-কুঙ্কুমে
কবে কোন্ কালো সেনা এসে নাকি ঘুমে,
শুনি, দিয়ে গেলো রঙে স্মৃতির জোয়ার !"

ভারত-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ

ইন্দ্রজিত্

পূর্ব্বানুস্মৃতি

ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের বুকে শাসক হিসেবে পদার্পণ করে বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশে একটা জাতির সংস্কৃতি আছে সে সংস্কৃতি সর্ব্বভারতীয় সংস্কৃতি। বহু ইতিহাস সুখ-দুঃখের কথা সে সংস্কৃতিতে আছে অলিখিত ভাষায়। সে সংস্কৃতিকে মেরে ফেলা যাবে না, নাশ করা যাবে না পুরোণ ধর্মকে, অতএব নানা রকম বিদেশী প্রলোভন বিদেশী চাকচিক্য আর বিদেশী ধর্মের উপকারিতা দেখিয়ে ভুলিয়ে দিতে হবে ভারতবাসীকে নিজস্ব জাতীয়তা। ইতিহাস আর সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে প্রমাণ করতে হবে ভারতবাসীর কাছে, ইংরেজ শুধু শাসক নয়, শোষকও নয়, তারা ভারতের বন্ধু এবং এই উদ্দেশ্য নিয়েই ইংরেজ কাজ আরম্ভ করল শাসক হিসাবে আসার পর থেকে।

ভারতবর্ষের অধিবাসীরা কি সেই বিদেশীর প্রভাব ও ধর্ম নেবে না বুঝতে চেষ্টা করবে, রক্ষা করতে চেষ্টা করবে নিজেদের স্বধর্মকে—এ প্রশ্ন সেদিন উনিশ শতকের প্রায় প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে উদয় হয়েছিল। প্রয়োজন হোলে নিজেদের জাতীয় ধর্ম-দর্শনকে ত্যাগ করে নবাগত শাসকের ধর্মকে গ্রহণ করা উচিত, না নিজেদের ধর্মকে যুগ হিসেবে, যুগের তাগিদ হিসেবে পরিবর্ত্তিত করে দেওয়া উচিত, এই বিশেষ প্রশ্নটি সেদিন কতিপয় চিন্তাশীলকে রীতিমত চিন্তা করবার খোরাক যুগিয়েছিল। সেই চিন্তাশীলদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, নন্দকিশোর বোস, বৃন্দাবন মিত্র প্রভৃতি বাংলার ধর্ম ও সামাজিক নেতারা আছেন। এই সমস্ত নেতাদের অগ্রণী হোয়ে রাজা রামমোহন রায় ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বেদান্ত কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বেদান্ত-মত প্রাচীন হিন্দু দর্শনের রক্ষার জন্যে প্রতিষ্ঠা করা হোল।

রাজা বেদবাদী ছিলেন, ব্রহ্মবাদী ছিলেন, কিন্তু ছিলেন না সাকার মূর্ত্তি পূজার সমর্থক। তিনি পণ্ডিত হরিহরানন্দের কাছ থেকে বৈদিক ধর্মের বিষয় বহু তথ্যের পরিচয় পেয়েছিলেন ও সেই পণ্ডিত তাঁর নিজের ভাই পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে ব্রাহ্ম সভায় ভর্ত্তি করেছিলেন। সেই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশই হোলেন রাজা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ধর্মের প্রথম পুরোহিত।

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন একেশ্বরবাদী। তিনি সে মতকে বিশ্বাস করেছেন প্রথম নিজে, তারপর সে মতকে প্রচার করেছেন। সে মতকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেছেন, নিজের যুক্তি দেখিয়ে তিনি বক্তাদের বলেছেন যে মূর্ত্তি পূজাটা প্রাচীন শাস্ত্রীয় বিধান নয় এবং সেই কারণ বশত ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় মাদ্রাজের সুব্রাহ্মণায় শাস্ত্রীর সঙ্গে এক তর্ক সভায় অবতীর্ণ হন। সেদিনকার বিষয়-বস্তু ছিল মূর্ত্তিপূজা শাস্ত্রীয় বিধান কি বিধান নয়। কিন্তু সেই তর্ক-সভায় সুব্রাহ্মণায় শাস্ত্রী পরাজিত হন রামমোহনের কাছে। সেদিনকার সভায় উপস্থিত ছিলেন কোলকাতায় বিশিষ্ট নাগরিক রাধাকান্ত দেব। রাধাকান্ত দেব ছিলেন সম্পূর্ণরূপে হিন্দু-শাস্ত্র-বিশ্বাসী।

রামমোহন রায়কে তিনি ভাবলেন সংস্কারবাদী হিসেবে, যে সংস্কারবাদকে রাধাকান্ত দেব একেবারে চান না। সেই কারণবশত অর্থাৎ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিযোগিতা করবার জন্যে রাধাকান্ত দেব সেই সুব্রাহ্মণায় শাস্ত্রীর সহযোগে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্ম-সভা বলে এক সভা প্রতিষ্ঠিত করলেন।

রাধাকান্ত দেব চেষ্টা করলেন লোকদের বোঝাতে তাঁর সভায় মর্মার্থ, যে শাস্ত্রের যুক্তির দামই সবার চাইতে বেশী আর শাস্ত্র যে কথা বলেছে সে কথা মেনে চলাই হোল স্বধর্মাচরণ, তাকে সংস্কার করার অধিকার আমাদের নেই। কিন্তু রামমোহন রায় সংস্কার কথাটা পুরোপুরি ভাবে বল্‌লেন না, বল্‌লেন ব্রহ্মবাদ নিয়ে, আর সমাজের পরিবর্ত্তন হিসেবে তিনি ভারতীয় সামাজিক জীবনের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সারা ভারত ও ভারতের বাইরে রামমোহনের মতবাদ ছড়িয়ে পড়ল। রামমোহন চাইলেন একেশ্বরবাদকে ভারতীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সেই সম্পর্কে তিনি অনেক বই প্রবন্ধ লিখ্‌তে আরম্ভ করলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় ইউনিটারিয়াম ছাপাখানা খুলে "খৃষ্টানদের জনগণের প্রতি আবেদন" নামক ইংরেজী প্রবন্ধ লিখলেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় একেশ্বরবাদীর এক সভা প্রতিষ্ঠা করলেন। এই একেশ্বরবাদীর সভায় অনেক ইংরেজ আইনজ্ঞের পরিচয় পাওয়া যায় আর সেই সভায় আমরা পেলাম দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর আর রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়কে। কিন্তু এই সভা বেশী দিন টিক্‌ল না। কেন যে টিক্‌লো না তার বিশেষ কারণটি আমরা ঠিক ধরতে পারিনা আজও। রামমোহন রায় একেবারে বৈদিক উপনিষৎকে কেন্দ্র করে, ২০শে আগষ্ট,১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ৪৮ নং চিৎপুর রোডে কোলকাতা জোড়াসাঁকো এলাকায় ব্রাহ্ম সমাজ নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভায় প্রথম কর্মসচিব ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী আর এই নব-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজ দুইজন তেলগু ব্রাহ্মণকে পেল "বেদ" মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্যে। কিন্তু ব্রাহ্মণ নয় এমন কোন লোককে ব্রাহ্ম সভায় যোগদান করতে দেওয়া হোত না। উৎসবে উপস্থিত লোকেরা শুন্‌তে পেতেন উপনিষদের মন্ত্র। তারপর তার বাংলা ব্যাখ্যা। অনেক গান গাওয়া হোত ব্রাহ্ম সমাজে, সে গানগুলোর ভেতরে প্রায় সব কয়টা গানই রাজা রামমোহন রায়ের রচিত। কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজ দেশের বুকে অল্প দিনের ভেতরেই সাড়া জাগিয়ে তুল্‌ল। এরপর সেই ব্রাহ্ম সমাজের টাকাতে রাজা রামমোহন রায় ৫৫নং আপার চিৎপুর রোডে সমাজের নিজস্ব বাড়ী প্রতিষ্ঠিত করলেন।

আমরা রামমোহন রায়কে যদি শুধু ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ধরি তাহলে ভুল করব। কারণ, ব্রাহ্ম সমাজটা কোন প্রতিক্রিয়াশীলতা থেকে জন্মায়নি, জন্মেছিল জাতীয় ধর্ম্মের প্রতিরক্ষক হিসেবে। রামমোহন দেশের আচার বা অনুষ্ঠানকে বড় করে দেখেন নি, তিনি দেখে ছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষীয় জাতের আদর্শকে, স্বধর্ম্মকে বড় করে দেখেছিলেন। খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতি উনিশ শতকের যে ভারতবাসী আকৃষ্ট হোয়েছিলেন তাদের প্রতিই একদিক থেকে রামমোহন রায় উপদেশ দিয়েছিলেন যে বিদেশীর শাসনে অনেক নতুন জিনিষ আছে কিন্তু জাতির পার্থিব সুখ আছে স্বদেশের আসনে, অতএব···

রামমোহন দেশভক্ত অধিবাসী। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে জাতির ভেতরে ভেদ সৃষ্টি হোয়েছে বলে আজ সেই ভেদেরই ভেতর দিয়ে যে কোন বিদেশী তার ধর্ম্মের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত

করতে পারে। তিনি তাই সর্ব্ব-ভারতীয়কে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। রামমোহন রায় সমগ্র ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কার চেয়েছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন অর্থাৎ বিদেশী বহিরাগতের কাছে নিজের জাতি সে ধর্মে দীক্ষিত হবে এ তিনি চান নি কোনদিনই, এবং সেই পথে তিনি সাধ্য মতন কাজ করে গিয়েছিলেন।

সমাজের সকলের পক্ষে কাজে লাগুক আর না লাগুক কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে সংস্কৃতির সংস্কারের দিকে তিনি যে জোর দিয়েছিলেন, যে ভাবে ভারতের সংস্কৃতির শাস্ত্রীয় উচ্চ আদর্শগুলোকে তিনি বিদেশী ধর্মযাজকদের সামনে তুলে ধরেছিলেন, সেগুলোর দাম ভারত সংস্কৃতিতে অভূতপূর্ব্ব।

গোটা দেশ জুড়ে ভারতবাসীর ভেতরে যে সামগ্রিক আন্দোলন চলে আস্‌ছে সেই প্রাচীন যুগ থেকে, তার মূর্ত্তি করাঘাত দিল রাজা রামমোহনের দরজায়, আর তারপর রামমোহন আবার জাতির সমস্যার সমাধানের পথ বার করতে মনোনিবেশ করলেন।

রামমোহন রায় মত আবিষ্কার করেন নি, বরং আদি ভারত থেকে আরম্ভ সেই জাতীয় সমস্যাগুলোই আবিষ্কার করেছে তাদের চালক হিসেবে উনিশ শতকের রাজা রামমোহন রায়কে।

উনিশ শতকে মানবিক আন্দোলনের নেতা হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি বিদেশীর প্রবর্ত্তিত ধর্মের হাত থেকে নিজের জাতিকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একটা কথা জানা দরকার যে বিদেশীর ধর্ম বলতে উনিশ শতকে প্রবল আকারে ছিল একমাত্র খৃষ্ট ধর্ম আর সে ধর্মে জোর করে ধর্মান্তরিত করবার কোন রকম চেষ্টা খৃষ্ট ধর্মের যাজকরা করতেন না। তবে দেশের গোঁড়ামি যখন শাস্ত্রের পোষাক পরে জনসাধারণকে ঘৃণা করতে লাগল, তখন সেই অপমানিত জনসাধারণকে ডাক দিল খৃষ্টবাদ। সেই কারণে জনসাধারণ আর অনন্য-সাধারণ প্রায় সকলেই খৃষ্ট-ধর্মে দীক্ষা নিতে আরম্ভ করল। কিন্তু তাই বলে এটা মনে রাখা দরকার যে বিপদে পড়ে দেশের জনসাধারণ উদ্‌ভ্রান্ত হোতে পারে কিন্তু সকলেই সেই উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে সবসময় নতুন ধর্ম বা বহিরাগত ধর্মকে গ্রহণ করতে চায়না, কারণ জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভেতরে দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা প্রচ্ছন্ন গোড়ামি আছে যার জন্যে বহিরাগতকে হঠাৎ গ্রহণ করায় ঠিক তাদের মন সায় দেয়না। তবুও কিছু লোক খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। সেই গ্রহণ করবার কারণ একাধিক। যেমন, যীশু খৃষ্টের করুণাময় দুঃখদহনশীল মূর্ত্তি দেখে দেশীয় ধর্মযাজকদের দ্বারা প্রপীড়িত কিছু লোক আকৃষ্ট হোয়েছিল। আর দ্বিতীয়ত, অনেক লোক মনে করল যে শাসকের ধর্মকে গ্রহণ করে যদি জগতের পার্থিব সুখের সমাধান হয়, সেই কারণে। আর তৃতীয়ত, খৃষ্টবাদে ভারতবাসী অনেক নতুন পথ দেখল, স্পর্শ করল নতুনকে। এমনি করে ভারতবর্ষে কিছু লোক খৃষ্ট ধর্মে নিল দীক্ষা। সবাই যে একই কারণে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল একথা ভাবা অন্যায় হবে।

কিন্তু জাতীয় ভারতীয় আন্দোলন তাই বলে খৃষ্ট ধর্মে রূপান্তরিত হোল না পুরোপুরি ভাবে কারণ সে ভারতের সেই যুগ-পরিবর্ত্তনের সময় রামমোহন রায়ই সঙ্কেত পেলেন যুগ-পরিবর্ত্তনের।

খৃষ্টধর্ম যদি সমস্ত ভারতীয়রা গ্রহণ করতো, তাহলে জাতির আশা পূর্ণ হোত কি হোত না

সে কথা আলোচনা* করা চলেনা, শুধু বলা চলে: এটা হোল আর এটা হোল না, আর না হওয়ার বা হওয়ার কারণগুলো বিশ্লেষণ করে দেখান চলে, সম্ভব হোলে।

রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করলেন, ভারতের বাইরের লোকেরা বুঝতে পারলো, উপলব্ধি করতে পারলো ভারতভূমির ওপর ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব। রামমোহনের প্রভাব বুঝতে পারা গেল সেই সময়কার ভারতীয় সমাজের ওপর, বুঝতে পারা গেল সে সময়কার ভারতীয় ধর্মের ওপর আর রাজনীতির ওপর। শিবাজীর সময় যেমন ধর্ম আন্দোলনের ভেতর দিয়ে রাজনীতি করেছিল আত্মপ্রকাশ, রামমোহনের সময় মনে হোল যেন সেই শিবাজীর আন্দোলনের নবীনতম সংস্করণ আত্মপ্রকাশিত হয়েছে।

আজ থেকে ১২৫ বছর আগে রামমোহন রায় রাজা উপাধি নিয়ে বিলেত যাত্রা করেন। দিল্লীর মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাঁকে 'দুতক' হিসেব ব্রিটানিয়া রাজদরবারে প্রেরণ করবেন বলে 'রাজা' উপাধি দিয়েছিলেন। সতীদাহের রোধের সুপারিশ-ও এ-ভ্রমণে তাঁর কণ্ঠে ছিল। উর-সভ্যতা-জাত এই নৃশংস প্রথা উচ্ছেদ-কল্পে ইংরেজ-পর্ত্তুগীজ মুঘল-পাঠান্ রাজ ঘোরতর কোনো শপথ নেননি, যেমন নিয়েছিল বাঙালী হিন্দু আর তাঁদের রাজা রামমোহন রায়।। সম্পাদক।।

মীড়

অমল দত্ত

এমনি করেই বলতে হবে। রঙিন আবেশে বলবার সুযোগ আর নেই। যে অবিস্মৃত মুহূর্ত নীহারিকাপুঞ্জের মত সম্ভাবনা নিয়ে আসে, তার গোপন গৌরবটুকু নন্দলাল আর মাধবী হারিয়ে ফেলেছে। এখন একটু কাজের ফাঁকে নন্দলালের যে খানিক অবসর তাই জরুরী কথায় আশ্বাস দিয়ে ভরতে হয়।

নন্দলাল মাধবীর কাঁধ ছুঁয়ে বললে, এবার তবে সময় হলো?

মাধবী সহানুভূতির ভঙ্গীতে হাসলে। থুতনীর নিচে একটু মেদস্ফীতি দেখা দিয়েছে, সেখানে ভাঁজ পড়লো।

নন্দলাল আবার শুধালে, কী হলো, হাসচো যে বড়? একটা কিছু হলো—তোমার বড় বাধা তো দূর হয়েছে—আর তো আপত্তি করবার কেউ নেই—

—তা নেই। বাবাও গেলেন মাও গেলেন। মাধবীর চোখের কোণে জল ভাসলো। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে আবার বললে, ভাবো তো, আমি কেমন হতভাগী, বাবাকেও সুখী করতে পারলাম না, তোমাকেও না।

নন্দলাল স্নেহভরে মাধবীর হাতখানা তুলে নিলে: তুমি তোমার যথেষ্ট কর্তব্য করেচো মাধু, বাবা তোমার সেবাযত্ন শ্রদ্ধা পেয়ে সুখী হয়েই গেছেন—এবার আমার দিকে তাকাও—

—তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বলো। মাধবীর চোখে আবার জল ভাসলো।

—তা কি আমি আর জানিনে। নন্দলালের কণ্ঠ আবেগে গাঢ় হলো।

মাধবী চোখমুছে গলা ঝেড়ে একটু উদাস ভাবে নন্দলালের পাঞ্জাবীর একটা বোতাম খুঁটতে খুঁটতে বললে, বাবা ত গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে মাও গেলেন। কিন্তু কতটা দায়িত্ব ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেছেন ভাবো তো। ভাই দুটোর একটা অন্তত কলেজ ছেড়ে চাকরী না করলে আমি একা মাষ্টারী করে পেরে উঠছিনে। তার পর বাসবী বি, এ দেবে—আগে অন্তত ওর বিয়েটা দিতে পারলে তো নিশ্চিন্দি।

নন্দলাল করুণ ভাবে তাকিয়ে বললে, তাহলে বাসবীর একটী বিয়ের সম্বন্ধ দেখতে হয়।

—তুমি ছাড়া আর কে দেখবে!

এর আগেও কথা আছে। মাধবী সেনগুপ্তা সবে কলেজ ছেড়ে একটা ইস্কুলের শিক্ষিকা হয়ে ঢুকেছে। বাবাকে সাহায্য করার জন্যে মেয়ের চাকরীর দরকার, ঠিক তখন পুরনো পরিচয়ের সূত্র ধরে উপযুক্ত গোত্রহীন নন্দলাল রায় আসা যাওয়া করে এটা মাধবীর বাবা চাইতেন না, মাধবী মনে মনে ক্ষুব্ধ হতো, কিন্তু ছোট-ভাই বোনদের কাছে অপদস্ত হতে রাজী ছিল না।

নন্দলাল তখন টুকটাক বেচাকেনার ব্যবসা করে। মাধবীকে সুখী করতে হবে, নিজে সুখী হবে—এমন একটা উজ্জ্বল মধুর জীবনের স্বপ্নে টাট্টু ঘোড়ার মতো ছুটছিল—মাঝে মাঝে তাদের দেখা হতো কোনো পার্কে, নয় ইস্কুলের ছুটির পর বাসের ষ্টপেজে। বাসবীও সে ইস্কুলের ছাত্রী ছিল, হয়তো চেঁচিয়ে উঠতে, দিদি নন্দ দা।

মাধবী খুসী হয়ে উঠতো, লজ্জাও পেত। নন্দলালের চোখে মুখে ক্লান্তির কোনো চিহ্নও থাকতো না।

—তুই যা বাসু, মাকে বলিস আমার একটু কাজ আছে—

—কী বলবো, নন্দদাদার সঙ্গে সিনেমায় গেছ। বাসবী হাসতে থাকে।

—বাসু, কী অসভ্যতা করিস! মাধবী বড় অপ্রতিভ হয়ে পড়ে।

নন্দলাল এগিয়ে আসে, এই যে বাসু, তোর জন্যে চকলেট এনেছি—

—নন্দদা, আমাকেও একদিন সিনেমায় নিয়ে যেতে হবে!

নন্দলাল জবাব দেবার আগেই, বাসবী সামনের বাসের হাতল ধরে ঝুলে পড়ে।

মাধবী হেসে বলে, দুষ্টু!

গড়ের মাঠের প্রদোষান্ধকারে নির্ভাবনায় মাধবীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়বার সুযোগ নন্দলাল পেল। এতটুকু তার লাভ, এতখানি তার পুঁজি। দাড়িমের রসভরা টুসটুসে ঠোঁট দুটো বিস্তৃত করে নন্দলালের দিকে ঝুঁকে মাধবী যখন হাসে—দূরের আকাশের তারারাও বুঝি তার সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করে! অন্ধকারে গুড়ি মেরে এক ফুলওয়ালাও নন্দলালের কাণে মধুর ধ্বনি তুলে পরম সুসমায় মন ভরিয়ে দেয়। মাধবী বাধা না দিলে বেলফুলের মালা বহন করার কষ্টও লোকটার সেদিন আর থাকতো না।

মাধু কার জন্যে রোজগার—দু মুঠো ভাতের ব্যবস্থা কি আর আমার নেই।

না, টাকা আমাদের অনেক কাজে লাগবে—শুধু কি আমরা ফুল ভালোবাসি, দ্যাখো না, মেয়েদের গায়ে কত গয়না।

নন্দলাল হেসে বলে, কই তোমার তো গয়না পরতে দেখিনে।

বিয়ে হয়ে গেলেই পরবো। গয়না পরলেই তো গিন্নী। মাধবী খিল খিল করে হাসে। মাধবী অনেকক্ষণ হাসে, হাসি পেলে ও আর থামতে চায় না। নন্দলালের কাণে ঘুঙুরের আওয়াজ লাগে—রক্তে যেন মাদকতার প্রবাহ চলে, বিশেষ করে যখন সে মাধবীর মুখখানা ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে।

মাধবী হাসি থামিয়ে বলে, শোনো, আমার ইচ্ছে আমাদের একটী ছোট্ট বাড়ি হবে। সামনে ছোট বাগান, বাগানের এক কোণায় তাল-নারকেল-খেজুরের পঞ্চবটি, দরজার সামনে একটি নিম গাছ—নিমের হাওয়ায় বাড়িতে রোগ ঢুকতে পারে না।

নন্দলাল বাধা দেয়, ওটা তোমার ইস্কুলের পাঠ্য বই দেখে বলচো।

পাঠ্য বই তো আমরাই লিখি। শোনো বাধা দিয়ো না। দোতালা বাড়ি হবে, নিচে তোমার বৈঠকখানা, উপরে আমার; আর একটা লাইব্রেরী থাকবে তার একদিকে তোমার পড়বার জায়গা আর আরেকদিকে আমার।

নন্দলাল আবার বাধা দিলে, তা হয় না। তোমার আর আমার একঘরে পড়াশোনা চলবে না। আমায় তখন গড়গড়ায় তামাক খেতে হবে। আর গড়গড়া দেখলে তো মেয়েদের সতীনের জ্বালা ওঠে।

তা হলে, পঞ্চবটির তলায় তোমার জন্যে একটি তামাকুখানা গড়তে হবে।

নন্দলাল হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো মাধবীর গ্রীবাদেশে মুখ লুকিয়ে বললে, ওঃ মাধু—মাধু, জীবনের চেয়েও কি বত্তি কায়স্থের ব্যবধানটা বড় হয়ে ওঠলো! তোমার বাবা তো ছেলেবেলায় আমায় খুব ভালোবাসতেন।

হেষ্টিংসের দিকে একটা আলোর কণা আকাশপথে ঝরে পড়ছিল, মাধবী ছলছল চোখে সেদিকেই তাকিয়ে রইলো।

ছেলেবেলায় নন্দলালের হুকুম যারা তামিল করেছে, মাধবী তাদের একজন নয়। ছেলে-মেয়েদের ছোটখাট উৎসবে মাধবীর আসা যাওয়া বিশেষ ছিল না—মাধবীর বাবা ওসব পছন্দ করতেন্ না। তবে পাড়ার ছেলে নন্দলালের গতিবিধি আটকাতে পারেন নি, প্রয়োজনে চাঁদাও দিতে হয়েছে। পড়ার বই ছেড়ে মাধবীর আর কাজ ছিল ছোট ভাই-বোনদের কোলে করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা। তখনি সুট করে নন্দলাল ঢুকে পড়ে মাধবীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলতো হয় কুল নয় শোনপাপড়ি ঘুষ দিয়ে। এমনি করেই গোপন অন্তরঙ্গতা জমে উঠেছিল।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করবে কী না নন্দলালের সন্দেহ ছিল। খেলাধুলোয় সময়টা কেটে গেছে—তবুও মাধবী জোর করে বেণী দুলিয়ে বললে, তুমি ক'টা মাস একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ো, নিশ্চয়ই পাশ করবে। সন্ধ্যার অন্ধকারে য়ুনিভার্সিটির দেয়ালে প্রথম বিভাগে পাশের খবরটা দেখে নন্দলালের চোখে মাধবীর চোখদুটো ভেসে উঠলো—মাধবী ছাদে পায়চারী করতে করতে ভীষ্মদেবের কণ্ঠে শোনা অজয় ভট্টাচার্য্যের গান 'তব লাগি ব্যথা উঠে গো কুসুমি' ধীরে ধীরে গুণ-গুণ করছিল, নন্দলাল এক লাফে ছাঁদে উঠে মাধবীকে পাঁজা কোলে তুলে বললে, মাধু, ফাষ্ট ডিভিশনে পাশ করেছি!

ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী মাধবী এখন ভব্যসভ্য ভাবে মায়ের অনুকরণ করছে। অনেক আগে কোল থেকে নেমে ছোট ভাই বোনদের কোলে করে মানুষ করবার দায়িত্ব মায়ের কাছ থেকে নিয়েছে।

এমন ভাবে কারোর কোলে উঠবার চিন্তাও আর করছে না। অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ছটফট করে বললে, ছাড়ো ছাড়ো বলছি—ছি-ছি কী করচো?

নন্দলাল মহাউৎসাহে মাধবীর কপালে চুলে চুমু খেয়ে বললে, মাধু, তোমার জন্যেই পাশ করেচি, তোমাকে আর ছেড়ে দেবো না। তুমি আমার ধ্রুবতারা!

মাধবী নিরুপায় হয়ে কয়েকবার নন্দলালের মুখে ঘাড়ে খিমচে দিলে, নন্দলাল কৌতুক বোধ করলে। অগত্যা মাধবীর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এলো।

তুমি কাঁদচো মাধু, সত্যি আমার অন্যায় হয়ে গেছে! নন্দলাল ব্যতিব্যস্ত হয়ে মাধবীকে নামিয়ে দিতে চাইল—কিন্তু পারল না। মাধবী সবলে নন্দলালের গলা জড়িয়ে ধরে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো।

কেন জানি নন্দলালের হৃদপিণ্ড ঠেলেও কান্না বেরিয়ে এলো। সেদিন থেকেই ওরা জেনেছে, ওদের আর ছাড়াছাড়ি হবার উপায় নেই।

ধীরে ধীরে মাধবীর যৌবন সূর্য্যমুখী ফুলের মতো সংহত হয়ে এসেছে নন্দলালের স্পর্শ করোজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত হবার জন্যে। মাধবীর মনে হয়েছে এ জীবনের সাধনা। যেদিন থেকে নন্দলালের আসাটা মাধবীর বাবা আর পছন্দ করলেন না, মাধবীর মনে হলো, জীবনের কঠিন পরীক্ষা। শুধু বাবাকে ও জানিয়ে দিলে, এ বাড়ীতে আর কেউ আসে, এ আমি চাইনে বাবা। কাউকেই তুমি ঢুকতে দিয়োনা।

বাসবীর জন্যে পাত্র খুঁজে বার করা খুব কঠিন হবে বলে নন্দলাল মনে করছে না। বাসবীর হাবভাবে চলাফেরায় একটু বিয়ের কনের শ্লথগতি আয়েস আছে, আর সাজগোজ করে থাকাই ওর পছন্দ। বাসবীর রং ফর্সা, ঢালু নাক, চোখ দুটো বড় বড় মুখখানি ভরা-ভরা—মনে হয় পানজর্দা বেঁধে আঁচলে চাবির ছড়া বেঁধে চলাটাই ওর পক্ষে সবচেয়ে মানানসই। সংসার ওকে ডেকে ডেকে হয়রাণি হয়ে যাচ্ছে।

পাত্রের খবরও নন্দলাল নিয়ে আসে। বলে, ভালো পাত্র দ্যাখো। ছেলে তো রাস্তায় যথেষ্ট ঘুর ঘুর করছে—কিন্তু ছেলের মত ছেলে ক'টা আছে।

শেষটায় নন্দলাল 'পাত্রচাই' বলে দৈনিক কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিল। উত্তর এল একতাড়া। সব ক'টা চিঠি মাধবীর সামনে ফেলে দিয়ে নন্দলাল বললে, এবার একটা পাত্তর বেরিয়ে আসবেই।

—ওরে বাসু, আমার চশমাটা দিয়ে যা!

—কেন তোমার কি চোখ খারাপ হয়েছে না কি! নন্দলাল উদ্বিগ্ন হয়ে শুধালে।

হ্যাঁ পড়বার সময় আজকাল লাগচে। ছাত্রীদের সব কাগের ঠ্যাং বগার ঠ্যাং হাতের লেখা চোখের কত সয়।

নন্দলাল লক্ষ্য করলে মাধবীর তন্বী শ্যামাঙ্গের সুডৌল বাঁধনটি যেন আলগা হয়ে গেছে। গ্রীবাভঙ্গির মসৃণতা ব্যাহত হয়েছে মেয়েদের উঁকি ঝুকিতে। তার চোখের কোলে একটু ক্লান্তি।

মাধবী মৃদু হেসে বললে, ও ভাবে তাকিয়ে আছো কেন, সামান্য তো চোখের ব্যামো, ওর জন্যে আর ভাবনা কী।

—না, তাকিয়েই ছিলুম, তাকিয়েই আছি। তবে আজ তোমার দিকে তাকিয়ে আমাকেই দেখছিলুম মাধু, দেহটা আজকাল সেবা চায়—আর আগের মতো ছুটতে পারিনে। ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

মাধবী বাসবীকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে নিলে।

নন্দলাল বাসবীকে বললে, আয়, তুইও আয় বাসু, দ্যাখ কাকে পড়ে বর পছন্দ হয়।

আগেও তো স্বয়ম্বর প্রথা ছিল, লজ্জা কি।

বাসবী বললে, তোমার মত আনাড়ির সঙ্গে ও সব সীরিয়াস কথা বলতে চাই নে নন্দদা। বলেই সে পালালো।

মাধবীর মুখে যেন কে অকারণে রঙ ছিটিয়ে দিয়েছে। নন্দলাল অপ্রতিভ হয়ে শুধু হাসলে, কিন্তু মাধবী উদাস হয়ে গেল।

সেদিনের আলোচনা ওখানে স্থগিত রেখে নন্দলাল মাধবীকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে এল। অমনি করে ওরা দু'জন বেড়ায় প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায়। সবাই তা জানে, পাড়ার চোখে ওটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

আগে কারোর কারোর চোখ টাটিয়েছে, ফিসফিসানি গুঞ্জন যে না হয়েছে তা নয়—বিশেষ করে মাধবীর বাবা মরবার পর নন্দলালের সহজ আগমনে একটা বেহায়াপনার আভাস অনেকে পেয়েছিল। এমন ধিক্কারে অনেক আগে নন্দলালরা পাড়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। এখন ব্যাপারটা নিতান্ত সহানুভূতির, কারণ কেচ্ছা গাইবার মত নাটকীয় ঘটনা কিছু ঘটেনি। তবে অতি প্রৌঢ়া মহিলারা যারা নন্দলালকে ছেলেবেলা থেকে জানতেন, তাঁদের মধ্যে একটা আফ়শোষ আছে—ছেলেটা মেয়ের পাল্লায় পড়ে বিবাগী হলো। সামান্য একটা বিয়ে করতে পারলে না।

ও ধরনের একটা চিন্তা বুঝি মাধবীর মনে পাক খাচ্ছিল। বেড়াতে বেড়াতে পার্কের এক কোণায় এসে বললে, দ্যাখ, বাসবীর বিয়েটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দিতে হবে। বিয়ের যে মজা আছে—ওটা এ বয়েসেই চেখে নেবার।

কিন্তু বাসবীর বিয়ের কথাটা আচমকা ধামাচাপা পড়ে গেল। পাড়ার লোকদের সচকিত করে একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়ে ফেললে মাধবীর এম.এ পরীক্ষার্থী ভাইটি।

যে ভাইটি আই-এ পড়ে সে দৌড়ে গেল নন্দলালের বাসায়, একরকম টেনেই নিয়ে এল। মাধবী স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, বাসবী দিদির মাথায় হাত বুলাচ্ছে—নন্দলাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এসে থমকে দাঁড়াল।

—কী হয়েছে মাধু?

মাধবী চট করে জবাব দিতে পারলে না।

—বাসু, কী হয়েছে বল!

বাসবী একবার দিদির দিকে তাকিয়ে গলা ঝেড়ে বললে, দাদা দিদির ইস্কুলের এক মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে। মেয়েটা দিদির খুব প্রিয় ছাত্রী—মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি আসতো। তুমিও দেখে থাকবে। মেয়েটা এবার পরীক্ষা দিয়েছে—

—বেশ তো ভালোই হলো। নন্দলালের বুঝি আগের স্মৃতি চোখে ভেসে উঠেছে।

মাধবী বিরক্তিভরে বললে, বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে! হেনারা কড়া বামুন পরিবার, আমার উপর বিশ্বাস করেই তো মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছিল—আমার দায়িত্ব আছে না!

নন্দলাল চুপ করে থেকে কথাটা হৃদয়ঙ্গম করতে চাইল।

মাধবী আবার বললে, আমি একজন শিক্ষিকা, ছাত্রীদের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে আমাদের ভাবতে

হয়। আমার বাড়িতে আসবার নাম করে হেনা পালিয়ে গেল, আর তাও গেল কী না আমার ভাই ঝণ্টুর সঙ্গে! আমার কি আর মুখ দেখাবার উপায় আছে!

নন্দলাল বিনয় করে বললে, তা তোমার দোষ কোথায়—ওরা দু'জন পরস্পরকে নিশ্চয়ই ভালোবাসে—

—ভালোবাসলে কি পালাতে পারে?

—তা পারে, মাধু। সবার ভালোবাসা তো সমান নয়—মানে, একরকম নয়। কাগজে পড়েছি, ও রকম পালিয়ে থাকে। আর ও-দেশে তো হামেশাই পলায়। তাছাড়া এখন আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি—ছেলেমেয়েরা আর আগের মত ভাবছে না।—

মাধবীর চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়াতে লাগলো, পরিবারের মর্যাদার জন্যে এত দুর্ভোগ সইলুম, আজ ঝণ্টু সব উপড়ে ফেলে দিলে!

নন্দলাল মাধবীর একখানা হাত টেনে নিয়ে বললে, মাধু, সবাই কি সইতে জানে? যে সয় সে-ই তো সয়!

একদিন হেনা আর ঝণ্টু এসে 'দিদি' বলে মাধবীর পায়ে উপুড় হয়ে পড়লো। বাসবী শাঁখে ফুঁ দিলে। মাধবী সন্দিগ্ধভাবে হেনার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললে, একি তোর শরীর এত খারাপ হয়ে পড়েচে কেন, হেনা?

হেনা লজ্জায় অধোবদন রইল।

মাধবী হেসে বললে, আয় দুষ্টু মেয়ে, আমার বুকে আয়! আমায় তোরা আরো জ্বালাবি এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

বাসবী হাসির সোরগোল তুলে বললে, দিদি, তা হলে উৎসবের আয়োজন করি?

মাধবী ছাত্রীদের পরীক্ষার খাতা দেখছিল। চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে বললে, ও আসুক আমি একা এই নিয়ে ভাবতে পাচ্ছিনা।

নন্দলাল এল। পরামর্শ হলো। উৎসব। তারপর আরো উৎসব। বহুদিন পরে বাড়িটা শিশুর কান্নায় মুখরিত হলো।

মাধবী আর শিশু ছাড়া থাকতে পারে না। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে শিশুটিকে চোখের আড়াল করে না।

বাসবী হয়তো টেনে নিতে চায়, আমার কাছে দাও, দিদি, তোমার কষ্ট হচ্ছে।

—আমাকে এ কষ্টটুকু পেতে দে, বাসু।

—তুমি বুঝি একা কষ্ট করবে? দিদি কী স্বার্থপর!

মাধবী হেসে বলে, দিদি খুব স্বার্থপর নারে, বাসু?

বাসবী চোখ ঢেকে পালায়।

নন্দলাল একটা প্যারামবুলেটার কিনে এনেছে। শিশুটিও ওদের সঙ্গে বেড়াতে যায়। ঐ

সময়টুকুই মাধবীর বিশ্রাম। মাধবীর পদোন্নতি হয়েছে, কাজ বেড়েছে। সংসারের ঝামেলাও আবার নতুন করে জট পাকিয়েছে।

বাসবী বি-এ পাশ করে বসে আছে, এম-এ ইচ্ছে করেই পড়ল না। বলে, দিদি, তুমি একা কেন যুঝবে, আমিও একটা চাকরি করি!

মাধবী রাজী নয়,—না, তুই চাকরী করে পোড়াকাঠ হলে চলবে না। সংসারের কর্ত্রী হবি, সে পাঠটাই একবার নে না।

—মেয়েদের কি আর সে পাঠ নিতে হয়! বাসবী হাসে।

—হ্যাঁ নিতে হয়। মেয়েদের মন ঠুনকো পেয়ালার মত। ভাঙলে জোড়া লাগালেও দাগ থাকে।

নন্দলাল একদিন বেড়াতে বেড়াতে বলল, তা হলে বাসবীর একটা বিয়ের সম্বন্ধ দেখি। পুরানো আলাপগুলো বাসি হয়ে গেছে।

মাধবী আগ্রহভরে বললে, হ্যাঁ তাই কর। বাসবীর বিয়ে দিতে পারলে আমার আর বিশেষ দায়িত্ব থাকে না।

নন্দলাল ভারী গলায় গুমরে উঠলো, মাধু, দায়িত্ব নিলেই দায়িত্ব বাড়ে। একবার নিজের দিকে তাকাও।

—এবার তাকাতেই হবে। কেমন যেন মনটা উড়ু উড়ু হয়ে গেছে। আর ঝামেলা ভালো লাগচে না। হাঁগা, আমার কি অশান্তি বলতে পারো?

—আর ফাঁকি দিয়ো না, মাধু। চলো আমরা অনেক দূরে চলে যাই। একটা ছোট বাড়ি করবার মত টাকা আমার জমে গেছে।

পার্কের একটা বেঞ্চে ওরা পাশাপাশি বসেছিল। মাধবী দু'হাত দিয়ে নন্দলালের বাঁ কাঁধে ভর দিয়ে মাথাটা এলিয়ে দিয়েছিল। চোখ বুঁজে চুপ করে আছে দেখে নন্দলাল অনেকক্ষণ উত্তর পাবার আশায় অপেক্ষা করলে। তারপর মুখখানা কাছে টেনে দেখলে, মাধবী ক্লান্তভাবে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। নন্দলাল তাকে নিজের কোলে শুইয়ে দিয়ে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে জোরে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করলে।

বাসবীর বিয়েটা প্রায় ঠিক করে এনেছে নন্দলাল। এর পরে আর কোনো দায়িত্বের কথা মাধবী বলবে না, এমন কড়ার নন্দলাল আদায় করে নিয়েছে। অনেক আলাপও জড়ো হয়েছে, এবার একটা পছন্দ করে নিলেই হয়।

মাধবী বললে, বুঝতে পার্চ্ছো প্রধান শিক্ষিকা হয়েচি, ইস্কুল ছাড়াও সেক্রেটারীর সঙ্গে সলা-পরামর্শ আছে, কমিটির মীটিং আছে, ভিজিটরদের ঠেলাঠেলি আছে—আমার সময় হয়ে উঠবে না। তোমার যাদের সঙ্গে আলাপ করবার, খোঁজ খবর করবার, করে নাও—আমার জন্যে অপেক্ষা করো না।

নন্দলাল একাই আলাপগুলোকে নাড়াচাড়া করে একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলো। এবার মাধবীকে আর না বললে চলে না, বাসবীরও কী পছন্দ-অপছন্দ তার কিছুটা আভাসও পাওয়া দরকার ছিল।

সন্ধ্যায়ও মাধবীর দেখা মিললনা—ইস্কুলে না কি কে মহাভারতের ধর্ম্ম নিয়ে বক্তৃতা দেবেন। অগত্যা নন্দলাল বাসবীকেই ডেকে বললে, তা বাসু, তোর কী পছন্দ আমায় একবার মুখ ফুটে বলবি?

—তোমাকে ছাড়া আমার সবই পছন্দ। দয়া করে তোমার মত লোক ডেকে এনে আমার অবস্থা করুণ করো না। বলে বাসবী হাসতে থাকে।

—আমার মত লোক তুই সামনের আয়নাটা ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাবিনে। নন্দলালও হাসে।

—না, তা পাওয়া যেতে পারে।

—কোথায় বল তো?

—দিদির বুক চিরে দেখলেও ঐ আয়নার লোকটার সন্ধান মিলবে।

—বাসু, বড্ড ফাজিল হয়েচিস!

কিন্তু বাসবী ততক্ষণে চলে গেছে। নন্দলালও বেশীক্ষণ অপেক্ষা করলে না। ইদানীং পেটে একটু অম্বল হচ্ছে বলে তাড়াতাড়িই খেয়ে শুয়ে পড়তে চায়।

ক্রমাগত তিনদিন মাধবীর দেখা না পেয়ে নন্দলালের অভিমানে মুখ ভারী হয়ে গেল। এমন ঘটনা আর ঘটেনি। তারপরে মাধবী যখন এল, তখন আর বেড়াবার সময় নেই, রাত হয়ে গেছে। শিশুটি বুঝি মাধবীর কণ্ঠস্বর চিনতে পারে, মাধবী কোলে না নেওয়া পর্য্যন্ত কেঁদে অস্থির হয়ে গেল নন্দলাল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

মাধবী ত্রস্তে নিজের ঘরে এসে একবার নন্দলালের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর দ্রুত পদক্ষেপে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। মাধবীকে এতটা সতেজ নন্দলাল অনেকদিন দেখেনি। দূরে মাধবীর কথাবার্ত্তা শোনা গেল:

—হেনা, ওরে হেনা, বলি খোকনকে ঠিক মত খাইয়েছিলি তো?

—হ্যাঁ দিদি!

—ওকে পেপের হালুয়া দিয়েছিলি?

—হ্যাঁ, পেপের হালুয়া আর চা দিয়েচি।

—চা আবার দিতে গেলি, কেন! ওর শরীরটা যে ভালো যাচ্ছে না। একটু কাঁচা আমের শরবৎ করে দিলেই হতো!

মাধবী আবার ত্রস্তে নন্দলালেরর কাছে এল। শরীরটা আজ কেমন লাগচে বলো তো! এক'টা দিন সকাল সকাল বাড়ি চলে গেলে, আমি আর এসে দেখতে পেতুম না। সকালের দিকে যে তোমার কাছে যাব তারও জো নেই ঝণ্টুর ছেলেটা হয়েছে আমার এক নম্বরের শত্তুর!

মাধবী খোকনের গাল টিপে আদর করলে।

নন্দলাল এবার মাধবীর দিকে তাকাল। মুখে তখনও অভিমানের গুমোট লেগে আছে। মাধবী হেসে খোকনকে বললে, খোকনমণি, ওঁর গালে একটা চুমু খেয়ে দাও তো। তারপর খোকনকে নন্দলালের মুখের উপর ফেলে দিলে।

নন্দলাল খোকনকে দু'হাতে ধরে বললে, তিনদিন ধরে বেচারা বেড়াতে যায় না, জানো?

—এই তিন দিন আমি তোমাদের কল্যাণ কামনা করেচি—ঠাকুরের কাছে!

নন্দলাল চোখ বিস্ফারিত করে বললে, ঠাকুর!

মাধবী মৃদু হেসে জবাব দিলে, হ্যাঁ গো, ঠাকুর। এই তিন দিন চিত্তশুদ্ধি করে সন্ধেটা আমার কেটেচে। মাঝে মাঝে ভেবে বিমনা হয়ে পড়েচি, তুমি নিশ্চয়ই বসে ছটফট করচো আর বাড়িতে এসেও শুনেচি তা-ই।

বাসবী এসে বললে, দিদি, কিছু খাবে চলো। জানো, নন্দদা, দিদির এই তিনদিন ধরে উপোষ চলেচে—এবারে দিদি সংসারধম্মো ত্যাগ করবে।

নন্দলাল ব্যথিত হয়ে বললে, উপোষ, কেন? মাধু, আমার অগোচরে কী যে সব কাণ্ড করচো, কী দরকার আছে এসবের।

—তোমার অগোচরে কিছুই করচি না গো, সবই তুমি জানবে। ভুল হয়ে গেছে অনেক, তা-ই একটু শুধরে নিচ্ছি।—মাধবী হাসবার চেষ্টা করলে।

—মাধু, ভুল দিয়েই সংসার। শুধরে নিতে গেলে আরো ভুলই বাড়বে।

—না, আমার মন বলচে, না। ঠাকুরের দয়া হবেই। শোনো, কাল দুপুরে তুমি না খেয়ে এখানে চলে আসবে। লক্ষ্মীটি, না এলে কিন্তু রাগ করবো।

পরদিন দুপুরে নন্দলাল এসে দেখে, বাড়িতে উৎসবের আয়োজন চলেছে। ইস্কুলের শিক্ষিকারাও এসেছেন,—বাড়ির ছেলেমেয়েরা ব্যস্ত। বাসবী নন্দলালকে এসে জানালে, দিদির ঘর বন্ধ আছে, ওখানে দিদিকে দীক্ষা দেওয়া হচ্ছে। নন্দলাল বাসবীর ঘরে বসে তৃষিত নয়নে ঐ বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রইল।

দীক্ষা শেষে মাধবী বেরিয়ে এল বিজয়িনীর মত। বা হাতে একটা থালিতে ফুল-চন্দন আর শান্তিজলের পাত্র। চারদিকে ছিটিয়ে দিলে জল, আশেপাশে সকলের গায়ে, তার গরদের শাড়িতে রোদ্দুর লেগে ঝলমল করে উঠলো চলার গতি। ঘরের ভেতর থেকে ধূপ-অগুরুর গন্ধে বাতাস মন্থর হয়ে উঠছিল। অভ্যাগতরা মাধবীর কাছে গিয়ে সম্বর্ধনা জানাল।

নন্দলালকেই বুঝি মাধবী ব্যাকুল হয়ে খুঁজছিল। বাসবীর ঘরে নন্দলাল আছে শুনে আর কারোর দিকে দৃক্‌পাত না করে সটান চলে এল। এঁকে দিল চন্দনের টিপ, ফুল দিল হাতে, তারপর শান্তিবারি মাথায় ছিটিয়ে বিনা দ্বিধায় নন্দলালকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মনে মনে আওড়াল—শান্তি শান্তি শান্তি।

নন্দলালের মনে পড়লো, তার মা বুকের কাছে এমনি করে টেনে নিয়ে তাকে আশীর্বাদ করতো—স্নিগ্ধ স্পর্শে শীতল হয়ে যেত তার সর্বাঙ্গ। বহুযুগ পরে উদ্‌গত কান্নার এক ধারা নন্দলালের হৃদপিণ্ড ঠেলে কণ্ঠে এসে ব্যথার মোচড় দিলে। মাধবী তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললে, বলো তুমি খুসী হয়েচ!

—হয়েচি।

মাধবী নন্দলালকে ছেড়ে দিলে। বললে, আজ তোমাকে কষ্ট দেবো। অতিথিদের বিদায় করে আমরা দু'জন এক সঙ্গে খাব। তোমায় কিন্তু ওদের পরিবেশন করতে হবে।

মাধবী হেসে পেছন ফিরে, সহজভাবে অপেক্ষমান লোকজনের সঙ্গে আলাপ শুরু করলে। নন্দলালের মনে হলো, এ মাধবী তার সে মাধবী নয়। একটা অচেনা সুর, সুরধুনীর পরিচিত কল্লোল ছাপিয়ে উঠছে।

নন্দলালের মনে হলো, তার বহুদিনের প্রতীক্ষা ব্যর্থ হতে চলেছে। মাধবীর মন আর সে ফিরে পাবে না। মাধবী অন্যপথের নিশানী, যে পথে চলবার সামান্যতম ইচ্ছাও নন্দলালের নেই। এমনি করেই মাধবী বুঝি তাকে পরিত্যাগ করলে, ফাঁকি দিলে। দুরন্ত অভিমানে নন্দলালের মন ভারাক্রান্ত হলো। হতাশায় তার শরীরে অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেল।

দু'দিন নন্দলাল এল না দেখে সবাই একটু চিন্তিত হলো। কিন্তু মাধবীর চেহারার দিকে তাকিয়ে কেউ কিছু বলতে সাহস পেল না।

পরদিন ছোটভাই মণ্টু এসে খবর দিল, ডাক্তার বলেচে নন্দদার হৃদরোগ হয়েচে, জ্বরও আছে।

বাসবী কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, কী করবে দিদি?

মাধবী দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলে, আমি বেঁচে থাকতে ওঁর কোনো অকল্যাণ হবে না, ভাবিস নি। একটা বিছানা ঠিক করে রাখ, ওঁকে নিয়ে আসচি।

মাধবীকে দেখে নন্দলাল কী যেন বলতে চাইল। মাধবী তাকে জড়িয়ে ধরে নীরব করে দিল।

—তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—কোথায়?

—আমার ওখানে। আর দূরে থাকতে দেবো না।

—এতদিন পরে সময় হলো, মাধু!

—সময় তো প্রথম দিন থেকে হয়েছে—তবে আজ কেন অবিশ্বাস করচো। তুমিই আমার ভার নিয়েছিলে, তুমিই আমার পবিত্রতা দিয়েচো। নইলে আমি কি এত তদ্গত চিত্তে ঠাকুরকে ডাকতে পারতুম। তুমিই তো আমায় সুন্দরভাবে সাজিয়েচো।

নন্দলালের কাছে সব যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল। তবু একটা কথা মাধবীকে বলবে বলে ভেবে রেখেছিল, তাই বললে,—মাধু, সেদিন খবরের কাগজে পড়ছিলুম যে, বিলেতের একজন মস্ত বড় রাজনীতিবিদ পণ্ডিতলোক আমাদের চেয়ে ঢের ঢের বেশী বয়েসে বিয়ে করেচে।

একথা শুনে মাধবী খিল খিল করে হেসে উঠলো। ছেলেবেলায় যেমন করে হাসতো। হাসি আর তার থামতে চায় না।

—মাধু, জল খাবে।

—না, চরণামৃত খেয়ে এসেচি। মাধবী নন্দলালের বুকে মাথা রেখে আরো একটু হেসে নিলে।

তার হাসির আওয়াজে নন্দলালের মুখেও হাসি ফুটে উঠলো। কিন্তু হৃদপিণ্ডের দুর্বলতায় সহজ হতে পাচ্ছিল না।

মাধবী বললে, শোনো বয়েসটাই বড় কথা নয়। একেকজনের মন বয়েসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। সংসারের খেলা আমার মন থেকে মুছে গেছে! তোমাকে চেয়েচি তোমাকেই পেয়েচি, আর দরকার নেই। কিন্তু আমার একটা আদেশ তোমায় মানতে হবে—কথার অবাধ্য হতে পারবে না।

—বলো, কী বলতে চাও!

—বাসবীর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব, এই আমার ইচ্ছে।

নন্দলালের মনে হলো সে স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু কপালের উপর মুখ রেখে যে মেয়েটি এ কথা বলছে ও তো স্বপ্ন নয়। ও যে মৃত্যুর মত সত্য।

"যৌবন কেবল মিথ্যা মৃত্যুর বয়েস শুধু সত্য হয়ে চলে
সে-মেয়ে ফলের মতো গড়ায় বাতাসে ভূমিতলে।"

॥ এড্‌মুণ্ড স্পেন্সর ॥

বৈকালিক

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আবিষ্ট মনের কোণে যদি রম্য স্বপ্নের আবেশ
বাসা বাঁধে একবার ; পরাশ্রয়ী লতাতন্তু জাল
জড়ায়ে জড়ায়ে ক্ষীণ কবন্ধের ক্ষয়িষ্ণু কঙ্কাল
মৃত্তিকা সমাধি লভে ;—সে বিচ্ছেদে যন্ত্রণা অশেষ।

অশেষ যন্ত্রণা ভোগ, তবু দেহ নিস্পন্দ নির্বাক,
দু'চোখে তবুও স্বপ্ন জাল বোনে শিশিরে জ্যোৎস্নায়,
ছাতিম গাছের ডালে নিশাচর পাখী ডেকে যায়,
বিচারে অদ্বৈতবাদ, নৈমিত্তিক আচারে চার্বাক।

স্বপ্ন যদি ভেঙে যেত, দূরে যেত আশার ছলনা,
মদালস বিহ্বলতা উপবাসী আত্মার আধারে,
পরিহাস রমণীয় যদি না আসিত বারে বারে—
দিগন্তে বিলীন হোত বল্গাহীন প্রমত্ত কল্পনা।

তবুও কিছুটা মূল্য পেত এই স্বল্পায়ু জীবন
কিছু ছিল সার্থকতা উদয়াস্ত প্রাণান্ত শ্রমের,
আপাতত কণ্ঠরোধ কষ্টার্জিত আত্মসম্ভ্রমের
পক্ক কেশ বৈরাগ্যের ধ্যানমগ্ন স্তিমিত যৌবন।

ছায়া-পথ

শ্রীনীলোৎপল চক্রবর্ত্তী

দুই বান্ধবীতে প্রাণখুলে হাসিঠাট্টা হ'চ্ছিল।.......

অমিয় হঠাৎ যেন কার খোঁজ করতে এসে একেবারে অপ্রস্তুত হ'য়ে জিজ্ঞেস ক'রে ব'সল' কালিবাবু কোথায় ?

অণিমা মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল—বাবা ? ঐতো ঐ বারান্দায়। ধীরে চ'লে যায় অমিয়।

অরুণা সন্ধানী দৃষ্টি মেলে তাকা'ল অণিমার দিকে। জিজ্ঞেস করে—লোকটিকে নোতুন ব'লে মনে হোল ?

—হ্যাঁ, নোতুনই। অণিমা মৃদু হেসে উত্তর দেয়।

—পরিচয় আছে নাকি ?

—তা আছে বৈকি ?

—কোথায় থাকেন ভদ্রলোক ?

—আমাদের নীচের তলায়ই একটা ঘর ভাড়া নিয়েছেন।

—একাই থাকেন ?

—হ্যাঁ—

—কি করেন ?

—অতশত জানিনা বাপু। তোর অত খোঁজে দরকার কি বলতো ?

অপ্রস্তুত হ'য়ে অরুণা উত্তর দেয়—না এমনই। জিজ্ঞেস করছিলাম, তোর সাথে আলাপ হ'ল কি ক'রে।

—যেমন করেই হোকনা। তোর সাথে আলাপ করিয়ে দেব' ?

—না, আর অত উপকার করতে হবেনা। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে, অরুণা বলে—

—আচ্ছা আজ আমি চলিরে।

—আচ্ছা, আসিস কিন্তু আবার ! অণিমা হেসে হেসে বলে।

অরুণাও হেসেই উত্তর দেয়—আসবোইতো। আমার যেন কেমন—সন্দেহ লাগছে। ব্যাপারটা শেষ অবধি না দেখলে শান্তি পাবনা। অণিমা হাসতে থাকে।

*　　*　　*　　*

কালিবাবু তখন ছিপ্ সুতো নিয়ে ভারি ব্যস্ত। অমিয় এসে দাঁড়াল পাশে। তাকে দেখে কালিবাবু হেসে বল্লেন—

—এই যে এসেছেন আপনি ! কটা বাজে দেখুনতো ? হাতঘড়িটা দেখে অমিয় বলে—সাড়ে দশটা। শুনুন, রেডি হ'য়ে নিন। ভোলাসেনের পুকুরে আজ মাছ ধরতে যাব।

—ভোলাসেনের পুকুরে? অবাক হ'য়ে যান কালিবাবু। মাছতো ও কাউকেই ধরতে দেয়না?

—আমাকে দেবে। আপনি তৈরী থাকবেন।

*　　*　　*

সেদিন সন্ধ্যেবেলা এক বিরাট চেতল মাছ শিকার ক'রে ফিরলো ওরা। দেখে অণিমার আনন্দ আর ধরেনা। জিজ্ঞেস করে—কে ধরল' এটা?

কালিবাবু অমিয়কে দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন—ক্ষমতা আছে বটে। অতবড় মাছটা টেনে তুললে কি ক'রে হে? আমিতো ভাবলাম গেল বুঝি।

অমিয় হাসতে থাকে। অণিমা বলে—কিন্তু মাছটা কাটবে কে? আমি পারবোনা।

—জল থেকে যখন টেনে তুলতে পেরেছি, কাটতেও আমি পারবো। আপনি একটু চা করুন তো।

অমিয় জামা খুলে মাছ কাটতে ব'সে যায়।

কালিবাবু প্রৌঢ় মানুষ। তিনি চ'লে যান বিশ্রাম করতে।

প্রথম আলাপ মাছ কাটতে কাটতে।……

—আপনি তো খুব কর্ম্মী মানুষ? অণিমা হেসে হেসে বলে। অমিয় কোন কথা বলেনা। শুধু একটু মুখ টিপে হাসে।

—আজ কিন্তু এখানেই খাবেন আপনি!

হেসে অমিয় বলে—বাঃ রে তবে আবার খাব কোথায়! এতবড় একটা মাছ ধরলাম, আর এখানে খাবনা?

অণিমা লজ্জিতা হ'য়ে পড়ে, বলে—চাকরটাকে রাঁধতে বারণ ক'রে দিন তবে!

—ও আর বলতে হবেনা।… …

……খাওয়াদাওয়ার পর, পান চিবুতে চিবুতে, অমিয় শতকণ্ঠে অণিমার হাতের রান্নার প্রশংসা করতে লাগল। ব'লল—এমন রান্না বহুদিন খাইনা।

অণিমাও হেসে হেসে বলে—এমন মাছও অনেকদিন রাঁধিনি। বাবাতো প্রায়ই খালি হাতে ফেরেন।

অমিয় হাসতে থাকে।

সেদিন আর রাত দুটো অবধি অমিয়'র চোখে ঘুম এলোনা। কি এক চিন্তায় মনটা সারাক্ষণ আচ্ছন্ন হ'য়ে রইল।

কালিবাবু বিপত্নীক। সংসারে সম্বল এক মেয়ে আর এক ছেলে। ছেলে অনিল, ক'লকাতায় চাকরি করে। আর মেয়ে অণিমা বাবার কাছে থেকে, এখানকার কলেজে পড়ে। বাড়ীটার মালিক কালিবাবুই। মাসের আয় তাঁর মন্দ নয়।

কিন্তু আশ্চর্য্য ঐ মেয়েটি। সহজ, সুন্দর, সরল। পোষাকের পারিপাট্য নেই। গহনার বোঝা

নেই। লাল-রঙের বাটার স্লীপার পায় দিয়ে, সাদা জমির ওপর কালোপেড়ে সাড়ীটা প'রে ও যখন কলেজে চ'লে যায়, অমিয় তখন শুধু ভাবতে থাকে।

: ও মেয়ে। পয়সার অভাব নেই। তবে এত উদাসীন কেন? ওর কি সখ-স্ফূর্ত্তি নেই! ওর কি ইচ্ছে করেনা দুটো গহনা গায়ে দিতে, ওর কি ইচ্ছে করেনা একটা ভাল সাড়ী প'রতে? কিন্তু অমিয় এটা লক্ষ্য করেছে, ওর ঐ সাদা পোষাকের মধ্যে এমন একটা গাম্ভীর্য্য এবং সংযম লুকিয়ে আছে, যা থেকে মনে হয়, ও আর দশজন মেয়ের মত নয়। সম্পূর্ণ পৃথক। ও যেন নারীধর্ম্মের চিরন্তন কামনাটাকে বিদ্রূপ ক'রে চলেছে। প্রতিবাদ ক'রছে ওদের বিলাসিতার উদগ্র নেশাকে।

কিন্তু মুখে কোনদিন সে কথা উচ্চারণ করেনি, ক'রবেওনা। অমিয় জানে, অণিমা বেশী কথা বলেনা। যেটুকু বলে, তা সহজ, স্পষ্ট, অথবা দুরন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ। ওর দৃষ্টি গভীর। অন্তর গভীর। গভীর ওর প্রতিটি পদক্ষেপ। ও যেন হাল্কা হ'তে পারেনা। চায়ও না। অমিয় কিছুতেই অণিমার কাছে সহজ, স্পষ্ট হ'তে পারেনা। যতবার চেষ্টা করেছে, ততবারই জটিলতার সৃষ্টি হ'য়েছে প্রবলভাবে। কথার ঢেউ থেমে যায়—মূক হ'য়ে ব'সে থাকতে বাধ্য হয় অমিয়।

অণিমা রোজ ভোরবেলা বেহালা বাজাত। পাকা হাত। কিন্তু বড্ড করুণ। অমিয়র ইচ্ছে করে জিজ্ঞেস ক'রতে, তেমন বাজনা কি অণিমা বাজাতে পারেনা, যে বাজনা শুনলে, অন্তরের অন্তঃস্থলে লাগে দোলা, দেহে মনে আসে ফাল্গুনের ঢেউ! কিন্তু পারেনা। অণিমার সামনে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'তে ও পারেই না।

সেদিন রাত তখন দশটা। আশ্বিনের পূর্ণিমা রাত। সামনের নারকোল গাছটার ওপর শির-শিরে বাতাস চাঁদের হাসি গায়ে মেখে লুটোপুটি খাচ্ছে।

অণিমা ওপরের বারান্দায় ব'সে তন্ময় হ'য়ে বেহালা বাজাচ্ছিল। অমিয় চুপিচুপি এসে ওর পেছনে ব'সে রইল। কালিবাবু বোধহয় ঘরে ঘুমুচ্ছিলেন। দীর্ঘ একঘণ্টা পর অণিমা বাজনা বন্ধ ক'রল। বেহালাটা কোলের ওপর নিয়ে, আকাশের চাঁদের দিকে উদাসভাবে চেয়ে রইল। এ পৃথিবীর বাইরে যেন চ'লে গেছে ও। অমিয় চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ ওর দিকে। ভাঙতে ইচ্ছে করেনা এই তন্ময়তাকে। যেন চাঁদের সমুদ্রে অণিমা কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে কি সুর? না অন্য কিছু?

হঠাৎ অমিয় জিজ্ঞেস করে—কি রাগ বাজালেন এটা?

চমকে ওঠে অণিমা। জিজ্ঞেস করে—আপনি কখন এলেন! এভাবে চোরের মত আসা কিন্তু উচিত হয়নি!

অমিয় হাসতে থাকে, বলে—চোরের মত না এলে, এমন বাজনাও শোনা হ'তনা, আর এমন তন্ময়তাও চোখে পড়তোনা।

অণিমা মাথা নিচু ক'রে চুপ করে বসে থাকে। অমিয় সুযোগ হারায়না, জিজ্ঞেস করে—

—আচ্ছা আপনার বাজনা এত ব্যথাভরা কেন?

অণিমা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে—রাত অনেক হ'ল, শুতে যান এবার।

—তাতো যাবোই, কিন্তু আমার কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন?

অণিমা গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়—এ কথার কি ঠিক উত্তর দেওয়া যায়! আমি নিজেই জানিনা কেন এমন হয়।

—নিশ্চয় জানেন। অমিয় অণিমার আর একটু কাছে স'রে এসে বলে।—আমি অনেক গান বাজনা শুনেছি, কিন্তু আপনার মত এমন করুণ বাজনা কোথাও শুনিনি। আর আপনার মত এমন মেয়েও দেখিনি।

জ্যোৎস্না তখন বারান্দায় ছড়িয়ে প'ড়েছে। ভাড়াটে বাড়ীর কেউ কোথাও জেগে নেই। অণিমা ব'লল—

—সে অনেক কথা, আজ থাক্ অমিয়বাবু। রাত অনেক হ'ল, শুতে যান।

অমিয় নাছোড়বান্দা। সুযোগ যখন পেয়েছে, সে আর হারাতে রাজী নয়। বলে—

—ক্ষমা করবেন। যা শুনতে চাইছি, তা শুনতে না পেলে, ঘুম আমার কিছুতেই আসবেনা।

অণিমা চুপ ক'রে চাঁদের দিকে চেয়ে থাকে। এক টুকরো মেঘ এসে খানিকক্ষণের জন্য চাঁদকে ঢেকে দিয়ে যায়। এক নিমেষের জন্য বারান্দার কোণটায় অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। সেই মুহূর্তে, অণিমা হঠাৎ ব'লে ফেলে—অমিয়বাবু আপনি আর আমার সাথে মিশবেন না। আমার বড্ড ভয় করে। কণ্ঠে তার কান্নার ছাপ। অমিয় বলে—আমায় অবিশ্বাস ক'রছেন আপনি! ভয় নেই, কোন ক্ষতি আমি ক'রবোনা আপনার।

অণিমা বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলে—ক্ষতি আপনি করবেন না তা, জানি। কিন্তু আমায় বিশ্বাস করবেন না আপনি। আমি···আমি···। কথা শেষ ক'রতে পারেনা অণিমা। হঠাৎ কণ্ঠস্বর ঢেকে যায় কান্নার ঢেউয়ে। অমিয় বলে—থাক। আপনার কষ্ট হ'চ্ছে। আমি যাই। অমিয় উঠল। কিন্তু অণিমা বাধা দিয়ে বলল'—শুনতে যখন চেয়েছেন শুনেই যান। আপনাকে লুক'বনা। কিন্তু একথা এ বাড়ীর কেউই জানেনা।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে দুজনই। হঠাৎ বাষ্পরুদ্ধ স্বরে অণিমা বলে—আচ্ছা বলুনতো, আমার দেহে কি গয়না মানায়! রঙ্গিন সাড়ী পড়লে কি আমাকে খুব সুন্দর দেখাবে? আমার সিঁথিতে কি কি সিঁদুর মানাবে?

অমিয় বিস্মিত স্বরে বলে—আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা।

রুদ্ধস্বরে অণিমা উত্তর দেয়—বুঝতে পারবেনওনা। আপনাকে বুঝতে দিতে আমার বড় ব্যথা লাগছে। তবু শুনতে যখন চেয়েছেন, শোনাচ্ছি। আমি······আমি ·····বিধবা······।

বি ··ধ···বা···? অমিয় স্তব্ধ হয়ে যায়। অণিমা বেহালার রেশ টেনে যায়—খুব ছোটবেলায় আমার বিয়ে হয়। বিয়ের দু'বছর পরেই স্বামী মারা যান। কিন্তু বাবা আমাকে বিধবা সাজতে কিছুতেই দিলেন না। তাই কুমারী মেয়ের মত আমি ঘুরে বেড়াই। কিন্তু আমার চেহারা আমি কি ক'রে ভুলব?

অমিয় চেয়ে থাকে আকাশের ছায়াপথটার দিকে। ভাবতে থাকে, কি ক'রে অণিমাকে বোঝান যায়, সে যে বিধবা নয়।

বারান্দা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

"এ-কন্যা উচ্ছিষ্ট, কোনো লোলচর্ম বৃদ্ধ লালসার
দ্বাবিংশ সন্ধ্যার প্রণয়িনী।
ধিক, এরে ধিক!"
বলে সেই সত্যসন্ধ নিষ্পাপ প্রেমিক
বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন।
সেখানে টগর যুঁই হাস্নুহানা রজনীগন্ধার
সহৃদয় সান্নিধ্যে এবং
সন্ধ্যার হাওয়ায় তাঁর পরিশ্রান্ত ক্লিষ্ট স্নায়ু-মন
শান্ত হয়ে এলে ফের অরিন্দম সেন
দু দণ্ড তন্ময় বসে থেকে
পুনরায় সেই একই চিন্তার হাঁটুতে মাথা রেখে
নবতর সিদ্ধান্তে এলেন ঃ
"তা বলে কি প্রেম নেই? প্রেম শান্তি নেই? আছে, আছে।
বিবৃতজঘনা এই কন্যাদের কাছে
সে-প্রেম যাবে না পাওয়া। কিংবা পাওয়া গেলেও বিস্তর
মূল্য দিতে হবে। আমি ততটা শাঁসালো
প্রেমিক যখন নই, অনিবার্য এই পরাজয়ে
শোকার্ত হব না। অতঃপর
আমার আশ্রয় নেওয়া ভালো
মেঘ-নদী-বৃক্ষলতাপাতার প্রণয়ে।"

অপিচ পরম রঙ্গে টবের গোলাপে
মগ্ন হয়ে দেখা যায়, সে এক আশ্চর্য প্রণয়িনী;
ঘনিষ্ঠ, তবুও শান্ত। এবং পাপড়িতে তার কাঁপে

সেই একই অপার্থিব অমর্ত্য পিপাসা,
যাকে বলি প্রেম।
তাই সমস্ত প্রগল্‌ভ ছিনিমিনি
শেষ হয়ে গেলে সেই প্রেমিক আবারও বুঝি পারে
হৃদয়ে জ্বালিয়ে নিতে আর-এক প্রসন্ন ভালবাসা
বারান্দার এই মৌন বসন্ত-বাহারে।

"সুন্দর বান্ধব, তুমি আমার নিকট নও কখনো প্রাচীন
কারণ তোমার চোখে বুলোই প্রথম চোখ আমি যেইদিন
তুমি আছো মনোময় এখনো তেমন। তিন মাঘে ছিল শীত,
বনান্ধকারের থেকে তিন গ্রীষ্ম-গর্ব্ব মুছে করেছে অসিত॥"

॥ সেক্সপীয়র ॥

সাংস্কৃতিকী

বয়োজ্যেষ্ঠ কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

বয়োজ্যেষ্ঠ কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন মাত্র 'আকাশ-বাণীতে' তাঁর কণ্ঠ শুনিয়ে চিরতরে নীরব হলেন। এই কবির মৃত্যু তাঁরই ভাষায় 'ফুল-ফোটা ফুল-ঝরা'। 'মানব' কবি নিজের দিকে তাকিয়ে এর চাইতে আর বেশি কিছু ভাবতে পারেন না। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ভাবতেন যে তিনি ফলদাতা বৃক্ষ। তাঁর আশ্রয়ে পুষ্পোদ্গম হয়েছিল বহু। বহুদিন যে পুষ্প অমলিন থেকে তার হৃদ্‌গত সৌন্দর্য্য বিতরণ করতে পারে আমরা করুণানিধানকে তেমনই একটি আশ্চর্য্য কুসুম ভাবতে থাকব। 'আকাশবাণী'তে মুমূর্ষু কবির কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছিল বিশ্বের সৌন্দর্য্য-সভায় আমন্ত্রণ পেয়ে যে উল্লাস তিনি উপভোগ করে গেলেন তা-ই যেন সবিক্রমে আমাদের জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন।

করুণানিধানকে আমি পুরোপুরি সুফী-চিত্তের কবি বলে মনে করি। জাতি-ধর্ম্ম-বয়েস যাঁদের বিবেচনায় অবান্তর—তন্ত্রযোগীর মন নিয়ে যাঁরা জীবধাত্রীর দিকে ও নিজের হৃদয়ের দিকে তাকান এবং বিশ্বময় ষোড়শী যুবতী দেখতে পান, তেমন জাতের কবিচিত্ত বহন করে গেছেন করুণানিধান আজীবন। তাঁর চেহারাতেও যেন আমি মধ্যযুগীয় একটি সুফী কবিকে দেখতে পেতাম। দাড়ি-দোলান খুশী-খুশী মানুষটি দেখলে মনে হত এক্ষুণি তিনি 'ঢুম্‌কা-রাণী'র 'শয়ের' শুনিয়ে দেবেন—আর সেই ষোড়শী অপূর্ব্ব শ্রীতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে। আর তখন আমরা-ও তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বল্‌তে সুরু করব:

"তোমার রূপের দরবারে আজ
ভেট দিনু এই বরণ হার
চারু চোখের চোরা দিঠি
চম্‌কে দেছে দিল্ আমার!
তোমার পাণির তড়িৎ ভরা
দাও পরশন তরুণ-করা,
ঘুচাও মম সকল জরা
খোলো শৈল-পুরীর দ্বার।"

কবি-সভা

'কৃত্তিবাস'-পত্রিকার তরুণ কবিদের উদ্যোগে সরস্বতী-পুজা উপলক্ষ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ কবিদের একটি সম্মেলন হ'ল। মনোগ্রাহী সম্মেলন। কবিতা-রচনা ও কবিতা-শোনানো তরুণ মনকে উদ্বেজিত করছে জানতে পারলে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুশী হই। কবিতা-রচনা করা কঠিন ব্যাপার, শোনানো ততোধিক কঠিন। তরুণ কবিরা তাঁদের সম্মেলন-গৃহটিকে ছোট করে এই দু'টো কঠিন কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বসন্তোৎসব উপলক্ষ্যে যে কবিসভার বৃহদায়তন ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে একটা উল্লেখ্য ত্রুটী এই যে কবিতা-পাঠ বৃহৎ প্রকোষ্ঠে শ্রুতি-যন্ত্রসহযোগে একটি নির্ম্মম প্রতিধ্বনি তুলে বাণীকে অস্পষ্ট করে তুলছিল। কিন্তু এ-সভায় বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ নিমন্ত্রিত কবিদের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন তা সুরুচিব্যঞ্জক এবং মর্ম্মস্পর্শী। সভায় বিশ্ববিদ্যালয় সুযোগ্য কবি শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্তকে সভাপতির কার্য্য পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষ থেকে তিন জন কবি কবিতা পাঠ করলেন। 'ভালো পদ্য' নামে যে একরকম রচনা আছে তা কেউ লেখেননি—কবিতা লিখেছেন সবাই। আহূত কবিবৃন্দের শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদিনেশ দাস, শ্রীনীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, স্বয়ং সভাপতি এবং পূর্ব্বাশা-সম্পাদক কবিতা পাঠ করেন। কবিতা-পাঠ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য শুধু একটি কথা: কবিতা-পাঠে যেন সুর পরিবর্জ্জিত হয়। পাঠ ব্যাপারটিই স্পষ্টতা-ব্যঞ্জক। সুর ছন্দ-পূর্ত্তির জন্যে—ছন্দে যে কবিতা কাঁচা তাকে ব্যক্ত করতে সুরের প্রয়োজন পড়ে।

আমন্ত্রিত কবিবৃন্দ তাঁদের স্বকীয় মনোভঙ্গীর ব্যঞ্জনা দিয়েছেন কবিতায়। ক্লান্তি, ছায়ার মায়া, বাস্তব-বোধ এই তিনটি ভঙ্গী স্পষ্টত এখনকার বাংলা কবিতার জীবন-সঙ্গিনী। একথা বলা অবশ্য বাহুল্য যে সুভাষ কঠোর বাস্তবতাবাদী—তিনি জীবনকে শুধু রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির নাগপাশে জর্জ্জরিত ভাবেন। দিনেশ ছায়ার মায়া-শিল্পী। নীরেন ক্লান্ত। সুধীন্দ্রনাথ বাস্তববাদী এবং রোমান্টিক। সেক্সপীয়রের যুগে যেমন মন তৈরী হতে পারত, তেমন মনের অধিকারী তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার হৃদ্গত ধ্বনি শুনতে মনোযোগী হয়েছেন জানতে পেরে কাব্যোৎসাহী ব্যক্তিমাত্রই আনন্দিত হবেন।

'ঐতিহাসিক উপন্যাস'

যে-সময়টার অভিজ্ঞতা ইতিহাস-পাঠে সংগৃহীত হয়, সে-সময়কে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে গেলে তার গঠন, চরিত্র-চিত্রণ, কথোপকথন কেমন হওয়া উচিত, সে-প্রশ্ন বাঙালী উপন্যাস-পাঠকের মনে উদিত হয় বলে আমার জানা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশচন্দ্রের কথা এখানে আসছেনা। —হাল-আমলে উনিশ-শতকের কলকাতার ও মফঃস্বলের নীল-চাষ অঞ্চলের জীবন-চিত্র দেখাবার উদ্দেশ্যে দু'টি উপন্যাস লেখা হয়েছে। একটি উপন্যাস বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে উনিশ শতকীয় কল্‌কাতা সম্পর্কে পাঠকের অপরিসীম ঔৎসুক্যের প্রমাণ বহন করছে দেখতে পাই। দিশী সাহেব-বিবি-গোলামের কাহিনী মুখরোচক হয়েছে। অপর উপন্যাসে বিদেশী সাহেব আর দিশী বিবি-গোলামের কাহিনী আছে—উপন্যাসটির নাম 'নীল-ভুঁইয়া'। এতে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'-এর ছাপ একটুও নেই বরং আছে ইংরেজ-ফরাসীর (ইঙ্গোফ্রেঞ্চ) প্রচ্ছন্ন রেষারেষির একটি ম্লান চিত্র—এবং দিশী রাজনন্দনের সাবালকত্ব প্রাপ্তির খবর। কুইন ভিক্টোরিয়ার মতো একজন রাণীমা আছেন, ডিসরেলির মতো একজন দেওয়ান আছেন। এ-শতকের প্রিন্স-অব-ওয়েলস্-এর মতো রোমান্স করেন রাণীমার ছেলে আর এ-যুগের সন্ত্রাসবাদীদের মতো কথা বলে ও কাজ করে ফরাসী কুঠিয়ালের সাকরেদ বুজরুক আলি। রাজকুমারের প্রণয়িনী ব্রাহ্মণকন্যা নয়নতারা সংস্কৃত কাব্যে ও কবিরাজিতে আসক্তা। উপন্যাসের নায়িকা এই দুর্ব্বোধ্য মহিলা।

নীল-এলাকা বাংলাদেশের সর্ব্বত্র যে দুর্নাম অর্জ্জন করেছে—এখানে তা নয়। কুঠিয়াল বা ফ্যাকটররা আছেন জবচার্ণকীয় ভঙ্গীতে। গঠনাত্মক ভাবে খানিকটা ভাবিত তাঁরা। এর সত্য-মিথ্যা যাচাই করবার ক্ষমতা আমার নেই। উপন্যাসটি সুরু হয়েছে যে উজ্জ্বল বর্ণ ও রূপ নিয়ে তা কয়েকটি অধ্যায়ের পরে যে আর নেই—শুধু এটুকুই লক্ষ্য করবার ক্ষমতা পাঠক হিসেবে আমার আছে। 'ফরাসীর জীবন-সন্ধ্যা' উপন্যাসটির রাষ্ট্রনৈতিক আলেখ্য—সুতরাং উজ্জ্বলতা নিভে যাওয়া হয়ত ঔপন্যাসিকের কাব্য-প্রবণ মনের একটি সুবিবেচিত কাজের ছাপ। উপন্যাসের সামাজিক দিক হ'ল তদানীন্তন শিক্ষাসংস্কারমূলক বিদ্যালয়-স্থাপনের ঘটনা। মননের এই চিহ্ন সুস্পষ্ট করবার পর মনের দিক খানিকটা ম্লান হয়ে গেছে চরিত্রগুলো চিত্রিত করবার বেলায়। সবগুলো চরিত্রই যেন চিন্তাশীল। উনিশ-শতক চিন্তাশীলতার একটি ব্যাপক পরিধি অবশ্য তৈরী করেছিল, সে পরিধি একটি উপন্যাসের কলেবরে স্থানপ্রার্থী হলে আবেগময় চিত্তগুলো উপেক্ষিত পড়ে থাকতে বাধ্য। নয়নতারা আর রাজকুমার আবেগ দান করতে এসেও কেন পিছিয়ে যাচ্ছে তা ভেবে নেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য নয়।

শ্রীঅমিয়ভূষণ মজুমদার মনস্তত্ত্ব ও মনোভঙ্গী উদ্ঘাটনে পারদর্শী—সমাজ-শাসিত আড়ষ্ট মনোভাব নিয়ে তিনি লিখতে বসেন না—চরিত্রগুলোকে প্রাণময় করে তোলবার শিল্পী-প্রতিভা তাঁর যথেষ্ট আছে। কিন্তু সব-কিছু সত্ত্বেও যে 'নীল-ভুঁইয়া' আমাদের পাঠক-মনের খুব কাছাকাছি আসেনি তার একমাত্র কারণ 'নীল-ভুঁইয়া' চিরাচরিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। এমন একটি ইতিহাস এর মর্ম্মারূঢ় যাকে বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে তদন্তর্গত মানুষগুলো রক্তমাংস খুইয়ে শুধু মেধা ও মনন নিয়ে উপস্থিত হয়। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতিকে আমরা রক্তমাংসে তেমন জানিনে। আমাদের এই অজ্ঞাতিবোধ 'নীল ভুঁইয়া'র মতো বই পড়তে গেলে চিত্তে জাগ্রত থাকে এবং গ্রন্থোক্ত চরিত্রগুলোতে তার চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়। লেখক উনিশ-শতক সম্পর্কে প্রচুর অধ্যয়ন করেছেন, এ-কথাটি উপন্যাস পড়তে-পড়তে যদি বিস্মৃত হতে পারতাম, তাহলে মনে মনে হয়ত 'নীল ভুঁইয়া' এখনকার একটি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়ে দাঁড়াত।

এখনকার জীবন উনিশ-শতকে প্রতিবিম্বিত করা নয়, বরং উনিশ-শতকের জীবন্ততা এখনকার জীবন-বোধে সক্রিয় দেখে তাতে উদ্‌বুদ্ধ হওয়া এ-পর্য্যায়ের ঔপন্যাসিকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আজ পর্য্যন্ত সে-কর্ম্ম কোনো বাংলা উপন্যাসে দেখতে পাইনি। উল্টো রথে চেপে বসেন সবাই, অতীতের দিকে তাকাতে গেলে। সে রথযাত্রা কাজেই তেমন জমেনা। ঔপন্যাসিকদের নিজের মনেই জমেনা। শুধু লোক-দেখানো আচার পালন করেন তাঁরা। লোকের ভীড় হওয়া বা না-হওয়া রথের কারুকার্য্যের উপর নির্ভর করে।

'বাংলার অর্থ নৈতিক ইতিহাস'

আজ-পর্য্যন্ত বাংলাদেশের নানাবিধ ইতিহাস লেখা হয়েছে। 'অর্থনীতি'র উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে প্রাচীন বাংলা থেকে নবীনতম বাংলার ইতিহাস রচনা করবার অভিপ্রায় কারো ছিলনা। বিশ্বভারতীর তরুণ অধ্যাপক শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের রচনায় ও প্রচেষ্টায় সেই অলিখিত ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো দেখা

গেল। আশ্চর্য্যের কথা এই যে লেখক তাঁর সাহিত্যিক জীবন স্থরু করেছিলেন 'নিরুক্ত' কবিতা-পত্রিকার পৃষ্ঠায়। বৌদ্ধ-হিন্দু-মুস্লিম-খ্রীষ্টান অধিপতিরা আদিকাল থেকে বাংলা-ভূখণ্ডে বসবাস করে ভূমিজ অধিবাসীর ভরণপোষণের ও আত্মভোগের জন্যে যা-যা করে গেছেন তারই বিবরণ সংগ্রহ করে অত্যন্ত নিষ্ঠায় 'বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস' গ্রন্থখানি ইদানীং রচনা করেছেন শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ঐতিহাসিক-মাত্রেই বৌদ্ধ পাল-রাজত্বের কর্ম্মকৃতিতে পঞ্চমুখ। পাল-নৃপতিরা 'দ্রম্ম'-নামক একপ্রকার স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন এবং পণ্ডিতরা (সেকালেরও) 'দ্রম্যে'র দামে মুগ্ধ হয়ে পাল-প্রশস্তিতে মুক্তকচ্ছ হয়ে পড়েন। বস্তুত ব্যাপারটি যোন-গ্রীক 'দ্রখ্‌মে'-মুদ্রার প্রতিলিপি। যে গোপাল-মারফৎই তা এসে থাক্, এই মুদ্রা বিজয় গ্রীক অর্থনীতির বিজয়। তিব্বতী রাজা স্রঙ্গ-দর্ম 'দ্রম্ম'-ধর্ম্মদানে কতোটুকু তৎপর হয়েছেন, অতঃপর তা বিবেচনার বিষয়। শোষণ কবে থেকে স্থরু কর্ণস্থবর্ণে সোনার ঝিলিক দেখিয়ে, তা-ই বিবেচ্য। ইণ্ডোজার্ম্মাণ ভাষা নিয়ে যাঁরা মুগ্ধ তাঁরা 'স্রঙ্গ-দর্ম' নামে ঝুঁকে দেখতে পারেন।

ভারতের সর্ব্বত্র মঠ-মন্দির-স্থাপত্যে রাশিরাশি মুদ্রা ক্ষরিত হয়েছে, গলিত হয়েছে পিণ্ড-পিণ্ড স্বর্ণ বৌদ্ধ আমলের অনাথপিণ্ডদের যুগ থেকে স্থরু করে হয়দ্রাবাদের 'পালম্‌-পেত'-মন্দির নির্ম্মাণ তক্। স্থরুলে যে-মঠমন্দির তা শুধু বাঙালীর চেতনার স্থরুর সাক্ষ্য। কিন্তু জাতি হিসেবে বাঙালী স্মৃতিচিহ্নরহিত, চিরদরিদ্র। মস্লিন ও ধানচাল তৈরী করেও দরিদ্র। শোসণ কার নয়? শকের পর গুর্জ্জর-প্রতীহার পালরা শোষণ করেন নি? তারপর বুগরা-খান? জব চার্ণক বা দিনেমার ত সেদিনের ছেলে!

শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থ-পাঠে এসব কথা মনে পড়ে। আমি মনে করি, গ্রন্থখানির উপকারিতা পাঠকচিত্তে এই : একটি স্মারক-মঞ্জুষা তৈরী করে দেওয়া।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

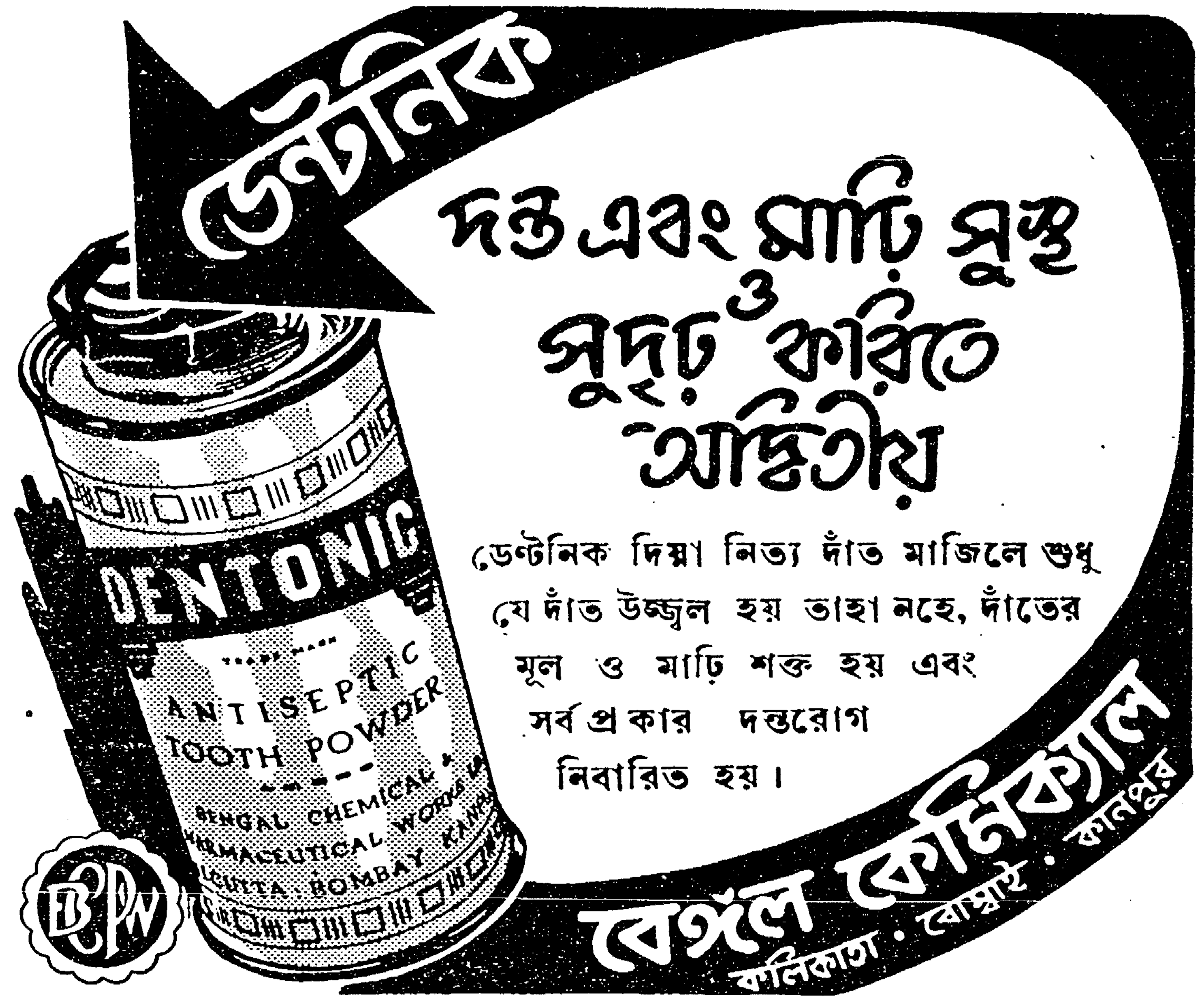

ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া বিল্ডিংস্
৬৪নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা-১৩
১৯৫২ ইং পর্য্যন্ত প্রথম ১৬½ বৎসরে পাঁচটি সার্থক ভ্যালুয়েশান।
প্রতি ভ্যালুয়েশানে পলিসি-হোল্ডারদের বোনাস্ এবং শেয়ার-হোল্ডারদের ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।
ভারতীয় বীমাজগতে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

এন্, সি, দত্ত
চেয়ারম্যান।

ক্রমোন্নতির পথে

নূতন কাজের পরিমাণ

১৯৫৪—১০,২৭,৮৪,৫৫০৲ টাকা
১৯৫৩—৮,৭৬,৬৯,৭৫০৲ টাকা
১৯৫২—৮,০৪,৬৯,৫৭৫৲ টাকা
১৯৫১—৭,৫১,৯১,১৫০৲ টাকা

মেট্রোপলিটান

ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

দি মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স হাউস

॥ ৭নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা ১৩ ॥

খাদ্যপ্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

সুপার-নিও-কড

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ
কলিকাতা-১৭

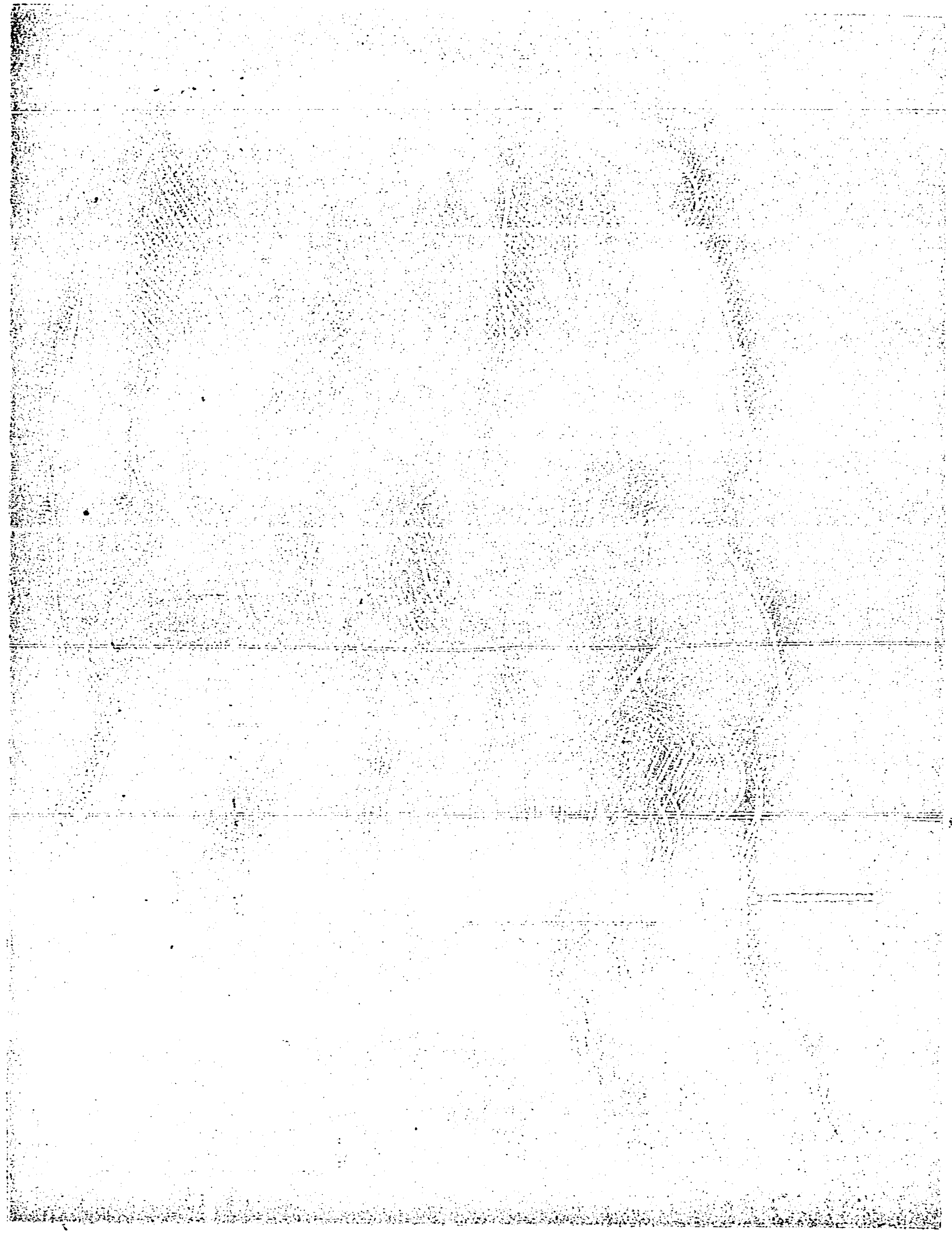

পূর্ব্বাশা
ফাল্গুন ★★ ১৩৬১ ★★ বারো ★★ সম্পাদক : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
চৈত্র ★★ বঙ্গাব্দ ★★ আনা ★★ প্রকাশক : সত্যপ্রসন্ন দত্ত

॥ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ॥

পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত

'ও কি যে-সে? ও আমার শক্তি,' বলতেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'ও সরস্বতী, বিদ্যাদায়িণী!' পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেই পুণ্যজীবনের সমস্ত উপাদান একত্রিত করে ভক্তিসুষমামণ্ডিত ভাষায় সাহিত্যে উপস্থিত করেছেন।

কী ছিল এই 'সাতিশয় লজ্জাশীলা বাঙালী হিন্দু কুলবধুটির মধ্যে?...আমাদের সমসাময়িক ইতিহাসে রামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট মূর্তির অন্তরালে...এখনও ছায়ার ন্যায় প্রতীত হইলেও তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির নারী না হইলে, রামকৃষ্ণও রামকৃষ্ণ হইতে পারিতেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে।...' (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়)। সচিত্র। দাম ৪৲

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পায়ণ

বাগেশ্বরী প্রবন্ধাবলীর পরিমার্জিত সংস্করণ

কাকে বলে শিল্পের সার্থকতা? কাকে বলে সুন্দর? রূপনির্মাণে শিল্পীর স্বাধীনতা কতদূর গ্রাহ্য? কিংবা শিল্পের রস অস্বাদ করার অধিকার কি ভাবে আমাদের মধ্যে জন্মাতে পারে?—এ সব তত্ত্ব নিয়ে পৃথিবীতে বাদানুবাদের অন্ত নেই। এই বদানুবাদ প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত উৎসাহ এবং কৌতূহলেরই সাক্ষ্য। আমাদের দুর্ভাগ্য যে শিল্পশাস্ত্রের—যাকে বলে নন্দনতত্ত্ব তার—বিষয়ে মৌলিক তেমন সৎগ্রন্থ বাংলাভাষায় নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাগেশ্বরী বক্তৃতামালায় অবনীন্দ্রনাথ আমাদের এই প্রাণের অভাব পূরণ করেছিলেন। গুণীশিল্পী, রসতাত্ত্বিক এবং অসামান্য সাহিত্যস্রষ্টার মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। তারই অপরূপ নিদর্শন এই 'শিল্পায়ণ'। দাম ২৲

জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল

রবীন্দ্রোত্তর যুগের অসামান্য কবি জীবনানন্দ দাশ যদি কোনো একটিমাত্র গ্রন্থে তাঁর সার্থকতম পরিচয় রেখে গিয়ে থাকেন, সে গ্রন্থ 'বনলতা সেন'। তাঁর কাব্যের প্রধান গুণ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চিত্ররূপময়।' 'প্রসন্ন বেদনায় কোমল উজ্জ্বল, বড়োই নতুন এবং নিজস্ব তাঁর লেখা; বাংলা কাব্যের কোথাও তার তুলনা পাইনে'—এই বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অমিয় চক্রবর্তী। দাম ২৲

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র প্রতিধ্বনি

স্মরণীয় বিদেশী কাব্যের অনুবাদ

তিশ বৎসর লেগেছিল মালার্মের একমুঠো কবিতার ইংরেজী অনুবাদে। বর্তমান অনুবাদ গ্রন্থের পিছনেও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সমপরিমাণ সময় যে ব্যয় করেছেন সেটা অকারণে নয়। 'যে উদ্যমের প্রস্তাবনা নিছক ভালো লাগায়, তার পরিণতি দুরূহের দারুণ আকর্ষণে।' কেন না বিবেকী সৎকবির কাছে সাহিত্যের দুরূহতম ক্রিয়া কাব্যের অনুবাদ। শেকসপীয়র, লরেন্স, সমুন, মেসফীল্ড, সিফীলড, হিউ মেনাই (ইংরেজী), হাইনে, কারোসা, গোটে (জার্মান), ভালেরি মালার্মে (ফরাসী) থেকে অনুদিত যে সব কবিতা এখানে সংকলিত হল তার সমতুল্য অনুবাদের আদর্শ বাংলায় সম্পূর্ণ বিরল। দাম ২||০

সিগনেট বুকশপ, ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, ১৪২/১ রাসবিহারী এভিনিউ

পূর্ব্বাশা

প্রতিসংখ্যা—আট আনা

ফাল্গুন-চৈত্র—১৩৬১

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

কবিতা : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ... ৬০১

স্বপ্নভাঙা : টমাস মান : অনুবাদক—
তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় ৬১৫

কবিতাগুচ্ছ :

ব্যর্থ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ... ৬২২

সুরসঙ্গতি : শান্তিকুমার ঘোষ ... ৬২৩

দ্বৈত : বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৬২৩

স্বর্ণ মৃগ : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ... ৬২৪

শীতকে : বংশীধারী দাস ... ৬২৫

অপরূপ : প্রমিত বসু ... ৬২৫

লেখক : প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৬২৬

সতীর্থা : শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় ... ৬২৬

নিরুক্ত : শুভ্রাংশু ঘোষ ... ৬২৭

অন্তরাল-ছায়া : মোহিত চট্টোপাধ্যায় ৬২৭

সূর্য্য-সম্মোহ : কবিতা সিংহ ... ৬২৮

অনামিকা রায় : শ্যামল দাস ... ৬২৮

অন্তরালেখ্য : সত্যেন্দ্র আচার্য্য ... ৬২৯

জন্মদিনের চিঠি : অমল দত্ত ... ৬৩০

সন্ধি-বিগ্রহ-শান্তি-চিত্র : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ৬৩০

সাইবারনেটিকস্ ও পাশ্চাত্ত্য জগৎ :
পারভেজ রিয়াজ ৬৩৩

বোঝাপড়া : মানসী দাশগুপ্ত ... ৬৪১

ভারত-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ : ইন্দ্রজিত্ ৬৫২

গড়শ্রীখণ্ড : অমিয়ভূষণ মজুমদার ... ৬৫৭

তনয়া : শ্রীতুষার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৬৭৭

রঙ্গমঞ্চ : অবধূত ... ৬৭৫

সাংতামামী : ৬৯১

সাহিত্য সংবাদ ... ৬৯৪

মহিলা সাহিত্য : ... ৬৯৫

সংক্রান্তি : ৬৯৬

সুজিতকুমার নাগের

ভালবাসাকে কেন্দ্র করে উচ্ছাসঘন রম্যরচনা

॥ জীবনশিল্পী ॥

আবার নতুন করে ছাপা হল, ২য় মুদ্রণ। ভালবাসাকে কেন্দ্র করে জীবনের ব্যথাবেদনার যে দিক, ব্যর্থতা বিফলতার যে দীর্ঘশ্বাস তারই সুরে লেখা জীবনের বিচিত্র সত্যচিত্র ॥ দাম : একটাকা। শোভন মলাট ॥ মনোরম বাঁধাই ॥

সুজিতকুমার নাগ

॥ মধ্য রাত্রির প্রার্থনা ॥

কবিপক্ষ উপলক্ষে প্রিয়জনকে উপহার দেবার মত উল্লেখযোগ্য কাব্য সংকলন ॥ শোভন প্রচ্ছদপট ॥ দাম : বারো আনা ॥

প্রকাশের পথে	প্রকাশের পথে
সতীকুমার নাগ	সুজিতকুমার নাগ
হলধর মালি ১৷৷০	চন্দ্রাবলী—২৲

আগমনী প্রকাশনা ভবন

১৩/২ বি, বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯

প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

মনোলীনা— ২৷৷০

সেতু বন্ধ— ২৷৷০

সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲

বিচিত্র হৃদয়— ২৲

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯

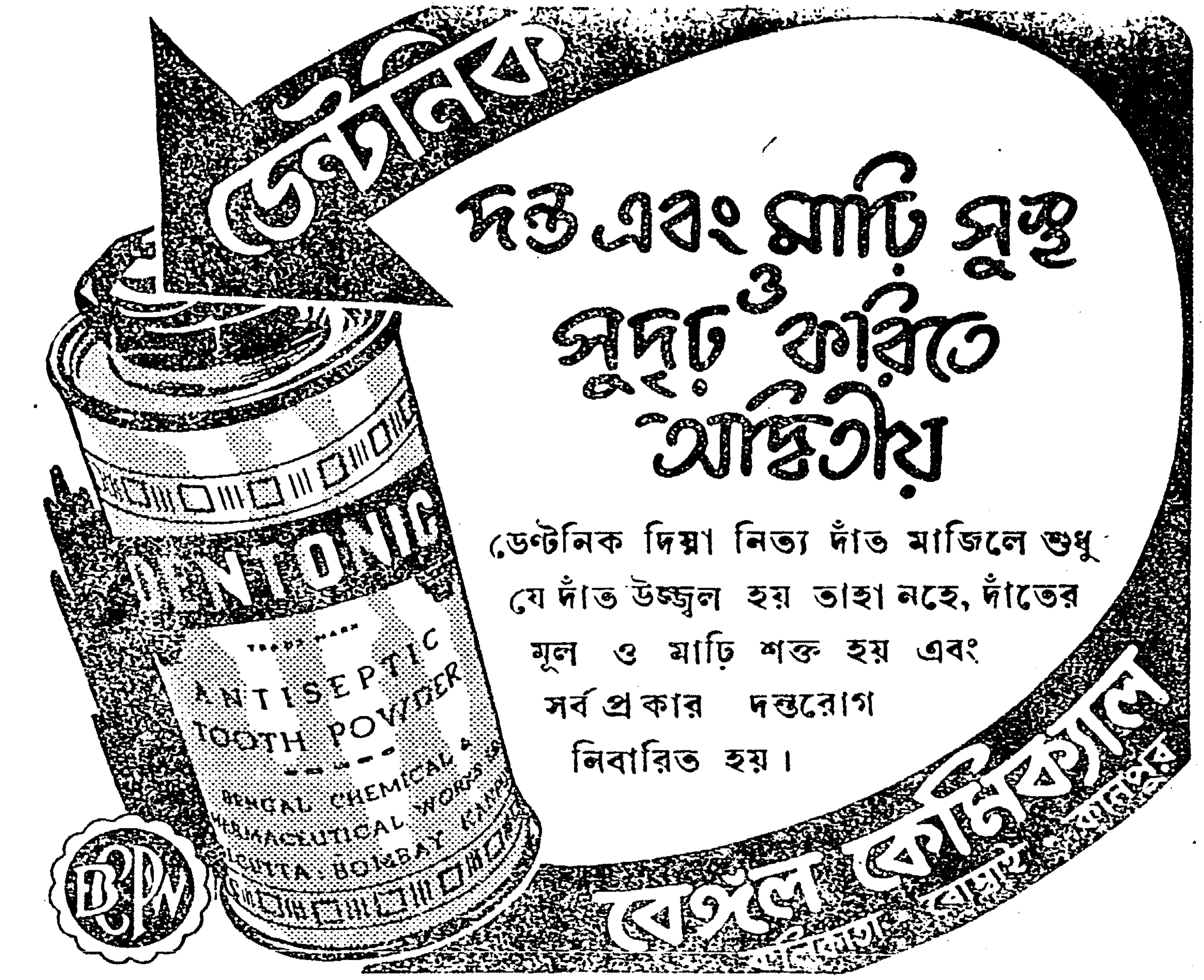

ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া বিল্ডিংস্

৬৪নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩

১৯৫২ ইং পর্য্যন্ত প্রথম ১৬ৢ বৎসরে পাঁচটি সার্থক ভ্যালুয়েশান।

প্রতি ভ্যালুয়েশানে পলিসি-হোল্ডারদের বোনাস্ এবং শেয়ার-হোল্ডারদের ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় বীমাজগতে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

এন্, সি, দত্ত

চেয়ারম্যান।

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

বাঙালীর জাতীয় উৎসব শুভ পঁচিশে বৈশাখ। এই উপলক্ষে কবিকে শ্রদ্ধা জানাইবার শ্রেষ্ঠ উপায়, তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনার অবিনশ্বর শিল্পী-স্বরূপ তাঁহার রচনার সহিত নুতন করিয়া পরিচয়সাধন।

সেই উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী দুই সপ্তাহকাল ২১শে বৈশাখ ৫ই মে বৃহস্পতিবার হইতে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৯শে মে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বাংলা হিন্দী ও ইংরেজী গ্রন্থ রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে, বিশ্বভারতী প্রকাশিত ও প্রচারিত গ্রন্থাবলী

সুলভ মূল্যে শতকরা ১২॥০ বাদ দিয়া বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

উক্ত সময়ের মধ্যে মফঃস্বল হইতে যে-সকল অর্ডার পাওয়া যাইবে তাহাতেও অনুরূপ সুলভ মূল্য ধার্য্য হইবে।

নিম্নলিখিত বিক্রয়কেন্দ্র-দ্বয় হইতে সুলভ মূল্যে প্রাপ্তব্য পুস্তকের বিস্তারিত তালিকা পাওয়া যাইবে।

বিশ্বভারতীর অন্যান্য পুস্তকের মূল্য পূর্ববৎ থাকিবে।

বিশ্বভারতী

৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পূর্ব্বাশা

ফাল্গুন-চৈত্র·১৩৬১

পাশে – ইরাকী চিত্র : লেবান-ওয়ালী (দুধওয়ালী)॥ শিল্পী : ইসমাইল অলচেখলি

নীচে – বাঁ-পাশে : জননী—(দারুশিল্প) শিল্পী : জেবদ সেলিম

নীচে-ডান পাশে—ঐর বা ঐল ভাস্কর্য্য (ভুবনেশ্বর-১১শ শতক) জননী—বৈদিক শিল্প।

[৬৯১ পৃষ্ঠার চিত্র-পরিচয়]

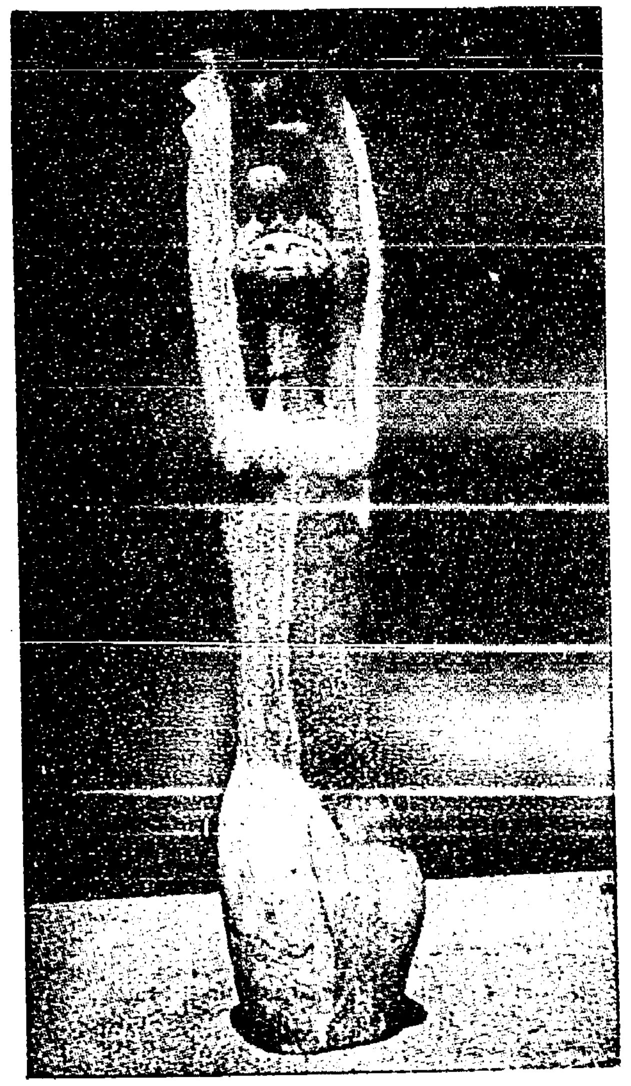

পূর্ব্বাশা
ফাল্গুন—১৩৫১
চৈত্র—১৩৫১

কবিতা

[চল্লিশের যুগ]

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

চল্লিশের যুগে সবচাইতে সুস্পষ্ট বিরোধী সুর শুনিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ যখন রবীন্দ্রনাথও বামপন্থার স্নেহে দোলায়িতচিত্ত হয়েছেন। তবে বামপন্থার বীজ হঠাৎ-হাওয়ায় উড়ে আসেনি। এসেছে রবীন্দ্রবিরোধিতা থেকে 'বিশের যুগে'র ভূমি থেকে। তাকে ঠিক কল্লোল-যুগ বল্‌বনা—বল্‌ব মোহিতলালের যুগ। মোহিতলাল, সজনীকান্ত, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ, যতীন্দ্র সেনগুপ্ত এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র এমন একটি চারাগাছ তৈরী করতে চেয়েছিলেন, যাকে বিত্তহীন বাঙালীর বিদগ্ধ চিত্তের রূপস্বপ্ন আশ্রয় করতে পারে। চিরাচরিত বস্তু বাংলাকাব্যে কিছু না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ কাব্যে একটি ধ্রুপদীলোক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বলা যায়, এককাণ্ড দেবদারুপ্রতিম বোধিদ্রুম রচনা করেছিলেন, যার শাখা ছিল স্তিমিতবাহু রবীন্দ্রাশ্রিত কবিবৃন্দ। বৃক্ষের কথাই যদি ভাবি, তাহলে বলব যে উদ্ধৃত নামগুলো এই বৃক্ষকে বটবৃক্ষে পরিণত করেছে। পিপ্পলাদ নানা মুনি বা বটফলভক্ষক নানা পাখী নানা আওয়াজ তখনও দিয়েছে, এখনও দিচ্ছে। কিন্তু একটি উড়েপড়া বীজে মাটিতে যে চারাগাছটি জন্মেছিল তাকে পাষাণ-বন্দী করে পূজো-পার্ব্বণের ধূম লাগিয়েছিলেন বামপন্থীরা। সুধীন্দ্রনাথ যে বৃক্ষের জন্ম দিলেন তা নবীন বলেই কচি চারার মাটির রসও চিনত। যেদিন আকাশ থেকে বজ্র-সম্পাত হল কাব্যারণ্যের উপর, সেদিন সুধীন্দ্রনাথের অলাতসদৃশ তরুটি অভিশাপ হানল কচি-চারাটির উপর। চল্লিশের যুদ্ধকাল সে অশনিসম্পাৎ করেছে। উচ্চমধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের বিনাশকাল বলে বাংলা কবিতা এই যুগটিকে স্মরণীয় করে রাখলেও আমার ব্যক্তিগত ধারনা অন্যরকম। বক্তব্য উপমা বর্জ্জিত করলে এই দাঁড়ায় যে যুদ্ধকাল আমাদের কাব্যকে বিচিত্র বর্ণে ও

অভিজ্ঞতায় চিহ্নিত করে গেছে। যুদ্ধযুগের বাংলা-কবিতার সবচেয়ে বড়ো ঘটনা 'নিরুক্ত' (প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত) কবিতা-পত্রিকার আবির্ভাব।

'নিরুক্তে' শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথের প্রাক্তন-বিরোধী-দল বা বটবৃক্ষের শাখা-রচয়িতারা সবাই সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু 'নিরুক্তে'র শেষকাল পর্য্যন্ত এই সংগঠন টেকেনি। তবু 'নিরুক্ত'ই সেই শক্তি সঞ্চার করেছে যা 'বামপন্থী' চারাগাছটির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেষ পর্য্যন্ত বিজয়ী। এ-বিজয় কবিতার ধ্রুব ধর্ম্মের। 'কবিতা' পত্রিকার সঙ্গে 'নিরুক্তে'র তুলনা-মূলক আলোচনায় বলা যেতে পারে যে 'নিরুক্ত' ঐতিহ্যগত পৌরুষ যাচঞা করেছে, কিন্তু 'কবিতা' পাশ্চাত্ত্যের পৌরুষে আসক্ত হয়ে গেছে। অবশ্য রবীন্দ্র-পিতৃমুখাপেক্ষী উভয় পক্ষই ছিলেন। এ-কথা বলা বাহুল্য যে সেদিনের 'জনযুদ্ধ' বা 'ফ্যাসিবিরোধী' সম্প্রদায় 'নিরুক্তে'র আবির্ভাবের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ ছিল। 'নিরুক্ত' অবশ্য গদ্যে-পদ্যে আপন অস্তিত্ববাদ প্রচার করতে কশুর করেনি কিন্তু কাব্য-বোদ্ধারা এম্নি যুদ্ধান্ধ বা অর্থান্ধ ছিলেন যে কবিতার সামাজিক শক্তি উপলব্ধি করবার চেতনা তাঁদের ছিলনা। চল্লিশের কাল বাংলা-কবিতায় রাহুযুক্তির ও রাহুমুক্তির কাল। রেনেসাঁস ও রিফর্ম্মেশন নামক আন্দোলন-দ্বয় মাত্র দশটি বৎসরে বাংলা কবিতা সুসম্পন্ন করেছে চল্লিশের যুগে। সম্প্রতি রিফর্ম্মেশনের তরঙ্গ-ভঙ্গী চলছে।

ইরাস্মাসের রেনেশাঁস যুদ্ধোন্মাদ উরোপায় যে মানব-ধর্ম্ম নিয়ে সংস্কৃতির রণশ্বাস প্রশমিত করেছিল তার তুলনা শ্রীগৌরাঙ্গের সময়ে ছাড়া ভারতবর্ষে মৌর্য্যযুগের পর পাওয়া যাবেনা। চণ্ডীদাসের ও মালাধর বসুর বৈষ্ণব সাহিত্য শ্রীগৌরাঙ্গের মানবতা প্রচারের কাজে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও আজীবন মধ্যযুগীয় মানবতার পরিপোষক হয়ে ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল খানিকটা নিয়ন্ত্রিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তবে সংস্কৃতির বিজয় অশোক-মৌর্য্যের পর আর কেউ যদি সাফল্যের সঙ্গে করে থাকেন তাহলে তা করেছেন পাঠান-যুগের ও ইংরেজ-আমলের বাঙালী শিক্ষিত পণ্ডিত ও সাহিত্যিক-বৃন্দ। রবীন্দ্রনাথ সাফল্যমণ্ডিত না হলেও মানবতাধর্ম্ম দেশে-বিদেশে প্রচার করে ভ্রমণ করেছেন ঠিক ইরাস্মাসের মতো।

তাঁর আজীবন সাধনা যুদ্ধোদ্যমে বিনষ্ট হল। তবে তিনি তখন যে 'ছড়া' কাটতে লাগলেন তার ধ্বনির মিল মারফৎ বাংলা সাহিত্যে তের্জ্জারিমার বা তর্জ্জাওয়ালার ল্যাটিনিটিও প্রকাশিত হল। শুধু সাহিত্যেরই দিক প্রকাশ নয়, বাঙালী চরিত্রের জাড্য ও কলহ যে দুরপনেয় তা-ও এই ছড়াগুলোর মারফৎ ব্যক্ত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের দরবারে মানবতা-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও, আশা করছিলেন যে অন্তত বাংলাদেশে তাঁর এই ধ্রুপদী ধর্ম্মটি প্রবর্ত্তিত হবে। কিন্তু সে-আশাও বাঙালী চিত্তের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে ডুবে

যেতে সুরু করল। যে যা-ই বলুন, রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্য-ধর্ম্মকে ছেলে-খেলা ভাবতেন না, তা তাঁর জীবন-সায়াহ্নের দুর্ব্বল রচনাবলীতেও অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাসিত হয়েছে।

কবিতা কার জন্যে এই পুরনো জিজ্ঞাসা বাংলাদেশের ত্রিশের দশকে উত্থাপিত হয়ে যে মীমাংসার পথই দেখিয়ে থাকুক, যুদ্ধময় পৃথিবীতে যখন চল্লিশের দশক দ্বার-উন্মোচন করল, তখন দেখা গেল যে যুদ্ধের জন্যেও কবিতা হয়। তারপর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাঙালী কবিদের অনেককেই জাতি-দায়িত্বশীল করে তুলল। মন্বন্তরে প্রচুর কবিতা লেখা হ'ল। দায়িত্বশীল কবি ছাড়াও অনেক নবীন-প্রবীণ কাব্য-প্রবণ ব্যক্তি এ-সময়ে বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট কবিতা দান করেছেন। যুদ্ধ, রবান্দ্রনাথের মৃত্যু, মন্বন্তর প্রভৃতি দুর্য্যোগ বাঙালী জীবনের জাড্য-দোষ ঘুচিয়ে সাহিত্যে যেন একটি ঐলিজবেথীয় যুগ এনে দিতে চাইছিল। এযুগে আবেগ ও যুক্তি বাঙালী চিত্তে পাশাপাশি বসবাস করতে সুরু করেছে।

ইরাস্মাসের নিঃশ্বাস শুধু যে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র-সম্পাদিত 'নিরুক্তে'র মনোভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়েছে তা নয়। অতীত থেকে একটি ধ্রুপদাভাস গ্রহণ করবার বৃত্তি বেশির ভাগ কবির মনেই জাগ্রত হয়েছে এ-সময়ে। কিন্তু আনন্দ-ভুঞ্জনের জন্যে অতীতের অরণ্যে বা শ্মশানে কেউ প্রস্থান করেন নি, বর্ত্তমানের বীভৎসতার সঙ্গে অতীতের কী সম্পর্ক বিদ্যমান তারই অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন অনেক কবি। যুদ্ধ তার বিভীষিকাকে যদিও অতিশয় বাস্তব করে তোলেনি ১৯৩৯-এ মারণাস্ত্রের বা কৌশলের লীলায়, তবু অনুভূতিপ্রবণ কবি আহত-স্নায়ু নিয়ে যেন বলতে পেরেছেন তখনওঃ "আমরা কি বুঝি কোথা পৃথিবীর আদি আর্ত্তনাদ?"

সুধীন্দ্রনাথ যুদ্ধের চার মাস আগে শ্রীদিনেশ দাসের বিখ্যাত 'কাস্তে' কবিতার অপ্রকাশিত ধ্বনিটি উচ্চারিত করলেন এই বলেঃ

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
ছায়াপথে কোন্ অশরীরী উন্মাদ
লুকাল আসতে আসতে? (১৯৩৯-১০ই মে)

ছড়া বা প্রবচনে বাংলাদেশের প্রাচীন পদকাররা বল্‌তেন, "বামুন গেলো ঘর ত লাঙ্গল তুলে ধর।' নজরুল ইস্‌লাম সৈনিক বৃত্তিতে একবার বিদ্রোহী হয়ে 'হল বলরাম স্কন্ধে' লাঙ্গল পত্রিকা বার করেছিলেন। বাংলা কবিতায় তখনই বিদ্রোহী সুরের জোয়ার এসেছিল। এ যেন কৃষাণ বিদ্রোহ। সে-বিদ্রোহের সুর যেম্নি দিনেশ দাসের কবিতায় 'কাস্তে'র মারফৎ শোনা যাচ্ছিল, তেম্নি নজরুল-মানসিকতা-সম্পন্ন প্রবীণ অজয় ভট্টাচার্য্যের 'সৈনিক'-গ্রন্থে, কামাক্ষীপ্রসাদের 'মৈনাক সৈনিক হও' কবিতায় এবং আরো অন্যান্য অনেকের

সেনা-কাব্যে দ্বিতীয় যুদ্ধের পরিবেশে জমে উঠ্ছিল। কিন্তু যুগের এই আবেগ-প্রবণতাকে সমালোচনার নিক্তিতে তুলে কাব্য-রচনা করার কাজ সুধীন্দ্রনাথই প্রথম করলেন। পরে ১৯৪০-এ 'ছড়া'য় এ-কাজ রবীন্দ্রনাথও করেছেন। কোনো প্রবল আবেগে যখন যুগ-চেতনা উৎক্ষিপ্ত তখন তার ভালোমন্দ বিচারের শক্তি আবেগে-প্রবণ কবি-সম্প্রদায়ে থাকেন না। এ-শতকে দ্বিতীয়বার সামরিক যুগ এসে বাঙালীর আবেগ-প্রবণ চিত্তের যে ছবি দেখিয়ে চলেছিল তার স্রোতোমুখে যুক্তি বিচারের বাধা উপস্থিত করা ভালো কি মন্দ সে-বিচারও সেদিন হয়ত খুব বেশি কবিতা-পাঠক দেখাতে রাজি হননি।

পেছনের দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে আজ আমরা বল্‌তে পারি যে কবি নূতন কথা শোনান না। তিনি 'বাগ্-গেয়কার' বা বাগ্মী হলেও নূতন তথ্যে সমাজকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে এগিয়ে আসেন না। তিনি একটি যুগের বাঙ্ময় প্রতিনিধি মাত্র। যুগবৃক্ষ একটিই থাকে, তাকে উপলক্ষ্য করে অরণ্য তৈরী হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে যুগবৃক্ষ অপর কারো হবার সম্ভাবনা ছিলনা। তবে কলমের চারা হয়েছে, যেমন 'কবিতা' পত্রিকা। তেম্নি আরেকটি কলমের চারা তৈরী হ'ল 'নিরুক্ত' পত্রিকা। এমনধারা বৃক্ষ ও কলম ঐলিজাবেথীয় যুগের ইংরাজি সাহিত্যে দেখা গেছে—চারশ' বছর ব্যবধানে বিদেশী ঐলিজাবেথীয় যুগের চিত্র দু'রকম হলেও কবিতার গঠন-নক্সায় রকম-ফের আসেনি। তখন যদি 'উইলিয়মের গ্যালারি' বা সেক্সপীয়র যুগ-বৃক্ষ হয়ে থাকেন, তাহলে ঈটস্-এলিঅটের 'সেল্টোইটালিক গ্যালারি' এখনকার ইংল্যাণ্ডের সাহিত্য-যুগ বৃক্ষ। ডিলান টমাস সে-বৃক্ষেরই কলমের চারা হয়েছিলেন। বাংলা কবিতায় আশ্চর্য্য-ভাবে ইংরেজি-সাহিত্যের নমুনায় ভাবভঙ্গীর উদয়াস্ত হয়েছে ষোড়শ-শতক থেকে বিশ-শতক পর্য্যন্ত। যেম্নি মাগন-ঠাকুরের দল পূববাংলায় তেম্নি রবিঠাকুরের দল পশ্চিমবঙ্গে। রাজাদের সাহিত্য-নির্ম্মাণ-কর্ম্ম রাজ-পুরুষরা হাতে নিয়েছেন চারশ' বছর আগে। তবে মুঘল আমলে রাজঅন্তঃপুরিকারাও কাব্য-রচনা করেছেন। এলিজাবেথ বা মেরী ল্যাটিনিটির ভক্ত পাঠিকা ছিলেন মাত্র, নূরজাহান বা জেবুন্নিসার মতো কবিতা রচনা করেন নি। মুসলমান কবিরাজপুরুষরা বাংলা কবিতার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন যেম্নি রোসাঙ্গ-রাজত্বে, তেম্নি ইংরেজ-রাজত্বে। শুধু নজরুল ইসলামের নামই ইংরেজ-রাজ্যে উচ্চার্য্য নয় এ-প্রসঙ্গে, জসীমুদ্দিনের নামও স্মরণীয়। জসীমুদ্দিন যেন রোসাঙ্গ-সভা থেকে উঠে এসেছিলেন বিশ-শতকে।

একেই বলে রেনার্শাস। সংস্কৃতির নিঃশ্বাসটা ছড়িয়ে যাওয়া। ঘরোয়ানা বিত্তার মতো শিল্পচর্চ্চা কারো একার সম্পত্তি হয়ে তখন থাকতে চায়না। একে বণিক যুগই বলি আর গণতন্ত্রই আখ্যা দিই, সভ্যতা যুগে-যুগে শিল্পক্ষেত্রে এই প্রবণতা এনে দেয়। সভ্যতা যতো বেশি প্রবীণ হয়ে চলেছে, শিল্প প্রবণতা ততোবেশি ব্যাপ্তিতে সমাজের শরীরে ছড়িয়ে

পড়ছে। কিন্তু ছড়িয়ে পড়াটাই যে সুলক্ষণ, তা নয়—স-বিচারে ছড়িয়ে পড়ছে কি না তা-ই ভেবে দেখবার। তারি জন্যে রিফর্ম্মেশন আন্দোলন। অতীতের বিচার।

এ সমস্ত লক্ষণ অকর্ম্মণ্যতার অবসানের জন্যেই সমাজ দেহে প্রকাশিত হয়। বাঙালী কবিদের চতুর্ম্মুখ-কোলাহল রিফর্ম্মেশনের আলোতে উদ্ভাসিত ও শান্ত হয়ে আসতনা, রবীন্দ্রনাথ-বৃক্ষের যদি পতন না হত। রিফর্ম্মেশনের পক্ষপাতী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আজ্ঞাই যেন তখন 'পূর্ব্বাশা' এবং 'নিরুক্ত' পত্রিকা বহন করিতে উদ্‌গ্রাব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ্ঞার হেতুত্ব বিচার করে তার ব্যঞ্জনা দেওয়া আগে থেকেই সুরু হয়ে গিয়েছিল কোনো কোনো কবি-চিত্তে।

ইংল্যাণ্ডের ধ্রুপদী রেনের্শাস রিফর্ম্মেশনের আলোতে টমাস-মিড্‌লটনের হাতে যে 'রোরিং গার্ল' তৈরী করেছিল, তাঁকে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'য় দেখেছি। এ-ধরনের বীরাঙ্গনা উরিপিদিস নামক গ্রীক নাট্যকারের কল্পনায় এসেছিল প্রথম এবং সংস্কৃত মহাভারতের দ্রৌপদী-চরিত্র 'রোরিং-গার্লে'র অভিমানটুকুসহ বর্ত্তমানা ছিলেন মৌর্য্যোত্তর ভারতে। মিড্‌লটন ভাবতে পেরেছিলেন, হয়ত এলিজাবেথকে দেখেই, এমন একটি মহিলাকে যিনি বল্‌ছেন: "I that am of your blood was taken from you for your better health".

আত্মশ্লাঘার কথা এ নয়—বাইবেলের আদমহবার বা ভারতীয় রাধাকৃষ্ণের জীবন-মথিত অমৃতসমান বস্তুও এ নয়, আপন অকর্ম্মণ্যতায় উত্যক্ত হয়ে সুতমিতরমণীসমাজ থেকে যে নারী চেঁচিয়ে উঠ্‌তে পারেন: "সাহং কেশগ্রহং প্রাপ্তা পরিক্লিষ্টা সভাং গতা" সেই পরিকেলেসের নারীকে ভজনা করবার বৃত্তি যেমন ষোড়শ-শতকের ইংল্যাণ্ডে ছিল, তেম্নি হিন্দুভারতে ছিল। এ-নারী দেবদাসী হয়েছেন, নটী হয়েছেন, বুদ্ধ জননী হয়েছেন ভারতে। বাংলায় থেরী, অবধূতী. বৈষ্ণবী হয়েছেন। রজকিনী রামী হয়ে বলেছেন:

তুমি দিবাভাগে লীলা অনুরাগে
ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ না দেখিয়া দুখ
পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে।

এই দয়াশীলাই বলতে পারেন মিড্‌লটনের নারীর কথা সরোষে। কিন্তু নেহাৎ-ই রঙ্গরসে নিমজ্জিতা বলে রামী প্রাচ্য-বাংলার ব্যালেডের নারী হতে পারেননি।

রিফর্ম্মেশনটা সামাজিক কোষ-গ্রন্থিরসের কারুকার্য্য। সব রকম সমাজে একই মেজাজে এ-রস প্রবাহিত হয়না। শরৎচন্দ্র রাঢ়াঞ্চলের বহু নারী ও রমণী চরিত্র কল্পনায়

এনেছিলেন, তাঁরা বাস্তব হলেও রিফর্ম্মেশন-জ্যোতি বিকীর্ণ করেছে কেবল অবাঙালী 'কমল'। শরৎচন্দ্রের সংস্কারাচ্ছন্ন মন বৈষ্ণবী আবেগে অন্ধকার ছিল। উনিশ-শতকের প্রকৃত নারীর আত্মা উন্মোচিত হয়েছে একমাত্র রবীন্দ্রনাথে। শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্রগুলো অকর্ম্মণ্য। অকর্ম্মণ্যতা থেকে গাত্রোত্থান করতে পারেনি কল্লোল-যুগের নারী চরিত্রগুলোও।

শরৎচন্দ্র 'চিত্রাঙ্গদা' নির্ম্মাণ করিতে গিয়ে ঘরে-বাইরে যে ভাঙ্গা মূর্ত্তিগুলো পেয়েছেন, তাদের দিয়ে প্রতিমা নির্ম্মাণ করে বাঙালী চিত্তে তুফান এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর থেকেই নারী-নির্ম্মাণ-কলাশাস্ত্রে ভাটার টান পড়ে যায়। সমাজের দোষে তা হয়নি, শিল্পীদের দৃষ্টির দোষেই তা হয়েছে। কিন্তু মন্বন্তরে ও যুদ্ধে নারীত্বের ও মাতৃত্বের অপমান যাঁরা চক্ষু মেলে পান করেছেন, তাঁরা 'পরশুরামের কুঠারে'র মতো গল্পও লিখেছেন অথবা কবিতার পংক্তি সাজিয়েছেন এই ধরনের কথায়ঃ

"কত তন্বীর অশ্রুতে ছিল মুক্তা
মৃগ-নয়নের মৃগ-তৃষ্ণিকাকীর্ণ,
রক্তের ক্ষুধা অশ্রুতে লবণাক্ত
দেহ-মন্দিরে অবশেষে দেয় অর্ঘ্য।" (পৃথিবী-'প্রেম')

যেমি প্রকৃত রণাঙ্গনে তেমি অপ্রাকৃত রঙ্গের রণাঙ্গনে নারীজাতির দুর্দ্দশার চরম ঘটিয়েছে যুদ্ধ। ফুলের গান তখন 'পূর্ব্বাশা'র কানে ভালো শোনায়নি বলে 'পরিচয়ে'র সম্পাদকীয় বামপন্থা পূর্ব্বাশাকে 'নাৎসী' আখ্যা দিয়েছিল।

'যুগের মর্ম্মকে অস্বীকার করে নয়, তাকে নিজস্ব নূতন ব্যঞ্জনা দেওয়া'র যে ধ্রুপদী রেনেশাঁসের কাজ তা-ই 'পূর্ব্বাশা' এবং 'নিরুক্ত' কর্ত্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। অতীত রণের যেটুকু শ্বাস ও শাঁস বর্ত্তমানে এসে রূপায়িত হচ্ছে তাকে গ্রহন করে মূর্চ্ছিত করবার অভিপ্রায় জাগ্রত থাকে সামজচেতন শিল্পী মনে। অতীত জাতিতত্ত্ব, সংস্কৃতির সমন্বয় ও বিরোধ যাঁদের মনে পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট নয়—শুধু বর্ত্তমান ছাড়া অগ্রপশ্চাতের সব দৃশ্য যাঁদের দৃষ্টিতে বিলুপ্ত, তাঁরা না পারেন শিল্পী হতে, না শিল্পবোদ্ধা হতে। অতীত যাঁদের নিকট ব্যঙ্গের বস্তু, ব্যঞ্জনার বস্তু নয়, তাঁদের শ্রেণীর নাম সভ্যতার অভিধানে নেই।

যুদ্ধের প্রথম মাসে নাৎসী-বিরোধী একটি সংখ্যা প্রকাশ করে কয়েক বৎসরের জন্যে 'পূর্ব্বাশা' অপ্রকাশিত থাকে। বেন-জনসন রিফর্ম্মেশনের আওতায় যে-চিত্তে বলেছিলেনঃ Light, I salute thee, but with wounded nerves···তেমন চিত্তভার বহন করেই আমরা সেদিন বলেছিলামঃ

"বাতাসে পেয়েছি মৃদু সুরভিত শেফালিকা-স্বাদ,
আমরা কি বুঝি কোথা পৃথিবীর আদি আর্ত্তনাদ!" (১৯৩৯-সেপ্টেম্বর)

কিন্তু একা 'পূর্ব্বাশা'র বাক্ রুদ্ধ হয়ে গেলেই কি স্তম্ভিত হবে বাংলাদেশ? সেই বাংলার ছবি রবীন্দ্রনাথের 'ছড়া'র দু'টি পংক্তিতে এ-রকমঃ

"সিন্ধুপারে মৃত্যুনাটে চলছে নাচানাচি,
বাংলাদেশের তেঁতুলবনে চৌকিদারের হাঁচি।" (১৯৪০-১৫ মে)

সামরিক কাণ্ডে কিন্তু সমর সেন তখনও অবতীর্ণ হননি, তিনি চতুরঙ্গে 'কাণাকড়ি'র ছক পেতেছেন তখনঃ

"কয়েকটি শেষ খোঁয়াড়ের কড়ি গুণে
ছিন্নভিন্ন সময়ের জালে
বন্যার জলে মাছ ধরা।" (চতুরঙ্গ—১৯৩৯, সেপ্টেম্বর)

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ এই সময় সেনের উপর অত্যন্ত আস্থা চাপিয়ে দিয়ে, তাঁকে বন্যা-দুর্দ্দশায় ফেলে দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসু যুদ্ধের প্রথম মাসে তাঁর 'সমস্যা' কবিতাটি প্রকাশিত করেন। কোন্ পথ অবলম্বন করবেন, এ-সমস্যায় তখন তাঁর চিত্ত দোলায়িত।

কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ সম্ভ্রান্ত স্পেন্সারের মতো 'নিরুক্তে' যখন তাঁর 'শর্ব্বরী' কবিতাটি লিখলেন তখন সুধীব্যক্তিমাত্রেরই চিত্তাকাশে ইতিহাসের ঋতু-নৈঋতিরূপ প্রতিভাসিত হল। যেন এ-কবিতা লিখবার আগে তিান স্পেন্সারের মতো এ-কথাগুলোও উচ্চারণ করে নিয়েছিলেনঃ

"So oft as I with state of present time
The image of the antique world compare."

এবং মিশর-সভ্যতা থেকে সুরু করে বর্ত্তমার নাগরিক জীবনের উত্থান-পতন ও স্থিতির কথা ভেবে তিনি শেষ পংক্তিতে বলেছিলেনঃ "দুঃস্বপ্নের বিপর্য্যয়ে নিশি জাগে শুধু অন্ধ হানি"। শরু-গণ ঋতুদেবতার স্তুতি এভাবে শেষ হল।

স্পৃষ্টতই নৈঋতির শোক এবং করুণরস উত্থিত হয়েছে 'শর্ব্বরী' থেকে। স্পেন্সারের পৃথিবীতে "first blossome of faire vertue bare" ছিল। কিন্তু আমাদের নগর-পল্লী তা অপচয় করেছে। রবীন্দ্রনাথ-ও হয়ত সে-সুঘ্রাণ পেয়ে তাঁর বৃক্ষে সুরভিত ফুলশয্যা তৈরী করতে পেরেছেন কিন্তু আমাদের স্বকীয় উপলব্ধিতে সে-সুঘ্রাণ আসেনি। সৌন্দর্য্যের যেন অপঘাত-মৃত্যু হয়েছে, এই অনুভব বহন করে ত্রিশের অন্তিম বছরগুলোতেই আমরা বিষণ্ণ হয়ে পড়েছি। ফলে এই আক্ষেপঃ

"আমরা পাইনি এসে পৃথিবীর প্রথম যৌবন
আকাশে হারিয়ে গেছে কতো কথা তরুণ তারার
কতো নীল অন্ধকার, ম্লান কতো সূর্য্যের স্বপন,
জ্যোৎস্নায় জাগর রাত, রাতেরো তা মনে নেই আর।" (পৃথিবী)

বস্তুত দুই যুদ্ধের বাহুপাশে যাঁদের জন্ম-জীবন-যৌবন কাটতে চলেছিল, তাঁরা অতীতে তাকিয়ে স্বভাবতই সৌন্দর্য্যের অপঘাত-মৃত্যুর ছবি দেখবেন। ম্যাথু আর্নল্ডের ভঙ্গীতে তখন জীবন-বিচার করতে গেলে আমরা দেখতে পেতাম :

"...this iron time
Of doubts, disputes, distractions, fears."

সেই গ্রীসীয় হিংস্র-উন্মাদনায় 'জেসন'-বৃত্তিতে মুক্তির সন্ধান পেলেন একমাত্র সুধীন্দ্রনাথ। সন্ধানলব্ধ মুক্তা 'রমণীর দয়া'—কিন্তু তেমন দয়াময়ী নারী তৈরীর পথ বনেদী বামপন্থা রুদ্ধ করে চল্‌ছিল। আমরা আজ অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পারি যে চল্লিশের যুগের কবিচিত্তের প্রধান 'গায়েন' ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ।

বনেদী বামপন্থা প্রেমকে স্বপ্নসম্ভব জেনে বাস্তব যাত্রা সুরু করেছিল। যেমন শ্রীবিষ্ণু দে এ-দলে, তেম্নি শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়। প্রেমহীনতার ধ্বনি শোনালেন সুভাষ প্রেমকে ফুল-খেলার সামিল ভেবে। তাঁর বক্তব্যে প্রচ্ছন্নতা ছিলনা। তিনি স্পষ্ট-ভাবে বললেন :

"প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখী আমরা
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাট ফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।"

রীতিমত পুষ্পবর্গে বৌদ্ধ পরাক্রম—Iron time-এর 'fear' থেকে যা জাগ্রত। রূঢ়ভাষী সুভাষ ত্রিশের দ্বান্দ্বিক দশকের স্বাভাবিক পরিণতি। যেমন উপনিষদের পরিণতি নারী-বিদ্বেষী গৌতম বুদ্ধ, তেম্নি বামপন্থার সাহিত্য-রূপের শেষ রূঢ়তা সুভাষের প্রতিফলিত। এ-ও 'ম্যান অব সেন্সিবিলিটি' বা রোমান্টিক কবির একটি তির্য্যক মনোভঙ্গী। তার পর সুকান্ত বা বিমলচন্দ্র ঘোষ আমাদের চিত্তে বিশেষ নবীন মনে হয় না। 'ক্ষুদিত জাগুয়ার যেন এপ্রিলের বসন্ত আজ' (সমর সেন) কিম্বা 'শহরের বসন্ত ঘোরে বুইক বেঞ্জ বেলিলার চাকায়' (পৃথিবী') পর্য্যন্ত সম্ভবত সজীব মৃদুতার সামান্ত ছিল, কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'সেই সীমান্ত এমনই অনিশ্চিত' (অরুণ মিত্র) ভাবলেন যে 'শ্রদ্ধানন্দ পার্কে' 'মহাজনী খতে' 'ইতিহাসের অর্থনীতিতে' লাল-উল্কিতে সৈনিক সেজে ফিরতে লাগ্‌লেন। অবশ্য সমাজের মনে

তখন বামপন্থা 'উজ্জ্বল উষার ঠিকানা' ('ঘরে-বাইরে'—পদাতিক) দিতে সুরু করেছিল খুব ত্বরিতবেগে। উষা মানবী ছিলেন এবং বেদের যুগে যে 'প্রিমিটিভ কম্যুনিজ্‌ম্' আমাদের দেশে ছিল, হয়ত তারই ঐতিহ্য-বশে বাম-শিবিরে সৈন্যসংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছিল। আজ অসঙ্কোচে বলা যায় : সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে আদ্যোপান্ত সদন্তঃকরণের পরিচয় দিয়েছেন, অন্য অনেক সৈন্যই সে-পরিচয় অম্লান রাখতে পারেন নি। তার বহুবিধ কারণের মধ্যে একটি কারণ হল এই যে হৃদয়বৃত্তিকে নষ্ট করা অনেকের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনের দিনে এবং 'মন্বন্তর'-এর লঙ্গরখানার যুগে।

সুধীন্দ্রনাথ 'কুইট ইণ্ডিয়া'র পর ১৯৪৫-এ 'সোহংবাদ'-সনেটটি লিখে আপন আত্মার কর্ত্তৃত্ব ঘোষণা করেন। আত্মা মানে আত্মস্বরূপ বা সত্তা। সর্ব্বাস্তিবাদ যদি বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের পরের ধাপ হয় তাহলে তার প্রতি ধাবমানতা ঔপনিষদীয় এবং ভারতীয় ঐতিহ্য। অন্তত চল্লিশের দশকের শেষভাগে স্বাধীন ভারতের আবহাওয়ায় সর্ব্বাস্তিবাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ছিল। সমগ্র জীবনকে যদি আমরা কোনো দার্শনিক দৃষ্টিতে অবলোকন করে যাচাই করতে চাই তাহলে অকপটে বলতে হবে যে জীবনের সত্তা দু'টি স্রোতে অনুভূত। একটি অপরিচ্ছন্ন এবং অপরটি পরিচ্ছন্ন। পঞ্চেন্দ্রিয়-লব্ধ অভিজ্ঞতা অপরিচ্ছন্ন হতে থাকে অন্তঃকরণ সক্রিয় না হলে। অন্তঃকরণ পরিচ্ছন্নতা দান করবার চেষ্টা করে। এই দানটুকুই সৃষ্টি। অন্তঃকরণ বহুবিধ অভিজ্ঞতা থেকে কোন্ বিশেষ বস্তুকে পছন্দ করে পরিচ্ছন্ন করতে থাকবে তা যখন জানবার উপায় নেই তখন কবি বা শিল্পী সোহংবাদে যেতে বাধ্য হন। তিনি আপন আত্মদর্শনে বা নিজের মনোদর্পণে অভিজ্ঞতাগুলোর কার্য্যকলাপ দেখে একটা পরিচ্ছন্ন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা পেতে ইচ্ছা করেন। অভিজ্ঞা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে তিনি তা যখন ব্যক্ত করতে যান, তখনই তাতে সৃষ্টির আমেজ আসে। Fixation কথাটি শিল্পের ক্ষেত্রে জরুরী। যে-অভিজ্ঞতা সহজে Fixated হয়, মানে, মনোক্ষেত্রে যে-ধ্বজদণ্ড সহজে সুপ্রোথিত হয়, যে-ভাবটি অতি দ্রুত লয়ে এবং অবলীলায় অন্তঃকরণ-যন্ত্রে পরিশ্রুতি পায়, তারই শিল্পকারিতা বেশি। প্রেম তেম্নি একটি ভাব। অন্তত সাহিত্য-শিল্পীরা এই ভাবটিকে সব চাইতে বেশি রূপায়িত করেছেন। কিন্তু চল্লিশের দশকে প্রেম ছাড়াও অন্যান্য ভাব কবিচিত্তে চৈত্য-ধ্বজছত্র হবার উপক্রম দেখিয়েছে।

'কবিতা'-পত্রিকা কিম্বা নব-প্রতিষ্ঠিত 'নিরুক্ত' প্রেমব্যতিরিক্ত অন্যান্য অভিজ্ঞতার পরিচ্ছন্ন রূপ-প্রাপ্তির পথ খোলা রেখেছিল। কিন্তু এক দক্ষিণপন্থী জীবনানন্দ দাশ ছাড়া প্রেম-পরিত্যাগী বামপন্থী কেউ তেমন কোনো অভিজ্ঞতার পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়গ্রাহ্য মূর্ত্তি স্থাপিত করেন নি। তাঁর কবিতায় তখন মৌলিক ও কৌলিক স্বাদ এই কারণেই

বেশি অনুভূত হয়েছে। তিনি তাঁর বিনম্র বিশ্বাসের কলেবর তৈরী করেছেন। তা ইতিহাস-চেতনাই হোক, আর ভূতত্ত্বই হোক, কিম্বা ভুখালোকই হোক, কাব্যের পোষাকে তা প্রীতিধারার মতোই রূপ-স্বপ্নময়। ১৯৪৫-এ সুধীন্দ্রনাথ প্রেমে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছেন। ফ্রেঞ্চ কবির প্রভাবে তাঁর লাতিন-চিত্ত দিব্যভাবাপন্ন ছিল : Dont l'un m'est doux. l'autre plein de rudesse—আলোকিত আর রুদ্র ছিল প্রেমের দ্বৈত-চক্ষু ও দৃষ্টি এবং তার অনুভবেই অমরত্ব-চেতনায় তিনি উদ্বোধিত হয়েছিলেন। 'অর্কেষ্ট্রা'র অভিজ্ঞতা বা প্রেমের সপ্তপদস্মৃতি সুধীন্দ্রনাথ পূর্ব্বে নিবেদন করেছেন। এসময়ে জার্ম্মাণ হাইনে-অবলম্বনে প্রেমের কালো খবর সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছিলেন। অতঃপর যুদ্ধান্তে তিনি 'সোহংবাদে' নিশ্চয়ই বলতে পারেন : 'নিখিল নাস্তির মৌনে সোহংবাদ করেছি ধ্বনিত'। বৌদ্ধ শূন্যতা নিয়ে ব্যক্তিমন, কাব্যমন, সমাজমন বাঁচতে পারে না, যদিও প্রজ্ঞাবান জানেন যে শূন্যতাই শেষ-পরিণতি। ব্যক্তি-কর্ত্তৃত্ব বা পুরুষকার নামক একটি মানবীয় মনো-তরঙ্গ প্রেমের সামিল করে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় সম্প্রতি স্থাপন করতে উন্মুখ। সজীব মূর্ত্তিস্থাপনই কাব্য-সৃষ্টি।

'সোহংবাদ' (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য) চল্লিশের দশকের দান নয়, তবু রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা যখন অনায়াসেই সোহংবাদ দান করতে পারে—আমরা কাব্য-ক্ষেত্রে তাকে তখনই সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাই। অবশ্য নিরুক্ত-সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র বৃটিশ সম্রাটের যুগেই আত্ম-প্রতিকৃতিতে সম্রাট-লক্ষণ অনুভব করেছেন এবং নিরুক্তের প্রথম বর্ষের শেষ-সংখ্যায় 'জয়'-কবিতায় মনোভঙ্গীটি সুস্পষ্ট করেছেন 'উর্দ্ধশ্বাস রূপান্তর' বলে। মৃত্যু-চেতনা মনে বহন করেও বিদ্রোহী-ভঙ্গী থেকে যে তিনি পৃথক, তা-ও এ-কবিতায় ব্যঞ্জিত হয়েছে। কিন্তু প্রেমেন্দ্র-মিত্রের সম্রাট-লক্ষণাক্রান্ত কবিতা তরুণ চিত্তে যে আলোড়ন এনে আত্ম-সচেতন রাজচক্র তৈরী করেছিল সে-কালে, তার-দৌরাত্ম্য এখনও বিদূরিত নয়। আমার মনে হয়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাম্রাজ্যবাদ তখন একটি মাত্র কবিতায় তির্য্যকভঙ্গীতে কাব্যগত সার্থকতা লাভ করেছে—তখনকার তরুণতম কবি শ্রীঅমল দত্ত 'তুমি' কবিতাটিতে 'অহং'-বাদকে যে তির্য্যক-গতিসম্পন্ন করেছেন তা সত্যি উপভোগ্য। তির্য্যক-বিন্দুটি এ-রকম :

হায় প্রিয়া,
জেনো এই মৃত্যু অহঙ্কার :
আমার জীবন দিয়ে তোমার সম্ভার।

কবিতার রাধা-রস এখানে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মনোগত রসের বাম দিকে বাহিত। কবি-কর্ম্মে বামপন্থা বা শিশুত্ব এমন হলেই মানায়। 'নিরুক্তে'র প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় তরুণ কবি শ্রীমনীন্দ্র রায় এই ধরনের একটি চমৎকার কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর

লক্ষ্য ছিল জীবনানন্দের কাব্যাদর্শ যা রূপকল্পে বিমূর্ত্ত হয়ে যাচ্ছিল। একটি তীর ছুঁড়ে তিনি যেন জীবনানন্দের 'নারী' বা 'রমণী'কে সৎ ও পরিচিত পরিবেশে নিয়ে এলেন। চন্দ্রাবলীটি এমন :

কুড়ি বছরের কপালে চিন্তারেখা :
শীতের সকালে কুয়াশায় ভেজা যেন মাকড়সাজাল।
কুড়ি বছরের যৌবন যেন বালবিধবার সাজ।
মাটি খুঁড়ে দেখ' আছে নাকি তার লেখা
হৃদয়ে প্রেমের স্তূপীকৃত কঙ্কাল।
বোলতার মত ক্ষীণকটি মেয়ে। পুরানো বইয়ের মত
সান্ধ্যনেত্রা : মেরুপ্রান্তিক চাঁদের হলদে সাজ।

এই বাংলার মেয়ে রূপকল্পের ভূষণেও সেদিনের একটি অত্যন্ত বাস্তব সত্তা। রূপকল্প এখানে নবীন অথচ উৎকট নয়। রূপকল্পের নবীনতা যদি কাব্য প্রতিভা নিরূপিত করে তাহলে শ্রীমনীন্দ্র রায় ১৯৪২-সনের প্রতিভাস্ফুরিত কবি। কিন্তু কাব্য-প্রতিভা বস্তুত রূপকল্পে সর্ব্বত্র রসের সন্নিকর্ষ লাভ করতে পারেনা। পারেনা, পাঠক-চিত্তে রূপ-কল্পের উৎসমুখ কোথায় তা অজ্ঞাত বলে। পরিচিত পরিবেশ থেকে যদি কাব্যের এসব অলঙ্কার তৈরী হয়ে না আসে তাহলেই পাঠক কবিকে দুর্ব্বোধ্য আখ্যা দেন। জীবনানন্দ ঠিক তেমন দুর্ব্বোধ্য কবি। এজ্রা-পাউণ্ডও দুর্ব্বোধ্য হয়েছেন এবং এলিঅটও দুর্ব্বোধ্য ছিলেন একই কারণে। কবির শক্তি দশদিকে প্রসারিত—এনিয়ে 'দিসপুট' চলেনা। পাঠক যদি দশ বল বা দশভূজ কবিকে উপভোগ করতে চান তাহলে তেমন ভক্ত-পুরোহিতই তাঁদের হতে হবে।

যুদ্ধের অবসানে অনেকেই ব্রিটিশের 'বেতার-কেন্দ্র' থেকে শান্তির ও স্বস্তির কবিতা পাঠ করেছেন—মিছিল বার করেছেন কিন্তু হয়ত কোনো কোনো কবি একান্তে বসে ভেবেছেন : এ-যুদ্ধ কার, জয়-পরাজয় কার আর কার হ'ল ক্ষয়-ক্ষতি। অন্তত আমাদের মনে পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের ছড়ার ছন্দ ধ্বনি :

"ঘুলিয়ে গিয়েছে তার বেবাক খবর
জানিনে তো কে যে কারে দিচ্ছে কবর॥"

যাঁদের তা মনে পড়েছে তারা ভেবেছেন : যুবক মানুষ জীবিত কেন এবং বিজয়ী কিসের জন্য ? 'জুবইহ মাণসু কেন উবিজ্জই ?' কিসের এই উজ্জীবন ? তারপর বাংলার পক্ষে প্রেম-হীন স্বাধীনতা-প্রভাত এলো।

১৯৪৫-এ সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়াতে 'নিরুক্ত' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় এবং 'পূর্ব্বাশা' পুনঃ-প্রকাশিত হতে শুরু করে স্বাধীনতার প্রাক্কালে। নিরুক্তের সর্ব্বশেষ সংখ্যায় 'এ-যুগের কবিতা' প্রবন্ধে আমরা তখনকার কাব্য-বিচার করতে গিয়ে বলেছিলাম:

"......আজকের দিনের বাংলা কবিতার বাঁচাকে অস্বাভাবিক না বলে উপায় নেই! তার কারণ, পাঠকের ঔৎসুক্যে নয়, কবিদের অপরাজেয় উৎসাহেই কবিতা আজ বেঁচে থাকবার প্রয়াস দেখাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আধুনিক বাংলা কবিতায় এমন একজন কবির অন্তত সন্ধান পাওয়া যাবে যিনি কবিতাকে সাহিত্য-সৃষ্টির বাহন রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চান; যুগের মননের ও হৃদয়ের প্রত্যেকটি তরঙ্গকে যিনি কবিতার ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করছেন।......"

বলা বাহুল্য যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব-সমাকুল জীবনানন্দ সম্পর্কেই এই উক্তি ছিল তখন আমাদের।

তারপর দাঙ্গা ও স্বাধীনতার ঊষাকালে পূর্ব্বাশায় শ্রীঅজিত দত্ত 'সোহং বাদ'-ব্যতিরেকে শোনালেন কবির অন্য চরিত্র-কথা:

"কেমন করে কী সৌভাগ্যে জানি
সবারই দান সবারই ঋণ পেলাম অনেকখানি
হৃদয়ভরা সে-ঐশ্বর্য মুহূর্ত্তে ফুৎকারে
বিলিয়ে দিলাম সবার দ্বারে দ্বারে।" (দেনদার)

বাংলাদেশের 'ভাঙা ঘরের গান'-কবিতায় আমরা সে-সংখ্যাতেই লিখেছিলাম:

"আমাদের ভাঙা ঘরে, ভাঙা মাঠে, আকাশের আনাচে-কানাচে
মনের অনেক ছায়া
ছায়ার মতন বেঁচে আছে।
জীবনের ছোট ছোট রোদ নিয়ে ছবি আঁকে এখনো সময়,
চকিতে চোখের মায়া
হৃদয়ের আশেপাশে বুঝি জেগে রয়।" (১৩৫৪)

'নিরুক্তে'র উদ্যোক্তা ও প্রধান সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্রও তখন 'ফেরারী ফৌজে'র সন্ধানে বেরিয়েছিলেন, যারা তাঁকে বালক-বয়েসে রাজা হারুণঅল রসিদ বানিয়ে তরুণ বয়েসে 'সম্রাটে'র আসনে বসিয়েছিল। সেই ফেরারী ফৌজ প্রেমানুভূতি। বুদ্ধদেব বসু

যে একই আত্মস্থতায় প্রেম অনুভব করেছেন এবং জীবনানন্দ দাশ যে 'সাতটি তারার তিমিরে' ভিন্ন আলোর রেখা-বিন্দু সন্ধান করেছেন তা আমরা পূর্ব্বাশার পৃষ্ঠায় (১৩৫৫ সাল) আলোচনা করেছি। অচিন্ত্যকুমারের 'নীল-আকাশ'-এর একটি বৃহৎ অংশও 'নিরুক্তে'র পৃষ্ঠায় রচিত। মোটের উপর, চল্লিশের দশক রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের জয়যাত্রার যুগ। সে যাত্রায় বিচিত্রের মেলা—নবীন কে, প্রবীণ বা কে নয়, তা যেন বোঝা মুস্কিল ছিল। প্রেমের সুর এবং অপ্রেমের বেসুর ১৯৪৫-এর 'নিরুক্তে' কবিদের চিত্তে সমান জায়গা পেয়েছে। 'কবিতা'র যোগ্যতম তরুণ-কবি অশোকবিজয় রাহা ও বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহসঙ্গী বহু তরুণ কবি-ও নিরুক্তে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তবে শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য, আবুল হোসেন এবং শ্রীঅশোক মিত্র 'নিরুক্তে'র পৃষ্ঠায় জীবনকে দ্বন্দ্বহীন, অন্ধকার-বিমুক্ত ভাবতে পারেননি জীবনানন্দের উত্তর-সাধনা মনে বহন করে'। কিন্তু শ্রীনরেন্দ্র মিত্র, শ্রীনীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীনরেশ গুহ তখন মনোরম রূপকল্পে প্রেম কাব্য-ধর্ম্ম প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন।

আমি ব্যক্তিগতভাবে দশবছর আগেকার 'নিরুক্তে'র একটি কবিকে এখন বিশেষভাবে স্মরণ করেছি, যিনি ত্রিশের দশকে 'পূর্ব্বাশা'য় এই পংক্তিদ্বয় লিখেছিলেন:

"জাগিয়ে রেখোনা তারে ঘুম যার আঁখির পাতায়
বলিতে বলিতে কথা যে-ঘুম কাতুরে মেয়ে কথা ভুলে যায়।"

তিনি আসাম-বাসী কবি প্রজেশকুমার রায়। 'নিরুক্তে'র ঘুম-কাতর দিনে কথা-ভুলে-যাওয়া মেয়ের কথা ভুলে তিনি যে 'বাসর' কবিতাটি লিখেছিলেন তার চারটি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি। উত্তরণকাম্যিতার উৎসমুখ এখানে দেখা যাবে:

"নক্ষত্রমেয়েরা জাগে
আমাদের সঙ্গেই বাসর
ঘুম নাই তন্দ্রা নাই
লক্ষ আঁখি যামিনী জাগর।"

সাতটি তারার তিমিরের স্বপ্নময় জাগরণ তার মুখ দেখিয়েছে শ্রীপ্রজেশ রায়ের বিস্মৃত লেখনী-মুখে প্রেম-রাজ্যে মানবিক পরিক্রমার অন্তে। কিন্তু প্রেম পরাক্রম ফিরে আসছিল ত্রিশের দশকের মতোই আবার স্বাধীনতার অবতরণ মুহূর্ত্তে। এবং ১৩৫২-আষাঢ় 'নিরুক্তে'র শেষ-সংখ্যায় 'রাত্রিশেষের কাব্য'-কবিতায় আমরা বলেছিলাম:

"এখন যে কোন দিন দেখা যাবে প্রভাতের প্রপাত আকাশে,
আকাশে জলের মতো আলো
মাটিতে আলোর মতো জল!
এ-দিন অনেক দূরে ছিল
যখন ছিলাম আমি প্রভাতের মতন উজ্জ্বল।"

এমন পেছন-তাকানো চিত্তেই সম্ভবত অপ্রেম ও প্রেমের বিষণ্ণ ছবির শোভাযাত্রা চলে। শুভযাত্রার চিত্রই তাকে হতে হবে, এমন কোনো সড়কী আইনের রাজ্যে অন্তত কবিরা বাসিন্দে হতে চাননা। জাতীয় স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের কোনো ক.ব ভাবতে পারেন নি (অবশ্য তখনকার শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কে স্বতন্ত্র কিম্বদন্তী আছে) যে কবিচিত্তের অকপট চিত্র-প্রদর্শনের পথে কোনো অন্তরায় আছে।

কোনো সময়কে অবাস্তব ও বাস্তব ভাবার বা বানিয়ে নেবার কর্ত্তা কবির মন। কবির হৃদয় বলে' মনের থেকে আলাদা কিছু আছে কি না জানিনে। মন হারিয়ে যায় বিষাদে, নৈরাশ্যে, উন্মত্ততায়; আবার তা ফিরে আসে হর্ষে, আশায়, স্থৈর্য্যে। এই চাঞ্চল্যকর অবস্থায় কবির মন যেতে বাধ্য। অবস্থা বিপরীত হয়েই তরঙ্গায়িত করে মন। দ্বৈতবাদ বা দ্বৈধভাব বড়ো চমৎকার-ভাবে বসবাস করে কবি-মনে সব সময়; সর্ব্ব কালে, সর্ব্বদেশে। কালজড়িত মনই হৃদয়ের চেহারা দেখায়, দেখায় মননের ছবি। সুতরাং যে নাস্তিবাদ শোনাচ্ছেন বুদ্ধদেব তাঁর কবিতায়, তা চিরস্থায়ী নয় বলে আমরা মনে করব। মনে করব যেহেতু '৪৬ সনে তিনি লিখেছিলেন 'বাসা-ভাঙার গানে' হীরক-চোখের আশার কথা এবং 'ভাঙা-ঘরের গানে' আমিও দাঙ্গার সময়ে ('৪৬ সনে) আশার ছবি আঁকতে চেয়েছি। সে-আশা ভঙ্গই যে কবির জীবনের সব স্বপ্ন ভগ্নদশায় আন্‌বে তা এখনও মনে করতে পারিনে আমি। বুদ্ধদেব চল্লিশের বছরগুলোতে যে নৈরাশ্যে ও শূন্যবাদে হারিয়ে যাচ্ছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ সে-সময়ে অকল্পিত গাত্রোত্থান দেখিয়েছেন। 'নাস্তিপ্রত্যাখ্যাত হয়ে' 'আকাশদুহিতা' যে 'গূঢ় দৈববাণী রূপে' ফিরতে পারে সে-ঘোষণা সজোরে তিনি ১৯৪১-এ 'বিপ্রলাপ' কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। তাই তিনি চল্লিশের বছরগুলোর নেতৃস্থানীয় বাগ্মী ও স্মরণীয় কবি।

স্বপ্ন ভাঙা

টমাস মান : অনুবাদক : তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

আমি স্বীকার করছি যে এই অদ্ভুত লোকটির সাথে কথাবার্তা বলে ভীষণভাবে আশ্চর্য হোয়েছিলুম। আমি ভয় করছি ঐ ভদ্রলোকের কথা তখন আমায় যে ভাবে নাড়া দিয়েছিলো সেই অনুভূতি আপনাদের ভিতর আনতে পারবো কিনা। অতি সত্য কথা যে, সেই ভদ্রলোকের অকুণ্ঠ সারল্য ও বন্ধুগত মনও সেই পরিবেশ-সৃষ্টির একমাত্র কারণ ছিল।

প্রায় মাস দু'এক আগে এক শরৎকালের বিকেলে আমি প্রথম এই ভদ্রলোককে মার্কো-ডি-মাস পিয়াৎজায় দেখতে পাই। মাত্র অল্প কয়েকজন ভিনদেশীই সেখানে ছিল। কিন্তু সেই প্রশস্ত পার্কটিতে সবচেয়ে বেশী ভিড় একজায়গায়-ই গুলজার করছিল, যেখানে নরম ধূসর নীল আকাশের নীচে অত্যুজ্জ্বল আলোর রোশনাই-মাখানো একটি দামী, মূল্যবান বস্তু দাঁড় করানো ছিল। আর ঠিক মাঝখানকার প্রবেশ-পথের মুখোমুখি একটি তরুণী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক ঝাঁক পায়রার দিকে শস্যের দানা ছিটিয়ে দিচ্ছিল। আর এই জন্যে চারদিক থেকে আরো পায়রার সারি সেইদিকে উড়ে উড়ে নাবছিল। যেন একটা তুলনাহীন আনন্দ ও উৎসব দৃশ্য।

আমি এই ভদ্রলোককে এইখানেই দেখেছিলুম। এবং আমার লিখবার সময়ও তার সমস্ত কিছু আমার চোখের সামনে ঘুরছে। সেই মাঝামাঝি ধরনের উচ্চতা, কুব্জ দেহ, হাঁটার সময়ে হাত দু'খানা পেছনে রেখে একটি ছড়ি ধরে সতেজ পদক্ষেপ—সব কিছু, স্পষ্ট। তিনি অতি-সাধারণ একটি কালো টুপি পরতেন, গায়ে গরমের হাল্কা ওভারকোট আর ধূসর রংএর ডোরাকাটা ট্রাউজার। তাঁকে দেখে ত্রিশ বছরের মত মনে হয়—আবার পঞ্চাশ বছর বল্লেও ভুল হয় না। দাড়িগোঁফ কামানো মুখের ওপর চাপা নাক আর ক্লান্ত ছাইছাই রংএর চোখ। ঠোঁটের দু'ধারে অনবরত যেন একটি বর্ণনাতীত সারল্যের হাসি খেলে খেলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কিছুটা সময় পরপর তিনি যেন তাঁর চতুর্দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি বুলোতে থাকেন, তারপর সেই দৃষ্টি মাটীর দিকে নেমে আসার পর নিজের মনে-মনেই কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করে মাথাটা একটু ঝাঁকি দেন, তারপর হাসতে থাকেন। আর এইভাবে এই পার্কের চতুর্দিকে তারপর দৃঢ়ভাবে মার্চ করার ভংগীতে প্রদক্ষিণ করেন।

এই প্রথম দিনের পর তাঁকে প্রত্যেকদিনই দেখতুম। এবং এছাড়া আর যেন তাঁর দ্বিতীয় কিছু করারও ছিল না। যেন যে-কোন ভাল কিম্বা মন্দ দিনে এই পার্কে তাঁর এই

অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে একাকী ত্রিশ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশবার পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করতে হ'বেই।

যে বিকেলের কথা আমি বলতে যাচ্ছি, সেদিন সৈনিকদল-কর্তৃক একটি কনসার্ট বাজছিলো। আমি পিয়াৎজার ভিতর একটি ফ্লোরিয়ান কাফের একটি ছোট টেবিলের ধারে বসেছিলুম। এবং যখন কনসার্ট বাজনা শেষ হ'লো, ভীড়ও আস্তে আস্তে পাতলা হো'য়ে এলো, আমার সেই আগন্তুক তাঁর সেই চিরপরিচিত নিস্পৃহ হাসি নিয়ে আমার পাশেই একটি খালি আসনে এসে বসলেন।

বিকেল হোয়ে আসছে। চারদিক এখন নিঝুম থেকে নিঝুমতর। চারপাশের টেবিলগুলো একে একে ফাঁকা হোয়ে আসছে। এই রাজকীয় পার্কে, যেখানে ভ্রমণার্থী বলতে কেউ নেই, এখন পূর্ণ নির্জনতা। মাথার ওপরে আকাশে উজ্জ্বল তারা, বড় আধখানা চাঁদ সানমার্কোর ধরে রাস্তার মুখোমুখি হোয়ে দাঁড়ানো একটি আশ্চর্য মসৃণ বাড়ীর ওপর ঝুলছে।

আমি আমার আগন্তুকের দিকে পেছন ফিরে পত্রিকা পড়ছিলুম, ইচ্ছা পার্কের সমস্ত অংশই তার চোখের সামনে বিরাজ করুক। আর এইভাবে আমি বসেও থাকতুম কিন্তু তাঁর কথা বলার শব্দ শুনে পিছন ফিরলুম।

—এই বুঝি আপনি প্রথম ভেনিসে এলেন? তিনি আমায় ভাংগা-ভাংগা ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন।

কিন্তু আমি আমার উত্তর ইংরেজীতে জানাতেই তিনি চমৎকার জার্মানভাষায় বলতে আরম্ভ করলেন, মৃদু কর্কশ স্বরে, যে স্বর বলতে বলতে আটকে যাবার জন্যে তিনি কেঁশে গলা পরিস্কার করে নিচ্ছেন।

—আপনি কি এইসব জিনিষ এই প্রথম দেখছেন? এবং যা দেখছেন তা আপনার মনের সাথে মিলে যাচ্ছে? এর পরেও আরো কিছু কথা কি আপনার মনে আসে না, যে সব ছবি আপনার দৃষ্ট জগতের চেয়েও সুন্দরতর? আর তা বোধগম্যও? আর এসব কথা আপনি কি সুখ ও ঈর্ষাউদ্দীপনের জন্যেও বলতে চাইবেন না?

বলে তিনি পেছনে হেলে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন, যে দৃষ্টির ভিতর চোখের পাতাদু'টো এক অবর্ণনীয় ও অদ্ভুত ভংগীতে বারবার উপর নীচ হচ্ছে।

এবং এই অবস্থায় কিছুক্ষণ চলে যাবার পর পর্যন্তও আমি এই একক কথাবার্তার ভিতর কি করতে পারি বুঝতে পারছিলুম না। আবার আমি তাঁকে এড়িয়ে যেতে চাইছিলুম কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনি তাড়াতাড়ি আবার আমার দিকে ঝুঁকে বসলেন।

—আপনি বোঝেন নি আশাভংগজনিত মনের কি অবস্থা হয়? তিনি তাঁর হাত দু'টো ছড়ির ওপর রেখে যেন কোন প্রয়োজনায় কথা জানাবার ভংগীতে বলতে লাগলেন—ছোট ছোট কিংবা অপ্রয়োজনীয় ঘটনার সাথে মিল না খাওয়াতে পারার জন্যেই নয়, তারও চেয়ে বড় আর বিশেষ নৈরাশ্য যা সমস্ত জীবনময় স্তূপীকৃত হোয়ে আছে, সেই সব কি? না, তাও আপনি জানেন না। আমার যৌবনের প্রথম উন্মেষের সময় থেকেই আমি এই স্বাপ্নিক জগতের অনুভূতি পুষে পুষে এসেছি—আর এই জগৎ, আমার অস্বীকার করে লাভ নেই, আমায় নিসংগ, একক ও অখুসী করে রেখেছে।

—আপনি হয়তো হঠাৎ বুঝতে পারবেন না আমি কি বলতে চাইছি। কিন্তু আপনি যদি কয়েক মিনিট আমার কথা শুনতে পারেন, বুঝতে পারবেন। আর আমার এ কথা জানাতে গেলে, তা অল্প কথায় বলা যাবে, যেতে পারে।

—আমার কাহিনী আরম্ভ করতে গিয়ে প্রথমেই জানিয়ে রাখি, আমি ছোট্ট সহরের এক পাদ্রীর ঘরে মানুষ হোয়ে এসেছি। আমাদের বাড়ীর ভিতর সবসময় ঘড়ি ধরে চলার টিপটাপ ছিমছাম পরিচ্ছন্নতা আর করুণ আশাবাদ নিয়ে এক পণ্ডিতি আবহাওয়া ঘুরঘুর করতো। আমরা যেন এক অদ্ভুত আবহাওয়ার ভিতর নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস নিয়েছি, যে আবহাওয়া ধর্মপ্রচারকের বাগ্মীতার মত কোন জিনিষের ভালমন্দ নিয়ে বড় বড় কথা কিম্বা তার সৌন্দর্যের কারণ বিশ্লেষণ। আর এই সব আমি ঘৃণা করতে আরম্ভ করলুম, কারণ এসবই শেষে আমার বেদনার কারণ হোয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

—আর এইসব বড় বড় বুলির সমন্বয়ে আমার জীবন তৈরী হ'তে লাগলো। এইসব সীমাহীন অসার্থক ভাবালুতা ছাড়া অন্য কিছু জানতে শিখলুম না। মানুষের কাছ থেকে হয় আমি কোন স্বর্গীয় গুণ কিম্বা কোন লোমহর্ষক শয়তানী কামনা করেছি। জীবন থেকে হয় চিত্তবিমোহনকারী প্রেম অথবা বিধ্বংসকারী ভীতি আর এইসব চিন্তা নিয়ে উদগ্র বুঁদ হোয়ে থেকেছি। আরো বৃহত্তর সত্যের জন্যে এইসব গভীর যন্ত্রণাদায়ক উপলব্ধি—যে সুখ হয়তো মহিমায় উজ্জ্বল আর উন্মাদনায় অস্থির কিম্বা অকথিত স্বপ্নাতীত যন্ত্রণাও হ'তে পারে।

—আমি সেদিনের সেই কথা পরিস্কার বলতে পারি, মনের সেই সব যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতিকথা। আর তা যদি শোনেন বুঝতে পারবেন, এ কেবল কতগুলো পালিত আশার আশাহতজনিত বিষয় নয়, কেবলমাত্র দুর্ভাগ্যজনিত একটি ঘটনা। যখন আমার বয়স অল্প ছিল, আমাদের বাড়ীতে রাত্রিতে একদিন আগুন লেগে যায়। এই আগুন এক নিমিষে ছড়িয়ে পড়ে পড়ে আমার ঘরের দোর অবধি এসে গেছে, আর একটু পরেই সিঁড়িগুলো দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠবে। আমিই প্রথম এটা টের পেয়েছিলুম এবং এও

আমার মনে আছে সমস্ত বাড়ীময় 'আগুন! আগুন!' বলে চীৎকার ক'রে ছুটাছুটি করেছিলুম। আর এও জানতুম এই শব্দের অন্তরনিহিত কি ব্যাখ্যা আমার মনের ভিতর ছিল, যদিও তা আমার চেতন-মনে স্পষ্ট ছিল না, কিন্তু অবচেতনায় স্পষ্ট। 'এই হ'চ্ছে আগুন', আমি সেই সময় ভাবতে চেয়েছিলুম 'এবং এই আগুনই একটি ঘরকে পোড়াতে পারে। আর এই কি শেষ?'

—অস্তিত্বগত চিন্তায় এটা বিশেষ গুরুতর ছিল। সমস্ত বাড়ীখানা পুড়ে ছাই হ'লো, বাড়ীর লোক কোনরকমে রক্ষা পেয়ে গেলো আর আমার শরীরের কিছু কিছু যায়গা পুড়ে গেলো। এবং একথা জানালে ভুল হ'বে, আমার রংগীন কল্পনা আমাদের বাড়ী পোড়ার যে দৃশ্য চর্মচক্ষে দেখেছিলো তার চেয়েও খারাপতর কোন কিছু দৃশ্যের কথা কল্পনা করতে পারবে! তবুও একটি ঘটনার ভাসাভাসা সংগতিহীন ধারণা আরো ভীষণ ভয়ালরূপে আমার মনের ভিতর ঘুরে বেড়াতে লাগলো, আর যার সাথে তুলনামূলক বিচারে দৈনন্দিন অন্য সব ঘটনা মূল্যহীন। এই আগুন আমার জীবনের চরম দুর্ঘটনা ছিল, আমার ভয়জনিত কল্পনার একমাত্র বঞ্চনা।

—আপনার ভয় করার কারণ নেই, আমি আমার ব্যক্তিগত নৈরাশ্যের কাহিনী সবিস্তারে বলছি না। এটুকু বল্লেই বোধ হয় যথেষ্ট হ'বে, যে আমি আমার জীবনের সর্বোত্তম সময় হাজার হাজার বইএর বিষয়বস্তু এবং কবির কাব্যকে চেতনা দিয়ে জড়িয়ে রেখেছি। আর এটাকেই আমি তীব্রভাবে ঘৃণা করতুম, যে সব কবিরা প্রতি মনের অন্দর মহলে বড় বড় বুলির রেখাংকন করতে চেয়েছেন, কারণ তাঁদের নিজেদের কোন ক্ষমতা ছিলো না সেই সব আগ্নেয় অক্ষর আকাশের গায়ে খোদাই করে তুলতে পারে। আর তাঁদের এই সব বুলি আমার কাছে মনে হোতো মিথ্যা ও শঠতা, অন্য কিছু নয়।

—সৌন্দর্যবাদী কবিরা কথায় দীনতার কথা বলেন। 'আর কথা কত ক্ষুদ্র!' এইভাবে তাঁরা কবিতার গান শোনান। কিন্তু একটা বিষয়, কথা—আমার কাছে মনে হয়, সম্পদগৌরব, বিশেষ একটা গৌরবান্বিত রূপ, আর তা তখনি খুব বেশী করে চোখে পড়ে যখন আমাদের সীমিত বিষয় ও দারিদ্র্যের সাথে তুলনা করি। যন্ত্রণার একটা সীমা আছে, শারীরিক যন্ত্রণা বা মানসিক জড়তা ও অজ্ঞানতার ভিতর আনন্দের সাথে কোন ভিন্নতা নেই। সংযোগের জন্যে মানসিক প্রয়োজনীয়তা ধ্বনি তৈরীর জন্যে এমনই একটা উপায় বের করতে পেরেছে, যা এইসব সীমা থেকে উর্ধ্বে।

—আমার দোষ কি খুব বেশী ছিল? স্বতসিদ্ধ প্রজ্ঞানুভূতির উন্মোচনের জন্যে যে সব অনুভূতির কোন বাস্তব সত্য নেই, আমার মেরুদণ্ডের মজ্জায় মজ্জায় এই সকল শব্দ কি ছুটে বেড়ায় নি?

—আমি এই অদ্ভুত কাল্পনিক জীবনের ভিতর ঘুরে বেড়াতে লাগলুম এই আশায়, যে আমার জীবনে একটি অভিজ্ঞতাও আসবে যা আমার এই অত্যুচ্চ কল্পনার সাথে মিল পেতে পারে। ঈশ্বরের দয়া বলতে পারেন, আমি সেটা পাই নি। আমি পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছি। সবচেয়ে বেশী প্রশংসিত দৃশ্যাবলী দেখে—সেই সব শিল্পাংকন যার ওপর পরিমাপহীন কথার স্তুতি হোয়েছে আর এইসব দেখবার সময় আমি মনে মনে ভাবতুম—"এই সব সুন্দর, তবুও এই কি সব? এর চেয়ে আরো কিছু সুন্দর, আরও ভাল?"

—আমার বাস্তব সম্বন্ধে মোটেই অনুভূতি নেই, বোধ হয় এটাই আমার অসুবিধা ছিল। একদিন পৃথিবীর কোন এক যায়গায়, আমি পাহাড়ের ওপর একটি সংকীর্ণ পথের ধারে দাঁড়িয়েছিলুম, যে পথ নিঝুম, দু'দিকে ঋজুভাবে উন্নত নগ্ন পাথরের স্তূপ আর অনেক নীচে দিকপ্রকম্পিত ঝর্ণার স্রোত। আমি নীচের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগলুম—'যদি আমি এখান থেকে পড়ে যাই?' কিন্তু আমার মনে এর উত্তর কি ছিল তাও আমি জানতাম—যদি সেরকম ঘটে, পড়বার মুহূর্ত্তে তুমি নিজে নিজে বলতে থাকবে "তুমি পড়ে যাচ্ছো, সত্যি সত্যি পড়ে যাচ্ছো! কিন্তু তারপর?"

—আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারেন, আমি না বুঝে এইসব অভিজ্ঞতার কথা বলছি না। কয়েক বছর আগে আমি একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিলুম। শান্ত সুন্দর একটি মেয়ে আর যে মেয়ের মুখ মনের ভিতর পুরে রাখবো এটাই আমার আনন্দ। কিন্তু সে আমাকে ভালবাসেনি, আর এটাই আশ্চর্য্য ছিল না যখন সে আর একজনকে বিয়ে করলে। এর থেকে অন্য অভিজ্ঞতা আর কি বেদনাদায়ক হতে পারে? এই ব্যর্থ লালসার ঝুনো যন্ত্রণার চেয়ে আরো সাংঘাতিক পীড়াদায়ক কোন উপলব্ধি কি আছে? বহু রাত এই অবস্থায় আমি নির্জ্জন অবস্থায় কাটিয়েছি। তবুও সেইসব কথা আমার চিন্তায় বেশী যন্ত্রণাদায়ক ছিল—"এটাই হচ্ছে বৃহত্তম কষ্ট যা আমি ভোগ করছি। কিন্তু এর পর এর চেয়ে আরো কি কষ্টদায়ক হতে পারে কিম্বা আছে?"

—আমি কি আপনাকে আমার সুখের কথাও কিছু বলবো? যেমন আমার ভিতর নৈরাশ্যও আছে, তেমনি সুখকর কিছু ঘটনাও। কিন্তু সেইসব বলার বোধ হয় কোন প্রয়োজন নেই। কারণ কতগুলো শুকনো উদাহরণ জড়ো করে আমার জীবনের যে স্বাভাবিক অবস্থা তা তুলে ধরতে পারবো না। জীবনের এই বোবা, নিরানন্দ সাধারণ গতি—যা শুধু আমার ব্যর্থতা এনেছে, নৈরাশ্য ও হতাশা।

—মানুষ কি? এই কথা ওয়েরদার বলতো—মানুষ, সে কি সেই মহিমময় অর্দ্ধ-ঈশ্বর? যখন মানুষ কোন জিনিষকে খুব বেশী ক'রে পেতে চায় সেই সময়-ই কি তার

ক্ষমতা তাকে ব্যর্থতায় পৌছে দেয়? যতই সে আনন্দে উত্তুংগ হোয়ে উঠুক কিম্বা যন্ত্রণায় ডুবে মরুক—যে মুহূর্তে অসীমতার পূর্ণতার ভিতর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে খুঁজে দেখতে চাইছে সেই মুহূর্তে কি তাকে সেই শূন্য হিমচেতনায় ফিরিয়ে এনে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে না?

—কোন এক সময় যখন আমি সমুদ্রের দিকে প্রথম তাকাতুম আমার দিনের কথা মনে হ'তো। সমুদ্রের বিশালতা, তার বিস্তৃতি—আমার চোখে শুধু এ প্রান্তর থেকে ও প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতো এবং মুক্তির বাতাস নিতে চাইতো। কিন্তু সেখানে দিকচক্রবাল, দিঙ্মণ্ডল আছে। কেন এই দিঙ্মণ্ডল যখন আমি জীবনের ভিতর অসীমতা চেয়েছি, কেন এই দিঙ্মণ্ডল?

—আমার এই দিগদর্শন হয়তো অন্যান্য মানুষের চেয়ে সংকীর্ণ হ'তে পারে। আমি আগেই জানিয়েছি আমার বাস্তবানুভূতি কম, বোধ হয় আমি খুব বেশী পেতে চেয়েছি বলে। কিম্বা অল্পেই নিজের পূর্ণতা পেয়েছি, না হয় অতি অল্পেই আমার সর্বনাশী স্তর পেয়েছি। আনন্দ ও দুঃখের সংমিশ্রিত রূপের সাথেই কি আমি জ্ঞাত?

—আমি এটা বিশ্বাস করি না, আর সবচেয়ে কম বিশ্বাস করি তাদের, যাদের জীবনের আদর্শ কবিদের বড় বড় বুলির ভিতর নিজেদের মূলের সন্ধান পেয়ে দাঁড় করাতে চেয়েছে, কবিদের সেইসব কথা নিয়ে যা মিথ্যা ও মানসিক নীচতার লক্ষণ। আর এটাও আপনি লক্ষ্য করেছেন, এমন সব লোকও আছে যারা দাম্ভিক, আনন্দে অতি মত্ত আর অন্যের ওপর ঈর্ষান্বিত। আর এইসব লোক এমন ভান করে যেন তারা গভীর সুখের স্বাদ পেয়েছেন, কিন্তু তারা কি কোন গভীর দুঃখের কোন যন্ত্রণাই পান নি?

—এখন অন্ধকার হোয়ে আসছে আর আমার অনেক কথাই আপনি শুনতে চান নি। এজন্যে আমি অনায়াসে এই স্বীকারোক্তি করতে পারি যে, আমি এইসব লোকের মত হ'তে বহু চেষ্টা করেছি। আমার নিজের ও অন্যের কাছে যে আমি সুখী, এ কথা আমি দেখাতে চেয়েছি। কয়েক বছর হয় আমার দেমাকের এই বুদবুদ কুটি'কুটি হোয়ে ফেটে গেছে। এখন আমি একা, অখুসী, বেখাপ্পা—একথা অস্বীকার করে কোন লাভ নেই।

—এখন রাত্রিতে আকাশের তারা দেখা-ই আমার প্রিয় কাজ, আমার এই জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকাই সবচেয়ে ভাল উপায়। আর হয়তো এইজন্যে কি আমি ক্ষমা পেতে পারি যে এখনো আমি সেই সুদূরের পিয়াসী হোয়ে নিজেকে আঁকড়ে ধরে আছি? আমি কি একটা মুক্ত জীবনের স্বপ্ন দেখছি যেখানে আমার প্রিয় সম্ভাবনার বাস্তবতা এই স্বপ্নজগতের যন্ত্রণাদায়ক সময় ছাড়া প্রকাশিত হ'তে পারে? সেই জীবন, যার তেপান্তে সীমান্তের কোন হাতছানি নেই?

—আমি এও স্বপ্ন দেখেছি ও মৃত্যুর জন্যে দিন গুনছি। আমি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছি যে, মৃত্যু এই হতাশার শেষ পরিণতি। আর আমি সেই অন্তিম মুহূর্তে মনে মনে বলতে থাকবো—"এটাই হ'চ্ছে চরম অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই মৃত্যু, তারপর? এই সব শেষের পর আরো কি?"

—কিন্তু এখন পিয়াৎজার ভিতর ঠাণ্ডা লাগছে, এটা আমি এখনো বুঝতে পারি! হাহাহা! যদি কিছু মনে না করেন রাত্রির অভিবাদন জানিয়ে আমি উঠলুম।*

* 'Disillusionment'-এর গল্পের অনুবাদ।

"আমি তোমার সঙ্গে একমত যদি রোমান্টিক বলতে তুমি অনুভূতির উষ্ণতা বোঝাও। আজকাল যান্ত্রিক বুদ্ধিজীবিতার দাসত্বে গিয়ে সঙ্গীত সে-উষ্ণতা বর্জ্জন করেছে। সম্ভবত এ-ও একরকম আত্ম-বঞ্চনা। জটিলের ঋজু পরিস্রুতি বলতে যা আমরা বুঝি তা আসলে প্রাণবত্তার ও অনুভবশক্তির পুনরুদ্ধার।" 'ডক্টর ফস্টাস'।

॥ টম্যাস মান ॥

কবিতাগুচ্ছ

ব্যর্থ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তুমি কথা বলো, তুমি গান করো, আমি
শুধু পাই যন্ত্রণা
তোমার শরীরে বর্ণবাহার
অথচ আমি যে পাইনে একটু কণা ;
নীল যৌবন আকাশে হারাবে, তাই বুঝি এই
চুপি চুপি দিন রাত্রির মন্ত্রণা ।

অন্ধঝড়ের পাখার ঝাপটে এই যৌবন
বর্তমানেই সঁপে দেবে মন ?
দুঃখ বাজাবে, পরাভূত হবে
জানবে না তার দৃষ্টি অতীত কি যে গৌরবে
মুক্তি মূল্যে মগ্ন সুদূর প্রতীক্ষা পণ !

জানে কি পৃথিবী এ ষড়যন্ত্রে তুমি
মৃত্যু না-হোক, দেবেই আত্মদান
ব্যথার শিহরে সারা অরণ্যভূমি
উন্মাদ হয়ে গাইবে ঝড়ের গান !

তুমি কথা বলো, তুমি গান করো, আমি
শুধু পাই যন্ত্রণা
তুমি রয়ে গেলে রূপের আড়ালে
হৃদয়ে পেলেনা একটু আলোর কণা ।
নীল যৌবন আকাশে হারালো, তাই বুঝি এই
চুপি চুপি দিন রাত্রির মন্ত্রণা ।

সুরসঙ্গতি

শান্তিকুমার ঘোষ

তিন ধাপ কালো মেঘ উঠে গেছে ক্রমে—
গাছের ত্রিভুজ সব চুপ চাপ স্থির ঃ
গির্জার ক্রুশে শুধু তিনটে পাখির
মূর্ছিত কথাকলি—সন্ধ্যা তখন ।

*

দ্রুতগামী মেলে এসে দূরযানী মন
মুখের ডৌলে শেষে পায় এক নীড়,
রাজকীয় গ্রীবা তুলে এমুর মতন
নিয়ে চলে নদীবন গভীর-গভীর !

*

দেখে চূর্ণজলস্রোত বাঁধ ভাঙে রোষে—
অতিকায় বৃষ-মেঘ পড়ে গেল ধ্বসে !

দ্বৈত

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অবসন্ন কোনদিন দিগন্তের রক্তমুখে চাহি
মনে হয় তুমি আমি কত শতাব্দীর পণ্যবাহী,
উচ্চমুখ উটের মতোন ; আমাদের ফাটা খুরে খুরে
নিয়ত হাঁটার ফোস্কা । লুব্ধ, ঘৃণ্য প্রচারের সুরে
সময়ের বুকে নেই চিরস্থায়ী পায়ের স্বাক্ষর,
শিবিরের সাক্ষ্য নেই ; বৃষ্টি নেই । শুধু মরু-ঝড়
আঁধির উদ্বেগে পথ মুছে নিয়ে কাছে আর দূরে,
বাতাসে কান্নার গানে কেবল বলেছে—"নাহি নাহি ।"

তবু ভাবি সব তার মলিনতা এ হীরক হৃদয়ের কাছে
পায়নিক কোন প্রেম, বসন্ত-সবুজ তবু পেয়েছে প্রত্যাশা
খুঁজে বোশেখের বাজেপোড়া কোনো গাছে ।

মনের কামনা তবু উষা আর রাত্রির তিমির
আবার ফেলেছে ধুয়ে ; সূর্যের প্রতিজ্ঞা ফের এঁকে
গেছে দিকচক্রবালে।
জাহাজ উদ্দাম আর অকস্মাৎ ছেড়ে গেছে বন্দরের পরিচিত ন।ড়।
আশার সোনালী খড় মুখে নিয়ে পাখী এসে বসে গেছে মরা আমডালে।
দুমুঠো সৃষ্টির গান ঢেলে গেছে উপবাসী হৃদয়ের কানে।
ভাষা যার জীবনের অন্যনাম ; সমুদ্রের মতো
যার চিরদিন এক সুগভীর মানে
স্নেহের শিশিরে ভেজা মৃত্যুঞ্জয় প্রভাতের পাছে,
আলোর উৎসব ঘিরে কেবল বলেছে—"আছে আছে।"

স্বর্ণ মৃগ

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

যখন-হৃদয় মন দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় জ্বলে,
পাণ্ডুর স্বেদাক্ত ক্লান্তি—এ-মুমূর্ষু দিনের বল্কলে
বাঁধেনা, হয়না শান্ত তৃষ্ণার্ত্ত নিষ্পিষ্ট ক্ষত বুক
চন্দন প্রলেপ চেয়ে—বন্ধনেও মনে হয় সুখ,
তখন তোমাকে ভাবি। দুচোখে আশার জ্যোৎস্না ঝরে।
রাতের সময় গুণি হৃদয়ের ঘড়িটির স্বরে।
তুমি নও কল্পনার মোনালিসা, অথবা উর্বশী—
সাগর-সম্ভবা কন্যা,—একান্তই আমার মানসী।

মায়া-প্রদীপের আলো—জীবনের বসন্ত রঙিন
উবে যায় উবে যায়, উপেক্ষায় ঝরে ব্যর্থ দিন।
বাস্তব আঘাত হানে। বৃষ্টিহীন মাঠের মতন
এবুকেও জ্বলে আলো, বুঝিনা সে আলেয়ার মন।
কোথায় হরিণ-ছায়া! প্রান্তরের পত্রহীন গাছে
কুয়াশায় ভেজে কাক ; মনে ভাবি, তুমি আছো কাছে।
প্রতারণা করে শুধু জীবনের মায়াবী প্রহর ;
তুমি আছো, আমি আছি মাঝে ধু ধু মরু বালুচর।

শীতকে

বংশীধারী দাস

সন্ধ্যা যদি দিগ্বধুর গোধূলিরাঙা হাসি
ছিনিয়ে নেয়, ছড়িয়ে দেয় আকাশ জুড়ে ছায়া,
শীতের ষড়যন্ত্র আনে ধূসর হিম হাওয়া
এ জীবনে, শীতের বনে ঝরায় লাখো পাতা
লাখো আশার, লাখো সবুজ আশ্বাসের, আনে
শীর্ণ রেখা, ধূসর রং, জীর্ণ মন, তবু,
শুনবো আমি শুনবো তার
শিশির-ভেজা হাওয়ার স্বর।

আলোকলতা বাসনা যদি হারায় তার পথ
ভ্রূকুটিভরা অন্ধকারে, হঠাৎ-আলো যদি
হাঁপিয়ে ওঠে কালের এই রোমশ কালো হাতে,
জীবন ঘিরে বন্ধ্যা এক বৃত্ত আঁকে যদি
কুয়াসা, আর শীতের রাত তুষার-ঝরা পথে
শয্যা পাতে এ হৃদয়ের, বুকের কাছে তবু,
শুনবো আমি শুনবো তার
শিশির-ভেজা হাওয়ার স্বর।

অপরূপ

প্রমিত বসু

কচি মুখে তার ভোর জমে আছে
নীল চোখে ঝরে শীত—
আলো ফোয়ারার স্নান সেরে তার
নাচে প্রাণ উদ্ভিদ্ ;
ফাগুনের রোদে এলো বুঝি মায়া
ছায়ার শাড়িটি পরে
আকাশের লাল দুই গালে তার
প্রবাল দুপুরে ঝরে,
ফুলের মতন শরীরে তাহার
কাঁদে হৃদয়ের রোদ
বলো তো কপোত, তাকে দেখলেই
জাগে কেন প্রেম-বোধ ?

লেখক

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ক্রমাগত লিখে যাওয়া : মগজের-মাঠ চষে চষে
কথার-ফসল শুধু ক্রমাগত ফলিয়ে ফলিয়ে
পাতায় উজাড় করা ! চেয়ারে ত্রিভংগ হয়ে বসে
শুধু লেখা আর লেখা, সময়ের ধূপ জ্বেলে দিয়ে !

একদিন ছিল নেশা : (একরাশ কথার-কলাপে
স্বপ্ন-মগ্ন হ'য়ে থাকা !) আজ বুঝি হল তাই পেশা ;
হয়ত গভীর রাত : ক্লান্তিতে চোখের পাতা কাঁপে,
গাঁথ্‌তে হবেই তবু বাস্তবেও কল্পনায় মেশা

অজস্র কথার মালা ! লিখতে হবেই তবু তাকে :
রাগ-অনুরাগ-প্রেম, জীবনের তল্পিতল্পা ঘেঁটে
যেখানে যা কিছু পাবে তুলে এনে তাই ঝাঁকে ঝাঁকে
করতে হবেই সৃষ্টি, শ্রান্তি হীন রাত্রি দিন খেটে,

কথার-কল্পনা তাকে এঁকে যেতে হবে রোজ রোজ
ভরাতে মাসিকপত্র, সাময়িকী, খবরের কাগজ ॥

সতীর্থা

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

পাতা ঝরে দূর বনে উত্তরফাল্গুনে ;
রুদ্ধদ্বার বন্ধঘরে একা মনোলীনা
স্বরচিত স্বপ্ন দেখে, দুঃখ পায় শুনে
হয় না হবে না কিছু যতই জ্বলি না ।

ব্যথাই কথার কথা । বিসদৃশ লাগে
আকাশের ইচ্ছা আর এখানের সীমা,
দুরারোগ্য সংক্রামক অস্থিরতা জাগে—
পাণ্ডুর আভাসে মৃত মৌন অরুণিমা !

তা হলে ঘনিষ্ঠ হই কার কাছে বলো
উথাল পাথাল নীল বিষের সাগরে,
দূর পথে হেঁটে যেতে সামান্য সম্বলও
ফুরোবে কদিনে ঠিক রঙিন সফরে ;
তবে, শান্ত অনুষঙ্গ বিরল ছায়ায়
তুমি হয়ো, ধরা দিও মুখের মায়ায় ।

নিরুক্ত

শুভ্রাংশু ঘোষ

মঞ্জুষাকে বার বার প্রশ্ন করে মেলেনি উত্তর,—
জীবনকে ভেঙে গড়ে কি আনন্দ পেয়েছে ; দুর্মর
প্রাণের গহনে কত অবগাহনের রাঙা রঙ্‌,
কালের দেউলে রোজ আরতির ঘণ্টা ঢঙ্‌ ঢঙ্‌ ।

সোনার সকাল বেলা, প্রজাপতি হলুদ রোদ্দুরে
ছুঁয়ে ছুঁয়ে নুয়ে গেছে না-বাজা অবাক্‌ সুরে সুরে,
সবুজ ঘাসের শিষে, অপরাজিতার নীলিমায়
জীবনের সব স্বর্গ ডাক দেয় যেন ইশারায় ।

স্বপ্নকে স্মৃতিকে নিয়ে একাকার আতুর প্রহরে
কার জ্বালা সন্ধ্যাদীপে ছায়া-ছায়া আলো-দোলা ঘরে
পাখীর পালক-ঘুমে ভারি চোখ, আধোচেনা কথা,
এক মুঠো শেফালির নেশা-নীল শেষ নীরবতা ॥

অন্তরাল-ছায়া

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

মৃত্যুর মুকুরে তার ছায়া পড়ে, সঙ্গোপন ছায়া ।
যখন দুর্জ্জয় প্রেমে অহংকৃত আলোর গরিমা
কনক-সূর্য্যের মত জ্বলে ওঠে আকাংক্ষার মেঘে
তার চোখে রাখে স্বর্ণ, জ্যোতির্লেখা অমৃত্যু-মহিমা—
অন্তরালে কার মুখ ?— শোকমগ্ন দিনান্তের মায়া !
মৃত্যুর মুকুরে তার ছায়া পড়ে, সঙ্গোপন ছায়া ।

প্রেমের দুর্ব্বল চোখে কী-আশ্চর্য্য আপাত-অমর
তার স্নিগ্ধ প্রিয়তম স্বর্ণ-চূড়া আকাশিনী আলো

রাত্রির শরীরে মিশে একদিন ছায়াবৃত হিমে
শুধু হবে অন্ধকার—দুঃখহীন হৃদয়ের কালো।
প্রকৃতির শরাঘাতে, সময়ের রৌদ্রে পুড়ে পুড়ে
সে হবে মৃত্যুর মুখ—সংস্কারের চেনা দিয়ে আঁকা
হৃদয়ের যাদু ঘরে ধুলি ম্লান ছায়ার পুতুল,
প্রণয়ের পুণ্য হবে করুণার কান্না দিয়ে ঢাকা।

মৃত্যুর মুকুরে তার ছায়া পড়ে, সঙ্গোপন ছায়া :
চোখে তার শোকমগ্ন প্রাকৃতিক দিনান্তের মায়া!

সূর্য্য-সম্মোহ

কবিতা সিংহ

সূর্য্য তোমার ঘড়ি কত বলে? জানিনা বেলা
সময় হয়েছে নেইত খেয়াল, সিণ্ডারেলা—
তীব্র-মধুর এত রদ্দুর দিয়েছে হানা
এত তাপে আর বিবশ শরীরে তাপ লাগেনা।
রদ্দুর যেন বাঁধ ভাঙা ঢেউ অংগে নামে,
আলোর কীটাণু খেলা করে যায় ডাইনে বামে,

শরীর ছাড়িয়ে সোজা সোমরস ঢুকেছে মনে
চুঁয়ে পড়ছে ত' উষ্ণ রৌদ্র অন্ধকোণে,
কিছু যেন আর ভালো লাগেনা এ রৌদ্র ছাড়া
বহুক্ষণ হলো ছেড়েছি বুঝি সে অফিস-পাড়া।
সূর্য্য তোমার মেয়াদ ছাপালো গেল সে বেলা,
সময় গিয়েছে, খেয়াল হয়নি, সিণ্ডারেলা।

অনামিকা রায়

শ্যামল দাস

কী-নিবিড় একখানি স্মরণীয় নাম
কাত্‌রী নদীর জলে কুড়িয়ে পেলাম।
কুড়িয়ে পেলাম।
পেয়ে, আস্তে ছুঁলাম।
ছুঁয়ে, ঘন-স্মৃতি কাশ-দ্বীপে উঠলাম জেগে।

উঠে, ছোট ছোট নীল-নুড়ি কুড়িয়ে নিলাম।
নিয়ে, ছড়িয়ে দিলাম মেঘে।
দিয়ে, মাছরাঙা-পাখীদের ডেকে বললাম :
এই আবছা-নিওন-নীল নির্জ্জন দ্বীপ
এখানে জ্বালতে পারি একটি প্রদীপ?
মাছরাঙা-পাখীদের উত্তর নেই।
স্মরণীয় নামটি কী? শুধালাম যেই—
উড়ে গেল উত্তর ছড়িয়ে ডানায় :
স্মরণীয় এই নাম—অনামিকা রায়॥

অন্তরালেখ্য

সত্যেন্দ্র আচার্য্য

কেমন করে ভুলতে পারি বল্‌গো সখি বল্
রাত্রি কেন ঘুম রাখেনা চোখে,
জ্বলতে কি আর পারব আমি, চোখ যে ছলছল্
তন্দ্রা তবে জ্বলুক একক জ্বলুক আকুল শোকে।
জ্বলুক আকুল শোকে॥

তন্দ্রা তো তাই আকুল করা শোকে
আদিম আশা অধরে নেয় তুলে
কেমন করে ভুলব সখি বল্‌না ভুলি তোকে
তন্দ্রা গেল কোন সুদূরে কোন্ সে নাগর খেলার ছলে ছুঁলে?
খেলার ছলে ছুঁলে?

আমি তো তাই একান্ত নির্জনে
আকাশে চাই—আলোর মালা জ্বলে,
তোর সে দ্যুতি ভাবনা রাখে মনে,
অকপটে মনের পাষাণ অঝোরে যায় গলে।
অঝোরে যায় গলে॥

কেমন করে ভুলতে পারি বল্‌গো সখি বল্
রাত্রি কেন ঘুম রাখেনা চোখে,
জ্বলতে কী আর পারব আমি, চোখ যে ছলছল্,
তন্দ্রা তবে জ্বলুক একক জ্বলুক আকুল শোকে।
জ্বলুক আকুল শোকে॥

জন্মদিনের চিঠি

(সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য-কে)

অমল দত্ত

এ জন্মের হারে গাঁথা মরণ-বাঁচন দিনগুলি,
অ-বোঝ আশার ঠেলাগাড়ি ঠেলে নিয়ে যায় তুলি—
ভালো লাগে পলাশের হাত, ধুলি, চাঁপার অঙ্গুলি !

হৃদপিণ্ড পাত্রভরা যত ব্যথা মুঞ্জরিয়া যায়,
আকাশ তারার পটে মহত্তরো খুঁজিছে কুলায়,—
আমার পাখীর মন সঞ্চরণ এক জিজ্ঞাসায়—

তবু দিনগত পাপক্ষয়, ক্ষুন্নিবৃত্তি, অবসাদ,
ইন্দ্রিয়ের কণ্ডুয়ন, বক্ষের কোরকে লোনাস্বাদ,
বাঁধাধরা বুলি আর কার্য্যাঞ্চাগে লাভ ক্ষতি খাদ—

প্রত্যহের হাহাকারে। দিবারাত্র দিগচক্রযানে
আহ্নিক-বার্ষিক গতি, সুর্য্যরতি, ভবিতব্যে টানে,—
রঙে রঙে রঙছুট বিজ্ঞানের ভাবানুসন্ধানে !

কী দিলাম জীবনেরে ? জন্মদিন এসে ফের ডাকে,
প্রথম দিনের কান্না—চুনিপান্না ভুলতে আমাকে।

সন্ধি-বিগ্রহ-শান্তি-চিত্র

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

[এক]

একটি করুণ ডাক কন্যার মতন
পেছনে ফেলে কি আমি অগস্ত্যের পণ
ভেঙে ভেঙে ডাকি অন্য নদীকে আবার ?
যেন এক সমর-আরাব
পরিত্যাগ করে চলে অমরতা-ভাব
অপর রণের নিতে সৈনাপত্য-ভার।

বৈশাখের সন্ধ্যা চৈত্রে মিতালি পাতায়।
আবীরের গুচ্ছে কৃষ্ণচূড়া-শাখা পাতা ফেলে আজ
দাঁড়িয়েছে গলিপথে, পীচে-ঢালা কালো-ও তাতায়
কোনো উষ্ণ উঁচু বুক, পথিক নিলাজ।

তা যেন হলুদ রাধাচূড়া বা বেগনি চন্দ্রাবলী ;
ফুল—শুধু ফুলে পরিতোষ পায় কোমল সময় ;
আমি সমরের মোহে অমান্ত পক্ষের সুর্য্যোদয়
না কি রাকা চাঁদ আজও মনে-মনে বলি।

[দুই]

খুবই সহজ কথা : সমর-মরণ।
তা-ও যে বোঝনা তাই এতো লিপি লেখা !
স্মরণের সমীরণ মনে বঁধু কাঁদে একা-একা,
অশ্রু মুছে সুরু করে চতুর লড়াই ;
দেবদৈত্য বনে যায় মন,
ব্যথা ভুলে যাই।

বিস্মরণী সরণির মতো শুধু অতল-ইঙ্গিত।
ফলত উষ্ণ কি শীত
কী কব, থাকিনি দিনরাত্রির আগুনে।
তাই প্রাক-বিচরণ শুনে
নেই প্রেমে মৃতের শবণ।

মনে প্রেম প্রমা নয়, সমর-প্রতিমা—
স্বাহায় সমিধে দেয় সমাধার সীমা
অনেক প্রাঞ্জল, জানিতে তা
প্রেতা হবে কি না অভিপ্রেতা।
হবে যে সে আশা নেই বলে,
শর ছুঁড়ি শর্ব্বরীর মলয়-হিল্লোলে।

[তিন]

তোমার সে রূপ আমি হারিয়ে ফেলেছি।
ফেলে হেরে অমাবস্য পরুষের স্বপ্নে মাতোয়ারা
শরীরে ঢেলেছি
যে বিষ বিষের মতো, তুমি লেশমাত্র কি পাবেনা
তার বেদনার জ্বালা, পেয়ে কি দেবেনা মৃদু সাড়া
মন্থর নিনাদ বিনা, যদিবা এখন কোনো সেনা-
সুমিত্রার পাথরের মুখ পান করি ?

আমি আজ সম্মুখের রেখা-পাতে ধরি
পানপাত্র তা-ই স্বচ্ছ পাখা মেলে তীর,
বৃত্তাকারে পরভৃতিকারা হয় তাতেই মদির।
দমিত সদয় নয় মারক দয়িত,
দয়াহীন কুৎসাগাত্র করবে ক্ষয়িত
বজ্রনিভ এই পণ তার।

তুমি নিতে পারো কিন্তু তূণীর-সম্ভার,
মনোনীতা, তোমাতেই পাই
আমার লাঞ্ছনাগুণ, পদচিহ্ন—ঠাঁই॥

[চার]

এ যেন আরেক সূর্য্য রূপোর মতন অপরূপ
চৈত্রের উষার আগে বিনাশের বেদীপাশে যূপ
ইশারায় চোখ টিপে বৈশ্বানর-মৈত্রী-লালসায়।
আদি নিশা হয়ত বা নিদ্রাঘোরে তোমাকেও পায়,
তোমার স্বাহার ঠোঁটে আমিও দেখছি এই ভোর,
আমার চিত্রা কি তুমি? রাকানারী, অজস্র আলোর
কণাগ্নি আকাশ-কোণে জ্বেলে দাও জাগার ইঙ্গিত
আবার কী মন্ত্রণায় একাদশ ঘরে রেখে শীত!

এগারো বছর পরে আবার তোমার সঙ্গে দেখা
এখন নূতন মেয়ে তুমি, যা ভেবেছি একা একা
এতোদিন তা-ই দেখি, এসেছ তুমিই ফিরে ফিরে।
দাও নি যে শ্বাস নিতে তোমার বুকের থেকে টেনে
আজ মমতায় যেন উজার করতে চাও এনে
তার সুরভিত রঙ এ-সুন্দর উষার তূণীরে॥

সাইবার নেটিক্স্ ও পাশ্চাত্ত্য জগৎ

পারভেজ রিয়াজ

১৯৪৮ সাল থেকে পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞানী ও দার্শনিক মহল 'সাইবার নেটিক্সে'র বোল-বোলাওয়ে মুখর। বহু লোকের ধারণা সাইবার নেটিক্স্ সম্পূর্ণ নতুন জিনিস। মিষ্টিক ও ভাইটালিষ্টরা একে পছন্দ করেন না। কিন্তু অপর অনেক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক একে বরণ করে নিয়েছেন এবং মনে করেন যে এর সাহায্যে সমস্ত প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের রূপ বদলে দেয়া যাবে। একে কেন্দ্র করে দার্শনিক বিধান সমষ্টি-ও (System) গড়ে তোলা হচ্ছে।

আমেরিকার বিজ্ঞানী নরবার্ট ভাইনার সাইবার নেটিক্সের ক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট চিন্তানায়ক। তাঁর দেয়া সংজ্ঞা অনুসারে সাইবার নেটিক্স্ হচ্ছে জীব ও যন্ত্র জগতে সংবাদ আদান-প্রদান ও নিয়ন্ত্রণের তত্ত্ব। প্রথমে এই তত্ত্ব খোদকারী (automatic) যন্ত্রের ব্যাপার থেকে পুষ্টিলাভ করে। সাইবার নেটিক্সে বাণীর (Message) ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ লোকের কাছে বাণীর মানে "একজন মানুষের কাছে পাঠানো সংবাদ"। কিন্তু যন্ত্রও বাইরের জগৎ থেকে বাণী পায়। এ বাণী বৈদ্যুতিক কিম্বা যান্ত্রিক উপায়ে বাহিত হয়। আধুনিক খোদকারী যন্ত্রের ব্যাপারে কার্য্যকরী-ভাবে বাণী পাঠানোর সমস্যা বিশেষ জরুরী। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত সাইবার নেটিক্স্ নামক বইয়ে ভাইনার লিখেছেন: "আমরা যে সমস্ত খোদকারী যন্ত্র নিয়ে কাজ করি, সেগুলি বাইরের জগতের সংগে যে কেবল মাত্র শক্তি প্রবাহ দ্বারাই সংযুক্ত তা নয়, এছাড়া অন্তর্গামী বাণী-প্রবাহ এবং বহির্গামী বাণীর ক্রিয়াও এগুলিকে বাইরের জগতের সংগে সংযুক্ত করে।" এই বইয়ের অন্য জায়গায় তিনি লিখেছেন: "আমরা অনেক সময় দেখি যে বাণী বাইরের গোলমালের জন্য বিকৃত হয়। এই গোলমালকে আমরা বলি নেপথ্য কোলাহল। তখন সমস্যা দাঁড়ায় কী ভাবে মূল বাণী কিম্বা নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত বাণী বা নির্দ্দিষ্ট প্রতিবন্ধক দ্বারা পরিবর্তিত বাণীকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এর জন্য বিকৃত বাণীকে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে হয়। এই প্রক্রিয়া ও যেসব যন্ত্রপাতি দ্বারা এটি সফল হয়, সেগুলির বাঞ্ছনীয় নক্সা নির্ভর করে বাণী ও কোলাহলের সম্মিলিত ও একক ভাবে গৃহীত শুমারী হিসাবের (statistical nature) উপর।" এর জন্যে ভাইনার ও তাঁর সহকর্মীরা শুমারী-বিজ্ঞানের প্রণালীর সাহায্যে বাণী ও কোলাহলের অংক ফলের (Function) আকার নিরূপণ করেন। এ ছাড়া গোলমালের

বর্তমানে মূলবাণী সম্বন্ধে পাওনা এত্তেলার (Information) পরিমাণ হিসাব করার সমস্যা ও রয়েছে। সাইবার নেটিক্স্ অনুসারে এত্তেলা হচ্ছে একটি বিশেষ সংগঠনের (system) ভিতরকার শৃংখলার পরিমাপ, যেমন এনট্রপী (Entropy) হচ্ছে একটি সংগঠনের ভিতরকার বিশৃংখলার পরিমাপ। এই এত্তেলা গতিশীল। একটি বিশেষ সংগঠন এত্তেলার যে গতিবেগ সামলাতে পারে তার পরিমাপ গাণিতিক উপায়ে বার করা যেতে পারে। এর জন্য দুটি জিনিস জানা দরকার। একটি হচ্ছে সংগঠনটি যে বৃহত্তম বাণী সহ্য করতে পারে তার তীব্রতা, অপরটি যে ক্ষুদ্রতম বাণী সংগঠনটিকে পাঠানো যেতে পারে তার তীব্রতা (Intensity)। ভাইনার লিখেছেন, "সংবাদ আদান-প্রদানের এই দিকটার চাহিদা মেটানোর তাগিদে আমাদের এত্তেলার পরিমাপের একটি শুমারী হিসাব অনুযায়ী তত্ত্ব খাড়া করতে হয়েছে।" ভাইনার আরও বলেছেন যে তিনি ও তাহার সহকর্মিরা সংবাদ আদান-প্রদানের কারিগরি বিদ্যাকে (Communication Engineering) শুমারী বলবিজ্ঞানের (Statistical Mechanics) একটি শাখায় পরিণত করেছেন।

সাইবার নেটিক্সের ব্যাপার থেকে মনে হয় আধুনিক যুগে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞানের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়েছে। এও দেখা যায় যে কলকব্জা চালানোর সমস্যা থেকেও নতুন গাণিতিক প্রণালীর উদ্ভব হতে পারে। যাঁরা গণিতকে অপার্থিব বলে মনে করেন তাঁরা এতে হতাশ হবেন।

এখানে আর একটী লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা ভাইনার ও তাঁর সহকর্মীদের আগেই সাইবার নেটিক্সের গাণিতিক প্রণালীগুলি খাড়া করেছিলেন। সাইবার নেটিক্স্ বইয়ে ভাইনার লিখেছেন, "এক্ষেত্রে আমার কতকগুলি অনুমান রাশিয়ার কলমো গোরোফের অপেক্ষাকৃত আগে করা কাযের সংগে জড়িত। যদিও আমার কাযের বেশ কিছুটা অংশ আমি রাশিয়ান স্কুলের কাজে নজর দেবার আগেই করেছিলাম।" নানা কারণ বশতঃ সোভিয়েট জনসাধারণ কলমো গোরোফের কাজ সহজ ভাবেই গ্রহণ করেছিল; অন্যদিকে পাশ্চাত্যের দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা ভাইনারের কায নিয়ে তুমুল শোর-গোল বাঁধিয়েছেন।

এটা স্পষ্ট যে সাইবার নেটিক্সের সাহায্যে যন্ত্র-বিদ্যার উন্নতি সম্ভব। তা ছাড়া এর গাণিতিক প্রণালীগুলি অন্য বিজ্ঞানে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা খুবই স্বাভাবিক। পদার্থবিদ্যা ও প্রাণতত্ত্বের সমস্যা থেকে উৎপন্ন বহু গাণিতিক প্রণালী অর্থনীতিতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অর্থনীতির তথ্য এবং পদার্থ বিদ্যা ও প্রাণতত্ত্বের তথ্যের মধ্যে অনেক তফাৎ। এক বিজ্ঞানের বৃদ্ধি অন্য বিজ্ঞানকে সাহায্য করে। কিন্তু বিভিন্ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বিভিন্ন, যদিও এদের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে মিল পাওয়া যেতে পারে। একই ধরনের

গাণিতিক প্রণালী বিভিন্ন বিজ্ঞানে প্রয়োগ সম্ভব হলেই এক বিজ্ঞানের তথ্য-সম্বন্ধীয় ধারনা অন্য বিজ্ঞানের উপর চাপানো যায়না। কোন বিজ্ঞানের ভিত্তি মজবুত করার জন্য দরকার যে বিশেষ ধরণের তথ্য নেয়ে, তার কারবার সে গুলিকে পর্য্যবেক্ষণ। এই ভাবেই বিজ্ঞানের বিকাশ হয়। পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়নের ভিত্তি বেশ দৃঢ়। কিন্তু প্রাণতত্ত্বের ভিত্তি তত দৃঢ় নয়। পাশ্চাত্য জগতে মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের ভিত্তি শিথিল। ভাইনার ও তাঁর সহকর্মীরা প্রাণতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। এদের প্রভাব পাশ্চাত্য জগতের সমাজতাত্ত্বিকদের উপর কতটা তা জানিনা। তবে যন্ত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে সাইবারনেটিক্ গবেষণা অনেক স্নায়ু-বিজ্ঞানীকে (Neurologist) খুবই প্রভাবান্বিত করেছে। গণনাকারী যন্ত্রের মত কতকগুলি আধুনিক যন্ত্র মানুষের সাধ্য কিছু কিছু মানসিক ও কায়িক কাজ করে। জীবন্ত দেহ ও যন্ত্রের মধ্যে অনেক জিনিষ আছে যে গুলি পদার্থ বিদ্যা ও রসায়নের আলোচ্য বিষয়। মানসিক কার্য্যকলাপ জীবন্ত দেহের কার্য্যকলাপ। ভাইটালিস্ট প্রাণতাত্ত্বিক ও অধ্যাত্মবাদী মনস্তাত্ত্বিকরা জীবন্ত দেহের কার্য্যকলাপকে রহস্যময় করে দেখান। দায়িত্ববোধসম্পন্ন বিজ্ঞানীরা এঁদের কথা মানতে পারেন না। সাইবার নেটিক্স যদি প্রাণতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক তথ্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকে সাহায্য করে তা হলে অবশ্যই একে বরণ করা উচিৎ। কিন্তু এটী বিজ্ঞানীদের ভুল পথেও চালিত করতে পারে। অনেকে ভাবতে পারেন জীবন্ত দেহ যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। নানা কারণে জীবন্ত দেহকে যন্ত্রের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। মানুষ কতকগুলি বিশেষ কাযের জন্য যন্ত্র গড়ে আর জীবন্ত দেহ অসংখ্য গুণনীয়ক সম্পন্ন একটি ধারার ফল।

ভাইনার লিখেছেন "আমাদের ধারণা স্নায়ু-বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচলিত ধারণাকে ছাড়িয়ে বেশ কিছু অগ্রসর হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্নায়ু সংগঠনকে (Central Nervous System) আর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রত্যঙ্গ বলে মনে হয়না। দেখা যাচ্ছে ইন্দ্রিয় থেকে পাঠানো জিনিস পেশীতে ছেড়ে দেয়াই এর একমাত্র কাজ নয়। এর অনেক কায বৃত্তে ভ্রমণের সামিল। কারণ সেগুলি স্নায়বিক সংগঠন থেকে পেশীতে পৌঁছে আবার ইন্দ্রিয়ের মারফৎ স্নায়বিক সংগঠনে ফিরে যায়।" আমি স্নায়ু-বিজ্ঞানী নই। ভাইনারের মতামত কতদূর সত্য তা জানিনা। কিন্তু সাইবারনেটিক্সের আবির্ভাবের আগে পাভলভ স্নায়বিক কার্য্য-কলাপের আরও ভাল বর্ণনা দিয়েছিলেন। পাভলভ লিখেছিলেন "কেন্দ্রীয় স্নায়ু-সংগঠন শরীরের সকল ঘটনাকেই নিয়ন্ত্রণ করে। বাইরের জগত ও দেহের আভ্যন্তরিক পরিবেশ থেকে মগজে সব সময়েই Stimuli বা প্রেরণা যাচ্ছে। এগুলি মিলিত হয়, এদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং এদের সংযুক্ত ও সংগঠিত করতে হয়। এইভাবে একটি বিরাট গতিশীল সংগঠন গড়ে ওঠে। দেহের প্রতি অংশেরই অবস্থান-স্থাপিত প্রতিফলন-চিহ্ন (Conditioned

reflex signal) রয়েছে……দেহের প্রতি অংশই মগজে খবর পাঠাতে পারে।"—পাভলভ জীবন্ত দেহ পর্য্যবেক্ষণ করে এই মতামতগুলি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি অনেক আধুনিক যন্ত্র দেখেননি। পাভলভের মতামতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আধুনিক সোভিয়েট বিজ্ঞানী বায়কফ্ বলেছেন, "বাইরের ইন্দ্রিয়ের মত ভিতরকার ইন্দ্রিয়গুলি দেহে গ্রহণ-যন্ত্র (receptor) ও বিশ্লেষক-যন্ত্রের (Analyzer) এর কাজ করে।" তিনি আরও মনে করেন যে সেচেনভের অনুমান সত্য। সেচেনভের অনুমান ছিল যে দেহের ভিতরকার অনুভূতির ও বাইরের ইন্দ্রিয়ের প্রেরিত অনুভূতির শারীরিক প্রকৃতি একই ধরণের। গ্রহণ-যন্ত্র ও বিশ্লেষণ-যন্ত্রের উল্লেখ দেখে মনে হয় বায়কফ্ সাইবারনেটিক যন্ত্রের সংগে পরিচিত।

১৯৫৩ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী উইল্কির "মন ও মগজের বিজ্ঞান" বইটি প্রকাশিত হয়। উইলকি মনে করেন যে সাইবারনেটিকসের নক্সার সংগে মানসিক ব্যাপারের প্রচুর মিল আছে। তবে তাঁর মতে সাইবারনেটিক্ যন্ত্রের অধিকাংশ অংশ শুকনো এবং জীবন্ত দেহের অধিকাংশ অংশই জলে ভরা। এইজন্য তিনি বিজ্ঞানীদের সাবধান হতে উপদেশ দিয়েছেন। এই বইয়ের এক জায়গায় উইলকি জীবন্ত দেহকে ভিজে যন্ত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন, যদিও ভাইনার, বিগ্লো ও রোজেন ব্লুয়েথ জীবন্ত দেহকে যন্ত্র না বলে দেহই বলেন। যন্ত্র ও জীবন্তদেহের মধ্যে যে জিনিসগুলি সাধারণ, সে গুলি বুঝবার জন্যে বিজ্ঞানীরা যন্ত্রের নক্সা থেকে সাহায্য পেতে পারেন। কিন্তু এই নক্সা অন্য অনেক জিনিস বুঝতে সাহায্য করে না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র-বোধ ও ব্যক্তিত্ব বোঝার জন্যে আলাদা ধরণের বিচার-বিবেচনা দরকার। বায়কফ্ দেহ আর যন্ত্রকে আলাদা বলে মনে করেন। তাঁর মতে জীবনের গতি পথে বাইরের পরিবেশের সংগে দেহের একটা বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠে, যার ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির ধরণ (type) বিভিন্ন হয়। এ ছাড়া তিনি আরও বলেছেন, "গত বিশ বছরের সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে দেহের প্রায় সকল ক্রিয়াকেই স্নায়ু সংগঠন নিয়ন্ত্রণ করে।" 'সকলে'র বদলে 'প্রায় সকল' কথাটির ব্যবহারে মনে হয় তিনি পাভলভের অন্ধ অনুগামী নন। বায়কফের অন্যান্য মতামত থেকে এও বোঝা যায় যে স্নায়ু-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি স্নায়বিক তথ্য পর্য্যবেক্ষণ করাকেই বেশী জরুরী মনে করেন, যদিও অন্য বিজ্ঞানের সাহায্য তিনি গ্রহণ করেন।

১৯৪৮ সাল থেকে অনেক পশ্চিমা বিজ্ঞানী সোভিয়েট বিজ্ঞানী লাইসেংকোর উপর বিরূপ। লাইসেংকো এক জায়গায় লিখেছেন, "জীবদেহের বৈশিষ্টর জন্য যে সমস্ত পরিবেশ ঘটিত অবস্থা একান্ত দরকারী সে গুলির পরিবর্তন ঘটলে জীবদেহের বৈশিষ্ট পরিবর্তিত হতে বাধ্য। এইভাবে এক জীবতাত্ত্বিক উপজাতি (Species) থেকে অন্য জীবতাত্ত্বিক উপজাতির উৎপত্তি হয়।" অন্য আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন "যে সমস্ত জীবদেহ

জীবনের পরিবর্তিত অবস্থার সংগে খাপ খাইয়ে নিজেদের পরির্তিত করতে পারে না তারা লোপ পায়।" লাইসেংকোর এ দুটি উক্তি আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়। তাঁর অপর একটি উক্তি এ দুইয়ের মধ্যে কিছুটা বোঝাপড়া করে। সে উক্তিটি হচ্ছে, "যদি জীবদেহ পরিবেশ-ঘটিত অবস্থাগুলিকে আত্মসাৎ করতে পারে তা হলে তার প্রয়োজনের অর্থাৎ কৌলীন্যর (Heredity) পবিবর্তন সব সময়েই পরিবেশ-ঘটিত অবস্থার ক্রিয়ার সমানুপাতী হবে।" লাইসেংকোর মতে বৃদ্ধি (Growth) ও বিকাশের (Development) মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। তাঁর মতে জীবদেহের প্রতি অংশ দ্বারা অনুরূপ অংশের সৃষ্টি হচ্ছে বৃদ্ধি আর যে প্রক্রিয়ায় অনুরূপ অংশ প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট না হয়ে অন্য রকমের বহু অংশের দীর্ঘ পরিবর্তন সূত্রের মারফৎ সৃষ্ট হয় তাকে বিকাশ বলে। তিনি মনে করেন যে গাছপালার উপর কোনো বিকাশের সময় যদি পরিবেশের প্রভাব জারী করা যায় তা হলে তাদের কৌলীন্য ভেঙ্গে যাবে। আমি প্রাণ-তাত্ত্বিক নই। কাজেই লাইসেংকোর মতামতের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারি না। তবে এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে। সে প্রশ্নটি হচ্ছে ঃ—পরিবেশের গুণনীয়ক যখন অসংখ্য, তখন কী প্রচলিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মারফৎ বিশেষ কোনো স্থানে ও কালে বিশেষ কোনো জীবদেহের একান্ত প্রয়োজনীয় পরিবেশ-ঘটিত অবস্থাগুলির সঠিক নির্দ্ধারণ সম্ভব? লাইসেংকো এ সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন। তিনি লিখেছেন, "এই সাধারণ সূত্র সত্য হলেও প্রতি ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া না যেতেও পারে। জীবদেহের প্রকৃতি বদলানোর সংশ্লিষ্ট সম্ভাবনা ও প্রণালী প্রত্যেক স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে আলাদা ভাবে ঠিক করতে হবে।" এ ছাড়া লাইসেংকোর বিকাশ সম্বন্ধীয় ধারনা অনেক দার্শনিক প্রশ্ন তোলে। তার মতে বৃদ্ধি হচ্ছে সংখ্যাগত (Quantitative) পরিবর্ত্তন। বিকাশ আর বৃদ্ধির মধ্যে গুণগত (Qualitative) তফাৎ রয়েছে। বিকাশ জীবদেহের গুণ-গত পরিবর্ত্তনের সংগে জড়িত। কিন্তু বিকাশ যে গুণগত পরিবর্ত্তন একথা তিনি কোথাও বলেননি। মনে হয় তিনি একটি নূতন দার্শনিক পদ (Category) প্রচলিত করতে যাচ্ছেন।

লাইসেংকো বিরোধী পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা লাইসেংকোর মতামত থেকে যে সব প্রশ্ন ওঠে সেগুলির জবাব দিতে পারেন নি। হয় তারা এবিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ পাননা কিম্বা তাঁদের মন পক্ষপাতদুষ্ট। সম্ভবতঃ বিশেষজ্ঞদের জন্যে লেখা লাইসেংকোর বই সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে পাওয়া যায়না। জুলিয়ান হাক্স্লি লাইসেংকো-বিরোধী। তাঁর কয়েকটী সাম্প্রতিক লেখা পড়ে মনে হয় সাইবার নেটিক্সের প্রভাব তাঁর উপরেও পড়েছে। তবে সাইবারনেটিক্স তাঁর কতকগুলি ভুল ধারনা ভাঙ্গতে পারেনি। ১৯৫৩ সালে তিনি লিখেছেন, "জেনের (Gene) রকমফের (Mutation)

হচ্ছে তাদের কাঠামোয় সামান্য পরিবর্তন। কতকগুলি পরিবর্তন হচ্ছে সত্যই আকস্মিক পুনঃ বন্দোবস্ত (Chance rearrangement), অন্য কতকগুলি পরিবর্তন বাইরের কোনো বিষয়ের সংঘাতের ফল। সমস্ত ক্ষেত্রেই এদের সঙ্গে বিবর্তনের সম্পর্ক অনির্দিষ্ট (random), এদের সংগে জীবদেহের পারিপার্শ্বিক অবস্থার বা প্রয়োজনের কোনো সম্পর্ক নেই।" হাক্স্লি প্রাণ-তত্ত্বের ক্ষেত্রে কার্য্যকারণ সম্পর্ক আলোচনা করতে নারাজ। বাইরের কোনো বিষয়ের সংঘাত মানে পরিবেশের পরিবর্তন। এর ফলে যদি দেহের কোনো পরিবর্ত্তন ঘটে তবে এর সংগে দেহের নিশ্চয়ই কোনো সম্পর্ক আছে। এ সম্পর্ক দূর বা নিকট, প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষ। অনেক সময়ে একটি ঘটনার নির্ণায়ক কারণগুলি খুঁজে পাওয়া যায় না ; এই জন্যেই আধুনিক বিজ্ঞানে শুমারী বিজ্ঞানের প্রণালী ব্যবহৃত হয়। আকস্মিক ঘটনা কারণহীন ঘটনা নয়। আকস্মিক ঘটনা হচ্ছে সেই ঘটনা যার নির্ণায়ক কারণ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব থাকে। আকস্মিক ঘটনার বিচারের ভিতর দিয়েই বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। কোনো আকস্মিক ঘটনার সম্ভাবনা হিসাব করতে হলে সেই ঘটনাটী ঘটবার ধারাগুলি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানের দরকার পড়ে। একটি বিশেষ সংগঠনের যে কোনো অনির্দিষ্ট উপাদান (Random element) সেই সংগঠনটীর একটি অংশ। একটি অনির্দিষ্ট উপাদান হয়ত গুরুত্বহীন হতে পারে। কিন্তু সমস্ত সংগঠনটী বহু অনির্দিষ্ট উপাদান দ্বারা গঠিত। বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে অনির্দিষ্ট উপাদান ও সংগঠনের ভিতরকার সম্পর্ক খুঁজে বার করা। এ ক্ষেত্রে জুলিয়ান হাক্স্লির দৃষ্টিভঙ্গী অবৈজ্ঞানিক। সকল দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন বিজ্ঞানীই কার্য্য কারণ সম্পর্ক বিশ্বাস করেন। শুমারী বলবিজ্ঞানের কারবার বহু আকস্মিক ঘটনা নিয়ে। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী ম্যাক্স্বর্ণের মতে, যে দর্শন কার্য্য কারণ সম্পর্ককে অস্বীকার করে সে দর্শন আজগুবি কল্পনা। যন্ত্র বিদ্যায় সাইবারনেটিক্সের প্রয়োগ থেকে বোঝা যায় আকস্মিক ঘটনার বিচার থেকে ব্যবহারিক ফল পাওয়া যেতে পারে। শুমারী বিজ্ঞান দূর ও অজানা কারণের সন্ধান দেয় এবং কার্য্য-কারণ সম্পর্কের ধারণাকে সমৃদ্ধ করে। ফরাসী শুমারী গণিতবিদ এমিল বোরেল লিখেছেন, "কার্য্য কারণ সম্পর্কের সূত্র ব্যবহার করার মানে যে সব ব্যাপারের উপর দূর ও অজানা কারণ প্রভাব ফেলতে পারে, সে গুলিকে আলাদা করে রাখা। কার্য্য কারণ সূত্রের যদি এই সরল ব্যাখ্যা করা হয় যে কারণ স্থানে ও কালে কার্যের নিকটে থাকবে, তাহলে এটী অবশ্যই সার্ব্বজনীন সত্য হবেনা।" বোরোল স্থানে ও কালে দূরবর্তী কারণ ঘটিত কার্য্যের উদাহরণও দিয়েছেন। সাইবার নেটিক্স্ জুলিয়ান হাক্স্লিকে কার্য্য-কারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন করতে পারেনি।

নরবার্ট ভাইনারের গণিতে দখল আছে। কিন্তু তাঁর দার্শনিক মতামত গোলমেলে।

।তনি লিখেছেন, "এখন দেখা যাচ্ছে জড়বাদ যন্ত্রবাদের একটি প্রতিশব্দ বিশেষ। যন্ত্রবাদী ও ভাইটালিষ্টদের ঝগড়া ভুলভাবে তোলা প্রশ্নের ফলেই সম্ভব হয়েছিল।" তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে কতকগুলি সুস্পষ্ট বৈশিষ্টের জন্য দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদ ও যান্ত্রিক জড়বাদের মধ্যে মিল হয়নি। এ ছাড়া যন্ত্রবাদ ও ভাইটালিষ্টদের ঝগড়া ভুলভাবে তোলা প্রশ্নের ফলে ঘটে।ন ; কতকগুলি বিশিষ্ট জিনিস সম্বন্ধে এদের ধারণার সংঘর্ষ ঘটেছিল। সাইবার নেটিক্স্ ভক্ত কয়েকজন দার্শনিক বৈজ্ঞানিক জড়বাদ নামে একটি মেটাফিজিক্যাল মতবাদ গড়ছেন। এই 'বৈজ্ঞানিক' জড়বাদ একটি নতুন যান্ত্রিকজড়বাদ। পুরানো যান্ত্রিক ও এই নতুন যান্ত্রিক জড়বাদের সংগে তফাতের কারণ এদের কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা। পুরানো যন্ত্রের নির্মাতারা নিউটনের মতো বিশ্বাস করতেন যে কালের পুনরাবর্ত সম্ভব এবং একই অবস্থাকে যতবার খুসী ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। কিন্তু সাইবারনেটিক্ যন্ত্রের ব্যাপার আলাদা। এদের ভিতর বাইরে থেকে সে সব জিনিষ আসতে পারে তার শুমারী হিসাব দরকার এবং সেই অনুসারে এদের সন্তোষজনক অভিনয় (Satisfactory performance) দরকার। একটি সাইবারনেটিক যন্ত্রে যে ফর্দ (Data) পাঠানো হয়, সেই অনুসারে তার কাজের নিয়মও বদ্‌লাতে পারে। সুতরাং সাইবারনেটিক যন্ত্রের নির্মাতারা কালের পুনরাবর্ত অসম্ভব বলে মনে করেন। তাঁদের বিশ্বাস বিগত অবস্থাকে ফিরিয়ে আনা যায়না। কিন্তু সাইবার নেটিক্সের উপর যদি একটি মেটাফিজিক্যাল মতবাদ গড়া যায় তাহলে এর সূত্র একটি বিশ্লিষ্ট ছকে (Abstract Schema) পরিণত হবে। এই মতবাদের অনুচররা এই ছকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের (Concrete Question) জবাব খুঁজবেন। যার ফলে তথ্যের বিশ্লেষণ বাধা পাবে। কোনো কোনো সোভিয়েট বিজ্ঞানী তাঁদের নিজেদের কাজের বাইরে গিয়ে মার্ক্স্বাদের প্রশংসা করেন। কিন্তু তাঁরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক শৃংখলা মেনে চলেন। লাইসেংকো তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যেই একটি সেভিয়েট প্রতিষ্ঠানের প্রধান হয়েছিলেন ; শুধু মার্ক্স্, এঙ্গেল্স্, লেনিন ও ষ্ট্যালিনকে প্রশংসা করার জন্য নয়। স্মল হাউসেন প্রমুখ লাইসেংকো বিরোধী সো।ভয়েট বিজ্ঞানীরাও মার্ক্স্বাদ ও সোভিয়েট নেতাদের প্রশংসা করতেন। সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নে লাইসেংকোর এক প্রিয় ছাত্র দিমিত্রিয়েভের একটি বৈজ্ঞানিক ডিগ্রী কেড়ে নেয়া হয়েছে। দিমিত্রিয়েভের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তাঁর থিসিসে যথেষ্ট যুক্তি ছিলনা। দিমিত্রিয়েভকে সমর্থন করার জন্য সোভিয়েট বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা লাইসেংকোর নিন্দা করেছেন। যতদূর খবর পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় দিমিত্রিয়েভের প্রধান সমালোচক স্তানকফ কামউনিষ্ট পার্টীর সদস্য নন। এ থেকে বোঝা যায় যে সোভিয়েট বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান-গুলি দার্শনিক বিধান-সমষ্টির চেয়ে বৈজ্ঞানিক প্রণালীকেই বেশী দাম দেয়।

[এই প্রবন্ধটি ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত Modern Trends নামক ইংরেজী বইয়ের কিছু অংশের তর্জ্জমা। ইংরেজীতে যা লিখেছিলাম বাংলায় ঠিক তার আক্ষরিক অনুবাদ করিনি। তবে মানে মোটামুটি বজায় রাখতে চেষ্টা করেছি। যে পরিভাষাগুলি ব্যবহার করেছি সেগুলি চলবে কিনা জানিনা। দর্শনের system এর বাংলা করেছি বিধান-সমষ্টি ও পদার্থ system এর বাংলা করেছি সংগঠন। গণিতের function এর জায়গায় অংক ফল ব্যবহার করেছি এবং শরীর বিদ্যার function এর জায়গায় কার্য্যকলাপ বা ক্রিয়া ব্যবহার করেছি। এছাড়া আর একটি কথা বলা দরকার। আজকাল statistics এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে অনেকে সংখ্যাতত্ব ও রাশি-বিজ্ঞান ব্যবহার করছেন। আমার মনে হয় এক্ষেত্রে কথা দুটি অচল। সংখ্যাতত্ত্বের মানে Theory of numbers, এর অনুরূপ। রাশি-বিজ্ঞান কথাটি অনির্দিষ্ট। এর দ্বারা Theory of numbers, scales of notation ও Theory of setsও বোঝানো যেতে পারে। আমি যতদূর জানি statistics এর উৎপত্তি সরকারী হিসাব থেকে। পরে বিভিন্ন সমস্যার তাগিদে উচ্চাঙ্গ গণিতের সাহায্য নিয়ে এটি একটি স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধ বিজ্ঞানে পরিণত হয়। পারস্য দেশে statistics এর নাম 'আমার'। কিন্তু আমাদের দেশে একথাটি অপ্রচলিত। পারস্য ভাষায় শোমারে বলতে সংখ্যা বোঝায় ও শোমার দান মানে গণনা করা। কিন্তু ভারতবর্ষে সরকারী হিসাবের ব্যাপারে শুমারী কথাটি বহুদিন থেকে প্রচলিত। সুতরাং statistics এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'শুমারী বিজ্ঞান' ব্যবহার করা যেতে পারে।

Modern Trends বইটির উপর মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে J. B. S. Haldane সোভিয়েট ইউনিয়নে লাইসেংকোর সমালোচনার কথা লিখেছিলেন। এবিষয়ে তিনি সুখাচোভ ও তুরবিনের নাম করেছিলেন। আমি সুখাখোভ বা তুরবিনের লেখা পড়িনি। জানা গেছে তাঁরা শুধু লাইসেংকোর প্রাণতাত্ত্বিক মতের আলোচনা করেননি, দার্শনিক মতামতও প্রকাশ করেছেন। সুখাচোভ ও তুরবিনের মতামত ভুল বা ঠিক যাই হোক, এবিষয়ে ভাল খবর পেলে সোভিয়েট ইউনিয়নে সমালোচনার স্বাধীনতা ও দার্শনিক তর্কের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করা যেতে পারে। এদেশের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে বইপত্র আমদানী করে থাকেন। দুঃখের বিষয় তাঁরা সুখাচোভ ও তুরবিনের মতামত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানাতে নারাজ।]

বোঝাপড়া

মানসী দাশগুপ্ত

মনোলীনা যেদিন যেচে প্রবীরের কণ্ঠে বরমাল্য দান করল মন্দলোকের ঈর্ষা এবং বন্ধুলোকের আনন্দিত বিস্ময়ের শেষ ছিলনা। পুরাকালীন স্বয়ংবরের ইতিহাসেও এমনটি দেখা গেছে কিনা এ নিয়ে তত্ত্বালোচনা উঠতেও এমন-কি কসুর ঘটলোনা।

যে-গল্পের পরিসমাপ্তি নিরানন্দে তাকে রসিকতা রঙ্গ দিয়ে আরম্ভ করা রীতি-বিগর্হিত, ওতে পাঠকদের মনে অনর্থক আশাভঙ্গের খেদ জাগে। কিন্তু বিধাতা এমন বেনিয়মে গল্প বলতেই ভালবাসেন, মানুষের আশা নিরাশা নিয়ে লেশমাত্র বিচলিত না-হয়ে। তাই এ-সমস্ত হাসি আলাপ আকস্মিকতার ভিতরে মনোলীনা-প্রবীরের যে জীবন সুরু হল, মনে হল সেখানে "মধুর বহিবে বায়ু", এবং জীবনযাত্রাকে নেহাত জলযাত্রার সংগে তুলনা দিলে তারা রংগেই ভেসে যাবে বৈকি!

শ্বশুর বাড়ির সকলের কাছে, পরিচিত সাধারণের কাছে, মনোলীনা ছিল রূপকথার রাজকন্যার মত অপরূপ। সে ছিল স্বভাবতঃ শান্ত, তাতে তার রূপ একটি সম্ভ্রম লাভ করেছিল। তার হাসিতে কথায় চোখের ভঙ্গিতে দেহের সৌন্দর্য্য, মনের পরিশীলন ও বংশের আভিজাত্যের যে মিশ্রণ ঘটেছিল তা দুর্লভ। এ মেয়ে যে হঠাৎ এক ইতুপূজোর কথার বামুনঠাকুরের তুল্য প্রবীর ভট্টাচার্যকে বিয়ে করে কলামূলোর ভাণ্ডারের ধন খেয়ে নিজেকে ধন্য বোধ করবে, এতে সবচেয়ে বেশি পীড়া বোধ করল বোধ হয় প্রবীর নিজে। তার কেবলি মনে হতে লাগল এ যেন মনোলীনার আত্মদান নয়, এ যেন শুধু আগাম দাদন দিল সে ভবিষ্যত ফসলের আশাতে। সে ফসল তো সহজে মেলেনা। এতদিনের পতিত মানব জমিতে সোনা ফলানোর ভাবনায় প্রবীরের রোমাঞ্চ হল, সে রোমাঞ্চ আশারও, আশংকারও। যে-মেয়ে অর্থ-সমৃদ্ধি যশমান বংশগৌরব কিছুই চাইলনা সে যে কতবড় অমৃতের অধিকারিণী হতে চায়, তার চরিত্র এবং পরিমাণ কল্পনা করে নিজেকে সে অতিশয় দীন বোধ করলে। নববধূর সুন্দর সজ্জিত মুখের দিকে চেয়ে সে বারে বারে ভাবলো, আমি তোমার যোগ্য হব। সে ভাবনায় ফাঁকি ছিল না। তার প্রমাণ সে বিয়ের মাসখানেকের ভিতরেই দিতে সুরু করলে। প্রবীর সাধনায় বসলো।

প্রবীরের গর্ব ছিল তার বুদ্ধিতে। সে বুদ্ধি ইচ্ছামাত্রই বিদ্যার যোগে শাণিত হয়ে প্রকাশ পেতে পারে। প্রতিষ্ঠা এনে দিতে পারে তার সুধীমহলে, সে জানত। জানত, এতদিন ইচ্ছা হয়নি বলেই সে শুধু পরীক্ষায় পাশ করেছে, বিদ্যাচর্চা করেনি।

এখন সে উঠে পড়ে লাগল সেই চর্চাতে। এই তার অমৃতের উপায়। অবসরকালে বিদুষী স্ত্রীকে শোনায় তার নূতনতম চিন্তার কথা, তার সারাদিনের সঞ্চয়, কী সূক্ষ্ম তার কথার বাঁধন, কী নৈপুণ্য তার ভাবনায়। মনোলীনা শান্তভাবে শোনে আর মাঝে মাঝে চোখ রাখে হাতের বুনুনিতে, জামার প্যাটার্ণ যাতে হঠাৎ না ভুল হয়ে যায়! এক সময়ে হয়ত বলে, চলনা বেড়াতে যাই। কিংবা বলে, রাগ করোনা, দেখনা এই এইখানটা এই ডিজাইনটা কেমন দেখাচ্ছে, রবুকে মানাবেনা ?

মুগ্ধ লাগে প্রবীরের। ভাই প্রবীরের মোটে ওই একটিই। অনেক ছোট। কিন্তু সে যে প্রবীরের ভাই। তাকে নিয়ে মনোলীনারও যে এত আগ্রহ, শুধু সে বলে নয়, সংসারের তুচ্ছতম সকলের ইচ্ছাআকাঙ্ক্ষার প্রতি তার যে সাগ্রহ দৃষ্টি দেখে প্রবীরের আশ্চর্য্য ঠেকে, ভাল লাগে। সংসারের আর পাঁচজন সাধারণ স্ত্রীর স্তরে যে মনোলীনা নেমে আসতে পারে এ যেন তার এক আশ্চর্য গুণ।

অথচ সংসার-প্রীতি মনোলীনার সত্যই অকৃত্রিম। যদি জন্মান্তরের কর্ম বলে কিছু থাকে, তাহলে বলতে হয় জন্মজন্মান্তরে মনোলীনা ঘরন্তী মেয়ে—ঘর গেরস্থালীই সে করে এসেছে, করবে। সে ঘর যেমনি হোক, তাতেই সে লক্ষ্মীশ্রী এনে দেবে। এ জন্মে তাই যদিও দৈবক্রমে সে ঘরকরণার কাজ কিছুই শেখেনি, বরং দু চারখানা পুঁথির বিদ্যাই তার থাকার কথা—তার নিজের ঐকান্তিক আগ্রহ সে বিদ্যা ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে স্বামীসেবায় আত্মনিয়োগ করাতে। তার সেবায় তার যত্নে তার স্বামীর যদি আরো শ্রীবৃদ্ধি হয়। যশ বাড়ে, সে খুসী, যদি না বাড়ে, তাতেও তার খেদ নেই, সে যা পেয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট।

প্রবীর কিন্তু ভুলবার ভবী নয়। সে অনেক মেয়ে দেখেছে, নিজের ঘরে না হোক পরের ঘরে, সাহিত্যে। সার জেনেছে—মেয়েরা কী চায়। তারা চায় প্রাচুর্য, প্রতিষ্ঠা,—স্বামীর মাধ্যমে। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী পর্যন্ত স্বামীকে ছেড়ে কথা বলেননি। আর সে যে নিরীহ বাঙ্গালীর ছেলের স্বাস্থ্য এবং চেহারাখানি নিয়ে মোটামুটি ভদ্র আয়ের একটি চাকরী বজায় রেখে ছোট ভাড়াটে বাড়িতে অভ্যস্ত জীবন যাত্রা নির্বাহ করছে এতেই মনোলীনার মন কেন তারই প্রতি আকৃষ্ট থাকবে এ সে বুঝে উঠতে পারলনা। সেকি মনোলীনার স্বামী বলেই মূল্যবান, না-কি সে মূল্যবান বলেই মনোলীনার স্বামী? ভাবে আর প্রবীর আরো অনেক মূল্যবান করে তুলতে চায় নিজেকে।

এরই ভিতরে শীত কেটে গ্রীষ্ম এল। বিয়েতে পাওয়া আটপৌরে শাড়ি পুরোনো হয়ে গেল। মনোলীনা সকাল সকাল উঠে প্রবীরের জন্যে টিফিন তৈরা করে। জুতো জামা ট্রাউজার গুছিয়ে রাখে সময়মত। ঘরখানা গুছিয়ে নেয় আরেকবার, বইগুলি ঝাড়ে। ফুলদানীতে কোনওদিন ফুলও রাখে দুটো একটা। তারপর ননদকে দুটো মিষ্টি কথা বলে

দেওরকে স্কুলে পাঠিয়ে দশটা না বাজতেই নেয়ে খেয়ে বাড়ির কাছের মেয়ে স্কুলটাতে পড়াতে চলে যায়। সংসারের সাশ্রয়ের জন্য এই কাজটি সে কিছুদিন হল নিয়েছে, এও যেন তার গৃহস্থালীর অঙ্গ। স্কুল থেকে ফিরে সবচেয়ে আগে সে নিজেকে সাজিয়ে নেয়। কাপড় কেচে, চুল বেঁধে, মুখ মেজে। তারপরে কখনও হয়ত একটু দোকানে গেল ননদের সংগে, কখনো বসে বসে শুনলো দেওরের স্কুলের ক্রিকেট ম্যাচের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। হঠাৎ মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয় হয়ত। কিন্তু না, প্রবীর নয়, তার আসতে আরো দেরি হয়। অফিস সেরে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে পড়ে তার ফিরতে এই গ্রীষ্মের দিনেও সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়।

এমনি করে একদিন বর্ষা নামল। মনোলীনা স্কুল থেকে ফিরে বন্ধ জানালায় হেলান দিয়ে ঘরের মেঝের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। ননদেরা এসে বলল, এমন করে দাঁড়িয়ে কেন বৌদি ? এবং তার পরমূর্ত্তে তারা চলে যেতেই শ্বাশুড়ী এসে বললেন, শরীর খারাপ নাকি বৌমা ? একমুহূর্ত কী যে হল মনোলীনার। কোনও উত্তরই দিলনা ঠিকমত। তারপর সংক্ষেপে "না" বলেই সে নিয়মমত কলঘরে চলে গেল। বাইরে বৃষ্টি পড়তে লাগল। দুই ননদে মিলে কখনও জোরে কখনো আস্তে 'গগনে গরজে মেঘ' আবৃত্তি করে চলেছে। কেন যেন মনোলীনার মনটা ভারি বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। অভ্যাসমত ঘরে এল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিঁদুর পরছে, ছোট ননদ এসে ডাকলো "বৌদি"। তার ভাবভঙ্গী কৌতুকে ত্রস্ততায় বিচিত্র। না জেনেই মনোলীনার বুকটা ধক করে উঠলো। অপ্রস্তুত হয়ে সেটুকু লুকোতে গিয়ে একটু বেশিরকম শান্ত হয়ে সে বললে, কি হল? অনু ফিসফিস বলল, বিনয়দা!

ঘরের এককোণে বসে রবু লাট্টু ঘোরাচ্ছিল, লাফিয়ে উঠে বললে, সত্যিরে ছোড়দি!

অনতিবিলম্বে এদের আরেক বোন-ও এসে যোগ দিলে, ওরে অনু, এনে বসা! বৌদি যাও-না ভাই।

যাঃ বৌদি কি যাবে, উনি চেনেন-ইনা বৌদিকে।

কিছু নয়। এ পরিবারের এক দূর আত্মীয় এবং প্রবীরের এককালীন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিনায়ক বসু এতদিন রেঙ্গুনে একটা কি মস্ত বড় কাজে (এরা সেটা জানেনা, দাদা জানে, ভীষণ নাম করা লোক উনি !!) ব্যস্ত ছিলো, এতদিন পরে ফিরলেন দেশে। ফিজিক্সের ভীষণ ভাল ছাত্র, সত্যেন বসুর ভারি প্রিয় ছাত্র ছিলেন যে, বউদি জানেনা? আইষ্টাইন শুদ্ধু—

দরজার কড়াটা আরেকবার নড়ে উঠলো, ঢোক গিলে অনু হাসবার চেষ্টা করে বললে, ভেতরে আসুন বিনু-দা, দাদা কিন্তু বাড়ি নেই। এই আমাদের বৌদি।

মনোলীনা বলল, নমস্কার।

বিনায়ক বলল, প্রবীর বাড়ি নেই! আমি তাহলে অন্য সময় আসব। মনোলীনার দিকে চেয়ে হেসে বলল, তখন আপনার সংগে আলাপ করা যাবে, আজ যাই কেমন ?

ব্যবহার বিনায়কের অত্যন্ত আত্মীয়ের মত কিন্তু গায়ে-পড়া আত্মীয়তা নেই। আত্মীয়দের ভিতরে যেমন একটা অত্যন্ত দূরত্ব থাকে মনোলীনা যেন তেমনি বিনায়কের আপনার লোক বলেই একটু দূরের। যখনি আসে হাতে এটা-ওটা উপহার থাকে, থাকেও কিছুক্ষণ, কথা বলে যৎসামান্য, কিন্তু সহজেই। ওর কাছে যেন অনু-মনু-রবু-ও যা মনোলীনাও তাই।

চা দিতে দিতে হাসিমুখেই মনোলীনা রাগ করে বলে, রোজ আমার জন্যে আজ ফুলদানি, কাল বই আনেন কেন ? আমি কি রোজ খেলনা চাই।

বিনায়ক বলল, রোজ ত আসিনা। আর এগুলো তো খেলনা-ও নয়। আপনাদের বিয়েতে একসংগে কিছু দিতে পারিনি, সেগুলো ক্রমে ক্রমে দিচ্ছি। কিন্তু প্রবীর কি একদিনও বিকেলে বাড়ি থাকেনা এত কি তার কাজ ?

মনোলীনা বলল, থাকেননা বললেই হয়। কত কাজ।

বিনায়ক বলল, বর্ষার বিকেলে গল্পও তো একটা কাজ। সে করছে কে ?

মনোলীনা অস্বস্তি বোধ করার আগেই বলে, ছোটবেলায় নিশ্চয়ই এমনদিনে আপনি চুরি করে আচার খেতেন ঘুরে ঘুরে।

মনোলীনা হেসে ফেলে বলে, কি করে জানলেন ?

বিনায়ক বললে, চেষ্টা করলেই জানা যায়। তা এখন আচার খাওয়ান তাহলে, কই, শুধু বিস্কিট দিলেন যে বড় !

মনোলীনা বলল, আচার আমি করতে জানি নাকি, বাঃ।

বিনায়ক বলল, জানেননা ? হায় হায় !! থাকগে না জানলেন, গান জানেন তো ? তাই শোনান।

মনোলীনা বললে, তা-ও জানিনা "কোনও গুণ নাই তার।"

বিনায়ক পাদপূরণ করে বললে, "কপালে সিঁদুর।" মুস্কিলেই ফেলেছেন, অতিথি-সৎকার করবেন কী দিয়ে। শীগ্‌গির গল্প বলুন তাহলে।

মনোলীনা বলল, রেডিও শুনবেন ?

বিনায়ক হাসল, বলল, অতটা সঙ্গীত-রসিক ভাববেননা আমাকে। আপনার স্কুল ছুটি হবে কবে ?

মনোলীনা বললে, পূজোর ? সে তো অনেক দেরি !

বিনায়ক বলল, অনেক মানে কত, দেড়মাস ?

মনোলীনা বলল, প্রায় তাই।

বিনায়ক বলল, তাহলেই তো সবচেয়ে ভাল, ঠিক ওই সময়েই আমি হায়দ্রাবাদ যাচ্ছি, আপনাদের নিয়ে যাওয়া যাবে।

মনোলীনা বলল, ওর ছুটি কোথায় ?

বিনায়ক বলল, সে আবার ভাবনা নাকি ? ছুটি নেওয়া তবে বলে কাকে !

মনোলীনা বলল, কাজও তো আছে তাছাড়া।

বিনায়ক বলল, আপত্তি সব নাকচ হয়ে যাবে। যেতে আপনাকে হবেই।

মনোলীনা হেসে ফেলে বলল, না পারি আচার খাওয়াতে, না পারি গান শোনাতে, নিয়ে গিয়ে করবেন কী।

বিনায়ক গম্ভীর মুখে বলল, সে সব সত্যিই ভাববার কথা। তবে ও আমি আর প্রবীর পরামর্শ করে ঠিক করে ফেলব।

গেল আশ্বিনে সবে এই সাদা মেঘের পালা সুরু হতে না হতে মনোলীনা মুখের কথায় প্রকাশ করেছিল মনের সম্মতিকে। ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীর খোলা মাঠের ভিতরে চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল প্রবীর। বর্ষায় সবুজ ঘাসে শরতের সোনালী আলো পড়েছে। পড়ন্ত বিকেলের অপ্রখর রোদ। পোর্টফোলিও হাতে বাড়ি ফিরে এল প্রবীর। সামনেই মনু।

—এই মনু। তোর বৌদি কোথায় রে !

বৌদি। ওই ও ঘরে বিনুদার সঙ্গে গল্প করছে !

রীতিমত হাসিতে গল্পে সভা জমে গেছে একটা। দু-জনে সম্পূর্ণ সভা। প্রবীর যেন অতিথির মত নিজের ঘরে ঢুকেছে। দুজনেই আপ্যায়নে অধীর হয়ে উঠেছে।

—ওমা, তুমি এসে গেছ! কতদিন পরে বিকেলে বাড়ি এলে !! যাওনি বুঝি লাইব্রেরীতে—না ? ঠিক বুঝেছি।

মনোলীনার হাসি ছেলেমানুষী, হাত থেকে পোর্টফোলিও নেওয়া একটু জোর করা যেন ! না ?

বিনায়ক উঠে দাঁড়িয়ে একটু বাড়াবাড়ি হাসি-হাসি মুখে বললে, বোস বোস প্রবীর ! আমি যাই আজ।

প্রবীর বলল, আমার বসার সঙ্গে তোমার ওঠার সম্পর্ক কী।

বিনায়ক একটুও অপ্রস্তুত না-হয়ে হেসে বলল, কোনও সম্পর্ক নেই, আমার ওঠার

এমনিতে দরকার ছিল। Asiatic Society Hall এ মিটিং আছে একটা, ইচ্ছা করত' আসতে পার।

প্রবীর শুকনো গলায় বলল, না।

বিনায়ক মনোলীনার দিকে চেয়ে বলল, তুমি যাবে নাকি, না ?

মনোলীনা অস্বস্তি বোধ করে বলল, না।

প্রবীর বলল, যাওনা যদি ইচ্ছে করে।

এতে মনোলীনা কি বলবে কিছু ভেবে না পেয়ে ডেকে বলল, অনু, চায়ের জল কি চড়িয়েছ ? বলতে বলতে সে গেল চলে। বিনায়ক ঘরের বাইরে গিয়ে জুতো পরতে লাগল। সেদিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে প্রবীরের মনে পড়তে লাগল যে প্রায়ই আজকাল সে শুনেছে বটে যে বিনায়ক এসেছিল। মনোলীনা-ই বলেছে। বলেছে কি রকম মজার লোক বিনায়ক, আবার কী-রকম অদ্ভুত। কেন যেন খেয়াল করেনি প্রবীর সে সমস্ত খবরে। সে কি তলিয়ে গিয়েছিল তার লেখাপড়ায় ?

বিনায়ক বলল, যাই প্রবীর।

প্রবীর হঠাৎ সাড়া দিতে পারলনা।

একটু পরেই চমক ভাঙ্গলো মনোলীনার স্বরে। মনোলীনা বলছে, অমন করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, হাত-পা ধোবেনা ? চা হয়ে যাবে এক্ষুনি।

এর পরে পরপর ক'দিন কিছুতেই লাইব্রেরীতে যেতে পারলনা প্রবীর, অফিসের, পরেই, এমন-কি কোনও কোনও দিন একটু আগে বেরিয়েই চলে আসতে লাগল বাড়িতে। তার লেখার দ্বিতীয় পর্য্যায় এতদিনে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। গুণীজনের কাছে ইতিমধ্যেই সে-যে স্বীকৃতি পেতে সুরু করেছে। কাজ সম্পূর্ণ করে ফেললে তার জোরে সে-যে সদাগরী অফিসের ওই তুচ্ছ কাজের বন্ধন থেকে মুক্তি নিয়ে নিজের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে। এ-সমস্ত প্রকার উজ্জল সম্ভাবনার চিন্তাও তাকে কিছুতেই অন্যদিকে পা বাড়াতে দিলনা। সে সোজা চলে এল মনোলীনার কাছে।

মনোলীনা হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা করে। খুশিমুখে তার সংগে বলে কথা, বলে, মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেওয়াই তো ভাল, অফিসের তো কামাই নেই, পড়াতে একটু ঢিলে কখনো-সখনো না দিলে চলবে কেন ? ভেবনা, ঠিক হয়ে যাবে।

বেড়াতে যায় তারা এখানে ওখানে। এমনি করে সপ্তাহখানেক কেটে গেল।

সেদিন শনিবার। অফিস থেকে বেরিয়েই প্রবীর সিনেমার টিকিট কেটেছে ছ'টার শো'র। হাসিমুখে এসেছে বাড়িতে। খাটের ওপরে আড় হয়ে বসে আছে মনোলীনা।

—ইস্কুল থেকে পালিয়ে আসা হল কখন।

মনোলীনা একটুখানি হেসে মুখ ফিরাল, কখন এলে ?

প্রবীর ছেলেমানুষী সুরে ধমক দিতে দিতে বলল, যখন খুশী আসি। তুমি ওঠো ত, ওঠো ওঠো, শীগ্গিরি তৈরী হয়ে নাও। ওঠো বলছি।

শরীরটিকে আরো এলিয়ে দিয়ে মনোলীনা বললে, ভীষণ ক্লান্ত লাগছে জান। আজ স্কুলেও যাইনি।

—ভালই করেছ। ও-সব কি হয় স্কুলে টুলে গিয়ে। তার চেয়ে এইবার উঠে লক্ষ্মি-মেয়েটির মতো সেজে নাও। চা-টা বাইরেই খাব আজ কি বল ?

অন্য সময়ে এত আগ্রহের সুরে কথা শুনলে মনোলীনা কৌতূহলী হ'ত, জিজ্ঞাসা করত, কি হয়েছে গো ? সিনেমার টিকিট এনেছ বুঝি ? কি ছবি বলনা ? আরো কত কী। আজ কী হয়েছে মনোলীনার। শান্ত গলায় শুধু আস্তে আস্তে বলল, বেরোতে চাও !

প্রবীর বলল, তুমি চাওনা ? তোমার অন্য কিছু প্ল্যান আছে নাকি আজ বিকেলের জন্যে ? আরে টিকিট নিয়ে এসেছি যে।

মনোলীনা লাফিয়ে তো উঠেই না, হাসেও না। বরং, যেন একটু শঙ্কিত হয়ে বলে, কেটে ফেলেছ একেবারে ?

—তাতে মারা পড়েনি কেউ। কিন্তু তোমার হ'ল কি মনু ?

—কিছু না। কেটেছ যখন চল যাচ্ছি।

সিনেমা হলে যেন বন্দী ছিল মনোলীনা। হাসির দৃশ্যে হাসেনি এমন নয় কিন্তু সে যেন মুহূর্ত গুনছিল কখন বেরোবে হল থেকে, আর বেরিয়েই বলবে, এখনি বাড়ি ফিরবে ? চলনা একটু বিনায়কবাবুর বাড়ি যাই, কতদিন ধরে যে বলছেন ভদ্রলোক। উনি তো আবার বোধ হয় বাইরে যাচ্ছেন কাজে, জানো ?

এইটুকু কথা এমন অবলীলাক্রমে গুছিয়ে বলতে কতক্ষণের রিহার্সেল মনে মনে দিয়েছে মনোলীনা, কে জানে ! প্রবীরের ছবি দেখার সমস্ত আনন্দ একমুহূর্তে নিভে গেল। কিন্তু নিজেকে সে গুছিয়ে নিয়েছে। মনোলীনা যেন নিতান্ত বালিকা, নেহাত ছেলেমানুষীর ভুলে এমন প্রস্তাব করে ফেলেছে এমনি সুরে। অত্যন্ত পটুভাবে বললে, ন'টার পরে আবার কোথাও যাওয়া ? ওরে বাস, এখনি তো বাড়ি পৌঁছতে সাড়ে ন'টা বেজে যাবে। তাই ভুলে রাস্তায় নেমে বাসষ্টপের দিকে এগোতে এগোতে বলে, বিশেষত বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে মা এমন হয়েছেন ! বলিনি তোমাকে ? সেই একদিন দশটা বেজে গিয়েছিল ফিরতে রাত্রে—

কিন্তু মনোলীনা ত সত্যিই বালিকা নয়। কোনও এক নগণ্য পরিবারের নগণ্য কাহিনী

শুনতে আজ এখনি যদি সে লেশমাত্র আগ্রহ বোধ না করে, এমনই কী দোষ তার! প্রবীর বলল, মাঠে একটু বসবে, সেই গীর্জাটার ধারে?

মনোলীনা একটু হেসে বললে, দশটা বেজে যাবে।

প্রবীর সোজাসুজি তাকাল তার দিকে। বললে, তুমি ছেলেমানুষ নও মনোলীনা।

মনোলীনা বলল, নই-ই তো। তাই ত বলছি বাড়ি চল।

বাড়ি গিয়ে তারা যেন আবার ভুলে গেছে এ-সমস্ত কথা। এমন ভাবে ব্যবহার করলে। মনোলীনা ননদ-দেওরকে সিনেমার গল্প শোনালে, শ্বাশুড়ীর কুশল নিলো। শোভন ভাবে ছুটো একটা রহস্য করল স্বামীর সংগে। প্রবীর-ও হাসলো, কথা বললো, শুধু তার চোখ থেকে থেকে তীক্ষ্ম হয়ে উঠলো।

রবিবারের সকালে সাধারণতঃ তারা সকাল বেরোয়। নটা বেজে যায় মনোলীনা কলঘরের দিকে পা-ও বাড়ালোনা। তার চা জুড়িয়ে ঢাকা পড়ে আছে। রবু ব্যাখ্যা করে বলল, বৌদির ঘরের কাজ শেষ হয়নি যে। প্রবীর বিস্মিত ভাবে খবরের কাগজ ফেলে এসে ঢুকলো ঘরে—কী, ব্যাপার কী বলত?

মনোলীনা কাঁচের আলমারীর বইগুলি পেড়ে মুছে রাখছিল। মুখ না ফিরিয়েই বলল, পেড়ে মুছে রাখছি। নাড়াচাড়া না পড়লে বই-এ পোকা ধরে যাবে যে।

প্রবীর স্তম্ভিত হয়ে বলল, মাত্র তিন সপ্তাহ ওগুলো নাড়িনি চাড়িনি বলে এমন পোকা ধরে যচ্ছে যে আজই সকালে তোমার ওগুলো না ঝাড়লে মুখে অন্ন রুচছেনা।

মনোলীনা শান্তভাবেই বলল, অতখানি বক্তব্য আমার ছিল নাকি। বুঝতে পারিনি ত।

একমুহূর্ত রাগে কানছুটো আগুন হয়ে উঠল প্রবীরের। কিন্তু কথা বলল ভদ্রভাবেই, বলল, ওইটুকুর ভিতরে যে আরো বেশি বলতে চেয়েছ সেকি আর আমি জানিনা?

মনোলীনা আজ যেন কিছুতেই থামতে দেবেনা প্রবীরকে। হাতের বইখানায় ঝাড়ন বুলোতে বুলোতে বলল, জানবে বই-কি, বুদ্ধিমান লোক ত!

কী বলবে প্রবীর এর উত্তরে। এমন মেয়েলী ঝগড়ার উত্তরে! কী নির্বিকার শান্ত মনোলীনার দাঁড়ানোর ভঙ্গি। কী নিরুদ্বিগ্ন ভাবে তার হাত নড়ছে।

রবু এসে বললে, দাদা, বিনুদার পিওনটা এই চিঠিটা দিয়ে গেল।

মনোলীনার হাত স্তব্ধ হল। প্রবীর একবার তাকানোর চেষ্টামাত্র না করে খামশুদ্ধ চিঠিখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিল।

রবু সসংকোচে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মনোলীনা তেমনি স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল প্রবীরের দিকে। প্রবীর বলল, কী দেখছ?

কি নিরুত্তাপ হাসি মনোলীনার! বলল, একটা গল্প মনে পড়ে গেল। মাথা নিচু করে ফের হাতের কাজ তুলে নিল হাতে মনোলীনা, আপন মনেই বলল আবার, ছোটবেলায় একটি মেয়ে বছর ছুই ভয়ানক চেষ্টা করেছিল আমাকে হারিয়ে ক্লাশের পরীক্ষায় প্রথম হতে। কিছুতেই যখন পারলনা—প্রোমোশনের দিন অ্যানুয়াল রিপোর্টখানা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল।

পাংশু হয়ে গেল প্রবীর। হাসতে গিয়ে মনোলীনা-ও পাংশু হয়ে গেল। সে কী জানত এত নিষ্ঠুর হতে পারে তার কথা!

কিন্তু এমন করে হারের কথা শুনেও প্রবীর কি করতে পারে? সারারাত খোলা বারান্দায় তার পায়ের শব্দ শোনা গেল। অনু-রবু পর্য্যন্ত যেন ভয় পেয়েছে। ভয় পেয়েছেন তাদের মা। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, কবে না হয়েছে! কিন্তু একা!!

পরের দিন সকালে মনোলীনা তার মায়ের কাছে চলে গেল। এতে অভিনব কিছু নেই। এমন কে এই সেদিনও গিয়েছে। মেয়েছেলে, তিনকুল নিয়ে ঘর, নিলায়েরে তো সে নয়। শাশুড়ী মাথায় হাত দিয়ে বললেন, শরীরটা একটু শুধরেই চলে এস কিন্তু মা, তোমার সংসার, বেশিদিন ফেলে কি নিজেই থাকতে পারবে।

সত্যিই যেন শুকিয়ে গেছে মনোলীনা। ফ্যাকাশে মুখে একটুখানি হেসে গাড়িতে গিয়ে উঠলো সে। অন্যান্য বারের মতই হাত নাড়লো গাড়ির ভিতর থেকে। অন্যান্য বারের মতই ছুটির দিনে প্রবীরের নিমন্ত্রণ হল শ্বশুর বাড়িতে। প্রবীরের একবার ইচ্ছা হল চীৎকার করে আপত্তি জানাতে। তারপরে সময়মতই কিন্তু গেল সে সেই চেনা বাড়িতে। এই তিন চার দিনেই মনোলীনা যেন আরো শুকিয়ে গেছে। কী ছুর্লঙ্ঘ্য দূরত্ব!! কিছুতেই প্রশ্নও করা যাবেনা যেন কিসে তাকে শুকিয়ে ফেলেছে। প্রবীয় হাতের তেলোয় মাথা রেখে সামনে ঝুঁকে বসে রইল। কিন্তু শান্ত শোভন ব্যবহারের শিক্ষা মনোলীনার ত কম দিনের পুরোনো নয়, আর স্থৈর্যের জন্য সুখ্যাতি তার ঘরে বাইরে। তাই তার সহজ সহৃদয় আপ্যায়নে ত্রুটি প্রায় রইলনা বললেই চলে। শুধু, ছিদ্রান্বেষী লোক থাকলে বলত, স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে এত ভদ্র আপ্যায়ন কেন? প্রবীর মাথা তুলে বলল, আমি একটু একা থাকব।

মনোলীনা বলতে পারত তাহলে নিজের ঘরে একা থাকলেই হ'ত, বলল না। তার বদলে বলল, মা কি ভাববেন?

—তার জন্য এত ভাবনা কেন ? ভয় ?

মনোলীনা একটু হাসার চেষ্টা করল। বলল, ভয় করলে তোমাকে বিয়ে করার সময়েই ভয় পেতাম। কম ভয় ত দেখায়নি সবাই মিলে।

প্রবীর বললে, অবস্থাটা তুলনায় বটে !

মনোলীনা বলল, কথা হচ্ছিল ভয় নিয়ে।

প্রবীর উত্যক্তস্বরে বলল, বলছিনা আমি একটু একা থাকতে চাই।

মনোলীনা উঠে চলে গেল।

পাছে সেই পুরোনো বছরের দিনটি আবার ফিরে আসে, সেই তাদের বিয়ের দিন (কে জানত দিন এক বছরে এত পুরোনো হয়ে যায়, এত তিক্ত হয় তার স্মৃতি !) এই চিন্তা প্রবীর-কে তাড়া করে ফিরছিল। তার আগেই সে কলকাতা ছেড়ে পালাতে চায়। শ্বশুর বাড়িতে সে সেদিনের পর আর যায়নি। শ্বশুর শাশুড়ীর সস্নেহ আহ্বানেও না, ছুতো দেখিয়েছে কাজের ! ছেড়ে দিয়ে পড়াশুনো, অফিসের কাজে ঢিলে দিয়েছে, প্রাণপণে চেষ্টা করেছে অন্যত্র কাজ পাবার। ক্যালেণ্ডারের তারিখে তখনো দিন পনের বাকি আটাশে মাঘের. সেদিন দিল্লী থেকে নিয়োগ পত্র এল তার। যেতে হবে কালই। ছুটি তার স্মৃতি-মেশানো কলকাতা থেকে, আত্মীয়-পরিজনের সকৌতুক সমবেদনা থেকে, মনোলীনার দেখা পাওয়ার সম্ভাবনার ভয় থেকে, সহস্র জনরব থেকে।

ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল প্রবীর। ঘুম ভেঙে দেখল বাতি জ্বলছে। টেবিলের ঘড়িতে বেজেছে রাত্রি বারটা। তারই পাশে দু'খানা থালায় ঢাকা দেয়া-ভাত হয়ত দু'গ্লাস জল। মেঝেয় বসে তোরঙ্গ গোছাচ্ছে মনোলীনা। তাকে উঠতে দেখে বলল, কোটটার ডেলিভারী দিলনা আজকে, কাল সকালে উঠে ওটা এমনিই চেয়ে এনো লণ্ড্রি থেকে, বাড়িতেই যা পারি ইস্ত্রী করে দেব।

প্রবীর সোজা হয়ে উঠে বসল। ঘুমভাঙা গলায় বলল, কখন এলে ?

—সন্ধ্যায়। এসে দেখি ঘুমুচ্ছ।

—এলে যে ?

—আসবনা ! মনোলীনা আনন্দহীন হাসি হাসল। বলল, এস, খেয়ে নিই। রাত্তির কম হয়নি। কী শীত পড়েছে দেখেছ !

কেমন বোকা লাগল প্রবীরের নিজেকে। বুঝতে চাইল অবস্থাটা, ভাবতে চাইল, হয়ত বোঝাপড়া-ও তার করার ছিল অনেক মনোলীনা-র সংগে, কিন্তু এতদিনের শ্রান্তিতে ভরা শরীরকে কোনমতে তুলে খেয়েই ফের শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে ঘুম ভেঙে দেখল মনোলীনা উঠে গেছে।

বাইরে এসে দেখল সংসার গোছাতে সুরু করেছে মনোলীনা মা-র সংগে। মা একগাল হেসে বললেন, বৌমা-র বাবা বাসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন ওখানে খোকা, কাল ও এসেই ফোন করে ঠিক করল, ওনার চেনা বন্ধু আছেন তাঁর বিরাট বাড়ি, টেলিগ্রাফ করে দিয়েছেন তাঁকে। একসংগেই সব যাওয়া গেল। মা-লক্ষ্মি এসে পড়লে ভাবনা কী !

আড়ালে পেয়ে প্রবীর মনোলীনাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি চলেছ কোথায় আমাদের সংগে।

মনোলীনা বলল, আমার বাসায়। স্বামীর ঘরে যাবনা ?

শান্ত সংযত মনোলীনা, অক্ষুন্ন আজো মনোলীনার দেহশ্রী, শুধু সেই মাধুর্যটুকু যেন হারিয়ে গেছে যে মাধুর্য্যে এ কথা মধুরতম হয়ে উঠত।

প্রবীর হঠাৎ বললে, বিনায়ক হায়দ্রাবাদ চলে গেল।

মনোলীনা শান্তস্বরে বললে, পরশু। তোমার কোটটা কি এনেছ ?

প্রবীর কথার শেষাংশে কান না দিয়ে বললে, তাই তুমি আমার সংগে যাবে ?

মনোলীনা সহজভাবে তার দিকে চাইল, 'তাই' মানে কি ? আমি তো তোমার স্ত্রী এতে 'তাই' 'তবে'-র কি আছে।

প্রবীর ধৈর্য্যরক্ষা করে বলল, এই সামাজিক সত্যটা বড্ড বড় ঠেকছে ?

মনোলীনা ঘরের ভিতরে যেতে যেতে বলল, তা শাঁখা সিঁদূরের জোর ত আছেই।

"সমুদ্র-প্রকোষ্ঠে কাটে বিলম্বিত কাল
পাশে থাকে জলগুল্মঘাসের মালিনী সিন্ধু-রাই,
মালা তার মেটে আর লাল,
যতোক্ষণ মানুষের স্বর নেই জাগাতে এবং ডুবে যাই।"

টি-এস-এলিঅট ॥

ভারত-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ

ইন্দ্রজিত্

পূর্ব্বানুস্মৃতি

সাধকের মৃত্যু হোতে পারে কিন্তু সাধনার মৃত্যু হয়না। সাধনা পরাজিত হোয়েও থেকে যায় অস্তিত্ব হিসেবে। তেমনি রামমোহন বিলেতে "ব্রিষ্টল" নামক স্থানে মারা গেলেন কিন্তু তাঁর মারা যাওয়ার পরও ব্রাহ্ম সমাজের মান রক্ষা করে আস্‌ছিলেন রামমোহনের সহযোগী রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। কিন্তু এরই ভেতরে ব্রাহ্ম সমাজ পেল এক নতুন নেতাকে যাকে রামমোহনের উত্তরাধিকারী বল্‌লে কিছুমাত্র অন্যায় করা হবে না বলে মনে করা যেতে পারে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে, বাংলা মাসের ৭ই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখতে পাওয়া গেল রামমোহনের শূন্য স্থান পূর্ণ করেছেন ব্রাহ্ম সমাজে। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষা অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করেন, এর আগে দীক্ষা জিনিষটা ব্রাহ্ম সমাজে ছিলনা বলে ব্রাহ্ম হওয়ার ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক দিক দিয়ে কিছু অভাব থেকে গিয়েছিল। কিন্তু ঠাকুর-পরিবার ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষা প্রচলন করবার পর সাধারণ লোকের পক্ষে ব্রাহ্ম হওয়ার পথ সুগম হোল।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বোধিনী সভা বলে একটি নতুন সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' তার গোড়ার দিকে দশ জন লোককে পেয়েছিল সদস্য হিসেবে। তারপর সেই সভায় সভ্য সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচশোতে। নদীয়া ও বর্দ্ধমানের মহারাজা প্রভৃতিও যোগদান করলেন।

'তত্ত্ববোধিনী সভার' নেতা ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তিনি নেতাও যেমন ছিলেন আবার তেমনি তিনি "তত্ত্ববোধিনী সভা'র মুখপত্র "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" সম্পাদকও ছিলেন আর সেই পত্রিকায় তখনকার দিনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি লেখা দিতেন।

ভারতবাসীকে তাদের নিজস্ব শাস্ত্র বেদের বিষয় জানতে হবে এটা তখনকার দিনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বুঝতে পেরেছিলেন। সেই কারণে ও তার নিজস্ব অনুপ্রেরণায় একজন তরুণ যুবক যিনি "তত্ত্ববোধিনী" সভা'র কাজের সঙ্গে যুক্ত তাঁকে কাশীতে পাঠানো হোল বেদ ভাল করে বুঝে আসবার জন্যে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দেই দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পরিচালনায় রামমোহন প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম সমাজ জন-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত

হোয়েছিল দৃঢ় ভাবে। সে সময় হঠাৎ উমেশচন্দ্র সরকার হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করলেন। এই ব্যাপার অর্থাৎ উমেশচন্দ্র সরকারের খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করাটা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঠিক মনঃপূত হোল না। তিনি খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষা দেবার আন্দোলনকে সমর্থন করলেন না। এই ব্যাপারে খৃষ্ট ধর্ম্মের পক্ষ থেকে আলেকজেণ্ডার ডাফ্ নামে এক ইংরেজের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিনিধি রাজনারায়ণ বোসের এক বিতর্ক হয়।

রামমোহনের সময় রামমোহন নিজে সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয় বলেছিলেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু সমাজের কুসংস্কার বলে অনেক জিনিষকে দেখালেন, যেমন অসংযম, বহু বিবাহ প্রথা প্রভৃতি। আবার বিধবা বিবাহকেও স্ত্রীশিক্ষাকে উৎসাহিত করেছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমকালীন ব্রাহ্ম ধর্ম্মীরাও। এরপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজের দিকে দৃষ্টি দিলেন, চলে গেলেন তিনি ব্রাহ্ম সমাজ ছেড়ে হিমালয়ের পথে সাধনার উদ্দেশ্যে। আর তারপর অনেকদিন বাদে আবার তিনি ফিরে এলেন তাঁর ব্রাহ্ম সভায়। তখনই ঠিক তিনি মহর্ষি। এসে দেখলেন রামমোহনের আসনে ধূলো পড়বার ভয়ে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যেমন ধূলো ঝেড়ে কোন রকমে ধর্ম্মের প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে ছিলেন, তারপর সেই রামমোহনের শূন্য আসনে এলেন নতুন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের উত্তরসাধক, আবার হিমালয় থেকে ফিরে আসার পর বৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ দেখলেন যে সেই রামমোহনের আসনের উপযুক্ত লোক ব্রাহ্ম সভায় যোগদান করেছে সে লোক বুদ্ধিতে করছে জ্বলজ্বল, বিপুল সুসম্ভাবনা যেন তার চোখমুখ থেকে ফেটে পড়ছে। দেখলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্র সেনকে।

রাজা রামমোহন রায় এটা চাননি যে ভারতবাসী বিদেশী ইংরেজের ধর্ম্ম গ্রহণ করুক এবং সেই দিক দিয়ে তিনি চেষ্টা করে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রবর্তন করেছিলেন, ডাক দিয়েছিলেন স্বদেশকে কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে বিদেশকে নয়। তাঁর পরে দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহনের অপূর্ণ আশাগুলোকে পূর্ণ করবার দিকে মন দিয়েছিলেন ও নিজেও অনেক কিছু করে ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার ভেতর দিয়ে কিন্তু খৃষ্টবাদীদের দৃষ্টান্তকে দ্বারকানাথ ঠাকুরও কোনও দিন সম্পূর্ণ সমর্থন করেন নি। আর দেশের লোক যাতে খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে পর হোয়ে যায় এ চাননি তাঁরা কেউ। সুতরাং ব্রাহ্ম ধর্ম্ম মূলত খৃষ্ট ধর্ম্মের হাত থেকে ভারতবাসীকে দূরে রাখতে চেয়েছে বা তাদের ধর্ম্ম পিপাসার অবসান ঘটবার জন্যে, প্রাচীন শাস্ত্রের উচ্চ আদর্শগুলো সাধারণের চোখে তুলে ধরবার জন্যে প্রবর্ত্তন করেছেন ব্রাহ্ম সমাজের।

কেশব সেন ব্রাহ্ম সমাজের ভেতরেও যেন গোঁড়ামি খুঁজে পেলেন। কারণ তিনি ব্রহ্মবাদী ছিলেন বটে কিন্তু সেই ব্রাহ্ম সমাজে তিনি প্রবর্ত্তন করলেন সঙ্গীতের ব্যবস্থা।

সে সঙ্গীত কীর্ত্তন বলেই পরিচিত হোল জন সমাজে। কারণ তিনি জানতেন যে শাস্ত্রের শুকনো কথা বা বেদের শ্লোকেও সেদিনকার মানুষের মন ভেজান সম্ভব নয়। সেই কারণে তিনি জানতেন যে ব্রহ্মবাদ সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হোলে সাধারণের কাছে আদরণীয় হবে বেশী। অবশ্য তাঁর আগেকার দিনে রামমোহন রায়ের দিনে রামমোহন নিজে এ বিষয়ে অগ্রণী হোয়েছিলেন। সে বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করা গিয়েছে কিন্তু তথাপি পরবর্ত্তী কেশব সেনের প্রবর্ত্তিত এই কীর্ত্তনের দলে সে সময়কার লোকে গ্রহণ করেছিল। এর একটা কারণ হোল কেশব সেন প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম সমাজের ব্রহ্ম-কীর্ত্তনের ভাষায় ঠিক জোর করে ঈশ্বরের নিরাকারত্বকেই প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়নি, তার ভেতরে আমরা পেয়েছি ভগবানের বিরাট রূপকে। সে রূপকে পেয়েছি করুণা ধর্মরূপে।

কেশব সেন কোন জাত বিশেষকে যোগদান করতে বলেন নি আবার কোন জাত বা সম্প্রদায় বিশেষকে ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করাতে বাধা দেননি, কারণ তিনি জানতেন যে ভারতবর্ষের ভেতরে আজ এমন ধর্মমত ও সংস্কৃতি এসেছে যখন আর কোন উপায় নেই তাকে উপেক্ষা করবার। সুতরাং সে পথে না গিয়ে তিনি ধীর গতিতে বুঝতে চেষ্টা করেছেন নবাগত সংস্কৃতির সঙ্গে কতখানি সংযোগ হোতে পারে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির আর সেই মতানুসারে তিনি কাজ করে গিয়েছেন।

এরপর আমরা নতুন একটি সভার পরিচয় পেলাম সেটার নাম সমদর্শী পার্টি। প্রতিষ্ঠিত হোল ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে। ব্রাহ্ম সমাজের কাজ বাড়তে লাগলো দিনে দিনে। এই ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যে সমস্ত লোক প্রথম দিকে জড়িত ছিলেন তাদের ভেতরে অনেকেই পরে রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা হোয়েছিলেন সেকথা ইতিহাসও বলে। সেদিনকার ব্রাহ্ম সমাজ যে উনিশ শতকের ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনকে সর্ব্ব-প্রথম পথ দেখিয়েছিল সেকথা আমরা চিন্তা করলে বুঝতে পারি, যদি গভীর ভাবে চিন্তা করি।

ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলন ও তার পরবর্ত্তী যে সমস্ত আন্দোলন হোল সেগুলোর ভেতরে আমরা উৎসাহ লক্ষ্য করেছি খুব বেশী, এমন কি রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা উনিশ শতকে লক্ষ্য করেছি যে সেখানে বড় লোকের মনে কাজ করবার উৎসাহ বা সভা সমিতি করবার ও তাতে বক্তৃতা দেবার উৎসাহ অনেকখানি।

এর একটি মূল কারণ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে আঠারো শতকের শেষ ভাগে বা উনিশ শতকের প্রথম বা সম্পূর্ণ শতকটা ধরে যে সমস্ত ধর্ম বা সামাজিক আন্দোলন আমরা লক্ষ্য করেছি, সেগুলোর ভেতরে জনসাধারণ খুব বেশী নেই বরং দেশের ধনী সম্প্রদায়ই আছে সে সমস্ত যুগের আন্দোলনে। এর কারণ হোল ১৭৯৩ খষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ যে জমি-দারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন সেই কারণবশত অর্থাৎ আর্থিক দিক থেকে

জমিদাররা নতুন শাসকদের কাছ থেকে নিশ্চিন্ত হোয়ে তারপর সমাজ-কল্যাণের কাজে, ধর্ম সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করতে পেরেছিলেন। তাই সে সমস্ত আন্দোলনে জন সাধারণের তেমন কোন প্রতিনিধিকে আমরা দেখতে পাইনা। তার কারণ তাদের জীবনের ভার কমাবার ভার তো কেউ নেয়নি সেদিন, কেউ তৈরী করেনি তাদের দুঃখ দূর করবার আইন, এমন কি নতুন শাসকরা পর্য্যন্ত না। যাদের দুঃখ কপালে ছিল তাদের দুঃখ সেই কপালে পাকা কালী দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী করে দিলেন লর্ড কর্ণওয়ালিশ।

ইংরেজের স্বরূপ বোঝা গেল তাদের ভারতে আসবার পর। আর আরও ভাল ভাবে বোঝা গেল যখন তারা ভারতবর্ষের শাসক হিসাবে ভারত ভূমির ওপর কায়েমী হয়ে বসেছে।

কিন্তু তাদের এই স্বরূপ নানা কারণবশত ভারতবর্ষের সমস্ত লোকে বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারেনি যে তারা শাসন করবার প্রধান অস্ত্র হিসেবে ভেদ-নীতিকে গ্রহণ করবে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইতিহাস একটি স্মরণীয় ইতিহাস। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবনে ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণের জীবনে দুঃখের ও শোকের যে ঘনায়মান কালো ছায়া পড়েছিল সে দুঃখ, সে দুঃখের আগুনের মতন শিখায় পরিণত হোয়ে আরতি করলো গণ-দেবতাকে আর সেই গণদেবতা সন্তুষ্ট হোয়ে পরিণত হোলেন গণচেতনায়। ধর্মের ভেতর দিয়ে বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে ভারতবাসীর মন হরণের চেষ্টা চলেছে এতদিন ধরে। যখনই কোন বিদেশী ভারতের ধর্মকে আক্রমণাত্মক মন নিয়ে স্পর্শ করেছে তখনই ভারতবাসী রাগে হোয়েছে আত্মহারা এই ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে যে সভ্যতা, যে সংস্কৃতি তাকেই এতদিন ভারতীয় সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা হোয়েছে। ভারতবাসী একে আদর করেছে, করেছে যত্ন, চেষ্টা করেছে এই অমূল্য রত্নটীর ওপর যেন কোন বিদেশী কোন পাষাণের হাত না পড়ে যে এর পরিপূর্ণ মর্য্যাদা দিতে পারবে না। কিন্তু মূলত ভারতীয়রা যুদ্ধ করেছে, বিদ্রোহ করেছে, সংস্কাত বলে বোঝাতে চেয়েছে ধর্মকেই। তাই ধর্ম রক্ষা মানে সংস্কৃতি রক্ষা আর সংস্কৃতি রক্ষা মানে জাতির সব রক্ষা কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে দেখা গেল দুঃখ আসে মানুষের জীবনে চরম রূপে বারে বারে কিন্তু সুখ আসেনা সেই রকম পরম ভাবে। মানুষ চাইলো ধর্ম সুখের জন্যে ; ধর্ম মানুষকে ধর্ম দিল, দিল উচ্চ আদর্শ কিন্তু সুখ দিলনা। মানুষ যা চাইলো তা পেলনা। এটাই সব চেয়ে বড় কথা, মানুষের জীবনের সংগ্রামে কিন্তু সুখের আশায় ভারতবর্ষের মানুষ পাগল, তার চিরন্তন সুখ লাভ করবার পথে যুগে যুগে সে অনেক জিনিষ আবিষ্কার করেছে, করেছে অনেক জিনিষ তৈরী, কিন্তু সেইগুলো তার জীবনের মূল কারণ নয়। তাই সিন্ধুসভ্যতার উত্তরপুরুষেরা এসে থামলো ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে।

সুখাকাংখী এই উত্তরপুরুষদের শরীর বহন করেছে শত শত বছরের ক্ষত কশাঘাত, বহন করেছে সিন্ধুসভ্যতার উত্তরপুরুষ তার বলিষ্ঠ পিতৃপুরুষের রক্ত। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতভূমির ওপর মন্দিরে মন্দিরে উড়েছে ধর্মের বিজয়-পতাকা আর কত শত দেববিগ্রহের নিগ্রহ হয়েছে কালের কবলে। কখনও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে কত বছর ধরে, আবার কখনও সেটা একদিনে ধূলিসাৎ হোয়ে যায় যার কারণ সংগ্রহ করা সব সময় সম্ভব হোয়ে ওঠেনা কোন ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে। তবুও আজ পর্য্যন্ত যত রকম বিজয়-পতাকা ভারতভূমির ওপরে দেখা গেল সেগুলো মূলতঃ ধর্মের জয়ধ্বজা বলে পরিচিত একথা সহজে বোঝা যায়। পতাকা উড়েছে মন্দিরে সে পতাকা দেবতার প্রতীক, পতাকা উড়েছে রথে সে পতাকা যোদ্ধার প্রতীক, পতাকা উড়েছে রাজদ্বারে সে পতাকা ভোগের প্রতীক। এ সবই তুলেছে মানুষের দল দুরন্ত প্রত্যাশায় কিন্তু তারপর সে প্রত্যাশা তাদের হতাশায় পরিণতি লাভ করেছে।

কলদি-কবিতা

[৩৫০০খ্রীঃ পূঃ]

পঙ্কিল হাতে অপহৃতা আমি কাঁপছি ভয়ে,
দুঃখিনীতেও পীড়কের দয়া নেই হৃদয়ে।
আমার বসন-আভরণে তার দুহিতাজায়া
শোভমানা, তবু আবার সে চায় আমার কায়া!
রাজসভাতলে, মন্দিরে, ঘরে যেখানে থাকি
ডাক এলে প্রাণ ঝাপটায় যেন খাঁচার পাখী॥

গড় শ্রীখণ্ড

অমিয়ভূষণ মজুমদার

[পুর্ব্বানুস্মৃতি]

চরণকাশির জোলা নয় শুধু, সমস্ত গ্রামটাই একদিন পদ্মার গর্ভে ছিল। কোন সময়ে হয়তো চিকন্দির মাটি গ্রাস করেছিল পদ্মা, একসময়ে সে মাটি ধীরে ধীরে চর হয়ে মাথা তুলল। কিন্তু তখনো পদ্মার মনোভাব বুঝবার উপায় ছিল না। চরের তিনদিকে তো বটেই চরকে দ্বিখণ্ডিত করেও স্রোত চলত। কালক্রমে সেই মধ্যস্রোতই জোলা হ'য়েছে। চর জাগবার আগে নদীর যে অংশটায় পাক ঘুরত সেটারই কালাগত পরিবর্ত্তনে জোলার সৃষ্টি। সমস্ত অঞ্চলটাই চিকন্দির তুলনায় এদিকের ভাষায় দোলা অর্থাৎ নিচু জমি। জোলাটার প্রবাহ একটানা নয়। আঁকাবাঁকা গতিপথের কোথাও কোথাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কোথাও দু'পাশের জমির চাইতে দু'তিন হাত নিচু ; মাত্র একটি জায়গায় বারমাস জল থাকে। প্রগাঢ়তম বর্ষাতেও এখন জোলা পদ্মার স্বপ্ন দেখেনা। ভরাবর্ষার একটা দুটো মাস দু'একটি তালের ডোঙা চলে, দু'একটি জালও হয়তো ছপ্ ছপ্ করে পড়ে, কিন্তু পদ্মা তখনও অনেক দূরের কথা। বদ্ধজলায় আগাছার মতো জোলার বুকে আমনধানের মাথাগুলি জেগে থাকে জলের উপরে একআধ হাত করে। চৈত্র বৈশাখে পিচ্ছিল শ্যাওলা ঢাকা তলদেশ বেরিয়ে পড়ে ; তারপর লাঙ্গলের মুখে মাটি উল্‌টে শ্যাওলাগুলি ঢাকা পড়ে যায়, কখনো কখনো গত ফসলের বিচুলির অংশও চোখে পড়ে।

প্রবাদ এই ঃ পদ্মার সঙ্গে এর গোপন সংযোগ আছে। তার প্রমাণ নাকি এই যে, এদিকে বর্ষা নামতে একদিন দু'দিন করে যখন দেরী হচ্ছে তখন উত্তরের পাটকিলে জল এসে একসুত দু'সুত ক'রে ফুলতে থাকে পদ্মা, তখন জোলার তলদেশও ভিজে ভিজে ওঠে।

তা যতই না দুর্বল হ'ক, জন্ম যার মহাবংশে,—এরকম একটা মনোভাব হয় আলেফ সেখের।

জোলাটার অনেকাংশ হাজিসাহেব গয়রহের দখলে। মানিকদিয়ারে তাঁর বাড়ী থেকে সোজা পূবে হেঁটে এসে যে বাঁশঝাড় তার নিচে থেকে প্রায় সিকি মাইল জোলা ধরে এগিয়ে গেলে একটি বুড়ো পাকুড় গাছ, তার গোড়া পর্য্যন্ত জোলাটা হাজিসাহেব এবং তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠীর। এদিকের চৌহদ্দিটা আরও পরিষ্কার করে নির্দ্দিষ্ট করা আছে। পাকুড়ের গোড়া থেকে এপার ওপার বিস্তৃত একটা বাঁধ। এপার থেকে বাঁধ

ডিঙিয়ে নামা সহজ নয়। এদিক থেকে বাঁধের উচ্চতা প্রায়-চার পাঁচ হাত, ওদিক থেকে হাত দু'তিন। জোলা যখন টৈটম্বুর তখনও বাঁধটা আধহাতটাক জলের উপরে জেগে থাকে।

আলেফ সেখ জোলার পার ধরে হাঁটতে হাঁটতে এসে বাঁধটার নিচে হাজিসাহেবদের চৌহুদ্দির এপারে থামল। হাতের লাঠিটা দিয়ে বাঁধটার গা ঠুকতে ঠুকতে সে স্বগতোক্তি করল—বোধায় ওপারের জমি আরও ভালো।

আলেফ সেখ একটা প্রবাদ শুনেছিল সেটা এই : পদ্মার প্লাবন হলেই কেউ না কেউ বড়লোক হয়। পুরানো প্রাসাদ যখন ভেঙে পড়ে তখন পদ্মার জলে ঝন্‌ঝন্ করে লোহার শেকল বাঁধা ঘড়া পড়ার শব্দ পাওয়া যায়। যে ভাগ্যবান দুঃসাহসী, সেই আবর্ত্তের কাছাকাছি যেতে পারে তার আর হা-অন্ন করতে হয়না। বাল্যে যেমন এটা প্রাত্যহিক ব্যাপার ব'লে মনে হ'ত, এ বয়সে তেমন হবার কথা নয়। তা হ'লেও পদ্মার ভাঙা-গড়ার ব্যাপারের সঙ্গে হঠাৎ কারো ভদ্রলোক হওয়ার সম্ভাবনা তার মন থেকে একেবারে স্থানচ্যুত হয়নি। যুক্তির সাহায্যে বরং তার প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে। পদ্মার গতি-পরিবর্ত্তন মানেই জমি ভাঙা আর চর ওঠা। যার জমি ভাঙে সে নিজের কপাল চাপড়ে চাপড়ে ফাটায় আর যার ভাগ্যে চর পড়ে তার কপাল আপনি ফাটে—বরাতের বরকত, এক আবাদে বিশ ধান, ধানের মাপের বিশ নয়, বিশগুণের বিশ। সেবারের ব্যাপারটাও পদ্মার কূল ভাঙার মতো হ'য়েছিল। হেঁউতি ধানের ফলন দেখলেই মাথা ঘুরে যায়, ফসল ঘরে ওঠার আগেই। ঘরে যখন উঠল ধান তখন মতি স্থির রাখা যায় না।

ঠিক সেই বছরেই আলেফ সেখ আর তার ভাই এরফান সেখ সহর থেকে পেন্সন নিয়ে গ্রামে এসেছিল। বিদায়ের সময়ে তারা কিছু নগদ টাকা পেয়েছিল, তারই সাহায্যে বহুদিন পরিত্যক্ত নিজেদের বাড়ীঘর মেরামত ক'রে, লাঙ্গল-বিদে-বলদ কিনে, দুই ভাই স্থির করেছিল জীবনের বাকি কয়েকটি দিন শান্তির দিকে মুখ করে একটানা নমাজে কাটিয়ে দেয়া যাবে। পৈতৃক জমিজমা তাদের সামান্যই, কিন্তু তাদের দু'জনের পরিবারে সাকুল্যে ছ'টি প্রাণী। আলেফ সেখের স্ত্রী এবং একটি ছেলে ; নিঃসন্তান এরফানের দুই পরিবার।

গ্রামে আসার পর তার নিজগ্রামের কয়েকজন লোক মিলে আলেফ সেখ ও এরফান সেখের কাছে এসে কথায় কথায় বলেছিল, গ্রামে একটা পাঠশালা ছিল সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যদি দু'ভাই এদিকে নজর দেয় ভালো হয়। পাঠশালায় ধর্ম্মকথা শিখানো হবে, এবং তার নাম মক্তব হবে এই সর্ত্তে আলেফ সেখ নজর দিয়েছিল। অবশ্য গ্রামে বিদ্যোৎসাহী জনতা ছিল এমন নয়। আমজাদ, যাকে গ্রামের চাষীরা আড়ালে খোঁড়া

মৌলবী বলে, তারই উদ্যোগে ব্যাপারটা হ'য়েছিল। সে সরকার থেকে পাঠশালায় শিক্ষকতা করার দরুণ বৎসরে তিনকুড়ি টাকা পায়। পাঠশালাটাকে একটু ভালো করতে পারলে সেটা বেড়ে বৎসরে তিনকুড়ির উপরে বার টাকায় দাঁড়াতে পারে। আলেফ সেখ এর পরে মক্তবের সেক্রেটারি হ'ল এবং তদারক ক'রে পদ্মার তীর থেকে স্বচ্ছন্দজাত কাশ ও নল-খাগড়া কাটিয়ে এনে ঘরটিও মেরামৎ ক'রে দিয়েছিল।

এর পরেই এল ধানের বন্যা। সে এরফানের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ধান কেনাবেচার কাজ করেছিল। অস্থিরমতি ধানের সে এক অবুঝ পাগলামি। এ হাটে ধান কিনে ও হাটে যাও দু'টাকা ব্যাজ মণে। সাতদিনের দিন ধানের দাম বাড়ে পাঁচ টাকা। কিন্তু ভাঁটার টান লাগল ধানের বন্যায়। সে টান এমন যে চড়চড় ক'রে জমি ফেটে যেতে লাগল। ধান যেন পদ্মা। সে ভাঁটার টানে মাথা ঠিক রেখে নৌকা চালানো যার-তার কাজ নয় ত ! চৈতন সাহা আর তার বাঙাল মাল্লারা ছাড়া আর সকলেই সরে দাঁড়াল।

আলেফসেখ এরফানকে ডেকে বলল—কেন্‌রে আর ধান কিনব ?

এরফান জানত আলেফ ধানের হাতরফতোর কাজ করছে। সে বলল—কেন্, হলে কি ? কতকে ?

—গহরজান তিনপাটি দিবের চায়, চৌদ্দ মণের দরে।

—সর্বনাশ। চৌদ্দয় উঠেছে। আর কেনা নাই।

—কেন্ ?

—এবার নামবি।

—নামবি তার কি মানি ?

—নইলে মানুষ জেরবার হবি। বাঁচবি কে ? খোদাই আর দাম উঠবের দিবেনে, নামাবি।

যুক্তিটা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ না করলেও আলেফ ধান কিনতে সাহস পায়নি। কিন্তু পরদিন সকালেই আবার এল।

—এরফানরে—

—কি কও বড়ভাই।

—জমি ধরব ?

—জমি ?

—হয়। বিশটাকায় বিঘা, এক বছরের খাইখালাসি।

—ভাবে দেখি।

আলেফ তখনকার মতো চলে গেল। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে জমি কিনবে না।

এরফানের সঙ্গে পরামর্শ করার আগেই বুধেডাঙার এক সান্দারের পাঁচবিঘা জমি সে খাই-খালাসিতে রেখে টাকা দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু খটকা লেগেছে তার, জমির এই স্বল্পমূল্য কি প্রকৃত কোন ব্যাপার, না জীনপরীর খেলা। সে অপেক্ষা করতে লাগল, ঘুরঘুর ক'রে বেড়াতে লাগল সুযোগের অপচয় ক'রে উদাস ভঙ্গীতে এ মাঠে ও মাঠে।

এ রকম সময়ে একদিন মাঠের পথে রিয়াছৎ মৌলবীর সঙ্গে তার দেখা হ'য়েছিল। রিয়াছৎ তখন রাস্তার পাশ থেকে খানিকটা দড়ি কুড়িয়ে নিয়ে তার লজ্ঝর সাইকেলটার একটা অংশ মজবুত করছে। আলেফকে দেখে সে প্রীতি-সম্ভাষণের ভঙ্গীতে বলল—আদাব সেখসাহেব।

—আসলাম্।

—ইস্কুলডা কেমন চলতেছে ?

—কোন ইস্কুল ?

—আপনার সেই মক্তবটা।

আলেফ উত্তর দিতে গিয়ে থামল। মক্তবটার দিকে সে কয়েক মাস নজর দিতে পারেনি। ধান উঠবার আগে সে স্থির ক'রেছিল মক্তবের নামে একটা ফাণ্ড খুলে দেবে। কিন্তু ধান ও জমির ভাবনায় সেদিকে আর কিছু করা হয়নি। রিয়াছতের কথায় আলেফের গা চিড়বিড় ক'রে উঠল। সে যেন আলেফের পায়ের কড়া মাড়িয়ে দিয়েছে। রিয়াছৎ কিছুদিন আগে মানিকদিয়ারের মসজিদের জন্য কিছু অর্থসাহায্যের জন্য এসেছিল, আলেফ বলেছিল মক্তবের জন্যই তার অন্য কোন সৎকাজে অর্থব্যয় করার সামর্থ্য নেই। সে কথাটা রিয়াছৎ কেচ্ছার মতো আজগুবি ক'রে ছড়িয়ে দিয়েছে।

আলেফ বলল—চলবে না কেন, বেশ চলতেছে, জোরের সঙ্গে চলতেছে।

—আজ যে বন্ধ দেখলাম।

—তা মাঝে মধ্যে বন্ধ দেয়াও লাগে।

রিয়াছৎ ফিক্ ক'রে হেসে সাইকেল চড়ল। তার হাসিটা বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক প্রফুল্লতার লক্ষণ নয়।

আলেফ ক্রুদ্ধ হ'ল। যে কটূক্তিটা মুখে এসেছিল সেটা চেপে সে রিয়াছতকে ডাকল।

—শোন—শোন, রিয়াছৎ।

—জে। রিয়াছৎ সাইকেল থেকে নামল।

—তুমি শুনছ নাকি মক্তবটার জন্য দুইশ' টাকার ফণ্ড করে দিছি।

—তাতো দিবেনই, আপনার মক্তব। রিয়াছৎ উদাসীন সুরে বলল।

আলেফ আশা করেছিল খবরটা শুনে রিয়াছৎ বিস্মিত হবে। আশানুরূপ ফল না পেয়ে সে আবার বলল, ধর যে দুইশ' তো নগদ এ ছাড়াও মেরামতরে, বেঞ্চিরে, টুলরে, এসকলেও খরচ-খরচা আছে।

রিয়াছৎ এবার বিস্মিত হ'য়ে বলল,—দেয়াইতো লাগে, পাঠানের বংশ আপনার।

বলাবাহুল্য ফণ্ড করে বেঞ্চ, টুল এ সবই কাল্পনিক বদান্যতা ; আলেফ আর কথা বাড়াল না। পায়ে পায়ে বাড়ীতে ফিরে সে ভাবতে বসেছিল। স্ত্রী এসেছিল। খরচের পয়সা চাইতে, আলেফ বলল—নাই, নাই।

—কও কি, এত ধান তুললা ?

—হয় ধানইতো।

দুপুরের পর, এফরানের বাড়ীতে গিয়ে সে বলল,—কও দেখি কি অত্যাচার।

অত্যাচার করল কে ?

আলেফ রিয়াছৎ মৌলবীর ব্যাপারটা বর্ণনা করল।

এরফান হেসে বলল,—দিলা নাকি এ সব ?

—তুই কি ক'স ?

—ভালো কাজ।

—হয়, দেনা তুই কিছু, ধর যে মক্তবটাতে আমার ওকার না।

—কোনদিন চাও নাই, নিও দুই পাটি ধান।

বাড়ীতে ফিরে খানিকটা সময় আলেফ ভাবল ; হয়তো তার সঙ্গে আলাপ করার আগে খোঁড়া মৌলবীর সঙ্গে মক্তব্য সম্বন্ধে রিয়াছৎ আলাপ ক'রে এসেছিল এবং ফাণ্ড ইত্যাদি যে সবই কাল্পনিক একথাটা এতক্ষণে প্রচার করতে লেগে গেছে। এবং প্রচার করার সময়ে আলেফের পাঠান বংশ সম্বন্ধেও ইঙ্গিত করছে। এরপরে দু'একদিনের মধ্যে ফণ্ড খুলে দেয়া, মক্তবের বেঞ্চ ইত্যাদি ব্যাপারে আলেফের টাকার একটা মোটা অঙ্ক খরচ হ'য়ে গেল।

জমি কেনার পথে প্রথম বাধা হিসাবে এ ব্যাপারটি উল্লেখযোগ্য এই মনে হ'ল এখন আলেফের। জোলার খানিকটা জমি হস্তান্তর হবে এ সংবাদ শুনেই আজ সে পরিদর্শনে এসেছে। কিন্তু সেই দুর্ভিক্ষের বছরের তুলনায় এ বৎসর দাম প্রায় পাঁচগুণ। এখন দাঁড়িয়ে বাঁধের গায়ে লাঠি ঠুকে জমির পরখ করতে করতে আলেফের মনে হ'ল এ ছাড়াও আরও বাধা ছিল। রিয়াছৎ মৌলবীর ব্যাপার মিটবার পর কিনি-না-কিনি করতে করতে কাউকে কিছু না ব'লে পাঁচ দশ বিঘা জমি বুভুক্ষুদের কাছে কিনে, গ্রামে যতদূর

লেখাপড়া করে নেয়া সম্ভব তা সব শেষ ক'রে আবার একদিন এরফানের বাড়ীতে গিয়েছিল সে।

এরফান ফুর্সিটা আলেফের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলল,—বড়ভাই, এদিকে আর আস না। কাল গেছিলাম তোমার বাড়ী, পাই নাই। জমি কেনার কথা বলেছিলে, কিনলা ?

—অল্প-সল্প কিছু।

—দাম কমে যাতেছে। আল্লা, কি হ'ল দুনিয়ায় !

এরফানের কথা বলার ধরনটা আলেফের ভালো লাগল না। জমির দাম কমা যেন একটু খুব খারাপ ব্যাপার এ রকম তার কথায় মনে হ'ল। সে কথার পিঠে কথা বলল না।

এরফান বলল,—ধান কিন্তুক ছাড়ো না।

—তুই সবই উল্টা ক'স। জমির দাম কম তাও খারাপ, ধানের দাম বেশী তাও ধান ছাড়ব না।

—ছমাসের খাবার রাখে যা হয় করবা। দুর্ভিক্ষ কতদিন চলবি কে বলবি।

আলেফ এবার পাল্টা প্রশ্ন করল,—তুই জমি কিনলি না ?

—ভাবছিলাম কিনব, তা কিনলাম না।

—কেন্, এমন সুবিধা কি আর কখনো পাবি ?

এরফান খানিকটা সময় ভাবল, বড়ভাইএর মুখের সম্মুখে কথাটা বলা উচিত হবে কিনা, তারপর ধীরে ধীরে বলল,—কেন বড়ভাই, ওরা খাতে না পায়ে জমি বেচতিছে, সে জমি কেনা কি অধর্ম্ম না ?

আলেফ খুঁত খুঁত ক'রে হাসল।

—অভাবে না পড়লে কেউ কোনদিন বেচে সম্পত্তি, সে সান্দারই হোক আর সান্যালই হোক।

এরফান একথাটার যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারলনা। পৃথিবীর সব ক্রয়-বিক্রয়ের মূলকথা এটা। তবু তার দ্বিধা কাটল না। সে বলল,—আমার আর খানেয়ালা কোথায়, কি হবি জমিতে।

এরই ফলে আর যাই হ'ক জমিকেনার প্রবৃত্তি কিছু সংহত হ'য়েছিল আলেফের কিন্তু আসল বাধাটা এল অন্যভাবে।

ঠিক এ রকম সময়েই শোনা যাচ্ছিল খানিকটা জোলার জমি বিক্রী করবে রহমৎ খন্দকার। হাজি সাহেবেরই বংশের লোক রহমৎ। সহরে গিয়ে ভিক্ষা করতে পারবে না, ঘরেও ধান নেই যে তারই জোরে ঘরে থাকা যাবে; ঘরে থাকতে হবে ঘরেরই একাংশ বিক্রী করে।

খবরটা শুনে আলেফ মানিকদিয়ারে গেল হাজিসাহেবের বাড়ীতে। হাজি সাহেব নমাজ শেষে উঠে বসতেই কথাটা সে উত্থাপন করল। গত কয়েক মাসে হাজি সাহেব আর একটু বৃদ্ধ হয়েছেন, চোখে কম দেখছেন। আলেফের কথা শুনে বললেন,—ওরা কি গাঁয়ে থাকবিনে ?

—তা থাকবি।

—তবে বাপ্ বড় চাপের জমি বেচে কেন্। তা কি বেচা লাগে ?

—মনে কয় জমি বেচে খোরাকির ধান কিনবি।

হাজি সাহেব দুর্ভিক্ষের খবরটা ভালো রকম জানতেন না। নমাজ, ফুর্সি ও বিশ্রামের গণ্ডীবদ্ধ জীবনে আজকাল পৃথিবীর সংবাদ খুব কমই পৌঁছায়। তিনি জিভ্-টাকরায় চুক্ চুক্ শব্দ ক'রে প্রশ্ন করলেন,—খোরাকির ধান জমি বেচে, কও কি আলেফ ?

—হয়, তাই শুনি। আপনি জমিটুকু রাখবেন ?

রহমৎ খন্দকারের বাপজেঠার সঙ্গে তারা যতদিন বেঁচে ছিল হাজিসাহেবের মামলা চলেছে। এ জোলা নিয়েও শরিকানি হুজ্জত কম হয়নি তখন। হাজি সাহেবের কপালটার পাশে দু'একটা শিরা আড়ষ্ট হ'য়ে উঠল। বড় ছেলে ছমিরুদ্দিকে ডাকলেন তখন, তখুনি যেন যে সম্বন্ধেই কোন নির্দেশ দেবেন !

শেষ পর্য্যন্ত হাজিসাহেব কিন্তু জমি কিনলেন না। বাঁধের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে অনিচ্ছুকভাবেই আলেফ মাথাটা নত করে ভাবল ঘটনাটা। একটু পরে হাজি সাহেব বলেছিলেন: না আলেফ, লোভ সামলান লাগে; কামটা ভালো না। লোকে কবি বিপদে পড়ছিল আপ্তজন; তাকে না দেখে, হাজি তার মাথায় বাড়ি মারল। তোবা। ছমির; দুই বিশ ধান দেওনা কেন, রহমৎকে।

আলেফকে তখন তখনই বাড়ী ফিরতে দেননি হাজি সাহেব। গোসল, খানাপিনা শেষ ক'রে রোদ পড়লে হাজি সাহেব আলেফকে ফিরবার অনুমতি দিলেন। ধানের কথা, জমির কথা তলিয়ে গেল। হাজি সাহেব বললেন,—কেন আলেফ তোমার বাপের সেই মজিদের কি হ'ল।

—আছে সেই রকমই।

—কও কি, ক'লে যে দুইভাই পিলান পাও।

—তা পাই।

—এবার তাইলে মজিদের ভিৎ পাকা রং করে দেও।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভদ্রতা ক'রে আলেফ ব'লেছিল,—বেআদপ যদি করছি মাপ করবেন, হাজি সাহেব।

—কও কি, আলেফ, তুমি সৈয়দ বংশের। আসছিলা তারই জন্য সুক্রিয়া করতে।ছ।

কিন্তু জমি জমিই, বিশেষ ক'রে জোলার জমি। এক সঙ্গে তিন চাষ। আউস, আমন কলাই। আউস তোল, নামুক ঢল্। জল বাড়বি, আমন বাড়বি। এক হাত বাড়ে জল, সোয়া হাত আমন। কাট সোনার আমন। জল কমবি, জল শুকায়ে যাবি। একাবারে শুকানের আগে ছলছলায় কাদায় ছিটাও কলাই। ধর যে চাষই নাই।

কথাগুলি প্রায় সোচ্চার ক'রে আবৃত্তি করতে করতে বাঁধ থেকে নামল আলেফ। খুব ঠকেছে এই রকম অনুভব হ'ল তার। এখন কি আর জোলার জমি টাকায় বেড় পাওয়া যায়। লাঠির আগায় খানিকটা এঁঠেল মাটি লেগেছিল। লাঠিটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে মাটিটুকু আঙুলে করে তুলে ডলে ডলে স্পর্শ অনুভব করল; নাকের কাছে এনে সোঁদা সোঁদা গন্ধটা অনুভব করল। আলেফ স্বগতোক্তি করল—এতদিন চাকরি না করলে জমির চেষ্টা করলে জোলার অনেকখানি আমার হ'লেও হ'তে পারত।

আলেফ জোলার বুকে হেঁটে চলল। ক্বচিৎ কোথাও জলের চিহ্ন আছে; তাছাড়া সর্বত্রই শুকনো পলিমাটি। যখন কাদা কাদা ছিল জমিটা, তখন গোরুর খুড়ের গর্ত্ত হ'য়েছে। দেখে মনে হয় শক্ত। পা দিলে ভেঙে সমান হয়ে যায়।

হায় হায় এমন সব জমি পড়ে আছে। তার হ'লে কি এই দশা হয় জমির। জোলার বাঁধের ওপারে যেমন হাজি গোষ্ঠী, এপারে তেমনি সান্যালরা। এদিকের অধিকাংশ জমি পড়েছে মিহির সান্যালের জমিদারীতে, কিছু খাস, অধিকাংশ পত্তনিতে প্রজা বসানো ছিল। খাসে তবু কিছু চাষ পড়েছে, প্রজাপত্তনি ভুঁইয়েতে চাষ না হওয়ার সামিল। যারা নাই তারা নাই। দু'সন পরে যারা ফিরেছিল তাদেরও অধিকাংশ বাঁকি খাজনার মামলা-হামলায় কোর্ট-কাছারি নিয়েই ব্যস্ত, চাষ হয় কি করে। নানাদিক থেকে বাধা পেয়ে ইচ্ছানুরূপ জমি কেনা তার হয়নি। একটা ক্ষোভের মতো হয়ে ব্যাপারটা তার মনে ঘুরতে থাকল।

জোলা ধরে হেঁটে আসতে আসতে মুখ তুলে দেখতে পেল আলেফ তার সম্মুখে কিছুদূরে জোলার একটি অংশে চাষ হচ্ছে। দু'জন কৃষাণ, দুটি লাঙ্গল। জোলার ধারে একজন ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে। এতক্ষণ সে খেয়াল করে নি সে হাঁটতে হাঁটতে নিজের বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়েছে। জমির অবস্থান লক্ষ্য করেই সে বুঝতে পারল ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে এরফান চাষের তদারক করছে।

জোলার এই অংশটার প্রায় পাঁচ সাত বিঘা জমি আলেফ-এরফানদের পৈতৃক সম্পত্তি। পৈতৃক সম্পাত্তি বলতে অন্যত্র যা আছে পেন্সান নিয়ে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আপোষে

ভাগ করে নিয়েছিল তারা, কিন্তু এটা এজমালি থেকে গেছে। ব্যবস্থা করা ছিল চাষ ইত্যাদির সব দায়িত্ব এরফানের, ফসল উঠলে ভাগ ক'রে দেবে। কথা ছিল চাষের খরচেরও একটা হিসাব হবে। সেটা এ পর্য্যন্ত হয়নি, সে খরচটা এরফানই করে। আর সব জমি ভাগ করার পর এটা এজমালি রাখার মূলে একটা মেয়েলি সখ ছিল। আউস উঠবার পর আমন যখন একবুক জলে দাঁড়িয়ে শির শির করে তখন জোলায় মাছ আসে, ট্যাংরা পাবদা তো বটেই, সংখ্যায় নগণ্য হ'লেও দশ বিশ সের ওজনের বোয়ালও কখনো কখনো পাওয়া যায়। জোলাটার অন্যতম গভীর অংশে এই জমি, পলাদ'র পরেই এর গভীরতা। জমিটা ভাগ করে নিলে মাছ ধরার কি উপায় হবে সেখবধূরা এ নিয়ে খুব বিচলিত হ'য়ে পড়ায় এরফান এই প্রস্তাবটা তুলেছিল।

এখন এখানে জল নেই বললেই চলে, যেটুকু ছিল লাঙ্গলের টানে মাটিতে মিশে গেছে। বাঁ পাড় থেকে শুরু করে চষতে চষতে লাঙ্গল জোড়া তলদেশে পৌঁছে গেছে, এবার ডান পাড়ের দিকে লাঙ্গলের মুখ ফিরবে।

সকালে উঠে যখন আলেফ এই পথ দিয়ে বাঁধের দিকে গিয়েছিল তখন এখানে লাঙ্গল ছিল না। এরফানের সঙ্গেও তার দু'তিনদিন দেখা হয়নি, কাজেই কবে চাষ হ'তে পারে এটা জানা ছিলনা তার। কথা বলার মতো দূরত্বে পৌঁছে আলেফ বলল,—আজই দিলা চাষ।

এরফান ফিরে দাঁড়িয়ে আলেফকে দেখতে পেয়ে বলল,—হয়। দেরি ক'রে কাম কি?

দেরি করার কথাও নয়। জল দাঁড়ানোর আগেই আউশ কেটে তুলতে হবে; আষাঢ়ের পনের দিন থাকতে থাকতে সামাল সামাল করতে হয়। কাজেই চৈত্রের গোড়াতেই জোলায় চাষ দিতে হয়। ধান নাবলা হ'লে আর রক্ষা নেই।

আলেফ বলল,—আমি যে জানবেরই পারি নাই।

এরফান বলল,—আমিও জানতাম না। আজ পেরভাতে ঠিক হ'ল। চাষের লোক পায়ে গেলাম দু'জন, নামায়ে দিলাম।

—আজ লোক পালা, আজই নামায়ে দিলা। খুব যেন আগ্রহ করতিছ?

এরফান বলল,—রোজ পাব এমন কি ভরসা।

কথাটা শুনবার জন্য আলেফ অপেক্ষা করেনি। সে ততক্ষণে চাষ দেয়া জমিতে নেমে গিয়ে লাঙ্গলের কাছাকাছি ঘুরছে। লাঠিটা একবার শূন্যে উঠছে, একবার মাটিতে বিধছে। খুব ঠাহর ক'রে দেখতে দেখতে মনে হয় তার লাঠি চালনা আর চলায় মিলে একটা ছন্দ তৈরী হ'চ্ছে। বিচুলী থেকে ধান আলাদা করার পর; ধান থেকে ধূলো আর চিটে উড়ানোর জন্যে কুলোর হাওয়া দিতে দিতে চাষীরা যখন একবার এগোয়

একবার পেছোয় সে সময়েও কতকটা এমনি হয়। অভ্যস্ত চোখে স্বাভাবিক ব'লে বোধ হয়, যারা নোতুন দেখছে তারা অনুভব করে ছন্দটুকু।

কখনো লাঙ্গলের পেছনে, কখনো আগে খানিকটা সময় ঘুরে ঘুরে আলেফ অবশেষে এরফানের কাছে ফিরে এল। তখন তার জুতো জোড়া এঁঠোল মাটির প্রলেপ লেগে লেগে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে; পায়জামার পায়ের কাছে কাদা লেগেছে, কপাল বেয়ে ঘাম পড়ছে।

এরফান রহস্য করে বলল,—লাঙ্গলের মুঠাও ধরেছিলে নাকি?

আলেফ বলল,—তা ভালো করেছিস আজ চায নামায়ে। মিঠে মিঠে রোদ্দুর আছে।

আজকের রৌদ্র গতকালের মতোই। এরফান হেসে বলল,—হয় চিনি চিনি।

আলেফ আবার হাসল, বলল,—মস্করা না মাঠে নামে দেখ।

—তুমি কি আর না দেখে কইছ।

ব্যাপারটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। দুজনে দাঁড়িয়ে লঘুস্বরে কথা বলাই এর একমাত্র সার্থকতা।

কিন্তু কোন কোন মনে সুখ নিখাদ অবস্থায় থাকতে পারেনা। পেন্সান নিয়ে বাড়ী আসবার পর থেকে আলেফের মনের গতিটা এরকমই হ'য়েছে। আহারদির পর মন যখন ভালো থাকা উচিত মনটা খারাপ হ'য়ে উঠল। নিষেধের পর, নিষেধ এসে তাকে যেন কর্ত্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত করেছে। সামান্য ঐটুকু জোলাজমির চাষে যদি এত আনন্দ, যদি রহমৎ খন্দকারের জোলাটুকু পেত কতনা গভীর আনন্দ সে পেতে পারত। ঐ সামান্য জমি তবু সবটুকু তার একার নয়।

এমন অবশ্য শোনা গেছে দু'ভাইএর এজমালি জমি অবশেষে একজনের 'অধিকারে এসেছে। এক ভাই খাজনা চালাতে পারেনি, অন্যজন সেই সুযোগে খাজনার ব্যবস্থা ক'রে ক্রমে জমিটার দখল নিয়েছে।

চিন্তাটা পাক খেতে খেতে একটা কল্পনা গড়ে উঠছিল, কাঁচা মাটি থেকে মৃৎপাত্র গড়ে ওঠার মতো। সেটা সম্পূর্ণ গড়ে ওঠা মাত্র আলেফের চিন্তা বাধা পেল। চুরি করে ধরা পড়লে যে রকম মুখ হয় তেমনি মুখ ক'রে সে বলল,—তোবা, তোবা। ঠকানের কথা ভাবা যায় না।

কিন্তু অত সহজে ঝেড়ে ফেলার নয়, চিন্তাটা অবার অন্যরূপে ফিরে এল। জমিটা বিক্রী করে না এরফান?—ভাবল আলেফ। অভাবে পড়া চাষীদের মতো নয়, নায্য দাম নিয়ে হাত বদল করে না?

করে হয়তো কিন্তু কি ক'রে প্রস্তাব তোলা যায়। এরফান যদি হেসে উঠে বলে,

কেন, বড়ভাই, ট্যাকা যে খুবই হ'ল? কিম্বা ধর যদি সে রাগ করে, কিম্বা পাল্টা প্রস্তাব করে, বড়ভাই, নোতুন যা কিনছ আমারও তাতে ভাগ দেও না, টাকা নিয়ে।

কাজ নাই লোভ ক'রে, এই ব'লে আলেফ কল্পনাকে সংহত করল। মনের মধ্যে তবু অসন্তোষ প্রশ্ন তুলল,—একবার যাচাই ক'রে দেখলে কি হয়? এতই যদি নির্লোভ এরফান, দেখাই যাক না কি বলে সে।

সন্ধ্যার আগে আগে আলেফ এরফানের বাড়ীতে গেল। এরফানের উঠোনে তখন ধান ঝাড়া চলছে। একদিকে আমন অন্যদিকে আউস ঢেলে দুজন কৃষাণ কুলোর বাতাসে ধুলো চিটে উড়িয়ে বেছন বাছাই করছে। ধূলো আর চিট আবর্ত্তের মতো উড়ছে। ধূলো অগ্রাহ্য ক'রে আলেফ প্রথমে বাঁয়ের স্তূপটার কাছে গিয়ে একমুঠো ধান তুলে নিয়ে নাকে মুখে খানিকটা ধূলো খেয়ে বলল,—আউস কেন? তারপর ডাইনের স্তূপটার কাছে গিয়ে অনুরূপ ভাবে বলল,—আমন, কেন?

এরফান বারান্দায় বসে তামাক টানছিল, সে হাঁহাঁ ক'রে উঠল।

—কর কি, ধূলো খাও কেন? আঃ হাঃ

আলেফ হাসিমুখে বারান্দায় গিয়ে বসল, বলল,—এত ঝাড় যে ধান?

এরফান কৌতুকোজ্জ্বল মুখে বলল, ধান দেখলেই ঘুরানি লাগে বুঝি? লোক পালেম ঝাড়ে রাখি।

আলেফ বলল,—তোর অত অভরসা কেন? এবারও কি লোকে খাটে খাবিনে?

এরফান ফুর্সিতে মুখ দিয়ে দম মেরে রইল, তারপর বলল,—বড়ভাই, দুনিয়ার হাল কে কবি কও? আদমজাদ পয়মাল হয় না খায়ে। শুনছ না খবর? লোক দেশ ছেড়ে যাতেছে।

—দেশ ছাড়ে কনে যায়?

—কেন্ শোন নাই? ওপারের কলে নাকি মেলাই লোক নিতেছে।

--গাঁয়ের সব লোক খাবি এতবড় পেট কোন কলেরই নাই, তা তোকে কয়ে দিলাম।

—তা নয় নাই। সময় মতো হাতের নাগালে লোক না পালে সময় মতো তোমার চাষও হয় না, ধান ছিটানেও হয় না। কেন্ খোঁজ ক'রে দেখলেই পার বুধে ডাঙায় কয়ডা লোক আছে? চত্তির যায় যায় কয়ডা লোক খ্যাত আর লাঙ্গল এক করল কও।

কথাটা মিথ্যা নয়। বুধেডাঙা বলো, চিকন্দি, চড়নকাশি আর সানিকদিয়ার কোথাও যেন চাষের তাগাদা নেই এবার। নিস্পৃহ উদাসীন ভাব যেন কৃষকদের। এরফানের একক প্রচেষ্টার কথা ছেড়ে দিলে জোলাতেও আজ পর্য্যন্ত চায পড়ল না।

আলেফ বলল,—হয় শুনছি। চৈতন সার জমিগুলিতে এবার কেউ চাষ দিবের চায়

নাই। মিহির সান্ন্যালও জমি সব খাস করতেছে। লোক পাওয়া কঠিন হ'লেও হবের পারে। তাইলে আমার জমিতেও চাষ ফেলা লাগে। এজমালিডার ধান ছিটানে কবে করবি ?

—কাল লাঙ্গল, পরশু মই, তরশুদিন ধান বই।

—রঙ্গ রাখেক। বেছন ঝাড়তিছিস ?

—ঝাড়া লাগে না ?

—লাগে না কেন। আমার নোতুন কেনা জমিগুলিতেও কালই চাষ দিব, কি ক'স ? রাখাল পাঠায়ে আজই লোক ডাকাব। তা শোনেক এরফান যত ধান ঝাড়ছিস সব তো তোর জোলায় লাগাবিনে।

—না তা লাগবিনে।

—তা'হলে আমার জমিটুকের জন্য খানটুক রাখিস।

এরফানের হাসি পেল। তার বড়ভাই যতদিন চাকরি করেছে ততদিন তার এ পরিচয়টা ঢাকা ছিল। এখনও খরচের জ'াক তারই বেশী, মক্তব করা, মসজিদ তোলা এসব পরিকল্পনা এরফানের মাথায় আসে না। অথচ এই সামান্য সামান্য ব্যাপারে আলেফের ব্যয় সঙ্কোচের চেষ্টাও হাস্যকর।

—তা রাখব। বলল এরফান হাসি মুখে।

ফুর্তিতে আর দুই একটি টান দিয়ে উঠে দাঁড়াল আলেফ, বলল,—তা'হলে আর বসিনা। চাষডা কালই দি। বুঝিস না গতসন সান্দারদের জমিতে এক ফসল পাইছি, এবার দু'ফসল তোলা চাই।

বারান্দা থেকে উঠানে নেমে সে বলল—মনে রাখিস বেছনের কথা।

বাড়ীতে পৌঁছে আলেফ দেখল, তার স্ত্রী কুপি ধরে পথ দেখাচ্ছে আর রাখাল ছেলেটি গোরুবাছুরগুলি গোয়ালে তুলছে।

দরজার কোণে লাঠিটা রেখে আলেফ গোয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মনটা তার খুসি খুসি হ'য়ে উঠেছে। চাষ, চাষ। একটা প্রত্যাশায় অন্য সব অভাব বোধ সাময়িকভাবে মন থেকে স্থানচ্যুত হ'য়েছে। স্ত্রীকে হকচকিয়ে দিয়ে সে হাঁই হাঁই ক'রে বলল,—কেন জমি কিনবা, চাষ দিবা না ?

বুঝতে না পেরে স্ত্রী বলল,—আমি কি মানা করছি ?

—তা কর নাই, বুদ্ধিও দেও নাই।

স্ত্রী তার মনোভাব বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

স্ত্রীকে ছেড়ে আলেফ রাখালকে আক্রমণ করল,—শালা গিদ্দির, শোনেক !

—জে

—জের কাম না। তোর বাপ-দাদাকে কাল আনবি।

—জে, যদি না আসে ?

—তুমি এ মুখ হবানা, হার ভাঙে দেব তোমার।

রাখাল ছেলেটি মনিবের আকস্মিক রূঢ়তায় ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল।

—বোঝ নাই আমার কথা, কাল তোর বাপ-দাদাকে আনাই চাই।

ছেলেটি পলায়নের ভঙ্গিতে হাঁটতে সুরু করল। সে চলে যেতেই আলেফের স্ত্রী বলল,—নেশা করছ নাকি বুড়াকালে, আচমকা ছাওয়ালটাকে তাড়লা।

—তাড়লাম কই। রহস্য করলাম। বুঝলানা, কাল ধর যে তোমার জমিতে চাষ দিব। ওর বাপ দাদা না হ'লে চাষ করে কেডা।

—চাষ দিবার জন্য বৌকে আর রাখালকে মারপিট করতে হয়। ও মনে কয় কাল আসবিনে, বাবা দাদাকে আনা দূরস্তান।

—কও কি !

আলেফ বাইরে এসে দাঁড়াল। চৈত্রের চাঁদের আলোয় শূন্য মাঠের উপর দিয়ে রাখাল ছেলেটি হেঁটে যাচ্ছে। আলেফ ডাকল—ছোবান। উত্তর না পেয়ে মুখের দু'পাশে হাত রেখে আলেফ হ'াক দিল—ছু—বা—ন।

—জে-এ-এ

—বাপ আমার—শো—নে—ক।

ছেলেটি কাছে এলে আলেফ বলল,—তোর আজি ডাকতিছেরে, জল পান দিবি। রাখাল ছেলেটির হাত ধরে বাড়ীর ভেতরে এনে স্ত্রীকে বলল আলেফ,—দুডে জলপান দেও না।

—তা হোক, তা হোক। কাল কত খাটবি-খোটবি। দেও, দু'ডে দেও।

রাখাল ছেলেটির কোঁচড়ে জলপান এসে পৌঁছুলে আলেফ বলল,—ছুবান আমার সোনার ছাওয়াল। কাল তোমার বাপ আর দাদাকে আনবা, কেমন ? কবা যে, কি যেন কও তুমি, কবা যে সেখের বেটা ডাকছে তোমাদেক। তার বুধেডাঙ্গার জমিতে চাষ দিবি।

ছেলেটির মুখে এবার হাসি দেখা দিল।

আহারাদির পর আলেফ স্ত্রীকে বলল, তুমি শোও, আমি আসতেছি।

—রাত ক'রে জমি দেখবের যাও নাকি ?

—শোও না, শোও। আমি আসতেছি।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেখানে লাঙ্গল বিঁধে থাকে খানিকটা সময় সেখানে অকারণে খোরাঘুরি করে আলেফ মশজিদটার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল। লম্বা চওড়ায় বার তের হাত

টিনের ছাদ, ছ্যাঁচার উপরে মাটিলেপা বেড়ার ঘর, পাশে একটি পাতকুয়ো। এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন ক'রেছিল আলেফের পূর্বপুরুষ! প্রধানত এটা পারিবারিক উপাসনার জন্যই ব্যবহৃত হবার কথা। কখনো কখনো গ্রামের লোকরাও আসে। প্রবাদ এই চড়নকাশি বুধেডাঙার নোতুন মাটিতে লাঙ্গল দেবার নেশায় যখন আদমজাদরা রহমান খোদাকে বিস্মৃত হ'য়ে গেল, তখন আলেফের পূর্বপুরুষ এ দুটি গ্রামের প্রতিষ্ঠা শয়তানের দৃষ্টি থেকে দূরে রাখার জন্য প্রায় একক চেষ্টায় এ মসজিদ স্থাপন করে তৎসংলগ্ন পাঁচ ছ' কাটা জমি পৃথক ক'রে রাখে। আলেফ চাকরি থেকে ফিরে কিছু অর্থব্যয় করে এটাকে আবার ব্যবহার যোগ্য করেছিল কিন্তু জমির দিকে নজর দিয়ে মসজিদকে বাঁধিয়ে পাকা করার পরিকল্পনা কাজে আসে নি। ফকির বোধ হয় চেরাগের তেল পায়নি আজ। বার্দ্ধক্যের দরুণ ঘুমও হয় না, মসজিদের বারান্দায় একটেরে চুপ করে বসে আছে।

দুর্ভিক্ষের বৎসরে বোধ করি আহারের আশায় ফকির এই দেশে এসেছিল। কিন্তু কেউই তাকে আশ্রয় দেয় নি। অবশেষে সে এই মসজিদের কাছে এসে বসেছিল। ময়লা ঝুলঝুলে আলখিল্লা, আর ছেঁড়া ছেঁড়া কাঁথাগুলি বয়ে বেড়াবার ক্ষমতাও তার আর অবশিষ্ট নেই তখন। অন্ধকারে লোকটিকে বসে থাকতে দেখে আলেফ রাগ করে বলেছিল—কে ওখানে।

ফকিও ভীতও হ'ল না, আগ্রহও দেখাল না।

আলেফ উঠে গিয়ে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল—এখানে কি হ'তেছে?

—বাবা—

—ভিক্ষা শিক্ষা এখানে নাই।

—ভালো, বাবা, ভালো।

—নিজেই খাতে পাই না।

—ভালো, বাবা।

—গ্রামে বড় বড় লোক আছে, উঠে দেখেন।

—তা বেশ, বাবা। আজ রাত থাকি। গ্রামের লোক ক'লে সৈয়দবাড়ী এটা।

—হুঁ। কি ক'লে?

—সৈয়দ বাড়ী।

—হুঁ সৈয়দ বাড়ী।

আলেফ দম্ দম্ ক'রে পা ফেলে অন্দরে গিয়ে বলল,—লোক না খায়ে মরে দরজায়।

স্ত্রী বলল,—আমি কি করি কও।

—ওকি যাবের আসছে মনে কর। নড়বিনে, থাকবি। খাবের তো দেয়া লাগবি। ওর জন্যি পাক, মনে কয়, করা লাগে।

সেই থেকে ফকির মসজিদে আছে। প্রথম দু'চার দিনের পর সে নিজের অকারণ অর্থব্যয় বিরক্ত ও শঙ্কিত হ'য়ে ফকিরকে প্রকারান্তরে স্থান ত্যাগের নির্দ্দেশ দিয়েছিল, এমন কি একবেলা আহারও বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু এখন অভ্যাস হ'য়ে গেছে। নির্বিরোধ ফকির। যা বলে তাতেই, তা বেশ, বাবা, ছাড়া অন্যকথা মুখে নাই। একটা দিকে অবশ্য সুবিধা হয়েছে, ফকির মসজিদের যত্ন করে। দাওয়াটাকে ও ঘরের ভেতরে নিকিয়ে ঝকঝকে ক'রে রাখে। ছ্যাঁচার বেড়া থেকে মাটির প্রলেপ খসে গেলে নিজে কাদামাটি ছেনে আস্তর লাগায়। মোটকথা মসজিদ সম্বন্ধে আলেফ নিশ্চিন্ত। তার উপরেও খানিকটা হ'য়েছে। অন্য সময়ে খেয়াল না করলেও কোন কোন দিন ভোর বেলায় তার ছোট মসজিদ থেকে ফকির কাঁপা কাঁপা দুর্ব্বল গলায় বিশ্বাসীদের নমাজের জন্য আহ্বান করে, শুনতে পায় আলেফ। মোটের উপরে লাভই হয়েছে।

—আলেকোম সেলাম।

—আস্লাম আলাইকুম। আলোয় ঘুরতেছেন? ফকির প্রশ্ন করল মৃদুস্বরে।

—আপনার কাছে আসছিলাম। কাল জমিতে চাষ দিব কিনা।

—তা বেশ, বাবা, বেশ।

—ধরেন যে আমি তো চৈতন সার মতো মানুষেক জেরবার করি নাই। নগদ দামে জমির সত্বও কিনছি, জমিদারেক হালতক খাজনাও শোধ করছি!

—চাষবাসের কথা আমি বুঝিনা, বাবা, সেই কোন বয়সে ঘরবাড়ী ছাড়া।

—তা নয়। ধরেন যে বছরের প্রথম খন্দের চাষ। তা ধরেন মো'ৎ, হায়াৎ, দৌলৎ, এতো ধরেন মে মানুষের কাছে থাকে না।

—খোদার ফরমায়েস বাবা।

—ধরেন যে মজিদের কাছে আসে একবার তো অনুমতি নেয়া লাগে।

—বেশ, বাবা, বেশ।

স্বামী বিছানায় এলে আলেফের স্ত্রী প্রশ্ন করল,—সাঁঝে কতি গিছলা?

—এরফানের বাড়ী।

—কেন্?

কথাটা আবার মনে হ'ল। আলেফ বলল,—এজমালিডার সবটুক যদি আমার হ'ত!

—না হ'লিই বা ক্ষতি কি?

— ক্ষতি কি, হ'লে বৃদ্ধি ছিল।

ও পক্ষ থেকে কোন উৎসাহের সঞ্চার হ'ল না। আর তা ছাড়া তখনকার মন আর সকালের মনে পার্থক্য আছে। বিছানায় গা এলিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাষের টুকিটাকি বিষয়গুলি শোভাযাত্রা ক'রে তার মন দিয়া চলতে লাগল। লাঙ্গল ঠিক আছে কি না, মইএর দুখানা কাঠ ভেঙ্গে গেছে, কাল সকালে ছোবানের বাপ-দাদা দু'জন এলে তাদের জলপান দেয়া উচিৎ হবে কিনা। বলদ দু'জোড়াকে এতদিন দেখা হয়নি, কাল তারা লাঙ্গল কি রকম টানবে কে জানে। ছোবানের বাপ-দাদা আসবে তো? শেষের এই প্রশ্নটা অনেকটা সময় ধ'রে মনের মধ্যে পাক খেয়ে ঘুরল।

এ চিন্তাগুলি শেষ ক'রে আলেফ সদ্যচাষ দেয়া জমিগুলির চেহারা কল্পনা করতে লাগল। কি ক'রে, কি করে কাল বুধেডাঙ্গার যে জমিগুলিতে চাষ দেয়ার কথা সেগুলি ভুলে গিয়ে আবার জোলার কথাই চিন্তা করতে লাগল। মানুষের দুখানা হাত একত্র ক'রে যাচঞার ভঙ্গি করলে যেমন দেখায় অঞ্জলিটা, তেমন যেন জোলার চেহারা। কালো রঙের মাটি, যেন কাল রঙের একজন চাষী অঞ্জলি পেতে আছে। সেই অঞ্জলি ভ'রে উঠবে ধানে, জলে কলাইএ। চারিদিকের জমিতে চাষ পড়বে না, সেগুলি সাদাটে থাকবে, তার মাঝখানে জোলাটায় চাষ পড়ে কালো মাঠি বেরিয়ে পড়বে, তাতেই এই অঞ্জলিটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে।

আলেফ খুসিখুসি মুখে ঘুমিয়ে পড়ল।

সব জমিতে আউশের চাষ হয়না। নোতুন পুরানো মিলে আলেফ আউসের সব জমিতে চাষ দেয়া শেষ করে, ধান ছিটানো শেষ করে এদিকে ওদিকে চাইবার অবকাশ পেল আলেফ। চৈতন্য সার নামে গান বেঁধেছে ছেলেরা কানে এল তার। প্রথমে শুনে ছেলেদের উপরে রাগ হয়েছিল। পরে এক সময়ে সে কৌতুক বোধ করল। এরকম সময়ে চৈতন্যসার সঙ্গে মাঠের মধ্যে তার দেখা হয়ে গেল। সেদিন সন্ধ্যায় এরফান এসেছিল। প্রাথমিক আলাপের পরই আলেফ বলল,—শুনছ না গান?

—কিসের?

—চৈতন সার নামে বাঁধছে। রাখাল ক'তেছিল।

—হয় শুনছি। তোমার ছোবানই আমার উঠানে নাচে নাচে শুনায়ে আল।

—কাণ্ড, ব'লে আলেফ খুঁত খুঁত করে হাসল।

এরফান বলল,—এবার যদি তোমার নামে বাঁধে!

—সোবানাল্লা, কস্ কি?

—তুমিওতো কিনছ কিছু কিছু জমি, কিছু খাইখালাসিতে।

কথাটা উড়িয়ে দেয়ার মতো নয়, খানিকটা সময় ভাবল আলেফ।

—ক'স কি, সে তো মুস্কিল। তাইলেতো কোন ব্যবস্থা করা লাগে।

—ব্যবস্থা আর কি করবা। এত যদি ডর হাইহুঁই ক'রে বেড়াও কেন, বয়স তোমার বাড়তিছে না কমে?

—কেনরে কি বাঁধবি গান আমার নামে।

—কেন তুমি নিজেকে সৈয়দ কও, তাই নিয়ে যদি চ্যাংরামো করে।

—তাই করবি নাকি?

—করবি তা কই নাই, করবের পারে তো।

আলেফ বিরক্ত হয়ে বলল,—মানুষ কি মজিদের ফকির—তার নড়াচড়া নাই। এরফান এবার হাসল। ফুর্সিটায় সুখটান দিয়ে দাদার দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল,—ছোটকালে বাবা যখন এক হাতে লাঙ্গল ধরছে তার থিকে এখন অনেক বাড়ছ। আর কেন এবার সাজায়ে গুছায়ে আরাম কর। ছাওয়াল বড় হতেছে। সে কি চিরকালই মামার বাড়ী থাকবি।

—মামার বাড়ী থাকবি কেন। গরমের বন্ধেই তো আসবি!

—তা আসবি। কি লেখছে জান?

—কই চিঠিতো পাই নাই আজকালের মধ্যে।

—তার চাচাকে লেখছে কোলকাতায় নাকি পড়বের যাবি। এনূট্রেন্স পাশ ক'রে যে থামবিনে।

—হয় হয় পাশ করুক।

—পাশ সে দিবি নাইলে অমন কথা লেখেনা। লেখছে কলারসিপ না পালেও সে পড়বি। চাচী যেন চাচাকে কয়ে রাখে।

ছেলের কথায় কিছুকাল আলেফ অন্যমনস্ক হ'য়ে রইল। সেদিন এরফান ওঠে দাঁড়ালে আলেফ বলল,—চেতন সার মতো গান যদি বাঁধে, চুপ ক'রে থাকাই ভালো হবি, ভাই না?

এরফান বলল,—সে তখন দেখা যাবি।

এরফান চলে গেলেও খানিকটা সময় আলেফ বসে বসে চিন্তা করল। কি সর্বনাশ। কয় কি। ছাওয়াল যদি শোনে কি কবি!

রাত্রিতে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আলেফের অভিমান হ'ল। ছেলে মামা-বাড়ী থেকে পড়ে, তারও আগে নিঃসন্তান বড় চাচার কাছে মানুষ হয়েছে। আলেফকে বহুদিন পর্য্যন্ত ভয় করে এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াত। সে সব অল্পবয়সের ব্যাপার। এখন ছেলে বড় হয়েছে, তার বাপ-না চেনা উচিত।

আলেফ বলল,—কেন, ছাওয়ালের মা ? তোমার ছাওয়াল নাকি পাশ দিছে ?

—হয়। ওর চাচা ক'লে মেট্রিক নাকি পাশ দিছে।

—হুম্।

—কি কও ?

—বলি ছাওয়ালডা আমার তো ?

—তার মানি ?

—মানি আর কি ? দুনিয়ার লোক জানে ছাওয়াল পাশ দিল, আর আমি জানবের পারলামনা।

—তোমাকে তো লেখছে। তুমি তো চিঠি হাতে পায়ে চালের বাতায় গুঁজে রাখছিলে, গোঁজাই আছে।

—কাল সকালে দিবা। পড়ব। সে নাকি কোলকাতায় পড়বের যাবি।

—হয়। ওর ছোট চাচী বলে, ডাক্তারি পড়বের চায়।

—ডাক্তারি। আল্লা, আল্লা কয় ।ক ? লোক মারে শেষ করবি, তাইলে।

কিছুকাল চিন্তা করে আলেফ বলল,—কেন, ঘুমালে ?

—না, কি করা ?

—কেন্, আমি কি কিছু কবের জানিনা।

—কোনদিন কও নাই।

আলেফ রসিকতার চেষ্টা করে বলল,—তোমাকে হেঁদুদের আয়োস্ত্রির মতো দেখায়, কই নাই।

—কইছ। স্বামী যখন বাঁচে আমি তখন আয়োস্ত্রি না তো বিধবা হব নাকি ?

চাকরির একসময়ে আলেফকে দীর্ঘকাল হিন্দুপল্লীতে বাস করতে হ'য়েছিল। আলেফের স্ত্রীর মিশুক স্বভাবের জন্য হিন্দু মেয়েরা আলেফের বাড়ীতে যাতায়াত করত। কেন তা বলা যায় না আলেফের স্ত্রী তাদের কাছে লেস-বোনা জামা সেলাই করা যেমন শিখেছিল তেমনি পায়ে আলতা দিতে প্রথমে, পরে কপালে সিঁদুরের টিপ দিতে। এখন অবশ্য সে আলতা বা সিঁদুর ব্যবহার করে না কিন্তু এঁঠো-কাঁটার বাছবিচার করে। এবং অত্যন্ত কৌতুকের ব্যাপার, কোন মাংসই খায় না। এক সময় ছিল যখন আলেফ এসব নিয়ে বিদ্রূপ করেছে স্ত্রীকে কিন্তু স্ত্রীর নির্বিরোধ দৃঢ়তাই জয়লাভ করেছে শেষ পর্য্যন্ত। এ সবের গোপন কারণ অবশ্য এরফান জানে। আলেফের স্ত্রী তার ছেলের মঙ্গল কামনায় মাংস খায় না, এটাকে এরফান প্রকাশ্যে সমর্থন না করলেও মনে মনে প্রশংসা করে।

আলেফ বলল,—কাল সকলে চিঠি দিও, দেখব ছাওয়াল তোমার কত লায়েক হইছে।

—ওরকম করে কথা কও কেন, ছাওয়াল এখন বড় হইছে।

আটদশদিন পরে আলেফের মনে হ'ল ছেলেকে একটা চিঠি লেখা দরকার। সহসা এ কর্ত্তব্যবোধটা জাগ্রত হওয়ার কারণ আগের দিন সন্ধ্যায় এরফানের সঙ্গে আলাপ ক'রে বুঝতে পেরেছিল ছেলেকে কোলকাতায় রেখে পড়ানোর অর্থ মাসে সত্তর আশি টাকা খরচ।

আলেফ আঁৎকে উঠে বলেছিল, কস কি ? সে যে আমার পিন্সানের সব টাকা দিলেও হয় না।

তা কি করবা। ছাওয়ালকে ডাক্তার করতে গেলে তা লাগে।

আলেফ নিজের অর্থকৃচ্ছ্রতার কাল্পনিক ও অর্দ্ধসত্য কাহিনী দু'একটি উত্থাপন করেছিল কিন্তু এরফান এতটুকু সহানুভূতি দেখায়নি। বরং ভয় দেখিয়েছিল বেশী জোর-জার করলে ছেলে হাতছাড়া হবে। এরকম ভালো ছেলে এ রকম ঘরে সবসময়ে হয় না। তার মামা বাড়ীদেশের যে কোন স্বচ্ছলগৃহস্থ জামাই করে ছেলেকে ধরে রাখতে পারবে।

রাত্রিতে অনেকটা সময় সে চিন্তা করে স্থির করল ছেলেকে বাড়ীতে এনে খপ্পরে পুরতে হবে, তারপর অন্য কথা।

খুব সকালেই গ্রামের ডাকঘরে চিঠি পোষ্ট করতে গিয়েছিল আলেফ, এরফানও বেরিয়েছিল লোহারের দোকানে নিড়ানি তৈরী করানোর জন্যে।

ফিরতি পথে এরফান হঠাৎ থেমে দাঁড়ল। তার সম্মুখের ঘাস বনটা দুলছে, ভেতর থেকে একটা ঘোঁত ঘোঁত শব্দ উঠছে। শুয়োর না হয়ে যায় না। এরফান নিঃশব্দে সরে যাবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় সে জঙ্গলের মধ্যে সবজে রঙের আলখিল্লা ও সাদা দাড়ির অংশগুলি দেখতে পেল।

—সোভানাল্লা, বড় ভাই, কি কর ?

কথাটা শুনতে পেয়ে আলেফ থেমেছিল। রাস্তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে এরফানকে দেখতে পেয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, বুঝলি না লটা ঘাস! কুশেরের মতো লাগে। ছোটকালে খাইছিস মনে নাই।

—তা খাইছি, কিন্তক এখন কি তুমি আবার ছোটকালের মতো কায়ফলা আর লটা খায়ে বেড়াবা নাকি।

—না-না আমি খাব কেন ? গোরু ভাল খায়।

—তোবা! গোরুর ঘাসও কাটবা ?

আলেফের মতি স্থির করা কঠিন হ'ল। ঘাস তুলে তুলে ইতিমধ্যে সে ছোট একটা

আটি ক'রে ফেলেছে। করুণ চোখে একবার ঘাসের আটির দিকে একবার এরফানের মুখের দিকে চাইতে লাগল।

—থাক থাক মায়া ছাড়তে না পার—বাড়ী যায়ে রাখালকে পাঠায়ো। ও আর তোমার মানায় না।

বিপর্য্যস্ত আলেফ এরফানের পেছন পেছন চলতে চলতে বলল,—ঠিকই কইছিস। এরফান সে কথায় ফিরে না গিয়ে বলল,—ছাওয়ালে চিঠি লিখলা ?

—লেখলাম !

—গালমন্দ কর নাই তো।

—তা করব কেন।

বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি এসে আলেফ বলল,—ডাকঘরে যায়ে এককথা শুনে আসলাম।

—কি কও ?

—জমি কিনবি ?

—জমি—জমি আবার বুঝি ঘুরানি লাগছে। গান তাইলে ওরা এখনও বাঁধে নাই।

—না-না তাই কই নাই। শুনলাম রামচন্দর মণ্ডল জমি বেচে। বুঝলি একলপ্তে আটদিন বিঘা। এতো না-খাওয়ার ভুই না। ন্যায্য দামে কিনবা, তার কি কথা কে কবি। আর জমি বুঝলি না, সে যেন কথা শুনে ফসল দেয়।

—জোৎদার হবের চাও ?

—জোৎদারি আর কনে, একটুক বাড়ায়ে বাড়ায়ে খাতে হয়।

—জমি ও কিনবা, লটা ঘাসও বাঁধবা, এ-কেমন বুঝি না।

আলেফ আবার চুপ ক'রে গেল।

(ক্রমশঃ)

বাঙালীর ইতিহাস ঃ

"তুমি যদি আশ্রয়প্রার্থী আফঘন-নারী-শিশুকে তোমার রোটস-দুর্গে আশ্রয় না দাও, তোমার দুয়ারে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।" রাজা হরিকৃষ্ণ রায়কে তাঁর নায়েব-সচিব ব্রাহ্মণ চূড়ামণি বললেন। ষোড়শ শতকে হুমায়ুন যখন গৌড়-বিজয় করে শেরখানের কিল্লা ফতে করে দিয়েছেন, শেরখান বিপন্না আফঘন-নারীর রক্ষক হিসেবে বাংলার হিন্দু রাজা ও রাজমন্ত্রীর শরণ নিয়েছিলেন।

তনয়া

শ্রীতুষার বন্দ্যোপাধ্যায়

মৈত্রেয়ী বাইরের গেটটার কাছে এসে প্রথমে দাঁড়ালো।

শ্বেতপাথরের খোদাই করা অক্ষরে বাড়ীর নাম লেখা আছে, তা পড়া যাচ্ছে না। তার উপর পুরু মাকড়সার জাল ; নিচের স্তরে প্রায় দু' ইঞ্চি ধূলো জমেছে। কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে নীরবে চিন্তা করে নিল ঃ বড় বড় দুটো ইউক্যালিপটাস গাছ আছে গেটের দু'পাশে। লাল বাড়ীটার সামনে বেশ বড় বাগান। দক্ষিণ দিকে প্রকাণ্ড একটা পলাশ গাছ, একটু দূরেই একটা সাঁকো আছে। বাড়ীর নামটা গেটের উপরে লেখা।

······কোমল হাত দিয়ে মুছে ফেলল, সেই প্লেটখানা। নামটা এবার পড়া গেল ···অক্ষরগুলোর স্পর্শে শিহরণ বইল মৈত্রেয়ীর সারা অঙ্গে। "প্রেমনিকুঞ্জ"। আলতো ভাবে উচ্চারণ করল ঃ "প্রেমানকুঞ্জ"।

আশেপাশে জনমানব নেই। লোকালয় থেকে যেন একেবারে বাইরে এসে পড়েছে সে। কিছুক্ষণ। আরো কিছুক্ষণ কাটল। তারপর গেটটা হাত দিয়ে খুলে বাগানের ভেতরে গেল। ···একটু একটু করে এগিয়ে যেতে লাগল। ইউক্যালিপটাসের পাতার মড়মড় শব্দ। এপাশ ওপাশ থেকে চলে-আসা লতা পাতাগুলো হাত দিয়ে সরাতে সরাতে একটু একটু করে এগোতে লাগল।

বাংলো প্যাটার্নের বাড়ী। বাইরের দালানে যে পরিমান ধূলো জমেছে তা দূর থেকে দেখলেই মনে হয় এবাড়ীতে বহুকাল মানুষের বাস উঠে গেছে। থমকে দাঁড়িয়েছিল মৈত্রেয়ী। ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। শব্দটার উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার করে নিয়ে সে দেখতে পেল, একটা বিরাটকায় সাপ। শিকার ধরেছে ; সেই আনন্দেই তার এই গর্জ্জন। একটা চামচিকে আচমকা কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তার স্পর্শ এড়াবার জন্য মৈত্রেয়ী একটু ঝুঁকে পড়ল। দেওয়ালের বাঁকে কায়েমী বাসা বেঁধেছে ওরা। নোতুন আগন্তুক দেখে যেন কিচির মিচির শব্দ করতে লাগল। দূরে একটা খেঁক-শিয়াল দেখা গেল। এদিকেই ছুটে আসতে গিয়ে মানুষ দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল, আবার সেই দিকেই পালিয়ে গেল।...কি করবে ভাবতে লাগল মৈত্রেয়ী।

এ বাড়ীতে কেউ নেই ? রাস্তায় কোনো জিজ্ঞাসা বাদ করা হয় নি। গোপালপুর ষ্টেশনে নেমে যা যা নোট বইয়ে লিখে রেখেছিল, সেইমত পথ আবিষ্কার করে এই বাড়ী চলে এসেছে। কিন্তু যেখানে লোক নেই, সেখানে কার কাছে আসা ?

ঘং ঘং ঘং—ওয়াক-ওয়াক-আহ আক্ থুঃ।···একি এ যে মানুষের কাশি ? তাহলে কেউ আছে নিশ্চয়।

হঠাৎ যেন, মানুষের অস্তিত্ব আছে, একথা বিশ্বাস করতেই তার ভয় করল। মনে হল, না না—নির্জ্জনতাই ছিল ভাল।···আবার সেই কঠিন বেদশচেরা কাশি কানে আসতে লাগল। মৈত্রেয়ীর মনোবল আছে। সে স্থির করল : নাঃ ভয় পাব কেন ? নিজের অধিকার নিজের সত্তা ছেড়ে দেব কেন ? এবার মনে পড়ল সিদ্ধার্থের উজ্জ্বল মধুর মুখখানা। বিদ্বান্ গুণবান সে। তার কথাগুলো কানে বেজে উঠল : তোমাদের বাড়ীতে একবার যাও না, তাঁকে অন্ততঃ একবার দেখে আসা কর্ত্তব্য। তোমার একলা যেতে ভয় করে·······

ঃ না আমার ভয় করে না। বাধা দিয়েছিল মৈত্রেয়ী। আমি একাই গিয়ে দেখে আসবো। তারপর প্রয়োজন বোধ কর, তুমি আমার সঙ্গে যাবে। তারপর আশায় সুন্দর স্বপ্নে মধুর জগৎটা, তার কল্পনা-পটে ভেসে উঠতেই তার সাহস, উৎসাহ শতগুণে বেড়ে গেল। চীৎকার করে ডাকলো : কে আছেন এ বাড়ীতে ? কে—উ—আ—ছে—ন ?

ঃ ঘং ঘং ঘং·······মৈত্রেয়ীর কথার প্রতিধ্বনির সঙ্গে ভেসে এলো সেই কাশির শব্দ—ঘং ঘং ঘং।···আছে আছে···।

চমকে উঠলো মৈত্রেয়ী। কে সাড়া দিচ্ছে ?

আস্তে আস্তে দরজাটা নড়ল। বেশ ঝাঁকুনি দেওয়ার পর খুলে গেল। একটি ছ'ফুট লম্বা লোক. শীর্ণ জরাজীর্ণ, দরজা খুলে দিয়ে সেই কাশি নিয়ে বসে পড়ল। তার সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যটা মুড়ে ছোট করে করে নিল। চুলগুলো অর্দ্ধেক পেকে গেছে। দাঁতও পড়ে গেছে। কদর্য্য ময়লা পোষাক।

ঘং ঘং ঘং······আঃ ওয়াক থুঃ···কাকে চান ?

মুখ নীচু করে লোকটা প্রশ্ন করল। মৈত্রেয়ী তাকে ভাল করে লক্ষ্য করে নিল। তারপর বলল : শ্রীপ্রেমময় সান্যাল মশাইকে।

ঃ ঘং ঘং ঘং···তিনি···তিনি···মারা···মানে না না। তিনি এখানে নেই। কেন তাকে চাই জানতে পারি কি ?···ঘং ঘং ঘং !

ঃ আপনি কে ?

ঃ আমি কে, জানবার বিশেষ প্রয়োজন আছে কি ?

ঃ আছে। আপনার পরিচয় না পেলে আমার বক্তব্য প্রকাশ করব না। তার কারণ আমি অত্যন্ত ব্যক্তিগত কাজে এসেছি।

ঃ তা'হলে তো পরিচয়টা দিতেই হ'ল। আমার নাম···কাশীনাথ। এ বাড়ীটা আমার তত্ত্বাবধানেই প্রেমবাবু রেখে গেছেন।

ঃ তা'হলে আমি চলি। তিনি কবে আসবেন ? কোথায় গেছেন ?

ঃ এ সংবাদ দিতে পারলুম না। তিনি বহুদিন চিঠি পত্র দেন না।

ঃ বেশ আমি তা'লে চলি····

ঃ না না যাবেন কেন। বৃদ্ধ বাধা দিল। তারপর কিছুক্ষণ একদৃষ্টে দেখে নিল মৈত্রেয়ীকে। তারপর টেনে বলল : তোমার নাম কি মৈত্রেয়ী ?

ঃ হ্যা। আপনি কি করে জানলেন ?

ঃ প্রেমবাবু বলেছিলেন—বলেছিলেন হয়তো তুমি আসবে···এই দেখ, 'তুমি' বলে ফেললুম। আমি বুড়ো মানুষ, কিছু মনে করো না মা।

ঃ আপনি আমায় 'তুমি' বলবেন। কিন্তু তিনি আর কি বলে গেছেন, তাই বলুন দয়া করে।

ঃ যা যা বলে গেছেন, সবই বলবো একে একে। তুমি মা ভেতরে এসো। বৃদ্ধ কাশীনাথ উঠে দাঁড়ালেন। এস মা ভেতরে এসো।

মৈত্রেয়ী ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকলো।

ঃ ঐ চেয়ারটায় বস মা। একটু চা-জল খাবার খাওয়া যাক, তারপর গল্পগাছা হবে। কি বল ?

ঃ দেরী করতে পারবো না। চারটের ট্রেনে ফিরতে হবে।

ঃ আজ বেটা কেষ্টা কোথায় ডুব মেরেছে। দেখেছে আজ বুড়ো একটু বেকাদায় আছে, বেশী হাঁকডাক করতে পারবে না—অমনি···এইযে, কোথায় গিয়েছিলে বাপধন ?

কেষ্টা ঢুকল। বছর পনেরো বয়স হবে। লেখাপড়া শেখা ভদ্রলোকের ছেলে মনে হল। বিনীত স্বরে বলল : জ্যাঠাবাবু আপনার জন্য—আনতে গিয়েছিলাম। চা করি।

ঃ হ্যা কর। আর ঐ দিদিকে দাও। চিন্তামণির দোকান থেকে কিছু ভাল খাবার নিয়ে এস। এক দৌড়ে যাবে—আর আসবে।···

বলার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি দৌড় দিল।

বাধা দিতে গিয়েছিল মৈত্রেয়ী। খাবার হাঙ্গামা না করলেই ভাল হত। কিন্তু সেই সকালে সহর থেকে কিছু খেয়ে বেরিয়েছিল। সত্যি খুব খিদে পেয়েছিল। তাই চুপ করে রইল। কাশীনাথ প্রশ্ন করল : মা কখন বেরিয়েছ ?

ঃ সকাল সাড়ে ন'টায়।

ঃ এখনো লেখাপড়া করছ ?

: করছি। এবার বি. এ. পরীক্ষা দেব।

: তোমার মা কেমন আছেন?

: তিনি তো মারা গেছেন মাস-দুই আগে। এখানে সংবাদ দিয়েছিলাম।

: তোমার মা মারা গেছেন?

বৃদ্ধ বসে পড়ল। হঠাৎ সে যেন কঠিন আঘাত পেয়েছে। তারপর সুরু হ'ল তার কাশি। সঙ্গে সঙ্গে কাঁদছে মনে হল।

: এই ঠিকানায় আমি চিঠি দিয়েছিলাম।···প্রেমবাবু পান নি?

: তিনি তো এখানে নেই। আমি আছি বরাবর। কিন্তু কোনও চিঠি তো পাইনি মা। এইভাবে হঠাৎ চলে যাবে রাণী, আমার কল্পনা করতেও কান্না পাচ্ছে। ঘং ঘং ঘং···

: মা'কে আপনি চেনেন?

: তা' সামান্য চিনি। কিন্তু আমার কাজগুলো তা'হলে সেরে নিই। আর দেরী করা চলে না।

: আপনার কি কাজ?

: বলছি মা আছে, একটু চা খেয়ে নাও, সব বলছি। হ্যা তোমার বিয়ের কথাটা বড় জানতে ইচ্ছে করছে মা, লজ্জা করো না। তুমি তো আজকালকার বুদ্ধিমতি মেয়ে।

: কলকাতায় মা যাঁর সঙ্গে ঠিক করে গেছেন তার সঙ্গেই হবে। তারা ইদানীং আমাদের সহরেই আছেন। তাঁর কাকা আমাদের বিষয়ে সঠিক খোঁজ খবর চান। আমার বাবাকে আমি কখনো দেখিনি। তিনি বিদেশে আছেন—এ কথাই শুনে এসেছি। মৃত্যুর আগের দিন, মা সব কথা বললেন। ডাইরীতে নোট করে নিলাম। তাঁর মৃত্যুর পর একটা সংবাদ দিয়েছিলাম—তাঁরই ইচ্ছামত। কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে আমার ভারী দুঃখ হয়েছিল। আমার ইচ্ছে ছিল না যে, এখানে আবার আসি, বা খোঁজ খবর নিই। শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হয়েই এলাম। আমার মা ছাড়া আর কেউ নেই। তাই আমায় বিয়ে করে সংসারী হতেই হবে।···তাই···পিতৃপরিচয়টা···

: বুঝেছি মা। তোমার পিতৃপরিচয় আমার কাছে পাবে। ঐ কেষ্টা এসে গেছে। দে রে, তোর দিদিকে একটু তাড়াতাড়ি খেতে দে।

কিছুক্ষণের মধ্যে কেষ্টা চা-খাবার এনে দিল। ভারী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খাওয়া হয়ে গেল কাশীনাথ বলল: মা তোমার ভারী কষ্ট হল এখানে।

: না না। কিছুই কষ্ট হয় নি। মৈত্রেয়ী অকপটে বলল। তারপর বলল: এত বড় বাড়ীতে আপনি একলা থাকেন? কেষ্টা কোথায় থাকে?

: এখানে একা আমিই থাকি। কেষ্টা পাড়ার ছেলে, লেখাপড়া করে, আর একটু আধটু এই বুড়োকে সাহায্য করে। খিড়কির দরজাটাই খোলা থাকে, ঐ দিক দিয়েই যাতায়াত চলে। সদর দরজা বন্ধ থাকে। কেষ্টা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমার প্রতি ওর একটু দয়ামায়া আছে। কায়স্থর ছেলে, বড় ভাল ছেলেটি। ওরে কেষ্টা, ঐ খাতাটা পাড়ত বাবা।

কেষ্টা খাতাটা এনে দিল।

: তোর দিদিকে খাতাটা দে। কেষ্টা খাতাটি মৈত্রেয়ীর হাতে তুলে দিল।

মৈত্রেয়ী খাতাটী হাতে নিয়ে খুলে দেখল। তারপর প্রশ্ন করল: এই খাতাটি কার? কি চমৎকার হাতের লেখা।

: পড়ে দেখ। সব জানতে পারবে।

: এতে গল্প লেখা আছে। আমিও গল্প লিখি। আচ্ছা পড়ে দেখি একটা গল্প।

সৌম্যর সঙ্গে দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে আলাপ এক অপরিচিত ভদ্রমহিলার।

তিনি সেখানে একলাই এসেছিলেন। ভদ্রমহিলাই আলাপ করে নিলেন। বিদেশে এসেছেন, সঙ্গীহীন। তাই সঙ্গী করে নিলেন সৌম্যকে।

সৌম্য মিথ্যা কথা বলেছিল—সে-ও সঙ্গী খুঁজছিল। যাই হোক, দুজন সঙ্গীহীন হল পরস্পরের সঙ্গী। একই হোটেলে তারা গিয়ে উঠল। আর সৌম্যেন দুষ্টুমী করে হোটেলের খাতায় তাদের নাম লেখাবার সময় বলে দিল—তারা স্বামী-স্ত্রী। প্রথমটা আপত্তি করলেও, সীমা একই ঘরে 'স্বামী-স্ত্রীর' অভিনয় করে চারদিন দার্জ্জিলিং-এ কাটালো। দাম্পত্যের অভিনয় করতে গিয়ে বাস্তবতার আস্বাদ পেয়ে গেল। শেষ পর্য্যন্ত সৌম্য জোর ক'রেই সীমাকে নিয়ে এল তার দেশের বাড়ীতে। ছবির মত চমৎকার বাড়ী, বাগান, ফুলে ফলে ভরা। এসব দেখে সীমা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেন বসন্তের সীমানায় পৌঁছাল। কিন্তু সীমা যখন দেখল, এবাড়ীতে কোনও মেয়ে নেই, তখন সে বেশ বিব্রত বোধ করল। বলল: তোমার বাড়ীতে মা আছেন বলেছিলে; তিনি কই? সৌম্য বলেছিল: তিনি নেই। আমার কেউ নেই। তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছিলাম। আমার জীবনের ইতিহাস যদি শোন, তা'হলে তোমারও আমার প্রতি নিশ্চয় দয়া হবে। আমার বাবা, মা, ভাই সকলে একে একে আমায় ছেড়ে চলে গেছেন। যখন আমার ভাল লাগে না, তখন আমি দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে যাই। কলকাতায় কিছুদিন প্রফেসারী করেছিলাম কিন্তু বাড়ীর এই অবস্থা! জমি-জমা আছে: আমি এখানে না থাকলে আমার সব নষ্ট হয়ে যাবে। তাই এখানে চলে এসেছি গানবাজনা আর সামান্য লেখাপড়া নিয়ে

সময় কাটে। আমার নিঃসঙ্গ জীবনে তোমাকে সেইদিন সঙ্গী করে নিয়েছি, যেদিন দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে তুমি আমার সঙ্গ চেয়েছিলে।

সীমা শিক্ষিতা মেয়ে। পঁচিশ বছরের উদ্দাম যৌবন তার। সৌম্যর সৌম্য-সুন্দর মূর্ত্তির কাছে যেন আত্মসমর্পণ করতেই তার ভাল লেগেছিল। প্রায় দশদিন কাটল সেখানে। তারপর সীমার স্কুল খোলবার সময় হয়ে এল।

সীমা বলল ঃ দেখ সৌম্য, আমি এবার ফিরে যাই। পিসিমাকে কাশী থেকে আনতে হবে। আমার জীবনও তোমার মত আত্মীয়-স্বজনহীন, নিঃসঙ্গ। তা তো তুমি জান। আমার বিয়ের সময় কিছু গোলমাল বাধায় আমার বিয়ের রাত্রে, অসমাপ্ত বিয়ে ভেঙ্গে যায়। আমার স্বামী আছেন, আমি জানি। স্কুলে বিবাহিতা হেডমিসট্রেস রাখা হয়, তাই আমি সিন্দুর পরি। কিন্তু আমার বিবাহিত জীবন যাপন করা হয়নি একদিনের জন্যও। তবে তোমার কাছে আমি এর স্বাদ পেয়েছি। এখন কিন্তু তোমায় বিয়ে করা সম্ভব নয়।

সৌম্য প্রশ্ন করেছিল ঃ কেন ?

ঃ আমি স্কুলের হেডমিসট্রেস। আর আমার স্বামী আছেন বিদেশে, তার চাকরী নিয়ে, এই সকলে জানে। কাছে থাকেন বিধবা পিসিমা। ছুটীর সময় তাকে তীর্থে পাঠিয়ে দিয়ে আমি দেশ ভ্রমণে যাই; লোকে জানে আমি স্বামীর কাছে যাই। এ অবস্থায় বিয়ে করা সম্ভব নয়। তারপর, বাংলায় এম, এ, পরীক্ষা দিয়েছি। ফল যদি ভাল হয় তা'হলে প্রফেসারী করব।

সৌম্য আর কিছু বলল না।

একটু পরে বলল : বেশ কাল তুমি চলে যেও।

শেষ রজনী। সেই শেষ রজনীতে সীমা আর সৌম্যেন পরস্পরের বন্ধুত্বের সীমানা ছাড়িয়ে এসে দাঁড়াল।......তখন তাদের চমক্ ভাঙ্গলো যখন তারা অনুভব করল তারা তারা আর কেউ নয়—একটি পুরুষ ও নারী। কিন্তু তাদেরই অজান্তে কখন যেন তারা 'এক' হয়েছে। আবার যখন তারা পরস্পরকে খুঁজে পেল, তখন তারা শিউরে উঠল। কেবল তাদের মনে হতে লাগল, তারা একি করেছে? কোথায় গেল তাদের শিক্ষার শক্তি? কোথায় হারালো তাদের সত্তা, তাদের মনোবল? কোন্ মায়াজালে তারা আপনহারা?......সারা রাত কিভাবে কেটে গেল তারা কেউ জানে না। তবে সূর্য্যের আলোকে যখন তাদের চোখে সোনালী ঝলকানি লাগল, তখন তারা বুঝল, তারা একটা ছোট যুগ পার করে চলে এসেছে কোন্ যুগান্তরে!

সীমা ফিরে গেল তার কর্ম্মস্থলে। সৌম্য রইল তার নিজের দেশে। কিছুকাল পর হঠাৎ একদিন সীমা এসে হাজির হল সেইখানে।

সৌম্য বলল ঃ আরে তুমি এখানে ?

সীমা বলল ঃ আমি সীমাহীন ছিলাম। কিন্তু সৌম্য তুমি এ কী করেছ? আমায় সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে? আমার জীবনে......আর কথা কইতে পারল না। আবেগে কান্না পেল, ভাষা হয়ে গেল মূক। সীমার অব্যক্ত কথাগুলো শান্তদৃষ্টিতে পড়ে নিল সৌম্য একটু একটু করে।

উচ্ছল নারীর যৌবনোন্মত্ত নির্ভীক চাহনীর উপর পড়েছে কোমল স্নিগ্ধ একটা মায়া-ভেজা আচ্ছাদন। মাতৃত্বের উজ্জ্বল আলো...তা হয়ে রয়েছে আবীর গোলা রঙ্গীন। কিন্তু কেন? নারী-জীবনের উষাকালে একি অস্তরাগ?

রাঙ্গা ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে সীমার। বলে, সৌম্য তুমি কথা কও। কথা কও। কথা বল। আমি কি করব? আত্মহত্যা?

ঃ না, আত্মরক্ষা। সৌম্যর শান্তগম্ভীর মূর্ত্তি নড়ল ঃ যে আসছে তাকে আসতে দাও। ওকে পালন করবার কর্ত্তব্য আমাদের আছে।

সীমা এবার কেঁদে ফেলল ঃ কিন্তু কি করে বাঁচবো আমি, আমার এই মুখ নিয়ে?

ঃ তোমার স্বামী জীবিত এই তোমার রক্ষাকবচ। এই মাতৃত্ব হবে তোমার জীবনের গৌরব। তুমি তো ভয় পাবার শিক্ষা পাওনি? সীমা কিছুকাল ভাবল, তারপর বলল ঃ ও কোথায় দাঁড়াবে?

ঃ কেন, এই "প্রেম-নিকুঞ্জে" যেখানে তার জীবন অঙ্কুরিত হয়েছিল? এই নাও আমি লিখে দিচ্ছি।......সৌম্যর মুখের দিকে এবার তাকাল সীমা। সৌম্য কোন্ ধাতু দিয়ে আজ পর্ব্বত হয়ে গেছে দৃঢ়তায়। আজ তার জীবনে কোথা থেকে সার্থকতা এসেছে কোথায় যেন সে আজ হয়ে উঠেছে পূর্ণ। সীমা, মাসিক দু'শত টাকা পাবে, এই স্বীকারোক্তি লিখে দিল সৌম্য। সেই স্বাক্ষর দিয়ে সে স্বীকার করে নিল গর্ভজাত শিশুর পিতৃত্ব। অস্বীকার করল না, সেই শেষ রজনীর পুরুষ ও নারীর মিলনকে।

গল্পটা এভাবে শেষ করা নয়, অসমাপ্ত রাখা।

মৈত্রেয়ীর চমক ভাঙ্গল।

এ যেন সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে।দল কে? মৈত্রেয়ী চীৎকার করে উঠল ঃ প্রেমময় সান্যালকে আমি চাই। তাঁর কাছে আমার অনেক প্রশ্ন আছে।

কাশীনাথ বলল ঃ প্রশ্নের তো শেষ নেই মা এজগতে। কিন্তু এই গল্পের মধ্যে কোনও প্রশ্নের উত্তর কি পাও নি?

ঃ বুঝতে পারছি না। আমার যাবার সময় হ'ল। প্রেমময়বাবুর সঙ্গে যখন দেখা হল না, তখন অ-যথা......

সময় কাটে। আমার নিঃসঙ্গ জীবনে তোমাকে সেইদিন সঙ্গী করে নিয়েছি, যেদিন দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে তুমি আমার সঙ্গ চেয়েছিলে।

সীমা শিক্ষিতা মেয়ে। পঁচিশ বছরের উদ্দাম যৌবন তার। সৌম্যর সৌম্য-সুন্দর মূর্ত্তির কাছে যেন আত্মসমর্পণ করতেই তার ভাল লেগেছিল। প্রায় দশদিন কাটল সেখানে। তারপর সীমার স্কুল খোলবার সময় হয়ে এল।

সীমা বলল : দেখ সৌম্য, আমি এবার ফিরে যাই। পিসিমাকে কাশী থেকে আনতে হবে। আমার জীবনও তোমার মত আত্মীয়-স্বজনহীন, নিঃসঙ্গ। তা তো তুমি জান। আমার বিয়ের সময় কিছু গোলমাল বাধায় আমার বিয়ের রাত্রে, অসমাপ্ত বিয়ে ভেঙ্গে যায়। আমার স্বামী আছেন, আমি জানি। স্কুলে বিবাহিতা হেডমিস্ট্রেস রাখা হয়, তাই আমি সিন্দুর পরি। কিন্তু আমার বিবাহিত জীবন যাপন করা হয়নি একদিনের জন্যও। তবে তোমার কাছে আমি এর স্বাদ পেয়েছি। এখন কিন্তু তোমায় বিয়ে করা সম্ভব নয়।

সৌম্য প্রশ্ন করেছিল : কেন ?

: আমি স্কুলের হেডমিসট্রেস। আর আমার স্বামী আছেন বিদেশে, তার চাকরী নিয়ে, এই সকলে জানে। কাছে থাকেন বিধবা পিসিমা। ছুটীর সময় তাকে তীর্থে পাঠিয়ে দিয়ে আমি দেশ ভ্রমণে যাই ; লোকে জানে আসি স্বামীর কাছে যাই। এ অবস্থায় বিয়ে করা সম্ভব নয়। তারপর, বাংলায় এম, এ, পরীক্ষা দিয়েছি। ফল যদি ভাল হয় তা'হলে প্রফেসারী করব।

সৌম্য আর কিছু বলল না।

একটু পরে বলল : বেশ কাল তুমি চলে যেও ;

শেষ রজনী। সেই শেষ রজনীতে সীমা আর সৌম্যের পরস্পরের বন্ধুত্বের সীমানা ছাড়িয়ে এসে দাঁড়াল।......তখন তাদের চমক্ ভাঙ্গলো যখন তারা অনুভব করল তারা তারা আর কেউ নয়—একটি পুরুষ ও নারী। কিন্তু তাদেরই অজান্তে কখন যেন তারা 'এক' হয়েছে। আবার যখন তারা পরস্পরকে খুঁজে পেল, তখন তারা শিউরে উঠল। কেবল তাদের মনে হতে লাগল, তারা একি করেছে ? কোথায় গেল তাদের শিক্ষার শক্তি ? কোথায় হারালো তাদের সত্তা, তাদের মনোবল ? কোন্ মায়াজালে তারা আপনহারা ?......সারা রাত কিভাবে কেটে গেল তারা কেউ জানে না। তবে সূর্য্যের আলোকে যখন তাদের চোখে সোণালী ঝলকানি লাগল, তখন তারা বুঝল, তারা একটা ছোট যুগ পার করে চলে এসেছে কোন্ যুগান্তরে !

সীমা ফিরে গেল তার কর্ম্মস্থলে। সৌম্য রইল তার নিজের দেশে। কিছুকাল পর হঠাৎ একদিন সীমা এসে হাজির হল সেইখানে।

সৌম্য বলল : আরে তুমি এখানে ?

সীমা বলল : আমি সীমাহীন ছিলাম। কিন্তু সৌম্য তুমি এ কী করেছ ? আমায় সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে ? আমার জীবনে......আর কথা কইতে পারল না। আবেগে কান্না পেল, ভাষা হয়ে গেল মূক। সীমার অব্যক্ত কথাগুলো শান্তদৃষ্টিতে পড়ে নিল সৌম্য একটু একটু করে।

উচ্ছল নারীর যৌবনোন্মত্ত নির্ভীক চাহনীর উপর পড়েছে কোমল স্নিগ্ধ একটা মায়া-ভেজা আচ্ছাদন। মাতৃত্বের উজ্জ্বল আলো...তা হয়ে রয়েছে আবীর গোলা রঙ্গীন। কিন্তু কেন ? নারী-জীবনের উষাকালে একি অস্তরাগ ?

রাঙ্গা ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে সীমার। বলে, সৌম্য তুমি কথা কও। কথা কও। কথা বল। আমি কি করব ? আত্মহত্যা ?

: না, আত্মরক্ষা। সৌম্যর শান্তগম্ভীর মূর্ত্তি নড়ল : যে আসছে তাকে আসতে দাও। ওকে পালন করবার কর্ত্তব্য আমাদের আছে।

সীমা এবার কেঁদে ফেলল : কিন্তু কি করে বাঁচবো আমি, আমার এই মুখ নিয়ে ?

: তোমার স্বামী জীবিত এই তোমার রক্ষাকবচ। এই মাতৃত্ব হবে তোমার জীবনের গৌরব। তুমি তো ভয় পাবার শিক্ষা পাওনি ? সীমা কিছুকাল ভাবল, তারপর বলল : সে কোথায় দাঁড়াবে ?

: কেন, এই "প্রেম-নিকুঞ্জে" যেখানে তার জীবন অঙ্কুরিত হয়েছিল ? এই নাও আমি লিখে দিচ্ছি।......সৌম্যর মুখের দিকে এবার তাকাল সীমা। সৌম্য কোন্ ধাতু দিয়ে আজ পর্ব্বত হয়ে গেছে দৃঢ়তায়। আজ তার জীবনে কোথা থেকে সার্থকতা এসেছে কোথায় যেন সে আজ হয়ে উঠেছে পূর্ণ। সীমা, মাসিক দু'শত টাকা পাবে, এই স্বীকারোক্তি লিখে দিল সৌম্য। সেই স্বাক্ষর দিয়ে সে স্বীকার করে নিল গর্ভজাত শিশুর পিতৃত্ব। অস্বীকার করল না, সেই শেষ রজনীর পুরুষ ও নারীর মিলনকে।

গল্পটা এভাবে শেষ করা নয়, অসমাপ্ত রাখা।

মৈত্রেয়ীর চমক ভাঙ্গল।

এ যেন সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে দেল কে ? মৈত্রেয়ী চীৎকার করে উঠল : প্রেমময় সান্যালকে আমি চাই। তাঁর কাছে আমার অনেক প্রশ্ন আছে।

কাশীনাথ বলল : প্রশ্নের তো শেষ নেই মা এজগতে। কিন্তু এই গল্পের মধ্যে কোনও প্রশ্নের উত্তর কি পাও নি ?

: বুঝতে পারছি না। আমার যাবার সময় হ'ল। প্রেমময়বাবুর সঙ্গে যখন দেখা হল না, তখন অ-যথা......

ঃ অযথা নয়। এই নাও, স্বাক্ষর করে দিলাম।······একখানা দলিলপত্র সে এগিয়ে দিল মৈত্রেয়ীর হাতে।

মৈত্রেয়ী আশ্চর্য্য হয়ে বলল ঃ এটা আবার কি? এটা আমার কি প্রয়োজন? কাশীনাথ হাসল। স্নেহভরে মৈত্রেয়ীর মাথার হাত রেখে বলল ঃ একটা তোমার ভাবী স্বামীকে দেখিও। আর বলো ঃ আমার বাবা প্রেমময় সান্যাল তার "প্রেমনিকুঞ্জ" আমায় দিয়ে গেছেন। আমার অধিকার আমি পেয়েছি।

ঃ কিন্তু, আপনি এতে সই করলেন? এ যে জাল দলিল তৈরী হল! মৈত্রেয়ী আবার প্রশ্ন করল।

ঃ দলিল জাল। কাহিনীত জাল নয়। আসল প্রেমময় সন্যাল তোমার সামনে দাঁড়িয়ে।

ঃ আপনিই শ্রীপ্রেমময় সান্যাল? আপনি আমার বাবা? অবাক্ চীৎকার করে উঠল মৈত্রেয়ী।

ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ এই···ঘং ঘং ঘং ভীষণ কাশি সুরু হয়ে গেল। বৃদ্ধ বসে পড়ল।

মৈত্রেয়ী সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না।

আর দেরী না করে, বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে।

বৃদ্ধ চীৎকার করতে লাগল ঃ মৈত্রেয়ী যেও না যেও না। শুনে যাও। আমার পিতৃত্বকে অবহেলা করোনা। মৈত্রেয়ী···

মৈত্রেয়ী ছুটতে চেষ্টা করল স্টেশনের দিকে। পিছন দিকে তাকাবার সাহস নেই। তবু ছুটে চলল। তা পা-দুটো দু'মণি বোঝা বলে মনে হতে লাগল। কানে বেজে উঠেছে সেই ঘং ঘং ঘং কাশির শব্দ। তবু ছুটেছে। ফিরে তাকাবে না। এ ট্রেন তাকে ধরতেই হবে। সিদ্ধার্থ হয়তো তার জন্যে বাসায় এসে সন্ধ্যে বেলায় অপেক্ষা করবে। মৈত্রেয়ীর কাছে সব সংবাদ পেলে তার কাকাকে গিয়ে বলতে পারবে—মৈত্রেয়ীর বংশ পরিচয়। পিতৃপরিচয়। সে বেচারা কত আশা করে বসে থাকবে?

মৈত্রেয়ী কোনও মতে ট্রেনটা পেয়ে গেল। গাড়ীর শব্দের মধ্যেও সে কেবল শুনতে লাগল, সেই বৃদ্ধের ঘং ঘং কাশির শব্দ। আর তার কথা সিদ্ধার্থ যখন শুনতে চাইবে, মৈত্রেয়ী কি উত্তর দেবে তাকে? তাকে সমস্ত কাহিনী বলে যাবে? না না, কি করবে? কি ভাবে দেবে তার পিতৃপরিচয়?

এবার হঠাৎ তার নজরে পড়ল। প্রেমময় সান্যালের দেওয়া দলিল পত্রটি তার হাতে রয়ে গেছে। ওভাবে পালিয়ে আসার সময় ফেলে আসে নি। সে তার অধিকার। তার অবচেতন মনে গ্রহণ করে ফেলেছে তার পিতৃপরিচয় পত্রটি—তার জীবন্ত পিতার জ্বলন্ত স্বাক্ষরিত সেই দলিল পত্র।

রঙ্গমঞ্চ

অবধূত

[উজ্জয়িনীর অবধূত-সম্প্রদায়ভুক্ত মহাকাল-মন্দিরের এক ব্যক্তি তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা ইতোপূর্ব্বে মরুতীর্থ পর্য্যটন-প্রসঙ্গে পত্রান্তরে ব্যক্ত করেছেন। কালিদাস এই উজ্জয়িনীর মহাকবি ছিলেন। রঙ্গমঞ্চ-প্রণেতা কালিদাস বা ঈশকাইলাস না হলেও কৈলাস-মানস দেখে পুরোপুরি মানবিক। পাঠকরা নির্ভয়ে এই তান্ত্রিকের মানবিক মন্ত্রোচ্চারণ পাঠ শুনতে পারেন...আমি সম্পাদক হিসাবে এটুকু ভর্সা মাত্র দিতে পারলাম।]

উদ্ধারণপুরের ঘাট। কান্নাহাসির হাট। ছত্রিশ জাতের মহাসমন্বয় ক্ষেত্র। দুনিয়ার সর্ব্বত্র দিনের শেষে নামে রাত, রাতের পিছু পিছু আসে দিন। উদ্ধারণপুরের ঘাটেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।

কিন্তু উদ্ধারণপুর শ্মশানের দিন আসে ওস্তাদ জাদুকরের বেশ ধরে। ভেল্কি-বাজির সাজ-সরঞ্জাম বাঁধা প্রকাণ্ড পুঁটলিটা পিঠে ফেলে আঁধার কালো যবনিকার অন্তরাল থেকে নিঃসাড়ে পা টিপে টিপে আবির্ভূত হয় উদ্ধারণপুরের দিন। ধীরে ধীরে যবনিকাখানি চোখের ওপর মিলিয়ে যায়। আলোর বন্যায় ভেসে যায় রঙ্গমঞ্চ। হেসে ওঠে উদ্ধারণপুরের ঘাট। পোড়া কাঠ, ছেঁড়া মাদুর, চট কাঁথা, বাঁশ চাটাই, হাড়গোড় ভাঙ্গা কলসী সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। হাড়গিলাদের ঘুম ভাঙ্গে। শকুনিরা ডানা ঝাপটে সাড়া দেয়। আকাশের দিকে মুখ তুলে শেয়ালেরা শেষবারের মত বলে ওঠে—হুক্কা হুয়া-হুয়া হুয়া-হুয়া হুয়া। অর্থাৎ কি না, হে-নিশা আবার ফিরে এস তুমি। দিনের আলোয় আমরা বড় চক্ষু-লজ্জায় পড়ে যাই কাঁচা মড়া নিয়ে টানাটানি করতে। তারওপর ওই ওরা জেগে উঠে পাখা ঝাপটাচ্ছে, এখনি ভাগ বসাতে আসবে আমাদের ভোজে।

ততক্ষণে উদ্ধারণপুরের দিন তার জাদুর পুঁটলি খুলে ফেলেছে। সুরু হয়ে গেছে মায়াবী যাদুকরের জাদুর খেল্। পুঁটলিটা থেকে কি যে বেরুবে আর কি যে বেরুবেনা তা আন্দাজ করে কার সাধ্য? খেলার পর খেলা চলতেই থাকে। কথা আর কথা, কথার ইন্দ্রজালে সব কিছু ঘুলিয়ে যায়। যা জ্বলজ্বল করছে চোখের সামনে এক ফুঁ দিয়ে দেয় তা উড়িয়ে। কোথাও যার চিহ্ন মাত্র নেই—তুড়ি দিয়ে তা আমদানি করে তুলে ধরে নাকের ডগায়। সবই অদ্ভুত সবই তাজ্জব কাণ্ড। আগের খেলাটির সঙ্গে পরেরটির কোনও খানে কোনও মিল নাই।

উদ্ধারণপুরের শ্মশান। পাকা ওস্তাদ জাদুকরের বেশে প্রতিটি দিন যেখানে আসে

কালো যবনিকার অন্তরাল থেকে। চালিয়ে যায় তার ভোজবাজি যতক্ষণ না যবনিকাখানি আবার ধীরে ধীরে নামতে থাকে রঙ্গমঞ্চের উপর। তখন সব ফাঁকা হয়ে যায়।

আর তখন গালে হাত দিয়ে বসে থাকতাম আমি, পুনরায় যবনিকা ওঠার অপেক্ষায়।

আজ বড় বেশী করে মনে পড়ে উদ্ধারণপুর শ্মশানের সেই জমজমাট দিনগুলিকে। প্রতি রাতে আমার সেই রাজসিক শয্যায় শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আগে হিসেব খতিয়ে দেখলাম, কি কি জমা পড়ল সেদিন আমার জমা খরচের খাতার পাতায়। কম কিছু নয়, আক্ষেপ করতে হোত না কোনও দিন। তখন সারা দিনের উপার্জ্জন অমূল্য মনিরত্নগুলি সাজিয়ে সাজিয়ে তুলে রাখতাম আমার মনের গহন কোণের মণি-কোঠায়। একটি পরম পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসত বুক খালি করে।

তারপর নিশ্চিন্ত আরামে চোখ বুঁজে ঘুমিয়ে পড়তাম বুক ভরা আশা নিয়ে। ঘুম ভাঙ্‌লেই এমন একটি দিনকে পাব যা রঙে রসে যেমন টইটুম্বুর, আলোয় আঁধারে তেমনি রহস্যময়। এমন একটি দিনকে বরণ করবার বুক-ভরা আশা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া কি কম ভাগ্যের কথা!

এখন রাত পোহায় আঁটকুড়ো দিনের মুখদর্শন করে। অর্থাৎ হাড় অযাত্রা। এখনকার এই দিনগুলির কাছে কোনও কিছুই প্রত্যাশা করা বৃথা। জীবনের জোয়াল-বাঁধা কাঁধে নিয়ে টেনে বেড়াবার এতটুকু অর্থ আছে নাকি এখন। বহুবার পড়া পুরাণ পুঁথির পাতা ওলটানো। না আছে তাতে চমক, না আছে উত্তেজনার রোমাঞ্চ। বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা ভোগ। এর নাম বেঁচে থাকা নয়, শুধু টিকে থাকা। মড়া ফুল যেমন গাছের ডালে শুকনা বোটা আঁকড়ে ঝুলতে থাকে।

আজ মনের দুয়ারে ভিড় করে এসে দাঁড়ায়—উদ্ধারণপুর শ্মশানের কত কথা, কত কাহিনী। কোনটিকে ফেলে কোনটি বলি! এমন একটি দিনও তখন আসেনি যেদিন কিছু না কিছু কুড়িয়ে পেয়ে তুলে রাখিনি মনের মণিকোঠায়। সেই সব ভাঙ্গিয়ে এখন এই মড়া দিনগুলোর গুজরান হচ্ছে। মহাশ্মশান উদ্ধারণপুর ঘাটে কুড়িয়ে পাওয়া মণি-মুক্তাগুলির আভা আজও এতটুকু ম্লান হয় নি।

কাটোয়া ছাড়িয়ে গঙ্গার উজানে উঠতে থাকলে আসবে উদ্ধারণপুর। শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেবের পার্ষদ শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর। তাঁরই নামের স্মৃতি বহন করছে উদ্ধারণপুর। কিন্তু সে কথা কারও মনে পড়ে না। উদ্ধারণপুর বলতে বোঝায় উদ্ধারণপুরের ঘাট। "যত মড়া উদ্ধারণপুরের ঘাটে"—এটা হচ্ছে ওদেশের একটা চলতি কথা। অবাঞ্ছিত কেউ এসে জ্বালাতে থাকলে বিরক্তি প্রকাশ করে এই কথাটা যখন-তখন বলা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার যে অংশটুকু গঙ্গার পশ্চিম তীরে পড়েছে, বারভুম জেলার প্রায়

ষোল আনা মড়া আসে সেই উদ্ধারণপুর ঘাটে। কাঁথা মাদুর চট জড়ানো বাঁশে ঝোলান মড়া দশ দিনের পথ পেরিয়ে আসে উদ্ধারণপুর ঘাটে পুড়তে। ওদেশের নিয়ম স্বজাতিরা মড়া কাঁধে করে গ্রামের বাইরে একটা নির্দ্দিষ্ট গাছ তলায় নিয়ে গিয়ে মুখাগ্নি করবে। মন্ত্র পড়া পিণ্ডি দেওয়া এ সমস্ত শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান সেখানেই সেরে ফেলা হয়। তারপর মড়াটিকে নিয়ে যাওয়া হয় উদ্ধারণপুরে গঙ্গায় দিতে। গঙ্গায় দেওয়া যদি সামর্থ্যে না কুলায় তাহলে আত্মীয়স্বজনের আর আক্ষেপের অন্ত থাকে না। দশবছর আগে যে মরেছে তার জন্যেও শোক করতে শোনা যায়—ওরে বাপ্‌রে-তোকে আমি গঙ্গায় দিতেও পারিনি রে বাপ্।

গঙ্গায় মড়া নিয়ে যাবার জন্যে গাঁয়ে গাঁয়ে দু-একদল লোক আছে। মড়া বওয়া হচ্ছে তাদের পেশা। কে কোথায় মরমর রয়েছে সে খোঁজ তারা রাখে। মরার সঙ্গে সঙ্গে জুটবে গিয়ে সেখানে। তখন দর কষাকষি চলবে। এত বোতল কাঁচি মদ, নগদ টাকা এত। আর যাওয়া আসায় যে ক'দিন লাগবে সেই কদিনের জন্যে চাল ডাল নুন তেল তামাক মুড়ি গুড়! সব জিনিষ বুঝে পেলে মড়াটাকে কাঁথায় মাদুরে জড়িয়ে একটা বাঁশে ঝুলিয়ে হাঁটতে সুরু করবে উদ্ধারণপুরের দিকে। এরাই হোল কেঁধো। সব জাতের ঘর থেকেই কেঁধোর পেশার লোক জোটে। যে ছেলেটা বকে গিয়ে বাউণ্ডুলে হয়ে গেল, সে আর করবে কি? পরের পয়সায় মদটা ডাঙ্‌টা চলে এমন পেশা বলতে ঐ কেঁধোর পেশার তুল্য আর কোন কাজটি আছে! টাকাটা সিকেটা ত জোটেই। পেট ভরে খাওয়াটা ও ফাউ, তার উপর নেশাটা। গাঁয়ে ফিরে একটি ফলারও জোটে বরাতে। যেমন তেমন করে মৃতের পারলৌকিক কর্ম্ম করলেও কেঁধোরা বাদ পড়ে না। মুখাগ্নি হয়ে যাবার পর আর জাতি বিচারের দরকার করে না। তখন বামুনের মড়াও এদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। মাসে যদি দু তিনটে কাজও কপালে জুটে যায় তাহলে কেঁধোদের সচল বচল থাকে সব দিকে।

কিন্তু সব সময় ত আর সেরকম চলে না। হামেশা আর মরছে কটা লোক? একবারের বেশী দুবার ত আর মরবে না কেউ। একবার মলেই একজনের মরার পালা সাঙ্গ হয়ে গেল জন্মের মত। তখন আবার আর একজনের দিকে তাকিয়ে কেঁধোদের দিন গুনতে হয়। আর এক একটা লোক জ্বালায় ত কম নয়। ক্ষীরগোবিন্দপুরের ঘোষাল মশাই আজ মরি কাল মরি করে তের বছর পার করে তবে এলেন। তের বছর একজনের দিকে নজর রেখে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করা কি সহজ কথা না কি!

মড়া কাঁধে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে মাঠের পর মাঠ ভাঙ্গতে থাকে কেঁধোরা। রান্না খাওয়ার সব কিছু ত সঙ্গে আছেই। পথে কোথায় কোথায় থেমে খাওয়া দাওয়া করা হবে

তার জন্যে এক একটা আম জাম বট পাকুড় গাছ ঠিক করাই আছে। ঘণ্টা পাঁচ ছয় সামনে চলে সেই গাছতলায় পৌঁছে—প্রথমে মড়াটাকে টাঙ্গানো হবে সেই গাছের ডালে। নয়ত ওরা যখন ব্যস্ত থাকবে খাওয়াদাওয়ায়—তখন শেয়াল-কুকুরে টানাটানি করবে যে। মড়াটা টাঙ্গিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে আশেপাশের খানা ডোবা পুকুরে ডুব দিয়ে এসে সকলে রান্নাবান্নায় লেগে যাবে সেই গাছতলাতেই। তার সঙ্গে চলতে থাকবে মদ গাঁজার শ্রাদ্ধ। খাওয়াদাওয়ার পর সেই গাছতলাতে পড়েই লম্বা বেহুঁস ঘুম। ঘুম ভাঙ্গলে মড়া নামিয়ে নিয়ে আবার হাঁটা। এইভাবে দশ দিনের পথ ভেঙ্গেও মড়া আনে উদ্ধারণপুর ঘাটে।

আবার এরই মধ্যে অনেক রকমের অনেক সব গড়বড়ও হয়। বর্ষার সময় বিচার বিবেচনা করে মাঠের মধ্যে কোনও নালায় ফেলে দিলে মড়াটাকে। দিয়ে যে যার কুটুম বাড়ী চলে গেল দূর গাঁয়ে। কাটিয়ে এল কটা দিন। প্রাপ্যটা ষোল আনাই মিলে গেল দিকদারি না ভুগে।

আরও নানা রকমের কাণ্ডও ঘটে। তবে সে সমস্ত ব্যাপার হামেশা ঘটে না। উপযুক্ত শাস্ত্র-সঙ্গত আধার পেলে শুরু হয় মড়া খেলানো। মড়াখেলানো অতি কঠিন গুহ্য ব্যাপার। যার তার কর্মও নয়। পাকা লোক দলে থাকলে তবে এ খেলা চলে।

কিন্তু এ সমস্ত ব্যাপার বড় একটা হতে পায় না। সব মড়াই আর কেঁধোদের হাতে নিশ্চিন্ত হয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় না। আত্মীয় স্বজন সঙ্গে থাকেই। তার পর বড় ঘরের কাণ্ড। খাটে করে মড়া যাবে। সঙ্গে-লোক জন-আত্মীয় স্বজন এক পাল। যেন বিয়ের বরযাত্রা চলেছে। এ সমস্ত ব্যাপারে কেঁধোদের যদি ডাকা হয়ও তবে তাদের পাওনা শুধু ঐ টাকা কটাই। এক ঢোঁক মদ বা এক বেলার ফলারও নয়।

সেই বিখ্যাত উদ্ধারণপুরের শ্মশানে যে ঘাট দিয়ে ওদেশের বাপ ঠাকুরদার ঠাকুরদারাও পার হয়ে চলে গেছেন ওপারে, সেই ঘাটেই তখন আমি সাধ করে বাসা বেঁধেছিলাম। ছিলামও কয়েকটা বছর বড়ই নির্ঝঞ্ঝাটে। একেবারে রাজার হালে আর আমিরী চালে।

শ্মশান গঙ্গার কিনারায়—দক্ষিণে উত্তরে লম্বা। পশ্চিমে বড় সড়ক। সড়ক থেকে নেমে শ্মশানে ঢুকলে দেখা যাবে গঙ্গার জল পর্যন্ত সমস্ত স্থানটুকুময় ভাঙ্গা হাঁড়ি কলসা পোড়া কাঠ, বাঁশ চাটাই মাছুর দড়ি আর হাড় গোড় ছড়িয়ে পড়ে আছে। ইয়া হামদা হাম্দা শিয়ালগুলো আধপোড়া মড়া নিয়ে টানা হেঁচড়া করছে। দিনের আলোয় সকলের চোখের ওপরেই তাদের খেয়োখেয়ির বিরাম নেই। ওদের চক্ষুলজ্জা বলতে কোনও কিছুর বালাই নেই একেবারে। রক্ত চক্ষু কেঁদো কেঁদো কুকুরগুলো বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়ত বা একটা টাটকা কচি ছেলেকে পোঁটলার ভেতর থেকে টেনে বার করেছে। চেটে চেটে তাজা রক্ত চুষছে ছেলেটার নাভিকুণ্ড থেকে।

একেবারে গঙ্গার কিনারায় জলের ধারে শকুনগুলো পাখা মেলে মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। যা খেয়েছে তা হজম না হওয়া পর্যন্ত ওরা পাখায় রোদ লাগাবে।

শ্মশানের উত্তর দিকের শেষ সীমায়—একটু উঁচু ঢিবি। ঢিবির পেছনেই আকন্দ গাছের জঙ্গল। সেই ঢিবির ওপরেই ছিল আমার গদি।

তোষকের ওপর তোষক তার ওপর আরও তোষক, তার ওপর অগুণতি কাঁথা লেপ কম্বল চাপাতে চাপাতে আমার সেই সুখাসন মাটি থেকে দুহাতের ওপর উঁচুতে উঠে গিয়েছিল। ওখানে গিয়ে প্রথম যেগুলো পেতেছিলাম সেগুলো ক্রমে ক্রমে মাটিতে পরিণত হচ্ছিল। তা হোক না, আমার কি তাতে? আমার ত অভাব ছিল না কোনও কিছুর। রোজই কিছু না কিছু নতুন জিনিষ চড়ছেই আমার গদিতে। কাজেই একেবারে তলার গুলোর জন্যে মন খারাপ হোত না।

বনকদমপুরের কুমার বাহাদুরের বুড়ি ঠাকুমার গঙ্গালাভ হোল মাঘ মাসে। আধ হাত চওড়া হাতের কাজ করা কাশ্মিরী শালখানা এসে চড়ল আমার গদির ওপর। দিন কতক লাগল ঝুলতে আমার গদির দু পাশে সেই অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-করা পশমী শালের পাড়। তার ওপর শুয়ে শরীর-মন-মেজাজ বেশ গরম হয়ে উঠেছে। কয়েকটা দিন কাটতে না কাটতেই এসে গেলেন গোঁসাই পাড়ার সপ্ততীর্থ ঠাকুর মশাই। তাঁর শিষ্য ভক্তরা প্রভুকে একখানা নতুন মটকা চাদর চাপা দিয়ে নিয়ে এল। দিলাম চাপিয়ে সেই মোলায়েম মটকাখানা কশ্মিরী শালের ওপর। শাল নিচে যেতে সুরু করলে। মটকার ওপর শুয়ে মন মেজাজ বেশ মোলায়েম হয়ে আসছে—এমন সময় এলেন পালবাবুদের বড় বৌ মা একখানি রক্তবর্ণ বেনারসী পরে। তা বলে বেনারসী পরে চিতায় ওঠা যায় না। বেনারসী ছাড়িয়ে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে নতুন লাল পাড় সাড়ী পরিয়ে সিন্দুরে চন্দনে আলতায় সাজিয়ে যখন তাঁকে চিতায় তোলা হল তখন সেই বেনারসীও এসে গেছে আমার গদির ওপর। পালবাবুর খোদ শালাবাবু আস্ত পূর্ণাভিষিক্ত কৌল। বিলাতী ভিন্ন দিশি জিনিষ ছোঁন না তিনি। তবে আমার কাছে যা পেলেন তা হচ্ছে শোষণ করা মহাকারণ। মহাপাত্র পূর্ণ করে মহাকারণ করে গেলেন তিনি। ভাগ্নে বৌয়ের বেনারসী খানা নিজে হাতে আমার গদির ওপর বিছিয়ে দিয়ে বিকট চীৎকার করে উঠলেন, "বোম্ কালী শ্মশানওয়ালী, যাকে নিলি তাকে পায়ে ঠাঁই দিস মা।" বলে ঢক-ঢক করে গলায় ঢেলে দিলেন মহাকারণ।

বেনারসীর ওপর শুয়ে রাতে ঘুম হোল না। খস খস করে, গায়ে ফোটে। তারপর দিন বিরক্ত হয়ে তার ওপর চাপালাম একখানি পুরান কাপড়ের নরম কাঁথা। কাঁথা খানায় বড় যত্নে সাড়ীর পাড় থেকে নানা রঙের সুতো তুলে ছুঁচ দিয়ে ফুল লতা পাতা আঁকা

হয়েছে। কতদিন লেগেছে তৈরী করতে কাঁথাখানা কে জানে! এবার তার ওপর শুয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

এই ভাবেই তখন আমার আমিরী মেজাজ গড়ে উঠেছিল। কোনও কিছুর জন্যই পরোয়া ছিল না তখন। গরজ বলতে কোনও বালাই ছিল না একেবারে। অফুরন্ত ভাণ্ডার—কে কার কড়ি ধারে?

আমার সেই গদির তিনপাশে দিয়েছিলাম বাঁশ পুঁতে। অপর্য্যপ্ত বাঁশ, চাঁচা ছোলা পরিষ্কার করা। যে বাঁশে মড়া ঝুলিয়ে আনে তা নাকি পোড়াতে নেই। সে বাঁশ পোড়ালে আর সহজে বয়ে আনবার জন্যে মড়া জুটবে না। কেঁধো বন্ধুরা কায়মনোবাক্যে এ কথাটি বিশ্বাস কোরত। আর সেইজন্যেই তারা মড়া নামিয়ে বাঁশখানা এনে আগে পুঁতে দিয়ে যেত আমার গদির তিন পাশের দেওয়ালে। ঘরখানির উপরে চাল হয়েছিল মাদুর আর চাটাই দিয়ে। মাদুরের ওপর মাদুর তার ওপর চাটাই আর চাটাই। ঘরের ভেতর তিনদিকের বাঁশের দেওয়াল ঢেকে দিয়েছিলাম রঙ বেরঙের সাড়ী দিয়ে। মাথায় ওপর হরদম বদলে বদলে ঝুলিয়ে দিতাম নতুন নতুন চাঁদোয়া। চাঁদোয়াও সাড়ী দিয়ে বানানো। কোনও কিছুরই অভাব ছিল না কি না তখন। এতে কার না মেজাজ চড়ে!

খাওয়াদাওয়ার কথা না বলাই ভাল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক কথা একশবার শুনতে হচ্ছে 'বাবা এটুকু পেসাদ করে দিন?' গণ্ডা গণ্ডা বোতল সামনে নামিয়ে দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে মিনতি করছে 'বাবা পেসাদ করে দিন।' এক ঢোঁক করে গিলতে গিলতেও সারাদিন অন্ততঃ এক পিপে গিলতে হোত। তার ওপর গাঁজা। কলকেতে আগুন দিয়েই জোড় হাতে এগিয়ে ধরবে "প্রভু-ভোগ লাগান।" টান দিতেই হবে একটা। নয়ত ভক্তরা হায় হায় করতে থাকবে। বলবে-'ভৈরবের কিপা পেলুম না।'

বাজার থেকে কিনে আনলে লুচি পুরী মেঠাই মোণ্ডা। তাও 'পেসাদ' করে দিতে হবে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে মিলে গেল গঙ্গার ইলিশ। মাছ ভাজা আর গরম ভাত তৈরী হোল। কলাপাতা পেতে সামনে সাজিয়ে দিলে আগে। তাও করে দাও প্রসাদ। ডোমপাড়া থেকে দুটো হাঁস কিনে এনে পালখ ছাড়িয়ে সেদ্ধ করে ফেললে পেঁয়াজ-গরম মসলা দিয়ে। তার সঙ্গে খিচুরী। দাও পেসাদ করে। শ্মশান জাগিয়ে যে বসে আছে সেই ত সাক্ষাৎ ভৈরবের চেলা। প্রথমে তার মুখে না উঠলে অপরে এখানে মুখে দেয় কি করে কিছু!

এই ভাবেই কেটেছে তখন আমার উদ্দারণপুরের সেই মধুর দিনগুলি।

ক্রমশঃ

সালতামামী

ভারত-ইরাক-সমন্বয়

১৯৩৩-এ গথিক আর্য্য হিটলার যখন মোহেঞ্জোদারো-মার্কা স্বস্তিকা-চিহ্ন হাতে লাগিয়ে সিন্ধু-উপত্যকার স্পার্টান মুষিকের মতো বিয়ার-সেলার থেকে বেরিয়ে উপরে উঠে এলেন, তখন ফরাসী তরুণ নাট্যকার 'আলবেয়ার কেমু' তাঁর 'প্লেগ'-উপন্যাসের কথা ভাবছেন। কিন্তু উরোপায় অপর আর্য্য ইংরাজ তখন নিরুপায় হয়ে সিরিয়া-মেসোপোটমিঞা দ্বিখণ্ডিত করবার মতলব ঠিক করে ফেলেছেন এই রণদেবতার পুনরাবির্ভাবে। কোরিন্থে প্রোথিত ছিল উরোপার রণদেবতা মঙ্গল-গ্রহের প্রসাদপুষ্ট গ্রাসীয় বিষণ্ণ মূর্ত্তি। সম্প্রতি তাঁর কবর খোঁড়ার খবর বেরিয়েছে। প্রাক-পুণ্য-শ্লোক মোঙ্গল-দেবতারা সিরিয়ার সেলুসিদ আমলের, যার প্রথম পুরুষ মৌর্য্য বৈবাহিক। কৌটিল্য-ব্রাহ্মণের দেবদৈত্য-মিশ্রিত গুরু-প্রতিভায় সেলুসিদ বাহিনীকে সিন্ধু এলাকার আলেকজান্দ্রিয়া ত্যাগ করতে হয়। শতবর্ষেই তাঁদের পুনরাগমন হয় পঞ্চাল-শাকল্য রাজা মিলিন্দুর দরবারে; তখন বৌদ্ধগুরু নাগসেন রাজাকে ধর্ম্মান্তরিত করে ফেলেন। সেকালে শুঙ্গ বা ত্রাতার সেবক গ্রাকদূত হেলিওদোরা ভেবেছিলেন যে বৌদ্ধ হলে 'ছাগ'-ধর্ম্ম বা দায়নিসাস-জামা গায় রাখা দায় হবে; অতএব ভাগবত হওয়াই ভালো। মৌর্য্যোত্তর যুগে মগ-গ্রাক (সিরিয়ান) মুস্কিলে পড়েছিলেন সিন্ধু-উপত্যকায়, মৌর্য্যসেনাপতি শুঙ্গ আর্য্য মিত্রদের উপদ্রবে। ভর্হুত নামে জায়গাটি তাঁদের প্রজাবৃন্দের দানসত্র বা প্রদর্শনীক্ষেত্র ছিল। ভর্হুত যেমন হোতৃভারত বোঝায় ধ্বনি-গুণে, তেম্নি সিরিয়ার সাম্প্রতিক নৃত্যস্থলী 'ব্যয়রুথ'-ও হয়ত বোঝাত তৎকালে। না বোঝাবার কারণ নেই। খ্রীষ্টপূর্ব্ব চোদ্দ শতক থেকে দ্বাদশ-শতক পর্য্যন্ত আর্য্য মিত্রাণি রাজ্য সিরিয়া-মেসোপোটমিঞায় কায়েম থেকে "ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ"—গায়ত্রীমন্ত্র বা সবিতৃধ্যান জপিয়েছে সেখানকার বেবিলোনী রুথ-মোওয়াবাট মানবদের। ফলে আজমীঢ়ে যখন শুঙ্গ-মহাভারতের সবিতৃমঠ নির্ম্মিত হ'ল তার স্থাপত্য ইরাকী 'সকে'র বা কবরের গম্বুজমার্কা হয়ে দাঁড়াল। এই নক্সাটি জ্যা-শরযুক্ত এসিরীয় বা মিশরীয় বীরযুগ থেকে পাওয়া মনে করা যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মরাজিক দেখলে এই যুক্তি এঁটে বসে। পিরামিদের ত্রিকোণ সুমেরী 'জিগ্‌গুরথে' (নৃসিংহবাহন দোলমঞ্চ) খানিকটা ভঙ্গী বদলায়, যা বৌদ্ধ আমলের তক্ষশিলায় ধর্ম্মরাজিক চৈত্য-গাত্রে দেখা যায়। তারপর তা ক্রমে বৃত্তার্দ্ধ আকার নেয় এবং সবিতৃমঠে পুরোপুরি মসজিদ-গম্বুজ হয়ে ওঠে। সেণ্ট-মেরির বাইজেন্তিনাম গীর্জ্জা-চূড়াও এম্নি। কিন্তু ইরাণী 'জিয়ারৎ' গথিক স্থাপত্যের চিহ্নবাহী।

উত্তর ভারতের সঙ্গে ইরাক-ইরাণের দহরম-মহরমের কথা 'স্বস্তিভিঃ'-মন্ত্র প্রণেতা ঋক্‌বেদের বসিষ্ঠ-সূক্তে আছে। মোহেঞ্জোদারোর স্বস্তি-মোহর নির্ম্মাতা আর "রঞঞো বসিষ্ঠীপুতস বিলিবায়কুরস' নামক অন্ধ্র রাণা যেমন ঘনিষ্ঠ তেম্নি তাঁদের সঙ্গে গণ-রণক স্বস্তিকাবাহী হিটলার ঘনিষ্ঠ। গথ ও গুপ্তদের নৈকট্য সিরিয়া-মানব ফণীসিয় কণ্ননাইট 'গুট্ট'-কুলে স্থাপিত।

ইরাকী শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় খলিল কণ্ণ প্রাক্তন 'মিতানি' সাম্রাজ্যের প্রত্নশিল্প সমভিব্যাহারে নবীন

শিল্পীদের যে কারুকর্ম্ম ভারতের প্রেক্ষণের নিমিত্ত প্রেরণ করেছেন, তা পার্কষ্ট্রীটের প্রদর্শনী গৃহে দেখে এসে উল্লিখিত কথাগুলো মনে পড়েছিল। প্রথম আর্য্যের আদিবাসস্থলী ইলা-বুধের দেশে—সুতরাং ঐল গোষ্ঠী 'খ্যাতিমান' যযাতিকুল আর্য্য-রাজন্য। শ্রীকৃষ্ণ ঐল। তবে ঐতিহাসিকরা জাতিটির নাম দিয়েছেন গ্রাক 'আর্টি'-শব্দে 'বিভ্রান্ত' হয়ে 'কুশাইট'। বস্তুত এঁরা ভারতে মোঙ্গোল-শত্রু হিন্দু কুশজাতি। 'অনাস ত্বচম্ কৃষ্ণা' বলে উল্লেখিত আর্য্যরাজন্য কুল।

পুরোহিত গোপী বা আভীরদের সঙ্গে ঐল-কুল মিশ্রিত হয়ে 'যাদব'-বংশ তৈরী করে। ঐল-কুল গাঙ্গেয় মিশ্রণে 'তুর্ব্বসু' নাম নেন। ভুবনেশ্বর, পুরী ও কোনার্ক স্থাপত্য-ভাস্কর্য্য এই গঙ্গরাজবংশের।

'ঐল' কথাটিই সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে 'ঐর' হয়ে যায়। ঐর-রাজা 'সিরিখারবেল' (সেরিকা বা কুশদ্বীপের 'বেল') করমণ্ডল উপকূলের রথযাত্রা প্রবর্ত্তক ও চেট্টিকুলোদ্ভব। তিনি-ও মৌর্য্যোত্তর বলে সনাক্ত। এসিয়ামাইনরে ইরাক-ইরাণ সিরিয়া তুরস্ক ও হেব্রু যখন পঞ্চাল 'মিতানি' তৈরী করেন তখন সীলমোহর গড়বার ভার ছিল এই চেট্টির (শ্রেষ্ঠী চেদী) বাণিজ্যিক ষষ্ঠ হাতে। দু'টি ইরাবতী-নদী এঁদের ঐর নামে বিধূনিত। ইরাণ-ইরাক এঁদের স্পর্শমুক্ত নন।

পুরণো ইতিহাসের মতিগতি জানা না থাকলে ইরাকী শিল্পপ্রদর্শনী হৃদয়ঙ্গম করা মুস্কিল ছিল। মাননীয় খলিল কণ্ণ ইরাণ-ইরাকের দু-ইয়াকি ভেট পাঠাননি কিম্বা পাঠান-পৈঠান-পার্থান-স্পার্টান সামরিক দৌত্যও প্রেরণ করেন নি। শিল্পকর্ম্ম পাঠিয়েছেন আত্মীয়তা বিনিময় কল্পে। তবু ইরাকের যক্ষের ধন পেট্রোলিয়াম-এর খবরবার্ত্তা দেখা যায় ছবির গায়ে। ইরাক-ইরাণে ইংরেজ যে চাতুরী দেখিয়েছেন, দ্বিখণ্ডিত করবার যে সিজার গুণ দেখিয়েছেন সালাদিনের মতো, সেই 'সালাতিন' নিয়ে ইরাবতী-ক্ষেত্র পঞ্চালের ও বাঙালীর ভাগ্যলিপি ইতিহাস-লেখন সুরু। এবং সেই গুণবশে ইংরাজ পঞ্চাল ও বঙ্গালকে দ্বিখণ্ডিত-ও করে গেছেন। ইরাকী শিল্পীদের মনপ্রাণ ও বিদীর্ণ হৃদয় দেখতে হলে বা বুঝতে হলে এসব কথাও ভেবেচিন্তে দেখতে হয়।

ব্রহ্মদেশীয় ইরাবতী ক্ষেত্রের বাঙালী জবলীজেন্দ্র আগ্নেয়াস্ত্র নিয়েও খ্রীষ্ট দ্বিতীয় শতকে স্বস্তিমন্ত্র পাঠ করেছে কোরেশ আরবি-কে (কুরস) ডেকে সিঙ্গাপুরে— সেই শতকে ইরাকও স্বস্তিমুদ্রান্বিতা ও জঙ্গী-পুরুষের পদাশ্রিতা করে 'জবল'-কন্যা 'উবল'-কে প্রতিষ্ঠিতা করেছে। জুলিয়াস সিজারের মিশরী রাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে'? সে বাঙালী ইংরেজ-মোগল আমলে হয়ত হিন্দু শক—হয়ত ব্রাত্য, হয়ত ম্লেচ্ছ। কারণ, অশোক-মৌর্য্য নেই যে বলবেন: এঁরা 'উবলিকেক'-শাক্য।

চেষ্টা-প্রযত্ন থাকলে ইরাকের এখনকার তেল-রঙা শিল্পশালা থেকেও বাঙালিনী মহিলা আবিষ্কার করা যায়—যেমন জেবদ সেলিমের আঁকা 'নলিনী'। ব্যথার কালিমায় বাইজেন্টিনাম মূর্ত্তির আদর্শে আঁকা এই নলিনী-কন্যার পোষাক, মুখ ও ব্যথার কারণ সবই আমাদের চেনা। জেবদ অন্তত পিঙ্গল-পাঠক বাঙালী দর্শকের চোখে ফাঁকি দিয়ে তাদের জব্দ করতে পারবেন না।

কিন্তু জব্দ করেছেন তিনি দারুশিল্পী হিসেবে আমাদের মনকে। তার প্রতিভা এ ক্ষেত্রে হেনরী-মূরের ভাস্কর্য্য-প্রতিভার তুল্য। তৈরীও করেছেন মূর-জননী—আফ্রিকার মুখমণ্ডল বিশিষ্টা (বেনিন-মকোও শিল্পের) দারুব্রহ্মাণীকে তিনি 'সবিতৃ' বা প্রসূতি হিসেবে দণ্ডায়মানা করেছেন। প্রি-ফতেমাইট আরব স্মরণে হয়ত এই পরিকল্পনা। কৃষ্ণগুরুর চর্য্যাপদোক্ত কায়াতরু। পঞ্চেন্দ্রিয় শাখা যে ফলটি

দিয়েছে তা আদি-মাতার শিরোধার্য্য। ভর্ত্তৃহীনা জবালার 'সত্যকাম'—বৈদিক শরগণ-জননী দেবদাসীর অঙ্কদপুত্র।

কাঠের শ্বেত-চন্দন রঙে আমাদের বোম্বের স্কন্দন-জ্যোতির কথা মনে পড়ে—ব্রাহ্মণসাহী দাহির নাম স্মরণ করতে ইচ্ছা যায় এই দারুব্রহ্মাণীকে দেখে। 'হবা'র বিষ-ফল চিরজননী শিরে বহন করছেন—চিরযুগের চিরাঞ্চলের চের ভূমিমাতা। তাই চিরতন চিহ্ন মোহেঞ্জোদারোর পুরুষ-গাত্রে এবং দায়নিসাসের প্রাচীনতম মূর্ত্তির দ্রাক্ষালতায়। জেবদ ফলটিকে তরুকায়া থেকে সন্তর্পণে আলাদা রেখে বলতে চেয়েছেন, সন্তান নাড়ীছেঁড়া বিচ্ছিন্নতাময় এক আদরণীয় বস্তু সহনশীলা ধাত্রীমাতার নিকট। ভাব এই শিল্পে রূপানুষঙ্গে মানবিক ইতিহাসের প্রত্যেকটি অধ্যায়ে বিচরণ করে শিল্পী সেলিমকে ইরাকের জিউস-প্রিয়া হীরার টুকরো বানিয়ে দিয়েছে আমার দৃষ্টিতে। 'জিউ'-ধ্বনি শুনছি বোম্বাই বন্দরে ও মোগলদরবারে।

কিন্তু তাঁর 'অজ্ঞাত বন্দী' ভীষণ জ্যামিতিক। ইন্দ্রের জ্যা-যুক্ত নয়, বৈশ্যতা-বশে শৈব ত্রিশূল-বিদ্ধ। যক্ষের ধন তেলের কলের চিত্র-রূপ বহুমাত্রিক হয়ে রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাট্য-কথা উড়িয়ে চলেছে আমাদের মনে—কালিদাসের যক্ষ-গীতি নয়।

তা-ই তাঁর চাইতে প্রিয়তর মনে হয়েছে শিল্পী অলচেকলিকে যিনি এখনকার বিচ্ছেদদুঃখাতুরা লেবাননীকে বেছে নিয়েছেন গোমতী-জননী হিসেবে—আভীর-গোপিনী দুধওয়ালী (লেবাননী) রূপে কিম্বা উট-পাখীর ভ্রান্তি-দাতা আরব রজককে। অবশ্য চণ্ডীদাসের রজকিনীকেও গোপিনীর মতোই রাই মনে করি আমরা। অলচেখলির রাইগোপিনিবৃন্দা মথুরার হাট 'হাটরা' পাচ্ছেন না বলেই কি শ্লথগতি, বিমর্ষা? না, তা নয়। তার চাইতে গভীরতর হৃদয়বিদারী ব্যথা এঁদের মনে, যা ঋক্‌বেদী আচার গোবৎসহত্যা এঁদের প্রাণে আজও আনছে। দুধের বেসাতির সঙ্গে সঙ্গে চলেছে দুধের বাছাদের রক্তাক্ত মাংস হিংস্র যমানুচর মানবের উদরপূর্ত্তির জন্যে। শিল্পী এই চিত্রটি 'লেবান-ওয়ালী'তে দেখাতে গিয়ে লোহিত-আদিত্যের মুখ শববনের পাবনিক শরে বিদ্ধ করে দেখিয়েছেন, যা কুশার্যের হিংস্রতার প্রতীক ছিল সুমেরী সভ্যতায়। আমরা অশোক রাজার আমলাতন্ত্রের ঋষিবিরোধী একজন থেরবাদী শিল্পীর মন পেলাম অলচেখলির এই ছবিতে। তবু ঐরজাতির শিল্প-প্রদর্শনী উপলব্ধি করতে সাম-ঋকবেদী বৈষ্ণব মতিগতির দরকার হ'ল।

সাহিত্য সংবাদ

বৈশাখের পত্রচ্ছায়া

নূতন দু'টি মাসিক পত্রিকা বৈশাখ থেকে বেরুবে আমরা খবর পেয়েছি। একটি মহিলা পত্রিকা: সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সুলেখা দাশগুপ্তা। অপরটি হাওড়া থেকে, যেখানে সাহিত্য পত্রিকা নেই। তার নাম 'পাণ্ডুলিপি': সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুশীল ভট্টাচার্য্য।

বার্ষিক সাহিত্য-পত্রিকা 'বৈশাখী' শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসুর সম্পাদনায় বৈশাখে বেরুবে। শান্তি-নিকেতন থেকে 'ঋতুপত্র'-ও বৈশাখে বেরুচ্ছে।

শুভ-বৈশাখ সাহিত্যের সু-ঋতু আনয়ন করুক। শনিবারের চিঠিও নবকলেবর পরিগ্রহ করছে।

'রবিবাসরে'র রজতাভা

'রবিবাসর'—সাহিত্য সভা এই চৈত্রে শতকের একচতুর্থাংশ পঁচিশ বছর পুর্ণ করল। এ সভার তারুণ্য ঈর্ষ্যাযোগ্য। এ-তারুণ্য পুরাতন দারু-নিম্মিত। প্রাচীন কাষ্ঠখণ্ডের চিলতে নিয়ে নয়া নারঙ্গ-তরুবর যেন সম্মুখে ভাস্বর। আমাদের চোখে তা-ই 'রবিবাসর'। নয়া জমানার কোনো সভা পঁচিশ মিনিট-ও টেকেনা। পঁচিশ দিন একসঙ্গে সভ্যরা চললেও মাসান্তে মুখদেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়। এই যখন বঙ্গীয় সাহিত্যের রীতি, তখন রবিবাসরের দীর্ঘ-জীবন কতো আনন্দের, তা সাহিত্য-সেবকমাত্রেই অনুভব করবেন।

সাহিত্য-সেবার পুরস্কৃতি

সাহিত্যের পুরস্কার জীবনানন্দ দাশ, শ্রীরাজশেখর বসু (পরশুরাম), শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র পেলেন এ-বছর। নানা দিকদেশের বিচারে এই পুরস্কৃতি। আমরা সাহিত্যিকের পুরস্কার-প্রাপ্তির সংবাদ জানলেই আনন্দিত হই—বিচার-বচসায় অগ্রসর হতে চাইনে। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার ও শ্রীবিমল মিত্র পুরস্কৃত হলে আনন্দ-বর্দ্ধিত হত।

সাহিত্য-ব্রতের রাহুগ্রাস

পুর্ব্বাশার সাহিত্য-ব্রত দুর্গ্রহের মতো আমাদের জীবনে জড়িত। আমরা এতাবৎকাল এ-ব্রত নিয়ে জর্জ্জরিত হয়েছি। সবচাইতে দুর্বৎসর গেলো ১৩৬১-সাল, যে বছর চৈত্র-মাসেও ফাল্গুন-চৈত্রের যুগ্ম-সংখ্যা বেরুলনা। তবু ১৩৬২তে বারোটি সংখ্যার কথা পূর্ব্বাশা বিবেচনা করবে আষাঢ়ের ষষ্ঠ দিবসে।

গ্রন্থ-প্রাপ্তি

সুপণ্ডিত প্রবীণ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের 'ধনুর্বেদ' থেকে সুরু করে নবীন লেখক সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জর্নাল'-তক যে অজস্র পুথি-পুস্তক আমরা সমালোচনার জন্যে পেয়েছি, ১৩৬২-র শুভ-যাত্রার জন্যে তাদের শব্দাদিকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

মহিলা-সাহিত্য

অঙ্গনা (ত্রৈমাসিক)—প্রগতিশীল মহিলাদের সাহিত্যপত্র ॥ সম্পাদিকা: প্রতিভা রায়

'অঙ্গনা' প্রথম বর্ষ উত্তীর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বর্ষে সগৌরবে আত্মবিস্তার করছে। এর অঙ্গসজ্জা বা রচনাগুলিতে কোথাও ম্লানিমার আভাস মাত্র নেই। বেশ দীপ্তিময়ী প্রতিভাশালিনী অঙ্গনা, যাকে বলা চলে শিশু-প্রডিজি। মহিলাদের দাবি, ঋদ্ধি ও প্রতিষ্ঠাদানে সোচ্চার এবং পুরুষদের সমকক্ষতা অর্জনে এর বাছাই বাছাই যুক্তি-তর্ক রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের অনেক পংক্তিই মনে করিয়ে দেয়। তবে 'অঙ্গনা'র চিন্তাধারা পুরুষ ও নারীর কল্যাণকামনায়-ই হবে, এ বিশ্বাস আমার আছে, কারণ দাবি নিয়ে যাঁরা লড়াই করেন তাঁদের মুখপত্রের নাম 'অঙ্গনা' হয় না। 'অঙ্গনা' হবে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা, মোহমুক্তি ঘটাবে—দেবে পরিপুর্ণ নারীত্ব আর মর্য্যাদাবোধ।

খুব আনন্দের কথা যে 'অঙ্গনা'র অঙ্গনতলে বহু জায়া-জননী-কন্যা সমবেত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ—পাঠক-পাঠিকা উভয় লোকেই সুখ্যাতি পাচ্ছেন। সম্পাদিকার আবেদন—মহিলাদের একটি সুসংস্কৃত পত্রিকা হিসেবে অঙ্গনাকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবার দায়িত্ব মহিলাদেরই, এ কথা উল্লেখ করে পুর্ব্বাশার পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রতিদিন: শ্রীমতী বাণী রায় ॥ নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা-১

শ্রীমতী বাণী রায়ের কাছে ইতিমধ্যে সুযশ সুলভ হয়ে গেছে। পাঠকপাঠিকা তাঁর রীতিমত ভক্ত হয়ে উঠেছেন। সুনাম যাঁরা অর্জন করেন, তাঁদের মধ্যে চমৎকৃত করবার উপাদান অনেক আছে, ক্রিটিকের দৃষ্টি হয়ত তা অনেক সময় এড়িয়ে যেতে পারে, তাই রচনার বিচারে সমকালীনের দৃষ্টিও থাকা দরকার। কারণ রচয়িতার জনপ্রিয়তাকে অবহেলা করা যায় না। নিরবধি কাল বিপুলা পৃথ্বী, তবু আজকালের আবেদন বড় মোহময়। নইলে সাহিত্যকর্ম জীবনকে ভারাক্রান্ত করে ফেলতো। শ্রীমতী বাণী রায়ের রচনায় আজকালের জীবন-যাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে, বর্ত্তমান নিম্নমধ্যবিত্তরা উপলক্ষ্য। তাই 'প্রতিদিন'কে নিয়ে শাশ্বতচিন্তা চলবে না।

'প্রতিদিনে' বারোটি কাহিনী আছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখিকার ব্যবকলনই (পাঠকেরও বটে লেখিকার সৌজন্যে) গল্পের ইংগিত। এই পুস্তকে শ্রীমতী রায়ের রচনা ইংগিতধর্মী এবং সার্থকও বটে। তবে এদের আয়ু কতদিনের তা বলা যায় না, কারণ, এ যে লেখিকার মনের সঙ্গে এ ক'দিনের সংঘাত এবং গল্পগুলিও আপন ভারে চলছে না—চলছে অতি সূক্ষ্মতার গৌরবে। কর্পুরের মত যদি উড়ে যায়, তা হলে শ্রীমতী রায় নিশ্চয়ই আফশোষ করবেন না—কারণ, তাঁর কাজ তিনি সুষ্ঠুভাবেই করছেন। মেয়েদের মনের পরিধি আমরা হিসেব খতিয়ে নাও পেতে পারি, শ্রীমতী রায়ের বদৌলৎ এ রহস্যের দরওয়াজা অনেকটা উন্মোচিত হয়েছে। তিনি এজন্যে অকারণ রোমান্টিকতার আশ্রয় নেন নি।

প্রকাশকের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে।

অমল দত্ত

সংক্রান্তি

'সাহিত্য তীর্থে' কথা-সাহিত্যিক ও কবি সম্মেলন

চৈত্র সংক্রান্তি ও পয়লা বৈশাখ দু'দিন অনুষ্ঠান

[প্রাপ্ত-সংবাদ]

গত চৈত্র সংক্রান্তি ও পয়লা বৈশাখ দুদিন ব্যাপী কথা সাহিত্যিক ও কবি সম্মেলন সাহিত্য তীর্থের উদ্যোগে ৬৭, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটের 'মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতি মন্দিরে' অনুষ্ঠিত হয়। কবিসম্মেলন ইতিপূর্ব্বে বহু স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু কথাসাহিত্যিক সম্মেলন এই প্রথম। তাই একটা সংশয় ছিল গল্প পাঠের দ্বারা শ্রোতারা রসোপলব্ধি করতে পারবেন কিনা? শ্রীমনোজ বসু ও শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অনুপম ভঙ্গীতে স্বরচিত গল্প পাঠের সময় শ্রোতারা যেরূপ নিবিষ্ট মনে তাহা শ্রবণ করেন তাহাতে উক্ত সংশয়ের নিরসন হয়। শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী (সর্পশিশু) শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (ষ্ট্যাম্প), শ্রীমনোজ বসু (একটুকু বাসা), শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু (পোকা) ও শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (আমার মা) গল্প পাঠ করেন। বাংলা বছর ১৩৬২ সালের প্রথম সন্ধ্যায় কবি সম্মেলনে প্রাচীন ও আধুনিক রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিদের মধ্যে শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীরাধারাণী দেবী, শ্রীউমা দেবী, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, রাজারাও শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্রীকরঞ্জাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীদিনেশ দাস, শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীরমা দাশগুপ্ত, শ্রীমণিমালা দাশগুপ্ত, শ্রীদুর্গাদাস সরকার, শ্রীকল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীরাণা বসু, শ্রীবিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মাইতি, শ্রীপূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু, শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য, শ্রীকৃষ্ণ ধর, শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীনরেশ গুহ, শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ও শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। শিল্পী শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহার মণ্ডপসজ্জা পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচায়ক ছিল।

কল্যাণ
ও
সংগ্রহ

লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে; কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে।

—রবীন্দ্রনাথ

জীবন-বীমা লক্ষ্মী ও কুবেরের এই অন্তরের কথাই প্রকাশ করে। ব্যক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের দ্বারা সমষ্টিগতভাবে ধন শ্রী লাভ করে এবং তাহাতে সামাজিক কল্যাণ সাধনের পথ প্রশস্ত হয়। স্বদেশী-যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীরা এই আদর্শেই হিন্দুস্থানের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানের ৪৮ বৎসরের কর্মসাধনার ফলে দেশের ধন আজ যে বহুলত্ব লাভ করিয়াছে, ১৯৫৪ সালের নূতন বীমার কাজের বিপুল সাফল্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ:

নূতন বীমা

—১৯৫৪—

৩০ কোটি টাকার উপর

বোনাস

আজীবন বীমায়	১৭৷৷০	প্রতি হাজার
মেয়াদী বীমায়	১৫৲	প্রতি হাজার টাকার বীমায়

স্বদেশী যুগের স্মৃতি-পবিত্র

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ক্রমোন্নতির পথে

নূতন কাজের পরিমাণ

১৯৫৪—১০, ৮৪,৫৫ ৲ টাকা
১৯৫৩—৮, ৭৬, ৬৯, ৭৫০৲ টাকা
১৯৫২—৮, ০৪, ৬৯, ৫৭৫৲ টাকা
১৯৫১—৭, ৫১, ৯১, ১৫০৲ টাকা

মেট্রোপলিটান

ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

দি মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স হাউস

॥ ৭নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা ১৩ ॥

খাদ্যপ্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড্' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

সুপার-নিও-কড্

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ
কলিকাতা-১৩

Editor: Sonjoy Bhattacharya. Printer & Publisher : Satya Prasanna Dutta, Purvasa Ltd., 54 Ganesh Chandra Av